বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

॥ 32 তম বর্ষ ॥ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥

জানুয়ারী : 1979

প্রকাশক, পাঠক এবং লেখকদের প্রতি নিবেদন

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের পুণ্য নামাঙ্কিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তার সূচনা থেকেই ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন এবং প্রয়োজনকে অন্যতম মূল উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থাগারটি 1977 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পাঠাগারে নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে বি এস. সি (পাশ ও অনার্সক্রম), এম এস সি, কারিগরী ও মেডিক্যাল প্রভৃতি ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ আছে। সীমিত অর্থে এই পাঠাগারকে আজো পরিকল্পনামত যথার্থ উপযোগী করে তোলা যায় নি। এই উদ্দেশ্যে, প্রকাশক, পাঠক ও লেখকদের কাছে আমরা একান্তভাবে আবেদন করি—দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করে তাঁরা নমুনাকপি, লেখককপি বা দান হিসাবে নানা পাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ দান করে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করুন। অব্যবহৃত পুরনো পুস্তকও সাদরে গৃহীত হবে।

ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবিজ্ঞান ছাড়া,—জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের ঔৎসুক্য ও বিজ্ঞানতৃষ্ণাকে জাগরিত করে তুলে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতাকে প্রসারিত করাও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পেই—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সাধারণ গ্রন্থাগার। বহু বিজ্ঞানপিপাসু পাঠক নিয়মিত এ গ্রন্থাগারে আসেন। এ গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রিকা সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত নগণ্য। তাছাড়া সাম্প্রতিক বন্যায়ও কিছু পুস্তক ও পত্রিকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের বিভাগটিকে সুসজ্জিত ও প্রামাণ্য বিজ্ঞান গ্রন্থাগাররূপে গড়ে তুলতে—জনসাধারণ, প্রকাশক, পাঠক ও লেখকদের, অর্থ ও পুস্তক মারফৎ সাহায্য পাঠাতে আমরা একান্তভাবে আবেদন করি।

পুস্তকাদি ও সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা :

'সত্যেন্দ্র ভবন'

P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রিট

কলিকাতা-700006

ফোন : 55-0660

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 1, জানুয়ারী, 1979

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাত্রিংশত্তম বর্ষ | জানুয়ারী, 1979 | প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা

আজ 1979 সালের সূচনার সঙ্গে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা তার একত্রিশ বৎসরের আয়ুষ্কাল পূর্ণ করে, বত্রিশ বৎসরে পদার্পণ করল। আজ এই নববর্ষের সূচনায়, পত্রিকার নানা গ্রাহক ও পাঠক, সংশ্লিষ্ট 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদে'র সভ্য-গ্রাহক ও নানা শুভানুধ্যায়ীদের—পত্রিকার পক্ষ থেকে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে ও আমার নিজের পক্ষ থেকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

যে কোন বনস্পতির সৃষ্টি ঘটে একটি বীজ থেকে। উত্তরকালে সেই অংকুরিত বীজের লালন ও পরিবর্ধন, তার শাখাশ্যামলিম বিস্তার, তার যথার্থ পুষ্পিত ও ফলবান হয়ে ওঠার ঘটনাটি কিন্তু নির্ভর করে জল-হাওয়া-ভূমির প্রসাদ ও দাক্ষিণ্যের উপর। একটি পত্রিকার সম্বন্ধেও ওই কথাটিই সত্য। একটি পত্রিকার জন্ম ঘটে কোন একটি আদর্শকে বিকীর্ণ করার ইচ্ছার বীজ থেকে। তারপর সেই পত্রিকার রূপ আর রূপায়ণ সমর্পিত হয় পরিচালক মণ্ডলী, গ্রাহক ও পাঠকের ওপর; এবং বর্তমান কঠোর অর্থ-সংকটের দিনে অবশ্যই জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের আনুকূল্যের এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের সহযোগিতার ওপরও। তবু পত্রিকার রূপায়ণের মূল নিয়ামক গ্রাহক ও পাঠকরাই, এ সত্যটি অনস্বীকার্য। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার ক্ষেত্রেও এই সত্যটি আমরা নতুন বছরে, নতুন করে উপলব্ধি করার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই।

'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' ও তারই মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্নে, স্বর্গত আচার্য সত্যেন্দ্র-নাথের যে স্বপ্নের বীজ ছিল, তার মূল কথা ছিল—

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার, মূল কথা ছিল বাঙালীর মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার একটি ভূমির প্রতিষ্ঠা। বিজ্ঞান মানে 'ভেল্কি' বা সংবাদপত্রের 'স্টান্ট'-রূপে গ্রহান্তর যাত্রা, পরমাণু বিস্ফোরণ, নলজাতক যে নয়, বিজ্ঞানী মানে যে গজদন্তমিনার-বাসী মৃণালভোজী কোন অচেনা সম্প্রদায় নয়, বিজ্ঞান মানে যে দুর্বোধ্য আরেক পরিভাষার জন-বিচ্ছিন্ন জগৎ নয়—বিজ্ঞান যে জল-হাওয়ার মত স্বচ্ছন্দ, প্রাণদ, সহজ, জনজীবন সংশ্লিষ্ট একটি সত্যানুসন্ধানের কল্যাণমুখী প্রচেষ্টা—এই বোধটিই আচার্য সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন জনবোধ্য বিজ্ঞানপত্রিকা সৃষ্টির মাধ্যমে। বিজ্ঞানপত্রিকায় আলোচ্য বিজ্ঞানের বিষয় ও তার প্রকাশভঙ্গীর মূল কথা যে জনলগ্নতা ও সহজবোধ্যতা একথাটি আচার্য তাঁর শেষ একটি পত্রেও সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করে গেছেন। (সেই মূল্যবান পত্রটি এ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত করা হল)। স্বভাবতঃই, এই আদর্শকেই কেন্দ্র করে, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পথপরিক্রমা একান্ত কাম্য।

নানা প্রতিকূলতা ও অনিবার্য কারণে, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা চলমান কালের একটি প্রত্যাশিত সার্থক বিজ্ঞান পত্রিকার রূপ পরিগ্রহ করে উঠতে পারেনি, এ সত্যটি সম্বন্ধে আমরা সলজ্জ ও সচেতন। এই অপূর্ণতা থেকে উত্তরণের প্রয়াসে এ সংখ্যা থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে', নতুন নানা বিভাগ সংযোজিত হল। প্রাথমিক পরিকল্পনারূপে এতে যুক্ত হল—'পুরাতনা' (স্মরণীয় পূর্বসূরীদের বিজ্ঞান রচনা) 'বিজ্ঞান ও সমাজ' (নানামুখী সমাজ মানসের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক), 'ভাষান্তর : বিজ্ঞান' (দেশী ও বিদেশী নানা ভাষা থেকে বিজ্ঞান রচনার অনুবাদ), 'বিজ্ঞানীর জীবনী' 'বিজ্ঞান-সমীক্ষা' (দেশ বিদেশের সাম্প্রতিক বিজ্ঞান কীর্তির সংকলন), 'বিজ্ঞান অভিযান' (বৈজ্ঞানিক গবেষণাভিত্তিক নানা অভিযান ও মৌল প্রয়াস), 'বিজ্ঞান প্রসার পরিচিতি' (পশ্চিম বাংলায় বা অন্যত্র, বিজ্ঞান-ক্লাব, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান আলোচনার সংবাদ), 'সংকলন' (সমকালীন বিজ্ঞানকেন্দ্রিক আলোচনার সংকলন), 'চিঠিপত্র' (বিজ্ঞান-কেন্দ্রিক বা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত রচনার উৎকর্ষ অপকর্ষ মূলক গঠনাত্মক সমালোচনা) এবং সাধারণভাবে বিজ্ঞান-প্রবন্ধ সমূহ, যার মূল ভিত্তি হবে জনবোধ্য বিজ্ঞানের পরিবেশন।

'কিশোর বিজ্ঞানীর আসরে'র প্রচলিত বিভাগ-গুলিরও কিছু কিছু পরিবর্তন হবে যার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হবে বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী কিশোর ও ছাত্রদের অধীত ও পাঠ্যভিত্তিক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে সাবলীল আলোচনা।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র সাধারণ সংখ্যাগুলি ছাড়াও, বিশেষ সংখ্যা প্রয়োজনমত প্রকাশিত হবে। সম্প্রতি 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' ও 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান-কর্মী সংস্থার' যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'পশ্চিমবাংলা ও সাম্প্রতিক বন্যা' সংক্রান্ত সেমিনারের বিষয়বস্তু নিয়ে একটি 'বন্যা সংখ্যা' প্রকাশিত হবে। তাছাড়া, 1959 'আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ'; এরই স্মারকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র একটি বিশেষ 'শিশু সংখ্যা' প্রকাশের কর্মসূচী আমাদের আছে।

এই পরিবর্তনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, গ্রাহক ও পাঠকদের অকুণ্ঠ ও নির্ভীক মতামত এবং আলোচনা-সমালোচনা আহ্বান করছি। পূর্বপ্রসংগের পুনরুক্তি করেই বলি, পত্রিকার রূপ আর রূপায়ণ নির্ভর করে. গ্রাহক এবং পাঠকদের ওপর। এবং শুধুই নির্ভরতার প্রশ্নও নয়—প্রশ্ন দায় এবং দায়িত্বেরও। শুধু আঞ্চলিক ভাষায়ই নয়, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'কে ভারতেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং প্রামাণ্য বিজ্ঞান পত্রিকারূপে রূপান্তরিত করার দায়দায়িত্ব সকলকেই তুলে নিতে হবে। সেই রূপায়ণ সার্থক হলে, তার কৃতিত্বও যেমন সকলেরই, তার অপূর্ণতা যদি থাকে তার দায়ভাগও সকলেরই।

আরেকটি প্রসংগ এবং সেটি অপরিহার্যও—সেটি লেখক-প্রসংগ। পশ্চিমবাংলায় শক্তিমান বিজ্ঞান

লেখক নেই একথা আমি বিশ্বাস করিনে। তাঁরা আছেন, তাঁরা সহযোগিতা করবেন, এবং এর নানা শাখাকে তাঁদের প্রতিভায় ও উদ্যমে সার্থক, ফলবান, পুষ্পশ্রী করে তুলবেন এই একান্ত আবেদন তাঁদের কাছে জানাই। ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের কাছে বিশেষ করে লেখার আবেদন জানাই, কারণ তাঁদের মধ্য থেকেই ভবিষ্যতের লেখক সৃষ্টি হবে। এই লেখক সৃষ্টির দায়িত্বও আমাদের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র এখন থেকে অন্যতম উদ্দেশ্য হবে।

এই বৎসর থেকে ছাত্রছাত্রী ও বিজ্ঞানশিক্ষার্থী লেখকদের কাছ থেকে পাওয়া, প্রতি সংখ্যার দুটি শ্রেষ্ঠ লেখার জন্য—'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র সীমিত সামর্থ অনুযায়ী একটি সম্মান দক্ষিণা পত্রিকার পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। প্রকাশনা ও মূল্যায়নের বিষয়ে সম্পাদক মণ্ডলীর মতই চূড়ান্ত বলে গ্রাহ্য হবে।

পরিশেষে পুনর্বার সকলের কাছে শুভেচ্ছা ও সহযোগতার আবেদন জানাই। সকলের সমবেত সমমর্মিতায় ও সহযোগিতায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র নতুন রূপ ও রূপায়ণ, সার্থক ও প্রাণবান হয়ে উঠুক এই কামনা করি।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান

"লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আলোচিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক বাংলা বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকেরা এবং আধুনিক শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রী বুঝিতে পারেন"।

॥ বিজ্ঞান রহস্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র

* * * *

"মানুষ মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে সে ভাষাতেই সে আপনার সুখ-দুঃখ জ্ঞাপন করে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমার বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধ মাতৃভাষাকেই লিখিত হইয়াছিল।"

॥ 'অব্যক্ত' কথারম্ভ ॥ জগদীশচন্দ্র

* * * *

"শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই। সেই দায়িত্ব নিয়েই আমি একাজ শুরু করেছি। ...যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।"

॥ বিশ্বপরিচয় ॥ রবীন্দ্রনাথ

* * * *

গত কয়েক বছরে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবগুলি এই পুস্তকে সংগৃহীত হইল। বাঙ্গলা ভাষায় সাধারণ পাঠকের নিকট বিজ্ঞান প্রচার বোধ হয় অসাধ্য সাধনের চেষ্টা, সিদ্ধিলাভের ভরসা করি না।"

॥ প্রকৃতি ॥ রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রুতকীর্তি সত্যেন্দ্রনাথ

ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা

এক আকাশে দুই সূর্যের উদয় হয় না, কিন্তু প্রতিভার আকাশে দুই মহাজ্যোতিষ্কের বিরল সম্মেলন ঘটেছিল এই শতাব্দীতেই, যাঁদের ভাস্বরতা শতাব্দী পেরিয়ে উদ্ভাসিত। একজন মহাকবি, আরেকজন মহাবিজ্ঞানী। রবীন্দ্রনাথ আর আইনষ্টাইন। একজনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত সাহিত্যসঙ্গীতের সৌরমণ্ডল, অপর জনের মননের বীজে আধুনিক বিজ্ঞানের নানা বনস্পতির উদ্ভব আর বিকাশ। এই দুই মহাজ্যোতিষ্কের সাক্ষাৎকারও ঘটেছিল। সেই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারে, নানা প্রসঙ্গের মধ্যে প্রসঙ্গান্তরে আইনষ্টাইন সেদিন রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'গণিতবিদ বসু'র কথা। সেই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করতে পারেননি—কে গণিতবিদ্ বসু? পরে, দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথ যোগাযোগ করেছিলেন সেই তরুণ গণিতবিদের সঙ্গে (যদিও তখন তিনি 'বিচিত্রা'র নিয়মিত সভ্য) এবং স্মরণে যাঁকে চিহ্নিত করতে পারেন নি একদিন, তাঁকেই আবার স্মরণীয় করে, দুর্লভ সম্মানের টীকায় অভিষিক্ত করেছিলেন—তাঁর অবিস্মরণীয় বিজ্ঞানগ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়ে'র উৎসর্গনামায়।

কিশোর বয়সে ছাত্রাবস্থায়—ঐচ্ছিক পাঠ্য ছিল, রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়'। সেই বিশ্বপরিচয়ের পাতাতেই প্রথম পরিচয় ঘটেছিল উৎসর্গের পাতায়, সেই নামটির সঙ্গে: সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তারপর বিশ্বকবির ভূমিকা:…এই বইখানি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করেছি। বলাবাহুল্য, এর মধ্যে এমন কোন বিজ্ঞান সম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য। তাছাড়া অনধিকার প্রবেশে ভুলের আশঙ্কা করে লজ্জাবোধ করছি—হয়তো তোমার সম্মান রক্ষা করাই হলোনা।'…কিশোর মনের মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই নাম, স্বতঃই কৌতূহল জাগিয়েছিল সেদিন—কার এই নাম, যাঁকে উৎসর্গে বিশ্বকবিরও সঙ্কোচ এমন অসঙ্কোচ!

আরো অনেক পরে দেখেছিলাম। দেখেছিলাম ছাত্রাবস্থায়, দেখেছিলাম সসম্ভ্রমে। তখন তিনি আর সত্যেন্দ্রনাথ বসু নন, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ। সৌভাগ্যও হয়েছিল পরবর্তী জীবনে, অনেক কাছাকাছি আসার। আচার্যকে প্রথম দেখার যে স্মৃতি আজো মনে আছে, তা এক অনাবিল শুভ্রতার স্মৃতি। রেশমের মতো আশ্চর্য শুভ্র, কোমল, অবিন্যস্ত শুভ্রকেশ। কোথাও কৃষ্ণতার লেশ নেই। আরো আশ্চর্য—তারই পাশাপাশি একটি তারুণ্যোজ্জ্বল আনন। এই যে বৈপরীত্য, এই স্থিতধীর প্রাজ্ঞতার পাশাপাশি প্রাণশক্তির যে তারুণ্য, যুগলবন্দীর সেই বহমান ধারাটি কোনোদিন ম্লান বা বিচ্ছিন্ন হতে দেখিনি, দেখিনি অশীতির পারে শেষশয্যায়ও। নানা বৈপরীত্যের বিচিত্র সমন্বয়ে, এক অমলিন শুভ্রতারই আরেক নাম বোধ হয়—আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ।

নিজের জীবিতকালেই যিনি কিংবদন্তী, এমন মানুষেরা সংখ্যায় বিরল। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেই বিরল শ্রেণীর মানুষের অন্যতম। মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন ও মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নাম একত্রে যুক্ত, দুর্লভ গৌরবে। আইনষ্টাইনের সঙ্গে তাঁর বিজ্ঞানকীর্তি কীর্তিত, আর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সম্মাননায় ভূষিত করেছেন তাঁর অবিস্মরণীয় একমাত্র বিজ্ঞানগ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়ে'র উৎসর্গনামায়। নানা কীর্তিতেও যথার্থ-ই শ্রুতকীর্তি—আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলার চিত্তলোকের
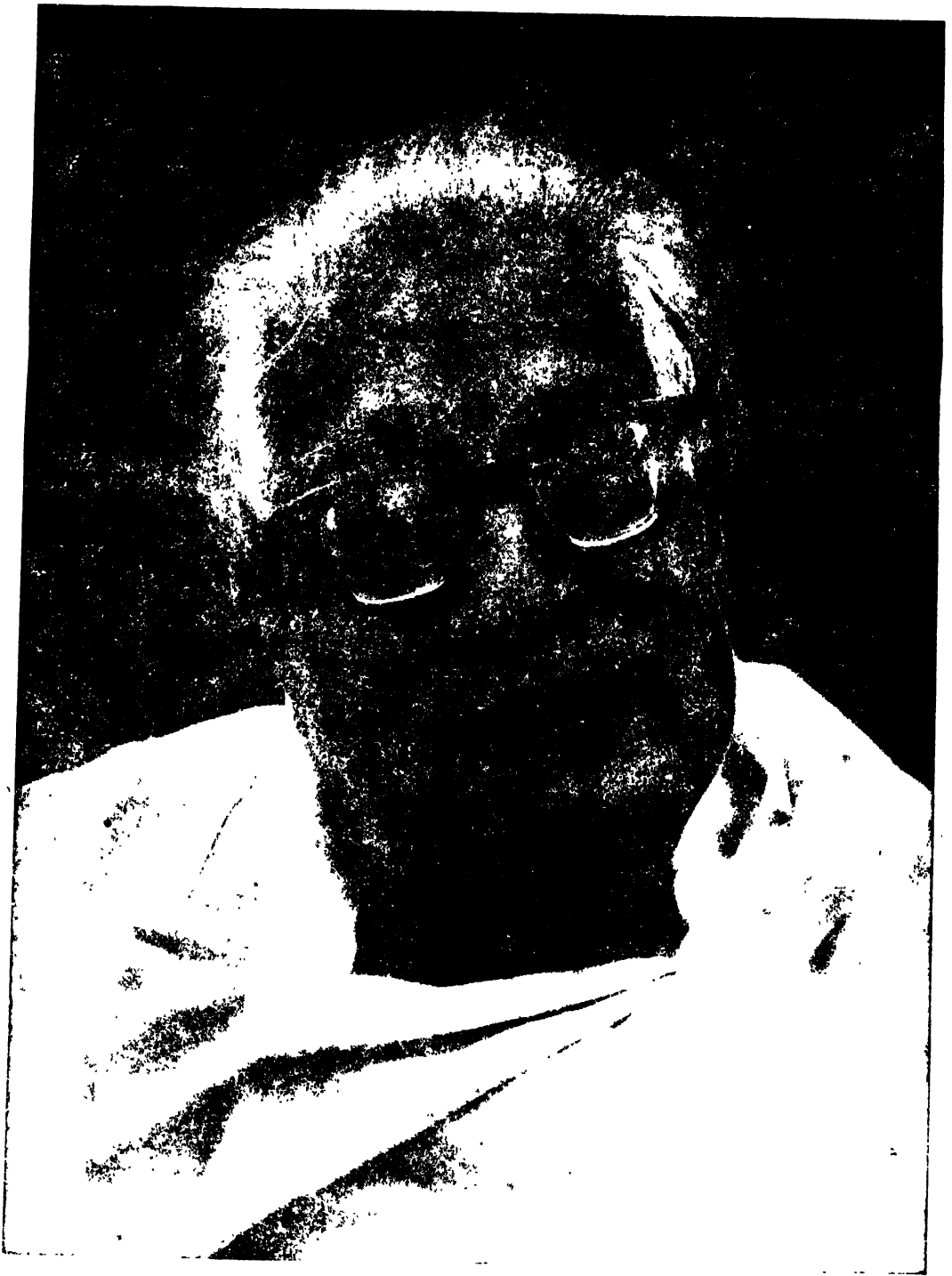
আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

জন্ম : জানুয়ারী 1, 1894

মৃত্যু : ফেব্রুয়ারি 4, 1974

যে আশ্চর্য প্রকাশদীপ্তি, তা আজ ইতিহাসের সামগ্রী। সেখানে উদ্ভাসিত রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের মতো মহাজ্যোতিষ্ক। সহচারী ছিলেন আরও অনেক জ্যোতিষ্কই। সেদিনে প্রবাহিত সাহিত্য দর্শন ধর্ম প্রভৃতি নানা প্রবল প্রবাহিনীর পাশে, বিজ্ঞানের ধারাটি ছিল অবশ্যই ক্ষীণস্রোতা। তবু তারও উদ্বোধন ঘটেছিল জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের কীর্তিতে। আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার প্রচার ও প্রসার ঘটলেও, সেদিনের পরাধীন ভারতবর্ষে নানা প্রতিকূল পরিবেশে বিজ্ঞান সাধনার কীর্তিস্তম্ভ রচনা সহজসাধ্য ছিল না। তবু তারই মধ্যে একাধিক ভারতীয় ও বাঙালী বিজ্ঞানী প্রতিভার স্বাক্ষরে জয়মাল্য অর্জন করে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন স্বদেশের এবং বিদেশের। রামানুজন, রামন, মেঘনাদ সাহা এঁরা সসম্ভ্রম স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন বিশ্ববিজ্ঞানী মহলে, এবং দীপ্ততম নক্ষত্রের মতো অত্যুজ্জ্বল প্রতিভায় যিনি শীর্ষস্থানে সে স্বীকৃতিলাভ করেন, তিনি—আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ।

সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানকীর্তি অর্ধশতকেরও বেশী সময় কাল ধরে এবং নানা বিচিত্র বিজ্ঞানবৃত্তে। তাঁর সে কীর্তির পূর্ণ মূল্যায়ন আজও সম্ভব হয়নি। যত দিন যাচ্ছে ততো তাঁর বিজ্ঞানকীর্তি সুদূর প্রসারী সম্ভাবনা নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে প্রসারিত হয়ে চলেছে।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম মৌল গবেষণা সতীর্থ মেঘনাদ সাহার সহযোগিতায়—'সাহা বোস অবস্থা সমীকরণ (Saha Bose Equation of State)। এর কিছু আগে আইনষ্টাইনের যুগান্তকারী 'আপেক্ষিকতাতত্ত্ব' আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল বিজ্ঞানজগতে। এই জটিল তত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য ও স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন—মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানীরা। গবের কথা এই যে, তাৎক্ষণিক উপলব্ধিতে সেদিনও বাঙালীর মেধা অগ্রণী ছিল; এবং, প্রস্তাবনার সঙ্গে সঙ্গেই, আপেক্ষিক তত্ত্বের তাৎপর্য যথাযথ অনুধাবন করে, মেঘনাদ সাহা ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের সহযোগিতায়, সত্যেন্দ্রনাথ আপেক্ষিকতাতত্ত্বের উপর একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করলেন (Principle of Relativity, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1920)। এটি আজো ঐ তত্ত্বের একটি প্রামাণিক গ্রন্থ।

1924 সালে সত্যেন্দ্রনাথ রচনা করলেন তাঁর সুবিখ্যাত 'প্লাঙ্ক সূত্র ও কোয়াণ্টাম প্রকল্প' সম্বন্ধে গবেষণা পত্রটি এবং প্রকাশের জন্য এ প্রবন্ধ পাঠালেন 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে'। অখ্যাতনামা এক তরুণ বাঙালী অধ্যাপকের এ প্রবন্ধকে প্রকাশের গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি পত্রিকার কর্তৃপক্ষ। দুঃসাহসী সত্যেন্দ্রনাথ একটি পত্রসহ প্রবন্ধটি সোজাসুজি পাঠালেন স্বয়ং আইনষ্টাইনের কাছে মতামতের জন্য। আইনষ্টাইন শুধুমাত্র সচকিত হলেন না, স্বয়ং প্রবন্ধটিকে জর্মন ভাষায় অনূদিত করে টীকাসহ প্রকাশ করলেন 'ট্সাইট শ্রিফ্ট্ ফুর ফিজিক্'এ। সেই টীকায় আইনষ্টাইনের অভিমতের সারার্থ: 'আমার মতে আধুনিক পদার্থবিদ্যার এক জটিল সমস্যার এ এক দ্যোতনাময় সমাধান। প্লাঙ্কের সূত্র প্রমাণে, বোসের পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এখানে ব্যবহৃত পদ্ধতি, আমাদের আদর্শ গ্যাসের কোয়াণ্টামবাদে উপস্থিত করে, যা আমি অন্যত্র দেখাব।'...

বসুর পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে, আদর্শ গ্যাসের কোয়াণ্টামবাদের রূপ নিয়ে, আইনষ্টাইন অনতিকালের মধ্যেই পরপর দুটি প্রবন্ধ রচনা করে প্রকাশ করলেন বার্লিনের বিজ্ঞান আকাদেমীর পত্রিকায়। এবং পরে আরও একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন বার্লিনের বিজ্ঞান আকাদেমীর পত্রিকায়। এর আরও অনুবৃত্তিতে চলতে লাগল পরে প্লাঙ্ক ও শ্রয়ডিংগারের আলোচনা। বিজ্ঞান জগতে বসুর চারপাতার ছোট প্রবন্ধটি সেদিন যে যুগান্তকারী আলোড়ন তুলল, তা সেদিনের তরুণ বাঙালীকে অচিরেই এনে দিল বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ও স্বীকৃতি।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে প্রস্তাব করেছিলেন তাঁর সংশোধিত তত্ত্ব ও শক্তিবণ্টনের সংখ্যায়ন

আলোক কণা বা ফোটনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আইনষ্টাইনের পরিবর্ধনায় দেখা গেল শক্তিবণ্টনের এই সংখ্যায়ন বস্তুকণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বসুর প্রথম প্রস্তাবিত সংখ্যায়ন 'বসু সংখ্যায়ন' (Bose Statistics) ও পরিবর্ধিত রূপের সংখ্যায়ন 'বসু-আইনষ্টাইন সংখ্যায়ন' (Bose-Einstein Statistics) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে ইতিহাসে, আর এই সূত্রেই ইতিহাসে চিরকালের মতো যুক্ত হয়ে রয়েছে দুটি বরণীয় মানুষের স্মরণীয় নাম। 1974 সালে, 'বসু-আইনষ্টাইন সংখ্যায়নে'র সুবর্ণজয়ন্তী সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে দেশে-বিদেশে।

এই সংখ্যায়নের পর ফের্মি ও ডিরাক বসু-সংখ্যায়ণের অনুপূরক আরেক সংখ্যায়ন প্রস্তাব করেন। এটি প্রখ্যাত, 'ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন' নামে। আধুনিক পদার্থবিদ্যার সব মৌলকণাই হয় 'বসু-সংখ্যায়ন' না হয় 'ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন' অনুসরণ করে। যারা 'বসু সংখ্যায়ন' মেনে চলে তাদের 'বোসন' (Boson) এবং যারা ফের্মি সংখ্যায়ন মেনে চলে তাদের 'ফের্মিয়ন' (Fermion) বলা হয়। দেখা গেছে যে, যেসব মৌলকণার ঘূর্ণী (Spin-value) শূণ্য অথবা পূর্ণসংখ্যা, তারা বোসন এবং যাদের ঘূর্ণী, ভগ্নাংশ বা তার গুণিতক, তারা ফের্মিয়ন। পৃথিবীতে যতদিন মৌলকণা থাকবে, ততদিন 'বোসন' বহন করবে আচার্য বসুর নাম।

এরপর সত্যেন্দ্রনাথের প্রধানতম বিজ্ঞানকীর্তি—আইনষ্টাইনের 'একীকৃত ক্ষেত্রবাদে'র (Unified Field Theory) উপর পাঁচটি মৌল গবেষণাপত্র এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে 64টি দুরূহ সমীকরণের সহজ সমাধান। আয়নমণ্ডলে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলন সম্বন্ধে গবেষণা, অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের D^2—সংখ্যায়ণের উপর গবেষণা, কেলাসতত্ত্ব (Crystallography) ও তাপ স্বয়ং-প্রভতার (Thermo-luminescence) উপর গবেষণা এবং কিছু সাংগঠনিক রসায়নের (structural chemistry) উপর কাজও উল্লেখযোগ্য। তরল হিলিয়মের প্রকৃতিও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে তাঁরই তত্ত্ব অনুসরণ করে (Bose-Einstein Condensation)। তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার বিজ্ঞানী হয়েও ফলিত পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁর উদ্ভাবিত কয়েকটি উন্নত যন্ত্র আজ গবেষণার বিশেষ সহায়ক। এমনি একটি যন্ত্র হল—এক অতি সূক্ষ্ম গ্যাস পরিমাপের যন্ত্র, 'মাইক্রোব্যালান্স'। তাঁরই গবেষণায়, ভারতে দুর্লভ ও মূল্যবান হিলিয়ম গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে ও তার উৎপাদন সম্ভব হতে চলেছে। বস্তুতঃ তাঁর নিজস্ব বিষয় পদার্থবিদ্যা ও গণিতের বৃত্তের বাইরেও, বিজ্ঞানের সব শাখাতেই ছিল তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা ও অনায়াস-সঞ্চরণ। তাঁর মূল্যবান নির্দেশে উদ্ভিদবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ভূবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতিতেও উপকৃত হয়েছেন অনেক গবেষকই। আচার্য বসুর মূল গবেষণার সুদূরপ্রসারী ফলাফলের মূল্যায়ন আজও সম্ভব হয়নি। আজও নানা বিজ্ঞানীরা নানা নতুন আলোকে নতুন গবেষণা করে চলেছেন,—তাঁরই তত্ত্বের ধারা অনুসরণে।

আইনষ্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁর নাম যুক্ত, মাদাম কুরীর গবেষণাগারে যাঁর শিক্ষানবিশী, প্রাগ্ শ্রয় ডংগার ফের্মি ডিরাকের সঙ্গে যাঁর প্রত্যক্ষ আদান-প্রদান, তাঁর কীর্তির নতুনতর স্বীকৃতি নিষ্প্রয়োজন। তবু সে স্বীকৃতি এসেছে বারংবার। এসেছে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদে নির্বাচনে, এসেছে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডক্টরেটে, এসেছে বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম' সম্মাননায়, এসেছে পদ্মবিভূষণ উপাধিতে এবং সর্বশেষে ভারতের 'জাতীয় অধ্যাপক' রূপে তাঁকে বরণে।

তবু শ্রুতকীর্তি সত্যেন্দ্রনাথের আড়ালে ছিলেন আরেক বিচিত্র সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি মজলিশী সত্যেন্দ্রনাথ, খেয়ালী সত্যেন্দ্রনাথ। মেঘদূতের উদাত্ত আবৃত্তিতে তিনি আত্মমগ্ন, এস্রাজের আলাপে তিনি

স্বপ্নচারী, ফুল আর সঙ্গীতে তিনি আবিষ্ট, দাবা আর ক্যারামে তাঁর নিপুণ দক্ষতা। আর ছিল তাঁর জনলগ্নতা। কৈশোরের হেদুয়ার আড্ডা থেকে ঢাকায় 'বারোজনা'য় আসরের মজলিশ, 'বিচিত্রা'র সভা, 'সবুজপত্র' আর 'পরিচয়ে'র দপ্তর এবং শেষে 'কিশোর কল্যাণ পরিষদে'র শিশু কিশোরের আসর—সর্বত্রই যে তার নিয়মিত উপস্থিতি, তাও সর্বজনবিদিত। বিজ্ঞানের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে, নানা ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন-কলা-শিল্প মানব-মনীষার সব শাখাতেই ছিল তাঁর অবাধ সঞ্চরণ, প্রগাঢ় বৈদগ্ধ্য, অবিশ্বাস্য অনায়াস দক্ষতা।

সত্যেন্দ্রনাথের আরেক পরিচয়, দেশব্রতী সত্যেন্দ্রনাথ। সারাজীবন স্বদেশের কথা চিন্তা করেছেন তিনি। 'অনুশীলন সমিতি'র সঙ্গে ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। বহু বিপ্লবীকে গোপন আশ্রয় দিয়েছেন তিনি—সেই ইংরেজ শাসনের রুদ্র মধ্যাহ্নে। পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কালে, ত্রাণ-কার্যেও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল তাঁর। সমাজ-সেবার নানা ক্ষেত্রে ছিল প্রত্যক্ষ যোগ ও সহানুভূতি। সেই দেশব্রতী সত্যেন্দ্রনাথ, তাঁর নিজের শেষ জন্মদিনে, তাঁর আদর্শ-দীক্ষার কথা উল্লেখ করেছিলেন 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে'র সভায়। বলেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের কথা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ব্রতকে তিনি নিজের জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত অর্থ সম্মান যশ প্রতিষ্ঠা নয়—বিজ্ঞানের প্রয়োগে স্বদেশের উন্নতি, এই-ই ছিল তাঁর জীবনস্বপ্ন, জীবন সাধনা। আর এ স্বপ্নের পরিপূরক হিসেবে তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের বৈজ্ঞানিক শিল্পায়ন, ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের অনুশীলন। মানবতাবাদী সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন—বিজ্ঞান মানুষের সত্য অন্বেষণের একটি প্রক্রিয়া এবং মানব-কল্যাণই বিজ্ঞানের প্রথম এবং শেষ লক্ষ্য, শেষ অন্বিষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ, জগদানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা-ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ধারাটিকে একদিন উদ্বোধন করেছিলেন। 'বিশ্বপরিচয়ের উৎসর্গনামায় রবীন্দ্রনাথ একদিন অনুপ্রেরিত করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথকে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চায়। চিন্তায় আচারে মননে নির্ভেজাল বাঙালী সত্যেন্দ্রনাথ সেই দায়িত্ব আজীবন ভোলেন নি। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার স্বপ্ন দেখে ছিলেন তিনি যৌবনেই। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে বাংলা পত্রিকা। নিজে অনুবাদ করে, প্রকাশ করেছিলেন দুরূহ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব 'পরিচয়' পত্রিকায়। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে দুঃসাহসের সঙ্গে উচ্চতম ও জটিল বিজ্ঞানের বক্তৃতা দিয়েছেন বাংলায়। নিজের সারাজীবনে তিনি নিজেই প্রমাণ করে গিয়েছেন নিজের কথা: যাঁরা বলেন বাংলাভাষায় বিজ্ঞান হয় না, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।

এই অকৃতার্থতার বেদনায় মর্মাহত সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন "বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ", প্রকাশ করেছিলেন 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অনলস কঠোর পরিশ্রম করেছেন তিনি এ দুটির জন্য। এই উদ্দেশ্যে শিশুর মত নিরভিমান হয়ে বারংবার হস্ত প্রসারিত করেছিলেন, তিনি দরিদ্র 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে'র তহবিলের জন্য। অনেক সমালোচনা, অনেক ব্যঙ্গ উপেক্ষা করে যত্রতত্র ছুটেছিলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের এবং তার মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার যৌক্তিকতাকে ব্যাখ্যা করতে। অথচ আজও পরিষদ ও পত্রিকা দুটিই সরকার ও জনগণের আনুকূল্য ও দাক্ষিণ্যের কৃপাকণা হতে প্রায়-বর্জিত। আজও মাতৃভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের কোন আয়োজন হয় নি। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের মৌলিক গ্রন্থ, মৌল গবেষণা প্রকাশিত হয় নি। দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেনি—শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষানায়ক, রাষ্ট্রশাসকদের।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অবাস্তবায়িত স্বপ্নের বাস্তবায়নের দায়িত্ব রেখে গেছেন আমাদের ওপর। একদিন হয়ত তাঁর স্বপ্ন সার্থক হবে। সেদিন তাঁর নাম চিরকালের মত আবার প্রথম হয়ে দেখা দেবে

মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের ইতিহাসে। সেই-ই হবে আমাদের তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন।

স্বাধীনচেতা সত্যেন্দ্রনাথ, অকুতোভয় সত্যেন্দ্রনাথ, কোন দিন আপোষ করেননি অন্যায়ের সঙ্গে, অসত্যের সঙ্গে, অশুভের সঙ্গে। আইনষ্টাইনের মৃত্যুর পর তিনি আইনষ্টাইনের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তা তাঁর সম্পর্কেও বলা চলে

"Throughout his life he was a fearless exponent of what he believed to e true, His indomitable will never bowed and hisl ove of Man often induced him to speak out unpalatable truths which were sometimes misunderstood'

প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর তাঁর মতো স্বাধীনচেতা আপোষহীন বিজ্ঞানীর কাছ থেকে যা আমাদের প্রাপ্য ছিল তা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। অনুকূল পরিবেশে তাঁর মতো বিজ্ঞানীর আরো অবদান, আরও সংগঠন হয়ত আমরা পেতে পারতাম। বঞ্চিত তিনিও; তাঁর যে স্বীকৃতি প্রাপ্য ছিল স্বাধীন দেশের কাছে, জনগণের কাছে, তার অল্পই তিনি পেয়েছেন। এমন কি 'জাতীয় অধ্যাপকে'র মৃত্যুতে একটি দিনের জন্যও 'জাতীয় শোক' উদ্‌যাপিত হয়নি। তাঁর স্মারকে কোন যথার্থ সারস্বত প্রতিষ্ঠান বা গবেষণাগারও জাতীয় স্তর থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আচার্য বসুর লোকান্তরের পর 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইনষ্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল সায়ান্সেস' নামক একটি প্রতিষ্ঠান যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা একান্তই অপূর্ণাংগ এবং রাজ্যসরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তিনেরই দীর্ঘসূত্রিতা ও অবহেলার প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা মর্মান্তিক।

তবু সত্যেন্দ্রনাথ বেঁচে থাকবেন অনাগত কালেও, তাঁর নিজেরই অন্যতরো আরেক পরিচয়ে। সে পরিচয়—'মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ'। যিনি ছিলেন ঋষির মতো নিরাসক্ত নির্লোভ নিরহঙ্কার। যিনি ছিলেন—সত্যধী, স্থিতধী, হৃদয়বান, কাছের মানুষ। যিনি রোগার্ত সতীর্থের সেবা করেছেন নিজের হাতে, ছাত্র এবং বন্ধুদের আর্তির দিনে ছুটে গিয়েছেন নিজে, দুঃস্থকে সাহায্য করতে যিনি ব্যাঙ্কে ওভারড্রাফ্‌ট্ কেটেছেন। সেই সত্যেন্দ্রনাথের পূর্ণপরিচয় সাধারণ মানুষ জানেন না, জানার সুযোগ হয়নি তাঁর প্রচারবিমুখ নির্লিপ্ত চরিত্রের জন্য।

মহাজীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল সত্যেন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তো কথাই নেই, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী প্রভৃতির সম্বন্ধেও গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাঁর, শ্রদ্ধা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিও। সর্বধর্মের সমন্বয়ে যে উদার মতবাদ সেই উদার মতবাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। আর ছিল তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা বিবেকানন্দের প্রতি। বিবেকানন্দ শতবর্ষ কমিটি'র সভায় তিনি নিয়মিত এসেছেন, বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বহু ভাষণ দিয়েছেন। সাম্প্রতিককালের অন্ধকার প্রহরগুলিতে, যখন গোলপার্কে স্বামিজীর মূর্তিতে কালি লেপন করা হয়, তখন অকুতোভয়ে তার প্রতিবাদ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথই।

সত্যেন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ জন অগণন। গুণমুগ্ধ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একদিন বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথের' নামে উৎসর্গ করেছিলেন 'অর্কেষ্ট্রা' কাব্যগ্রন্থ। নানা বিচিত্র সুরের ছন্দোবদ্ধ একটি সমন্বয়ের যে সুরসংহতি—তাইই অর্কেষ্ট্রার ঐকতান। সত্যেন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনও ছিল অর্কেষ্ট্রার মতই নানা বিচিত্র সুরের একটি বিরল সুষম সমন্বয়।

আজ অবক্ষয়ের দিনে, মূল্যহীনতার দিনে, ভাঙন আর ঝড়ের দিনে যখন আশপাশ থেকে চূড়া পর্যন্ত শুধুই ভাঙাচোরা মানুষের মিছিল, যখন আশেপাশে শুধুই এলিয়টের ভাষায় 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'—বন্ধ্যাভূমি, আর শুধুই ফাঁপা মানুষ ('hollow man'), তখন এক অখণ্ড গোটা মানুষের প্রতীক—এই ঋষিপ্রতিম নিবাতনিষ্কম্প আলোকস্তম্ভের দিকে তাকিয়ে আমাদের বিস্ময়ের বুঝি বা আর পরিসীমা থাকে না!

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের পত্র

[1974 সালের 14ই মার্চ বাংলাদেশের 'বিজ্ঞান সাময়িকী' পত্রিকার সম্পাদক, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর লেখা একটি চিঠি পেয়েছিলেন। চিঠিটিতে কোন তারিখ ছিল না; তবে খামের উপর ডাক ঘরের সীল থেকে বোঝা যায় খামটি ডাকে দেওয়া হয়েছিল 1974 এর 22শে জানুয়ারি। ঠিক তার বারদিন পর 4ঠা ফেব্রুয়ারী তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকায় কি ধরণের লেখা থাকা উচিত সে সম্পর্কে আচার্যের অভিমত এই চিঠিটি থেকে পাওয়া যাবে। 'বিজ্ঞান সাময়িকী'-র সত্যেন বসু সংখ্যা (এপ্রিল, 1974)-য় প্রকাশিত চিঠিটি এখানে পুনর্মুদ্রিত করা হল।]

বাইশ ঈশ্বর মিল লেন,
কলিকাতা-ছয়

বিজ্ঞান সাময়িকীর সম্পাদক মহাশয়,

নিয়মিতভাবে আপনার কাগজ পাচ্ছি ও পড়ে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছি। প্রায় তিরিশ বছর পর বাংলাদেশের এই সংস্কৃতি চর্চা ও আলোচনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। মনে পড়ছে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হলো (তখন) আমরা কয়জন নবীন মিলে 'বারোজনা' বলে একটি সভায় মিলিত হতাম। তার মধ্যে পেয়েছিলাম সবে বিলাত প্রত্যাগত হাকিম শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়কে ও পরলোকগত পূর্ণেন্দু মজুমদারকে যিনি তখন ঢাকা কলেজের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। কাজী মোতাহার হোসেন তখন ছিলেন সকলের থেকে বয়সে ছোট সভ্য। সেই আড্ডায় নানা বিষয়ের আলোচনা হতো। শেষ অবধি 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে বাংলায় একটি মাসিক পত্র বার করা হয়। দেশ ভাগ হলো আমি চলে এলাম, তারপরেও কিছুদিন সে কাগজ চলেছিল বলে শুনেছি। বিজ্ঞানের বিষয়ে ঝরঝরে সুন্দর রচনা বার হচ্ছে আপনার সাময়িকীতে। তবে একটি কথা বলে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে ইচ্ছে করছে। বিদেশে যেসব অদ্ভুত আবিষ্কার হয়েছে সেই কথাই শুধু প্রচার করা এদেশের বিজ্ঞানীর মুখ্য কর্ম নয় বলে আমার ধারণা। নিজের দেশের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়, আর গাছপালা-জীবজন্তুর কথা, তার নদ-নদী কৃষি-বাণিজ্য এবং শেষাবধি বর্তমানে দেশের মধ্যে যেসব নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিলে দেশে বিজ্ঞানের হাওয়া চলবে ও মনোভাব তাড়াতাড়ি বদলাবে বলে আমার ধারণা। প্রাচ্যদেশে সনাতনী মনোভাব, গোঁড়ামী ও জাতিবিদ্বেষ হলো সর্বনাশের মূল।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে মনোহরা। চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ, পদ্মা-মেঘনা ঘেরা বিস্তৃত সমতল ও তার পরিশ্রমী অধিবাসীরা, এসব মিলে আকর্ষণীয় করে রেখেছে চিরদিনই বাংলাদেশকে। নতুন প্রগতির যুগে কি শিল্প গড়ে উঠলো, আরো দেশের প্রয়োজনীয় কত কি গড়তে বাকী রয়েছে সে সবের হিসাব আপনার সাময়িকীতে প্রকাশ হোক। বাংলা ভাষাভাষী আমরা দু'দেশে-শুনেছি— ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে আপনারা অনেক উন্নতি করেছেন, সংগ্রহ করেছেন অনেক প্রাচীন গাথা ও কাহিনী, বলার ভঙ্গী ধরে রেখেছেন নানা সংগ্রহে। সেসব অমূল্য সম্পদ এদেশের লোককে অংশীদার হিসেবে ভাবলে হয়ত আপনাদের আপত্তি হবে না।

'73 সাল মোটামুটি দুর্বৎসর বলে সাধারণে ভাবছে। চারিদিকে সংঘাত, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষয় ইত্যাদি। আমাদের মতো, বাংলাদেশের লোকেরাও নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। তবে আপনাদের মতো আশাবাদীদের দেখে মনে বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ যোগ্য হাতে অর্পিত হয়েছে। ভাষা ও দেশ, সংস্কৃতি ও সম্পদ আপনারা ধাপে ধাপে উচ্চে তুলতে থাকুন। যেসব নবীনেরা বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর চারিদিকে জড়ো হয়েছে তারাই বাংলা মা'কে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, প্রসন্নময়ী সোনার বাংলা করে রাখবে।

অভিবাদন জানিয়ে শেষ করি।

ইতি

সত্যেন বোস

'বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।'

রবীন্দ্রনাথ ঃ বিশ্বপরিচয়

* * * *

'বর্তমান জগতে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই আমাদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে হচ্ছে। অথচ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দীক্ষা এমনভাবে চালিত হচ্ছে না, যাতে আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্ভার জীবনের দৈনন্দিন কাজে সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করতে পারি। এর প্রধান অন্তরায় ছিল বিদেশী ভাষার শিক্ষার ব্যবস্থা। আজ ভারতে নব পটভূমিকার সৃষ্টি হয়েছে—চারদিকে নতুন আশা ও আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। এই নতুন পরিবেশে জীবনকে সমগ্রভাবে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে এই প্রধান বাধা দূর করে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের বহুল প্রচার ও প্রসারের দ্বারা তাঁদের সহজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলবার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বিজ্ঞানীদেরই।'

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে প্রচারিত আবেদন (1948)

হীরক

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

যত প্রকার উৎকৃষ্ট প্রস্তর আছে, হীরকের জ্যোতি সর্বাপেক্ষা অধিক। হীরক আকরে জন্মে। পৃথিবীর সকল প্রদেশে হীরকের আকর নাই। ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গোলকুণ্ডা প্রভৃতি কতিপয় স্থানে, দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী ব্রেজিল রাজ্যে, রুশিয়ার অন্তর্বর্তী যুরমন পর্বতে এবং আফ্রিকার দক্ষিণ বিভাগে হীরকের আকর আছে। আকর হইতে তুলিবার সময় হীরা অতিশয় মলিন থাকে, পরে পরিষ্কৃত করিয়া লয়।

এ পর্যন্ত যত বস্তু জানা গিয়াছে, হীরা সকল অপেক্ষা কঠিন। হীরার গুঁড়া ব্যতিরেকে, আর কিছুতেই উহা পরিষ্কৃত করিতে পারা যায় না। বিশুদ্ধ হীরক অতি পরিষ্কৃত জলের ন্যায় নির্মল। ঐরূপ হীরাই অতি সুন্দর ও প্রশংসনীয়। তদ্ভিন্ন, রক্ত, পীত, নীল, হরিত প্রভৃতি নানা বর্ণের হীরা আছে। বর্ণ যত গাঢ় হয়, হীরার মূল্য তত অধিক হয়; কিন্তু বর্ণহীন নির্মল হীরাই সর্বাপেক্ষা মহামূল্য। আকার বর্ণ ও নির্মলতা অনুসারে মূল্যের তারতম্য হয়।

হীরার মূল্য এত অধিক যে, শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। পোর্টুগালের রাজার নিকট এক হীরা আছে; তাহার মূল্য 5,64,48000 পাঁচ কোটি চৌষট্টি লক্ষ আটচল্লিশ সহস্র টাকা। আমাদের দেশে কোহিনুর নামে এক উৎকৃষ্ট হীরা ছিল। সচরাচর সকলে বলে, উহার মূল্য 3,50,00000 তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এক্ষণে এই মহামূল্য হীরা ইংলণ্ডে আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে হীরা অতি অকিঞ্চিৎ-কর পদার্থ। ঔজ্জ্বল্য অতিরিক্ত উহার আর কোন গুণ নাই; কাচ কাটা বই, আর কোন বিশেষ প্রয়োজনে আইসে না। এরূপ প্রস্তরের একখণ্ড গৃহে রাখিবার নিমিত্ত এত অর্থ ব্যয় করা কেবল মনের অহঙ্কার প্রদর্শন ও মূঢ়তামাত্র।

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, এই মহামূল্য প্রস্তর ও কয়লা, দুই-ই এক পদার্থ। কিছুদিন হইল, দেপ্রেয় নামক এক ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত, অনেক যত্ন, পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পর কয়লাতে হীরা প্রস্তুত করিয়াছেন। পূর্বে কেহ কখনও হীরা গলাইতে পারে নাই, কিন্তু তিনি বিদ্যার বলে ও বুদ্ধির কৌশলে, তাহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন।

হীরকের ন্যায়, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি আরও বহুবিধ মহামূল্য প্রস্তর আছে। শোভা ও মূল্য বিষয়ে, উহারা হীরক অপেক্ষা অনেক ন্যূন। হীরক, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি মহামূল্য প্রস্তর সকলকে মণি ও রত্ন বলে।

বিজ্ঞান প্রবন্ধ

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-কর্ম

বিমলেন্দু মিত্র*

গত 30শে নভেম্বর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 120তম জন্মদিন গেল। আর ঐদিন তাঁর সৃষ্টি বসুবিজ্ঞান মন্দিরের হীরক জয়ন্তী বর্ষ শেষ হল। এই উপলক্ষ্যে জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে নতুন করে কিছু ভাবা বা বলার প্রয়োজন আছে। আমি ভূমিকা বা উচ্ছ্বাস বাদ দিচ্ছি। সরাসরি তাঁর কাজের মধ্যে চলে যাই।

জগদীশচন্দ্রের 1901 সালের গবেষণাপত্র 'On Continuity of Effect of Light and Electric Radiation (Proceedings of Royal Society) থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি,—'Since the action of radiation is one of surface, the larger the superficial area, greater is the result ..'। আবার ঐ বছরেই প্রকাশিত On Similarities between Radiation and Mechanical Strain' প্রবন্ধে বলেছেন—"It is to be borne in mind that the effect of electric radiation is only skin-deep"—"মনে রাখতে হবে যে, বিদ্যুৎতরঙ্গের ক্রিয়া কেবলমাত্র বহিঃস্তরেই সীমাবদ্ধ। আবার—"When the particles become continuous, the radiation can only affect the extremely thin layer of molecules on the surface"—"যখন বস্তুর কণিকাগুলি সংলগ্ন অবস্থায় অখণ্ডরূপ গ্রহণ করে, তখন বিদ্যুৎরশ্মি কেবলমাত্র ঐ ধাতুখণ্ডের উপরের স্তরের ক্ষীণ আণবিক আবরণটিতেই ক্রিয়া করে"।

জগদীশচন্দ্রের ধারণা ছিল যে, বিদ্যুৎরশ্মি বা তাঁর সৃষ্ট পাঁচ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের "মাইক্রোওয়েভ" (Microwave) যান্ত্রিক (mechanical) উপায়ে বস্তুর "ত্বকের" অর্থাৎ বহিঃস্তরের কেবলমাত্র ওপরের অণুগুলিতে "সজ্জার পরিবর্তন" ঘটায়। তিনি এই তত্ত্বের নাম দিয়েছিলেন—"Molecular Strain Theory"। অবশ্য তখন ইলেকট্রন সবেমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বস্তুর কঠিন অবস্থার ধর্মবিচারে ইলেকট্রনের স্থান কি, তা তখনও আবিষ্কৃত হয়নি; সমগ্র Solid State Physics ভবিষ্যতের গর্ভে। তবুও জগদীশচন্দ্র সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত বলছেন—পদার্থকে কঠিন অবস্থায় রেখে, তার surface property ('পরিবাহিতা' প্রভৃতি) জানার কাজে ঐ 'মিলিমিটার'-তরঙ্গ নিয়োগ করা যেতে পারে! ভবিষ্যতের মাইক্রোওয়েভ-বিজ্ঞানীর কাজ তিনি প্রায় 60 বছর আগেই অনুমান করে নিয়েছিলেন।

ধাতুর "মুক্ত-ইলেকট্রন"-তত্ত্ব বা Madelung ও Born আবিষ্কৃত "আয়নিত কেলাস"-তত্ত্বের (যা 1918-1923 খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছিল) জন্মকাল থেকে বর্তমান Solid State Physics এর বয়স হিসাব করা হয়। পদার্থের কঠিন অবস্থার ধর্ম বিচারে যে সব অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়, অর্থাৎ X-ray, ইলেকট্রন-ডিফ্র্যাকশন পদ্ধতি বা নিউট্রন-ডিফ্র্যাকশন—সবই তখন ভবিষ্যতে নিহিত। তাই জগদীশচন্দ্র 'কোহেরারের' (Coherer) প্রকৃত তত্ত্বের খোঁজে মাইক্রোওয়েভ প্রয়োগ করে পদার্থের কঠিন অবস্থার ধর্ম জানবার যখন চেষ্টা করেছিলেন—তখন তাঁর সেই কাজকে সুদূর ভবিষ্যতের অগ্রদূত হিসাবে আমরা শ্রদ্ধা করতে বাধ্য।

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, 93, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-700 009

তাঁর যে ধারণা,—'বিদ্যুৎরশ্মি যান্ত্রিক আঘাতের মত কাজ করে পদার্থের 'ত্বকের' আণবিক সজ্জাকে বদলে দেয়',—সে সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে তিনি স্থির করলেন, যদি যান্ত্রিক আঘাত ও বিদ্যুৎরশ্মি একই কাজ করে, তবে যান্ত্রিক আঘাতের ফলেই ধাতুর মধ্যে বিদ্যুৎচাপ উদ্ভূত হতে পারে। এই ধারণা হাতে কলমে প্রমাণ করার জন্য তিনি একটি অতি অদ্ভুত যন্ত্র সৃষ্টি করলেন। এর নাম দিয়েছিলেন Strain Cell। এই Strain Cell এর কার্য-কলাপের সঠিক কারণ বোঝা খুব মুস্কিল। দেওয়ামাত্র ক্ষীণ বিদ্যুৎপ্রবাহ গ্যালভানোমিটারের কাঁটা নড়িয়ে দেয়।

এই স্ট্রেন-সেলের পরীক্ষা খুবই বিস্ময়কর। এর সঠিক তত্ত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। জগদীশচন্দ্রের molecular strain তত্ত্ব অবশ্য সঠিক নয়। নানা-রকম পরীক্ষা করে তিনি বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে, ঐ ক্ষীণ বিদ্যুৎস্রোত (1) থার্মো-ইলেকট্রিসিটির জন্য নয়, (2) জলের অণুর সঙ্গে ধাতব তারের ঘর্ষণের জন্যও নয়, (3) মোচড়ের

স্ট্রেন সেল যন্ত্র
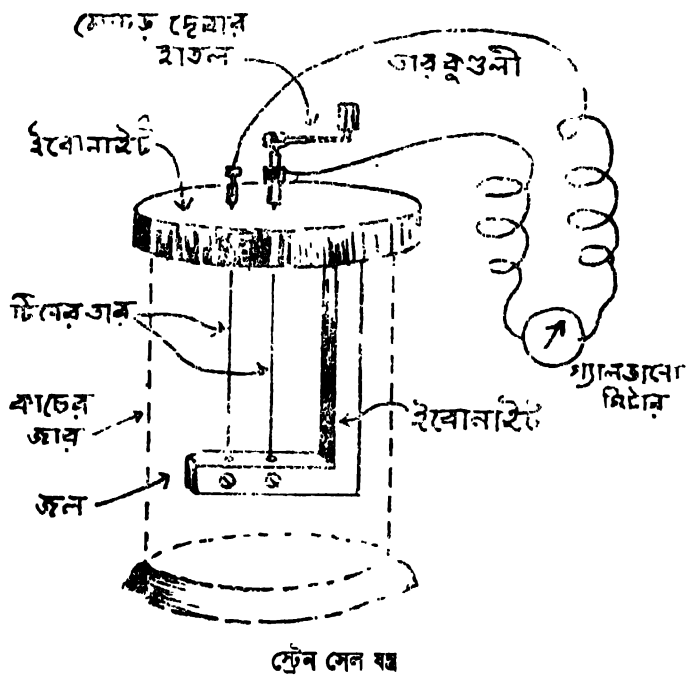
যন্ত্রটিতে আছে, ইবোনাইটের ফ্রেমে আটকানো খাড়া দুটি টিনের অথবা সীসার তার। কাচের জারে জলের মধ্যে ফ্রেমশুদ্ধ তার-দুটি ডোবানো আছে। হাতল ঘুরিয়ে একটি তারকে বাইরে থেকে মোচড় দেওয়া যায়। তার দুটির খোলা প্রান্তের সঙ্গে গ্যালভানোমিটার যোগ করা আছে। জগদীশচন্দ্র দেখালেন,—হাতল ঘুরিয়ে একটি তারকে মোচড় ফলে তারের ধাতব ক্রিস্ট্যাল-(কেলাস) গুলির পরস্পরের মধ্যে ঘর্ষণের জন্যও নয়। বর্তমানে exo-electron তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছে; বলা হয়েছে, ধাতুর তারে মোচড় দিলে ওপরের আণবিক-বিন্যাস থেকে প্রচুর তথাকথিত exo-electron নির্গত হয়। 'গাইগার-কাউন্টারের' মাঝের তারে এরকম মোচড় দিয়ে দেখা গেছে, ইলেকট্রনস্রোত

বের হয়, আর গণকযন্ত্রে (কাউন্টার) বিদ্যুৎ-চমকের দরুন গণনা বেড়ে যায়। কিন্তু গাইগার কাউন্টারে তীব্র বিদ্যুৎক্ষেত্র থাকে, বিদ্যুৎচাপের দরুন। স্ট্রেন-সেলে তেমন কিছু নেই। তারের গা থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়ে তারকে আধানযুক্ত করলেও জলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎস্রোত প্রবাহিত করবার মত বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র কোথায়? দেবেন্দ্রমোহন বসু অবশ্য বলেছেন,—টিনের তারটি জলে ডোবানো মাত্র তার গায়ে একটি ক্ষীণ 'সেমিকণ্ডাকটিং' বা আংশিক পরিবহণক্ষম আস্তরণ পড়ে। তারটিকে মোচড় দেবার ফলে ঐ সেমিকণ্ডাকটিং আস্তরণ ভেঙ্গে পড়ে। সাধারণ নলের মধ্যে প্রচুর মুক্ত 'আয়রন' আছে। সুতরাং এই অবস্থায় দুটি তারের মধ্যে বিদ্যুৎচাপের বিভিন্নতা ঘটে এবং বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে এখনও অনেক কাজ করার আছে বলে মনে হয়।

1900 সালের প্যারিসে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে জগদীশচন্দ্র তাঁর সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ পড়লেন,—'On the similarity of effect of electric stimulus on inorganic and living substances'।

"বিদ্যুৎতরঙ্গের গ্রাহকযন্ত্র লইয়া কাজ করিবার সময় আমি দেখিতে পাই যে, আগত বিদ্যুৎরশ্মির দ্বারা ক্রমাগত উত্তেজিত হইতে হইতে ধাতব গ্রাহক যন্ত্রের সংবেদনশীলতা কমিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিলে পুনরায় উহার উপযুক্ত সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ফিরিয়া আসে। উহার পৌনঃপুনিক সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার সময় আমি আশ্চর্য হইয়া লক্ষ্য করিলাম যে, উহা জীবিত পেশীর ক্লান্তির সাড়ালিপির সমরূপ। একটি ক্লান্ত পেশীকে বিশ্রাম দিলে ঠিক যেরূপ উহার কর্মক্ষমতা ফিরিয়া আসে, সেইরূপ বিদ্যুৎরশ্মি গ্রাহক যন্ত্র, যাহা জড়পদার্থ—কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিলে তারও ক্লান্তি দূর হয়।"

সমকালীন প্রখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ্ ডাঃ এ. ডি. ওয়ালার (Waller) একটি আপ্তবাক্যের প্রচলন করেছিলেন যে, বৈদ্যুতিক সাড়া দেবার ক্ষমতাই জীবনের সর্বপ্রধান, সর্বব্যাপক ও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য লক্ষণ। গ্যালভানির সেই পুরাকালের পরীক্ষার কথা আমরা জানি,—বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করলে স্নায়ু বা পেশী কুঞ্চিত হয়ে সাড়া দেয়। বিপরীতটা অর্থাৎ আঘাত বা অন্য উত্তেজনায় বিদ্যুৎশক্তি সৃষ্টি করে জীবিত পেশী বা স্নায়ু বৈদ্যুতিক সাড়া দেয়। পরবর্তী শারীরতাত্ত্বিকরা এটির বহু পরীক্ষা করেছেন। ওয়ালারের মতে, জীবিত ও মৃত বা অজৈব পদার্থের মধ্যে পার্থক্য ঐ বৈদ্যুতিক সাড়া দিতে পারা বা না পারা।

জগদীশচন্দ্র বললেন—আপ্তবাক্যটি যদি সত্যি হয়, তবে কোহেরার নিয়ে পরীক্ষা বা স্ট্রেন সেলের পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, যে সব বস্তুকে আমরা অজৈব পদার্থ বলি, তার মধ্যেও আঘাত বা বিদ্যুৎরশ্মিপাতজনিত উত্তেজনায় তথাকথিত বৈদ্যুতিক সাড়ার অস্তিত্ব রয়েছে।

ঐ সব সাড়ালিপি আর জীবিত পেশীর সাড়া-লিপি পাশাপাশি ধরে তিনি বললেন (প্যারিসে ও রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে, 1901 সালের মে মাসে)—"এই সব সাড়ালিপি কি একথা বলছে না যে জড় ও জীবের মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম আছে, যা উভয়ের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত? এই সকল সাড়ালিপি কি আমাদের জানাচ্ছে না যে, জীবের মধ্যে যে সাড়ার অস্তিত্ব রয়েছে, জড়ের মধ্যে তা পূর্ব হতেই সূচিত হয়েছে? শারীরবৃত্তের নিয়ম সমূহ ভৌত রসায়নতত্ত্বের নিয়ম থেকে পৃথক নয়; বিজ্ঞান এক, তার নিয়মগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে গেছে, কোথাও কোন ব্যবধান বা ভেদরেখা নেই।"

মনে হতে পারে যে, অত্যন্ত অল্প পরীক্ষাফল বা তথ্য থেকে তিনি অতি ব্যাপক সাধারণীকরণ করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র অজৈব পদার্থ নিয়ে জীবনের বিশিষ্ট ক্রিয়ার কতকগুলি 'মডেল' তৈরি করেছিলেন। স্ট্রেন-সেল তার মধ্যে অন্যতম। ঠিক কি কারণে স্ট্রেন-সেলে বিদ্যুৎপ্রবাহের জন্ম হয়

তা জগদীশচন্দ্র বলে যাননি। এই বিদ্যুৎপ্রবাহকেই জীবিত স্নায়ুর মধ্যে আঘাতের ফলে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক সাড়ার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। জীবিত স্নায়ু ও জড় টিনের তার আঘাতের ফলে সমশ্রেণীর সাড়া দিচ্ছে। 902 সালে রয়্যাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে তিনি দেখালেন—(1) সামান্য সোডিয়ম কার্বনেট ঐ সেলের জলে দিলে মোচড়ের ফলে সঞ্জাত বিদ্যুৎচাপ বা বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাড়ার পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে যাচ্ছে। (2) পটাশিয়ম ব্রোমাইডের 10% দ্রবণ সাড়ার পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে। (3) কস্টিক পটাশের মাত্র 3% দ্রবণ সাড়া একেবারে স্তব্ধ করে দিচ্ছে, যদিও অতি সামান্য মাত্রায় কষ্টিক পটাশ সাড়া খুব বাড়িয়ে দেয়। (4) অক্স্যালিক অ্যাসিড খুব সামান্য মাত্রাতেও বৈদ্যুতিক সাড়া দেবার ক্ষমতা একেবারে নষ্ট করে দেয়। অনেক সময় নানারকম রাসায়নিক 'ওষুধ' দিয়ে সাড়া দেবার ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা যায়।

অর্থাৎ তাঁর ঐ স্ট্রেন-সেল যন্ত্রটি জীবিত স্নায়ু-সূত্রকে সার্থকভাবে অনুকরণ করছে। উত্তেজক বস্তু দিয়ে জীবিত স্নায়ুসূত্র থেকে বৈদ্যুতিক সাড়া বেশি পাওয়া যায়, অবসাদক দিলে কম, আর বিষ-প্রয়োগে ঘটে তার মৃত্যু বা বৈদ্যুতিক সাড়ার অবলুপ্তি। বহু জীবিত-কোষের সমষ্টি যে টিস্যু বা কলা, তাদের ওপরে থাকে অর্ধভেদ্য পর্দা 'সেমিপারমিয়েব্ল্' মেমব্রেন (Semi-permeable membrane) প্রাণীশরীরে বা তরলে ডোবানো অবস্থায় তার ভেতরে আর বাইরে বিভিন্ন পরিমাণের আয়ন-সমৃদ্ধ তরল পদার্থ। থাকে যান্ত্রিক মোচড় বা উত্তেজনায় বা রাসায়নিক প্রয়োগে ঐ সেমিপারমিয়েব্ল্ আস্তরণ ভেদ করে আয়ন চলাচল করে। ঐ হল সেই ক্ষীণ বিদ্যুৎ প্রবাহ। কিন্তু স্ট্রেন সেলের তারে? তার গায়ে কি তরলে ডোবানো অবস্থায় 'সেমিকণ্ডাক্টিং' আস্তরণ থাকে? তা কি যান্ত্রিক মোচড়ে ভেঙ্গে পড়ে? বিভিন্ন রাসায়নিকে কি ঐ আস্তরণের অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে? জোর করে কিছু বলা যাচ্ছেনা; শুধু বলা যাচ্ছে, স্ট্রেন-সেল খুব সার্থকভাবে স্নায়ুকে অনুকরণ করছে।

জগদীশচন্দ্র 'জীবনের' আরও মডেল তৈরি করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হচ্ছে 'বৈদ্যুতিক চোখ'। গ্যালিনা স্ফটিকের ওপরে আলগাভাবে লেগে থাকা একটি সূচীমুখ এবং স্ফটিক ও সূঁচের মধ্যে বিদ্যুৎচাপ সৃষ্টি করবার জন্য একটি ব্যাটারি ও একই কুণ্ডলীতে গ্যালভানোমিটার। গ্যালিনার ওপরে ছুঁয়ে থাকা সংযোগ বা Cat Whisker হচ্ছে সংবেদনশীল বিন্দু। বিদ্যুৎ তরঙ্গ (মাইক্রোওয়েভ) বা আলোক তরঙ্গ, যে কোন একটি ঐ বিন্দুতে পৌছলে বিন্দুটিতে একাভিমুখী বিদ্যুৎপরিবাহিতা বেড়ে যায়। সুতরাং ঐ সংযোগ বিন্দুতে 'ফোটোভোল্টাইক' সেল তৈরি হচ্ছে। আমরা জানি, সেলেনিয়াম বা Cu ও Cup সংযোগের এরকম আলোক-সংবেদনশীলতা আছে। গ্যালিনা বা সীসার স্ফটিকে এই ব্যাপারটি জগদীশচন্দ্রই প্রথম প্রত্যক্ষ করেন। এদিয়ে তিনি সার্থক মাইক্রোওয়েভ গ্রাহক-যন্ত্র তৈরি করেছিলেন, পেটেণ্ট নিয়েছিলেন সেই হিসাবেই। কিন্তু 'জীবনের' মডেল হিসাবেও এটিকে উল্লেখ করেছেন—প্রাণীর চোখের সঙ্গে তিনি এটিকে তুলনা করেছেন। ঐ সংবেদনশীল সংযোগবিন্দুটি হচ্ছে রেটিনা, যে তার দুটি গ্যালিনা ও সূঁচটিকে যুক্ত করে গ্যালভানোমিটারে পৌচেছে তাদের বলেছেন অপ্টিক নার্ভ; গ্যালভানোমিটার হল মস্তিষ্ক, যার শক্তি জোগাচ্ছে ব্যাটারি। মডেলগুলি জীবনের বহু বৈশিষ্ট্যর মধ্যে একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যকে অনুকরণ করছে; তা হলো, উত্তেজনার ফলে বৈদ্যুতিক সাড়া দেওয়া। ওয়ালারের কথামত, এই বৈশিষ্ট্যই হল জীবনের সর্বব্যাপক ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বৈশিষ্ট্য। জীবিত প্রাণীর স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে উত্তেজনার ফলে বৈদ্যুতিক সাড়া একটি স্নায়ুগুচ্ছ সমন্বিত কেন্দ্রে পৌছায় আর সেখান থেকে নির্দেশিত সাড়া স্নায়ুবাহিত হয়ে কার্যকরী প্রত্যঙ্গগুলিতে উত্তেজনার সঞ্চার করে, ফলে প্রত্যঙ্গ কাজ করে।

উচ্চস্তরের জীবিত প্রাণীর স্নায়ুকেন্দ্র বা মস্তিষ্ককে অনুকরণ করতে পারে, এমন যন্ত্রও বর্তমানে তৈরি হয়েছে.—উদাহরণ Computer, Self propelled missile ইত্যাদি। বর্তমান শতাব্দীর স্বয়ংক্রিয় বা স্বনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র তৈরির চেষ্টা মূলতঃ communication ও control এর অটোম্যাটিক যন্ত্র তৈরির চেষ্টায় নিবদ্ধ। ইলেকট্রনিক্‌স্‌-এর বিচিত্র প্রয়োগের ফলে তা সম্ভব হয়েছে। যদিও জগদীশচন্দ্র control বা ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার উপযুক্ত যন্ত্র তৈরি করেন নি, তবু অজৈব পদার্থ দিয়ে জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়ার মডেল তৈরির সর্বপ্রথম কাজগুলির জন্যে এবিষয়ে তাঁকে পথিকৃৎ বলতে হবে।

পরে তিনি তাঁর গবেষণাকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন উদ্ভিদ-শারীরতত্ত্বের কাজে, কারণ উদ্ভিদকে তিনি automation বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র হিসাবেই দেখেছিলেন। এই "যন্ত্র" বাইরের শক্তি (মাধ্যাকর্ষণ), আলো, তাপ, আর্দ্রতা প্রভৃতি "উত্তেজনায়" "সাড়া" দেয় অর্থাৎ তার বৃদ্ধি ঘটে, আলো ও উত্তাপের পরিবর্তনে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি। তাঁর ধারণা হল যে, উদ্ভিদের প্রতিটি জৈব ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ ধরনের বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া যাবে।

উদ্ভিদ বেছে নেওয়ার একটা কারণ হল, উদ্ভিদের দেহকলা প্রাণীদেহকলার চেয়ে অপেক্ষাকৃত সরল। কোষের সমাহারে বহুকোষী কলার সৃষ্টি। এককোষী প্রাণীর প্রোটোপ্লাজম বৈদ্যুতিক সাড়া দেয়। তিনি বিশ্বাস করলেন—বহুকোষবিশিষ্ট কলায় একই ধরণের ক্রিয়া পাওয়া যাবে। আরও বিশ্বাস করলেন, উদ্ভিদকলায় ও প্রাণীকলায় উত্তেজনার সাড়া একই রকম হতে বাধ্য। জড় থেকে উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদ থেকে প্রাণী, এদের মধ্যে উত্তেজনার বৈদ্যুতিক সাড়ায় কোন প্রভেদ নেই। জীবনের এই লক্ষণটি অবিচ্ছিন্নভাবে জড় থেকে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে উপস্থিত রয়েছে। পরবর্তীকালে তাঁর সমস্ত কাজই মোটামুটিভাবে উদ্ভিদশরীরে প্রাণী-শরীরের সমরূপ সাড়া পাওয়া ও তা লিপিবদ্ধ করার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল।

কিন্তু এই কাজে তিনি দুটি উল্লেখযোগ্য সমস্যার সামনে পড়েছিলেন। একটি হল ascent of sap বা মাটি থেকে মূলরোম যে রসশোষণ করে উদ্ভিদদেহের ঊর্ধ্বাঞ্চলে তার পরিবহণ প্রক্রিয়া আর অন্যটি photosynthesis বা সালোকসংশ্লেষ। কেউ কেউ বলেন, প্রথমটি সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাপার। পাতা থেকে রস উবে যায় আর সেই শূন্যতা পূর্ণ করবার জন্যে উদ্‌স্থিতির নিয়মে জল ওপরে ওঠে। কেউ বলেন, শিকড়ের চাপ এর জন্যে দায়ী, কেউ বলেন জাইলেম কোষের কৈশিক শক্তিতে জল ওপরে ওঠে। আর একটি মতবাদ হল: বায়ুতে পাতার মেসোফিল কোষের জল উবে গিয়ে অস্‌মোটিক চাপের সৃষ্টি হয় আর ঐ চাপ কোষ পরম্পরায় নিচের দিকে শিকড় পর্যন্ত পৌঁছবার ফলে জাইলেমের মধ্যদিয়ে জল ওপরে ওঠে। বর্তমান বায়োকেমিক্যাল মতবাদ আমার জানা নেই। জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা ও যুক্তি দিয়ে যে মত প্রচার করেছিলেন তা হল—উদ্ভিদের রস পরিবহণ যান্ত্রিক পদ্ধতি নয়, তা জীবনধর্মী এবং জীবিত ও পরস্পর সংলগ্ন কোষগুলির পাম্প করবার শক্তির ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি বহুরকম পরীক্ষা করেছেন। আর এই সব পরীক্ষা করার জন্যে অপূর্ব সব সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। প্রসঙ্গত বলি,—জলশোষণ ক্রিয়ার সঠিক তত্ত্ব আজও সংশয়াতীতভাবে নির্দেশিত হয় নি। এক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র এখনও 'আধুনিক' বিজ্ঞানী।

তাঁর তৈরি সব যন্ত্রগুলির মধ্যে ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph) খুব বিখ্যাত। এই যন্ত্র দিয়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধি বহুগুণ বাড়িয়ে লক্ষ্য করা যায়। ফলে প্রতি মিনিটে গাছ কতটা বাড়ছে তা ও মাপা যায়। গাছের বৃদ্ধির ওপর বিভিন্ন পরিবেশ বা অন্যান্য শক্তির প্রভাব এ যন্ত্র দিয়ে তিনি নিরূপণ করেছিলেন। বৃদ্ধি হচ্ছে, পরিবেশ থেকে সমশ্রেণীর অণু নিজ-শরীরে আত্তীকরণ। জীবনের এটি বিশিষ্ট ধর্ম।

সালোকসংশ্লেষের হার মাপার জন্য তিনি "ফটোসিন্থেটিক বাব্‌লার, (Photosynthetic

bubbler) নামে আর একটি বিখ্যাত যন্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন। সালোকসংশ্লেষ হচ্ছে সূর্য-কিরণের প্রভাবে পত্রহরিতের সাহায্যে বায়ুর কার্বন-ডাই অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্পের দ্বারা উদ্ভিদের কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুতের প্রক্রিয়া। এই শর্করা আত্মসাৎ করেই উদ্ভিদ-দেহ পুষ্ট ও বর্ধিত হয়।

অন্যান্য যে সব যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তার সবকটির নাম বা বর্ণনা দেওয়া ছোট একটি প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে তাঁর recorder শ্রেণীর প্রায় সব যন্ত্রগুলিতে ঘড়ির কলের অদ্ভুত চাতুর্যপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে। এবিষয়ে একটা কথা মনে হচ্ছে। বর্তমানে ইলেকট্রনিক্সের বিচিত্র ব্যবহারের ফলে অনেক সংবেদনশীল বা সূক্ষ্ম recorder যন্ত্রাদি তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু electrical ও electronic বা thermal noise এড়ানো সম্ভব নয়, pick up প্রভৃতিও চিন্তা করতে হয়। সেক্ষেত্রে ঘড়ির যন্ত্র আর সিল্কের সুতা আর সরু কাচনলের লিভার (lever) প্রভৃতি অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। তাই জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রগুলি এখনও বিশেষ রকম 'আধুনিক', এবং তার কার্যকারিতা ফুরিয়ে যায় নি।

আর তাঁর যে ধারণা,—জড়েই জীবনের প্রথম উন্মেষ, সে ধারণার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও একান্ত আধুনিক। বর্তমান বায়োকেমিষ্ট্রি বলে, পৃথিবীর উপাদান যে জড়পদার্থ, তা থেকেই প্রাণীজীবন ও তার চেতনার উৎপত্তি। তাহলে ধরে নিতে হবে, অচেতন জড় পদার্থের মধ্যে জীবন ও চেতনা প্রচ্ছন্ন ভাবে রয়েছে। কিন্তু এই প্রচ্ছন্ন জীবন ও চেতনা কিভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে? জীবনের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বর্তমান বিজ্ঞানীরা বলছেন,—রাসায়নিক আসক্তির দ্বারা ব্যাপারটা ঘটছে। এই রাসায়নিক আসক্তির ফলে একটি সরল অণু বাইরের কয়েক রকমের পরমাণু আত্মসাৎ করে জটিল হয়ে উঠছে। শেষ অবধি তা থেকেই প্রাণের উৎপত্তি।

সবশেষে বলি, জগদীশচন্দ্রের পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষার মধ্যে কোনদিন কোন ভুলচুক ছিল না। মনে হয়, তথাকথিত "কোহেরারের" লোহাচুরের ওপরে বিদ্যুৎরশ্মি ক্রমাগত পড়ার ফলে ক্রমশঃ লোহাচুরের সাড়া দেবার ক্ষমতার বিলুপ্তি বা "অবসাদ", আবার বিশ্রামে সেই ক্ষমতার প্রত্যাবর্তন—এই নিরীক্ষা সঠিক। কিন্তু এর সঠিক তত্ত্ব কি?

টেলিভিশনে এক্সরে

বোম্বায়ের জে. জে, হসপিটালে ভারতের ইলেকট্রনিকস্ করপোরেশনে তৈরি একটি নূতন ধরণের এক্সরে যন্ত্র কাজ করছে। এ যন্ত্রের দ্বারা রোগীর দেহে প্রেরিত রঞ্জেন রশ্মি দেহ ভেদ করে একটি ক্ষমতা বর্ধনকারী নলের দ্বারা সাধারণ এক্সরে ছবির চেয়ে হাজার হাজার উজ্জ্বল ছবিতে পরিণত হয়। এই ছবি ক্লোজড্ সারকিট ক্যামেরার (closed-circuit) দ্বারা টেলিভিশনের পর্দায় প্রতিফলিত হয়। সাধারণ এক্সরে ফিল্মের চেয়ে এতে শতকরা 80 ভাগ খরচ কম পড়বে। এই যন্ত্রটি ভারতের ইলেকট্রনিকস করপোরেশন তৈরি করেছেন কিন্তু এর 60 ভাগ যন্ত্রাংশ আমদানী করা।

ইলেকট্রনিক্সের জগতে লিলিপুট

জয়ন্ত বসু*

জোনাথন সুইফ্‌ট-এর লেখা 'গ্যালিভারের ভ্রমণকাহিনী' নামক বইতে ক্ষুদে বামনদের দেশ লিলিপুটের গল্প আমরা অনেকেই পড়েছি। সাম্প্রতিক কালে ইলেকট্রনিক্সের জগতে ঐ ধরণের একটা লিলিপুটের আবির্ভাব হয়েছে, যার নাম মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স। এখানকার সব কিছুই আশ্চর্য রকম ছোট। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় হল, ইলেকট্রনিক লিলিপুটিয়ানদের আধিপত্য দিনের পর দিন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই লিলিপুটিয়ানদের নাম: মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিট। এরা না থাকলে মানুষের মহাকাশ অভিযান সম্ভব হত না। বছর বিশেক আগে এরা অবশ্য কেবল মহাকাশ অভিযান ও আধুনিক রণসজ্জার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির কাজে নিযুক্ত ছিল; অন্যান্য কাজে এদের ব্যবহার করা হত না, কারণ এদের দাম ছিল একেবারে আকাশ-ছোঁয়া। কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে এগুলিকে বিপুল সংখ্যায় তৈরি করা যাচ্ছে এবং এদের দাম অনেকখানি কমে গেছে। কতখানি কমেছে জানেন? ধরুন, একটা অ্যামবাসাডার গাড়িকে যদি পাঁচ টাকায় কিনতে পাওয়া যায়, তাহলে দাম যে হারে কমে, অনেকটা সেইরকম।

ইলেকট্রনিক্স ক্ষুদ্রীকরণ:

ইলেকট্রনিক্সে ক্ষুদ্রীকরণ কার্যতঃ শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির আয়তন ও ওজন কম হলে তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া সুবিধাজনক। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে ছাপা সার্কিটের (printed circuit) উদ্ভব হয়, পরে তার বহুল প্রয়োগ হয়েছে। এই সার্কিট প্লাস্টিক বা সিরামিক জাতীয় অপরিবাহী পদার্থের একখানি বোর্ডের সমতল পৃষ্ঠার উপর প্রয়োজন অনুযায়ী পাতলা ধাতব পাত মুদ্রিত করে সেই সব পাত দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগের কাজ করানো হয়। এই পাত এক সেন্টিমিটারের কয়েক শ' ভাগের এক ভাগ মাত্র পুরু হয়। প্রত্যেক পাতের প্রান্তে রোধক (resistor) ধারক (capacitor) ইত্যাদি নির্দিষ্ট উপাদান জুড়ে দিয়ে ডোবানো ঝালাই (dip soldering) প্রক্রিয়ায় সমস্ত ঝালাইয়ের কাজ একসঙ্গে করা হয়ে থাকে।

ছাপা সার্কিটের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যবহার ঘটে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মর্টারের গোলা বিস্ফোরণের ব্যাপারে। এই সময় বৃটেন ও অ্যামেরিকায় 'নৈকট্য ফিউজ' (proximity fuse) নামে এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল, যা মর্টারের গোলার অগ্রভাগে বসিয়ে দিলে লক্ষ্য বস্তু থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে গোলাটি আপনা থেকেই বিস্ফোরিত হয়। 'নৈকট্য ফিউজ' তৈরির সমস্যা ছিল -- এক, মর্টারের গোলার অগ্রভাগের যৎসামান্য স্থানে একে ধরাতে হবে; দুই, এটিকে যথেষ্ট মজবুত হতে হবে যাতে মর্টারের গোলা ছোঁড়বার ধাক্কা সে সামলাতে পারে; এবং তিন, এই ফিউজ তৈরি করবার

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-৯

পদ্ধতি এমন হতে হবে যাতে বহুল ব্যবহারের জন্যে একই ধাঁচের যথেষ্ট সংখ্যক ফিউজ অল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এই সমস্যাগুলির সন্তোষজনক সমাধান করা হয় নৈকট্য ফিউজ ছাপা সার্কিট ব্যবহার করে।

ইলেকট্রনিক ভাল্‌ব নামক যে বায়ুশূন্য নলে ইলেকট্রন কণার গতি নিয়ন্ত্রণ করে বিদ্যুৎপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, বৈদ্যুতিক ভোল্টেজের পরিবর্ধন ইত্যাদি সম্পন্ন হয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সেই ভাল্‌বকে যথাসম্ভব ক্ষুদ্রাকৃতি করা হয়েছিল। রোধক, ধারক প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় উপাদানকেও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারে তৈরি করা গেল। ফলে অবস্থাটা যা দাঁড়াল তাতে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির প্রতি ঘন ফুটে প্রায় 5,000 উপাদান ধরানো সম্ভব হল।

1948 খ্রীষ্টাব্দে ট্রানজিস্টর আবিষ্কৃত হবার পর ইলেকট্রনিক্সে ক্ষুদ্রীকরণ প্রচণ্ড এক ধাপ এগিয়ে গেল। বিভিন্ন ধরণের ট্রানজিস্টর বহু ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ভাল্‌বের স্থান অধিকার করল। ট্রানজিস্টর আকারে ভাল্‌বের চেয়ে অনেক ছোট। ট্রানজিস্টরের কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ ভাল্‌বের তুলনায় বহুলাংশে কম হওয়ায় বিদ্যুৎশক্তির উৎসের আকারও অনেকখানি ছোট হয়। আগেকার ভাল্‌ব রেডিও সেটের চেয়ে ট্রানজিস্টর রেডিও সেটের আয়তন সেজন্যে অনেক কম।

অতঃপর এল ইলেকট্রনিক্সে অতি ক্ষুদ্রীকরণের (microminiaturization) পালা। তৈরি হল মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিট। এই অতিক্ষুদ্রাকরণ মূলতঃ তিন ভাবে হতে পারে:—

(1) পৃথক উপাদান পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে সব সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উপাদানকে পৃথক পৃথক ভাবে যথাসম্ভব ক্ষুদ্রাকারে তৈরি করা হয়।

(2) পাতলা পাত পদ্ধতি—কাচ বা সিরামিকের মত কোন অপরিবাহী পদার্থের একটি অধঃস্তরের উপর ধাতু, আধা-পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের পাতলা পাতের আকার ও রাসায়নিক গঠন নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলিকে দিয়ে বিভিন্ন উপাদানের কাজ করানো হয়। এই স্তর এত পাতলা হয় যে, এরকম হাজারটি স্তর উপর উপর রাখলে উচ্চতা হয় মাত্র 1 মিলিমিটার।

(3) ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে অতিক্ষুদ্র একখণ্ড আধা-পরিবাহী পদার্থের বিভিন্ন অংশের ধর্মকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয় যে, সেই খণ্ডটি বহু উপাদান সমন্বিত একটি সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক সার্কিটের মত কাজ করে। একে বলা হয় ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (Integrated Circuit), সংক্ষেপে আই সি (IC)।

ইলেকট্রনিক্সে অতিক্ষুদ্রীকরণ কি পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা বোঝা যাবে একটি উদাহরণ দিলে। 1946 সালে সর্বপ্রথম যে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার তৈরি হয়, তাতে 1500 বর্গফুট জায়গা অধিকার করেছিল। এখন ঐরকম যন্ত্রের আয়তন হতে পারে এক টাকার একটি মুদ্রার আয়তনের সমান।

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট

বর্তমানে যে মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্সের দ্রুত প্রসার হচ্ছে, তার মূলে রয়েছে আই. সি অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের ব্যাপক প্রয়োগ। আই সি যেমন আকারে ছোট, তেমন দামে সস্তা। আবার কাজে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যও বটে। সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উপাদান মিলিয়ে মোট কটি উপাদানের কাজ করতে পারে একটি আই. সি? 1960 সালে এই সংখ্যার সর্বোচ্চ মান ছিল 50; এখন হয়েছে প্রায় 10,000। এই রকম আই সি-কে বলা হয় 'লার্জ-স্কেল ইন্টিগ্রেসন', সংক্ষেপে এল এস আই (LSI)। 'লার্জ-স্কেল ইন্টিগ্রেসন'-এর অর্থ হচ্ছে বৃহৎ মাত্রায় সামগ্রিকীকরণ।

আই সি প্রস্তুতিতে যে পদার্থ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে সিলিকন। পৃথিবীর বুকে এই পদার্থটি প্রচুর পরিমাণে আছে - বালির অন্যতম উপাদান হল সিলিকন। আই. সি প্রস্তুতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

হল এইরকম :—পরীক্ষাগারে সিলিকনের কেলাস তৈরি করে তাই থেকে পাতলা পাতলা চাকৃতি কেটে নেওয়া হয়। এইগুলি সব বিশুদ্ধ সিলিকনের নক্সা রূপান্তরিত হয় এক একটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটে। (বস্তুতঃ ট্রান্‌জিস্টরও তৈরি হয় এন-অঞ্চল ও পি-অঞ্চলের সঠিক সমন্বয়ের ফলে)।
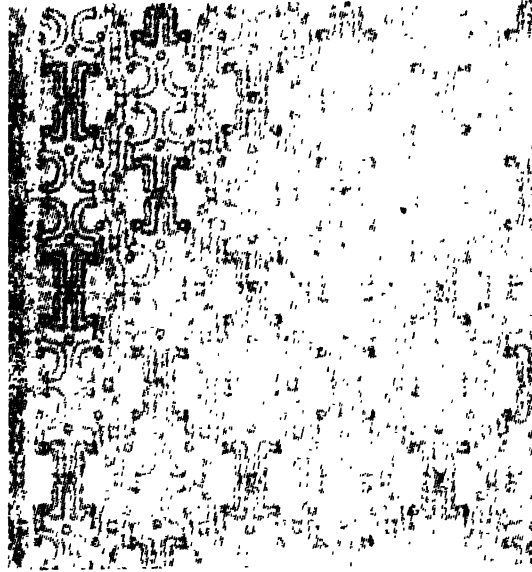
2000 উপাদান সমন্বিত একটি এল. এস. আই-কে প্রায় 200 গুণ আকারে দেখানো হয়েছে। এই এল. এস. আই এত পাতলা যে এই রকম চারটিকে উপর উপর রাখলে মাত্র 1 মিলিমিটার হয়।

চাকৃতি। ঈপ্সিত নক্সা অনুযায়ী এক একটি চাকতির উপর উপযুক্ত আবরণীর একই রকম নক্সা পাশাপাশি অনেকগুলি মুদ্রিত করা হয়। অতঃপর চাকৃতি-গুলিকে একটি কোয়ার্ট্‌জ্‌ 'নৌকায়' বসিয়ে জ্বলন্ত চুল্লীর মধ্যে রাখা হয়। চুল্লীর উষ্ণতা যখন কয়েক হাজার ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস, তখন প্রত্যেক নক্সার নিরাবরণ অংশগুলিতে রাসায়নিক অবিশুদ্ধি (impurities) ঢুকিয়ে দেওয়ার এমন ব্যবস্থা থাকে যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী নক্সাটির অংশবিশেষে ঋণাত্মক (negative) বা ধনাত্মক (positive) আধানের আধিক্য গড়ে ওঠে। এই ভাবে তৈরি হয় যথাক্রমে এন অঞ্চল (n-region) ও পি-অঞ্চল (p-region)। এইগুলির যথাযথ সংযোগেই প্রত্যেকটি

অতঃপর চাকৃতিগুলিকে চুল্লীর বাইরে এনে প্রত্যেক চাকৃতির প্রতিটি একক বা তথাকথিত 'চিপ' (chip) সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা হয়। যে দু-একটি চিপ ত্রুটিপূর্ণ থাকে, সেগুলিকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। এই ভাবে এক-একটি চাকৃতি থেকে বহু চিপ একসঙ্গে উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রচলিত সার্কিটের তুলনায় আই. সি তৈরি করবার খরচ যে অনেক কম, সে কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে একটা 'যদি' আছে। যদি অন্ততঃ 50,000 অবিকল একই রকম সার্কিট তৈরি করা হয়, তবে এই সার্কিট তৈরি করা লাভজনক। কারণ এই সার্কিট তৈরি করবার

জন্যে যে সব যন্ত্রপাতি কিনতে হয়, কম সংখ্যক সার্কিট তৈরি করলে তাদের খরচ পোষায় না।

আমাদের দেশে এখনও আই. সি তৈরি হয় না, তবে বহু আই সি সমন্বিত সিলিকন চাক্‌তি বিদেশ থেকে আমদানি করে এখানে 2-3টি প্রতিষ্ঠানে সেগুলিকে কেটে পৃথক করা হচ্ছে এবং তারপর সেগুলিকে যথারীতি আবৃত করে ব্যবহারের উপযোগী করবার ব্যবস্থাও হয়েছে। আর্থিক দিক থেকে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে, কেননা আই. সি তৈরি করবার চার ভাগের তিনভাগ খরচই হয় এই কাজে।

মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিটের ব্যবহার

মহাকাশযানে রক্ষিত কম্পিউটার, ক্ষেপণাস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রভৃতিতে মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিটের সর্বপ্রথম ব্যবহার হয়েছিল। মহাকাশযানে বহু ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি রাখতে হয়, অথচ 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী'—সেখানে কোন রকমে ঠাঁই করে নিতে হলে যন্ত্রপাতির আকার ছোট এবং ওজনও কম হওয়া দরকার। ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদির ক্ষেত্রে মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স এই চাহিদা মিটিয়েছে।

আই. সি ব্যবহার করে যে মিনি-কম্পিউটার তৈরি হচ্ছে, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে সেগুলির ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। কল-কারখানা, দোকান, অফিস ইত্যাদির কাজে তো বটেই, গৃহস্থালীর কাজ-কর্মের এদের প্রচলন ব্যাপক হয়েছে। যেমন ধরুন, এরা তাড়াতাড়ি হিসেব-নিকেশ করে দিচ্ছে, সহায়তা করছে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে। মিনি-কম্পিউটার যেমন দামে সস্তা, কাজও তেমন করতে পারে খুব তাড়াতাড়ি। তামার তারের মধ্য দিয়ে যখন বৈদ্যুতিক সংকেত যায়, তখন তার গতিবেগ আলোর গতিবেগের চেয়ে শতকরা প্রায় 20 ভাগ কম, অর্থাৎ সেকেণ্ডে প্রায় 2 লক্ষ 80 হাজার কিলোমিটার। প্রচলিত বড় কম্পিউটারে এত তার ও বিভিন্ন উপাদানের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয় যে, তার সম্পূর্ণ চলার পথে সময় লাগে প্রায় 1/10 সেকেণ্ড। কম্পিউটার যে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে, তাতে এই সময় মোটেই নগণ্য নয়। মিনি-কম্পিউটারে ব্যবহৃত তার ইত্যাদি অনেক কম হওয়ায় এই সময় অনেকখানি সংক্ষিপ্ত হয় এবং সেজন্যে এই কম্পিউটার একই কাজ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে করতে পারে। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে এই কম্পিউটারের কর্মক্ষমতা বেশি।

সাম্প্রতিক কালে মিনি কম্পিউটারের চেয়েও ক্ষুদে কম্পিউটারের প্রচলন হয়েছে। নাম: মাইক্রো-কম্পিউটার। এতে কম্পিউটারের যাবতীয় অংশের কাজ করে একটি বা কয়েকটি মাত্র এল এস. আই চিপ। এইরকম চিপকে বলা হয় মাইক্রো-প্রসেসর।

পরিবর্ধক, প্রেরক, গ্রাহক ইত্যাদি যন্ত্রে মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করে অনেক যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষুদ্রাকৃতি করে ফেলা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আমরা জানি, রেডার হল প্রেরক, গ্রাহক, অ্যাণ্টেনা ইত্যাদি নিয়ে গঠিত একটি বড় যান্ত্রিক ব্যবস্থা। দূরের আকাশে কোন বস্তুর উপস্থিতি ও দূরত্ব বেতার তরঙ্গের সাহায্যে এতে নির্ণয় করা যায়। 1977 সালে লণ্ডনে 'রেডার '77' নামক সম্মেলনে এমন একটি ক্ষুদ্র ও হাল্‌কা রেডার প্রদর্শিত হয়েছিল, যা একজন লোক অনায়াসে বহন করতে পারে। এই মিনি-রেডার দৈর্ঘ্যে 30 সেন্টিমিটার, প্রস্থে 26 সেন্টিমিটার ও উচ্চতায় 15 সেন্টিমিটার। মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করে এই রেডার তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এতে রয়েছে 13 রকমের 22টি মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিট। মিনি-রেডারের দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোন বিমান বা অন্য কোন লক্ষ্যবস্তু উপস্থিত হলে বাহকের কানে লাগানো হেডফোনে উৎপন্ন শব্দের মাধ্যমে বাহক তার উপস্থিতি জানতে পারে। রেডারের পর্দায় বস্তুটির দূরত্ব ও অবস্থান সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয়। এই ধরনের মিনি-যন্ত্র রেডার নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের একটি গুণ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আই. সি আশ্চর্যরকম স্বাস্থ্যের অধিকারী—এর বিকল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এজন্যে যে সব যন্ত্রে আই. সি ব্যবহৃত হয়, সেগুলি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। এ কথাও বলতে হয় যে, আই সি খুব ছোট হওয়ায় যন্ত্রের মধ্যে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি কয়েকটি সার্কিট রাখা সম্ভব হয়, যাতে কোন কোন সার্কিট অকেজো হয়ে গেলে এইসব অতিরিক্ত সার্কিট তাদের কাজ চালিয়ে দিতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়—এই যে redundancy বা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত উপাদান রাখার পদ্ধতি, আমাদের মস্তিষ্কে এর বহুল ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে, যার জন্যে কোন দুর্ঘটনা বা অস্ত্রোপচারের ফলে মস্তিষ্কের অনেকগুলি উপাদান অকেজো হয়ে গেলেও অতিরিক্ত উপাদান তাদের কাজ চালিয়ে দিয়ে অনেক সময় মস্তিষ্কের কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে পারে।

শেষ কোথায়, কি আছে শেষে ?

ইলেকট্রনিক্সে ক্ষুদ্রীকরণ যে হারে এগোচ্ছে, তাতে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, এর কি কোন শেষ আছে? উত্তর হল—হ্যাঁ, এর একটা শেষ সীমা আছে। সেই সীমা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় দ্বারা মোটামুটি ভাবে নির্দিষ্ট হয় :—

(1) ইলেকট্রনিক সার্কিটের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ গেলে তাপের সৃষ্টি হয়। যন্ত্রের মধ্যে নির্দিষ্ট আয়তনে সার্কিটের সংখ্যা খুব বেশি হলে উৎপন্ন তাপ যথেষ্ট পরিমাণে নির্গত হয় না। ফলে উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে সার্কিটের ক্ষতি করতে পারে।

(2) যে যন্ত্র দিয়ে বা যে পদ্ধতিতে মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিট তৈরি হয়, তার পক্ষে শতকরা 100 ভাগ নিখুঁত হওয়া সম্ভব নয়।

(3) যদি আধা-পরিবাহী সার্কিট খুব ছোট হয়, তার মধ্য দিয়ে মহাজাগতিক রশ্মি যাওয়ার ফলে তার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অনেক ক্ষেত্রে দু-একটি সার্কিট অকেজো হলে সমস্ত যন্ত্রই বিকল হয়।

(4) আধা-পরিবাহী সার্কিটের যে যে জায়গায় অবিশুদ্ধির ঘনত্ব সমান হওয়ার কথা, সেখানে কিছু না কিছু তারতম্য থাকে। অতিক্ষুদ্র সার্কিটের ক্ষেত্রে এই ত্রুটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রতি ঘন সেন্টিমিটারের যতগুলি মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিট গাঁটবন্দী হয়ে থাকে, সেগুলির সংখ্যাকে বলা হয়, গাঁইট-ঘনত্ব (packaging density)। বর্তমানে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের ক্ষেত্রে এই ঘনত্ব কয়েক হাজার। মানুষের মস্তিষ্কে অনুরূপ বস্তুর ঘনত্ব প্রায় এক কোটি। আধা-পরিবাহী উপাদানের ক্ষেত্রে এই ঘনত্বের সর্বোচ্চ সীমা 10 কোটি। অন্যান্য ইলেকট্রনিক উপাদানের ক্ষেত্রে এই সীমা হতে পারে 100 কোটি।

শৈবাল ঃ
নতুন উদ্ভিজ্জ প্রোটিন উৎস

পার্থদেব ঘোষ ও মন্টু দে*

প্রোটিনের স্থান খাদ্য তালিকার শীর্ষে। পৃথিবীর জনসংখ্যা নিত্যই ক্রমবর্ধমান। তাই, মানুষের হাত প্রসারিত হয়েছে বার বার এক একটি নতুন প্রোটিন উৎসের দিকে। ইতমধ্যেই মৎস্য ও অন্যান্য প্রাণীজ প্রোটিন, তৈলবীজ প্রোটিন, পত্রজ প্রোটিন মানুষের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এককোষী দেহজ প্রোটিনে (single cell protein)। সাধারণতঃ জীবাণু দেহজ প্রোটিন, ইষ্ট ছত্রাক ও শৈবালের দেহ থেকে প্রাপ্ত প্রোটিন এই শ্রেণীর প্রোটিনের অন্তর্গত।

খাদ্য হিসেবে শৈবালের ব্যবহার বহু শতাব্দী থেকেই মানুষের জানা। প্রাচীন চীন সাহিত্যে খাদ্য হিসেবে শৈবালের কথা উল্লেখিত আছে। শৈবাল, আফ্রিকা ও মেক্সিকোর কিছু কিছু অঞ্চলের আদিবাসীদেরও খাদ্য তালিকাভুক্ত ছিল।

শৈবাল হচ্ছে এক শ্রেণীর নিম্নস্তরের উদ্ভিদ। যাদের দেহ পত্র, কাণ্ড ও মূলে বিভাজিত নয়। এরূপ অঙ্গ বিভেদহীন (undifferentiated) দেহকে বলা হয় থ্যালাস (thallus)। এদের অধিকাংশেরই বিস্তার জলে তবে কেউ কেউ ভিজে স্যাঁতসেঁতে জায়গাতেও জন্মায়। বিভিন্ন বর্ণের শৈবাল দেখা যায় যেমন সবুজ (green algae), নীল-সবুজ (blue green algae, বাদামী (brown algae) ও লাল শৈবাল red algae)। এদের মধ্যে কারও দেহ এককোষী আবার কেউ কেউ বহুকোষী। খাদ্যের জন্য কিন্তু এরা সকলেই স্বনির্ভরশীল (autotrophic)। বিশেষতঃ সবুজ শৈবালের সূর্যালোক ও ক্লোরোফিল কণার সাহায্যে সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় (photosynthesis খাদ্য তৈরির অপূর্ব কৌশলটি সম্পূর্ণ আয়ত্বে।

বিগত দুই দশক ধরে আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও জার্মান বিজ্ঞানীরা শৈবাল উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন। কিছু কিছু সবুজ শৈবাল যেমন ক্লোরেলা পাইরিনয়েডস্ chlorella pyrenoides), সীনডেসমাস এ্যাকুটাস (scenedesmus acutus), কোলেসট্রাম প্রোবোসিডিয়াম (coelastrum proboscidium) ও নীল-সবুজ শৈবাল যেমন স্পিরুলিনা প্লেটেনসিস্ (spirulina platensis) এর চাষ আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

ভারতবর্ষে ইন্দো-জার্মান চুক্তি অনুযায়ী শৈবাল চাষ শুরু হয় 1973 সালে মহীশূরের সেণ্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে। প্রথম যে সবুজ শৈবালটির চাষ করা হয় তার নাম সীনডেসমাস এ্যাকুটাস। বর্তমানে নীল-সবুজ শৈবাল স্পিরুলিনারও চাষ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন জৈবিক-সার biofertilizer, প্রোটিন উৎস (source of protein, জ্বালানী উৎস (fuel source) ও সর্বোপরি খাদ্য হিসেবে শৈবালের সদ্ব্যবহারে আজ ভারতবর্ষের একাধিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্মব্যস্ত। এদের মধ্যে সামুদ্রিক শৈবাল থেকে খাদ্য, সার ও জৈব-গ্যাস উদ্ভাবনে 'সেণ্ট্রাল সল্ট এণ্ড ম্যারীন্ কেমিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও রয়েছে 'ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট', 'ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশন' প্রভৃতি।

*উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষিক্ষেত্রে ধান, গম চাষের মতই শৈবাল চাষ পদ্ধতিও কিছুটা একই রকম, তবে এক্ষেত্রে চাষের মাধ্যমটি শক্ত মাটি নয়, তরল পদার্থ—জল। শৈবাল চাষের প্রধান ও উল্লেখযোগ্য পর্যায়গুলি চিত্রে দেখানো হল। প্রথমে যে শৈবাল মাধ্যমকে আন্দোলিত করা হয়। উপযুক্ত অবস্থার পরিপোষণ মাধ্যমে পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই শৈবাল সংগ্রহ করার উপযুক্ত হয়। পর্যায় পরিপোষণ (batch wise culture) বা নিরবচ্ছিন্ন পরিপোষণ (continuous culture)—কোন্ পদ্ধতিতে চাষ হবে
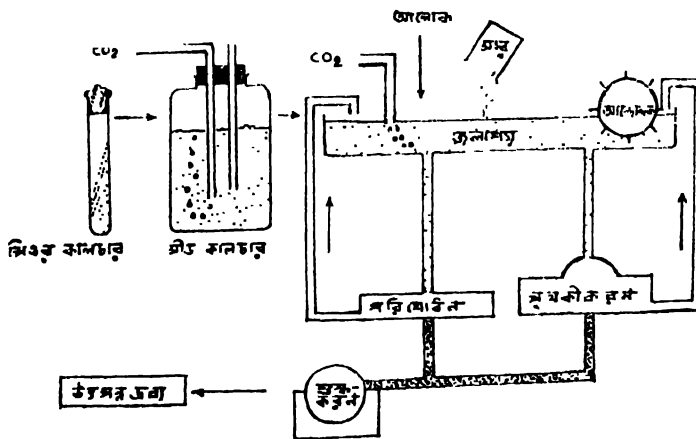
শৈবাল চাষ পদ্ধতির প্রবাহ রেখাচিত্র

চাষ করা হবে তার পিওর কালচার (pure culture) নিয়ে পুনরায় কালচার করে পরীক্ষাগারে 'বীজ-শৈবাল' বা ইনোকুলাম (inoculum) তৈরি করা হয়। তারপর বাইরের জলাশয়ে চাষ করা হয়। ফসল তোলার (harvesting) সময় পরিশোধন ও পৃথকীকরণ অথবা সেন্ট্রিফিউজ্ করা হয়। সবশেষে প্রাপ্ত শৈবাল শুষ্ক করা হয়। চাষের সময় শৈবাল পরিপোষণ মাধ্যমে (algal culture) বিভিন্ন সার মিশ্রণ ও ইউরিয়া সরবরাহ করা হয়। শৈবালের বৃদ্ধি—উপযুক্ত কার্বন উৎস (carbon source) ব্যবহারের উপরেও নির্ভরশীল। সবুজ শৈবাল সীনডেসমাস (scenedesmus *sp*) এর ক্ষেত্রে কার্বনডাই অক্সাইড ও নীল-সবুজ শৈবাল স্পিরুলিনার (spirulind *sp.*) ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাইকার্বনেট কার্বন-উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সমপরিমাণ আলোক ও সার (uniform light and fertilizer) যাতে প্রতিটি কোষেই পৌঁছে যায় সেজন্য শৈবাল পরিপোষণ

তা নির্ভর করে শৈবালটির বৈশিষ্ট্যের উপর। ছোট শৈবালের ক্ষেত্রে (5—8 μm) যেমন সীনডেসমাস সংগ্রহ করা হয় সেন্ট্রিফিউজড সেপারেটরের সাহায্যে ঘনীভূত (concentrate) করে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় শৈবালের ক্ষেত্রে (100 μm) সাধারণ কাপড় দিয়েই ফিলটার করা হয়। মানুষের খাদ্য উপযোগী করে তুলতে শৈবাল শুষ্ক করা হয় সাধারণতঃ ড্রাম ড্রায়ারে (drum drier) 120°C এ 10 সেকেণ্ড ধরে। এই ভাবে শুষ্ক করলে কোষপ্রাচীর ভেঙ্গে যায় এবং প্রোটিনকে পরিপাকের উপযুক্ত করে তোলে। সেই সঙ্গে শৈবাল জীবাণুমুক্তও (sterilized) হয়। কিন্তু গবাদিপশু খাদ্যের জন্য শৈবালকে সাধারণভাবে সূর্যালোকে শুষ্ক করা হয়। কারণ গবাদিপশুরা সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীর সেলুলেজ্ নামক এনজাইমের সাহায্যে ভাঙ্গতে ও পরিপাক করতে সক্ষম। বর্তমানে সোলার হিটারের (solar heater) সাহায্যে শৈবাল শুষ্ক করার কথাও

ভাবা হচ্ছে। উপযুক্ত অবস্থায় শৈবাল (শুষ্ক) উৎপাদন প্রতিদিন সাধারণতঃ 15-20 গ / m^2 ।

শৈবালের প্রধান খাদ্যগুণ উচ্চমানের অপরিশোধিত প্রোটিন। তাছাড়াও রয়েছে ভিটামিন B-complex বিশেষ করে ভিটামিন B_{12} যা সাধারণত উদ্ভিদখাদ্যে থাকে না। শুষ্ক শৈবাল দেখতে সবুজ ও স্বাদে ঘাসের ন্যায় (grassy in taste)। সবুজ রঞ্জককে (pigment) নিষ্কাশিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে কিন্তু সেক্ষেত্রে খাদ্যগুণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়।

বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে শৈবাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে যা খরচ পড়ে তা তৈলবীজ প্রোটিন উৎপাদন অপেক্ষা তিন গুণ বেশি। তবে আধুনিক গবেষণা, উন্নত ও পরিবর্তিত পদ্ধতির ফলে অদূর ভবিষ্যতে খরচ নিশ্চয়ই কিছুটা কমে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। গবাদিপশুর খাদ্যরূপে শৈবালের ব্যবহার ইতিমধ্যেই বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে খাদ্য হিসেবে গ্রহণের কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে শৈবাল নতুন প্রোটিন উৎস হিসেবে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ হলেও মানুষের চোখ ভিজে দেয়াল অথবা কুয়োর পাড়ে যে শৈবাল দেখতে অভ্যস্ত তাকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার সাফল্য নির্ভর করবে তার রুচি, দৃষ্টিভঙ্গী ও খাদ্যাভাসের পরিবর্তনসাপেক্ষে—অর্থাৎ, মানসিক প্রস্তুতির ওপর।

উড়ন্ত পিরীচ

"উড়ন্ত পিরীচ' নিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। এগুলি নাকি গ্রহান্তরের উন্নততরো জীবদের গ্রহান্তর যান। মাঝে মাঝেই এখানে ওখানে 'উড়ন্ত পিরীচ' দেখা যায়, অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও আছে।

সম্প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত পরীক্ষা ও গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে উড়ন্ত পিরীচ জাতীয় 'অসনাক্ত উড়ন্ত বস্তু' (Unidentified Flying Objects বা সংক্ষেপে UFO) এগুলি আয়নমণ্ডলের উচ্চতর স্তরে নানা সৌরক্রিয়ার ফলে দৃষ্টিভ্রম মাত্র। এর সঙ্গে অন্য কোনো গ্রহের উন্নত জীবের তৎপরতার কোনো সম্পর্ক নেই।

* * * *

রেশম ও চৌম্বক ক্ষেত্র

বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্রিয়ায় গুটিপোকার জৈব তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। বিকিরণপ্রাপ্ত রেশমগুটির ডিম থেকে যেসব শুঁয়োপোকা বেরিয়ে আসে সেগুলো থাকে সূক্ষ্ম সুতো দিয়ে ঘেরা অবস্থায়। বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্রিয়ায় উৎপন্ন এই সুতো হয়ে থাকে স্বাভাবিকের চেয়ে আরো অনেক বেশি লম্বা ও শক্ত। এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়েছে তাসখন্দ কৃষি ইনস্টিটিউট থেকে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতায় তা সমর্থিত হয়েছে। উজবেকিস্তানের কুড়িটি যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারে রেশমগুটিকে নিম্ন-কম্পাংকের বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্রিয়ার মধ্যে রাখা হয়েছে। ফলে বিকিরণপ্রাপ্ত রেশমগুটির ডিম থেকে দশ থেকে পনেরো কিলোগ্রাম অধিক গুটি পাওয়া গিয়েছে। এই রেশমের উৎপাদন প্রায় দশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমস্যা সমাধানে সারণি তত্ত্বেরপ্রয়োগ

শক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়*

[Matrix বা সারণিতত্ত্ব আজ একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। গণিতবিজ্ঞানের এই শাখাটি, গণিতের লোক নন্—এমন যাঁরা, তাঁদের কাছে কৌতূহলের বিষয়। সংক্ষেপে, বিষয়টি সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে আলোচনাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।]

Matrix বা সারণি তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ-সম্বন্ধে নীচের দুটি সমস্যা ধরা যাক্।

প্রথম সমস্যা:

A. অমলবাবু, সরলবাবু ও কমলবাবু দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যের অধ্যাপক। কার যে কি বিষয় তা অজ্ঞাত। এখন ঐ তিন বিষয়ের তিন ছাত্র সর্বদাই তিনটি ভিন্ন রঙের পোশাক পরেন। (1) দর্শনের ছাত্র পরেন সাদা পোষাক। (2) সাহিত্যের ছাত্রের বয়স অল্প, এখনও ভালমত গোঁফদাড়ি গজায় নি। (3) প্রায় প্রতি সকালে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে কমলবাবুর সঙ্গে ইতিহাসের অধ্যাপক খানিক গল্প করেন। (4) সরলবাবুর ছাত্র গেরুয়াবসনধারী (5) ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা ছাত্রটি কালো স্যুট পরে যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান তখন পিছন থেকে তাঁকে হুবহু সরলবাবুর মত দেখায়।

প্রশ্ন: অমলবাবু কিসের অধ্যাপক?

দ্বিতীয় সমস্যা:

B. কোন এক কলেজে গণিতবিভাগে পাঁচজন অধ্যাপক। এই পাঁচ অধ্যাপকের প্রত্যেকের একটি করে অধ্যাপনার বিষয় এবং প্রত্যেকের প্রিয় বিষয় অপরের অধ্যাপনার বিষয়। এবং, দু'জনের প্রিয় বিষয় আবার এক নয়।

(1) অমিতের প্রিয়বিষয় রেখাগণিত বা আনন্দের অধ্যাপনার বিষয়। (2) উমেশের অধ্যাপনার বিষয় হল জ্যোতির্বিজ্ঞান। (3) ঈশানের প্রিয় বিষয় পরিসংখ্যান। (4) বলবিদ্যা হল তাঁর অধ্যাপনার বিষয় যাঁর প্রিয় বিষয় ইন্দুর অধ্যাপনার বিষয়। (5) উমেশের প্রিয় বিষয় বীজগণিত। (6) আনন্দের প্রিয় বিষয় বলবিদ্যা।

প্রশ্ন: বীজগণিত কার অধ্যাপনার বিষয়?

সারণি সম্বন্ধে প্রাথমিক দু-চার কথা:

m-সংখ্যক সারি ও n-সংখ্যক স্তম্ভে m n সংখ্যক পদ বসিয়ে একটি m × n ক্রমের সারণি গঠিত হয়। যেমন A, B I, J হল চারটি সারণি।

$$A=\begin{pmatrix}7 & 8 & -4\\ 3 & 0 & 5\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}s & p & b\\ l & m & n\\ x & y & z\end{pmatrix},$$

$$I=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\quad J=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

A সারণিতে আছে দুটি সারি ও তিনটি স্তম্ভ। সেজন্য এটি হল একটি 2 × 3 সারণি। আয়ত সারণির এটি একটি উদাহরণ। এর সারি ও স্তম্ভের সংখ্যা অসমান। এটিতে আছে মোট ছয়টি পদ।

আবার, B সারণিতে আছে তিনটি সারি ও

*গণিত বিভাগ, বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়, ইটাচুনা, হুগলী।

তিনটি স্তম্ভ। এটি 3×3 সারণি। সারি ও স্তম্ভের সংখ্যা সমান বলে এটিকে বলা হয় বর্গ সারণি। এটিতে আছে মোট নয়টি পদ। কোন পদের অবস্থান বোঝাতে হলে সেই পদটি কোন্ সারি ও কোন্ স্তম্ভের অন্তর্গত তার উল্লেখ করতে হয়। এই সারণির দ্বিতীয় সারি ও তৃতীয় স্তম্ভের ছেদবিন্দুতে আছে n; অর্থাৎ, n হল দ্বিতীয় সারি ও তৃতীয় স্তম্ভের সাধারণ পদ। সেজন্যে n হল (2, 3) পদ। প্রথম সংখ্যা 2 হল সারি-অঙ্ক, দ্বিতীয় সংখ্যা 3 হল স্তম্ভ-অঙ্ক। আবার ঐ সারণির (3, 2) পদ হল y। সাধারণতঃ এই পদ দুটি ভিন্ন হয় অর্থাৎ, সারি-অঙ্ক ও স্তম্ভ-অঙ্কের ক্রম বদলালে পদ দুটি সাধারণতঃ বদলে যায়। s, m, z পদগুলি হল যথাক্রমে (1, 1), (2 2) ও (3, 3)। এদের সারি-অঙ্ক, স্তম্ভ-অঙ্কের সমান। এই তিনটি পদ নিয়ে প্রধান কর্ণ গঠিত হয়েছে। গৌণ-কর্ণ গঠিত হয়েছে b, m, x পদ তিনটি নিয়ে।

I একটি একক 3×3 সারণি। এর প্রধান কর্ণের প্রতিটি পদ 1 (এক) এবং অন্যস্থানের প্রতিটি পদ 0 (শূন্য)। J সারণির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারি যথাক্রমে I সারণির দ্বিতীয়, তৃতীয় ও প্রথম সারি। J সারণির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তম্ভ যথাক্রমে I সারণির তৃতীয়, প্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভ। সেজন্যে J সারণি I সারণির একটি রূপান্তর। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে I অথবা J সারণির প্রতি লাইনে (অর্থাৎ, সারিতে বা স্তম্ভে) মাত্র একটি করে 1 আছে। যে অবস্থানে 1 আছে সেই সারি বা স্তম্ভ বরাবর অন্য অবস্থানে প্রতি জায়গায় 0 (শূন্য) আছে। যদি B সারণি I বা J সারণির সমরূপ হয় এবং $y=1$ হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ আমরা $x=0$, $z=0$, $p=0$, $m=0$ লিখতে পারি।

মূল বিষয়ের আলোচনায় এবারে আমরা ফিরে যাই। উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে যে সারণি ব্যবহৃত হয় তার আকার I অথবা J এর অনুরূপ। সাধারণতঃ 'সত্য বাক্য' 1 ও 'মিথ্যা বাক্য' 0 দ্বারা সূচিত হয়। যদি কোন বাক্য 'সত্য বাক্য' বলে প্রতিভাত হয় তাহলে তার বিপরীত বাক্যগুলি নিঃসন্দেহে মিথ্যা বাক্য' হবে। নীচের বাক্যগুলি লক্ষণীয়।

(ক প্রতি সকালে সূর্য উত্তর আকাশে ওঠে।

(খ) প্রতি সকালে সূর্য পূর্ব আকাশে ওঠে।

(গ) প্রতি সকালে সূর্য দক্ষিণ আকাশে ওঠে।

(ঘ) প্রতি সকালে সূর্য পশ্চিম আকাশে ওঠে।

একই সঙ্গে এই চারটি বাক্য 'সত্য বাক্য' হতে পারে না। (খ) বাক্যটি একটি 'সত্যবাক্য'। সেজন্য (ক), (গ), (ঘ) বাক্যগুলির প্রত্যেকটিই 'মিথ্যা বাক্য'। তাহলে (ক) 0, (খ) 1, (গ 0, (ঘ) 0.

প্রথম সমস্যার সমাধা- :

	অমলবাবু	সরলবাবু	কমলবাবু
ইতিহাসের অধ্যাপক	l	m	n
সাহিত্যের অধ্যাপক	f	g	h
দর্শনের অধ্যাপক	x	y	z

	সাদা	কালো	গেরুয়া
ইতিহাসের ছাত্র	L	M	N
সাহিত্যের ছাত্র	F	G	H
দর্শনের ছাত্র	X	Y	Z

3) থেকে কমলবাবু ইতিহাসের অধ্যাপক নন,

$\therefore$ $n=0$

(1) থেকে $X=1$. তাহলে $L=0$, $F=0$, $Y=0$, $Z=0$

(2) ও (5) ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা ছাত্রটি সাহিত্যের নয়, দর্শনের নয়। তাহলে সে ইতিহাসের ছাত্র। $\therefore$ $M=1$ তাহলে $N=0$, $G=0$, $Y=0$, $\therefore$ $H=1$.

(4) থেকে সরলবাবু সাহিত্যের অধ্যাপক।

$\therefore$ $g=1$ তাহলে $m=0$, $y=0$, $f=0$, $h=0$

$\therefore$ $l=1$, $z=1$, $x=0$.

$\therefore$ অমলবাবু ইতিহাসের অধ্যাপক।

দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান :

পাঁচজন অধ্যাপকের নামের আদ্যক্ষরগুলি হল

অ, আ, ই, ঈ, উ এবং পাঁচটি বিষয়ের আদ্যক্ষরগুলি বী, রে, প, ব, জ্যো।

	অধ্যাপনার বিষয়					প্রিয় বিষয়				
	বী	রে	প	ব	জ্যো	বী	রে	প	ব	জ্যো
অ	a	b	c	d	e	A	B	C	D	E
আ	f	g	h	i	j	F	G	H	I	J
ই	k	l	m	n	p	K	L	M	N	P
ঈ	q	r	s	t	u	Q	R	S	T	U
উ	v	w	x	y	z	V	W	X	Y	Z

(1) থেকে $B=1$, তাহলে $A=C=D=E=G=L=R=W=0$;

(1) থেকে $g=1$, তাহলে $f=h=i=j=b=l=r=w=0$;

(2) থেকে $z=1$, তাহলে $v=w=x=y=e=j=p=u=0$ এবং $Z=0$;

(3) থেকে $S=1$, তাহলে $Q=R=T=U=C=H=X=0$ এবং $s=0$;

(5) থেকে $V=1$, তাহলে $W=X=Y=Z=A=F=K=Q=0$;

(6) $I=1$, তাহলে $F=G=H=J=D=N=T=Y=O$.

$\therefore$ $P=1$ এবং $K=L=M=N=E=J=U=Z=0$.

(4) থেকে ইন্দুর অধ্যাপনার বিষয় বলবিদ্যা নয়; অর্থাৎ $n\neq 1$. $\therefore$ $n=0$

এখন $d=1$ বা 0 হতে পারে।

কিন্তু $d\neq 1$ [$d\neq 1$ হলে (4) থেকে $l=1$, ইহা অসম্ভব কারণ পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে $l=0$.

$\therefore$ $d=0$ এবং সেজন্য $t=1$, $q=0$

$t=1$ অর্থাৎ বলবিদ্যা হল ঈশানের অধ্যাপনার বিষয়।

(3 থেকে ঈশানের প্রিয় বিষয় পরিসংখ্যান $(S=1)$

(4) থেকে ইন্দুর অধ্যাপনার বিষয় পরিসংখ্যান; অর্থাৎ, $m=1$, তাহলে $c=0$, $k=0$ এবং $a=1$

$a=1$ অতএব বীজগণিত অমিতের অধ্যাপনার বিষয়।

পরম শূন্যতার কাছাকাছি

এতকাল নিম্নতম উষ্ণতা মাপার যে রেকর্ড ছিল, তা হল 0 0000063 K; এটি ফরাসী ও আমেরিকান বিজ্ঞানীদের যৌথ কীর্তি। সম্প্রতি এই রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন একদল ফিনল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী, যাঁর পুরোধা ছিলেন অধ্যাপক অলি লুনাসমান। এঁরা একটি ভূগর্ভে প্রোথিত তাম্রখণ্ডকে যে মাত্রায় শীতল করেছেন তার পরিমাপ 0·00000003 K; অর্থাৎ, পরম শূন্যের দশকোটি ভাগের তিনভাগ!

ভাবান্তর বিভাগ

কূটাভাস

মূল লেখক : ই. পি. নর্থোপ*

ভাষান্তর : যুগলকান্তি রায়

ভাবুন, কোনো এক শহর ছেড়ে চলে গেল দুই বাবা ও দুই ছেলে। এতে সেই শহরের জনসংখ্যা কমে গেল। কত? —তিন।

এ সিদ্ধান্ত কি মিথ্যা?

না, সত্য। সত্য—যদি ঐ তিনজন—বাবা, ছেলে ও নাতি হয়!

ভাবুন, পরপর তিনখণ্ড বই আছে। একটি পোকা প্রথম খণ্ড বইয়ের সামনের মলাটের বাইরে থেকে খেতে সুরু করে, তৃতীয় খণ্ড বইয়ের পিছনের মলাটের বাইরে পৌছল। যদি প্রত্যেক খণ্ড বই এক ইঞ্চি পুরু হয়, তাহলে পোকাটি নিশ্চয় মোট তিন ইঞ্চি গর্ত করেছে। হিসেবটা কি ঠিক?
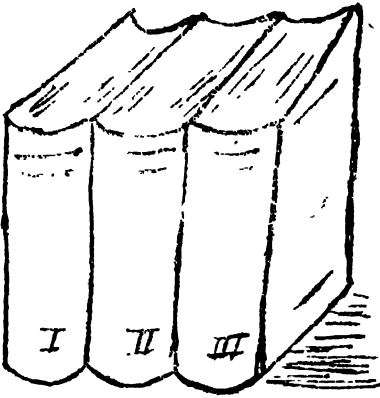
না, ভুল। ছবিটির দিকে তাকান। খণ্ড তিনটি বিশেষভাবে সাজালে, পোকাটি শুধু দ্বিতীয় খণ্ডটি অর্থাৎ মাত্র এক ইঞ্চি ছিদ্র করেছে।

ভাবুন, একটি লোক বলল: আমি মিথ্যা বলছি। তার এ উক্তি কি সত্য?

যদি তাই হয়, তাহলে সে মিথ্যা বলছে; সুতরাং তার 'বিবৃতি' মিথ্যা। তার উক্তি কি মিথ্যা? তাহলে সে মিথ্যা বলছে; সুতরাং তার উক্তি সত্য!

অভিধানে লেখা থাকে দ্বীপ হল 'জল দিয়ে সম্পূর্ণ ঘেরা একটি স্থলভাগ' এবং হ্রদ হল 'স্থল বেষ্টিত জলভাগ'। মনে করা যাক্, উত্তর গোলার্ধ সম্পূর্ণ স্থল এবং দক্ষিণ গোলার্ধ সম্পূর্ণ জল।

তাহলে কি উত্তর গোলার্ধ 'দ্বীপ'—এবং দক্ষিণ গোলার্ধকে 'হ্রদ' বলা যাবে?

উপরে যে উদাহরণগুলি বলা হল—তাকে 'কূটাভাস' (paradox) বা কূট বলা হয়। অর্থাৎ, কূটাভাস - প্রথমে মিথ্যা মনে হলেও আসলে সত্য, অথবা, পরস্পর বিরোধী। সময় সময় মনে হয় আমরা বুঝি যথার্থ অর্থ থেকে সরে যাচ্ছি। কিন্তু ধৈর্য ধরলেই দেখবেন, আপনার কাছে যা স্ফটিকের মত পরিষ্কার, অন্যের কাছে হয়তো তা নাও হতে পারে।

ওপরের উদাহরণগুলিরই কথা ধরা যাক্। এতে

* ই. পি. নর্থোপ Riddles in Mathematics-এর "What is a Paradox ?" এর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ

যে সব ঘোরালো জটিল ব্যাপারগুলি বলা হয়েছে—তা শুধু গণিতের ছাত্রই নয়, কখনো কখনো একজন পাকা মাথার গণিতজ্ঞকেও ভাবনায় ফেলে থাকে।

বাবা-ছেলের ঐ প্রথম সমস্যার কথা ধরা যাক্। এ সব ক্ষেত্রে সমাধানের জন্য আমরা প্রথম এখানে ওখানে এমন একটি ঘটনা খোঁজার চেষ্টা করি যা ঐ উদাহরণটির শর্ত পূরণ করে। প্রথমে, আপাত-দৃষ্টিতে কিন্তু মনে হয়—এমন ব্যাপার হতেই পারে না। সাধারণ বুদ্ধি এবং সহজাত সিদ্ধান্তও (intuition) এই কথাই বলে। কিন্তু, হঠাৎই এর একটা খুব সহজ সমাধানও মিলে যায়। গণিতের গবেষণায় দেখা গেছে, পরপরই এমন ঘটনা ঘটে।

গণিতজ্ঞ কোনো তত্ত্ব বা গণিতের সমস্যা নিয়ে ভাবতে ভাবতে এমন সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হন যা একান্তই অসম্ভব মনে হয়। তখন তিনি এমন একটি বাস্তব উদাহরণ খুঁজতে সুরু করেন যা ঐ সমস্যাজনক পরিস্থিতির সংগে খাপ খায়। অবশ্য—এর জন্যে তাঁকে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমন কি মাসের পর মাসও পরিশ্রম করতে হতে পারে। তারপর, আমাদের আগের উদাহরণগুলির মত, হঠাৎই একসময় সহজ এবং আসল সমাধান এসে যায়। তখনই গণিতজ্ঞ অবাক বিস্ময়ে ভাবেন—এত সহজ সমাধান আগে কেন তাঁর মাথায় আসছিল না?

এ-কথা আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করি যে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আমরা যুক্তিকে অনেক সময় বিপথে চালনা করি। বইয়ের পোকার সমস্যাটি ঐ জাতীয় দ্রুত সিদ্ধান্তের একটি চমৎকার উদাহরণ। অর্থাৎ, সমস্যার সবদিক ঠাণ্ডা মাথায় না ভাবাই—আমাদের ভুল সিদ্ধান্ত করায়।

বহু গুরুত্বপূর্ণ কূটাভাসের বা কূটতর্কের একটি বিখ্যাত উদাহরণ হল ঐ স্ববিরোধী মিথ্যাবাদীর উদাহরণটি। এটি প্রথম মাথায় এসেছিল গ্রীক দার্শনিকদের। প্রধানতঃ তর্ক-বিতর্কের সময়, বিরোধীদের জব্দ ও বিমূঢ় করার জন্য তাঁরা এমনি সব কূটাভাস সৃষ্টি ও ব্যবহার করতেন। পরবর্তীকালে কিন্তু, এই কূটাভাসগুলিই গণিতের নানা ধ্যানধারণার বহু বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

হ্রদ ও দ্বীপের সংজ্ঞা ও তার থেকে যুক্তির সাহায্যে দ্বীপ-হ্রদ সমস্যাটির আমরা সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করি। গণিতের যে কোন তত্ত্বের বিকাশ এভাবেই হয়। সংখ্যা, বা বিন্দু, বা রেখা বা অন্য যা কিছু নিয়েই গণিতজ্ঞ কাজ শুরু করুন না কেন প্রথমে তিনি ঐগুলির সংজ্ঞা দেন। তারপর তিনি কতকগুলি নিয়ম বের করেন যেগুলির তিনি নাম দেন 'স্বতঃসিদ্ধ' (Axiom অথবা 'স্বীকার্য' (Postulate)। তিনি আগে যেগুলির সংজ্ঞা দিয়েছেন সেগুলি কি রকম কি আচরণ করবে তা ঐ নিয়মগুলিই স্থির করে দেবে। এর উপর ভিত্তি করে যুক্তির সাহায্যে তিনি একের পর এক গাণিতিক সিদ্ধান্তে আসেন যার যে কোন একটি তার আগের সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভরশীল। তিনি সংজ্ঞা বা স্বতঃসিদ্ধের সত্যতা নিয়ে মাথা ঘামান না। তিনি শুধু চান তাঁর কাজ সঙ্গতিপূর্ণ হবে অর্থাৎ—তাঁর কাজের মধ্যে পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত থাকবে না (যেমন, আমাদের মিথ্যাবাদীর সমস্যায় আছে)। আমরা যে কথা বলতে চাইছি বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর 'Mysticism and Logic'—বই এ সে কথাই বলতে গিয়ে বলেছেন, "বিশুদ্ধ গণিত এমনই কতকগুলি অঙ্গীকার নিয়ে সৃষ্টি যার অর্থ হল,—যদি এই-এই কথা সত্য হয় তাহলে এমন-এমন অন্য কথাও সত্য হবে। প্রথম কথাটি প্রকৃতই সত্য কিনা তা যেমন তাঁর দেখার কোন প্রয়োজন নেই তেমনি যা সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে তার কোন উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

সুতরাং গণিত হল এমন একটি বিষয় যেখানে আমরা যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করছি সেগুলি কি-জানি না এবং যা আলোচনা করছি—তাও সত্য কিনা, জানি না।"

—তাহলে, এটিও কি একটি 'কূটাভাস'?

সারা ভারত গণ-বিজ্ঞান আন্দোলন কনভেনশন

সুব্রত পাল*

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিজ্ঞান ও সমাজ কর্মীদের মধ্যে ক্রমশঃ এ উপলব্ধি তীব্রতর হচ্ছে যে আমাদের দেশের বিজ্ঞানের শিক্ষা, গবেষণা ও ব্যবহারিক প্রয়োগের সাথে ব্যাপক জনসাধারণের সমস্যা বা চাহিদার যোগাযোগ অত্যন্ত সীমিত। অথচ কি বিশাল ক্ষমতা এবং সম্ভাবনাই না ছিল এ বিজ্ঞানের! আমাদের দেশের অনাহার ও দারিদ্র, নিরক্ষরতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও অবক্ষয়ী আচার-আচরণ, বিপুল সম্পদের অপচয়—এ সকল এবং সাধারণ মানুষের আরো অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারত বিজ্ঞান।

বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার সুফল আমাদের দেশের গরীব মানুষ প্রায় ভোগ করতে পারেন নি বললেই চলে এবং শুধু তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত পদ্ধতি ও কৌশল তাদের দুর্দশাকে বরং বাড়িয়েই তুলেছে। কারণ খুব অস্পষ্ট নয়—কৃষি, শিল্প ইত্যাদির মত বিজ্ঞানকেও মুষ্টিমেয়র হাত থেকে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করা হয় নি। স্বভাবতই বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করা যায় নি বা করার চেষ্টা হয় নি, অথবা ভিক্তভাবে বললে করতে চাওয়াই হয় নি।

অবশ্য সুখের কথা যে এমন হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার মধ্যেও বা বলা যায় এমন অবস্থার জন্যই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বহু স্বেচ্ছামূলক সংস্থা গড়ে উঠেছে যারা বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এদের কর্মধারা বিভিন্ন কোন কোন সংস্থার কাজকর্ম কেবলমাত্র বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণেই সীমাবদ্ধ, অন্যদিকে কেউ কেউ প্রগতিশীল সামাজিক রূপান্তরের জন্য সাধারণ মানুষকে বৈজ্ঞানিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চায় যাতে তারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক গতিপ্রকৃতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে শেখেন। এ সমস্ত সংস্থাগুলোর নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী বা লক্ষ্য খুবই স্বচ্ছ তাও নয়। তবে তাদের আত্ম-ত্যাগ এবং আন্তরিকতা অনস্বীকার্য।

এদের মধ্যে একমাত্র "কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ" ছাড়া প্রায় অন্য সকলেরই কাজকর্ম খুবই সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকেছে—যদিও সীমিত এলাকাগুলোতে তাদের অনেকেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। কিন্তু যদিও সারা দেশজুড়ে একটা প্রকৃত 'বিজ্ঞান আন্দোলন' গড়ে তুলতে হয় তবে এ সমস্ত গোষ্ঠী এবং সংস্থাগুলোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও তাদের কর্মধারার মধ্যে একটা সমন্বয় বিধান একান্তই জরুরী। তাই প্রাথমিকভাবে এদের মধ্যে একটা যোগসূত্র গড়ে তোলার জন্য কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে গত 10 থেকে 12 নভেম্বর ত্রিবান্দ্রমে গণ-বিজ্ঞান আন্দোলনের এক সারা ভারত কনভেন্শন্ (All India Convention of People's Science Movements) অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক প্রতিনিধি কনভেনশনে উপস্থিত থেকে নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যতে কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করেন।

---

*জীবপদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

কনভেনশনে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে ছিল—'বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রুপ' 'শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ', 'শ্রমিক সংগঠন', 'ভূমিসেনা', 'ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' ও 'ভীমশক্তি তরুণ মণ্ডল' (সকলেই মহারাষ্ট্র), 'গ্রাম বিকাশ মণ্ডল', 'বিজ্ঞান চক্র' 'অ্যাষ্ট্রা' ও 'আশা' (কর্ণাটক); 'বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা' (তামিলনাড়ু); 'বিদূষক কারখানা' ও 'কিশোর ভারতী' (মধ্যপ্রদেশ); 'সি এস. আই আর, 'তরুণ বিজ্ঞানী সমাজ' (দিল্লী); 'সি. এস. আই. আর' 'আঞ্চলিক প্রকল্প', 'কমিউনিটি সংগঠন কর্মসূচী' ও 'শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ' (কেরালা); এবং 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান-কর্মী সংস্থা' বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' এবং 'স্বাস্থ্য ও শিক্ষানীতি গ্রুপ' (পশ্চিমবঙ্গ)।

কনভেনশনে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল (1) পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভূত শিক্ষা (formal and non-formal education), (2) গণস্বাস্থ্য আন্দোলন (people's health movements), (3) বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যা (science research and technology) এবং (4) সমাজ বিপ্লবের জন্য বিজ্ঞান (science for social revolution)। আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটা খসড়া পত্র উপস্থিত করা হয়। নিছক 'তত্ত্বমূলক' উপস্থাপনা নয়, এগুলো ছিল কার্যক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রামাণ্য খসড়া। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থা তাদের কাজকর্মের সংক্ষিপ্ত রিপোর্টও পেশ করে।

পাঠক্রম অন্তর্গত শিক্ষার ত্রুটিগুলো আলোচনা করে প্রতিনিধিরা শিক্ষাক্রমের আমূল পরিবর্তন দাবী করেন। তাঁরা এমন এক শিক্ষাক্রম চালু করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন যা ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। শিক্ষাকে কর্মমুখী করা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে আবশ্যিক করার পক্ষেও মতামত ব্যক্ত করা হয়। এ উদ্দেশ্যে পাঠক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষা সামগ্রীর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসতে কনভেনশন থেকে আহ্বান জানান হয়। উল্লেখ্য যে কনভেনশনে অংশগ্রহণকারী কিছু কিছু সংস্থা এর মধ্যে এ কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে।

সাথে সাথে কনভেনশন অবশ্য মনে করিয়ে দিয়েছে যে ক্ষমতাশালী কায়েমী স্বার্থগুলোর বাধা অতিক্রম করতে না পারলে এ সকল প্রচেষ্টার আশানুরূপ সাফল্যলাভ করা যাবে না। তাই পাঠক্রম-শিক্ষার পাশাপাশি পাঠক্রম-বহির্ভূত শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য কনভেনশন গণআন্দোলনের সংস্থা ও কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পাঠক্রম-বহির্ভূত শিক্ষাকে প্রথমতঃ পাঠক্রম-অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে কাজে লাগাতে হবে। শুধু তাই নয়, দেশের জনসাধারণের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যাঁরা প্রচলিত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাঁদের মধ্যেও পাঠক্রম-বহির্ভূত শিক্ষাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছামূলক সংস্থা ও গণসংগঠনগুলোকে উদ্যোগ নিতে হবে। মনে রাখা উচিত আমাদের দেশে শতকরা 75 জন শিশু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েও চতুর্থ শ্রেণীর গণ্ডী পেরোবার আগেই পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

পাঠক্রম-বহির্ভূত শিক্ষার ভূমিকা সম্বন্ধে কনভেনশনের মতামত হচ্ছে যে এর মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষকে তার সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা উচিত। এক কথায় জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা এবং আত্মপ্রত্যয় ও আত্ম-অধিকারবোধ জাগিয়ে তোলাই এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

শিক্ষার ওপর আলোচনার সময় গণস্বাস্থ্য আন্দোলনের ওপরেও যথেষ্ট সময় ও গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রতিনিধিরা এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে আমাদের দেশের বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা বেশীর ভাগ মানুষের স্বাস্থ্যের প্রতি প্রয়োজনীয় যত্ন নেয় না। এক বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা ও স্বাস্থ-নীতি প্রস্তাব করার জন্য কনভেনশন গণস্বাস্থ্য আন্দোলনের সদস্যদের আহ্বান জানায় ও সাথে সাথে চিকিৎসার পেশায়

নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক নতুন মানসিকতা গড়ে তোলার সম্বন্ধে সকলকে সচেতন হতে আহ্বান জানায়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার গবেষণা সম্বন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে আমূল সামাজিক পরিবর্তন ছাড়া গবেষণাকে পুরোপুরি জনমুখী করে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমান গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সেখানে নিযুক্ত কর্মীদের সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটানোর জন্য চেতনাসম্পন্ন বিজ্ঞানীদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। বিজ্ঞানীদের এ মনোভাব পরিত্যাগ করা উচিত যে তারা 'বাইরে' থেকে বা 'ওপর' থেকে সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। সাধারণ মানুষ থেকেও তাঁদের অনেক কিছু শেখার আছে। এর জন্য বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা একান্তই অপরিহার্য।

সামাজিক রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে কনভেনশন এ সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, দেশের বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রযুক্তিবিদ্যাগত উদ্ভাবন ও সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধরণের উদ্ভাবন অবশ্যম্ভাবীরূপে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারের দাবী ও আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে। আন্দোলনের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক সংগঠন এবং এই তিনটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। 'বিজ্ঞান আন্দোলন'কে সাধারণ গণ-আন্দোলনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গড়ে তুলতে পারলেই এর প্রসার ও বিকাশ সুনিশ্চিত হবে। আমূল সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে বিজ্ঞান আন্দোলনও তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। 'সমাজ বিপ্লবের জন্য বিজ্ঞান' শীর্ষক আলোচনায় এবিষয়ে জোর দেওয়া হয়।

উল্লেখযোগ্য যে এই প্রথম এধরণের একটা সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ভবিষ্যতে কনভেনশনে যোগদানকারী এবং তাছাড়াও আরও বহু স্বেচ্ছাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ গড়ে উঠবে এবং তার মাধ্যমে সারা ভারত জুড়ে একটা প্রকৃত ও ব্যাপক বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলা যাবে—এ আশাই কনভেনশনে ধ্বনিত হয়েছে।

[গত 10-12 নভেম্বর, 1978 ত্রিবান্দ্রমে সারা ভারত গণ-বিজ্ঞান আন্দোলনের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহযোগী কর্মসচিব শ্রীসুব্রত পাল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন।]

বিজ্ঞান প্রসার পরিচিতি

হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ

হাওড়ায় কিছু উৎসাহী বিজ্ঞানানুরাগী ছাত্র ও শিক্ষক মিলে 1968 সালে যে হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজ যে প্রতিষ্ঠান নানা শিক্ষানুরাগী ও সক্রিয় কর্মীর কর্মযোগে একটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান।

এঁদের নিয়মিত কর্মসূচীর মধ্যে আছে (1) জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা (2) পাঠাগার (3) 'লোকবিজ্ঞান' নামে প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকা (4) মডেল সেণ্টার নামে বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরির কেন্দ্র (5) স্থানীয় অঞ্চলের নানা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা, এবং (6) ছাত্রছাত্রীদের জন্য নানা বিষয়ক বক্তৃতা প্রভৃতি প্রতিযোগিতা।

এ পর্যন্ত এঁরা প্রায় পঞ্চাশটি জনপ্রিয় বিজ্ঞানের উপর আলোচনাচক্র করেছেন। এঁদের পাঠাগারটি নানা বিজ্ঞান গ্রন্থে সমৃদ্ধ। এতে শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, দক্ষিণ কলকাতার অ্যাপেক্স ক্লাব ও ব্রিটিশ কাউন্সিলও নানা গ্রন্থ দান করেছেন। মডেল সেণ্টারের নানা মডেল, আঞ্চলিক ও সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে প্রশংসা অর্জন করেছে।

বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা সূচীতে এঁরা—হাওড়ার শিল্পে পেশাগত রোগ, হাওড়ার কাষ্ঠোপযোগী বৃক্ষ, এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হাওড়ায় গো-পালন প্রকল্প নিয়ে সমীক্ষা করেছেন।

এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি 'বিজ্ঞান পুস্তক মেলা' 'কৃষ্টি মেলা' প্রভৃতি আয়োজন করেছেন।

প্রতিষ্ঠানটির বহুমুখী কর্মধারা ও বিজ্ঞান প্রসারের এই উদ্যমে আমরা অভিনন্দন জানাই ও উত্তরোত্তর বিস্তৃততর কর্মসূচী ও তার সাফল্য কামনা করি।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর আলোচনা

'শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি' এবং বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা 'গবেষণা'র যৌথ উদ্যোগে 30শে জানুয়ারী '79 অপরাহ্নে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জনাকীর্ণ ভাষণকক্ষে প্রকৃতি-বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের বিজ্ঞান-কর্ম বিষয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয়ে বক্তৃতা দেন ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক আর. এল. ব্রহ্মচারী এবং সভায় পৌরোহিত্য করেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ ডঃ এস. সি. ভট্টাচার্য। বক্তৃতার পরে শ্রীতুষারকান্তি দত্ত কীট-পতঙ্গের বিষয়ে প্রায় দেড়-শ' অসাধারণ সুন্দর রঙীন স্লাইড প্রদর্শন করেন। বিজ্ঞান-কর্মী, সাধারণ মানুষ এবং ছাত্রছাত্রী সমাগমে সভাটি জনাকীর্ণ ছিল।

সভার সুরুতে গবেষণা পত্রিকার সম্পাদক শ্রীআশিস সিংহ সমবেত সুধীজনকে স্বাগত জানিয়ে বলেন: অ্যাকাডেমিক বিজ্ঞানচর্চা এবং প্রকৃতি বীক্ষণ একে অপরের পরিপূরক। 60-70 বছর আগে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র এবং তারপরে আচার্য সত্যেন বসু, আচার্য মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিজ্ঞানীর সাধনায় এদেশে অ্যাকাডেমিক বিজ্ঞানচর্চা যখন একটি বেগবান প্রবাহ লাভ করেছিল তখন সেই প্রবাহের পাশাপাশি আমরা জগদানন্দ রায়, সত্যচরণ লাহা, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের পেয়েছিলাম। ইদানীং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিজ্ঞান সংঘগুলি যৌথভাবে এবং অনেকে একক উদ্যোগে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সাধনায় যখন রত হয়েছেন তখন অগ্রজ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচিতি লাভ একটি অবশ্য কৃত্য।

অধ্যাপক ব্রহ্মচারী বলেন : গোপালচন্দ্র সারা জীবনে পোকামাকড়ের ওপর কাজ করেছেন। এদের মধ্যে তিনটি কাজ বিশ্বের প্রথম সারির আবিষ্কাররূপে গণ্য হবার যোগ্য। 1940 সালে গোপালবাবু স্বচ্ছ সেলোফেন কাগজের সাহায্যে নালসো পিঁপড়ের বাসা তৈরি করিয়ে তার ভিতরে গভীর পর্যবেক্ষণ চালান। এর ফলে তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, বসন্ত এবং গ্রীষ্মে আম, জাম প্রভৃতি পাতা খেতে দিলে শ্রমিক পিঁপড়ের পাড়া ডিম থেকে স্ত্রী এবং পুরুষ পিঁপড়ের উৎপত্তি হয়, কিন্তু অন্যান্য প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য দিলেও তা হয় না। এইসব পাতায় সে সময়ে প্রচুর ভিটামিন বি$_1$ থাকে। কিন্তু শুধু ভিটামিন বি$_1$ সমৃদ্ধ খাদ্যে এই পরিবর্তন হয় না। সে সময়ে গোয়েৎস, উইলসন প্রমুখ জার্মান ও ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তের কাছাকাছি আসতে পারলেও—এতদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। গোপালবাবুর এই কাজটি যুদ্ধের সময়ে বোস ইনস্টিটিউটের 'ট্রানজ্যাক্‌সান্‌স্‌'-এ প্রকাশিত হয়; হয়তো সেই কারণেই বিশ্বে বহুল প্রচারিত হতে পারে নি। গোপালবাবু কানকোটারি পোকার ওপর একটি কৌতূহলোদ্দীপক আবিষ্কার করেন। এই পোকা ডিম পাড়বার সময়ে পিছনের দুটি পায়ে কাদা মাখিয়ে শক্ত করে রাখে এবং এর সাহায্যে শত্রুকে লাথি মারে, যেন বুট পরে লাথিটাকে আরও জোরালো করে নেওয়া হচ্ছে। ঐ সময়ে কাদা ধুয়ে দিলে আবার সে কাদা মাখিয়ে নেয়। পোকাটির এই যন্ত্র ব্যবহার প্রবণতা অন্য সময়ে লক্ষ্য করা যায় না। ব্যাঙাচির ব্যাঙে রূপান্তর বিষয়ে গোপালবাবু একটি চমকপ্রদ আবিষ্কার করেন। তিনি দেখেন এই রূপান্তরের জন্য ব্যাঙাচির দেহে বসবাসকারী কিছু ব্যাক্টিরিয়া দায়ী। পেনিসিলিনের সাহায্যে ঐ ব্যাক্টিরিয়া ধ্বংস করে দিলে ব্যাঙাচি আর ব্যাঙে রূপান্তরিত হয় না। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ব্রহ্মচারী প্যালোজিনিক ব্যাক্টিরিয়া বা স্বাস্থ্যদায়িনী জীবাণু সম্বন্ধে কিছু বলেন।

বিজ্ঞান-বক্তৃতার আগে সভাপতির ভাষণে ডঃ এস. সি. ভট্টাচার্য গোপালচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীবিজয় বল।

সি. ভি. রামন স্মরণে সেমিনার

গত 19শে নভেম্বর'78 চুঁচুড়ার দেশবন্ধু মেমোরিয়াল হাইস্কুলে 'চিনসুরা সায়ান্স ক্লাবের' উদ্যোগে বিশ্বশ্রুত বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের নব্বইতম জন্মদিবস পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে শ্রীরণজিৎ চ্যাটার্জী 'সি. ভি. রামনের 'কর্ম ও জীবন' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী প্রদর্শনী

বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত 10—13 জানুয়ারি একটি মনোজ্ঞ 'বিজ্ঞান ও কলা প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলাবিভাগের রুচিস্নিগ্ধ প্রদর্শনীটি তথ্য সমৃদ্ধ; বিশেষ করে প্রাচীন কলকাতা অংশটি কৌতূহলোদ্দীপক ছিল। বিজ্ঞান বিভাগের মধ্যে গণিত, উদ্ভিদ ও জীববিদ্যা, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার নানা মডেল, চার্ট প্রদর্শিত হয়। গণিত ও পদার্থবিদ্যার বিশেষ কতকগুলি বিষয় প্রদর্শিত বিশেষ প্রশংসনীয়।

আবহবিদ্যার সমুন্নতি

আবহবিদ্যা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের যে আন্তর্জাতিক প্রয়াসের সূচনা হইয়াছে, তাহা আকারে ও প্রকারে বৃহত্তম আন্তর্জাতিক প্রয়াসের সূচনা। এক শত চল্লিশটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের পাঁচ হাজার বৈজ্ঞানিক ও পূর্তবিজ্ঞানী আবহবিদ্যার উন্নতি সাধিত করিবার সংকল্প লইয়া এই পরিকল্পনার অংশীদার হইয়াছেন। পরিকল্পনাটি সূচনায় প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের যৌথ প্রয়াসে সংগঠিত হইলেও বিশ্বের অন্যান্য ছোট-বড় রাষ্ট্র এবং বিশেষ করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া এই পরিকল্পনার সহিত প্রত্যক্ষ সহযোগিতার সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়াছে। প্রচারিত সংবাদে বলা হইয়াছে—'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার উপগ্রহগুলি উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তারিত জলস্থল ও আকাশের যাবতীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবে। তাহারা প্রতি অর্ধ ঘণ্টা পর-পর ইনফ্রা-রেড ছবি পৃথিবীতে প্রেরণ করিতে নিযুক্ত থাকিবে।' পরিকল্পনা এই বৎসরের পয়লা ডিসেম্বর তারিখে প্রচলিত করা হইয়াছে, এবং আগামী বৎসর (1979 সাল) নভেম্বরের ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত প্রচলিত থাকিবে। এই উদ্যোগে বিশ্বের সমগ্র জল-স্থল ও আকাশের একটি আত্যন্তিক সমীক্ষা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। এবং ইহাই এইরূপ প্রথম পরীক্ষা।

লক্ষ্য করিতে হয় যে, বিশ্বজনজীবনেরই পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ এহেন এক পরিকল্পনার সূচনা করিবার কালে বড় রকমের কোন আনুষ্ঠানিক সমারোহ এবং প্রচারের ঘটা দেখা যায় নাই। ভারত যখন এই উদ্যোগে একজন প্রধান অংশভাক্ তখন পরিকল্পনায় নিহিত বিবিধ কর্তব্যের সহিত ভারতের দায়িত্ব কীভাবে এবং কতটা নিয়ামিত করা হইয়াছে, তাহা ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে একটু বিশেষ করিয়া জানিবার প্রয়োজন ছিল। সংবাদ হইতে শুধু ইহাই বুঝিতে হয় যে ভারতীয় এবং মার্কিন বৈজ্ঞানিকেরা আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের এবং ভারত মহাসাগরেরও অঞ্চলে নিম্ন বায়ুমণ্ডলে সমীক্ষা করিয়া বুঝিবেন যে, ঠিক কী ধরনের চাপ এবং ক্ষতিকর চাঞ্চল্য এই নিম্ন বায়ুমণ্ডলে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই তথ্য বিশেষভাবে সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতীয় ও মার্কিন বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিবে। অধিকন্তু বর্ষাকালে এই দুই সমুদ্র অঞ্চলে বারিপাত কী রীতিতে নিষ্পন্ন হয় তাহাও পর্যবেক্ষণ করা হইবে। ত্রিশটি গবেষণা জাহাজ, এক শত দশটি বিমান এই তথ্য সংগ্রহের অভিযানে নিযুক্ত হইবে। সাংগঠনিক তথ্যের সাধারণ পরিচয় ইহা প্রমাণিত করে যে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্বন্ধ লইয়াও উদ্যোগটি প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ। উদ্যোগের জন্য মোট ত্রিশ কোটি ডলার ব্যয় করা হইবে।

আবহবিদ্যা যে সত্যই বিজ্ঞানসম্মত একটি বিদ্যা, সেবিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। তবে ভারতের বিভিন্ন আবহ কার্যালয়ের প্রচারিত তথ্যের ভাল মন্দ দুই দিক, অর্থাৎ ভুল-নির্ভুল দুই দিকের পরিচয় পাইতে অভ্যস্ত ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে যথোচিত আস্থা ও শ্রদ্ধার সহিত আবহবিদ্যাকে যথার্থ একটি বিদ্যা বলিয়া ধারণা করা সম্ভব হয় নাই। কোন বিজ্ঞানই নিখুঁত নহে, এই ধ্রুব সত্যটি স্মরণে থাকিলে কাহারও পক্ষে আবহ কার্যালয়ের প্রচারিত পূর্বাভাসের 'ভুল' দেখিয়া উত্তেজিত হওয়া সম্ভব হয় না। তাহা ছাড়া, আবহবিদ্যা বস্তুত বহু বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয়ের বিচার ও বিশ্লেষণের সমাহার, যাহা আবার বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতির সমাহারও বটে। অন্য কোন কোন বিজ্ঞানের মতো আবহ-

বিদ্যার পক্ষে ফরমূলা অনুসরণ করিয়া চলিবার সুযোগ খুব প্রশস্ত নহে।

কিন্তু এই সত্ত্বেও কোন সন্দেহ নাই যে, দেশের বৈষয়িক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ভারতের মতো দেশের পক্ষে আবহবিদ্যার নিকট হইতে যে বিপুল সাহায্যের অঙ্গীকার চাই, তাহা দেশের বর্তমান বিভিন্ন আবহ কার্যালয়ের যোগ্যতা ও আনুষঙ্গিক উপকরণের সম্বল হইতে প্রস্তুত নহে। চাই সম্যক ও সমূহ উন্নতি, যোগ্যতার নূতন ঐতিহ্যে উন্নীত হওয়া। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে আবহবিদ্যার গুরুদায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কৃষির ক্ষেত্রে প্রথম হলচালনার বিষয় হোক অথবা জাহাজের সমুদ্রযাত্রার বিষয় হোক, লোকে আশা করিবে যে, আবহবিদ্যা এই সব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নির্ভুল দিনক্ষণ তথা লগ্নকাল নির্ণয় করিয়া দিবে। আসন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের আভাস যথাসময়ে পাইলে নাগরিক জীবনের রক্ষাব্যবস্থাকে বিপর্যয় হইতে রক্ষা করা সম্ভব হয়। মানুষের পক্ষে প্রকৃতিকে বুঝিবার শক্তি উন্নত করিবার কর্তব্য আছে। কিন্তু প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত অথবা দমিত করিবার শক্তি মানুষের নাই। আলোচ্য পরিকল্পনা এইরূপ একটি কর্তব্য। আশার কথা বিশ্বজীবনের পক্ষে শুভদায়ক এইরূপ কর্তব্যে বিশ্বের এক শত চল্লিশটি দেশ সহযোগী হইয়াছে।

[আনন্দবাজার পত্রিকা, 30শে ডিসেম্বর, 1978]

বিজ্ঞানী লাভোশিয়ের বয়স যখন আঠাশ তখন তিনি বিয়ে করেন চৌদ্দ বছরের মেয়ে মারী পাউসেকে। ল্যাভোশিয়ে ছিলেন ধনী ও অভিজাত পরিবারের মানুষ। পাউসে শুধু ঐ পরিবারের একজন উপযুক্ত গৃহকর্ত্রীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞানী স্বামীর যোগ্য সহকর্মিনীও বটে। তিনি স্বামীর জন্যে প্রিষ্টলী প্রমুখ রসায়নবিদ্‌দের ইংরেজীতে লেখা প্রবন্ধগুলি অনুবাদ করার জন্যে ইংরেজী শিখেছিলেন, আর অঙ্কন শিখেছিলেন স্বামীর বইয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ছবি আঁকার জন্যে।

অভিজাত পরিবারের মানুষ হওয়ার অপরাধে ফরাসী বিপ্লবের সময় ল্যাভোশিয়েকে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হয়। পাউশে স্বামীর সম্মান রক্ষার্থে বহু বছর ধরে সংগ্রাম করেছিলেন।

অমূল্যধন দেব

স্মরণে

['জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র জানুয়ারী সংখ্যার প্রস্তুতি যখন সমাপ্ত, তখন আকস্মিকভাবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রাক্তন কর্মসচিব অমূল্যধন দেবের লোকান্তরের সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছল।

বিচ্ছেদ মাত্রেই বেদনার। বিশেষ করে, সে বেদনা যখন ব্যষ্টি ছেড়ে সমষ্টিতে অনুভূত। অমূল্যধন দেবের লোকান্তরের সংবাদে সেই সমষ্টির বেদনা আমরা অনুভব করছি।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগীরূপে তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে নিয়োজিত করেছিলেন তাঁর নানা উদ্যম, গ্রহণ করেছিলেন নানা কর্মভার। তাঁর নানা ঋণ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে।

গত বৎসর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নূতন কর্মসমিতি হবার পর তিনি শুধু অভিনন্দিতই করেননি সক্রিয়ভাবে এতে এগিয়ে এসেছিলেন নানা কর্মধারায়। পরিষদের আগামী আরো কর্মসূচীতে তাঁর মত কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীর শূন্যতা আমরা বিশেষভাবে অনুভব করব।

এ সংখ্যায় তাঁর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচিতিই মাত্র দেওয়া সম্ভব হল। আগামী সংখ্যায়, তাঁর স্মৃতিচারণে তাঁর অনুরাগীদের রচনা আহ্বান করি।

প্রসংগতঃ, উল্লেখ্য—শ্রীদেবের স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর পরিবারবর্গ, পরিষদে 5000 টাকা দান করেছেন। পরিষদ সেই দান থেকে তাঁর স্মৃতিরক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে : সভাপতি]

পরিচিতি :

1906 সালে অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জে স্বর্গত অমূল্যধন দেব জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অভয়াচরণ দেব হবিগঞ্জ শহরে ওকালতি করতেন এবং খ্যাতনামা কীর্তনীয়ারূপে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। এঁদেরই প্রযত্নে পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র অমূল্যধন শৈশবে ও ছাত্রাবস্থায় শুধুমাত্র বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, বিভিন্ন জনহিতকর ও সমাজসেবামূলক কাজেকর্মেও নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি 1923 সালে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে এনট্রান্স পাশ করে শ্রীহট্ট থেকেই ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে তৎকালীন আসাম সরকারের বৃত্তি লাভ করে পরে তিনি শিবপুরে বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে প্রবেশ করেন। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি বহু পুরস্কার এবং আশুতোষ স্মৃতি ও Tate Memorial পদক লাভ করেন। বি. ই কলেজ ছাত্র সংসদের তিনিই প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। 1932 সালে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং পাঠ সমাপনান্তে তিনি পাহাড়তলীতে ভারতীয় রেলের কারখানায় স্নাতক যান্ত্রিক প্রযুক্তিবিদরূপে যুক্ত হন। 1962 সাল পর্যন্ত ভারতীয় রেলের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অমূল্যধন দেব স্মরণে

চিত্তরঞ্জনে লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের গোড়াপত্তন থেকেই তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পরেও তিনি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কারিগরী প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। এই সময়েই বাংলাভাষায় এবং সহজ ইংরাজীতে তিনি কারিগরীশিক্ষার স্নাতকপূর্বমানের বহু পুস্তক রচনা করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি জর্জ টেলিগ্রাফ ইনষ্টিটিউট-এ শিক্ষকতার কাজে যুক্ত ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি Association of Engineers, India, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিবও ছিলেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিশেষ সংকটকালে তাঁর ধৈর্য, সাহস এবং সংগঠনশক্তি এই প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনে বহুলাংশে সাহায্য করে। যখন তাঁর সংগঠনী নেতৃত্ব আমাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তখনই তিনি ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেন (ইং 14 জানুয়ারী 1979)। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

আমাদের নিবেদন

প্রেস ধর্মঘটের জের হিসাবে জানুয়ারী '79 সংখ্যা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়েছে। আমরা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশনে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট আছি।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

* * * * *

অমূল্যধন দেব স্মৃতি-সভা

31শে মার্চ '79 'সত্যেন্দ্র ভবনে' (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট কলিকাতা-700006) বিকাল পাঁচটায় অমূল্যধন দেব স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হবে। সর্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিষদ-বিজ্ঞপ্তি

বিশেষ সাধারণ অধিবেশন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গত বার্ষিক সাধারণ সভায় বিধি-নিয়মাবলীর সংস্কার বিষয়ে যে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বানের কথা ছিল, বর্তমান কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্তানুযায়ী আগামী 2/4 (1979) বিকাল 5 টায় সত্যেন্দ্র ভবনে। (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট কলিকাতা-700006) ঐ বিশেষ সাধারণ অনুষ্ঠিত হবে। সমস্ত সভ্য-সভ্যাদের ঐ সভায় যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিবেদক

তাং—1-3 79

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

আইনষ্টাইন জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জনপ্রিয় বক্তৃতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে একটি লোকরঞ্জক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বিষয়ঃ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি **বক্তাঃ** অধ্যাপক হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

তারিখঃ 14ই মার্চ, 1979, **সময়**—বিকাল 5টা **স্থানঃ** 'সত্যেন্দ্র ভবন' বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি নিবেদন

বিদ্যায়তনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বিভিন্ন বিদ্যায়নের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে লোকরঞ্জক বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ এই সব বক্তৃতা প্রদান করবেন। এই বিষয়ে আগ্রহী বিদ্যায়তনের প্রধানগণকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700006
ফোন : 55 0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি নিবেদন

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে—আপনারা যেন জানুয়ারী '79 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর সংলগ্ন 'সমীক্ষা' শীর্ষক প্রশ্নগুলির উত্তর যথাসম্ভব শীঘ্র সম্ভব লিখে প্রকাশনা সচিব, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', পি-23, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন 55-0650) এই ঠিকানায় পাঠান। আপনাদের প্রেরিত উত্তরসমূহ পর্যালোচনা করে পত্রিকার সর্বপ্রকার উন্নতিসাধন করা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হবে।

বন্যা সংখ্যা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ফেব্রুয়ারী '79 সংখ্যা 'বন্যা সংখ্যা' হিসাবে প্রকাশিত হবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

ছাত্রদের উদ্দেশ্যে—

"গবেষণাগার এবং গ্রন্থাগারের নিবিড় প্রশান্তির মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন রাখো। নিজেকে প্রথম প্রশ্ন করো: আমার প্রতিষ্ঠানের জন্য আমি কি করেছি?···এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রশ্ন করো: আমার দেশের জন্য আমি কি করেছি?

এ ধরণের প্রশ্ন তুমি নিজেকে সততই করে যাবে যতদিন না তুমি নিজের বিবেকের কাছে এই জবাব দিতে পারো যে হ্যাঁ, তুমি মানুষের উন্নতি, মানুষের কল্যাণের জন্য কোন না কোন দিকে সত্যিই কিছু করেছ।"

-লুই পাস্তুর

* * * *

"আমরা যে গৃহে বাস করি তা অপরে বানিয়েছে, যে পোষাক পরি তা অপরে তৈরী করেছে, যে খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকি তাও অপরে উৎপন্ন করেছে; প্রতিদিন আমি শত শতবার নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিই আমার অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ দুইই নির্ভর করছে জীবিত ও মৃত বহু মানুষদের পরিশ্রমের উপর এবং আমি যে পরিমাণ গ্রহণ করেছি ও এখনও করছি সেই পরিমাণে আমাকে অন্যকেও দান করতে হবে।"

—আইনষ্টাইন

মানব কল্যাণে ব্যাঙের ভূমিকা

প্রণব কুমার মল্লিক*

ব্যাঙের নাম শুনলেই কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে ওঠে। আর যদি কোনও রকমে গায়ে লাফিয়ে পড়ে তা হলে তো রক্ষা নাই, সাবান দিয়ে ঘসেমেজে পরিষ্কার করে তবে কথা। এদের মধ্যে অনেকের কদাকার কুৎসিত চেহারাই ঘৃণার কারণ। এই ঘৃণিত অবহেলিত প্রাণিগুলি মানুষের চোখের আড়াল থেকে অনেক উপকার করে যাচ্ছে তা একটু নজর করলেই দেখা যায়, বোঝা যায় যে এরা মানুষের কত উপকারী বন্ধু।

ব্যাঙ বলতে সাধারণত আমরা বুঝি কুনোব্যাঙ, সোনা বা কোলা ব্যাঙ। কিন্তু এগুলি ছাড়াও পশ্চিম বঙ্গে আরও অনেক রকমের ব্যাঙ পাওয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গে যত রকমের ব্যাঙ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে কেউ থাকে ডাঙায়, কেউ বা জলে, কোনগুলি থাকে গাছে, আবার কতকগুলি থাকে মাটির নীচে। এই সমস্ত ব্যাঙদের স্বভাব, বাসস্থান ও জীবনযাত্রার প্রণালী লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এরা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে পরোক্ষে মানুষের কত উপকার করছে।

ব্যাঙ যতই ঘৃণিত প্রাণী হোক না কেন বর্ষাকালের মেঘলা সন্ধ্যায়, বৃষ্টি ঝরা রাতে এদের একটানা ঐকতান না শুনলে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। বর্ষাকাল বলে মনেই হয় না। আমরা ব্যাঙের যে ঐকতান শুনি তা হল নানা প্রকারের পুরুষ ব্যাঙদের নানা ধরণের সম্মিলিত ডাক। বর্ষাকালের একটা বিশেষরূপ প্রকাশ করার জন্য কবিরা তাঁদের কবিতায় দাদুরী বা ব্যাঙের ডাকের কথা লিখে গিয়েছেন। ব্যাঙেরা যে ডাকে তা কিন্তু কবির কাব্যের জন্যে নয়, বর্ষাকালের একটা বিশেষ রূপ প্রকাশের জন্যও নয়, ব্যাঙেরা ডাকে স্বজাতির স্ত্রী ব্যাঙদের সঙ্গে মিলনের জন্য, ডাকে বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।

সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা আমাদের এই পশ্চিম বঙ্গে ব্যাঙেরা কৃষকদের উপকারী বন্ধু হিসাবে আচরণ করে। শস্যগাছের ক্ষতিকারক নানা প্রকার কীট-পতঙ্গ ক্ষেতখামারে দেখা যায়। তাদের ধ্বংস করার জন্য কৃষকেরা নানারকম রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করেন। এই পদ্ধতি হল রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। মানুষের দৃষ্টির বাইরে প্রকৃতি যে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করে রেখেছে তাকে বলা হয় জৈবীয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। অর্থাৎ প্রাণীদের দ্বারা ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গের মোকাবিলা করার পদ্ধতি। অনেক পাখী যেমন কীট-পতঙ্গ খায়, তেমনই ব্যাঙেরাও কীট-পতঙ্গ খায়। নানা রকমের কীট-পতঙ্গ, গোলকৃমি, ফুলফলের বাগানে, চাষআবাদের ক্ষেতখামারে বহু সংখ্যায় জমায়েত হয় এবং ফুল, ফল, শস্যগাছেরও ফুল, ফল, শস্যের ক্ষতি করে। এরাই হল সোনা বা কোলা ব্যাঙের, ছ্যাড়ছ্যাড়েব্যাঙের, বিশেষত কুনোব্যাঙের উপাদেয় খাদ্য। একথা জানা গেছে যে

* আসানসোল কলেজ, আসানসোল

কুনো ব্যাঙেরা বীটগাছের ক্ষতিকারক 'ওয়েব ওয়ান" নামক কীটদের খেয়ে বীটচাষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।

সংরক্ষিত শস্যদানার কিছু অংশ অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে পিঁপড়েরাও খাদ্য হিসাবে নষ্ট করে। প্রায় সমস্ত ব্যাঙই পিপীলিকাভুক্। তারা অন্যান্য খাদ্য ছাড়াও পিঁপড়ে খায়। একথা নিশ্চয়ই অজানা নয় যে কুনোব্যাঙেরা মানুষের কাছাকাছি ঘরদোরে ও তার আশেপাশে বাস করে। বিশেষত এই কারণে এরা শস্যগোলার পিঁপড়েদের অতি সহজেই খেয়ে আংশিকভাবে শস্যদানা রক্ষা করে।

যে সমস্ত এলাকায় কুনোব্যাঙের বাস বেশি সেই সমস্ত এলাকায় 'প্লেগ' নামক ব্যাধি মহামারী রূপে প্রকাশ পায় না। এর একমাত্র কারণ হল প্লেগ ব্যাধির জীবাণু বাহক 'টিক্' জাতীয় একপ্রকার পোকা কুনোব্যাঙেরা খেতে ওস্তাদ্।

যে সমস্ত ব্যাঙ মাটির নীচে বাস করে তাদের মেঠো ব্যাঙ বলা যেতে পারে। এই মেঠো-ব্যাঙেরা পরোক্ষে মানুষের ক্ষতিকারক উইপোকা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে খেয়ে মানুষের উপকারী বন্ধুর কাজ করে চলেছে।

ছ্যাড়ছ্যাড়েব্যাঙেরা সাধারণত জলেই বাস করে। এরা ব্যাঙাচি দশায়, শিশু ব্যাঙ অবস্থায়, এমন কি পরিণত বয়সেও মশার বাচ্চাদের অতি আগ্রহের সঙ্গে আহার করে। আবার গেছো-ব্যাঙেরাও মশাদের অন্যান্য কীট-পতঙ্গের সঙ্গে সানন্দে খায়। এখন দেখা যাচ্ছে এই ব্যাঙেরা রোগ জীবাণুবাহক নানা জাতের মশা আহার করে পরোক্ষে মানুষকে মশকবাহিত নানা প্রকার ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করছে।

মানুষের উপকারের জন্য পুরুষ ব্যাঙদের অবদান কম নয়। পুরুষ ব্যাঙদের মাধ্যমে স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার পরীক্ষা চালানো হয়। এই পরীক্ষায় নির্ভুলভাবে প্রমাণ করা যায় স্ত্রীলোকেরা গর্ভবতী হয়েছেন কিনা। আবার স্ত্রীলোকের জরায়ুতে অথবা পুরুষের অণ্ডকোষে 'টিউমারে'র অস্তিত্বের কথা পুরুষ ব্যাঙদের উপর পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়।

এবার জীবন দিয়ে ব্যাঙেরা মানব সমাজের কি কি উপকার করে সেই সব কথায় আসছি। চীনদেশের হাটেবাজারে মানুষের খাদ্যের জন্য ও ওষুধ প্রস্তুতের জন্য শুকনো ব্যাঙের কেনাবেচা চলে। ঐ দেশেই কোন কোন ব্যাঙের ছাল থেকে ওষুধ তৈরির প্রচলন দেখা যায়।

চীন, জাপান ও অন্যান্য কোন কোন দেশে বড়জাতের ব্যাঙের ছাল থেকে সুন্দর চামড়া তৈরি হয়, যা দিয়ে মানুষের ব্যবহারের জন্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। আবার পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীরা একপ্রকার ব্যাঙের ছালের বিষাক্ত রস তাদের ধনুকের তীরে মাখিয়ে রাখে আত্মরক্ষার এবং শিকার করার জন্য। আর একটি কথা জানলে আশ্চর্য হতে হয় যে এরা ব্যাঙের ছালের রস ঘসে টিয়াপাখীর পালকের সবুজ রং হলুদ করে। আবার এ কথাও শোনা গেছে যে দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী মহিলারা তাদের স্বামীর অদম্য কুপ্রবৃত্তি প্রশমিত করার জন্য এক প্রকার টোড্ব্যাঙের গায়ের গুটিগুলির বিষাক্ত রস গোপনে জলে গুলে তাদের স্বামীদের পান করাত।

খাদ্য হিসাবে ব্যাঙের অবদান অপরিসীম। সোনা বা কোলাব্যাঙের সুগঠিত মাংসল ঠ্যাং মানুষের উপাদেয় খাদ্য। পৃথিবীর নানা দেশে ব্যাঙের ঠ্যাং খাদ্য হিসাবে সমধিক প্রচলিত। ভারতের নানা উপজাতিদের মধ্যে স্মরণাতীত কাল থেকে ব্যাঙ খাদ্য হিসাবে আদরণীয়। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অনেকেই তাদের সৌখীন খাদ্য তালিকায় ব্যাঙের ঠ্যাং-এর একটা স্থান করে দিয়েছে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ ব্যাঙের ঠ্যাং রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করছে।

আবার বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগারে ব্যাঙেরা ও তাদের বাচ্চা ব্যাঙাচিরা বিচিত্র ও জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। পৃথিবীর দেশে দেশে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মেরুদণ্ডী প্রাণীদেহের নানা তত্ত্বের প্রাথমিক জ্ঞান লাভের জন্য ব্যাঙেরা দলে দলে দধীচির মত আত্মদান করে চলেছে।

উপসংহারে একথা জানাই যে অতি ঘৃণার পাত্র, এই ব্যাঙেরা, নিঃসন্দেহে মানুষের উপকারী বন্ধু। এদের একটু নেকনজরে রাখলে আমাদেরই লাভ।

গ্রীষ্মকালে বাতাসে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণা ভেসে বেড়ায়। এগুলি এতই ক্ষুদ্র যে, খালি চোখে দেখা যায় না। এই বস্তুকণাগুলির অধিকাংশই হলো উদ্ভিদের পরাগরেণু। এর মধ্যে কতকগুলি বস্তুকণা অনেকের শরীরে নানারকম ব্যাধির সৃষ্টি করে। কিন্তু আর একদিক থেকে এগুলি জীবন-প্রবাহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র স্বরূপ। পরাগ-নিষেক ক্রিয়ার দ্বারাই নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়। পরাগ রেণুর সাহায্য না পেলে অনেক সপুষ্পক উদ্ভিদ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

* * * * * *

অনেক সময় গ্রীষ্মকালে গাছপালার উপর নীলরঙের একটা অস্পষ্ট আস্তরণ দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ডাঃ গ্রিট্‌স্ ডাব্লিউ ওয়েন্টের মতে, এই আস্তরণ হলো একরকম উদ্ভিজ্জ তেলের। তিনি বলেন, উদ্ভিদ-দেহে হাইড্রোকার্বনের দ্বারা উৎপাদিত অ্যাসফাল্ট এবং বিটুমেন জাতীয় পদার্থ উদ্ভিদ নিজের দেহ থেকে বাইরে বের করে দেয়। ঐ পদার্থগুলিকেই নীল বর্ণের অস্পষ্ট আস্তরণরূপে দেখা যায়। এই পদার্থগুলি বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটিতে পড়ে যায়।

যান্ত্রিক গরু

প্রবীরকুমার দাস*

গরু নামক জন্তুটিকে দেখে নি, এমন কাউকে কেউ দেখেছো কি? না দেখারই সম্ভাবনা বেশী। কারণ অবশ্য খুবই সোজা। গ্রামাঞ্চলে প্রতি ঘরে ঘরে গরু। শহরাঞ্চলেও দেখার অসুবিধা নেই খাটালগুলোতে তো আছেই; তাছাড়া আছে হাটে-বাজারে প্রতি রাস্তার মোড়ে মোড়ে; পচা আলু, পচা কলা, ছেঁড়া নুনের ঠোঙা ইত্যাদির কাছে, এমন কি শেষ পর্যন্ত খেলার স্টেডিয়ামে পর্যন্ত। শুধু কি তাই? ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে আমাদের ছোট সব্জীর বাগানটিতেও বাছাধনের শ্রীমুখটির দেখা মিলতে পারে। উঁচু পাহাড়ে গরু, নীচু সমভূমিতে গরু, বনভূমি, মরুভূমি, শীতের দেশ, গরমের দেশ, জল, স্থল···না, এবার থামতে হল। অন্য জায়গায় গরুর দেখা পেলেও জলে কিন্তু গরুর দেখা পাওয়া যাবে না। অবশ্য বিলে-ঝিলে-অগভীর জলাভূমিতে প্রায়ই দেখা যায় গরু জলে নেমে গোগ্রাসে ঘাস চিবোচ্ছে।

আমি এখানে যে গরুটির কথা বলব, সেটি কিন্তু অতটা বেহায়া নয়। সেটি হল যান্ত্রিক গরু। না মৃত নয়, আবার একপক্ষে জীবিতও বলতে পার। কেননা এটি মাথা নাড়ে, লেজ নাড়ে, চোখ মিট্‌মিট্ করে, ঘাসবিচালী খায়, এমন কি দুধ পর্যন্ত দেয়। না চমকাবার কিংবা আশ্চর্য হবার কিছু নেই, এরোপ্লেনের কথাই ধরা যাক না কেন। এক-শ' বছর আগে এরোপ্লেন তো অমনি আশ্চর্য হবার মত জিনিষই ছিল।

সত্যিই আমেরিকার কয়েকজন স্থপতি, জীব-বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ার যান্ত্রিক গরু তৈরি করেছেন। এখন কথা হল, যান্ত্রিক গরু তৈরি হয় কিভাবে? যান্ত্রিক গরু তৈরির প্রথম কাজ স্থপতিদের। তাঁরাই বিভিন্ন রকম ধাতু আর চামড়া দিয়ে একটা গরু বানাবেন। তাঁদের সঙ্গে কাজ করে চলবেন ইঞ্জিনীয়ার ও জীববিজ্ঞানীরা। ইঞ্জিনীয়াররা জীববিজ্ঞানীদের পরামর্শমত বিভিন্ন রকম যন্ত্র তৈরি করবেন। তাদের কোনটা বা খাদ্য গ্রহণে সাহায্য করবে কোনটা বা খাদ্যকে পরিপাক করবার জায়গায় নিয়ে যাবে, কোনটা থেকে বের হবে নানারকম উৎসেচক যা খাদ্যকে দুধে পরিণত করবে, আবার কোনটা বা সেগুলিকে বাঁটে নিয়ে জমা করবে। এই যন্ত্রগুলির মধ্যে একটি প্রধান যন্ত্র হল একটি ছোট করাত। এই করাতটি এত ধারালো আর এত তাড়াতাড়ি চলে যে এটি কোন খাদ্যবস্তুকে সেকেণ্ডে 300 বার কাটতে পারে। আরও দুটি যন্ত্র আছে। একটি দুধ দেয়, অপরটি অপ্রয়োজনীয় অবশেষকে বাইরে বের করে দেয়।

কিন্তু এতসব করার ফলে যান্ত্রিক গরুর দাম পড়ে যায়, মাত্র কয়েক লাখ টাকা! কিন্তু, তাহলে আমরা যান্ত্রিক গরু পুষব কেন? প্রথমতঃ, একে ইচ্ছামত খাওয়ালে, এও তোমার উপকার-অস্বীকার করবে না। তোমার যত দুধ চাই, তত দুধের যোগান এ দিতে পারে, তা সে 500 লিটার 1000 লিটার কিংবা তারও বেশী, যা যে কোন সাধারণ গরুর পক্ষে একান্ত অসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, এ কখনই কাউকে তেড়ে গুঁতোতে আসবে না কিংবা লাথি মারবে না। এই কারণগুলির জন্য আজ রাশিয়া ও আমেরিকার অনেকেই যান্ত্রিক গরু পুষছেন।

*[illegible] ইনস্টিটিউট. পোঃ—খাটরা। 24 পরগণা।

সহজ বা গ্রামীণ রেফ্রিজারেটর

গৌতম ব্যানার্জী*

'রেফ্রিজারেটর' বা সংক্ষেপে 'ফ্রিজ' বলতেই যে ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে সাদা আলমারির মত সুদৃশ্য আসবাবটি চোখে ভেসে ওঠে, তার আর নতুন পরিচয় আজকাল লাগে না। বাড়ীতে একটি ফ্রিজ থাকার সাধ অনেকের থাকলেও, কেনার সাধ্য অনেকেরই নেই। এখনো এটি যথেষ্ট মহার্ঘ। তাছাড়া 'ফ্রিজ' আবার সব জায়গায়—কেনার সাধ্য থাকলেও, ব্যবহার করা যায় না। এটি চলে বিদ্যুতে। কাজেই যে এলাকায় বিদ্যুত নেই, সেখানে ফ্রিজ অচল। লোডশেডিংয়ের সময়ও, ফ্রিজ নিয়ে অনেকেরই দুশ্চিন্তা।

ফ্রিজ থাকার সুবিধা - রান্না করা খাবার, ফলমূল-তরিতরকারী সহজেই অবিকৃত রাখা যায়, তাছাড়া প্রখর গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা জল, সরবৎ তো আছেই। পরিবারের ব্যবহার ছাড়াও—বিপুল পরিমাণ শস্য, আলু প্রভৃতিকে পরে ব্যবহার করা যায়,—'কোল্ড স্টোরেজ' বা বড় বড় ফ্রিজে রেখে। এইভাবে রেফ্রিজারেটর আধুনিক সভ্য জীবনে প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

কিন্তু, গ্রামাঞ্চলে যেখানে বিদ্যুৎ নেই এবং সাধারণ মানুষের ফ্রিজ কেনার ক্ষমতাও নেই—সেখানে 4-5 দিন তরিতরকারী ফলমূলকে টাট্‌কা রাখা, বা গরম জলকে ঠাণ্ডা করার জন্য একটি সুলভ ও সহজ রেফ্রিজারেটর আমরা সহজেই তৈরি করে নিতে পারি। যে 'সহজ রেফ্রিজারেটর' এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে তার মূল্য ও ব্যবহার খরচ কম। শুধু তাই নয়, এটি ব্যবহারে বিদ্যুৎও লাগে না। তাই গ্রামের মানুষের কাছে এটি আদৃত হয়ে উঠছে। এটিকে গ্রামীণ রেফ্রিজারেটরও বলা যায়।

এইরকম রেফ্রিজারেটর তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় 1 বিশেষ ভাবে তৈরী একটি আলমারী 2. দুটি চটের চাদর 3. একটি বড় জলপাত্র।

ছবিতে বিশেষভাবে তৈরী একটি কাঠের আলমারী দেখানো হয়েছে। (চিত্র)। আলমারীর দুদিকের এবং মাথার উপরের দেয়াল তিনটি বিশেষভাবে তৈরী। দেয়ালের বাইরের দিক সাধারণ আলমারীর মতই হবে, কিন্তু ভিতরের দুদিকের প্রতি দিকেই এবং মাথার উপরে কাঠের দেয়াল ও আলমারীর 'তাক' (shelf)-এর মাঝে একটি চটের চাদর রাখার মত জায়গা থাকবে। ছবি অনুসারে A B C D E F একটি চটের চাদর ; এটিকে আলমারীর একদিকের দেয়াল এবং তাক-এর মাঝের জায়গা দিয়ে ঢুকিয়ে অপর দিক দিয়ে বাইরে আনা হয়েছে ও একটি বড় জলপূর্ণ পাত্রে চাদরের দুই মুখ ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। চটের চাদরকে আলমারীতে প্রবেশ করাবার আগে পরিস্কার জলে ভিজিয়ে নিতে হবে। আলমারীর সামনের পাল্লা দুটিতে জাল দেওয়া থাকে। সাধারণ অবস্থায় আলমারীর ভিতরের বাতাস আবহাওয়ার সমান উষ্ণ থাকবে। কিন্তু এর ভিতর

*বেশোহাটা, পোঃ—চন্দননগর, হুগলী

ভিজে চট ঢোকালেই ঐ ভিজে চটের জলের বাষ্পীভবনের সময় যে লীন-তাপ দরকার তা আলমারীর ভিতরের বাতাস থেকে সংগৃহীত হয় বলে আলমারীর ভিতরের বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে যায়। চটের

সহজ রেফ্রিজারেটর
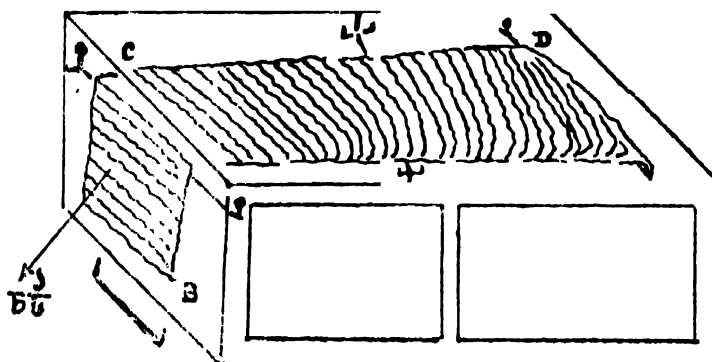
চাদরটি জলপাত্রে ডুবে থাকায় সহজে শুকিয়ে যায় না এবং বাষ্পীভবন চলতেই থাকে। তবে প্রতিদিন ভাল জল ও অন্য চটের চাদর দিতে পারলে আরও ভাল হয়। ব্যবহার করা চাদরটিকে ধুয়ে ফেলে আবার পরদিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, বাইরের গরম বাতাসের থেকে, আলমারির ভেতর রাখা জিনিষের উষ্ণতা অন্ততঃ 5—7°C কম হয়।

অনেক সময় খুব বেশী ঘামলে মানুষ তার ঘামের সঙ্গে ঘোড়ার ঘামের তুলনা দিয়ে থাকে, অর্থাৎ ঘোড়ার ঘাম খুব বেশী হয়। কিন্তু ঘোড়ার ঘামের সঙ্গে মানুষের ঘামের তুলনা করাই চলে না। বিশেষজ্ঞেরা সাধারণ প্রাণীদের ঘামের পরিমাণ হিসাব করে দেখেছেন। তাতে দেখা যায়, ঘোড়ার ঘামের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী এবং ঘোড়ার শরীরের ঘাম নির্গত হয়ও খুব তাড়াতাড়ি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন মানুষের তুলনায় ঘোড়া এবং শূকরের ঘামের ক্ষমতা অনেক গুণ বেশী।

ভেবে কর

গৌতম গাঙ্গুলী*

নীচের প্রতিটি প্রশ্নের দুটি করে উত্তর দেওয়া আছে, সঠিক উত্তরটি বের কর।

1. প্রতিসরাঙ্কের মান কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?
   (a) আপতিত রশ্মির রঙ ও মাধ্যমদ্বয়ের প্রকৃতির উপর।
   (b) প্রতিসৃত রশ্মির রঙ ও আলোর গতিবেগের উপর।

2. হার্ট্জ্ (Hartz) কি ?
   (a) শব্দের কম্পাঙ্কের একক।
   (b) শব্দের কম্পনকালের একক।

3. ত্বরণ বা মন্দনের এককে 'প্রতি সেকেন্ড' কথাটি দু-বার আসে কেন ?
   (a) সময় এবং সরণের পরিবর্তনের হার বুঝাবার জন্য।
   (b) বেগ এবং বেগের পরিবর্তনের হার বুঝাবার জন্য।

4. অম্লরাজে সোনা দ্রবীভূত হয় কেন ?
   (a) জায়মান ক্লোরিনের জন্য।
   (b) এক আয়তন ঘন HNO_3 ও তিন আয়তন ঘন HCl-এর জন্য।

5. 0.018 ওজনবিশিষ্ট একফোঁটা জলবিন্দুর মধ্যে অণুর সংখ্যা কত ?
   (a) 6.03×10^{26}
   (b) 6.03×10^{20}

6. 'হাইড্রোমিটার' (Hydrometer) কি কাজে ব্যবহৃত হয় ?
   (a) পদার্থের ঘনত্ব নির্ণয়ের কাজে।
   (b) পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের কাজে।

7. মূল, কাণ্ড, পাতা নাই—এরূপ একটি উদ্ভিদের নাম কর ?
   (a) রাফ্লেসিয়া (Ruflesia)।
   (b) ইস্ট।

8. রক্তে শ্বেতকণিকার পরিমাণ কমে গেলে—
   (a) লিউকোমিয়া রোগ হয়।
   (b) অ্যানিমিয়া রোগ হয়।

9. গ্লাইকোলিসিস (Glycolysis) কোথায় হয় ?
   (a) সাইটোপ্লাজমে।
   (b) মাইটোকনড্রিয়ায়।

10. বর্ণালীর কোন্ কোন্ রঙে সালোকসংশ্লেষ উত্তমরূপে চলে ?
    (a) সবুজ, হলুদ, কমলা
    (b) লাল, নীল, বেগুনী

নানা-চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর

11. কাঁপকল কোন্ শ্রেণীর লিভার ?
    (a) প্রথম শ্রেণীর।
    (b) দ্বিতীয় শ্রেণীর।
12. সূর্যগ্রহণ কখন হয় ?
    (a) পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে যখন চন্দ্র আসে।
    (b) চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে যখন পৃথিবী আসে।
13. কোন্ পদার্থ উত্তপ্ত করলে আয়তন বাড়ে ?
    (a) বরফ।
    (b) মোম।
14. চুম্বকের উপরে তড়িতের প্রভাব সম্পর্কিত নিয়মের প্রবক্তা কে ?
    (a) অ্যাম্পীয়ার (Ampere)
    (b) ফ্লেমিং (Flamming)
15. বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (exocrine gland) থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থের নাম—
    (a) এনজাইম (enzyme) ;
    (b) হরমোন (hormone)।
16. কোন কোন মহিলার গোঁফ-দাড়ি হয় কেন ?
    (a) অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির অতিরিক্ত ক্ষরণের জন্য।
    (b) পিটুইটারী গ্রন্থির অতিরিক্ত ক্ষরণের জন্য।
17. রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়—
    (a) ভিটামিন B_{12}-এর অভাবে ;
    (b) ভিটামিন K-এর অভাবে।
18. শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায়—
    (a) অক্সিজেনের অভাবে।
    (b) ফাইলোক্যালাইনের (phyllocaline) অভাবে।

'ভেবে কর'র উত্তর

1. (a) 2. (a) 3. (b) 4. (a) 5 (b) 6. (b) 7. (a) 8. (a) 9. (a) 10. (b) 11. (a) 12. (a) 13. (b) 14. (a) 15. (a) 16. (a) 17. (b) 18. (a)

বিজ্ঞান সমীক্ষা

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার : 1978

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

প্রতি বছর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বিশ্বের বিজ্ঞানী মহল ও বিজ্ঞানানুরাগী মানুষ একটি পরম ঘোষণার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে থাকেন। সে ঘোষণাটি হল বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার-বিজয়ীদের নাম ঘোষণা। এবছর (1978) পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনজন পদার্থবিজ্ঞানী যৌথভাবে; চিকিৎসাবিজ্ঞানেও পেয়েছেন তিনজন বিজ্ঞানী যৌথভাবে এবং রসায়নবিদ্যায় পুরস্কার পেয়েছেন শুধু একজন বিজ্ঞানী একক ভাবে।

পদার্থবিদ্যা

পদার্থবিদ্যায় যে তিনজন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁরা হলেন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ্ আকাদেমিশিয়ান পিওতর কাপিৎসা (Pyotr Kapitsa) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীর ডঃ আরনো পেনজিয়াস (Arno Penzias) ও ডঃ রবার্ট উইলসন (Robert Wilson)।

পিওতর কাপিৎসা : আকাদেমিশিয়ান কাপিৎসাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল একেবারে জীবন-সায়াহ্নে, এখন তাঁর বয়স 84 বছর। অথচ নিম্ন-তাপমাত্রার পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, তা বহু আগের আবিষ্কার। আমাদের ছাত্রাবস্থায় তাঁর কাজের বিষয় আমরা অবগত হয়েছিলুম।

1894 সালে এক সেনাধ্যক্ষের পরিবারে কাপিৎসার জন্ম। তাঁর শৈশব ছিল সুখের, চমৎকার ভাবে তিনি মানুষ হয়েছিলেন, তাঁকে দেখাশোনা করার জন্যে ছিল ইংরেজিভাষিণী গভর্নেস, তাঁর ছিল ভাল ভাল বই পড়ার সুযোগ। কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি ক্রনশটাট কলেজ থেকে শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন এবং 1912 সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গ পলিটেকনিকাল ইনস্টিটুটে ভর্তি হন। পলিটেকনিকে তিনি পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন অধ্যাপক ভি. ভি. স্কোবেলৎসিনের অধীনে। তবে প্রত্যক্ষভাবে যাঁর কাছে তিনি বিজ্ঞানের পাঠ নিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন ডঃ আব্রাহাম ইওফ্। ইতিমধ্যে কাপিৎসার ব্যক্তিগত জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। তিনি নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তারপর প্রথম ও একমাত্র পুত্র মারা যায় এবং তাঁর স্ত্রীও মারা যান।

অধ্যাপক ইওফ সে সময়ে ল্যাবরেটরির কিছু যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার জন্যে বিদেশে ছিলেন। তিনি এই সব দুঃখজনক মৃত্যুর কথা শুনলেন এবং বুঝতে পারলেন এই সংকটপূর্ণ সময়ে কাপিৎসা

*দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-700029

বেঁচে থাকতে পারেন একমাত্র কাজ নিয়ে। ইওফ-এর সহযোগিতায় কাপিৎসা 1921 সালে লণ্ডনে উপস্থিত হলেন।

আকাদেমিশিয়ান পিওতর কাপিৎসা

অধ্যাপক ইওফ বিখ্যাত ক্যাভেন্‌ডিশ ল্যাবরেটরির অধ্যক্ষ বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন কাপিৎসাকে কিছুদিনের জন্যে তাঁর ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সুযোগ দেন। রাদারফোর্ড সম্মত হলেন। কর্মকৃতির পরিচয় দিয়ে অল্পকালের মধ্যে কাপিৎসা হয়ে উঠলেন রাদারফোর্ডের প্রিয় শিষ্য। এই সময় তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন এবং তাঁর দুটি সন্তান হয়।

কেম্ব্রিজে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র নিয়ে গবেষণার সময় কাপিৎসা বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি আবিষ্কার করেন, চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে সকল ধাতুতেই রৈখিক মাত্রায় প্রতিরোধ বৃদ্ধি পায়। এই আবিষ্কার পরবর্তীকালে 'কাপিৎসার রৈখিক সূত্র' নামে পরিচিত হয়। ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরীর অধ্যক্ষের তিনি সহকারী হন এবং রাদারফোর্ড তাঁর জন্যে ব্রিটেনের সবচেয়ে আধুনিক ল্যাবরেটরী নির্মাণ করে দেন। কিন্তু কাপিৎসা স্থির করেন তিনি স্বদেশে ফিরে আসবেন।

1934 সালে কাপিৎসা সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে আসেন। গত 40 বছর ধরে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের পদার্থবিজ্ঞান সমস্যার ইনস্টিটুটে অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত আছেন। এই সময়ে তিনি তরলীভূত গ্যাস ও নিম্নতাপমাত্রা সম্পর্কিত কয়েকটি আশ্চর্য আবিষ্কার করেন। তরল হিলিয়ামের অতি-তরলতার রহস্যজনক ব্যাপার এবং এই অস্বাভাবিক তরল পদার্থের তাপ চলাচলের প্রকরণ তিনি আবিষ্কার করেছেন। গোলক-প্রজ্বলনের প্রকৃতি নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন এবং তাপ-নিউক্লীয় সংশ্লেষণের সমস্যা সম্পর্কে সম্প্রতি একটি কৌতূহলোদ্দীপক নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

আকাদেমিশিয়ান কাপিৎসা কেবলমাত্র তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী নন, তিনি একজন কৃতী যন্ত্রকুশলীও। তিনি যেমন পরীক্ষাকার্য উদ্ভাবন করেন, তেমনি সেই পরীক্ষাকার্যের প্রয়োজনীয় যন্ত্রও নির্মাণ করেন। গ্যাস তরলীকরণের যে চমৎকার ও মৌলিক পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করেছেন তা এখন সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হচ্ছে। 1935 সালে তিনি অক্সিজেন তরলীকরণের শক্তিশালী ব্যবস্থা নির্মাণ করেন।

বিজ্ঞানে তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্যে অধ্যাপক কাপিৎসা দেশবিদেশের নানা সম্মাননা লাভ করেছেন। সোভিয়েত রাশিয়ায় তাঁকে রাষ্ট্রের উচ্চতম সম্মান 'অর্ডার অভ লেনিন' প্রদান করা হয়। তিনি ডেনমার্কের রয়েল বিজ্ঞান আকাদেমি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আয়র্ল্যাণ্ডের বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য, জার্মান জীবতত্ত্ব আকাদেমির সদস্য, অসলো, আলজিয়ার্স ও প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রিত অধ্যাপক এবং ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির ফেলো। 1974 সালে তিনি ভারত সফরে এসেছিলেন। তিনি কয়েকটি বই লিখেছেন। তাঁর একটি বই-এর নাম 'পরীক্ষাকার্য, তত্ত্ব ও কার্যকরণ'।

আরনো পেনজিয়াস্ : অধ্যাপক কাপিৎসার সঙ্গে যে দুজন মার্কিন পদার্থ-বিজ্ঞানী 1978 সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা দুজনেই তাঁর তুলনায় বয়সে অনেক তরুণ এবং তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তুও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিগত কয়েক বছর ধরে ডঃ আরনো পেনজিয়াস এবং ডঃ রবার্ট উইলসন 'কসমিক মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশন' বা মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ বিকিরণ সম্পর্কে বিশদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে আসছেন। তাঁদের এই গবেষণা 'বিগ ব্যাং' নামক মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব প্রমাণ করার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এই গবেষণার স্বীকৃতিতে তাঁদের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। 'বিগ ব্যাং' তত্ত্ব অনুসারে দেড় হাজার কোটি বছরেরও আগে বিপুল বিস্ফোরণের ফলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সময় ফসিল বা জীবাশ্মের মধ্যে যে তাপ সঞ্চিত হয়েছিল তা দেখিয়েছেন ডঃ পেনজিয়াস ও ডঃ উইলসন। ডঃ পেনজিয়াসের বয়স এখন 45 বছর। তিনি বর্তমানে বেলটেলিফোন ল্যাবরেটরিজ-এর রেডিও রিসার্চ বিভাগের অধ্যক্ষ। তাঁর জন্ম হয়েছিল জার্মেনীতে। তাঁর বাবা চামড়া ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 1940 সালে পেনজিয়াস পরিবার জার্মেনী ছেড়ে আমেরিকায় চলে আসেন। সেখানে তাঁর প্রথম জীবন কেটেছিল সাধারণ ছাত্ররূপে। প্রথমে তিনি নিউইয়র্কের ব্রংশ শহরে একটি স্কুলে এবং পরে নিউইয়র্ক সিটি কলেজে অধ্যয়ন করেন। দুবছর সামরিক বিভাগে কাজ করার পর তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। 1961 সালে তিনি বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীজে যোগ দেন এবং 'মেসার' আবিষ্কর্তা চার্লস টাউন্স-এর কাছে অধ্যয়ন করেন। 1962 সালে তিনি

পদার্থবিদ্যায় পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ডঃ পেনজিয়াস বিশ্বের নানা স্থান থেকে বহু সম্মাননা পেয়েছেন। তিনি প্যারিস মানমন্দিরের অনারারী ডক্টরেট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আকাদেমি সায়েন্সেস ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমেরিকান আকাদেমি অফ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস-এর সদস্য, নিউ ইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক এবং হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন সহযোগী গবেষক। 'কমিটি কনসার্নড সায়েন্টিস্টস' নামক জাতীয় সংস্থার তিনি সহ-সভাপতি। যেসব দেশে বিজ্ঞানীদের রাজনীতিক স্বাধীনতা বিপন্ন, এই সংস্থাটি তাঁদের স্বার্থরক্ষার কাজ করে থাকে।

বাঁ-দিক থেকে—ডক্টর রবার্ট উইলসন ও ডক্টর আরনো পেনজিয়াস

রবার্ট উইলসন : আমেরিকার টেকসাস রাজ্যের হিউস্টন শহরে রবার্ট উইলসনের জন্ম। তাঁর বয়স এখন 42 বছর। তিনি বর্তমানে নিউ জার্সির বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীজ-এর বেতার পদার্থবিদ্যা গবেষণা বিভাগের প্রধান।

উইলসন 1957 সালে হিউস্টনের রাইস্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় অনার্স সহ স্নাতক হন এবং 1962 সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিট্যুট অব টেকনোলজি থেকে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। 1963 সালে তিনি বেল টেলিফোন সংস্থায় যোগ দেন। ডঃ উইলসন বিশ্বের নানা স্থান থেকে সম্মাননা লাভ করেছেন। আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি, ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন, ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ রেডিও সায়েন্টিস্টস এবং আমেরিকান ফিজিক্স সোসাইটির তিনি সদস্য।

রসায়ন

ডঃ পিটার মিচেল: 1978 সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এককভাবে ব্রিটেনের প্রান-রসায়নবিজ্ঞানী ডঃ পিটার মিচেল (Peter Mitchell)-কে। প্রাণ-রসায়নে যে অনন্য গবেষণার জন্য ডঃ মিচেলকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে সে সম্পর্কে সুইডিস আকাদেমি অফ সায়েন্স বলেছেনঃ ডঃ মিচেল ও তাঁর পাঁচজন সহযোগী যে অসামান্য গবেষণা করেছেন সেটি হলো 'কেমিঅসমোটিক তত্ত্ব'। এই তত্ত্বের সাহায্যে উদ্ভিদ ও জীবকোষ কিভাবে অক্সিজেন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ দেহাভ্যন্তরে গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে ভুক্তাবশেষ পরিত্যাগ করে তা ব্যাখ্যা করা যায়। প্রাণ-রসায়নের যে ক্ষেত্রে তাঁদের এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে,

ডক্টর পিটার মিচেল

সেটি সাম্প্রতিককালে 'বায়োএনার্জেটিকস্' নামে পরিচিত। সবুজ উদ্ভিদের কোষ এবং কয়েক ধরনের ব্যাক্টিরিয়া ও অ্যালগী যে ক্লোরোফিলের সাহায্যে সূর্যালোক থেকে সরাসরি শক্তি সংরক্ষণ করতে এবং সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলকে জৈব যোগে রূপান্তরিত করতে পারে তা এই তত্ত্বের সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

1961 সালে ডঃ মিচেল যখন এই তত্ত্ব প্রস্তাব করেন, তখন অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন। কিন্তু গত 15 বছর ধরে তাঁর ও অন্যান্য অনেক গবেষণাগারের পরীক্ষায় দেখা গেছে, মূল তত্ত্ব সঠিক।

ডঃ মিচেলের বর্তমান বয়স 58। তিনি লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। 1950 সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণ-রসায়নে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। 1955 থেকে 1963 সাল

পর্যন্ত তিনি স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগে রাসায়নিক জীববিদ্যার অধ্যক্ষ ছিলেন। 1964 সালে তিনি পশ্চিম ইংলণ্ডের করনওয়েল-এ গ্রিন রিসার্চ ল্যাবরেটরীর অধ্যক্ষপদে যোগদান করেন এবং বর্তমানে সেই পদে আসীন আছেন। ডঃ মিচেল তাঁর অসামান্য গবেষণার জন্যে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের বহু পুরস্কার পেয়েছেন এবং কেমিঅসমোটিক গবেষণা সম্পর্কিত দুটি গ্রন্থের রচয়িতা।

চিকিৎসাবিজ্ঞান

চিকিৎসাবিজ্ঞানে অসামান্য গবেষণার জন্যে সুইডেনের ক্যারোলিনা ইনস্টিট্যুট এবছর যে তিন বিজ্ঞানীকে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার দিয়েছেন তাঁদের অন্যতম হলেন সুইজারল্যাণ্ডের বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রো-বায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ভারনার আরবের (Werner Arber)। অপর দুজন হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্স হাফ্‌কিনস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডানিয়েল নাথান্স (Daniel Nathans) ও অধ্যাপক হ্যামিলটন স্মিথ (Hamilton Smith)। 'রেসট্রিকশান এনজাইম' সংক্রান্ত অনন্য গবেষণার জন্যে এই তিনজন অণুজীববিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে তাঁরা জীবন গঠনের প্রয়োজনীয় অণুসমূহকে ভাঙতে এবং বিভিন্ন যোগে তাদের পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের গবেষণার দ্বারা যে নতুন জ্ঞান লাভ করা গেছে তার সাহায্যে দৈহিক বিকৃতি, বংশগত ব্যাধি ও ক্যান্সার প্রতিরোধ ও নিরাময় সম্ভব হবে বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন।

ডঃ আরবের-এর বর্তমান বয়স 49। তিনি এখন বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রো-বায়োলজি বিভাবে গবেষণারত আছেন। 1958-59 সালে তিনি সাদার্ন ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসাবে কাজ করেন। 1970-77 সালে বার্কলের ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অণু-জীববিদ্যার পরিদর্শক গবেষক হিসাবেও তিনি কাজ করেন।

ডানিয়েল নাথান্স-এর জন্ম ডেলাওয়ারের উইলমিংটনে 1928 সালে। তিনি 1958 সালে সেণ্ট লুই-এ ওয়াশিংটন স্কুল অফ মেডিসিন থেকে ভেষজবিজ্ঞানে ডক্টরেট হন। 1962-তে তিনি জন্স্‌ হফ্‌কিনস্‌-এর সঙ্গে যুক্ত হন এবং বর্তমানে ঐ সংস্থার অণু-জীববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ। 1967 সালে তিনি অণু-জীববিজ্ঞানে 'সেলম্যান্‌ ওয়াক্সম্যান পুরস্কার' লাভ করেন। 1976 সালে তিনি অণু-জীববিদ্যার ন্যাশনাল আকাদেমি অফ সায়েন্স-ইউ এস স্টীল ফাউণ্ডেশনের পুরস্কার পান। আমেরিকান আকাদেমি অফ আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্স-এরও তিনি সদস্য।

হ্যামিলটন স্মিথ 1936 সালে নিউ ইয়র্ক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। 1952 সালে তিনি বার্কলের ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। 1956 সালে তিনি জন্স-হফ্‌কিনস্‌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিক্যাল ডিগ্রী লাভ করেন এবং 1967 সাল পর্যন্ত এখানেই কাজ করেন।

ডঃ স্মিথ একসময় মার্কিন নৌ-বিভাগে মেডিক্যাল অফিসারের কাজ করতেন এবং মার্কিন স্বাস্থ্য বিভাগের সদস্য ছিলেন। পরে তিনি জেনেটিক্স নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এই গবেষণা করতে করতেই 1970 সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি গবেষণাপত্র। এই গবেষণাপত্রে একটি রেসট্রিকশন এনজাইম

আবিষ্কারের কথা তিনি উল্লেখ করেন। 'হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা' নামে এক ধরনের ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে তিনি এই এনজাইমটির সন্ধান পান। ঐ ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে এটি প্রস্তুত হয় এবং এই এনজাইম আক্রমণকারী ভাইরাসের ডি-এন-একে খণ্ড খণ্ড করে কেটে দিতে পারে। স্মিথের গবেষণাপত্রের

বাঁ-দিক থেকে—অধ্যাপক ডানিয়েল নাথান্স এবং অধ্যাপক হ্যামিলটন স্মিথ

বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিকটি হলো যে, এক একটি রেসট্রিকশন এনজাইম ডি-এন-এর এক একটি অংশেই প্রতিক্রিয়া বিস্তার করতে পারে।

ডঃ স্মিথ 1975-76 গুগেনহাইম ইনস্টিট্যুটের সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ সময়ে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে অণুজীববিদ্যার গবেষণার জন্যে ঐ ইনস্টিট্যুটে কাজ করেন।

পরিষদ সংবাদ

আচার্য বসুর জন্মজয়ন্তী পালন

গত 27. 1. 79 তারিখে বিজ্ঞান পরিষদে 'কুমার প্রমথনাথ রায়' হলে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মদিবস পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রথমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা এবং পরে শ্রীজীবনতারা হালদার। ডঃ আচার্য বসুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান অধ্যাপক মহাদেব দত্ত, শ্রীযুগলকান্তি রায় ও ডঃ জয়ন্ত বসু। এবারের এই জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ দিক হল গ্রাম-বাংলার সঙ্গে মহানগরীর বিজ্ঞান বিষয়ে যোগসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা। নদীয়া জেলার হাঁপানিয়া গ্রামের এক কৃষকভাই শ্রীগনেশচন্দ্র সরকারের পেঁপে চাষে অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্যে পরিষদের তরফ থেকে এদিন তাকে অভিনন্দন জানান হয়। শ্রী সরকারের পরিচিতি দেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীরেবতীরঞ্জন ভৌমিক। শ্রী সরকারও তাঁর চাষ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেন এবং পরে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আচার্য বসুর জীবনের বহু ঘটনার সাক্ষী শ্রীজীবনতারা হালদারের ভাষণে আচার্য বসুর আড্ডার দু-একটি ঘটনা শুনে সকলের মন ভরে উঠে। শ্রীরতনমোহন খাঁর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সভায় পরিসমাপ্তি ঘটে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও বিজ্ঞান কর্মী-সংস্থার যৌথ উদ্যোগে 'পশ্চিম বঙ্গ ও সাম্প্রতিক বন্যা' শীর্ষক আলোচনা সভা।

সভাটি অনুষ্ঠিত হয় 16ই ডিসেম্বর (1978) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে। সভার কাজ চলে দুপুর 2-30 থেকে সন্ধ্যা 7-30 পর্যন্ত।

উদ্বোধন : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতে সভার উদ্বোধন করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। বিজ্ঞান-কর্মী সংস্থার ডঃ রবীন মজুমদার সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। সভার কাজ পরিচালনা করেন ডঃ জয়ন্ত বসু, ডঃ বিনায়ক দত্তরায় ও ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা।

উপস্থিত বিশেষজ্ঞদের নাম : বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী কাননগোপাল বাগচী, কপিল ভট্টাচার্য, দেবেশ মুখোপাধ্যায়, গিরিজাপ্রসন্ন বিশ্বাস, অসীম দাশগুপ্ত, সুহাস চট্টোপাধ্যায়, সুরজিৎ গুহ, নন্দগোপাল মজুমদার ও রাধানাথ ঘোষ। বিশেষজ্ঞদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেন শ্রীসুব্রত পাল :

ডঃ কাননগোপাল বাগচী :

বিষয় : পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদনদী, ক্যানেল, ড্যাম, ব্যারেজ প্রভৃতির ভৌগোলিক অবস্থান ও ঐতিহাসিক পরিচিতি। স্থান ও কালের মাপে বৃষ্টির বণ্টন এবং বন্যার কারণ।

আলোচনার সূত্রপাত করে ডঃ বাগচী বলেন—বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের মানচিত্রে সবচেয়ে বড় নদী গঙ্গা-ভাগীরথী-হুগলী। ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই প্রভৃতি ভাগীরথীর উপনদী। এরা পূর্ববাহিনী এবং এদের উৎস-স্থল ছোটনাগপুর অঞ্চল। উত্তরবঙ্গের নদীগুলির মধ্যে মহানন্দা, তিস্তা জলঢাকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এরা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। রাজ্যের দক্ষিণ অংশের নদীগুলির মধ্যে জলাঙ্গী, ইচ্ছামতী ও মাতলার নাম করা যায়। ইতিহাসের পাতা থেকে দেখা যায় এসব নদীগুলির মধ্যে অনেকগুলিই গতিপথ পরিবর্তন করেছে। তিস্তা এখন যমুনার উপনদী, আগে সোজা বঙ্গোপসাগরে পড়ত। দামোদরও দিক পরিবর্তন করেছে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে।

বন্যার কারণ—পাহাড়ী অঞ্চলে নদী প্রবল বেগে বয়ে আসে। সমতলে এসে বেগের হ্রাস ঘটে। ফলে গতিপথের পরিবর্তনের প্রবণতা বাড়ে এবং মোহনায় পলি জমে চড়ার সৃষ্টি হয়। এটি বন্যার অন্যতম কারণ। মোহনায় ও নদীবুকে পলি জমার পিছনে আছে ভূমিক্ষয়।

সমুদ্র থেকে যে ঝড় উঠে, সেই ঝড়ের গতি ও নদীর গতি সাধারণতঃ বিপরীত। যদি ঝড়ের গতি বেশী হয়, তবে উচ্চ অববাহিকায় (upper catchment) যে পরিমাণ বৃষ্টি হবে, নদীখাতে সেই পরিমাণ জল বয়ে যেতে পারবে না। নদীতীর ছাপিয়ে তখন বন্যা হবেই।

রাস্তা, সেতু প্রভৃতি জলপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে বন্যা হওয়ায় সাহায্য করে।

শ্রীদেবেশ মুখোপাধ্যায় :

বিষয় : উচ্চ অববাহিকার ও জলাধারের সমস্যা।

সমস্যা শুধু উচ্চ অববাহিকার বলে পৃথক করা যায় না। উচ্চ, মধ্য ও নিম্নঅববাহিকার সঙ্গে সমস্যাগুলি একই সূত্রে গাঁথা।

(i) বাঁধ তৈরি করে সম্পূর্ণরূপে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে বাঁধ তৈরি করতে হবে ছোটনাগপুরে, যেটি পশ্চিমবঙ্গের নয়। আবার যেখানে বাঁধ তৈরি হবে সেখানে বিস্তৃত অঞ্চল জলে ডুবে যাবে। এক জায়গায় বান রুখতে অন্য জায়গায় বান সৃষ্টি হবে। তাই বাঁধ তৈরি কতটা কার্যকরী করা সম্ভব সেটা ভাববার বিষয়।

(ii) এবারের বন্যা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার জন্য নয়। পশ্চিমবঙ্গের বহু নদনদী মজে গেছে। নদীর বুকে গড়ে উঠেছে চাষের জমি, বসত বাড়ী, কলকারখানা। ফলে বৃষ্টির জল ও উপরের জল নদী-খাতে প্রবাহিত হতে পারছে না।

(iii) বাঁধ তৈরির সম্ভাব্য ফলাফল—কংসাবতী ও ময়ূরাক্ষীর বাঁধ তৈরির সময় বন্যা নিয়ন্ত্রণের কথা চিন্তা করা হয় নি। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও বিদ্যুৎ—এই তিনটি বিপরীতমুখী। সেচের জন্যে ড্যামগুলিকে ভর্তি করে রাখতে হয় জলে। বিদ্যুতের জন্যে উপরের উচ্চতা ঠিক রাখতে হয়। আবার বন্যা রোধের জন্যে ড্যামগুলিকে জলশূন্য করে রাখা প্রয়োজন। তাই বন্যা রোধ করতে হলে বাঁধ বেঁধে সেচের জল দেওয়ায় সন্দেহ থেকে যায়।

(iv) উপরে ও নীচে একই সঙ্গে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার ফলেই এবারের এই বন্যা। দামোদরের চারিটি বাঁধের মধ্যে উপরের দুটি বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে নয়। বৃষ্টির ফলে জলাধারগুলিতে এবার জল জমে প্রায় 8.51 লক্ষ কিউসেক। জল ছাড়া হয় মাত্র 1·64 লক্ষ কিউসেক। কারণ জলাধারগুলির

জলধারণ ক্ষমতা 6·50 লক্ষ কিউসেকের মত। কিন্তু মাঝ-পথের জলে দুর্গাপুরে এই জলের পরিমাণ হয় 3·80 লক্ষ কিউসেক। মনে রাখতে হবে দুর্গাপুরে জল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই।

(v) প্লাবন নির্ভর করে বৃষ্টির তীব্রতার উপর। কয়েক বৎসরের উপাত্ত– এ উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করে। তিনি বলেন দুর্গাপুর ব্যারেজ কতটা ক্ষতি করেছে তা জনসাধারণের নিকট ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু দুর্গাপুর ব্যারেজ না থাকলে কি ক্ষতি হত সেটা বলা হচ্ছে না। তারপর দেখতে হবে কোন্ বৃষ্টিপাতের জন্যে জলাধার। এ বৎসরের বৃষ্টিপাতের চক্রকাল প্রায় 250 বৎসর। এরূপ বৃষ্টিপাতের জন্যে জলাধার তৈরি করা হয় নি। তার উপর নানা স্বার্থের সংঘাত ঘটে পরিকল্পনাগুলিকে রূপ দিতে, ফলে পরিকল্পনা মত কাজ ব্যাহত হয়।

(vi) মাটি প্রায় 25% বৃষ্টির জল ধরে রাখতে পারে। তাই ভূমিক্ষয় রোধ করার জন্যে বন সংরক্ষণ অতীব জরুরী। কংসাবতী ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় বন-সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। অবশ্য দামোদর পরিল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের এলাকায় বন-সংরক্ষণের কাজ বেশ ভাল ভাবেই সম্পন্ন করা হচ্ছে।

শ্রীকপিল ভট্টাচার্য : শ্রীভট্টাচার্য নিম্নঅববাহিকার সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্যে তাঁর রচিত 'রূপনারায়ণের ভূমিকা' বইটির উল্লেখ করেন। তাঁর মতে জোয়ার-ভাটাই মোহানায় বদ্বীপ সৃষ্টির প্রধান কারণ। রূপনারায়ণে প্রায় 100 মাইল পর্যন্ত জোয়ারের জল উঠে আসে। 3 ঘণ্টা ধরে জোয়ার থাকে, কিন্তু প্রায় 9 ঘণ্টা ধরে ঐ জল ভাটার টানে নামে। বেগের পরিবর্তনের জন্যে মোহনায় চড়া পড়ে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার ফলে প্রাকৃতিক সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়েছে এবং নদীর বহন ক্ষমতা কমে গেছে। তাঁর মতে এই পরিকল্পনায় নানা ত্রুটির জন্যে পশ্চিমবঙ্গ ভিক্ষুক রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

শ্রীনন্দগোপাল মজুমদার : স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে জলের অসম বণ্টনই বন্যার জন্যে দায়ী বলে তিনি মন্তব্য করেন। বণ্টনে সমতা আনার জন্যেই বাঁধ। সারা বৎসর ধরে জলের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে বাঁধের সাহায্যে জল ধরে রেখে। সেচের জন্যে যেমন জল চাই তেমনি বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে জলাধারের কিছু অংশ খালি রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে আসোয়ানের বাঁধের মত বড় জলাধার বানাতে হবে। পরিবেশ সম্পর্কে ভাবতে হবে। বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে।

শ্রীরাধানাথ ঘোষ : দামোদর পরিকল্পনার ব্যর্থতার উপরই তিনি জোর দেন। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের (যেমন Goldwin) পরামর্শমত পরিকল্পনা তৈরি হওয়ায় আমাদের দেশের প্রয়োজন মাফিক পরিকল্পনা হয় নি। কুমুদভূষণ রায়ের মন্তব্য এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। অশোককৃষ্ণ ঘোষের সেন্সার রিপোর্ট থেকে জানা যায় মানুষের দ্বারাই দামোদরের গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে, কোন প্রাকৃতিক কারণে নয়। মানসিংহ রিপোর্টে বলা হয়েছে তাড়াহুড়ো করে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্যই আজকের এই দুরবস্থা। বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায় নিম্নঅববাহিকায় বাঁধ দিয়ে, উপরে বাঁধ দিয়ে নয়। সবার আগে প্রয়োজন নদীখাত ঠিক করা। রাজনৈতিক দলের চাপে দেশের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে পরিকল্পনাগুলিতে।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন বিশ্বাস: মধ্যঅববাহিকা অঞ্চলের সমস্যার উপর আলোচনার সূত্রপাত করেন শ্রীবিশ্বাস। তিনি বলেন বন্যা নিয়ন্ত্রণে মাটির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। বৃষ্টিতে মাটি স্থানচ্যুত হয়। যদি গাছের উপর বৃষ্টি পড়ে, তবে এই সম্ভাবনা কম থাকে। তাই উচ্চঅঞ্চলে বন-সংরক্ষণ করতে হবে, প্রয়োজনে নূতন করে বনাঞ্চল তৈরি করতে হবে। ছোটনাগপুরে এ কাজ ঠিকমত হচ্ছে না। নদী প্রবাহ যাতে স্তিমিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জল স্থির হয়ে অঞ্চলে, পলি থিতিয়ে পড়বেই এবং নদীখাত বুজে যাবে।

শ্রীসুরজিৎ গুহ: শ্রীগুহ বন্যার কারণ, বন্যা প্রশমন এবং বন্যাজনিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার উপর আলোচনার সূত্রপাত করেন।

নদীপ্রবাহ বহুলাংশে নির্ভর করে মাটির গুণাগুণের উপর। তাই photo-morpho-geology বিভিন্ন নদী-প্রকল্পের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদী-প্রকল্পে প্রযুক্তিবিদ, ভূতত্ত্ববিদ, অর্থনীতিবিদ, পরিবেশ-বিজ্ঞানী, প্রকৃতি-বিজ্ঞানী প্রমুখের সমন্বয় প্রয়োজন। মাটির নীচে জল আছে। সেচের জন্যে জলাধার প্রদর্শনের পরিবর্তন দরকার। জলভিত্তিক চাষ রবিশস্যের জন্যে ভাল। ব্যারেজে খরচ অনেক বেশী, মাটির নীচে থেকে জল তোলার তুলনায়। বাঁধগুলি বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্যে রাখাই ভাল। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় পাওয়া যায় মাত্র 78 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। কিন্তু অনুরূপ প্রকল্পে স্পেনের টেনিসি নদীতে উৎপন্ন হয় প্রায় 1800 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ।

শ্রীঅসীম দাশগুপ্ত: অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার আলোচনায় অংশগ্রহণ করে শ্রীদাশগুপ্ত বলেন বহুমুখী নদী প্রকল্প পরস্পর বিরোধী। বাঁধ দিলে নদীর নীচের অংশে পলি জমে। স্থায়ী সমাধানের জন্যে পলি নিকাশের ব্যবস্থা করতেই হবে, তবে যান্ত্রিক উপায়ে পলি নিষ্কাশন খুব বাস্তবোচিত হবে না। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, না সেচ—যেটায় জাতীয় আয় বেশী সেটার উপর লক্ষ্য রেখেই জলাধার ব্যবহার করতে হবে। তবে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির হার অনেক বেশী। সেচের জন্যে যে জল পাওয়া যায় তার বণ্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠু নয়। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় মাঠের ক্যানেলগুলি ঠিকমত না হওয়ায় বহু জলের অপচয় হচ্ছে।

বিরোধ বাঁধলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যেই বাঁধগুলি ব্যবহার করা উচিত। বন্যার ফলে যে ক্ষয়-ক্ষতি হয় তার বড় অংশ বহন করে শহর ও গ্রামবাংলার গরীব জনসাধারণ। গরীবের কথা মনে রেখেই এ সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

শ্রীসুহাস চট্টোপাধ্যায়: পরিসংখ্যানের মাধ্যমে শ্রীচট্টোপাধ্যায় দেখান যে সাম্প্রতিক বন্যায় যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা আমাদের জাতীয় আয়ের প্রায় 20 থেকে 25 ভাগ। এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ভারতের অন্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের গড় আয় অনেক কমে যাবে।

সভার শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানান বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ডঃ রতনমোহন খাঁ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন এই সভায় আলোচনার উপর ভিত্তি করে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও বিজ্ঞান কর্মীসংস্থা যৌথভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণে ও সাম্প্রতিক বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি পূরণে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে জনমত গঠনে সচেতন হবে।

ভ্রম সংশোধন—

নভেম্বর'78 সংখ্যা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' "মাছ চাষের বৈপ্লবিক নিবিড় মিশ্রচাষ পদ্ধতি" শীর্ষক মুদ্রিত প্রবন্ধের 508 পৃষ্ঠায় প্রথম কলামের শেষ দু-লাইনের পাঠ "জলের পি-এইচ ভ্যালুর মাত্রা 6.0 থেকে 6.5 এর" স্থলে হবে "পি-এইচ ভ্যালুর মাত্রা 7.5 থেকে 8.2 এর মধ্যে"। 508 পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয় কলামে, ষষ্ঠ লাইনে, অনুরূপ ভাবে "পি-এইচ ভ্যালু 6.0 থেকে 6.5-এর মাত্রা থেকে বেড়ে গেলে" এর স্থলে হবে "পি-এইচ-ভ্যালু 7.5 থেকে 8.2-এর মাত্রা থেকে কমে গেলে"।

বিজ্ঞপ্তি

1956 সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের 8নং ফরম অনুযায়ী বিবৃতি :—

1. যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006

2. প্রকাশনের কাল—মাসিক

3. মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য ভারতীয়,
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006

4. প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা : শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য ভারতীয়
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006

5. সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা : শ্রীরতনমোহন খাঁ (প্রকাশনা-সচিব ভারতীয়,
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006

6. স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান)
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006

আমি, শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য

স্বাক্ষর :—মিহিরকুমার ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে
প্রকাশক—জ্ঞান ও বিজ্ঞান মাসিক পত্রিকা

তাং—28-2-79

প্রকাশনা সচিব—রতনমোহন খাঁ
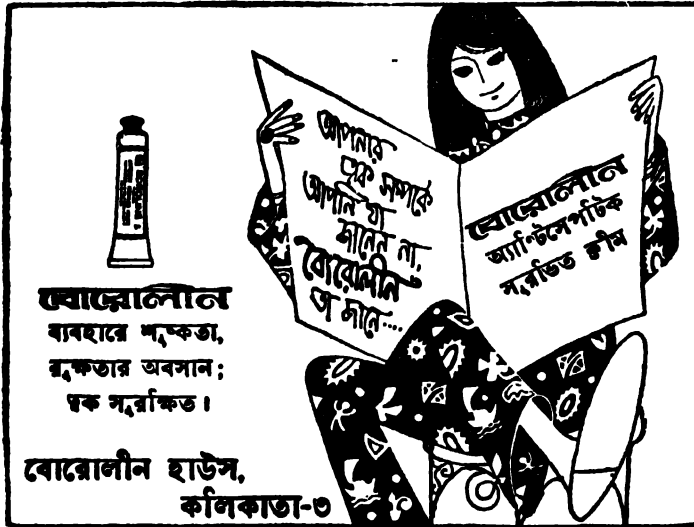
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

সমীক্ষা

['জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার মানোন্নয়নের জন্য এবং স্কুল (মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের) ছাত্রদের জন্য একটি পৃথক বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে আমাদের সমীক্ষায় সহযোগিতা করুন। উত্তরগুলো সম্পূর্ণভাবে আপনার নিজস্ব মতামতের ওপর ভিত্তি করে দিলেই সমীক্ষার কাজ ফলপ্রসূ হবে]

---

1. আপনার বয়স—

2. আপনার পেশা—

(i) (যদি ছাত্র হ'ন) কোন্ স্তরের ছাত্র—

(ক) প্রাথমিক (১ম—৭ম)—
(খ) মাধ্যমিক (৮ম—১০ম)—
(গ) উচ্চমাধ্যমিক (১১শ—১২শ)—
(ঘ) কলেজ (প্রাকস্নাতক)—
(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় (স্নাতকোত্তর)—
(চ) গবেষণা—

(আপনার উত্তরের পাশে ✓ চিহ্ন বসান)

(ii) (যদি শিক্ষক হ'ন) কোন্ স্তরের শিক্ষক —

(ক) প্রাথমিক (১ম—৭ম)—
(খ) মাধ্যমিক (৮ম—১০ম)—
(গ) উচ্চমাধ্যমিক (১১শ—১২শ)—
(ঘ) কলেজ (প্রাক্স্নাতক)—
(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় (স্নাতকোত্তর)—

(আপনার উত্তরের পাশে ✓ চিহ্ন বসান)

3. বিজ্ঞান সম্বন্ধে আপনার আগ্রহ কতটা ?

যথেষ্ট / মোটামুটি / খুব সামান্য / একেবারেই নয়—

আপনার উত্তর—

(i) যদি আগ্রহ থাকে তবে কেন ?

কারণ আপনি (ক) বিজ্ঞানের ছাত্র—
(খ) বৈজ্ঞানিক পেশায় নিযুক্ত—
(গ) বৈজ্ঞানিক চেতনা অর্জন করতে চান—

(ঘ) বিজ্ঞানকে দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য মনে করেন

(ঙ) নিছক জ্ঞান আহরণের জন্য—

আপনার উত্তর (এক বা একাধিক হতে পারে)

(ক, খ, গ, ইত্যাদির মাধ্যমে নির্দেশ করুন) ________

4. আপনি বিজ্ঞানের কোন্ কোন্ পত্রিকা পড়েন ?

____

5. আপনি কি বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য ? উত্তর ________

6. আপনি কি হারে (frequency) 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা কেনেন ?

(ক) প্রতিমাসে (খ) দু'মাসে একবার (গ) ছ'মাসে একবার (ঘ) বছরে একবার

(ঙ) অনিয়মিত (চ) কেনেন না—

আপনার উত্তর (ক, খ, ইত্যাদির মধ্যে যে কোন একটি বসান) ________

7. আপনার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা পড়ার হার

(ক) প্রতিমাসে (খ) দু'মাসে একবার (গ) ছ'মাসে একবার (ঘ) বছরে একবার

(ঙ) অনিয়মিত (চ) পড়েন না—

আপনার উত্তর (ক, খ, ইত্যাদির মধ্যে যে কোন একটি বসান) ________

8. আপনি যদি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' পাঠক হন

(ক) আপনি কি পত্রিকার সমস্ত লেখাগুলো মনযোগ সহকারে পড়েন—

(খ) পত্রিকার সমস্ত লেখাগুলোয় চোখ বুলিয়ে যান—

(গ) তিন / চারটে লেখা মনযোগ দিয়ে পড়েন—

(ঘ) তিন / চারটে লেখায় চোখ বুলিয়ে যান—

(ঙ) এক আধটা লেখার বেশী পড়া হয় না—

আপনার উত্তর (ক থেকে ঙ'র মধ্যে যে কোন একটি) ________

9. আপনি যদি নিয়মিত এবং বিস্তারিতভাবে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' না পড়ে থাকেন তার কারণ কি ?

(ক) 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' আপনার আগ্রহ সৃষ্টি করে না—

(খ) আপনার বিজ্ঞানের বিষয়ে লেখায় আগ্রহ নেই—

(গ) বাংলায় বিজ্ঞান পড়তে আপনার ভাল লাগে না—

(ঘ) বাংলায় বিজ্ঞান বুঝতে আপনার অসুবিধা হয়

(ঙ) আপনি পড়ার যথেষ্ট সময় পান না

(চ) আপনি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা পড়া প্রয়োজন মনে করেন না—

(ছ) আপনি যে কোন বিজ্ঞানের লেখা বা পত্রিকা পড়াই প্রয়োজন মনে করেন না -

আপনার উত্তর (ক থেকে ছ'এর মধ্যে এক বা একাধিক হতে পারে) ....

10 বাংলায় বিজ্ঞান পত্রিকাগুলোর মধ্যে আপনি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'কে কোথায় স্থান দেবেন ?

(ক) প্রথম (খ) দ্বিতীয় (গ) তৃতীয় (ঘ) এক থেকে তিনের মধ্যে নয় -

আপনার উত্তর ....

(i) যদি প্রথম না হয় কোন বিজ্ঞান পত্রিকাকে আপনি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর চাইতে ভাল মনে করেন—

(ক) ....

(খ) ....

(গ) ....

11 গত এক বছরে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর কোন্ দশটি লেখা আপনার সবচেয়ে ভাল লেগেছে (পছন্দ অনুযায়ী সাজান)

1. .... 2. .... 3. ....

4. .... 5. .... 6. ....

7. .... 8. .... 9. ....

0 ....

12. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর ত্রুটিগুলো কি এবং কোন্ মাত্রায় (যেমন—আপনি যদি মনে করেন যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' ভাষা সাধারণত দুর্বোধ্য তবে উত্তরের স্থানে লিখুন সাধারণত ; অথবা আপনি যদি বিচার করতে সক্ষম না হন, লিখুন জানি না)

(ক) দুর্বোধ্য ভাষা (যথেষ্ট / সাধারণত / খুব একটা নয় / মনে হয় না / জানি না) ; উত্তর— ________

(খ) ভুল তথ্য (যথেষ্ট / সাধারণত / খুব বেশী নয় / মনে হয় না / জানি না) ; উত্তর— ________

(গ) নীরস লেখা (যথেষ্ট / সাধারণত / খুব একটা নয় / মনে হয় না / জানি না) ; উত্তর— ________

(ঘ) অপ্রাসঙ্গিক লেখা (যথেষ্ট / সাধারণত / খুব একটা নয় / মনে হয় না / জানি না) ; উত্তর— ________

(ঙ) নতুনত্বের অভাব (যথেষ্ট / সাধারণত / খুব একটা নয় / মনে হয় না / জানি না) ; উত্তর— ________

(চ) প্রয়োজনীয় প্রবন্ধের অভাব (যথেষ্ট / সাধারণত / খুব বেশী নয় / মনে হয় না / জানি না) ; উত্তর— ________

---

13 আপনার মতে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' কাদের জন্য সবচেয়ে বেশী উপযোগী

(ক) সর্বসাধারণের জন্য (খ) স্কুল ছাত্রদের জন্য

(গ) কলেজ ছাত্রদের জন্য (ঘ) সকল ছাত্রদের জন্য

(ঙ) বিজ্ঞান না-জানা পাঠকের জন্য

উত্তর ('ক' থেকে 'ঙ'-র মধ্যে যে কোন একটি বসান) — ________

---

14. আপনার মতে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় কাদের উদ্দেশ্যে লেখা উচিত

(ক) সর্বসাধারণের (খ) স্কুল ছাত্রদের (গ) কলেজ ছাত্রদের

(ঘ) সকল ছাত্রদের (ঙ) বিজ্ঞান না-জানা পাঠকের

উত্তর ('ক' থেকে 'ঙ'-র মধ্যে যে কোন একটি বসান) — ________

---

15. (i) আপনি বিজ্ঞানের কোন্ কোন্ বিষয়ে লেখেন (বা লেখেন না) ________

(ii) আপনি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার জন্য লিখতে আগ্রহী কি ? (হ্যাঁ অথবা না) ________

16. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় মূল্য ও আয়তন কি হওয়া উচিত :

(ক) তিন টাকা — 100 পৃঃ
(খ) দুটাকা — 64 পৃঃ
(গ) দেড় টাকা — 50 পৃঃ
(ঘ) এক টাকা — 32 পৃঃ
(ঙ) 75 পয়সা — 25 পৃঃ

আপনার উত্তর ____________
('ক' থেকে 'ঙ'-র মধ্যে যে কোন একটি)

---

17 আপনার মতে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' স্কুল ছাত্রদের (বিশেষতঃ 8ম-12শ শ্রেণী ছাত্রদের) পক্ষে কতটা উপযোগী

(ক) পুরোপুরি (খ) বেশ কিছুটা (গ) মোটামুটি
(ঘ) খুব বেশী নয় (ঙ) মোটেই নয়

উত্তর ____________

---

18. স্কুল ছাত্রদের (8ম-12শ) বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে কি ?

(ক) নিশ্চয়ই (খ) করলে ভালই হয়
(গ) খুব একটা প্রয়োজন নেই (ঘ) করে কোন লাভ নেই
(ঙ) আপনার এ ব্যাপারে কোন মতামত নেই

আপনার উত্তর (যে কোন একটি) ____________

---

19. আপনার মতে স্কুল ছাত্রদের (8ম-12শ) জন্য

(ক) 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'ই যথেষ্ট
(খ) একটি পৃথক পত্রিকা বের করা প্রয়োজন

উত্তর ('ক' অথবা 'খ') ____________

---

20. স্কুল ছাত্রদের জন্য একটি আলাদা পত্রিকা বের করার কি কি কারণ হতে পারে ?

(ক) বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসার কার্যসূচীতে স্কুল ছাত্রদের ওপর সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত
(খ) 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' স্কুল ছাত্রদের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী নয়
(গ) স্কুল ছাত্রদের জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক পত্রিকা থাকাই বাঞ্ছনীয়
(ঘ) স্কুল ছাত্রদের জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক পত্রিকা অনেক বেশী কার্যকরী হবে
(ঙ) 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর দাম স্কুল ছাত্রদের পক্ষে অত্যধিক

আপনার উত্তর ('ক' থেকে 'ঙ'র সাহায্যে এক বা একাধিক উত্তর বসাতে পারেন)

____

---

21. স্কুল ছাত্রদের উপযোগী আপনার জানা আর কোন কোন্ বিজ্ঞান পত্রিকা আছে ?
(নামগুলো লিখুন)

22. আপনি স্কুলছাত্রদের জন্য আলাদা একটি বিজ্ঞান পত্রিকার কতটা প্রয়োজন অনুভব করেন ?
(ক) যথেষ্ট (খ) মোটামুটি (গ) সামান্য (ঘ) একেবারেই নয়
উত্তর

23. স্কুল ছাত্রদের জন্য এ পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া উচিত
(ক) বছরে একবার (খ) ছ'মাসে একবার (গ) দু'মাসে একবার (ঘ) প্রতিমাসে একবার
আপনার উত্তর

24. এ পত্রিকার দাম ও আয়তন হওয়া উচিত
(ক) 50 পয়সা --- 16 পৃঃ
(খ) 75 পয়সা --- 25 পৃঃ
(গ) এক টাকা --- 32 পৃঃ
আপনার উত্তর (ক, খ অথবা গ)

25. আপনি যদি ছাত্র হন আপনার পাঠ্য বিষয় অথবা শিক্ষক হন শিক্ষকতার বিষয়
ক)
খ)
গ)
ঘ)

26. পাঠ্যসূচীর বাইরে বিজ্ঞানের কোন্ কোন্ বিষয়ে আপনার আগ্রহ আছে
(যেমন পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, কৃষিবিজ্ঞান, ইত্যাদি)

27. বিজ্ঞান ছাড়া আর কোন্ কোন্ বিষয়ে আপনার পড়তে ভাল লাগে (যেমন সাহিত্য, কবিতা, খেলাধুলা, ইতিহাস, সিনেমা, ভ্রমণ কাহিনী, ফিক্‌সন, ইত্যাদি)

28. বিজ্ঞানের পত্রিকায় কি কি বিষয় আপনি পড়তে চান -

(ক) প্রবন্ধ, (খ) বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক অগ্রগতি, (গ) বিজ্ঞানীদের জীবনী, (ঘ) গাণিতিক ধাঁধা, (ঙ) মডেল তৈরি, (চ) বিজ্ঞান সংবাদ, (ছ) বিজ্ঞানের টুকিটাকি, (জ) দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান, (ঝ) বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তর, (ঞ) বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে রচনার অংশ, (ট) বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে রচনার অনুবাদ, ইত্যাদি।

(আপনার উত্তরগুলো পছন্দ অনুযায়ী সাজান ; ওপরের বিষয়গুলো ছাড়া অন্য কোন বিষয়ও যোগ করতে পারেন)

1) 4)

2) 5)

3) 6)

29. আপনার মতে বিজ্ঞানের পত্রিকায়—

ক) স্কুল পাঠক্রমের বিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে সহজভাবে ও আকর্ষণীয়ভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত

খ) পাঠ্যসূচার বাইরের বিষয়বস্তু নিয়েই লেখা উচিত

গ) দুয়েরই প্রয়োজন আছে

উত্তর (যে কোন একটি)

30. বিজ্ঞানের পত্রিকায়—

ক) সমাজবিজ্ঞানের বিষয়গুলো সম্বন্ধেও লেখা উচিত (হ্যাঁ অথবা না)

খ) বিজ্ঞানের সাথে সমাজের সম্পর্ক তুলে ধরা উচিত (হ্যাঁ অথবা না)

গ) দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান কি কাজে লাগে আলোচনা করা উচিত (হ্যাঁ অথবা না)

ঘ) বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে লেখা উচিত (হ্যাঁ অথবা না)

ঙ) বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তি তুলে ধরা উচিত (হ্যাঁ অথবা না)

31 স্কুল ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞানের পত্রিকা বের হলে আপনি কি

ক) নিয়মিত গ্রাহক হতে পারেন

খ) অনিয়মিত গ্রাহক হতে পারেন

গ) গ্রাহক হবেন না

উত্তর ________________

32. আপনি স্কুল ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞান পত্রিকার কি ধরণের পাঠক হবেন ?

(ক) নিয়মিত

(খ) অনিয়মিত—

(গ) একেবারেই নয় উত্তর ________________

33. এই বিজ্ঞান পত্রিকা আপনি কি

(ক) কিনে পড়বেন

(খ) ধার করে পড়বেন

(গ) লাইব্রেরীর মাধ্যমে পড়বেন

(ঘ) পড়বেন না

উত্তর ________________

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ওপরের প্রশ্নগুলো ছাড়াও যদি আপনার কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকে একটি আলাদা কাগজে সেগুলো সংক্ষেপে লিখে এর সাথে জুড়ে দিন।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি 'ডাকযোগে' পাঠানো হয়; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট অপিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4 টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করিবেন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং **মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন।** বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা: প্রকাশনা সচিব, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন: 55-0660.
2. **প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।**
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লিখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4 প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশ-বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রকাশনা সচিব
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে প্রকৃত জনকল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য পরিষদের বর্তমান কর্মসমিতি একান্তই সচেষ্ট, সেই বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাকে সফল করতে হলে সকলের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা চাই। এই উদ্দেশ্যে পরিষদের সদস্যবৃন্দ, দেশের বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞানকর্মী, বিজ্ঞান-সংগঠন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সমাজসেবা সংগঠন, সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং জনসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রতিষ্ঠিত এই মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও প্রসারকল্পে সকলে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসুন, সাহায্য করুন ও পরামর্শ দিন।

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—গুপ্তপ্রেশ, কলিকাতা-700 009

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 2, ফেব্রুয়ারী, 1979

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন ঃ 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বারোমাস পত্রিকার সৌজন্যে।

বন্যা সংখ্যা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাত্রিংশত্তম বর্ষ ফেব্রুয়ারী, 1979 দ্বিতীয় সংখ্যা

গত সেপ্টেম্বর মাসে যে প্রলয়ংকরী বন্যা পশ্চিম বঙ্গের 12টি জেলায় প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে, ছিনিয়ে নিয়ে গেছে প্রায় 7 হাজার মানুষের প্রাণ, বিধ্বস্ত করেছে আনুমানিক 20 লক্ষ ঘর-বাড়ি, বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এই রাজ্যের শতকরা 50 ভাগ অধিবাসীকে, সেই সবনাশা দানবীয় শক্তির উৎস অনুসন্ধান একান্তই প্রয়োজনীয়। বন্যার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজে বের করা এবং তার ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে সঠিক পথের নির্দেশ দেওয়া—বন্যাসম্পর্কিত বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার এই হল মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে 16 ডিসেম্বর 1978 তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই আলোচনার অধিকাংশ অংশই বিভিন্ন প্রবন্ধাকারে ও সংবাদ রূপে বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে।

পশ্চিম বঙ্গে তথা ভারতবর্ষে বন্যা নতুন কিছু নয়। কেবল পরাধীন ভারতেই নয় স্বাধীন ভারতেও প্রতি বছরই কোন না কোন অঞ্চলে বন্যা হয়েছে। 1947 সালের পর বন্যার ফলে বছরে গড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন 2 কোটি মানুষ; যে ফসল নষ্ট হয়েছে, তার মূল্যের বাৎসরিক গড় 100 কোটি টাকারও বেশি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উন্নত দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে বন্যাকে কার্যত অতীতের খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হয়েছে।

ভারতে বৃটিশ শাসনের আগে বাংলার নদনদীর বিন্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেচ ও জল নিকাশের

ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে যথেচ্ছভাবে রেলপথ ও বাঁধ নির্মাণের ফলে সেই ব্যবস্থা বহুলাংশে ব্যাহত হয়, বন্যার প্রকোপ যায় বেড়ে। প্রায় একশো বছর আগে বৃটিশ পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির কাছে স্যার আর্থার কটনের এজাহারে এ বিষয়ের উল্লেখ ছিল। 1927 সালে স্যার উইলিয়াম উইলকক্‌স্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতায় নদী স্বাস্থ্য হানিকর রেলপথ ও বাঁধের বেড়াজালের নামকরণ করেছিলেন 'শয়তানের বেড়াজাল'। আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছিল বৃটিশ সরকারের মাধ্যমে, এ কথা যেমন ঠিক, তেমনি এটাও ঠিক যে, সেই প্রয়োগ দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয় নি, করা হয়েছিল শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার তাগিদে এবং গোষ্ঠীস্বার্থের অনুকূলে। পরিতাপের বিষয়, স্বাধীন ভারতেও সরকারী কাজে অকাজে গোষ্ঠীস্বার্থের আধিপত্য অনেকাংশে বলবৎ আছে, বন্যাসংক্রান্ত আলোচনায় যার প্রমাণ পাওয়া যায় নদীর উচ্চ অববাহিকায় জলাধারের জন্যে নির্দিষ্ট জমি অধিগ্রহণের অক্ষমতা, নদীতীরে যত্রতত্র অপরিকল্পিত টানা বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে।

পশ্চিম বঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণে বৃটিশ সরকারের প্রথম টনক নড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে। 1943 সালের জুলাই মাসে দামোদরের বন্যায় বিধ্বস্ত হল ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ এবং গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। যুদ্ধে সরবরাহের কাজ দারুণভাবে ব্যাহত হল। সরকার দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা জরুরী ভিত্তিতে শুরু করলেন। অ্যামেরিকার টেনিসিভ্যালি কর্পোরেশনের অনুকরণে 1946 সালে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (সংক্ষেপে ডি. ভি. সি.) গঠিত হল। দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের লক্ষ্য কেবল বন্যা নিয়ন্ত্রণই হল না, সেচ ব্যবস্থা ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনও রইল এর লক্ষ্যের মধ্যে।

স্বাধীনতার পর দামোদর উপত্যকা প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে (যদিও তার আদি পরিকল্পনাকে অনেকখানি খর্ব করে)। ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী, ভাগীরথী ইত্যাদি নদীসম্পর্কিত কয়েকটি প্রকল্পও বাস্তবায়িত হয়েছে—অবশ্য সেগুলির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সেচ ব্যবস্থা ও / বা নাব্যতার উন্নয়ন। এতগুলি প্রকল্পের পরও পশ্চিম বঙ্গের নদী স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় নি কেন, তা আলোচনা হওয়া দরকার। সত্তরের দশকেই দু'বার ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেল 1971 ও 1978 সালে। অদূর ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মনকে নাড়াই বা দিচ্ছে কেন ?

বন্যার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞদের অভিমতের মধ্যে কিছু কিছু অমিল থাকলেও বহু ক্ষেত্রেই মিল রয়েছে। এগুলির সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে বর্তমান সংখ্যায়। অল্পবিস্তর মতান্তরের একটি অন্যতম কারণ বোধ হয় এই যে, বিশেষজ্ঞদের অনেকেই কোন না কোন প্রকল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন বা আছেন। স্বভাবতই সেই সব প্রকল্পের প্রতি তাঁদের একটি গভীর মমত্ববোধ আছে। আমরা যেমন প্রিয়জনের দোষ-ত্রুটি দেখেও দেখতে পাই না, প্রকল্পগুলির সম্বন্ধে তাঁদেরও সেই রকম একটি আধা-অন্ধ মনোভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী থাকা প্রয়োজন—তা না হলে সে আলোচনা সার্থক ও ফলপ্রসূ হয় না।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে এই সংখ্যায় (বা অন্যত্র) যে সব পন্থা নির্দেশিত হয়েছে, সেগুলি অনতিবিলম্বে বিশদভাবে আলোচিত হওয়া উচিত। আলোচনার ভিত্তিতে জলাধার, জলনিকাশী ব্যবস্থা, ভূমি সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে নির্দিষ্ট ও সময়-সীমিত কর্মসূচী গ্রহণ করা একান্তই আবশ্যক। কর্মসূচীর রূপায়ণ প্রসঙ্গে প্রায়ই আর্থিক অনটনের কথা বলা হয়। মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশে প্রতিরক্ষা খাতে যে ব্যয়, তার শতকরা মাত্র 2 ভাগের মত ব্যয় হয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে। সুতরাং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে বরাদ্দ 2-3 গুণ বাড়িয়ে দেওয়া আদৌ অযৌক্তিক

নয়, তাছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েক বছর বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি হলেও প্রকল্পগুলি রূপায়িত হবার পর বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ অনেকখানি কমে যাবে

নদীর বুকে পলি পড়ে যেমন নদীর জল বহন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, আমাদের মনেও তেমনি নৈরাশ্যের পলি জমে জমে আমাদের জীবনস্রোত স্তিমিত করে দিচ্ছে। তাই মাঝে মাঝে মন্তব্য শোনা যায়, বন্যা সম্বন্ধে আলোচনা করে আর কী হবে—অতীতের কত আলোচনাপ্রসূত প্রকল্প সরকারী দপ্তরে ফাইলের মধ্যে চাপা পড়ে আছে! কিন্তু সেই কারণেই তো আলোচনার প্রয়োজন আরো বেশি, প্রয়োজন শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলার, যাতে ফাইলের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে শ্রেয় প্রকল্পগুলি বাস্তবে মূর্ত হয়ে ওঠে। আমরা প্রস্তাব করছি, 1978 সালে প্রচণ্ড বন্যার সূত্রপাত যে তারিখে, সেই 27শে সেপ্টেম্বরের স্মরণে পশ্চিম বঙ্গে প্রতি বছর ঐ তারিখটিকে 'বন্যা দিবস' হিসাবে পালন করা হোক, প্রতি বছরই ঐ দিনে বন্যা সম্পর্কিত কার্যধারার পর্যালোচনা করা হোক এবং তাতে কেবল সরকারী মুখপাত্ররাই নন, বিশেষজ্ঞগণ, জনমাধ্যমগুলি, জনপ্রতিনিধিরা এবং প্রয়োজন বোধে জনসাধারণও অংশগ্রহণ করবেন।

জয়ন্ত বসু

"আলিপুর আবহাওয়া অফিসে এই বর্ষণের যে রেকর্ড করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, 28শে সেপ্টেম্বর, 1978 রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত পূর্ববর্তী 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল 390 মিলিমিটার। 28-29 তারিখে মাঝরাত নাগাদ পরিমাণ দাঁড়ায় 500 মিলিমিটারের কাছাকাছি, সারা জুলাই-অগাষ্ট মাসের মোট বৃষ্টিপাতের স্বাভাবিক পরিমাণের থেকেও অনেক বেশী। এবছর (1978) অগাষ্ট মাসে বৃষ্টি হয় 312·4 মিলিমিটার স্বাভাবিক অপেক্ষা 32 মি. মি. কম, অতীতে 24 ঘণ্টায় সবাধিক বৃষ্টিপাতের রেকর্ড ছিল 1900 সালের 10ই সেপ্টেম্বর, তার বিশ বছর পরে 1920 সালে 7ই অগাষ্ট 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছিল 230 মি. মি.। একমাত্র চেরাপুঞ্জী বাদে এত বৃষ্টির নজীর খুব বেশী নেই।"

বারোমাস—নভেম্বর, 1978

আটাত্তরের বন্যা

দেবেশ মুখার্জী*

পশ্চিম বঙ্গে আটাত্তরের বন্যার সমস্যা নিয়ে শুধু যে রাজনীতিবিদ্‌রা বা প্রযুক্তিবিদরাই মাথা ঘামাচ্ছেন তা নয়, বিভিন্ন সমাবেশ ও আলোচনায় অনেক জ্ঞানী-গুণী বিশেষ করে বৈজ্ঞানিকেরা অংশগ্রহণ করে মতামত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যে কোন আলোচনা বা সমালোচনাই হোক না কেন, বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে তথ্যবহুল বিচার-বিবেচনা ছাড়া সাধারণ মতামত গ্রহণযোগ্য হয় না। এটা সকলেরই নিশ্চয় জানা আছে যে বন্যার কারণ ও নিয়ন্ত্রণের সব তথ্য ও সঠিক খবর থাকে সরকারী দপ্তরে। এই সব দপ্তরের কিছু কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে—যেমন আবহাওয়া আফিস, বন্যাসংক্রান্ত পূর্বাভাস আফিস আর কিছু রাজ্য সরকারের অধীনে যেমন সেচ ও জলপথ বিভাগ বা বন্যাসংক্রান্ত ও ত্রাণ বিভাগ। সাধারণ লোকের পক্ষে এই সব কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা শুধু দুরূহই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্ভব। সংবাদপত্রে ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে কিছু কিছু তথ্য থাকে তবে সেই তথ্যের ওপর নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই করা যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রবন্ধের বক্তব্য কতদূর গ্রহণযোগ্য হবে জানি না।

অল্প-বিস্তর বন্যা প্রতি বৎসরই হয়। এই ব্যাপারটা এমনই জিনিষ যে বন্যার কথা ভুলতে আমাদের বেশী সময় লাগে না, কারণ বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যে অর্থব্যয় হয় সেটা সদ্য সদ্য ফলপ্রসূ হয় না আর সেই খরচের কোন প্রত্যক্ষ উৎপাদন (direct return) পাওয়া না। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এই খরচগুলি অউৎপাদনকারী (un-productive) বলে অভিহিত হয়। কারও কারও মতে ঐ খরচটা জলেই যায়। সুতরাং বন্যা যখন আসে ও বন্যার দরুন ক্ষয়ক্ষতি হয় তখনই হঠাৎ আমাদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিরা সজাগ হয়ে ওঠেন ও জনগণের দুঃখকষ্ট কমানোর জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ এমন কি বন্যা নিরোধের ব্যাপারে সজাগ ও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বন্যার প্রবলতা কোন্ বৎসর কত হবে ও তার দরুন কোন্ কোন্ এলাকায় কি রকম ক্ষয়ক্ষতি হবে সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার মত জ্ঞান বা ক্ষমতা বা পদ্ধতি কোন প্রযুক্তি-বিদ্যার মাধ্যমে জানা যায় না। অনেক বছরের সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে পরিসংখ্যানের (statistics) সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন মানের বন্যার চক্রকাল (frequency) নির্ণয় করা সম্ভব হলেও উচ্চমানের বন্যা যে আগামী বছরে বা দু-দশ বছরে হবে না সেটা বলা সম্ভব নয়। আশ্চর্যের বিষয় যে এর মধ্যেই নানান দিক থেকে প্রশ্ন উঠেছে "বন্যা কি প্রতি বছরেই হবে?" যেন আটাত্তরের আগে পশ্চিম বঙ্গে কোন বন্যা হয় নি। অনেকেরই নিশ্চয়ই মনে আছে যে 1956 ও 1959 সালেও এই দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে দারুণ বন্যা হয়েছিল; 1971 সালের বন্যাও কিছু কম নয়। এটা ঠিকই যে আটাত্তরের বন্যা সব দিক থেকেই আগেকার সব রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছে।

বন্যার কারণ যে অতিবৃষ্টি সে বিষয়ে হয়তো কোন দ্বিমত নেই। দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় বছরে গড়ে বৃষ্টি হয় 1300 থেকে 1500 মিলিমিটার। আর সেই তুলনায় কতকগুলি জায়গায় গত বন্যার সময় 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের

*Bl-V. গড়িয়াহাট হাউসিং এস্টেট, কলকাতা-700 029

পরিমাণ হল কলকাতা আলিপুর 370 মিমি., দমদম 327 মিমি., শ্রীনিকেতনে 342 মিমি., মেদিনীপুর 252 মিমি, মুকুটমনিপুর বাঁকুড়া 212 মিমি, পুরুলিয়া 144 মিমি.। গত একশত বৎসরে একদিনে এরকম বৃষ্টি হয় নি বলে শোনা যায়। এমন কি অনেক জায়গায় একদিনে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে সাধারণত, অন্যান্য বৎসরে গড়ে সারা আগষ্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে অত বৃষ্টি হয় না। বন্যার তীব্রতা বৃষ্টিপাতের তীব্রতার (intensity) ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, যেমন ধরুন কলকাতা শহরে যদি ঝিমঝিম করে সারা দিনে রাতে 15 কি 18 সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয় শহরে কোন জলজমার সমস্যা দেখা দেবে না, কিন্তু যদি এক ঘণ্টার 8 সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয় রাস্তাঘাটে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে যাবে। বৃষ্টির তীব্রতা ছাড়া বৃষ্টিপাতের সময়সীমার (duration) ওপর নির্ভর করে বন্যার জলের পরিমাণ, কতদিন সেই সব অঞ্চলে প্লাবন থাকবে ও তার দরুন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। বন্যার উদলেখ (hydrograph) শুধু বন্যার সর্বোচ্চ সীমাশীর্ষই (peak flood) দেখায় না, তার থেকে বন্যার প্রকোপতা (flood volume)-ও নির্ণয় করা যায়। দামোদরের কয়েক বৎসরের বন্যার পরিমাণ থেকে বোঝা যাবে আটাত্তরের বন্যার চেহারা কি রকম ছিল।

	সর্বোচ্চ পরিমাণ	বন্যার Volume
	1000 কিউসেক্স্	1000 একর ফুট
1913 6-12 আগষ্ট	650	3238
1943 3-11 আগষ্ট	296	2245
1950 10-22 জুলাই	338	2199
1956 25-30 সেপ্টেম্বর	420	983
1959 30 সেপ্টেঃ- 3 অক্টোঃ	810	2105
1978 27 সেপ্টেঃ- 12 অক্টোঃ	379 (দুর্গাপুরের নিয়ন্ত্রিত বন্যা।)	3733

অনেকের ধারণা এই বিগত বন্যার কারণ যে সব নদীর উপত্যকায় বাঁধ তৈরি করে জলাধার তৈরি করা হয়েছে, সেই সব জলাধার থেকে অতিরিক্ত মাত্রায় জল ছাড়া অর্থাৎ জলাধারগুলির ব্যর্থতা। এই রকম ধারণার মূল কারণ যে আমাদের দেশের প্রচার মাধ্যম যেমন ভাবে এই বিষয়টিকে সর্বজন সমক্ষে তুলে ধরেছেন আর ছাপার অক্ষরে বড় বড় হরফে যে খবর পরিবেশন করা হয়েছে, তার থেকেই এই ভ্রান্ত ধারণা অনেকেরই বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার লোকেদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। জলাধার তৈরি হয় বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যেমন কংসাবতী ও ময়ূরাক্ষীর বাঁধ তৈরি হয়েছে জলাধারের জলে নীচের এলাকায় প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করার জন্য। সেচের জন্য কখন কোন্ দিনে সেচ এলাকায় কত জলের প্রয়োজন হবে সেটা মেটাবার জন্য সব সময় সাধ্যমত জল জলাধারে ধরে রাখা প্রয়োজন। কোন জলাধার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করতে হলে জলাধারটিকে বর্ষার সময় খালি করে রাখতেই হবে। এবং সেই জলাধারের শূন্য জায়গাটি inviolate reserve হিসাবে গণ্য করতে হবে কারণ কখন বন্যা হবে বা একটা বৃষ্টির মরশুমের (spell) পর যে আর একটা বৃষ্টি হবে না, সেসব সম্বন্ধে আগে থেকে সঠিক হবার উপায় আজ পর্যন্ত অন্ততঃ আমাদের জানা নেই! আবহাওয়ার পূর্বাভাস কিছুটা নির্ভরযোগ্য হলেও তার ওপর কতদূর নির্ভর করে জলাধারের জল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা উচিত সেটা হয়তো এক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে অন্যান্য নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করা হবে। তাছাড়া যে সব নদীর উৎস আমাদের রাজ্যের বাইরে সেই সব এলাকায় কত উঁচু বাঁধ তৈরি করে নতুন এলাকায় বন্যার সমস্যা সৃষ্টি করা কতদূর সম্ভব ও কার্যকরী করা যাবে সেটা হয়তো যাঁরা এই নদীনালা নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করেছেন তাঁরাই ভাল জানবেন। আর তাছাড়া জলাধারের ক্ষমতাও সীমিত ও নদীর অববাহিকার অনেকটা অংশই

জলাধার ও বাঁধের নীচে। সেই এলাকায় যে বৃষ্টিপাত হয় তার থেকেই বিধ্বংসী বন্যা সৃষ্টি হতে পারে ও হয়। আটাত্তরের বন্যায় ময়ূরাক্ষী বাঁধ থেকে সর্বোচ্চ জল ছাড়ার পরিমাণ 27 সেপ্টেম্বর 1,45,000 কিউসেক্‌স্ কিন্তু বাঁধের নীচে সেউড়ির কাছে বন্যার পরিমাণ হয় প্রায় 4,00,000 কিউসেক্‌স্। নীচের এলাকায় (পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি নদীর ক্ষেত্রেই) বৃষ্টির পরিমাণ উপরের অপেক্ষায় বেশী, কম তো নয়ই। ময়ূরাক্ষীর বহন-ক্ষমতা নীচের দিকে মাত্র 30।40 হাজার কিউসেক্‌স্। সুতরাং উপরের বাঁধ থেকে জল যদি না ছাড়াও হত [অবশ্য এই রকম পরিস্থিতি সব দিক থেকে শুধু অবাস্তব নয়, বাঁধের নিরাপত্তার জন্য অসম্ভব] নীচের এলাকাকে প্রবল বন্যার কবল থেকে বাঁচানো যেত না। কংসাবতী নদীর বাঁধ থেকে সর্বোচ্চ জল ছাড়ার পরিমাণ 1,60,000 কিউসেক্‌স্ 2 সেপ্টেম্বরে কিন্তু মেদিনীপুরে সেই দিন কংসাবতীর জলের পরিমাণ 3,50,000 কিউসেক্‌স্ ছিল। মেদিনীপুরের নীচে কংসাবতী দিয়ে নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশী জল বয়ে গেছে। সেপ্টেম্বরের শেষেও যখন কংসাবতী জলাধারে জল এসেছে 90,000 কিউসেক্‌স্ তখন নীচের দিকে জল ছাড়া হয়েছে 61,000 কিউসেক্‌স্। কংসাবতীর সঙ্গে মিলেছিল দ্বারকেশ্বর ও শিলাবতীর বন্যা ও তার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 1,30,000 ও 1,00,000 কিউসেক্‌স্। এই সব জলই রূপনারায়ণ দিয়ে হুগলীতে নেমেছে যখন হুগলী নদীতে প্রচণ্ড জোয়ারের চাপ—ষাঁড়াষাঁড়ির কোটাল। দামোদর ও বরাকর নদীতে নীচের দুটি বাঁধ পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধারে যখন উপর দিক থেকে জল নেমেছে 8,51,000 কিউসেক্‌স্ তখন ঐ দুটি বাঁধের সম্মিলিত ও সর্বোচ্চ জল ছাড়ার মাত্রা ছিল 1,60,000 কিউসেক্‌স্। কিন্তু সেই সময় এই জল ও অনিয়ন্ত্রিত এলাকার (আসানসোল-রাণীগঞ্জ) জল মিলিয়ে দুর্গাপুরের ব্যারাজ থেকে জল নামে 3,80,000 কিউসেক্‌স্। ডি. ভি. সি-র বাঁধের কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের প্রচারমাধ্যমগুলি জনসমক্ষে উপরিউক্ত চিত্রটি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে না পারার জন্যই সাধারণের মনে বাঁধ সম্বন্ধে ও জল ছাড়ার ব্যাপারে এই বিভ্রান্তি ও বিতর্ক।

সব জলাধারগুলি যদি বর্ষার আগে থেকে সম্পূর্ণ খালি করে রাখা হত তা হলেও বন্যা এড়ানো যেত না উপরন্তু বন্যার পরেই ধান, গম ও অন্যান্য রবিশস্যের জন্য জল দেওয়া সম্ভব হত কি? ফলে বাঁধের নীচের এলাকায় শুধু বৃষ্টি থেকেই ঐ সব নদীর নীচের দিকের এলাকাকে বন্যার কবল থেকে বাঁচানো তো যেতই না বরং বন্যার পরেও ঐ সব এলাকায় পরবর্তী বর্ষণ পর্যন্ত কোন চাষ-আবাদ সম্ভব হত না। অজয় নদীতে কোন জলাধার নেই। সেই নদীর অনিয়মিত জলে বন্যা কি রূপ নিয়েছে ও ক্ষয়ক্ষতি কি হয়েছে আশা করি অনেকেরই তা অজানা নেই।

তবে বন্যার পরিমাণ কমানো না গেলেও ক্ষয়ক্ষতি অনেক কমানো যেত ও যায়, যদি—

(1) নদীর পাড়ে যেখানে সেখানে কিছু কিছু লোকের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে টানা বাঁধ (embankment) তৈরি না করা হত।

(2) নদীর বুকে যতদূর পর্যন্ত সাধারণতঃ বন্যার জল পৌছায় (বানভাসি এলাকা) তার মধ্যে জনবসতি, বিশেষতঃ নদীর ভিতর কোন রকম বাধা সৃষ্টি না করা হয়।

(3) নিকাশী খালের ভিতর; এমন কি অনেক নদীর ভিতর বোরো চাষের সুবিধার জন্য ও রবি-শস্যে জল সেচের জন্য বাঁধ দিয়ে বাধা সৃষ্টি না করা হয়।

(4) নদীর পাড়ের নীচু এলাকাগুলিতে ঘের বাধ দিয়ে জমি গড়ে ওঠা ও নদীর পলি জমা বন্ধ না করা হয়।

এইগুলি হল স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা এবং একেবারেই ব্যয়সাপেক্ষ নয়। প্রশাসনকে একটু সজাগ ও দলীয় রাজনীতির বাইরে থাকতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রতিটি নদী-নালার নিকাশী ক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে হবে। হাজামজা নদী ও খাল বিলগুলির পুনর্বিন্যাস করতে হবে। পশ্চিম-বঙ্গের বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের কথা মনে রেখে বন্যা প্রতিরোধ বা নিরোধের কথা না ভেবে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এটা ভুললে চলবে না যে যদি বন্যার সমস্ত জল ওপর এলাকায় ধরে রাখা সম্ভবও হত তবে সেই রকম ব্যবস্থা হলে আমাদের নদীমাতৃক দেশকে নদীহীন মরুদেশে পরিণত করা হবে। এই কয় বৎসরের মধ্যেই দামোদরের বাঁধগুলি রূপনারায়ণ নদীকে মজেহেজে যাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে সেবিষয়ে নিশ্চয়ই অনেকেই অবগত আছেন। রূপনারায়ণ নদীর বর্তমান অবস্থা এই ভয়াবহ বন্যার উগ্রতা ও তাণ্ডবলীলার একটি প্রধান কারণ। প্রয়োজন মত অর্থ খরচ করে অবিলম্বে এই নদীর উন্নতিসাধন করা আশু প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে ভাগীরথী হুগলীর উন্নতি দরকার। কারণ এই নদীই সারা দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের নিকাশী। আর সেই জন্যই 100 কোটি টাকা খরচ করে ফরাক্কা প্রকল্পের রূপায়ণ করা হয়েছে। হুগলী নদীর জোয়ার-ভাটার সমীক্ষা করলে দেখা যায় যে কলকাতায় চিৎপুরের কাছে সর্বনিম্ন ভাটার জলসীমা 1959-এর তুলনায় 1978-এ প্রায় $5\frac{1}{2}$ ফুট উঁচু হয়েছে। ডায়মণ্ডহারবারে ভাটার জলসীমা যথাক্রমে এই 19 বৎসরে 3 ফুটের ওপর উঁচু হয়ে গেছে। এই জলসীমা উঁচু হওয়ার কারণ হুগলী নদীর অবস্থা 1959-এর তুলনায় অনেক খারাপের দিকে যাচ্ছে। এই জলসীমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছে সারা দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের নিকাশীর কার্যকারিতা। আজকের চিন্তাশীল মনীষীদের কাছে একটা কথা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে 1978-এর বন্যা আমাদের কালে প্রথম ভয়াবহ বন্যা নয়। 1956 ও 1959 সালেও বেশ বিধ্বংসী বন্যা হয়েছিল ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 78-এর বন্যার চেয়ে কম হলেও যথেষ্ট হয়েছিল। সেই সব বন্যার পরে সরকার অনুসন্ধানী কমিটিও নিয়োগ করেছিলেন। সেই সময়কার বন্যার যে সব কারণ বিশেষজ্ঞরা নির্ণয় করেছিলেন 78-এর বন্যার কারণও প্রায় একই রয়ে গেছে। তার কারণ সেই সব কমিটির সুপারিশগুলি ফাইল চাপা রয়ে গেছে। এ যাবৎ কার্যকরী করায় বিশেষ কোন চেষ্টাই হয় নি। প্রধান প্রধান কার্যপ্রণালীর মধ্যে ছিল—

(ক) পশ্চিম বাংলার নীচের দিকের সব নিকাশী খালগুলির সংস্কার ও উন্নয়ন।

(খ) সমস্ত নিকাশী খালগুলি ও নদী-নালার বুকে যে সব বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে যেমন টানা বাঁধ তৈরি, জনবসতি বসান, সেচের জলের জন্য আড় (cross) বাঁধ দেওয়া, মাছ ধরার জন্য নদীর মধ্যে নানা রকম বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলির অপসারণ।

(গ) রূপনারায়ণ নদীর উন্নতি সাধন, এর জন্য তলকর্ষণের (dredging) ব্যবস্থা করতেই হবে।

(ঘ) যেখানে-সেখানে নদীর পাড়ে বাঁধ নির্মাণ করে বন্যা প্রতিরোধের চেষ্টা বন্ধ করতে হবে। বাঁধ নির্মাণ সম্বন্ধে আরও সতর্কতামূলক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রত্যেকটি পরিকল্পনা যাচাই করে দেখতে হবে। উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে রাজনীতি মেশানো চলবে না।

(ঙ) সমস্ত রেল লাইন ও রাস্তাঘাট সংক্রান্ত নিকাশী খালের ও নদীনালার ওপর পুলের জল নিষ্কাশনের ক্ষমতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে ও প্রয়োজনমত বাড়াতে হবে।

(চ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সব ব্যবস্থার পরিচালন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে, শাসনে যুদ্ধকালীন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে।

এগুলি ছাড়া অনেক জায়গায় কিছু কিছু স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনা কার্যকরী করাও দরকার। এখনও যদি উপরিউক্ত বন্যার কারণগুলি মনে

রেখে প্রতিকারের চেষ্টা করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে বন্যার প্রকোপের হাত থেকে অনেক কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হবে। তবে এটা ভুললে চলবে না যে, যেহেতু অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে আমরা প্রকৃতির নিয়মকে অগ্রাহ্য করে premature reclamation করে লোকজনের বসতি গড়ে তুলেছি তখন প্রকৃতির অবদান মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টি বিশেষ করে যদি সেই বৃষ্টি যদি নদীর ওপর দিকে ও নীচের অববাহিকায় একই সঙ্গে প্রবল বেগে দেখা দেয় তখন বন্যার প্রকোপ কিছুটা সহ্য করতেই হবে। নদীর বন্যা যে সব সময় ও সব জায়গায় অভিশাপ আনে তা নয়; বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আনে আশীর্বাদ। আর সেই জন্যই বন্যার ব্যাপারটা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সকলে ভুলে যায়। আর একটা কথাও মনে রাখা দরকার—আটাত্তরের বন্যা যে উনআশি, আশি বা নব্বইয়ে আবার হবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

নদীর উপরের বাঁধ ও জলাধারে নদীর বেশীর ভাগ জল আটকে রাখার আর একটা বিপদ আছে। নদীর প্রবাহ কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীর মধ্যে নানারকম আগাছা, বন-জঙ্গল জন্মায়। এছাড়া নদীতে জল না থাকলে বা এমনকি বর্ষার সময়ও জল যদি নদীর খাতে না আসে সাধারণতঃ নদীর চড়ায়, এমনকি নদীর বুকেও চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় ও নদীর জলসীমা উঁচু হতে থাকে। পরবর্তীকালে অল্প জল এলেই নদীর পাড় ছাপিয়ে চতুর্দিকে বন্যার সৃষ্টি করে। সুতরাং বন্যার সময় নদীকে সজীব রাখার জন্যও ওপর দিকের প্রবাহ ক্ষেত্র থেকে জল নামার বিশেষ প্রয়োজন। দামোদরের ক্ষেত্রে প্রতিবার এইরকম জলের তোড় (flushing dose) ওপরের জলাধার (reservoir) থেকে না দিতে পারার জন্য নদীর অবস্থার যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। আটাত্তরের বন্যায় যেখানে জলাধারে এসেছে 8,51,000 কিউসেক্স্ সেখানে ছাড়া হয়েছে মাত্র 1,60,000 কিউসেক্স্। সুতরাং এই জল ছাড়ার জন্য বন্যার সৃষ্টি বলে যেরকম প্রচার চালানো হয়েছে সেগুলি সাধারণ জনগণের মনে কি রকম বিভ্রান্তি এনেছে সেটা বোঝা দরকার ও সকলকে বোঝানো দরকার। এই পরিপ্রেক্ষিতে নদীর ওপর দিকে আরও বাঁধ করে শুধু জলাধার-গুলিকে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজে লাগানো কতদূর সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত হবে সে-বিষয়ে আমার মত অনেকেরই মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পূর্বেকার অনেক বিশেষজ্ঞ কমিটি তাঁদের প্রতিবেদনে এ-বিষয়ে অনেক সতর্কবাণী লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং জল ওপরে আটকে রাখার কথা চিন্তা করার আগে কত সুষ্ঠুভাবে ও কত তাড়াতাড়ি বন্যার জল নীচের দিকে নিকাশের ব্যবস্থা করা যায় সেইদিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত বলে মনে করি। এইসব নিকাশী ব্যবস্থা বহুমুখী নদী পরিকল্পনায় একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে সকলের কাজে হাত দেওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়ন যেন 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' এই অবস্থায় রয়ে গেছে। দামোদরের ওপর দিকে বন সংরক্ষণের কাজ অনেক এগিয়ে গেলেও অন্যান্য নদীগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই রাজ্যের অরণ্যাঞ্চলকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

সামগ্রিক মঙ্গল ও উন্নয়নের দিকে নজর রেখেই নদী-পরিকল্পনা ও জল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা দরকার এবং সেটা বেশ জটিল ব্যাপার সে-বিষয়ে হয়তো কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়

কেন এই বন্যা ?

নন্দগোপাল মজুমদার*

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যার ফলে পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনে কতকগুলি প্রশ্ন জেগেছে। এই বন্যা কেন হল ? এরকম বন্যা কি প্রতি বছরই হবে ? এর কি কোন প্রতিকার নেই ? তবে এত টাকাকড়ি খরচা করে এতগুলি বাঁধ (dam) তৈরি করে কি লাভ হল ?

এই সঙ্গে আরও কতকগুলি প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আমাদের দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কি আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী যে প্রায় প্রতি বছরই দেশের কোন না কোন অংশে বন্যা হয় ? তা হলে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জলে ঘাটতি কেন ? এই প্রবন্ধে এই সমস্যাগুলি নিয়ে সাধারণ ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করা হল।

আমাদের জলসম্পদের মূল উৎস হল বৃষ্টি। এই বৃষ্টির জলের একটা অংশ ঢালু জমির উপর দিয়ে গড়িয়ে নদীনালায় পড়ে এবং নদী বেয়ে অবশেষে সমুদ্রে গিয়ে পৌছায়। কোন নদীর অববাহিকা দিয়ে কোন সময়ে যে পরিমাণ জল নদীতে এসে পড়ে, নদী-খাতের পরিবহণ-ক্ষমতা যদি তার চেয়ে কম হয় তবে বন্যা দেখা দেয়।

আমাদের দেশে সমস্ত বন্যা বা খরা সমস্যার মূল কারণ হল স্থান ও কালের উপর বৃষ্টির অসম বণ্টন। এখানে বছরে মোটামুটিভাবে পাঁচ মাস বৃষ্টি হয়। মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা 85 থেকে 90 ভাগ বৃষ্টি এই পাঁচ মাসে হয়। এই শতকরা 85 বা 90 ভাগ বৃষ্টিও কিন্তু সমান বা প্রায় সমানভাবে পাঁচ মাস ধরে হয় না; হয় কতকগুলি isolated storm-এর মাধ্যমে। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের ফলে কোন নদীর অববাহিকা থেকে সেই নদীতে যে পরিমাণ জল আসে তা যদি সমানভাবে সারা বছরে বা এমনকি পাঁচ মাসে বণ্টন করে দেওয়া সম্ভব হত তা হলে কোন সমস্যা থাকত না। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

পশ্চিমবঙ্গের একটি বন্যাপ্রবণ নদীর কথা ধরা যাক। পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের মুখে এই নদীর গড় বাৎসরিক জল প্রবাহ 7.4 km³ (বা 6 মিলিয়ন একর ফুট); এই গড়-প্রবাহ বেড়ে কোন কোন মারাত্মক বন্যায় বছরে 14.8 km³ (বা 12 মিলিয়ন একর ফুট) ও হয়েছে। এখন এই জলপ্রবাহকে যদি সারা বছরে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যেত তাহলে discharge-এর পরিমাণ দাঁড়াত 8,424 কিউসেক; মারাত্মক বন্যার বছরে হত 16,848 কিউসেক। যদি বর্ষার পাঁচ মাসের উপর সমভাবে বণ্টন করা হত তা হলে ঐ অঙ্কগুলি দাঁড়াত যথাক্রমে 20,160 কিউসেক ও 40,320 কিউসেক। এই discharge নদীটি সহজেই বহন করতে পারে। যদি এভাবে সমগ্র জলপ্রবাহকে বণ্টন করা সম্ভব হয় তাহলে বন্যা, জলসেচ, নাব্যতা নিয়ে কোন সমস্যাই দেখা দিত না। এবার একটা আন্তর্জাতিক নদীর কথা বলি। গ্রীষ্মকালে এই নদীর জল বণ্টন নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ প্রতিবেশী রাষ্ট্রে প্রবেশের আগে নদীটির গড় বাৎসরিক জলপ্রবাহের পরিমাণ 430 km³ (350 মিলিয়ন একর ফুট)। (আমাদের সম্বৎসরের প্রয়োজন 35 km³ অর্থাৎ সমগ্র প্রবাহের শতকরা 8 ভাগেরও কম)। অবশ্য এই প্রবাহের শতকরা 85 ভাগ আসে বর্ষার পাঁচ মাসে। বাকি শতকরা 15 ভাগকে (52.5 মিলিয়ন একরফুট) যদি খরার

*রিভার রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট, হরিণঘাটা

সাত মাসে সমান ভাগ করে দেওয়া যেত তাহলে discharge দাঁড়াত 1,20,000 কিউসেকের বেশী। আমাদের প্রয়োজন এর তিন ভাগের একভাগেরও কম—অর্থাৎ কোন সমস্যাই থাকত না।

এবার অন্য একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু নীচু অঞ্চল আছে যেখানে বৃষ্টির জল জমে যাওয়ার ফলে বন্যা হয়। নদীয়া জেলার হরিণঘাটা এমন একটা অঞ্চল। 1978 সালে 27শে সেপ্টেম্বর থেকে কয়েক দিন ক্রমাগত বৃষ্টির ফলে এ অঞ্চলে প্রচণ্ড বন্যা হয়। এ অঞ্চলে 31শে অক্টোবর মোট বৃষ্টির পরিমাণ 180 সে. মি.। 1977 সালে এ অঞ্চলে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল 205 সে মি.—অথচ কোন বন্যা হয় নি।

উপরের উদাহরণগুলি থেকে এটা বোঝা যাবে যে সারা বৎসরে বৃষ্টিপাতের অসম বণ্টনই আমাদের জলসম্পর্কিত সমস্ত সমস্যার মূলে। এই সমস্যার আংশিক সমাধান করা সম্ভব হয়েছে কতকগুলি নদীতে উপযুক্ত স্থানে বাঁধ (dam) দিয়ে কৃত্রিম জলাধারের সৃষ্টি করে। বর্ষার সময়ে এই জলাধারগুলি পূর্ণ করে রেখে পরে সারাবছর সেই জল বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। কিভাবে বাঁধের পরিকল্পনা করা হয় এবং বাঁধ কি ভাবে কাজ করে নীচে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

প্রথমেই নদীর যে স্থানে বাঁধ দেওয়া হবে সেখানে নদীর সারা বছরের গড় জলপ্রবাহের একটা হিসাব করা হয়। ঐ স্থানের সারা বছরের discharge observation থেকে একটি hydrograph তৈরি করে এই হিসাব করা হয়। তারপরে স্থির করা হয় জলাধারের উচ্চতা কত হবে। এর সঙ্গে জড়িত আছে বাঁধের উপরে নদীর যে অংশ, তার অববাহিকার একটা অংশের নিমজ্জিত হওয়ার প্রশ্ন। আমাদের জনবহুল দেশে এই জমি নিমজ্জিত হওয়ার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জলাধারের উচ্চতা স্থির হওয়ার পরে এর জলধারণ ক্ষমতার হিসাব করা হয়। নদীর উচ্চ অববাহিকার নিমজ্জিত অংশের contour survey থেকে এই হিসাব করা যায়। সাধারণতঃ এই জলধারণ ক্ষমতা নদীর সারা বছরের জলপ্রবাহের একটা ভগ্নাংশ মাত্র। কাজেই বাকী অংশটা জলাধার থেকে বাঁধের নীচে নদীর খাতে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হয়। বাঁধের যে অংশ দিয়ে বাড়তি জল বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে তাকে বলে spillway। এই spillway দিয়ে কত জল বের করার বন্দোবস্ত রাখা হবে সেটা স্থির করা হয় ঐ স্থানে ঐ নদীর flood frequency analysis থেকে।

এই জলাধারগুলি বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন—এর যে কোন এক বা একাধিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। জলাধারের উপরের একটা অংশ বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং নীচের অংশ জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সংরক্ষিত থাকে। সব জলাধারে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে না। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। এই তিনটি উদ্দেশ্য বিভিন্ন এবং পরস্পর বিরোধী। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জলাধারটি যতটা সম্ভব খালি রাখা প্রয়োজন। সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যতটা সম্ভব ভর্তি রাখা প্রয়োজন। বর্ষার প্রথমদিকে কোন বন্যা এলে সাধারণতঃ কোন সমস্যা দেখা দেয় না কারণ, তখন জলাধার প্রায়শঃই খালি থাকে এবং অনেক সময় বন্যার সব জলটাই আটকে দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু এই বন্যা যদি বর্ষার মাঝখানে বা শেষে আসে তখন সমস্যাটা সম্পূর্ণ অন্য আকার নেয়। সাধারণতঃ কোন বন্যা পেরিয়ে গেলে জলাধারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ অংশ পরবর্তী বন্যার জন্য খালি করে রাখা হয়। পরে বন্যা এলে সেই বন্যাকে নিয়ন্ত্রিত করে ছাড়া হয় যে পর্যন্ত না জলাধারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ অংশটি পূর্ণ হয়ে যায়। তার পরে বাঁধের উপরে নদীতে যে discharge আসবে তার সবটাই ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ থাকে না।

প্রশ্ন হতে পারে যে, বাঁধগুলি থেকে যদি বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয় তবে নিম্নউপত্যকায় বন্যা বিধ্বংসী

আকার ধারণ করে কি ভাবে ? উত্তর হচ্ছে, বাঁধের নীচে নদীর যে উপত্যকা তার থেকে প্রবল বৃষ্টির ফলে যে জলপ্রবাহ নদীতে আসে তার উপর তো কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এই জলপ্রবাহ যদি নিম্নউপত্যকার নদীখাতের পরিবহন ক্ষমতার বেশী হয় তা হলে বন্যা হবেই। এই সঙ্গে যদি নদীর উপরের উপত্যকায় বৃষ্টিপাতের জন্য বাঁধ থেকে কিছু জল ছাড়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তবে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যার পটভূমিকা এটাই। এই সঙ্গে একথাটা স্মরণ রাখা দরকার যে, নীচের উপত্যকার অনিয়ন্ত্রিত জলপ্রবাহের সঙ্গে যদি উপরের উপত্যকার অনিয়ন্ত্রিত জলপ্রবাহ মিলত তা হলে পরিস্থিতি আরও বহুগুণে ভয়াবহ হত। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। খবরের কাগজে দেখেছি যে গত 27শে সেপ্টেম্বরের বন্যায় দামোদর এবং বরাকরের সম্মিলিত discharge ছিল 8,51,000 কিউসেক ; কিন্তু এই বন্যার মাঝে কোন সময়ই মাইথন এবং পাঞ্চেৎ বাঁধ থেকে সম্মিলিতভাবে 1,60, 000 কিউসেকের বেশী জল ছাড়া হয় নি। যদি পুরো 8,51,000 কিউসেক জল নদী দিয়ে নেমে আসত তাহলে দামোদরের নিম্ন উপত্যকার অবস্থা কি হত সেটা অনুমান করা যেতে পারে।

একদল বিশেষজ্ঞ মনে করেন কোন নদীতে বাঁধ দিলে নদীর নিম্নউপত্যকার বন্যাপ্রবণতা বেড়ে যায়। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে প্রথম বর্ষার flushing doseটা না পেলে নদীখাতের ক্রমশঃ অবনতি ঘটতে থাকে। ফলে পরবর্তীকালে অপেক্ষাকৃত অল্প জলপ্রবাহে বেশী বন্যা হয়। এ বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে এখানে শুধু একটা কথা বলা যেতে পারে। বন্যা নিয়ন্ত্রণই নদীর বাঁধ দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়—এমন কি মুখ্য উদ্দেশ্যও নয়। সারা বছর যতটা সম্ভব চাষের ক্ষেতে জল দিতে হবে, বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে এবং তার জন্যে সারা বছর নদীর জল ধরে রাখতে হবে অর্থাৎ বাঁধ দিতে হবে। তার ফলে যদি নিম্ন উপত্যকায় বন্যাপ্রবণতা বেড়ে যায় সে সমস্যার সমাধান অন্য উপায়ে করতে হবে। বাঁধ না দেওয়াটা সে সমস্যার সমাধান বলে গণ্য হবে না।

দেখা যাচ্ছে, অনিয়ন্ত্রিত উপত্যকায় প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা দেখা দিতে পারে। এই সঙ্গে যদি উপরের নিয়ন্ত্রিত উপত্যকায় বৃষ্টিপাতের ফলে বাঁধ থেকে জল ছাড়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তা হলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হবে। প্রশ্ন হতে পারে, এমনভাবে কি বাঁধের পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়, যাতে নিয়ন্ত্রিত উপত্যকার সমস্ত জলপ্রবাহ বাঁধের জলাধারে ধরে রাখা সম্ভব হয়? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সেটা নিশ্চয়ই সম্ভব এবং বিদেশে তা করাও হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে মিশরের আসোয়ান বাঁধের উল্লেখ করা যেতে পারে। আসোয়ান বাঁধের উপরে নীলনদের গড় বাৎসরিক জলপ্রবাহ হচ্ছে প্রায় 92 km³ (75 মিলিয়ন একর ফুট) আর আসোয়ান বাঁধের জলাধারের জলধারণ-ক্ষমতা হচ্ছে প্রায় 130 km³ (106 মিলিয়ান একর ফুট) অর্থাৎ নীলনদের বাৎসরিক গড় জলপ্রবাহের প্রায় 40 শতাংশ বেশী। আমাদের দেশেও এরকম বাঁধ তৈরি করা প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে অসম্ভব নয়। কিন্তু দুটি বাধা আছে। এক আর্থিক সমস্যা—এত টাকা কোথা থেকে আসবে ? এ বাধাটা হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে অতিক্রম করা সম্ভব। কিন্তু দ্বিতীয় বাধাটা আরও কঠিন। অতবড় জলাধার করলে যে পরিমাণ জমি জলমগ্ন হবে সে পরিমাণ জমি আমাদের এই জনবহুল দেশে পাওয়া শক্ত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমাদের একটি জলাধারের পূর্ণ জলধারণ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে পারা যাচ্ছে না। তার কারণ হচ্ছে এই জলধারণ-ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করতে গেলে যে পরিমাণ জমি জলমগ্ন হবে সে জমি নানা কারণে অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

এছাড়া একটা নদীর সারা বৎসরের জলপ্রবাহকে আটকে দিলে অন্যান্য সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে পরিবেশগত পরিবর্তন-জনিত সমস্যা। আসোয়ান বাঁধ তৈরি করার পর থেকে নীলনদের উপত্যকায় এই জাতীয় সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন।

তবে সমস্যা তো থাকবেই। সভ্যতার মানেই হচ্ছে প্রকৃতির অধিকারে হস্তক্ষেপ। এই হস্তক্ষেপ প্রকৃতি কোন দিনই প্রসন্ন মনে মেনে নেয় নি: পদে পদে বাধাসৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। আর এই সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করেই এগিয়ে চলেছে মানব সভ্যতার জয়রথ।

প্লাবনের কবলে কলিকাতা

কপিল ভট্টাচার্য*

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, ঝড় বৃষ্টির আক্রমণ, কলিকাতাকে বহুবার সহ্য করতে হয়েছে। বৃষ্টির জলে কলিকাতা ডুবছে, কিন্তু নদীর প্লাবনে নয়। তার কারণ, কলিকাতার চারদিকেই উঁচু বাঁধ। পশ্চিমে হুগলী নদী তীরে 7-8 ফুট উঁচু "স্বাভাবিক" বাঁধ হুগলী নদী তীর ঘেঁসে গড়ে উঠেছে। এটাকে আশ্রয় করেই স্ট্রাণ্ড রোডের পত্তন। আর উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে রেলের বাঁধ। সুতরাং নদীর প্লাবন সহজে কলিকাতায় ঢুকতে পারে না।

বৃষ্টির জলে ডোবা কলিকাতার প্রধান সমস্যা তার সুষ্ঠু জলনিকাশী ব্যবস্থার অভাব। বিদ্যাধরী নদী মজে যাওয়ার পর থেকে দিন দিন এ সমস্যা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া কলিকাতার সংলগ্ন নিম্নভূমিসমূহ সাম্প্রতিককালে উন্নয়নের ফলে উচ্চতর বসতি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। পূর্বে সেটা শহর থেকে নিকাশিত জলের জলাধারের কাজ করতো। সেই লবণ হ্রদ বিধান নগরীতে পরিণত হয়েছে। বিশাল নিম্নএলাকা পূর্ববঙ্গের বাস্তুচ্যুতদের কলোনি হয়ে বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে ডুবে থাকে।

কিন্তু নদীর জলের প্লাবন ইদানীংকাল পর্যন্ত কলিকাতায় বিশেষ প্রবেশ করতো না। হুগলী নদীর জোয়ার, বানের জল, বর্ষাকালে গড়ের মাঠের খেলার মাঠ হাঁটু জলে ডোবালেও 1970-এর আগে শহরের মধ্যে প্রবেশ করে নি। 1978-এর বর্ষাকালে চৌরঙ্গীর সড়ক ডুবেছে, রবীন্দ্রসদনে জোয়ারের জল ঢুকেছে। পূর্বদিকে ইছামতীর প্লাবন (অর্থাৎ পদ্মার বন্যার জল) শহরতলি পর্যন্ত পৌঁছেছে। কেন এমন অবস্থা হলো? স্বভাবতঃই এ প্রশ্ন মনে জাগে।

এমনটি যে হতে পারে, সে কথা আমি গত পচিশ বছর ধরে বলে আসছি। ভাগীরথী-হুগলী-রূপনারায়ণের খাত মজে যাচ্ছে, গভে চর সৃষ্টি হয়ে উচ্চতর হয়ে যাচ্ছে, জোয়ারের উচ্চতা দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। পঞ্চাশের দশকের পূর্বকালে যেখানে বছরে 20।22 দিন বান ডাকতো, আজ সেখানে 180 দিন বান ডাকে। মোহানার 5 মাইল প্রশস্ত মুখ দিয়ে গড়ে প্রায় 20 লক্ষ কিউসেক জোয়ার-বানের জলের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের উপকূল মঞ্চ থেকে আনীত বিপুল পরিমাণ পলিমাটি নিত্য নদীগর্ভ ভরাট করে চলেছে। ফলে নদীর জলতল (water level) ক্রমশঃ উচ্চতর হয়ে পাড়ের বাঁধ উপ্‌ছে

* 18, মদন বড়াল লেন, কলিকাতা-700012

নিম্নতর শহরের ভূপৃষ্ঠে প্রবেশ করছে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার বন্যানিরোধী পাঞ্চেৎ ও মাইথনের বাঁধ দুটি নির্মিত হবার পর থেকেই হুগলী নদীতে এই বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এমনটি হবে আমি পূর্বেই বলেছিলাম। কারণ, তার আগে, মে, জুন, জুলাই মাসে দামোদরের ছোট ছোট বন্যাগুলি, প্রবাহের ভরবেগের সাহায্যে মোহনার খাতের চর কেটে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দিত। দামোদর উপত্যকার বাঁধ নির্মাণের ফলে সেই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে হুগলী নদীতে এই বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে।

জোয়ার-ভাঁটার খেলায় পলিমাটি জমে হুগলী নদীর গর্ভ নিত্যই উচ্চতর হয়ে উঠছে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে ওই গর্ভ এতো উঁচু হয়ে যাবে যে, জলপ্রবাহের পৃষ্ঠ মধ্য কলিকাতার ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 10।12 ফুট উঁচু হয়ে বর্ষাকালে কলিকাতার শহর ডুবিয়ে রাখবে, দীর্ঘকাল ধরে। সে ডোবানো জল শহর থেকে সহজে নিকাশ করা যাবে না, কারণ কলিকাতার চারদিকেই বাঁধ। কাজেই শহরে অতি-বর্ষণ না হলেও, এবার থেকে নদীর প্লাবনের জলেই কলিকাতা বর্ষাকালটায় ডুবেই থাকবে। ওদিকে

ফরাক্কায় গঙ্গায় ব্যারেজ নির্মাণের ফলে গঙ্গা-পদ্মার খাত মজে যাচ্ছে, ফলে পদ্মার বন্যা ঠেলা মেরে মাথাভাঙ্গা, জলাঙ্গী, চূর্নী, ইছামতী দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্লাবিত করে রাখবে।

এ অবস্থার আশু-প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে। আর সে প্রতিকার সম্ভব, নদীর মোহনা দিয়ে জোয়ারের জলরাশির সঙ্গে বিপুল পরিমাণ পলিমাটির আমদানি বন্ধ করাতেই। যে নদী শাসন পদ্ধতিতে এ-কাজ সম্ভব সে প্রকল্পের রূপরেখা (outline of the scheme) আমি বহুপূর্বেই কর্তৃপক্ষের কাছে দিয়েছি।

উক্ত প্রকল্পটি সম্পূর্ণ রূপায়িত করতে 8-10 বৎসর সময় লাগবে এবং প্রায় পাঁচ-শ' কোটি টাকা খরচ পড়বে। কিন্তু পাওয়া যাবে বঙ্গোপসাগর থেকে উত্থিত প্রায় 200 বর্গমাইল নূতন ভূমি। এই নূতন ভূমির বেষ্টনী ডাইকের সাহায্যে মেদিনীপুর জেলার উপকূলে সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের বিভীষিকা হ্রাস পাবে।

ভাগীরথী, হুগলী, রূপনারায়ণ, দামোদর প্রভৃতি একটানা মিষ্টজলের প্রবাহে পরিণত হবে। 30-40 ফুট জলভাঙ্গা (draft) সমুদ্রগামী জাহাজ কলিকাতা বন্দরে যাতায়াত করতে পারবে। হুগলী-রূপনারায়ণের নিম্নএলাকাটি একটি বিশাল বন্দরে রূপায়িত হয়ে যাবে—এখানেই ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা খাতেই এই প্রকল্পের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করা যায়। কারণ এই প্রকল্পের ফলে এখানে একটি ডুবোজাহাজের ঘাঁটি (Submarine base) সমেৎ বিরাট নৌঘাঁটি (Naval base) স্থাপন করা যাবে—দেশের এই অংশে যার একান্ত প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

প্রকল্পটি তিনটি পর্যায়ে রূপায়িত করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে, নদীর মোহানা 15 মাইল থেকে কমিয়ে 2 মাইলে পর্যবসিত করার কাজের break-water এবং dyke নির্মাণের কাজ মাত্র 8-10 কোটি টাকা ব্যয়ে 2-1 বছরেই সম্পন্ন করা যায়। এরই ফলে জোয়ারের প্রকোপ সম্পূর্ণ হ্রাস পাবে এবং পশ্চিমবঙ্গে প্লাবনের ভয় শেষ হবে।

[সম্প্রতি "সোভিয়েত ইউনিয়ন" পত্রিকায় দেখলাম 20 বৎসর পূর্বে আমি যে পদ্ধতি পশ্চিমবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রস্তাব করেছি, প্রায় সেই পদ্ধতি লেলিনগ্রাড শহরকে নেভানদী দিয়ে বালটিক সাগরের জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করবার জন্যে প্রযুক্ত হতে যাচ্ছে।]

"নিম্নাংশে কাঁসাই হলদিয়ার সুষ্ঠু জলনিকাশ ব্যবস্থা না করে, কংসাবতীর বাঁধ নির্মিত হলে মেদিনীপুর জেলায় প্লাবন বৃদ্ধি পাবেই।"

কপিল ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক বন্যা ও ভূমি সংরক্ষণ

গিরিজাপ্রসন্ন বিশ্বাস*

গত কয়েক মাস পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে যে ভয়াবহ বন্যা ঘটে গেল তার নজির কেবল এদেশে বিরল নয়; পৃথিবীর অন্য কোন দেশেও এর নজির মেলে না। দীর্ঘ 14-15 দিন যখন পশ্চিমবঙ্গের নিম্নাঞ্চলের প্রায় সব কটি জেলায় 2 লক্ষ একর জমি জলের তলায় রইল দেখে সেখানকার ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামবাসী স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে নিজের ভাগ্য আর বিধাতাকে অভিসম্পাত করতে করতে উন্মুক্ত অম্বর তলে রেললাইনের ধারে কিম্বা কোন গাছের মাথায় আশ্রয় নিল তখন মরিস মেতারলিঙ্কের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে মুখ থেকে বের হয়ে এল "হে মানব! প্রকৃতিকে যতই তুমি বশীভূত করিতে চাও ততই সে ফুসিয়া গর্জিয়া উঠিবে। তুমি ও তোমার অবদান প্রকৃতির রুদ্ররোষে ক্রীড়নকের মত ব্যবহার পাইবে"।

বাংলাদেশ বিশেষত: নিম্নবঙ্গ পলিমাটির দেশ। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর সীমা থেকে দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরের কূল অবধি বিস্তীর্ণ ভূভাগ গঙ্গা তথা ভাগীরথী ও অন্যান্য উপনদীর স্রোতবাহিত পলিমাটি দিয়ে গড়া। এই মাটি বয়সে অর্বাচীন। এর কোন প্রকৃত স্তরবিন্যাস হয় নি। কিম্বা কোন শিকড়ের প্রভাবে কোন রূপান্তর ঘটে নি।

মাটি হচ্ছে—বালুকণা, পলি ও কাদামাটি—এই তিনের সমন্বয়ে গড়া। গাঙ্গেয় পলিমাটিতে কাদামাটির অংশ শতকরা 35 ভাগের কম এবং পলিমাটির অংশ শতকরা 40 ভাগেরও বেশী। যে কোন বালুকণার আকার ·02 মি.মি. থেকে বড়। আর কাদামাটির কণার আকার ·002 মি. মি. থেকে ছোট। এই দুয়ের মাঝে আছে পলিমাটির কণার আকার অর্থাৎ একটি পলিকণা ·02 মি.মি. থেকে ছোট আবার 002 মি.মি. থেকে বড়।

মাটিতে বন্ধন-গ্রন্থি সৃষ্টি করে কাদামাটি। এটা কাদামাটির বিশেষ ধর্ম। মাটি পৃথিবীর যে অংশেই থাকুক না কেন রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় তিনের সমন্বয়ে গঠিত। তবে কোন মাটিতেই এদের পরিমাণ প্রায়ই সমান থাকে না। এদের মিশ্রণের তারতম্য অনুসারে যেখানে বালুকণার ভাগ শতকরা 80 ভাগের বেশী সেখানকার মাটিকে বলা হয় বেলেমাটি, মেটেল মাটিতে পলি ও কাদামাটির ভাগ থাকে প্রায়ই সমান আর এঁটেল মাটিতে থাকে কাদামাটির ভাগ শতকরা 50 ভাগ থেকেও বেশী।

নিম্ন পশ্চিমবঙ্গের মাটি মূলতঃ পলিমাটি দিয়ে তৈরি হলেও মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশ, মূল ছোটনাগপুর অধিত্যকার পূর্বাংশ ধীরে ধীরে পূর্বে গাঙ্গেয় পলিমাটির তলায় চলে গিয়েছে। এই মাটি প্রায়শঃ লাল আর কঙ্কর-সঙ্কুল। একে বলা হয় লাল কাঁকুরে মাটি। সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে পুরাতন ওড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড ও তৎসংলগ্ন অহল্যাবাই রোড-এর পূর্বে পলিমাটি ও পশ্চিমে লাল কাঁকুরে মাটি; অবশ্য সব জায়গায় এই মাটি ঠিক মাঝ বরাবর যায় নি। এভিন্ন সমুদ্রতীরে পাওয়া যায় লোনামাটি। এটা অবশ্য পলিমাটির একটা বিশেষ রূপ মাত্র।

বন্যার মূল কারণ অত্যধিক বৃষ্টিপাত ও জল নিষ্কাশনের সীমিত পথ। মাটির উপর যে বৃষ্টির জল পড়ে সেটা উপর দিয়ে গড়িয়ে কিম্বা মাটির বিভিন্ন স্তর দিয়ে চুইয়ে নিকটবর্তী কোন নদী-নালায়

13/1/B, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700004

গিয়ে পড়ে। এইভাবে নদীর স্রোতের বেগ বৃদ্ধি করে পরে অসীম সমুদ্রে এসে মিশে যায়।

নদীর জীবনকালকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। শৈশব ও কিশোরকাল যখন নদীর স্রোত থাকে খুব প্রবল এবং ভাঙ্গাগড়ায় খুব পটু। যখন নদীর জল কানায় কানায় ভরে থাকে তখন বলা যায় যৌবন-কাল। তারপর আসে বৃদ্ধকাল যখন নদীর স্রোতের বেগ কমে যায় ফলে স্রোতের বহন শক্তি কমে আসে এবং নদীর তলদেশ বালুরাশিতে ভরে যায়। বৎসরে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে অল্পই জল থাকে। সামান্য পরিমাণ জল বালুরাশির মধ্য দিয়ে চুইয়ে যেতে থাকে। সুতরাং এই সমস্ত নদীর উপর অববাহিকা অঞ্চলে হঠাৎ যদি বেশী বৃষ্টি হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে তখন দুকূল ছাপিয়ে বয়ে যাবে। তার ফলে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হবে এবং মানুষের চরম দুর্দশার সম্ভাবনা থাকবে।

বৃষ্টিবিন্দু যখন সোজাসুজি এসে মাটিকে আঘাত করে তখন মাটির মধ্যেকার পলি ও কাদামাটি সেই বৃষ্টিবিন্দুর চারিদিকে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর চলমান জলধারার সঙ্গে চলতে চলতে কোন জলাধার বা সাগরে এসে মিশে যায়। পলি একবার চলতে শুরু করলে তার গতি রুদ্ধ হতে পারে কোন জলাধারে জমা হয়ে বা সাগরে মিশে গিয়ে। চলতি পথে কোথাও বাধা পেয়ে চলার গতিতে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে না, সাময়িক বিশ্রাম মাত্র হতে পারে। পরের বছর বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে আবার তার চলা সুরু হয়। কিন্তু যদি ঐ জলবিন্দু সরাসরি মাটির উপর না পড়ে কোন গাছের ডালে বা পাতায় আঘাত করে তবে জল বা পাতায় আঘাত করে মাটিতে পড়লেও তখন আর সে শক্তি থাকে না। আর যে বিন্দু গাছের ডালে পড়ে গাছের কাণ্ড দিয়ে নীচে নেমে আসবে সেটা ঐ গাছের শিকড়ের মাধ্যমে মাটির নীচের স্তরে চলে যাবে এবং মাটির স্তর বয়ে ধীরে ধীরে কোন নালীতে গিয়ে পড়বে তারপর অন্য জলধারার সঙ্গে মিশে সাগরে চলে যাবে। ফলে মাটির উপর স্রোতের বেগ খুবই কম থাকবে এবং কোন মাটির বিচ্যুতি ঘটবে না। মাটিতে পলি থাকবেই কারণ পলি মাটির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। হয় কম না হয় পরিমাণে একটু বেশী। পলি আমাদের বিশেষ ক্ষতি করে, জলাধারের গভীরতা কমায়, পাইপ ক্ষয়ে যায় পলির আঘাতে। যদি আমরা মাটির এই পলিকে স্থানচ্যুত হতে না দেই কিম্বা জলস্রোতের সঙ্গে কোন জলাধারে গিয়ে না পড়ে তবে কেবলমাত্র মৃত্তিকা সংরক্ষণ হবে না, আমাদের প্রগতিরও সংরক্ষণ সাধিত হবে।

ক্ষয়িষ্ণু মাটি ক্ষয় পাচ্ছে। এর জন্য দায়ী মাটির আভ্যন্তরিক অবস্থা ও বৃষ্টিপাত। বৃষ্টিপাতের আবার প্রকারভেদ আছে। আমাদের দেশে বৃষ্টিপাত হয় বর্ষাকালে অর্থাৎ জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস বরাবর অর্থাৎ দিনে গড়ে প্রায় 1 সে. মি.। যদি 365 দিন বরাবর হয়, তবে হবে 28 সে. মি.। এর ফলে মাটি স্থানচ্যুত হবে না।

এবিষয়ে মৃৎ-বিজ্ঞানীদের একটা ফরমূলা আছে। তাকে বলা হয় মাসগ্রেভ প্রিনসিপ্‌ল্‌। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, ভূখণ্ডের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, সেই অঞ্চলের ঢাল, উপরিস্থিত গাছপালা বা ফসল এবং ক্ষয় অবরোধের জন্য প্রতিকার পন্থার উপর মাটির ক্ষয় নির্ভর করে। যদি উপরের জল চুইয়ে মাটির নীচে না যেতে পারে, তবে মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে যাবে এবং যাওয়ার পথে যে পলি পড়বে, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

ভারতে অনেকগুলি বহুমুখী যোজনার জন্য বেশ কয়েকটি জলাধার তৈরি হয়েছে তার মধ্যে তিনটি বঙ্গ-বিহার সীমান্তে। জলাধারগুলি প্রায়ই বিহার প্রদেশে এবং নদীর উত্তর অববাহিকা অঞ্চল কেবল মাত্র কাঁসাই বাদে আর সবগুলির বিহারে অবস্থিত। জলাধার তৈরি করার সময় দেখা গিয়েছিল যে অন্ততঃ দেড়-শ' বৎসর এদের জীবনকাল কিন্তু আজ 14-15 বৎসরে দেখা যাচ্ছে পলি জমা হওয়ার ফলে জলধারণ-ক্ষমতা কমে গিয়েছে এবং অচিরেই এরা মরে যাবে।

এই ধরণের ভূমিক্ষয় নিবারণ বা নিয়ন্ত্রণ করার তথা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার অন্যতম পন্থা হল উপর

অববাহিকা অঞ্চলে যেন কোন ফাঁকা জায়গা না থাকে। যেখানে যেমন গাছ ও ফসল হতে পারে সেই রকম ফসল গাছ লাগিয়ে ভূমিক্ষয় প্রায় 20-22 শতাংশ নিবারণ এবং প্রায় ঐ পরিমাণ জল মাটিতে আটকে রেখে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

দামোদর ও তার উপনদীর উপর 4টি, ময়ূরাক্ষী নদীর উপর 1টি এবং কংসাবতী নদীর উপর 1টি জলাধার তৈরি হয়েছে, জলাধারগুলি আজ অনেকটা মজে গিয়েছে। ফলে সামান্য একটু বেশী বৃষ্টি হলেই এগুলি ছাপিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

যখন নদী উপত্যকা যোজনা পরিকল্পনা করা হয়, তখন অন্ততঃ 50 বৎসরের বৃষ্টিপাতের গড়ের লক্ষ্য রাখা হয়েছিল।

গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষে যে স্বল্প সময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে গেল (24 ঘণ্টায় 7 মি. মি. অর্থাৎ 14 ইঞ্চি) এটা সাধারণতঃ হয় না, হলেও 100 বৎসরে একবার হতে পারে। তবে এ কথা ঠিক যে সম্ভাবনা যখন থাকে তখন সামনের বছর এই ধরণের বৃষ্টি হবে না এ-কথা কোন আবহাওয়াবিদ্ হলফ করে বলতে পারেন না।

আমাদের দেশে বৃষ্টি হয় বর্ষাকালে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি জলাধারগুলি কানায় কানায় ভরে ছিল এবং মাটির অভ্যন্তর ভাগও যতটা জল ধরে রাখতে পারে তাদিয়ে পূর্ণ ছিল, ফলে যখন 24 ঘণ্টায় এই পরিমাণ বৃষ্টি হল তখন পরিপূর্ণ জলাধারগুলি জলের চাপে ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। ফলে একই সময়ে সমস্ত জলাশয় থেকে জল ছেড়ে দিল।

এদিকে মধ্য ও নিম্নঅববাহিকা অঞ্চলে সেই সময় অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ায় নিম্নাংশ জলপূর্ণ হল ও জল নীচের দিকে গড়িয়ে যেতে লাগল কিন্তু বাধা পেল পূর্ব-পশ্চিমাভিমুখী রেল রাস্তায় ও জাতীয় সড়কে। ফলে বানের জল ফুঁসে গর্জে উঠল, পাশের উঁচু জায়গা জলময় করতে লাগল।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ ঢাল দক্ষিণাভিমুখী। নদীর গতি দক্ষিণাভিমুখী হওয়া স্বাভাবিক। যেগুলি পূর্বাভিমুখী আছে সেগুলিও মাঝে দক্ষিণাভিমুখী হয়। সুতরাং পূর্বদিকে বাঁকের মুখে তীর ভেঙ্গে জল অনেক দূর ছড়িয়ে পড়ল।

রেলপথ ও জাতীয় সড়কে যে সমস্ত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল সেগুলি এবংবিধ বৃষ্টির পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রতুল। ফলে দক্ষিণে জলস্রোত বাধা পেয়ে ডাইনে ও বামে যত জায়গা ছিল সেগুলিকে প্লাবিত করল। তারপর এই সমুদয় জলের চাপে রেলপথ বা সড়ক ভেঙ্গে নীচের সব ভূভাগকে জল-প্লাবিত করল। কারণ এই রেলপথ ও সড়ক এখানকার মাটি দিয়ে গড়া হয়েছিল। এতে কাদামাটির অংশ কোন জায়গায়ই শতকরা 15/16 ভাগের বেশী নয়। বন্ধনশক্তি কম হওয়ায় পথের মাটি ভেঙ্গে গেল। তাছাড়া এই পথ রক্ষার জন্য পথের ধারে কোন বড় গাছ বসানো হয় নি—যারা মাটি আটকে রাখতে পারে।

বন্যার প্রভাবের উপর গাছপালার অবদান নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যে ধরণের বৃষ্টি হল এতে কোন পন্থাই কার্যকরী হতে পারে না—কেবল প্রকোপ একটু কমিয়ে দিতে পারে মাত্র। আমাদের দেশে যেভাবে যে পরিমাণ জল হয় তাতে বন সংরক্ষণ ও যে ভূমিতে যে ফসল করা যায় তার মাধ্যমে বন্যার প্রকোপ নিশ্চয়ই কমিয়ে দেওয়া যায়।

প্রকৃতির রাজত্বে বৃষ্টি হবেই—কম আর বেশী, কারণ এটা বেনিয়মের রাজত্ব নয়। কম হলে আমরা বলি খরা আর খাল দিয়ে জল এনে ফসল ফলাবার চেষ্টা করি আবার বেশী বৃষ্টি হলে সেই জল আবার খাল দিয়ে বের করে দিই। তখন আবার খালবিল ভেসে যায়, নালা দিয়ে জল নদীতে গিয়ে পড়ে সাগরের পথে। উপরিলিখিত উপায়ে বেশী বৃষ্টিরও প্রকোপ কমানো যায়। তবে ইদানীং কালে সারা বাংলা দেশের উপর দিয়ে যে দুর্যোগ বয়ে গেল, তাতে মানুষের বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে চেয়ে থাকা ভিন্ন অন্য কোন গতি ছিল না।

পরিকল্পিত নদীসংস্কারই বন্যা-নিয়ন্ত্রণের সঠিক পথ

শিবরাম বেরা*

সূচনা—1978 খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে, তথা সারা উত্তর ভারতে যে প্রলয়ঙ্কর বন্যা হয়ে গেল, যে বিপুল পরিমাণ শস্য ও সম্পত্তির ক্ষতি হল ও শত শত জীবনহানি ঘটল, তাতে স্বভাবতই ভবিষ্যতে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের নতুন পথের সন্ধান করা একান্ত কর্তব্য। বর্তমান নিবন্ধে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। বন্যার মূল কারণ অবশ্য প্রচুর বৃষ্টিপাত। তাই উত্তর ভারতে বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করব।

মে-জুন থেকে সেপ্টেম্বর অক্টোবর পর্যন্ত জলীয় বাষ্পপূর্ণ মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সমগ্র উত্তর ভারতে বৃষ্টি হয়। ঐ সময় বেশ কয়েকটি নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড় বঙ্গোপসাগর থেকে উত্থিত হয়ে হঠাৎ এক একটি অঞ্চলের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ বৎসর নিম্নচাপগুলির ফলে প্রথমে উত্তর ভারতে ও পরে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। গত বৎসর হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশে ও তামিলনাড়ুতে। তার আগে ত্রিপুরায়, আসামে ও পূর্ববঙ্গে। এ ছাড়া ব্রহ্মদেশে বন্যার জন্য ঐ নিম্নচাপগুলিই দায়ী। এদের নিয়ন্ত্রণের কোন পথ জানা নেই। কাজেই এই বৃষ্টিকে মেনে নিয়েই বন্যা-নিয়ন্ত্রণের দুটি পথ সম্পর্কে আলোচনা করব—(1) জলাধার নির্মাণ করে বাড়তি জল ধরে রাখা ও (2) নদীপথে বাড়তি জল সাগরে বের করে দেওয়া।

জলাধার নির্মাণ—সাধারণত নদীর উৎসমুখে পার্বত্য উপত্যকায় নদীপথে বাঁধ দিয়ে জলাধার নির্মাণ করা হয় এবং বর্ষায় জল ধরে রেখে পরে সেচের কাজে লাগানো হয়। এইভাবে দামোদর, বরাকর, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী নদীগুলির উপর বেশ কয়েকটি জলাধার নির্মাণ করাও হয়েছে। কিন্তু তবুও এই ভয়ঙ্কর বন্যা হল কেন? জলাধারগুলি আগেই জলপূর্ণ ছিল বলে? তা কিন্তু ঠিক নয়।

ডি ভি. সি.-র কথাই ধরা যাক। এর তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারগুলির বর্তমান জলধারণ ক্ষমতা প্রায় 128 কোটি ঘন-মিটার। অর্থাৎ ঐ জল 128 কোটি বর্গমিটার বা 1,280 বর্গ-কিলোমিটার অঞ্চলে 1 মিটার গভীর হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এখন মাইথন ও পাঞ্চেত পর্যন্ত দামোদর ও তার উপনদীগুলিতে যে অঞ্চলের জল এসে জমা হয়, সেই 17,200 বর্গ-কিলোমিটার অঞ্চলে ছড়ালে ঐ জলের গভীরতা হবে মাত্র 7.5 সেমি বা 3 ইঞ্চি। অর্থাৎ ঐ অঞ্চল থেকে গড়িয়ে আসা মাত্র 3 ইঞ্চি বৃষ্টিজলেই সম্পূর্ণ খালি জলাধারগুলি পূর্ণ হয়ে যাবে, যা দুর্গাপুর পর্যন্ত দামোদরের পার্বত্য-অববাহিকার মাত্র আড়াই ইঞ্চি বৃষ্টিজলের সমতুল্য। অতএব কোন নিম্নচাপের ফলে যদি ঐ অঞ্চলে 2/3 দিনের মধ্যে 16 ইঞ্চি বা 20 ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, তবে সব জলাধার সম্পূর্ণ খালি থাকলেও গড়িয়ে-আসা 12 ইঞ্চি বা 15 ইঞ্চি বৃষ্টিজলের শতকরা 80 ভাগই দুর্গাপুর দিয়ে দামোদর নদীপথে নামবে। যদি জলাধারগুলির অর্ধেক সেচের জন্য জলে ভরে রাখা হয়, তবে গড়িয়ে-আসা বৃষ্টিজলের শতকরা 90 ভাগই ডি. ভি সি-কে দুর্গাপুর ব্যারাজ দিয়ে নদীপথে ছাড়তে হবে। কাজেই বন্যা নিয়ন্ত্রণে জলাধারগুলির ক্ষমতা অতি সীমিত। বাড়তি আর কয়েকটি জলাধার নির্মাণ করলে সেচের সুবিধা ছাড়া বন্যা-নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কাজে আসবে না। কারণ বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য ঐগুলি খালি রাখলে সেচের জল অধিকাংশ বৎসর দেওয়া যাবে না, আবার সেচের

---

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা-70006

জল ধরে রাখলে বন্যা নিয়ন্ত্রণে ঐগুলির সীমিত ক্ষমতাকে কাজে লাগানো যাবে না। সৌভাগ্যক্রমে এ বৎসর (1978) উক্ত অঞ্চলে বেশ কম বৃষ্টি হয়েছে, সেপ্টেম্বরের 3 দিনে প্রায় 8 ইঞ্চির মত। তাই গড়িয়ে-আসা প্রায় 4 ইঞ্চি বৃষ্টিজল জলাধারগুলির দ্বারা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

এছাড়া পলি পড়ে জলাধারগুলির জলধারণ ক্ষমতা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে এবং কোন সময়ে ব্যারাজ বা তার সংলগ্ন বাঁধ ভাঙলে এক বিস্তৃত অঞ্চলে প্লাবন ডেকে আনবে। যেমন এবারে (1978) তিলপাড়ায় ময়ূরাক্ষীর ও হিংলো নদীর উপর ব্যারাজ সংলগ্ন বাঁধ ভেঙে বিস্তৃত অঞ্চলে প্রবল বন্যা হয়েছে।

তুলনামূলক বিচারে সমতলভূমির যেখানে ধান ও পাট চাষ হয়, তার জলধারণ ক্ষমতা অনেক বেশী। কারণ সেখানে 16 ইঞ্চি বা 20 ইঞ্চি বৃষ্টি হলেও তা সমভাবে (বা কিছু বেশী ডাঙাগুলির জন্য) ছড়িয়ে পড়ায় ধান ও পাট চাষের বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি করে না। প্রমাণস্বরূপ এবার যেখানে বাঁধ ভেঙে নদীজল যায় নি, সেখানে শস্য ভালই হয়েছে। তাহলে বাড়তি জল, বিশেষত পার্বত্য অঞ্চলের গড়িয়ে-আসা জলই নদীপথে দ্রুত সাগরে পৌঁছে দেওয়াই বন্যা-নিয়ন্ত্রণের উপায়।

নদীপথ—আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমি সাধারণভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢালু হওয়ায় নদীগুলি মোটামুটি দক্ষিণবাহিনী হলেও এদের পথ অনেক আঁকাবাঁকা। ঐ বাঁকগুলিই নদীর জলপ্রবাহ ব্যাহত করে। যেমন কোন গাড়ী বা কোন চলমান বস্তু সরলরেখা পথে যে গতিতে চলতে পারে, বাঁক থাকলে সে গতিতে চলতে পারে না। গাড়ীর ক্ষেত্রে ব্রেক কষে গতি কমানো হয়। এখানে জলপ্রবাহকে বাঁকের সামনের দিকে বা উত্তল অংশে বাঁধের উপর ধাক্কা দিয়ে গতি কমাতে হয়। ফলে জলের প্রবাহ-মাত্রা যথেষ্ট কমে যায়। এছাড়া সকল বস্তুই সরলরেখা পথে চলতে চায় বলে বাঁকগুলি উত্তল অংশে বা সামনের দিকে জলের স্রোতে ক্ষয় হতে থাকে এবং অপর পারে অবতল অংশে স্রোত না থাকায় পলি জমতে থাকে। এইভাবেই নদী এক কূল ভাঙে আর অন্য কূল গড়ে। (দ্রষ্টব্য 1নং ও 2নং চিত্র) ফলে নদীপথ ক্রমাগত সংকীর্ণ হতে থাকে ও প্রবাহমাত্রা আরও কমে যায়। প্রতিফলিত স্রোতে বাঁকের নীচে অপর পারে আরও বাঁকের সৃষ্টি হয় এবং বাঁকগুলির মাত্রা উত্তল অংশের ক্ষয়ে ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে। এইভাবে বাঁকের সংখ্যা ও মাত্রা বাড়তেই থাকে, যতক্ষণ না নদী একটি বা দুটি অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টি করে নতুন ও সরল পথে চলতে সুরু করে।

বাঁধ ভাঙে কেন ও কোথায়—সাধারণতঃ চারটি কারণে নদীর বাঁধ ভাঙে।

1. ফাটল—নদীর বাঁধে কোন ফাটল সৃষ্টি হলে তার মধ্য দিয়ে জল বেরিয়ে ফাটলকে বাড়িয়ে তোলে এবং পরে বাঁধ ভেঙে যায়। সতর্ক দৃষ্টি রাখলে এটি সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করা যায়।

2. উপ্‌চে পড়া—নদীর জলতল উঁচু হলে যে সকল জায়গায় বাঁধ নীচু, সেখানে জল বাঁধের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং বাঁধ ক্ষয়ে যায়। জলতল খুব উঁচু না হলে এগুলি আটকানো যায়।

3. জলের চাপে—নদীর জলের চেয়ে কৃষিজমির জল নীচু থাকায় নদীজল সর্বত্র বাঁধের উপর পার্শ্বচাপ দেয়। এই পার্শ্বচাপ দু'পারের জলতলের পার্থক্যের সঙ্গে বাড়ে এবং এর জন্য প্রযুক্ত বল জলতলের পার্থক্যের বর্গ-অনুপাতে বাড়ে। অর্থাৎ জলতলের পার্থক্য দ্বিগুণ হলে বাঁধের উপর চারগুণ বল পার্শ্ব-অভিমুখে পড়ে। এর ফলে বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। তবে বাঁধ মজবুত করে গড়লে ও দুর্বল অংশগুলির উপর লক্ষ্য রাখলে এ ভাঙন আটকানো সম্ভব।

4 জলের স্রোতে—পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নদীগুলি আঁকাবাঁকা পথে সাগরে এসে পড়েছে। যতক্ষণ নদী সরল পথে চলে, ততক্ষণ নদীর স্রোত মাঝ বরাবর থাকে এবং বাঁধের উপর কোন আঘাত হানে না। কিন্তু এই চলমান বিপুল জলরাশি

বাঁকের কাছে উত্তল অংশে প্রতিহত হয় এবং প্রবল বেগে ধাক্কা দেয়। শুধু তাই নয়, ঐ স্রোত উত্তল অংশে প্রতিফলিত হয়ে কিছু নীচে অপর পারের বাঁধেও আঘাত হানে। এই আঘাতের ফলে কয়েকটি মুখে ক্ষয়িষ্ণু বাঁধ ভেঙে জলস্রোত দুর্বার গতিতে, অর্থাৎ নদীর মাঝ-বরাবর যে গতি ছিল, সেই গতিতে সব কিছুই মুহূর্তের মধ্যে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই কারণে যে বন্যা হয় তা অপ্রতিরোধ্য। আর জল-

বর্ষায় প্রবল জলস্রোতে ক, খ, গ, ঘ ও ঙ অংশে বাঁধে দ্রুত ক্ষয় ও ভাঙন.
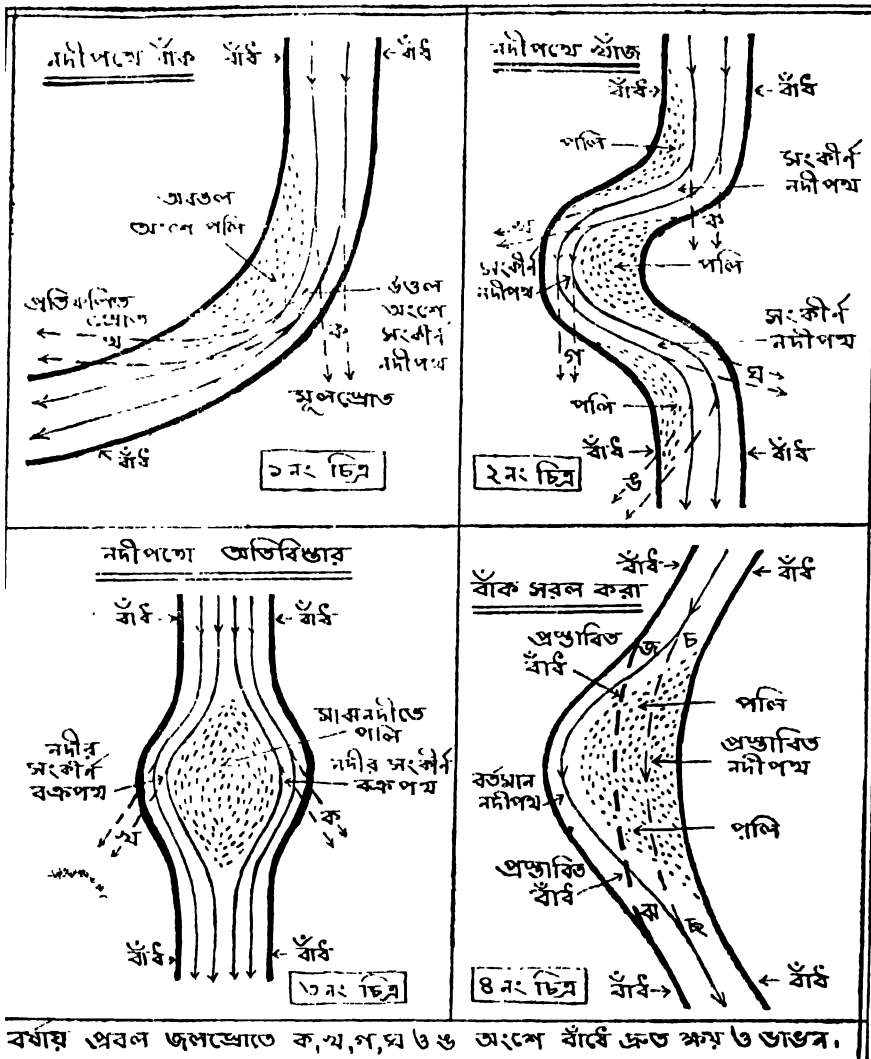
জায়গায় (দ্রষ্টব্য 1নং ও 3নং চিত্রে ক ও খ এবং 2নং চিত্রে ক, খ, গ, ঘ ও ঙ) বাঁধ দ্রুত ক্ষয় পেতে থাকে। প্রতি মুহূর্তের প্রবল জলস্রোতে সেই ক্ষয় আটকানো সম্ভব নয়।

কিছু পরে পার্শ্বচাপজনিত বল ও প্রবল স্রোতের বৃদ্ধির হার ও স্রোত প্রবল হওয়ায় ক্ষতি অনেক বেশী হয় এবং দুর্গতদের উদ্ধার বা ত্রাণের কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। মনে হয় যেন সমস্ত নদীটাই মাঠ ও জমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নদী এইভাবে পথও পরিবর্তন করে।

যদি উপযুক্তভাবে অনুসন্ধান করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, এই কারণই অধিকাংশ অর্থাৎ প্রায় শতকরা 75 ভাগ বাঁধ ভাঙা ও প্রবল বন্যার জন্য দায়ী।

বন্যা-প্রতিরোধের সঠিক পথ ও পরিকল্পিত নদী খননের মূলকথা

প্রথম অংশ—সরলরৈখিক পথ—উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নদীর বাঁকগুলিই (1) জলপ্রবাহ ব্যাহত হওয়া, (2) উত্তল অংশে বাঁধ ক্ষয়ে যাওয়া, (3) অবতল অংশে পলি পড়ে নদীপথ সংকীর্ণ হওয়া, (4) জলপ্রবাহ কমে জলস্ফীতি হওয়া এবং (5) চতুর্থ কারণে জলের স্রোতে বাঁধ ভেঙ্গে প্রবল বন্যা হওয়া ইত্যাদির জন্য দায়ী। সুতরাং বন্যা-নিয়ন্ত্রণের উপায় হল নদীপথকে এমনভাবে খনন করা যাতে বাঁকগুলি না থাকে। এইরূপ পরিকল্পিতভাবে খনন করলে—

(1) নদীর বাঁক না থাকায় প্রবাহ কোথাও বাধা পাবে না, ফলে প্রবাহমাত্রা বাড়বে, (2) নদীপথ পূর্বের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ঢাল বেড়ে প্রবাহমাত্রা বাড়বে। (যেমন মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ভাগীরথী ও জলঙ্গীর পথ অনেক সংক্ষিপ্ত হয়ে ঢাল বাড়বে), (3) নদী মোটামুটি মাঝ-বরাবর বইবে, এর পথের এক অংশে পলি পড়ে পথ সংকীর্ণ হবে না, ফলে প্রবাহমাত্রা বাড়বে, (4) নদীর স্রোত মাঝ-বরাবর থাকায় চতুর্থ কারণে বাঁধ ভেঙ্গে প্রবল বন্যা হবে না, যে বন্যা শতকরা 75 ভাগ ক্ষেত্রে ঘটে এবং অপ্রতিরোধ্য, (5) পথ সরলরৈখিক হওয়ায় এবং বাঁকের অবতল অংশে যে পলি জমত তা না জমায় নদী সহজে মজে যাবে না, (6) নদীর জলের স্রোত নদীখাতমুখী হওয়ায় যেটুকু পলি পড়বে তার অনেকটা বর্ষায় ধুয়ে যাবে, (7 বাঁক না থাকায় প্রতিফলিত স্রোতে নতুন নতুন বাঁকের সৃষ্টি হবে না, (8) নদীর স্রোত বাঁধের উপর আঘাত না হানায় বাঁধের ক্ষয় কম হবে এবং বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হবে, (9) পথ সরলরৈখিক হওয়ায় ভবিষ্যতে নদীর পথ পরিবর্তনের সম্ভাবনা কমে যাবে এবং (10) পথ ছোট হওয়ায় পুরান পথের বেশী জমি পাওয়া যাবে।

সরলরৈখিক পথ সর্বোত্তম হলেও নদীপথ সর্বত্র সরলরেখা বরাবর করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বাঁকগুলির সংখ্যা ও মাত্রা কমিয়ে এনে নদীপথকে প্রায় সরলরৈখিক করে দিতে হবে। সহজভাবে বলতে গেলে যেমন গাড়ীর দ্রুতগতি বজায় রাখার জন্য জাতীয় সড়কগুলিকে ছোট বাঁক ও খাঁজমুক্ত করে প্রায় সরলরৈখিক করে গড়া হয়েছে, ঠিক তেমনি জলের দ্রুতগতি বজায় রাখার জন্য নদীপথগুলিকে সকল ছোট বাঁক ও খাঁজমুক্ত করে এক একটি জাতীয় জলপথরূপে গড়ে তুলতে হবে। তবুও যেখানে বাঁক থাকবে সেখানে অবতল অংশের মাটি কেটে উত্তল অংশে ফেললে বাঁকের মাত্রা কিছুটা কমবে। (দ্রষ্টব্য 4নং চিত্র)

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ভাগীরথী ও জলঙ্গীর পথে অজস্র বাঁক থাকায় নদীর বাঁধ 1978 খৃষ্টাব্দের বন্যায় অসংখ্য স্থানে ভেঙেছে, কিন্তু চন্দননগরের দক্ষিণে হুগলীতে, কুলগাছিয়ার দক্ষিণে দামোদরে এবং কোলাঘাটের দক্ষিণে রূপনারায়ণে বাঁকের সংখ্যা ও মাত্রা কম হওয়ায় নদীর বাঁধ বিশেষ কোথাও ভাঙে নি। এতেই বোঝা যায় যে, বাঁকের সংখ্যা ও মাত্রা কম হলে বা বাঁকগুলির বক্রতা-ব্যাসার্ধ কয়েক মাইল হলে বাঁধ ভাঙার সম্ভাবনা কমে যাবে, কারণ বক্রতা-ব্যাসার্ধ বাড়লে জলের দ্বারা বাঁধের উপর প্রযুক্ত অপকেন্দ্রিক বল কম হবে।

দ্বিতীয় অংশ—বিস্তার ও গভীরতা— নদীপথগুলি কোথাও বেশ সংকীর্ণ, আবার কোথাও বা অতি বিস্তৃত। সংকীর্ণ পথে নদীর যে গতি থাকে, জল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় বিস্তৃত পথে সেই গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। এতে বিস্তৃত পথের সর্বত্র বিশেষ করে মাঝনদীতে পলি জমতে থাকে ও ঐ অঞ্চলের নদীখাত উঁচু হয়ে ওঠে। এ ছাড়া নদী দু-ধারে

বক্রপথে প্রবাহিত হয় এবং বাঁধ ভেঙে বন্যার সম্ভাবনা থাকে (দ্রষ্টব্য 3নং চিত্রে ক ও খ)। এটাই গঙ্গা, পদ্মা প্রভৃতি নদীর ভাঙনের কারণ। অনুরূপভাবে গভীরতার তারতম্যও নদীখাতে পলি জমতে সাহায্য করে। কাজেই নদীকে প্রায় সমবিস্তৃত ও গভীর করা দরকার। আবার যেহেতু জলের গতি নদীর তীর ও তলদেশ থেকে দূরত্বের সঙ্গে বাড়ে, সেহেতু নদীর বিস্তার ও গভীরতার অনুপাত দুই-এর কাছাকাছি হলে প্রবাহমাত্রা সবচেয়ে বেশী হবে। বিস্তার কমিয়ে ও গভীরতা বাড়িয়ে বিস্তার ও গভীরতার অনুপাতকে কমিয়ে আনতে হবে। তখন নদী সর্বত্র সমগতিতে ছুটে চলবে ও নদীবক্ষ পলি পড়ে মজে যাবে না।

তৃতীয় অংশ—ঢাল—মনে রাখতে হবে ঢাল নদীতে গতি সঞ্চার করে। কাজেই যেখানে নদীপথে ঢাল কম বা নেই, সেখানে নদীকে নতুন পথে বা অন্য কোন নদীখাতে ঘুরিয়ে দিতে হবে। কারণ পাহাড়ী পথ থেকে দ্রুতগতিতে নেমে আসা বিপুল জলরাশি ঐ সব ঢালহীন পথে জমে যাওয়ায় নদী স্ফীত হয়ে উঠবে ও বাঁধ উপচে বন্যা হবে। এছাড়া গতি স্তব্ধ হওয়ায় নদীখাতের সর্বত্র পলি পড়বে। রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢালু হওয়ায় কয়েকটি নদীর পূর্ববাহিনী অংশে, যেমন মেদিনীপুর জেলায় কংসাবতী ও শিলাবতী এবং বর্ধমান জেলায় দামোদর ও অজয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে, এরূপ নদীপথের সন্ধান করা দরকার, যাতে নদীটির গতিমুখ ও অঞ্চলটির ঢাল পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সহজভাবে বলতে গেলে যেমন জাতীয় সড়কগুলিকে বিভিন্ন শহরের মধ্যে অনাবশ্যক ঘুরপথ পরিহার করে সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত পথে যোগ করা হয়েছে, ঠিক তেমনি জাতীয় জলপথগুলিকে প্রয়োজনমত নতুন পথ কাটিয়ে সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত ঢালুপথে সাগরে পৌঁছে দিতে হবে। এই পথটি এমনভাবে খুঁজে নিতে হবে, যেন নদী তার পাহাড়ী পথে অর্জিত দ্রুতগতি যতদূর সম্ভব বজায় রাখতে পারে। বিষয়টি পরে আলোচিত হবে, শুধু মনে রাখতে হবে যে সংক্ষিপ্ততর নদীপথই অপেক্ষাকৃত ঢালু ও অধিকতর গতিসম্পন্ন।

চতুর্থ অংশ—মূলনদী ও উপনদীর পথ—অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি উপনদী মূলনদীতে প্রায় লম্বভাবে পতিত হয়েছে। এতে শুধু যে উপনদীটির জল-নির্গমনে অসুবিধা হয় তাই নয়, যে মূলনদীটি উপনদীর জল বহন করে তাতে উপনদীর জলের গতি সঞ্চারিত হয় না, পরন্তু উপনদীর জলের গতি মূলনদীর জলপ্রবাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ফলে ঐ অঞ্চলে উভয় নদীতে জলের গতি স্তিমিত হওয়ায় জলস্ফীতি হয়ে বন্যার প্রকোপ বাড়ে এবং উভয় নদীখাতই পলি পড়ে দ্রুত মজে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, শিলাবতী দ্বারকেশ্বর নদে, হুগলী রূপনারায়ণ নদে এবং অজয় ভাগীরথী নদীতে প্রায় লম্বভাবে পতিত হওয়ায় ঐ অঞ্চলে উভয় নদীখাতই দ্রুত মজে যাচ্ছে ও বন্যার প্রকোপ বাড়ছে। সেইজন্য উক্ত নদীগুলিকে এমনভাবে পরিচালিত করা উচিত, যাতে জলনিকাশী নদীপথটির সঙ্গে উভয় নদীপথই সুসামঞ্জস্য হয়ে ওঠে। তখন উপনদী ও মূলনদী উভয়েই দ্রুতগতিতে ছুটে চলবে, নদীখাতে পলি পড়া কমবে এবং বন্যার সম্ভাবনা কমে যাবে। বিষয়টি পরে বিভিন্ন নদী পরিকল্পনা অংশে আলোচিত হবে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, গতিই নদীর প্রাণ ও সেই গতি সঞ্চারের জন্য চারটি জিনিষ একান্ত দরকার—(1) প্রায় সরলরৈখিক ও সংক্ষিপ্ত পথ, (2) সুষম বিস্তার ও গভীরতা, (3) সর্বত্র ঢাল ও (4) উপনদী ও মূলনদীর মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ পথ। এই চারটি জিনিষ থাকলে নদীর প্রবাহমাত্রা বহুগুণ বেড়ে যাবে, নদী তার নিজের পথ নিজেই কেটে চলবে এবং সহজে মজে যাবে না। জল দ্রুত সাগরে চলে যাওয়ায় ও বাঁধ না ভাঙায় বন্যার সম্ভাবনা প্রায় বিলুপ্ত হবে। নদী কখনও সংহারমূর্তি ধারণ করবে

না ও দেশ সুজলা সুফলা হয়ে উঠবে। এটি পরিকল্পিত নদী সংস্কারের মূলকথা।

পঞ্চম অংশ—পলির আশীর্বাদ—পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চলে কয়েকটি নিম্নাঞ্চল বা বেসিন আছে, যেখানে বন্যা হলে জলের গভীরতা খুব বেশী হয়। নদীর পলি দিয়ে ঐ সব অঞ্চল উঁচু করা দরকার। অগাষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ধানগাছগুলি যখন 2 ফুট বা 3 ফুট হয়, অথচ শীষ আসে নি, তখন নিম্নাঞ্চলের বৃষ্টিজল পর পর কিছুদিন ভাটার সময় বের করে, পরে জোয়ারের সময় নদীর জলে ভরে নেওয়া যায়, যদি জোয়ারের সময় ঐ অঞ্চলের নদীর জল বর্ষাকালে লবণাক্ত না থাকে। অথবা নিম্নাঞ্চলের বৃষ্টিজল ঐ সময় প্রথমে জলনিকাশী পথে এক নদীতে বের করে পলিসমেত অন্য নদীজলে পূর্ণ করা যায়। যেমন (1) হাওড়া জেলায় আমতা নিম্নাঞ্চলের বৃষ্টিজল কেঁদুয়া খাল দিয়ে হুগলীতে বের করে পরে দামোদরের জলে ভরে নেওয়া যায়; (2) মেদিনীপুর জেলায় দাসপুর নিম্নাঞ্চলের বৃষ্টিজল রূপনারায়ণে বের করে পরে শিলাবতীর জলে ভরে নেওয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে অন্যান্য নিম্নাঞ্চল উদ্ধার করার সম্ভাবনা বিবেচনা করতে হবে। অবশ্য এজন্য নদী ও কৃষিজমির জলতলের উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ দরকার। কয়েক বৎসর বারবার এরূপ করলে শুধু যে নিম্নাঞ্চলগুলি উঁচু ও উর্বর হয়ে উঠবে তাই নয়, নদীতে পলির পরিমাণও কমবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য অঞ্চলও উর্বর করা যেতে পারে। আবার যেহেতু নদীর পলির সঙ্গে অসংখ্য মাছের ডিম ও ছোট্ট মাছ মিশে থাকে, সেহেতু ঐসব অঞ্চলের ধানজমিতে ও তাদের সংলগ্ন জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যাবে। তখন নদীর পলি আমাদের কাছে অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হয়ে উঠবে।

আসলে প্রথম বর্ষায় নদীতে যে ঢল নামে, তাতে প্রচুর খাদ্য থাকায় সমুদ্র থেকে মাছের ঝাঁক নদীপথে উঠে আসে এবং ঐ সব মাছ নদীর মিষ্টজলে ডিম ছাড়ে। কিন্তু আজ জলাধারগুলিতে জল ধরে রাখায় দামোদর, রূপনারায়ণ, কংসাবতী প্রভৃতি নদীতে আর প্রথম বর্ষার ঢল নামে না, মাছও আসে না। তাই মাছের ডিম সংগ্রহের জন্য সুবর্ণরেখার উপর নির্ভর করতে হয়। আমার মনে হয়, প্রথম বর্ষার জল জলাধারে ধরে না রেখে নদীপথে ছেড়ে দিলে শুধু যে মাছের ঝাঁক আসবে তাই নয়, প্রায় শুকনো মাটির উপর হঠাৎ-আসা ঐ জলধারা নদীখাত কাটাতে সাহায্য করবে। এছাড়া নদীর উপত্যকায় বনাঞ্চল গড়ে তুললে নদীতে ও জলাধারগুলিতে পলি কম আসবে এবং যে পলি আসবে তার উর্বরতা শক্তি বেশী হবে ও মাছের প্রচুর খাদ্য থাকবে। মনে পড়ে ছেলেবেলার দিনগুলির কথা, যখন আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বৃষ্টিজলের সঙ্গে নদীর ঘোলাজল মিশে চাষ হত এবং সার ছাড়া প্রচুর ফসল ও মাছ পাওয়া যেত। তাই সেদিন চাষীর ছিল গোলাভরা ধান ও পুকুরভরা মাছ, যা ছিল ঐ নদীরই দান। আজ মায়ের মত সেই নদীকে আমরা জলাধারে বেঁধেছি, তাই প্রাচুর্যের দিনগুলিকে হারিয়ে ফেলেছি।

ষষ্ঠ অংশ—সেতু ও ব্যারাজ নির্মাণ—যানবাহন চলাচলের জন্য নদীর উপর সেতু নির্মাণ করতে হয়, যার থামগুলি জলপ্রবাহকে যথেষ্ট বাধা দেয় ও পলি পড়তে সাহায্য করে। কাছাকাছি বাঁক থাকলে সেতুর একদিকে পলি জমায় নদীপথ আরও সংকীর্ণ হয়। ঐ সংকীর্ণ পথে নদীর প্রবল স্রোতে সেতু ভেঙে যেতে পারে। তাই কোন বাঁকের কাছে বা নদীর সংকীর্ণ অংশে সেতু নির্মাণ করা উচিত নয়। বর্তমানে যেখানে নদীর বাঁকের নিকট সেতু আছে, যেমন মহিষরেখায় দামোদরের উপর বা কোলাঘাটে রূপনারায়ণের উপর, সেখানে নদীকে এমনভাবে খনন করতে হবে, যেন সেতুর দু-দিকে অন্তত পাঁচ মাইল পথ প্রায় সরলরৈখিক হয়ে উঠে। যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে নদীপথ যতদূর সম্ভব সরল করে অবতল অংশে জমা পলি প্রতি বৎসর সরাতে হবে। ঐ পলি ইট তৈরির উপযোগী।

নদী যেখানে সমতল ভূমিতে বয়ে গেছে, সেখানে ঢাল খুব কম। এরূপ স্থানে ব্যারাজ নির্মাণ করে সমস্ত কপাট খুলে দিলেও দু-পারের নদীর জল-তলের কয়েক ফুট পার্থক্য দেখা যায়। অর্থাৎ ঐ অঞ্চলে ঢালুভাব কয়েক ফুট কম হলে যেরূপ প্রবাহমাত্রা দাঁড়াতো, সেরূপ কম প্রবাহমাত্রা হয়। এছাড়া ব্যারাজের উপরের অংশে নদীর জলতল যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সমতল অঞ্চলে ঢাল কম থাকায় এই জলস্ফীতি 20 মাইল বা 25 মাইল পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে এবং বাঁধ উপচে বন্যার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। আবার ব্যারাজের কপাটগুলি যখন বন্ধ রাখা হয়, তখন সমানে পলি পড়ে নদীবক্ষ দ্রুত মজে যায়। ফলে নদীর নতুন পথে চলার প্রবণতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কাজেই সমতল অঞ্চলে ব্যারাজ, যেমন তিলপাড়া ব্যারাজ, দুর্গাপুর ব্যারাজ, ফরাক্কা ব্যারাজ বা দামোদরের মোহনায় স্লুইস্-গেট নির্মাণ করা যুক্তিযুক্ত হয় নি।

এছাড়া ব্যারাজের সর্বোচ্চ জলনির্গমন-ক্ষমতার [বা সমস্ত কপাট সম্পূর্ণ খুলে দিলে প্রতি সেকেণ্ডে যে জল বেরিয়ে যেতে পারে] অতিরিক্ত জল কয়েক ঘণ্টা ধরে এলে ব্যারাজ বা তার পার্শ্ব-সংলগ্ন বাঁধ নিশ্চিতভাবে ভাঙবে এবং নদীর জল ও সঞ্চিত জল মিলিতভাবে ছুটে এসে গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে নদী নতুন পথে চলবে ও এক বিশাল অঞ্চলে ধ্বংস ডেকে আনবে। এই কারণেই এবারে তিলপাড়ায় ময়ূরাক্ষী ও দ্বারকা শোলে হিংলো নদী দুটি কয়েক শত জীবন ও বহু সম্পত্তি ধ্বংস করে নতুন পথে চলেছিল। ময়ূরাক্ষীতে তিলপাড়া ব্যারাজের সর্বোচ্চ জল-নির্গমন ক্ষমতা প্রায় আড়াই লক্ষ কিউসেক, কিন্তু জল এসেছিল চার লক্ষ কিউসেকের কাছাকাছি। হিংলো বাঁধের সর্বোচ্চ জল-নির্গমন ক্ষমতা মাত্র ষাট হাজার কিউসেক, কিন্তু এক লক্ষ কুড়ি হাজার কিউসেক জল সেখানে এসেছিল। গঙ্গায় ফরাক্কা ব্যারাজে ও দামোদরে দুর্গাপুর ব্যারাজে অনুরূপ ঘটনার সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে এবং সেক্ষেত্রে সমগ্র গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেইজন্য পার্বত্য অঞ্চলে জলাধার বা সমতল অঞ্চলে ব্যারাজ নির্মাণের পূর্বে তার অশুভ দিকগুলি ভালরূপে বিবেচনা করা উচিত এবং ব্যারাজের ও নদীর জল-নির্গমন ব্যবস্থা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া দরকার। সবদিক বিবেচনা করে আমার মনে হয়, পার্বত্য-অঞ্চলে যেখানে জল-বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে, শুধুমাত্র সেখানে ছোট বা মাঝারি জলাধার নির্মাণ করে সেই বিদ্যুতে গভীর ও অগভীর নলকূপ চালিয়ে সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ফলে (1) পার্বত্য-অঞ্চলে ছোট কোন জলাধারের বাঁধ ভাঙলেও জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল ধ্বংস হবে না, (2) সমতল অঞ্চলে ব্যারাজ নির্মাণের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে ও তার অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, (3) সেচ খালগুলি খননের জন্য বহু কৃষিজমি নষ্ট হবে না, (4) নদীপথে সারা বৎসর জল থাকবে যা অন্যকাজে যেমন শহরে ও বিভিন্ন শিল্পে জল সরবরাহে ব্যবহার করা যাবে এবং (5) স্বল্পব্যয়ে নদীপথে পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এইভাবেই আমাদের জল সম্পদের সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে।

সামগ্রিকভাবে বিচার করে সকল জলপথকে প্রধানত দু-ভাবে বিভক্ত করা যায়—(1) সেই সব জলপথ যেগুলির দ্বারা বর্ষায় পার্বত্য-অঞ্চল থেকে হঠাৎ-আসা বিপুল জলরাশিকে পলিসমেত অতি দ্রুত সাগরে পৌঁছে দেওয়া যাবে, অর্থাৎ নদীপথ। এগুলির পথ হবে সর্বত্র ঢালু, প্রায় সরল ও সকল বন্ধনহীন। কারণ এদের পথে বাধা থাকলে তা শুধু বিস্তীর্ণ অঞ্চলেই প্লাবন ডেকে আনবে না, গতি স্তব্ধ হওয়ায় কয়েক দশকে পলি পড়ে এদের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে, এবং একদিন এরা গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে নতুন পথে চলতে সুরু করবে, (2) সেই সব জলপথ যেগুলির দ্বারা সমতল অঞ্চলের বাড়তি জল পূর্বোক্ত নদীপথে পৌঁছে দেওয়া যাবে অথবা প্রয়োজন মত নদীপথ থেকে জল নিয়ে সেচের সুবিধা করা যাবে, অর্থাৎ সেচখাল। এগুলির ঢালুভাব কম থাকবে

এবং এরা যেখানে নদীপথে যুক্ত হবে, সেখানে অবশ্যই মজবুত স্লুইস-গেট থাকবে। নইলে এই খালগুলির বাঁধ ভেঙে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গে পরিকল্পিত নদীসংস্কারের সম্ভাব্যতা—বর্ষার কয়টি মাস ছাড়া হুগলী ও রূপনারায়ণের নিম্নাঞ্চল বাদে অন্য সব নদী প্রায় শুষ্ক থাকে, যখন এদের সহজেই পরিকল্পিতভাবে সংস্কার করা যায়। বর্তমানে দু-একটি অঞ্চল ছাড়া নদীখাতগুলি এমনই মজে গেছে যে, এরা প্রায় ধানজমির সমতলে আছে। কাজেই নদীকে বাঁকমুক্ত করে পরিকল্পিতভাবে অথবা পুরনো পথে খনন করলে প্রায় একই খরচ পড়বে। অবশ্য নতুন খাত খননের জন্য কিছু জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন হবে, কিন্তু পুরনো আঁকাবাঁকা নদীখাতে বেশী জমি পাওয়া যাবে। যাদের জমি নেওয়া হবে, তাদের ঐ জমি প্রয়োজনমত সংস্কার করে বিলি করা যেতে পারে।

হুগলীতে ও বাক্সির পর রূপনারায়ণে সারা বছর জল থাকে। এখানে ড্রেজার দিয়ে বা অন্যভাবে পলি কেটে কয়েকটি বাঁককে (যেমন—সাঁকরাইল, উলুবেড়িয়া, মানকুর. পানিত্রাস ও কোলাঘাট) যতটা সম্ভব সরল করতে হবে। কিভাবে করা হবে তা 4নং চিত্রে দেখানো হল। নদীর গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ও দরকারমত বাঁধ সরিয়ে প্রথমে চ থেকে ছ পর্যন্ত একটি খাত খনন করতে হবে এবং ঐ মাটি জ ও ঝ অঞ্চলে ফেলতে হবে। কয়েকটি বর্ষার পর নদী নিজেই চ-ছ পথে চলবে ও পুরনো খাত কিছুটা মজে যাবে। গঙ্গা, পদ্মা হুগলী ও রূপনারায়ণ কয়েক স্থানে অতি বিস্তৃত হওয়ার মাঝ নদীতে পলি জমছে এবং বন্যার প্রকোপ বাড়ছে। উপরিউক্তভাবে প্রথমে পলির মধ্যে পথ কেটে ও পরে বাঁধ এগিয়ে এনে নদীকে প্রায় সমবিস্তৃত ও গভীর করতে হবে। এতে মাঝনদীতে পলি পড়া কমবে ও কিছু জমিও পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন নদী-পরিকল্পনা—(1) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বারটি জেলার ও বিহারসহ উত্তর-ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জল শেষ পর্যন্ত হুগলী নদীপথে সাগরে চলে যায়। হাওড়া জেলার দক্ষিণে দামোদর ও রূপনারায়ণ মিশেছে হুগলীর সঙ্গে। কাজেই ওখান থেকে সাগর পর্যন্ত পথটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐ পথটি বেশ বক্র, প্রায় অর্ধ-বৃত্তাকার। আমার মনে হয় রূপনারায়ণ ও হুগলী নদী দুটির পথের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গেঁওখালী থেকে হলদিয়া পর্যন্ত প্রয়োজনমত বিস্তৃত ও জাহাজ চলাচল উপযোগী প্রায় 12 মাইল নদীখাত খনন করা দরকার (নদী মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। নতুন পথটিতে পূর্ব পথের তুলনায় গভীরতা বাড়িয়ে বিস্তার কম করলে প্রবাহ-মাত্রা যথেষ্ট বাড়বে। উক্ত পথটি পুরনো 20 মাইল পথের চেয়ে অনেক ছোট হওয়ায় ঢাল দেড়গুণ বাড়বে এবং সেই অনুপাতে প্রবাহমাত্রা বাড়বে। এছাড়া পথে বাঁক না থাকায় এবং পথটি উপরের নদীদুটির ও নীচে হুগলী মোহানার পথের সঙ্গে প্রায় সরল হওয়ায় প্রবাহমাত্রা আরও বাড়বে। এই তিনটি কারণে প্রবাহমাত্রা 2গুণ থেকে 3গুণ পর্যন্ত বাড়তে পারে। ফলে হুগলী মোহানার পলি ধুয়ে জল দ্রুত সাগরে চলে যাবে ও বন্যার প্রকোপ কমবে। এছাড়া জলের দ্রুতগতির জন্য বর্ষার সময় নদীগুলির দ্বারা বাহিত পলি দূর সাগরে নিক্ষিপ্ত হবে। ফলে জোয়ারের সময় সাগর থেকে নদীপথে আনীত পলি কম হবে। এর ফলে হুগলী ও রূপনারায়ণের নাব্যতা রক্ষায় যথেষ্ট সাহায্য হবে এবং শিল্পাঞ্চলসহ কলিকাতা ও হলদীয়া বন্দর ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচবে। এই খাত খননের মাটি দিয়ে দক্ষিণ রূপনারায়ণের ও সাগর-মোহানার অতি-বিস্তার রোধ করা যাবে এবং মোহানার কাছে একটি বিশাল হ্রদ পাওয়া যাবে। এছাড়া ডায়মণ্ডহারবারের পুরনো খাত দু-পাশে বাঁধ দিয়ে কয়েকটি স্লুইস-গেট ও লক-গেটের সাহায্যে একটি কৃত্রিম জলাধারে পরিণত হবে, যার ক্ষেত্রফল 60 বর্গমাইল হওয়ায় 10 ফুট গভীরতার জন্য জলধারণক্ষমতা হবে 3 লক্ষ 80

হাজার একক-ফুট। বর্ষাকালে উচ্চ উপত্যকা থেকে জলধারা নেমে আসতে যে 3-4 দিন সময় লাগবে,

তখন তাঁতার অথবা নীচে লক্ষ্মীপুরের গেটগুলি খুলে জলাধারটি কিছু খালি রাখা হবে এবং বন্যার জল নেমে এলে উপরে মুরপুরের গেটগুলি খুলে দিলে তা ঐ বিপুল জলরাশির অনেকটাই অগস্ত্যমুনির মত নিঃশেষ করে ফেলবে। এছাড়া জলাধারটি সমুদ্র ও কলিকাতা উত্তরের নিকটবর্তী হওয়ায়

একে পূর্বাঞ্চলের প্রতিরক্ষায় বৃহত্তম ঘাঁটিতে রূপান্বিত করা যাবে এবং ডায়মণ্ডহারবার তখন সত্যিকারের ডায়মণ্ডহারবার হয়ে উঠবে।

যখন 100 মাইল দীর্ঘ সুয়েজ-খালকে 110 বছর আগে খনন করা হয়েছে এবং কয়েক বছর আগে বড় জাহাজ-চলাচলের জন্য আরও বিস্তৃত ও গভীর করা হয়েছে, তখন মাত্র 12 মাইল দীর্ঘ এরূপ একটি খাত খনন করা কি বর্তমান যুগে একেবারেই অসম্ভব ?

(2) হুগলী ছাড়া এই বিস্তৃত অঞ্চলের জলরাশি সাগরে পৌঁছে দেওয়ার নতুন পথের সন্ধান করা দরকার। এখানে সুবর্ণরেখাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। মেদিনীপুর শহরের কিছু পশ্চিমে কংসাবতী যেখানে পূর্বমুখী হয়েছে, সেখান থেকে সুবর্ণরেখার সঙ্গে প্রায় 20 মাইল পথে যোগ করা যায়। এতে কংসবাতীর জল ঐ পথে সাগরে চলে যাবে। অথবা কংসাবতীকে সুবর্ণরেখার সঙ্গে যুক্ত না করে একে মেদিনীপুর থেকে দক্ষিণে কালিয়াঘাই নদীপথে ও পরে কসবা অঞ্চল দিয়ে রসুলপুরের নদীপথে পরিচালিত করা যেতে পারে। তখন কংসাবতীর একটি দক্ষিণ-পূর্বমুখী প্রায় সরল পথ গড়ে উঠবে, যে পথটি বর্তমান পথের চেয়ে সংক্ষিপ্ততর ও ঢালুতর। পথরেখাটি অবশ্য নদী-মানচিত্রে অঙ্কন করা সম্ভব হয় নি।

(3) তারপর শিলাবতীকে কংসাবতীর শেষ অংশে বা হলদীতে নাড়াজোল থেকে মাইসোরা পর্যন্ত প্রায় 10 মাইল পথ কেটে যোগ করলে শিলাবতীর জল হলদী নদী দিয়ে চলে যাবে। এর ফলে কংসাবতী ও শিলাবতীর জল প্রায় 25 মাইল কম ঢালু ঘুরপথ পরিহার করে ও পাহাড়ী পথের অর্জিত দ্রুতগতি বজায় রেখে সাগরে চলে যাবে। কংসাবতী ও শিলাবতীর মধ্যাঞ্চলগুলি, যা যুগ যুগ ধরে বন্যার জন্য দায়ী, দু-ধারে স্লুইস্-গেট দিয়ে সেচখালে পরিণত হবে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডার মেদিনীপুর জেলা বন্যা থেকে বাঁচবে। এছাড়া কংসাবতী ও শিলাবতীর জল রূপনারায়ণে না আসায় হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় বন্যার প্রকোপ কমবে।

(4) তারপর দ্বারকেশ্বর নদের জলবহন-ক্ষমতা বাড়িয়ে ও প্রয়োজনমত খনন করে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থেকে দীঘলগ্রাম পথ প্রায় 16 মাইল খাল কেটে দামোদরের জল দ্বারকেশ্বরে আনার কথা ভাবতে হবে। এতে দামোদরের ঐ অংশে প্রায় 25 মাইল বক্রপথ কমবে এবং পাহাড়ী পথের অর্জিত গতি অনেকটা বজায় থাকবে। তখন দামোদরের দ্রুতগতিই দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ ও হুগলী মোহানার নদীখাত পরিষ্কার রাখবে।

(5) অজয় নদ কাটোয়ার কাছে প্রায় লম্বভাবে ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। ফলে অজয়ের জল ভাগীরথীকে বহন করতে হয়, কিন্তু তার গতি ভাগীরথীতে সঞ্চারিত হয় না। অজয় নদের আবহ-ক্ষেত্র 6 হাজার বর্গ-কিমি হওয়ায় ঐ অঞ্চলের নদীতে প্রায়ই জলস্ফীতি হয়ে বন্যা হয় এবং অজয়-বাহিত পলি ভাগীরথীতে জমে যায়। কাজেই অজয়কে মঙ্গলকোট থেকে শ্রীবাটি পর্যন্ত প্রায় 15 মাইল পথ কেটে খাড়ি নদীপথে প্রবাহিত করা দরকার। এতে অজয়ের জলরাশির পথ 20 মাইল সংক্ষিপ্ত হবে, নদীয়া জেলায় ভাগীরথীর সর্পিল পথ (যা সরল করা অত্যাবশ্যক) থেকে মুক্ত হবে এবং গতি বাড়বে। খাড়ি নদী প্রায় সরলভাবে ভাগীরথীতে পতিত হওয়ায় অজয়-বাহিত বিপুল জলরাশির দ্রুত গতিই ভাগীরথী বা হুগলীর খাত কাটাতে সাহায্য করবে এবং তখন ভাগীরথী নবদ্বীপ পর্যন্ত সুনাব্য হয়ে উঠবে।

(6) চব্বিশপরগণা জেলায় বিদ্যাধরী ও মাতলায় কোন পার্বত্য-অববাহিকা নেই। তাই হুগলী নদীর কিছু জল সার্কুলার ক্যানাল সংস্কার করে বা অন্য কোন খাল দিয়ে স্লুইস্ গেটের সাহায্যে শুধুমাত্র বর্ষার সময় প্রথমে বিদ্যাধরী ও মাতলা নদীপথে সাগরে পৌঁছে দেওয়া যায়। এতে

কলিকাতা ও তার পূর্বাঞ্চলের জলনিকাশের সুবিধা হবে এবং বিদ্যাধরী ও মাত্‌লা মজে যাবে না।

নদীগুলিকে যে পথে যোগ করতে হবে তা নদী-মানচিত্রে দেখানো হল। এখানে 2, 3, 4 ও 5 কংসাবতী, শিলাবতী, দামোদর ও অজয় নদীগুলির সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত পথ। নদীগুলিকে বাঁকমুক্ত করে ঐ সব ঢালুপথে পরিচালিত করলে নদী নিজেই বরাবর তার পথ কেটে চলবে; সহজে মজে যাবে না, ও পথও পরিবর্তন করবে না। অনুরূপভাবে অন্যান্য নদী-পরিকল্পনা রচনা করতে হবে, যাতে পরিকল্পিত নদী সংস্কারের মূল কথা বজায় থাকে। তাহলেই বন্যার প্রকোপ কমবে।

একটি নদীকে অন্য নদীখাতে ঘুরিয়ে দেওয়া আপাতদৃষ্টিতে কঠিন কাজ বলে মনে হলেও তা খুব শক্ত নয়, কারণ ঐ পথে একটি ছোট খাত কেটে দিলে নদী নিজেই তার পথ কেটে নেবে। ইতিহাসে অনুরূপ নজীর আছে। পূর্বে ভাগীরথী নদী কলিকাতার পর কালীঘাট, রাজপুর, বারুইপুর, মজিলপুর, গোবিন্দপুর ও কাকদ্বীপ হয়ে সাগরদ্বীপে পৌঁছাত, যা এককালে আদিগঙ্গা নামে পরিচিত ছিল। 'নৌবাণিজ্যের সুবিধার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের দক্ষিণে (আন্দুল পর্যন্ত) একটি খাল কেটে সরস্বতী নদীর পুরাতন মজাখাতে ভাগীরথী নদীর জলধারা বইয়ে দেন নবাব আলীবর্দী।' (দ্রষ্টব্য—বিশ্বকোষ, সাক্ষরতা প্রকাশন, দ্বিতীয় খণ্ডের 330 পৃষ্ঠায় আদিগঙ্গা নিবন্ধ) ঐ পথটিতে বাঁক কম থাকায়, সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এবং নীচে দামোদর ও রূপনারায়ণের জলে পুষ্ট হওয়ায় ভাগীরথী নিজেই ঐ পথে আজ বিশাল হুগলী নদীতে পরিণত হয়েছে এবং আদিগঙ্গা আজ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যদি এইভাবে হুগলীর মত বড় নদীর পথ পরিবর্তিত হয়ে থাকে, তবে অন্য নদীর পথ পরিবর্তন কেন সম্ভব হবে না?

গত কয়েক দশকে নদীসংস্কারের বিশেষ কোন ব্যবস্থা হয় নি। মেদিনীপুর ক্যানাল, হিজলী ক্যানাল ইত্যাদি কয়েকটি খাল কেটে বিভিন্ন নদীর মধ্যে প্রায় ঢালুহীন পথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু যখন বৃষ্টি হয় তা বিস্তীর্ণ অঞ্চলেই হয়ে থাকে এবং প্রায় সব নদীই স্ফীত হয়ে পড়ে। কাজেই বন্যা-নিয়ন্ত্রণে খালগুলির কোন ভূমিকাই নেই। বরং এদের বাঁধ ভেঙে নতুন এলাকা প্লাবিত হয়, যদি না নদীমুখে খালের স্লুইস্-গেট যথেষ্ট মজবুত থাকে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, গঙ্গা ও পদ্মার স্থানে স্থানে অতিবিস্তারের জন্য মাঝনদীতে পলি, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ভাগীরথী ও জলঙ্গীর অজস্র বাঁক, মেদিনীপুর জেলায় কংসাবতী ও শিলাবতীর প্রায় ঢালুহীন পথ, হাওড়া ও হুগলী জেলায় উপরের তুলনায় দামোদরের সংকীর্ণ পথ, কোলাঘাটে সেতুগুলির কাছেই রূপনারায়ণের কয়েকটি বাঁক এবং হুগলী মোহানায় অর্ধ-বৃত্তাকার পথের জন্য জমে যাওয়া পলিই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে বন্যার মূল কারণ। এই কারণগুলি দূর করলে বন্যার সম্ভাবনা প্রায় বিলুপ্ত হবে। আর তা না করে নদীকে শুধুমাত্র পুরানো পথে খনন করলে প্রবাহমাত্রা বিশেষ বাড়বে না, আবার পলি জমবে ও বন্যা হবে।

পরিশিষ্ট—পরিকল্পিত নদীসংস্কারের জন্য কয়েক শত কোটি টাকার প্রয়োজন হবে সত্য, তবু বন্যার ফলে কয়েক হাজার কোটি টাকার শস্য এবং কয়েক কোটি মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের কথা ভেবে তা সর্বাগ্রে রূপায়িত করা প্রয়োজন। আমার মতে কয়েকটি নদীবাঁধ বা সেচবাঁধ নির্মাণ করতে যে কয়েক শত কোটি টাকা লাগবে, সেই টাকায় পরিকল্পিতভাবে নদীখনন করলে অনেক বেশী সুফল পাওয়া যাবে এবং ভবিষ্যতে জলাধারের বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকায় প্লাবনের সম্ভাবনা থাকবে না। এছাড়া একটি নদীবাঁধ নির্মাণে যে সিমেন্ট, ইট ও লোহা লাগত, তা দিয়ে কয়েক হাজার পাকা বাড়ী বা 20/25 হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করা সম্ভব হবে, যা বর্তমানে বন্যাবিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গে অতি প্রয়োজনীয়।

পরিকল্পিত নদীসংস্কারের জন্য বহু যন্ত্রপাতি বা

প্রচুর মালমসলার প্রয়োজন হবে না, শুধু প্রয়োজন হবে শ্রমশক্তি যা আমাদের দেশে প্রতিনিয়তই অপচিত হচ্ছে। আমরা সেই বিপুল জনশক্তিকে বন্যার বিরুদ্ধে দেশরক্ষার কাজে লাগাতে পারি এবং কাজের সুফল বুঝিয়ে বললে তারা তা আনন্দের সঙ্গে করবে বলে আশা করি। এ ছাড়া নদীসংস্কার-কার্য সহজেই কাজের বিনিময়ে খাদ্য-প্রকল্পে যুক্ত করা যাবে। আবার যেহেতু এই কাজগুলি এমন সময়ে হবে, যখন গ্রামের অধিকাংশ মানুষই বেকার থাকে, সেহেতু তা গ্রামের জনজীবনে ও অর্থনীতিতে অনুকূল প্রভাব ফেলবে।

বর্তমান নিবন্ধটি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হলেও পরিকল্পিত নদীসংস্কারের মূলকথা সকল নদীক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মূল কথাগুলি বজায় রেখে নদী-পরিকল্পনার সাহায্যে দেশ থেকে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু, কেরালা ও মহারাষ্ট্রের ন্যায় উপকূলবর্তী রাজ্য থেকে বন্যার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমানো যাবে। প্রসঙ্গত বলব যে, নদীবিজ্ঞানের উপর যথেষ্ট গবেষণা হওয়া উচিত এবং দেশের সকল পরিকল্পনা বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের যৌথ উদ্যোগে রচিত হওয়া আবশ্যক।

এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞদের বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আসলে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের দুটি পথের মধ্যে অস্থায়ী ও সীমিত ক্ষমতা-বিশিষ্ট পথকে অর্থাৎ জলাধার নির্মাণকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছি, কিন্তু স্থায়ী ও কার্যকরী পথটিকে অর্থাৎ নদীপথ সংস্কারকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেছি। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আজকের এই সর্বনাশা বন্যা। অর্থাৎ আমাদের কর্মযজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় মহাদেবের জটা-নিঃসৃত বারিধারাকে আমরা এতদিন শুধু জহ্নুমুনির মত ধারণ করতে চেয়েছি ও বিফল হয়েছি। আজ দিন এসেছে তাকে ভগীরথের মত পথ দেখিয়ে সাগরে পৌঁছে দেওয়ার এবং তাহলেই দেশবাসী বন্যার অভিশাপ থেকে চিরমুক্তি পাবে। আমি আশা করি ভবিষ্যতে জলাধার-নির্মাণ ও নদী-পরিকল্পনা এই দুটি পথের সুষ্ঠু সমন্বয়ে গড়ে উঠবে সত্যিকারের বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও সেচ-ব্যবস্থা এবং দেশ সমৃদ্ধ ও শস্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়েই আমার এই রচনা।

জনস্বার্থ বিরোধী প্রকল্প

1943 এর বড় বানের ধাক্কায় ইংরেজের যুদ্ধ প্রচেষ্টা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় লর্ড ওয়াভেলের টনক নড়ে এবং দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার কাজে তাড়াহুড়ো শুরু হয়। এই কাজে স্যার উইলিয়াম উইলকক্সের 'শয়তানের বাঁধ' নামক সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ডঃ মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের গবেষণালব্ধ মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে অত্যন্ত অপ্রতুল তথ্যের ভিত্তিতে ডি. ভি. সি-র কাজ করা হল। জাতীয় সরকারের নেতৃত্বেও বহু নদী প্রকল্পে এরূপ জনস্বার্থ বিরোধী কাজের নজিরের অভাব নেই।

শতাব্দীর দুর্যোগে আবহাওয়ার পূর্বাভাস কতটা কার্যকরী ছিল?

অরূপরতন ভট্টাচার্য*

সাম্প্রতিক কালে আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনেক উন্নত হয়েছে এ কথা বিশেষ ভাবে সত্য। আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাসকে নিয়ে আজও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করি, চায়ের টেবিলে রসিকতা করি অথচ চুম্বকের উত্তর-দক্ষিণ যেরকম পরস্পর পরস্পরের বিপরীত-মুখীন হয়ে আছে, সেরকম প্রকৃত আবহাওয়া সে সব সময়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের উল্টোদিকে চলেছে, এমন কথা কখনই বলা যায় না। বরং সত্যি কথা বলতে কি, বিভিন্ন রসিকতা সত্ত্বেও আবহাওয়ার পূর্বাভাস আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিলছে, এবং সর্বোপরি, পূর্বাভাসের উপরে আমাদের আস্থা ধীরে ধীরে ফিরে আসছে।

এবারে দুর্যোগের পূর্বাভাসের দিকে তাকানো যাক।

27, 28, 29 সেপ্টেম্বর, 1978 যে দুর্যোগ দেখা দিল কলকাতায় এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন নদীর অববাহিকায়, সাধারণ সকলের মনেই একটা ধারণা আছে যে, সে আবহাওয়ার পূর্বাভাস আবহ-বিদেরা মেলাতে পারেন নি। সে কথা কতটা সত্য?

আলিপুর আবহাওয়া অফিস 26 এবং 27 সেপ্টেম্বর যে পূর্বাভাস দেন, তাতে নতুনত্বের কিছু নেই। ওই দু-দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে উল্লেখ করা আছে, দু-এক পশলা বা মাঝে মাঝে বৃষ্টি হতে পারে এবং সেই সঙ্গে বজ্র-বিদ্যুতের সম্ভাবনা আছে। সেপ্টেম্বর মাস, তখন পুরো বর্ষা, সে সময়ে এ জাতীয় পূর্বাভাস খুবই স্বাভাবিক। এতে সচকিত বা অতিরিক্ত সতর্কিত হওয়ার মত কিছু নেই।

103/ই কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-700 029

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করেছে, জনজীবন বিপর্যস্ত এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস আমাদের অভিমতে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে।

অবশ্য আবহবিদেরা ঠিক সেইভাবে ব্যর্থতার কথা স্বীকার করতে চাইছেন না। তাঁরা বলছেন, যে নিম্নচাপের ফলে এই বৃষ্টি হয়, তার গতিবিধি ছিল অভূতপূর্ব। ভারতীয় আবহাওয়া অফিসের গত একশো বছরের রেকর্ডে বছরের এ সময়ে একটা নিম্নচাপ অঞ্চলকে এভাবে যেতে দেখা যায় নি। আবহবিদ্যার জ্ঞাত কোন নিয়মের মধ্যেই এ পড়ে না।

দুর্যোগের অঙ্কুরোদ্গম হয় প্রথমে বঙ্গোপসাগরে। সেখানে নিম্নচাপক্ষেত্র সৃষ্টি হল। তারপরে তা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে একটা সাইক্লোনে পরিণতি লাভ করে। সাইক্লোনের উৎপত্তি হয় মোটামুটিভাবে সমুদ্রের উপরেই। সমুদ্রের জলীয় বাষ্পকে নিয়েই এ শক্তি সঞ্চয় করে এবং পুষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এই দুর্যোগের ক্ষেত্রে সাইক্লোনই গঠিত হয় নি। এবারের এই দুর্যোগের যে 'ডিসটারবেন্স' থেকে উৎপত্তি, তা সাইক্লোনে পরিণত হওয়ার আগে নিম্নচাপরূপেই স্থলভাগে এসে পৌঁছয়। বালেশ্বরের কাছে 21 সেপ্টেম্বর বিকেলে। পশ্চিমবাংলার দুর্যোগের তখনও 6 দিন বাকি। তারপর বালেশ্বরের কাছ থেকে স্বাভাবিক গতিপথ ধরে পরের দিন অর্থাৎ 22 সকাল উত্তর-পূর্ব মধ্যপ্রদেশে পৌঁছয়। এখানে এই নিম্নচাপ মোটামুটি তিনদিন স্থির অবস্থায় কাটায়—25 তারিখ বিকেল পর্যন্ত। এবারে এ উত্তর-পূর্ব দিকে ঘুরে

26 বিকেলে বিহারের পালামৌ জেলার উপরে এসে পৌছয়। এই যে উত্তর-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে যাওয়া এটা সেপ্টেম্বর মাসের কোন কোন নিম্নচাপের ক্ষেত্রে একটা বৈশিষ্ট্য। ফলে নিম্নচাপ সৃষ্টির পর থেকে এ কদিন যা ঘটেছে, যে পথে চলেছে নিম্নচাপ, তাতে অবাক হওয়ার মত কিছু ঘটে নি, অস্বাভাবিকত্বও কিছু ছিল না।

সাধারণত এর পরে এই সব নিম্নচাপ আসামের খাসি জয়ন্তী পর্বতে বা উত্তর বাংলার পাহাড়ি অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত দিয়ে স্তিমিত হয়ে আসে। এই নিম্নচাপক্ষেত্রটির বেলায় আবহবিদদের আশা ছিল সেরকম। তাই 25 তারিখ সকালে সেইরকম সতর্কবাণী প্রচার করা হয়। 26 তারিখ বিকেলে যে রিপোর্ট পাওয়া গেল, তাতে হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলে পূর্বাভাসের সত্যতা পরীক্ষিত হল—সেখানে বৃষ্টি শুরু হয়েছে 26 তারিখ সকাল থেকে।

26 তারিখ বিকেলে কি হল ?

তখনও এমন আশঙ্কার কারণ নেই যে, এই নিম্নচাপ স্তিমিত হওয়ার বদলে আবার গভীর আকার ধারণ করে আমাদের প্রচণ্ড দুর্যোগের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। অথচ প্রকৃতির কি বিচিত্র খেয়াল! কলকাতা নিয়ে সমগ্র পশ্চিমবাংলায় 26 তারিখ রাত থেকে এক দুঃস্বপ্নের মত বৃষ্টি নেমে এল প্রলয়ের রূপ ধরে। 26 তারিখ বিকেলে যে পূর্বাভাস দেওয়া হল, 27 সকালে তা অর্থহীন মনে হল, আবহাওয়া আফিস তাৎপর্যশূন্য। বরং তখন দেখা দেখা গেল, যে নিম্নচাপক্ষেত্র ছিল একেবারে সুনির্দিষ্ট, তা অস্বাভাবিক দ্রুততায় সরতে সরতে আসানসোলের কাছে এসে স্থাণু হয়ে রয়েছে।

একটি পূর্বাভাস ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তাই ই সব নয়। সতর্ক আবহবিদেরা অতীত ইতিহাসের নজীর থেকে এবং তখনকার আবহ চার্ট বিশ্লেষণ করে এমন একটা আশা রাখলেন যে, এটা পূর্ব বা পূর্ব-উত্তর-পূর্ব দিকে সরে যাবে। আবহাওয়া পূর্বাভাস দেওয়া হল সেইভাবে। কিন্তু সেই রাতে আকাশ এবং আবহবিদদের মুখ কালো করে নিম্নচাপ অতি দ্রুত দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঁক নিল এবং 28 তারিখ সকালে সে এল মেদিনীপুরের উপরে। সেখানে তার 36 ঘণ্টা অবস্থান। তারপর আস্তে আস্তে দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সরে বালেশ্বরের কাছে পৌছল 29 সকালে।

অবাধ্য গতিবিধির এখানেই শেষ নয়। 29 বিকেল থেকে এটা আবার বালেশ্বর থেকে পূর্বদিকে সরে এসে 30 সকালে পৌছল কলকাতার 180 কিলোমিটার দক্ষিণে।

এই অবাধ্যতার জন্তে আবহাওয়ার পূর্বাভাস তেমনভাবে মেলানো সম্ভব হয় নি। আসলে আবহাওয়া অনেকটা দৌড়ের ঘোড়ার মত। যদি কেউ প্রশ্ন করে, এই দৌড়ের ঘোড়া এক ঘণ্টা দৌড়ে কোথায় গিয়ে পৌছবে ? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্তে কি কি তথ্যের দরকার ? দুটি নিয়ামকের প্রয়োজন এ প্রসঙ্গে। এক, সে কোন্ দিকে যাচ্ছে ? দুই, সে কত জোরে যাচ্ছে ? কিন্তু তারও আগে জানা দরকার, সে কোথা থেকে যাত্রা শুরু করেছে !

আবহাওয়া প্রসঙ্গে এই সব নিয়ামকগুলি এত দ্রুত বদলায় যে তার সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া খুবই কঠিন।

তবু 1978-এর সেপ্টেম্বর মাসের 27, 28,29-এই তিন দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল বলে আবহাওয়াবিদেরা দাবী করেন। এই দুর্যোগকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক কলকাতায় স্থানীয় বৃষ্টিপাত, দুই গাঙ্গেয় পশ্চিমবাংলার নদীগুলির অববাহিকায় বৃষ্টি। যে নিম্নচাপের ফলে এই বৃষ্টি হয়, তার গতিপ্রকৃতি ছিল অভূতপূর্ব। তা সত্ত্বেও, আলিপুর আবহাওয়া অফিস থেকে দাবী করা হয় যে, 25শে সেপ্টেম্বর সকালেই দামোদর এবং ওই অঞ্চলের নদীগুলির উৎস এলাকায় অর্থাৎ সাঁওতাল পরগণার জন্তে প্রবল বৃষ্টিপাতের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল। গাঙ্গেয় পশ্চিম বাংলার জন্তে ওই ধরণের সতর্কবাণী

প্রচার করা হয় 26 সেপ্টেম্বর। এই সমস্ত সতর্কবাণী 27, 28, এবং 29 তারিখের জন্যেও প্রযোজ্য ছিল। আবহবিদ্‌দের বক্তব্য, যদি প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্যেই বন্যা হয়ে থাকে, তবে তার জন্যে পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ নির্দেশ যথেষ্ট আগেই দেওয়া হয়েছিল।

এরপরে আসে কলকাতার স্থানীয় পূর্বাভাসের কথা। শতাব্দীর রেকরড ভাঙ্গা বৃষ্টি কলকাতায় শুরু হয় 27শে সেপ্টেম্বর ভোর থেকে। ওই দিন সকাল সাড়ে ছটায় রেডিওতে প্রচারের জন্যে পরবর্তী 24 ঘণ্টার জন্যে যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল তাতে বলা হয়েছে যে, কলকাতায় একটানা মাঝারি ধরণের বৃষ্টি, কখনও কখনও প্রবল বর্ষণ হতে পারে বা বজ্র-বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। 26 তারিখের পূর্বাভাসে ছিল, মাঝে মাঝে বৃষ্টি বা বজ্র-বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি।

আকাশবাণীতে 24 ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রচার করা হয়। অথচ যে নিম্নচাপের জন্যে এ বৃষ্টিপাত তার গতিপ্রকৃতি এবং তীব্রতার এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল যার ফলে খুব বেশি সময় আগে স্থানীয়ভাবে কলকাতার বৃষ্টি আরও সঠিকভাবে অনুমান করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সাম্প্রতিক মূল্যায়নে আবহাওয়া-বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, উষ্ণমণ্ডলীয় আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস 12 থেকে 24 ঘণ্টার বেশি সময়ের জন্যে দেওয়া খুবই কঠিন।

এখানে স্যাটেলাইট এবং র‍্যাডারের কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে। এই দুর্যোগে তারা কি ভূমিকা পালন করে?

স্যাটেলাইট পর্যবেক্ষণ সাধারণভাবে পূর্বাভাস দেওয়ার পক্ষে বিশেষ সহায়ক কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে আমেরিকান স্যাটেলাইট দুটির পাঠানো ছবি এখানে ধরা হয়ে থাকে সে দুটিই 26 তারিখ থেকে বিকল হয়ে যায়। দুর্যোগের সময়ে এদের পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায় নি।

আর কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর মাথায় যে শক্তিশালী র‍্যাডার আছে, তাতে 'দেখা যাচ্ছিল' যে, গাঙ্গেয় পশ্চিম বাংলায় যথেষ্ট বৃষ্টি হচ্ছে।

কিন্তু এই 'দেখা যাচ্ছিল' কথাটা কি সন্তোষজনক? একটি শক্তিশালী র‍্যাডার—পূর্বাভাসে তার কি তেমন কোন ভূমিকা নেই? অথচ র‍্যাডার একটা অদ্ভুত যন্ত্র যা দিয়ে এক জায়গায় বসে চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত কোথায় বৃষ্টি হচ্ছে বা হচ্ছে না, তা বলা যায়। অর্থাৎ যেন যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টিশক্তি বহুদূর প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় যে আধুনিক র‍্যাডার আছে তার প্রধান কাজ, সাগরের বুকে যে ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি হয়, প্রায় কয়েক শ' কিলোমিটার দূর থেকে তা নিরূপণ করা এবং ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবাণী দিতে সাহায্য করা।

আর একটি কথা প্রায়ই মনে হয়। যে নিম্নচাপের জন্যে এই দুর্যোগ, আবহবিদ্‌দের মতে তার তীব্রতা এবং গতিপথ অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। ফলে খুব বেশি সময় আগে স্থানীয়ভাবে পূর্বাভাস সঠিক অনুমান করা সম্ভব ছিল না। তাহলে আকাশবাণী মারফৎ 24 ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস না দিয়ে কেন 12 ঘণ্টা বা 6 ঘণ্টার পূর্বাভাস দেওয়া হয় না? পত্রিকা মারফৎ তা সম্ভব নয় বুঝি, কিন্তু সামান্য তৎপরতা বাড়ালে আকাশবাণীতে অল্প সময় ব্যবধানে পূর্বাভাস প্রচার জনজীবনকে অনেক বেশি সুরক্ষিত করতে পারে।

আবহাওয়া প্রসঙ্গে আমরা বুঝি, প্রকৃতি যেখানে অত্যন্ত খেয়ালি, সেখানে কিছু করবার নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতিতে এবং মানব তৎপরতায় তাকে যতটুকু বাঁধা সম্ভব, ততটুকুই বা আমরা বাঁধবো না কেন?

[রচনাটি আলিপুর আবহাওয়া আফিসের আঞ্চলিক অধিকর্তা ডঃ নীহার সেন রায় এবং আবহবিদ্ অঞ্জনকুমার সেনশর্মার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে লিখিত।]

আর্যশাস্ত্র ও দেশের এই বন্যা

গণেশ বিশ্বাস*

আর্যশাস্ত্রে উল্লেখ আছে জ্যোতিঃশাস্ত্র বেদের চক্ষুতুল্য অঙ্গ। মেঘ, বৃষ্টি, কৃষি প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা আছে জ্যোতিঃশাস্ত্র বা জ্যোতিস্তত্ত্বে। শকাব্দ অনুযায়ী কোন্ বছর কোন্ মেঘ-নায়কের প্রাধান্য থাকবে এবং তার ফলাফল কি হবে, তা সহজেই জানা যায় শাস্ত্রের আলোচনা থেকে। বায়ুমণ্ডলে যে বছর যে মেঘ নায়কের প্রভাব থাকে, নীচের শ্লোকে তাই বলা হয়েছে :

ত্রিযুতে শাকবর্ষে তু চতুর্ভিঃ শোধিতে ক্রমাৎ।
আবর্তং বিদ্ধি সম্বর্তং পুষ্করং দ্রোণমম্বুদং ॥
—জ্যোতিস্তত্ত্বং

শ্লোকের অর্থ হচ্ছে, শকাব্দর সংখ্যার সঙ্গে 3 যোগ করে, প্রাপ্ত সংখ্যাকে 4 দ্বারা ভাগ করলে যে সংখ্যা অবশিষ্ট থাকবে, তা পর পর আবর্ত, সম্বর্ত, পুষ্কর এবং দ্রোণ—এই চার নামের মেঘের ক্রমানুসারে মেঘকে বোঝাবে। এখন ধরা যাক শকাব্দ হচ্ছে 1900 (বাংলা 1385 সাল) । সুতরাং (1900+3= 1903) কে 4 দ্বারা ভাগ করলে 3 অবশিষ্ট থাকে। এখন, পুষ্কর মেঘের স্থান তৃতীয়, অর্থাৎ তার ক্রমিক সংখ্যা 3—কাজেই ক্রম অনুযায়ী 1900 শকাব্দে বা 1385 সালে বায়ুমণ্ডলে প্রাধান্য থাকবে পুষ্কর মেঘের। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে আধুনিক মেঘ-বিজ্ঞানে মেঘকে প্রধান চার ভাগে ভাগ করা হয় -উচ্চ-মেঘ, মধ্যম-মেঘ, নিম্ন-মেঘ এবং স্তূপ-মেঘ। আধুনিক মেঘ-বিজ্ঞানে যেমন মেঘের নানা প্রজাতির কথা জানা যায়, জ্যোতিস্তত্ত্বে কিন্তু কোন মেঘ-নায়কের অধীন তেমন কোন প্রজাতির কথা জানা যায় না (এই দিক থেকে জ্যোতিস্তত্ত্বের 'নায়ক' কথাটির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না)।

মেঘ নায়কের প্রকৃতি—আধুনিক আবহবিজ্ঞান যেমন বিভিন্ন মেঘের প্রকৃতির বিষয়ে আলোচনা আছে, জ্যোতিস্তত্ত্বেও তেমনি বিভিন্ন মেঘ নায়কের প্রকৃতির বর্ণনা আছে। আবর্ত, সম্বর্ত প্রভৃতি এক এক ধরনের মেঘ-নায়ক এক-এক প্রকার আবহাওয়া এবং কৃষি-সম্পর্কিত অবস্থা নির্দেশ করে :

আবর্তো নির্জলো মেঘঃ সম্বর্তশ্চ বহূদকঃ।
পুষ্করো দুষ্করজলো দ্রোণঃ শস্য প্রপূরকঃ ॥
—জ্যোতিস্তত্ত্বং

আবর্ত-মেঘে জল হয় না, অর্থাৎ যে বছর বায়ুমণ্ডলে আবর্ত-মেঘের প্রাধান্য থাকে, সেই বছর ভীষণ খরা দেখা দেয় ; সম্বর্ত-মেঘে জল হয় প্রচুর অর্থাৎ যে-বছর সম্বর্ত-মেঘের প্রাধান্য থাকে, সে-বছর বৃষ্টির জলে বন্যা হবার সম্ভাবনা থাকে ; পুষ্কর-মেঘে জল অল্প হয়। অর্থাৎ যে-বছর পুষ্কর-মেঘের প্রভাব থাকবে, সে-বছর জল হবে অল্প, কাজেই শস্যও উৎপন্ন হবে কম ; যে-বছর দ্রোণ-মেঘের প্রাধান্য থাকে, সে-বছর শস্য হবে প্রচুর পরিমাণে।

জ্যোতিস্তত্ত্বের বিচারে এ-বছর (1385 সাল) আমাদের ওপর রয়েছে পুষ্কর-মেঘের প্রভাব। অর্থাৎ এ-বছর স্বল্প বৃষ্টির বছর। অথচ দেখা যাচ্ছে বন্যায় দেশ ভেসে যাচ্ছে বার বার। তাহলে জ্যোতিস্তত্ত্বের বাণী কি ভুল ? এই প্রশ্নের উত্তর

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, প্রভাতকুমার কলেজ, কাঁথি, মেদিনীপুর।

আলোচনার পূর্বে সংশ্লিষ্ট অপর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক :

গত তিন দশকব্যাপী পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এমন কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে, যা সেই সব স্থানের ক্ষেত্রে খুবই অস্বাভাবিক এবং ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঘটনা বলা যায়—অস্বাভাবিক খরা, অতি বৃষ্টি, অসাধারণ তুষারপাত, অভূতপূর্ব সমুদ্রজলের হিমীভবন প্রভৃতি তেমনি সব ঘটনা। জ্যোতিঃশাস্ত্র বিশ্লেষণ করলে হয়তো জানা যাবে, ঘটনাগুলি সবই শাস্ত্রবিরোধী।

ভারতের এ-বছরের বন্যার অবস্থা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কেবল দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের বারোটি জেলার স্থানে-স্থানে বন্যা হয়েছে বটে (দক্ষিণ ভারতের এবারকার অতিবৃষ্টির ঘটনাও উল্লেখযোগ্য), কিন্তু বন্যাবিধ্বস্ত সমগ্র অঞ্চল ভারত-রাষ্ট্রের মোট আয়তনের এক-দশমাংশও হবে কিনা সন্দেহ। অমন যে অদম্য ব্রহ্মপুত্র, যে মাঝে-মাঝেই আসামে প্রলয় ঘটায়, সেই প্রবল নদও এবার স্তব্ধ।

বন্যা ও প্লাবনের কারণ—দেশের এ-বছরের বন্যার প্রধান তিনটি কারণ হচ্ছে—(ক) দামোদর, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি কয়েকটি নদ-নদীর অববাহিকায় দফে-দফে হঠাৎ অতি-বৃষ্টি, (খ) জল-বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট জলাধার থেকে এককালে অধিক পরিমাণে জল ছাড়া, (গ) প্রায় একই সময়ে গঙ্গা প্রভৃতি কয়েকটি নদীতে সামুদ্রিক বান ডাকায় নদী-নালার উপরের দিকের জল-নিকাশে বাধা সৃষ্টি ও বানের জল-প্লাবন। দেশের নিম্নভূমিতে বন্যার জন্য দায়ী বাঁধ। জলাধার প্রভৃতির উপযোগিতা বিষয়ে তদন্ত হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রশ্ন, পৃথিবীব্যাপী অস্বাভাবিক খরা, অতি বৃষ্টি, অসাধারণ তুষারপাত প্রভৃতি প্রকৃতির আপাত খামখেয়ালী আচরণ সম্বন্ধে তদন্ত বা গবেষণা হচ্ছে কি ?

আর্য-ঋষিগণ যখন জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তখন প্রকৃতি ছিল এক ধরণের। বৈদিক যুগের প্রকৃতি আর আজকের প্রকৃতি এক নয়। জেট-প্লেন, রকেট, মহাকাশযান প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে পরিক্রমণকালে এবং প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-সৃষ্ট যাবতীয় আগুন থেকে বায়ুমণ্ডলে যে বিপুল পরিমাণে দহনজাত বস্তুকণা সর্বদা ছড়িয়ে পড়ছে, তার ফলে পৃথিবীর প্রকৃতিতে মেঘ, বৃষ্টি, তুষার, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলীয় জলীয়-বাষ্প সম্পর্কিত ঘটনাবলীর স্থান, কাল, আয়তন, প্রচণ্ডতা প্রভৃতি ধর্মেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় আছে—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবন্তি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম সমুদ্ভব॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা—তৃতীয় অধ্যায়

শ্লোকের ব্যাখ্যা হচ্ছে—প্রাণিগণ খাদ্যের দ্বারা পুষ্ট ও বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ঔরষ-পরম্পরায় উৎপন্ন হতে থাকে; খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় মেঘ অর্থাৎ বৃষ্টি থেকে। যজ্ঞ থেকে উত্থিত দহনজাত নানা দ্রব্যের কণা কেন্দ্রক হবার ফলে সৃষ্টি হয় মেঘ ও বৃষ্টি, আর মানুষের সৎকর্মের ফলে ঘটে যজ্ঞ। বৃষ্টি-সৃষ্টিকারী একটি যজ্ঞের নাম 'কারীরী-যজ্ঞ'। এই যজ্ঞে হবি, মধু, দুগ্ধ, দধিসহ বেত, যজ্ঞডুমুর এবং বেলের পল্লব দিয়ে বৃষ্টি আহ্বানের মন্ত্র পাঠ করে দশ হাজার আহুতি দিতে হয়। একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, অজুত আহুতি থেকে যে বিপুল পরিমাণ দহনজাত ভস্মকণা ও ভূষা নির্গত হয়, তা বৃষ্টিপাতী মেঘ সৃষ্টির উপযোগী যথেষ্ট কেন্দ্রক (condensation nucleus) দান করতে পারে।

আধুনিক আবহ-বিজ্ঞানীদের মতেও স্থলভাগে মেঘ ও বৃষ্টি সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে উপযোগী কেন্দ্রক হল প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট অগ্নিজাত কণাসমূহ। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প ঘনীভবনের উপযোগী কেন্দ্রক যদি পৃথিবীর এক অঞ্চলে বৃদ্ধি পায়, তবে অনুকূল অবস্থায় সেখানে বেশী পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হবার ফলে, অস্বাভাবিক

পরিমাণে মেঘ-বৃষ্টি-তুষার সৃষ্টি হতে পারে ; আবার প্রতিকূল অবস্থায় কোথাও শূন্যে জেট-প্লেন, রকেট প্রভৃতি নিঃসৃত উষ্ণ বস্তুকণার জন্য উপযুক্ত কেন্দ্রক থাকা সত্ত্বেও খরা দেখা দিতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আবহ-বিজ্ঞানে বৃষ্টি ও তুষারপাত ঘটানোর প্রচেষ্টার মধ্যে মূল বিষয় হল দুটি—(ক) যে-সব মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় না বা কম বৃষ্টি হয়, সেই সব মেঘের মধ্যে মেঘ-বিন্দুর ঘনীভবনে জলবিন্দু সৃষ্টির উপযোগী কেন্দ্রক সরবরাহ করা, আর (খ) যে-সব মেঘে বড় বড় বরফ-শিলা সৃষ্টির ফলে শস্য এবং প্রাণের ক্ষতি হয়, তার মধ্যে একটা বিশেষ সময়ে মেঘের হিমীভবনে তুষার সৃষ্টির উপযোগী কেন্দ্রক পাঠিয়ে শিলা-গঠন বন্ধ করা—কম মাত্রার তুষার প্রাণের এবং শস্যের ক্ষতি করে না। আধুনিক বিজ্ঞান কেবল cloud seeding-এর কথাই বলে, প্রয়োজনীয় মেঘ সৃষ্টির বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। আর্যশাস্ত্র কিন্তু মেঘ ও বৃষ্টি সৃষ্টির আসল কৌশলটা বাৎলে দিয়েছে—আধুনিক বিজ্ঞান একটা অসমাপ্ত রায় প্রকাশের বহুকাল পূর্বে।

কিন্তু আজকের বায়ুমণ্ডল আর জ্যোতিঃশাস্ত্র দৃষ্ট বায়ুমণ্ডল নয়, তা বিজ্ঞানীদের জেটপ্লেন-রকেট মহাকাশযান অধ্যুষিত বায়ুমণ্ডল। তাছাড়া পৃথিবীর মাটিতে যানবাহন, শিল্প, পারিবারিক উনান প্রভৃতিতে ব্যবহৃত আগুন যে পরিমাণে বেড়েছে, বায়ুমণ্ডলীয় ঘটনাবলীর ওপর তার কি প্রভাব হতে পারে, শাস্ত্রকারেরা নিশ্চয়ই সেদিকটা ভেবে দেখেন নি। পৃথিবীব্যাপী আবহাওয়ার যে-সব অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, দেশেঃ এবারকার হঠাৎ-হঠাৎ অতি বৃষ্টিজনিত বন্যা আর প্লাবন হয়ত তারই এক বিশেষ দৃষ্টান্ত ; উপযুক্ত সমীক্ষা গৃহীত হলে দেখা যাবে বেশীর ভাগ ঘটনাই ঘটছে বায়ু-মণ্ডল দূষিত হবার কারণে (পারমাণবিক বিকিরণের কথাও স্মরণীয়)। কাজেই বলা যায় জ্যোতিস্তত্ত্বের গণনা ভুল নয়, তবে তা কতকটা আধুনিক বায়ু-মণ্ডলের অবস্থাধীন। আবহ-বিজ্ঞানীদের হয়ত শীঘ্রই বলতে হবে বায়ুমণ্ডল দূষিতকরণের ঘটনা আবহাওয়াকে কি পরিমাণে প্রভাবিত করছে।

অবস্থার উন্নতি বিধান

1) বন্যা আর প্লাবনের যে তিনটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রথম এবং শেষেরটি সম্ভবতঃ মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তবে সাধারণ-ভাবে বলা যায়, নদ-নদীসমূহের গভীরতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বাঁধ নির্মাণ করলে, তাদের জলবহনের ক্ষমতা বাড়বে, বন্যা ও প্লাবনের সম্ভাবনাও হ্রাস পাবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, যথাযথ পরিকল্পনা গৃহীত ও রূপায়িত হলে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও নিম্নলিখিত আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা লাভের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল :

(ক) বেকার সমস্যা হ্রাস—সমগ্র কাজে নানা ধরনের কর্মসংস্থানের বিরাট সম্ভাবনা ;

(খ) পলি-বহনকারী নদীর পলি সুষ্ঠু ব্যবস্থানুযায়ী চাষের জমিতে সরবরাহের দ্বারা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ;

(গ) প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন জাতের মিঠা-জলের ছোট বড় মৎস্য লাভের সম্ভাবনা—হয়ত তা থেকে দেশের সমস্ত চাহিদাও পূরণ হতে পারে ;

(ঘ) স্টিমার, লঞ্চ, নৌকা প্রভৃতি জলযান খাটিয়ে স্থলভাগের রেল ও সড়ক পরিবহনের চাপ হ্রাস ;

(ঙ) নদী বন্দর ও নিকটবর্তী জনপদের শ্রীবৃদ্ধি।

2) দ্বিতীয় কারণের উন্নতিকল্পে বলা যায়—

(ক) বিদ্যুৎ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জলাধারের সংখ্যা বৃদ্ধি, যাতে জলবিদ্যুৎ ও সেচের প্রয়োজনীয় জল সঞ্চিত রেখেও হঠাৎ অতি বৃষ্টিজনিত জলের চাপ নদী, খাল এবং অতিরিক্ত জলাধারগুলিতে ছড়িয়ে দিতে পারা যায় ;

(খ) সেচ-খালগুলির সংস্কার এবং যেখানেই সম্ভব খালের গভীরতা এবং বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি;

(গ) বিদ্যমান জলাধারগুলির নিয়মিত সংস্কার সাধন, যাতে প্রতি বর্ষায় সেগুলির গভীরতা নির্মাণকালীন অবস্থায় থাকে।

বন্যা আর প্লাবনের প্রলয়ঙ্কর কার্যকলাপ যেমনি দানবীয় আকারের সমস্যা, তার সঙ্গে লড়াইয়ে জয়লাভ করে সমাধানের ব্যাপার-স্যাপারও যে মহাদানবীয় হবে তাতে আর আশ্চর্যের কি!

বন্যা নিয়ন্ত্রণ

সুদীপ্ত ঘোষ*

এই তো সেদিনকার কথা। শতাব্দীর এক অদৃষ্টপূর্ব বন্যায় কলকাতাসহ পশ্চিমবাংলার বারোটি জেলায় সৃষ্টি হয়েছিল এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। বন্যা কত ভয়াবহ রূপ নিতে পারে তা আজ আর আমাদের অজানা নয়। মোটামুটি হিসাব করে দেখা গেছে 30,102 বর্গ কি.মি এলাকার 152 55 লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সরকারী হিসাবমত প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় এক হাজার মানুষ। 2 লক্ষেরও বেশী গবাদিপশু বন্যায় মারা গেছে। আর 20-25 লাখ বাড়ী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে। এই বিপুল ক্ষয়ক্ষতির কথা মনে রেখেই বন্যা প্রতিরোধের জন্য শুরু হয়েছে নূতনভাবে চিন্তা-ভাবনা।

দেশের কল্যাণ আসে দেশবাসীর ঐকান্তিক চেষ্টার মাধ্যমে। দীর্ঘকালের সংগ্রামের পরই চীনবাসীর নিকট চীনের দুঃখ 'হোয়াংহো' আজ বশীভূত হয়েছে। অগভীর নদীখাত, নদীর উৎস-মুখে প্রচুর পরিমাণে তুষার গলা ও নদীর অববাহিকায় অত্যধিক বৃষ্টিপাত বন্যার বিভিন্ন কারণ হিসাবে পরিগণিত হয়। অবশ্য বাঁধ ভেঙে গিয়েও বন্যার সৃষ্টি করতে পারে। অত্যধিক বৃষ্টিপাত অবশ্যই পশ্চিমবাংলার ভয়াবহ বন্যার অন্যতম কারণ, তথাপি সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক নদী-পরিকল্পনার রূপায়ণের অভাবও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবাংলায় প্রতি বছরে গড়ে 1500 মিলিমিটার থেকে 1600 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। কিন্তু গত 27শে, 28শে ও 29শে সেপ্টেম্বর'78 পশ্চিমবাংলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে 730 মিলিমিটার। এই সামান্য তথ্য থেকেই সেই কয়েকদিনের বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ মোটামুটি অনুধাবন করা যায়।

স্বাধীনতার আগে থেকেই পশ্চিমবাংলায় কিভাবে বন্যা প্রতিরোধ করা যায় তাই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে। 1943 সালে বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল 'River Research Institute'. এই সংস্থাটি বহু সমীক্ষা চালিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করেছে। কিন্তু তার কোন সুষ্ঠু বাস্তব প্রয়োগ হয় নি। এরই মধ্যে 1956, 1959, 1973 সালে বিভিন্ন সময়ে পশ্চিম বাংলায় বন্যা হয়েছে। বন্যার অব্যবহিত পরেই বিভিন্ন পরিকল্পনা হয়েছে কিন্তু তারও সুষ্ঠু রূপায়ণ হয় নি। যদি পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণ হত তাহলে একদিকে যেমন বন্যা প্রতিরোধ করা যেত, অপরদিকে তেমনি বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ হত, পরিবহণ ব্যবস্থা ও কৃষির উন্নতি হত। উর্বর জমির আয়তন বৃদ্ধি পেত। মজে যাওয়া নদীর সংস্কার হত। কিন্তু আজ আমরা সবদিক থেকেই বঞ্চিত।

*হুগলী কলেজিয়েট স্কুল

শীত, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, প্রভৃতির জন্য বাঁধ নির্মিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক বাঁধের উদ্দেশ্য এক নয়। যেমন কংসাবতী ও ময়ূরাক্ষী বাঁধ মূলতঃ সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অপরদিকে দামোদর ও অজয় বাঁধ অন্য উদ্দেশ্য রূপায়ণে ব্যবহৃত হয়। যদিও সামগ্রিকভাবে প্রত্যেক বাঁধের বন্যা নিয়ন্ত্রণ অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া প্রয়োজন ছিল।

তাই পশ্চিমবঙ্গ যাতে পুনরায় বন্যা বিধ্বস্ত হয়ে না ওঠে, সেই জন্য নূতনভাবে চিন্তা করা দরকার। বন্যা নিরোধ করা সম্ভব নয় কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। প্রথমেই যে সমস্ত বাঁধ রয়েছে —যেমন দামোদর, বরাকর, কংসাবতী, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি বাঁধের জলধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার। শুধুমাত্র বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর নির্ভর করে বাঁধ নির্মাণ করা উচিত নয়। অত্যধিক বৃষ্টিপাত ও জোয়ারের সময় যে অতিরিক্ত জল নদী দিয়ে প্রবাহিত হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জোয়ারের সময় জল যাতে অত্যধিক পরিমাণে প্রবেশ না করে সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেইজন্য সাগরদ্বীপের নিকটবর্তী অঞ্চলে নদী ড্রেজিং করতে হবে। উপরিউক্ত বাঁধ চারটির জলধারণ ক্ষমতা 128 কোটি ঘন সেন্টিমিটার থেকে বাড়াতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ নদীমাতৃক রাজ্য। তাই পশ্চিমবঙ্গে নদীর সংখ্যা যেমন প্রচুর তেমনি প্রতি নদীর বাঁকও প্রচুর। বাঁক থাকার ফলে প্রতি নদীতে প্রচুর পরিমাণে পলি সঞ্চিত হয়। এই সমস্ত পলি অপসারণের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর ড্রেজিং অবশ্যই করণীয়। এর সঙ্গে সঙ্গে নদীকে যথা সম্ভব বাঁকমুক্ত করতে হবে অর্থাৎ বাঁক-সংখ্যা হ্রাস করতে হবে। উঁচু জায়গা থেকে জল সত্বর নীচের দিকে নেমে আসে। এই সামান্য তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে উৎসস্থল থেকে সাগর পর্যন্ত যথা সম্ভব নদীতে ঢালুভাব বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। ফলে বরফগলা জল বা অত্যধিক বৃষ্টির জল অতি সত্বর নদীপথে প্রবাহিত হয়ে সাগরে মিশবে। যে সমস্ত নদীর ঢালুভাব অত্যন্ত কমে গেছে সেগুলিকে প্রয়োজন মত অন্য নদীর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ষার সময়ে যাতে সমস্ত জল হুগলী নদী দিয়ে প্রবাহিত না হতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে ক্যানেলের মাধ্যমে কিছু জল সাগরে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতি নদীর দুই তীরে উঁচু পাকা পাড় বা ডাইক সৃষ্টির দিকেও নজর দিতে হবে। ভূমিক্ষয়রোধ অবশ্য পালনীয় কাজের মধ্যে আনতে হবে। তার জন্য নদীর দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ বা ঘাস সৃষ্টি করা যেতে পারে। ফলে একদিকে যেমন বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে অপরদিকে তেমনি চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যেক নদীর প্রয়োজন অনুসারে খাল খনন করতে হবে। ফলে নদীর জল কোন বিশেষ পথে অত্যধিক পরিমাণে প্রবাহিত না হয়ে বিভিন্ন খালের মধ্য দিয়ে সমভাবে প্রবাহিত হবে। এই খালগুলি সেচকার্য; মৎস্য চাষ, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতিতে অনায়াসে সহায়ক হতে পারে। বর্ষার আগে বাঁধের সঞ্চিত জলকে অন্যান্য কাজে লাগাতে হবে অর্থাৎ বাঁধকে যথা সম্ভব খালি রাখতে হবে। ফলে বর্ষার সময়ে কিউসেক কিউসেক জল ছেড়ে নূতন করে নূতন এলাকা প্লাবনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

মনে রাখা দরকার, সকল নদীর সমস্যা এক নয়। কুশীর সঙ্গে দামোদরের সমস্যার পার্থক্য রয়েছে। তেমনি পার্থক্য রয়েছে যমুনা ও দামোদরে। তাই প্রত্যেক নদীর নিজ নিজ সমস্যা আলাদা আলাদা করে চিন্তা করে পরিকল্পনা রচনা করতে হবে ও তাকে সত্বর বাস্তবে রূপ দিতে হবে। নচেৎ পশ্চিমবঙ্গবাসী কোনদিনই বন্যার রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পাবে না। পরিশেষে বলতে চাই, বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাঁধের নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের নিরাপত্তার জন্য স্বয়ংক্রিয় সতর্কতার ব্যবস্থা করতে হবে।

সরকারী হিসাবে তৃতীয় স্তরের বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষয়ক্ষতি*

জেলা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা	বিপন্ন মানুষ	প্রাণহানি		বাড়ীঘর			নিখোঁজ
			মানুষ	গবাদিপশু	ধ্বংস	বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত	আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত	
মেদিনীপুর	7,610 বর্গ কিমি.	33 লক্ষ	18 জন	23,500	3,04,997	1,18,417	—	—
হাওড়া	1,415 ,, ,,	16 ,, 40 হাজার	4 ,,	—	1,90,000	1,17,000	78,000	—
হুগলী	2,815 ,, ,,	19 ,, 65 ,,	51 ,,	52,910	1,89,000	46,000	25,000	65 জন
বর্ধমান	3,735 ,, ,,	24 ,, 35 ,,	427 ,,	80,044	1,67,413	41,650	—	—
বীরভূম	4,760 ,, ,,	17 ,, 50 ,,	110 ,,	25,000	51,000	1,20,000	—	700 ,,
মুর্শিদাবাদ	1,474 ,, ,,	8 ,, 55 ,,	46 ,,	—	92,519	39,072	50,022	—
নদীয়া	3,072 ,, ,,	14 ,, 50 ,,	2 ,,	7,85,000	75,000	54.730	26,100	—
বাঁকুড়া	755 ,, ,,	3 ,, 20 ,,	47 ,,	9,000	12,000	20,000	—	—
চব্বিশ পরগণা	4,430 ,, ,,	15 ,, 40 ,,	83 ,,	2,379	25,100	35,300	26,099	—

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কয়েকটি জলাধারে পলি জমার হার

বাঁধের নাম	আবহক্ষেত্র (বর্গ কিমি)	জলাধারের প্লাবিত এলাকা	জলাধারে পলি জমার বাৎসরিক হার আনুমানিক [লক্ষ বর্গ কিউবিক মিটার]	জলাধারের পলি জমার বাৎসরিক হার কার্যত [লক্ষ বর্গ কিউবিক মিটার]
মাইথন	6,293	106	8.44	73.76
পাঞ্চেৎ	10,966	77	24.45	117.59
ময়ূরাক্ষী	1,860	67	6.64	24.67

*প্রধান মন্ত্রীর কাছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্ট (22.10.79)

বন্যা-সংক্রান্ত সেমিনার*

ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা*

আজ 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' ও 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা'র যৌথ উদ্যোগে আহূত – 'পশ্চিমবঙ্গ ও সাম্প্রতিক বন্যা বিষয়ে যে আলোচনা সভা আহ্বান করা হয়েছে, তাতে সমবেত সকল সুধীজনকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি রূপে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাই। এই আলোচনা সভা আজকে উদ্বোধন করার কথা ছিল শ্রদ্ধেয় উপাচার্য ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের। অনিবার্য কারণে, কর্মব্যস্ততায়, তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি বলে আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

আপনারা সকলেই জানেন, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু আজ থেকে তিরিশ বছর আগে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মূলতঃ জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারকে বিস্তারিত করে, জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি একটি কৌতূহল ও বিজ্ঞানমনস্কতার সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে। আচার্যের সেই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য করেই – বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বন্যার পরই, পশ্চিমবাংলার সাম্প্রতিক বন্যার উপর একটি বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করে। জনসাধারণকে বিধ্বংসী বন্যার সম্বন্ধে অবহিত করার জন্যই আজকের এই সভা। এই সভাকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য, যাঁরা যাঁরা সহযোগিতা করেছেন সকলকেই ধন্যবাদ জানাই।

প্রসঙ্গতঃ নিবেদন করি, আজ এ সভায় যা আলোচনা হবে তার মূল সারাংশ, বক্তাদের সহযোগিতায়, মুদ্রিত প্রবন্ধরূপে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র আগামী বৎসরের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। এ সম্বন্ধে সকলের আনুকূল্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ রূপে পশ্চিমবাংলার একটি ভৌগোলিক অনন্যতা আছে। এই প্রদেশে প্রতি বৎসর বন্যা কোথাও না কোথাও ঘটেই এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। পশ্চিমবঙ্গে এ বৎসর যে বন্যা ঘটেছে, তা ব্যাপকতায় এবং ধ্বংসের বিপুলতায় — তুলনাহীন। ঘরবাড়ী, সড়ক, শস্য ক্ষেত্র, শিল্পাঞ্চল সব কিছুর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে—ক্ষতি হয়েছে গবাদিপশুর এবং অনেক মানুষেরও প্রাণহানি ঘটেছে। এই ঐতিহাসিক, জাতীয় বিপর্যয়ের কারণ, এবং ভবিষ্যতে এ জাতীয় বিপর্যয়ের জন্য সতর্ক থাকার প্রয়োজনে—বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের ধারাগুলি আলোচিত হবার একটি প্রয়োজন আছে, ইতিহাসের কারণেই। পশ্চিমবাংলার ভূবিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়র, জলবিদ্যাবিশারদ ও বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় চিন্তা—আমাদের ভবিষ্যৎ সংকট মোচনে পথপ্রদর্শক হবে—এই আশা আমরা করি।

সাম্প্রতিক বন্যার পর, তার নানা আলোচনা— বিজ্ঞানী মহল থেকে, সাধারণ মানুষ ও সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে, এবং কিছু কিছু রাজনৈতিক দল থেকেও হয়েছে। এ সভার আলোচনায় আমরা রাজনীতিগত বিতর্কে আদৌ আগ্রহী নই, এবং তারই অনুষঙ্গীরূপে বন্যার্তদের ত্রাণ বা পুনর্বাসনের বিতর্কেও আগ্রহী নই—কেবলমাত্র বিজ্ঞানগত দিক থেকে, এবং

* 16ই ডিসেম্বর '1978 কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারভাঙ্গা হলে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আহ্বানে অনুষ্ঠিত বন্যা সংক্রান্ত সেমিনারের উদ্বোধনী ভাষণ।

রাজনীতি নির্বিশেষে, এই প্রদেশ এবং প্রদেশের মানুষদের দুর্গতিমোচনে, এই জাতীয় বন্যার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের রূপরেখা আলোচনায় আমরা বিশেষজ্ঞদের মতামত শুনব।

পশ্চিমবাংলার নদনদী বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতির আর মানুষের মধ্যে, একটি মিলনে সংগঠনে সাম্যাবস্থা ছিল—এটি ঐতিহাসিক সত্য। তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল স্মরণাতীত কাল থেকে, এখানে, সুপ্রাচীন সভ্যতা। এই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয় ইংরেজ আমলে বাঁধনির্মাণ ও রেল-লাইনের বেড়াজালে। সুরু হয় নদীগুলির অবক্ষয় ও 'মানুষের তৈরী' মানুষকে দুঃখ দেওয়ার বন্যা। এ সম্বন্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একশো বছর আগে আর্থার বার্টন দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; কিন্তু তাঁর সাবধানবাণী উপেক্ষিত হয়।

রমেশচন্দ্র দত্তর অর্থনৈতিক ইতিহাসের অমূল্য-পরিচ্ছেদেগুলিতে এবং 1880 ও 1898 এর দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টেও এ সম্বন্ধে সতর্কবাণী ছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে ও স্বার্থে তা উপেক্ষিত হয়।

এর পর আজ থেকে ঠিক 50 বছর আগে, আজ যেখানে আমাদের এই সেমিনার হচ্ছে, সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই—একটি সেমিনার হয়েছিল বন্যা-বিষয়েই। তাতে বলেছিলেন, সেচ বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম উইলকক্স। তিনিও নানা গঠনমূলক পন্থা ও সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। আক্ষেপের কথা, তাঁর সব বক্তব্যই অনাদৃত থাকে এবং তাঁর কোন নির্দেশই কার্যকরী করা হয় নি।

স্বাধীনতার পর, সেচ-প্রকল্প—বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন মিলিয়ে, বাঁধ বেঁধে অপ্রস্তুত দ্রুততার সঙ্গে যে প্রকল্পগুলি নেয়া হয় তাতে বিভিন্ন প্রকল্পগুলির একটি সার্বিক মেলবন্ধন ঘটে নি, এবং এই প্রকল্পগুলির অপূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ রূপায়ণও অনেক ক্ষেত্রেই বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেঘনাদ সাহা ও ভুডউইনের নানা চিন্তার কথাও গুরুত্ব পায় নি। সর্বশেষ, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মানসিং কমিটির রিপোর্টে যে প্রস্তাবগুলি ছিল আজ দু'দশক ধরে তারও কোন কাজ হয় নি।

আপনারা সকলেই জানেন এবারের বন্যার চারটি পর্যায়ে হয়েছে:

প্রথম পর্যায়ে, উত্তরবঙ্গে তিস্তার বন্যায় প্লাবিত হয় জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায়ে, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বন্যার অনুক্রম ও ফলশ্রুতিতে, বন্যায় প্লাবিত হয় মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ইত্যাদি। তৃতীয় পর্যায়ে সেপ্টেম্বরের গোড়ায় বন্যায় আক্রান্ত হয়, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী। চতুর্থ পর্যায়ে, সেপ্টেম্বরের শেষে সর্বগ্রাসী বন্যায় প্লাবিত হয় প্রায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ।

এই চার পর্যায়ের বন্যার কারণ বিভিন্ন। সর্বোপরি ছিল অস্বাভাবিক এক নিম্নচাপ ও অতিবৃষ্টি।

প্রশ্ন উঠেছে—এই সামগ্রিক বন্যা কি কারণে? প্রকৃতি ছাড়া মানুষের ভূমিকা কতটুকু? কতটুকু দায়ী কে বা কারা?

প্রশ্ন উঠেছে ডি. ভি. সি. ফরাক্কা, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি প্রকল্পগুলির বিশ্লেষণ হোক। প্রশ্ন উঠেছে হিংলা বাঁধ, তিলপাড়া ব্যারেজ, তেনুঘাট প্রভৃতি নিয়ে। নদীগর্ভ ভরাট হওয়া, জলাধারে পলি জমা, নিম্নভূমি বা polder flood plain, নদীর দুই পাড়ে জ্যাকেটিং, বনভূমির সংরক্ষণ, জলাধারগুলির সংরক্ষণ—সব নিয়ে সাধারণ মানুষ জানতে চাইছেন।

নির্বিচার বাঁধ, ভেড়ি, পরিকল্পনাহীন সেতু (যেমন রূপনারায়ণ সেতু) নিম্নউপত্যকায় অসম্ভব জনবসতির চাপ—এসবগুলিই প্রমাণ করেছে প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করতে হলে, সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আজকের দুর্বিপাক আবার এটাই প্রমাণ করেছে, আগামী বন্যানিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাগুলি এমন হওয়া উচিৎ যা সহজেই অতীত ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলির সঙ্গে গ্রথিত করা সম্ভব হয়।

বন্যা ও বন্যা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলির সম্বন্ধে বৃহত্তর

জনসাধারণের অজ্ঞতা দূর করা প্রয়োজন। এবং বিশেষ করেই প্রয়োজন—বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সুচিন্তিত, স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাকে কার্যকরী করা। বন্যা নিরোধ সম্ভব নয়, কিন্তু বন্যাপরিস্থিতিকে সহনীয় করা সম্ভব, বিজ্ঞানের যুগে।

আজকের আলোচনা সভায় নানা বিশেষজ্ঞরা সমবেত হয়েছেন: এঁদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী কপিল ভট্টাচার্য, দেবেশ মুখোপাধ্যায়, গিরিজাপ্রসন্ন বিশ্বাস, কাননগোপাল বাগচী, নন্দগোপাল মজুমদার, সুহাস চট্টোপাধ্যায়, শরজিৎ গুহ, অসীম দাশগুপ, রাধানাথ ঘোষ। এঁরাই এঁদের নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের দিক্‌নির্দেশ করবেন, এই আশা নিয়েই আমরা আজ সমবেত হয়েছি। সকলের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতায়, এ সভার সাফল্য কামনা করি।

পশ্চিম বাংলার বন্যা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

রাধানাথ ঘোষ

1978 সালে পশ্চিমবাংলায় যে বিধ্বংসী ও ব্যাপক বন্যা ঘটিয়াছে উহাতে প্রাণহানির ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিপুল। ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক। পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বন্যার পিছনে নানা কারণ আছে। বিশেষজ্ঞদের বিস্তৃত আলোচনা ও কার্যকরী পরিকল্পনা আশু গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন—এ সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই।

পশ্চিমবঙ্গ নদীমাতৃক দেশ। এদেশে স্মরণাতীত কাল হইতেই বন্যা আছে। কিন্তু বন্যা কখনও এত দুঃখদায়িনী রূপ নেয় নাই। বন্যার ব্যাপক রূপ এবং ক্ষতির বিপুলতা দিন দিন যে বাড়িতেছে—ইহার পিছনে প্রকৃতির উপর মানুষের নির্বোধ হস্তক্ষেপই দায়ী।

তথ্যাদির উল্লেখ না করিয়া মাত্র অভিজ্ঞতার দ্বারাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, নদী পরিকল্পনাগুলি সর্বাংশে যে ভুলভাবে কার্যকর করা হইয়াছিল তাহারই ফলশ্রুতি আজিকার বন্যা। নদীকে রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া নদীর জলকে কেবলমাত্র তাহাদের উৎসদেশে ধরিয়া রাখিবার যে ভ্রান্ত পদ্ধতি লওয়া হইয়াছিল এবং উহার ভিত্তিতে যতখানি কাজ করা হইয়াছিল তাহার সমস্তটাই একটা বিরাট ভুল।

দামোদরের বন্যার কথা ধরা যাক। দামোদর বন্যাকে অভিশাপ বলিয়া প্রচার করিয়া, দামোদরকে সর্বনাশা নামে অভিহিত করার পিছনে বিদেশী রাষ্ট্র-শক্তির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। আশু রাষ্ট্রশক্তির হস্তান্তরের প্রাক্কালে পশ্চিমবাংলার সার্বিক ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করিয়া, স্থায়ী সমস্যা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি ছিল সে উদ্দেশ্যের অন্যতম।

1943 সালের যে বন্যাকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করিয়া দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্প রচিত হইয়াছিল, সে বন্যায় কমবেশী 300 গ্রাম প্লাবিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে 50 বর্গমাইল এলাকার 70টি গ্রামের 18,000 বাড়ী ধ্বংস হইয়াছিল। ইহার জন্য নিঃসন্দেহে দায়ী করা যায়, তদানীন্তন রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবহেলাকে। নদীর বামপাড়ে বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল অন্যায়ভাবে। আরও অন্যায় হইয়াছিল সেই বাঁধের প্রতি যথোচিত তদারকীর ব্যবস্থা না করা।

পরবর্তী কালে বন্যার প্রতিকারের নামে যে প্রকল্প নেওয়া হয়, সেই প্রকল্পে বন্যার প্রতিকারের নামে উল্লিখিত ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামের সংখ্যার দ্বিগুণ গ্রামকে স্থায়ীভাবে জলের তলায় ডুবাইয়া দেওয়া

হইয়াছে। তবুও, সেই প্রকল্পের অর্ধেকমাত্র রূপায়িত হইয়াছিল! দামোদর-প্রকল্পের ফলে দেশের সামগ্রিক ক্ষতি হইবে তাহা প্রকল্পের এক সদস্য বলিয়াছিলেন। দেশের এক ইঞ্জিনীয়ার উহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন —প্রকল্পটিতে ক্ষতি হইবে। প্রখ্যাত কুমুদভূষণ রায়, বিমলনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভূয়জন ইঞ্জিনীয়ার উহার ভুলত্রুটি দেখাইয়া সংশোধনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। 'দেশ গড়ার আবেগে'—সব কিছুই অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন নেতৃবৃন্দ। আজো নদী বিশেষজ্ঞ শ্রীকপিল ভট্টাচার্য দেশবাসীকে সচেতন করার প্রয়াসে, অনলস পরিশ্রম করিতেছেন, নানা রচনায় ও ভাষণে। তথাপি, যথার্থ কার্যকর পরিকল্পনা, যথার্থ ত্রুটি সংশোধনের কাজ আজো অগ্রসর হয় নাই। বন্যার প্রতিকার, বিশেষতঃ নিয়ন্ত্রণের পথগুলি সম্বন্ধে সরকারী কর্মচারিগণের জ্ঞানের অভাব আছে ভাবিতে প্রবৃত্তি হয় না, অভাব যাহা আছে তাহা উদ্যমের, সাহসের।

নিম্নদামোদর-প্রকল্পের বিষয়টি সম্বন্ধে দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্পকগণ সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘ উপেক্ষার পর 1970 সালে সেই প্রকল্প গৃহীত হইয়া 14 কোটি টাকা খরচ হয়, তাহার পর সরকার বদল হয়। পরিবর্তিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, প্রকল্পটির প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ সত্বর রূপায়ন সমাপ্ত হইবার প্রত্যাশা থাকিলেও তাহা আজও পূর্ণ হয় নাই। কর্তৃপক্ষ কেবলই গড়িমসি করিতেছেন। অর্থাৎ ব্যাধির বীজ রহিল—বন্যা রহিল।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষক ও মধ্যবিত্ত। তাঁহারাই গ্রামে বাস করেন। গ্রামের প্রতি উদাসীন পূর্বতন সরকার নিম্নদামোদর উন্নয়ন প্রকল্পে অমনোযোগী ছিলেন। বর্তমান সরকারের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী কাম্য হইলেও, তাহা আজও ঘটে নাই, ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়। গ্রাম বাংলায় অধিক মনোযোগ আজ একান্ত আবশ্যক।

বন্যার আশু স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনারূপে, বৃষ্টির জলকে সহজে বহিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে খাল, বিল দেশের সর্বত্র এখনই প্রয়োজন। আরেকটি প্রয়োজন মূল নিকাশী হুগলী নদীর গর্ভে পলি পড়া রোধের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা। এই দুইটি প্রকল্প এখনই রূপায়িত করার কাজ সুরু করিলে আগামী বন্যার ভয়াবহতা সহনীয় হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ভাষান্তর বিজ্ঞান

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা

মেঘনাদ সাহা ও কমলেশ রায়

ভাষান্তর : রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

[জুলাই 1944 সংখ্যা 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' পত্রিকার অধ্যাপক সাহা ও রায়ের এই মূল্যবান প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। 1948 সালে ডি. ভি. সি গঠিত হওয়ার পর এ সম্পর্কে অনেক কাজ হয়েছে। কিন্তু তাঁদের মূল বক্তব্যের অনেক কিছু রূপায়িতও হয় নি। তাদের মূল বক্তব্যের সারাংশ ভাষান্তরিত করে এখানে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হলো।]

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতে মানুষের জীবন বড় বড় নদীর উপত্যকায় গড়ে উঠেছে। নদী তাদের পরিবহনের প্রধান পথ, কৃষি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে তাদের বিশেষ সহায়ক। কিন্তু অতীতে বহু বছর ধরে বিভিন্ন দল অবৈজ্ঞানিকভাবে নদী-প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে কৃষি, জনস্বাস্থ্য ও নদীপথে যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যদি আমরা দামোদর নদের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব, শক্তির বিরাট নদের মধ্য দিয়ে বয়ে যায়, অথচ তাকে কোন কাজে লাগানো হয় না। এই নদ উৎসমুখে 2000 ফুট উচ্চতা থেকে রানীগঞ্জে 285 ফুট উচ্চতায় নেমে আসে। এই নিম্ন অবতরণের প্রায় সবটাই বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কাজে লাগানো যায়, যদি মূল নদী ও তার শাখার উপযুক্ত স্থানে একাধিক বাঁধ নির্মাণ করা যায়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জল নিয়ন্ত্রণ বা শক্তি উৎপাদনের জন্যে মূল করণীয় কাজ হলো দামোদরের উপরদিক ও বরাকর অঞ্চলে কতকগুলি বাঁধ নির্মাণ এবং নিম্ন অববাহিকায় কতকগুলি ব্যারাজ নির্মাণ, যাতে সেচ ও ধৌতকর্মের (flushing) জল সরবরাহ সম্ভব হয়।

বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্যে বাঁধ নির্মাণের উপযুক্ত স্থানগুলিকে মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা যায়—প্রথম ভাগ বরাকরের সঙ্গমের উপরের অংশে দামোদরের ও তার উপনদীগুলির উপরের জায়গা এবং অন্যভাগে বরাকর ও তার উপনদীগুলির উপরে নির্দিষ্ট কিছু জায়গা।

দামোদর পরিকল্পনার উপরকার বাঁধের জায়গা

1 পারজোরি : বরাকরের সঙ্গে সঙ্গমের প্রায় 50 মাইল উপরে অবস্থিত এই জায়গাটি বাঁধের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। এর পরিবাহক্ষেত্রের বিস্তৃতি প্রায় 3000 বর্গ মাইল। একমাত্র গোয়াই নদী ছাড়া দামোদরের আর সবকটি উপনদীই এতে পড়ে। পরিপূর্ণ অবস্থায় এর জলাধারের জলে তলমাত্রা ঝরিয়া কয়লাখনির একাধারকে স্পর্শ করে। এই কারণে প্রথম দিকে কক্স্ ও অন্যান্য ভূতাত্ত্বিকদের আপত্তি ছিল এখানে বাঁধ করার। পরে 1926-29 সালে নতুন সমীক্ষার পর তাদের মত বদলায়। তারা দেখেন যে, খনিতে জলপ্রবেশের সত্যি কোন আশঙ্কা নেই। এই বাঁধের প্রস্তাবিত উচ্চতা 110 ফুট এবং পরিবাহক্ষেত্র 30.0 বর্গমাইল।

---

*দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-700 029

2 আয়ার : পারজোরির প্রায় 17 মাইল উপরে প্রস্তাবিত এই বাঁধটির উচ্চতা হবে 100 ফুট, পরিবাহক্ষেত্র 2000 বর্গমাইল।

3. রামগড় : সবচেয়ে উপরের এই বাঁধটির পরিবাহক্ষেত্র 1000 বর্গমাইল এবং জলধারণ ক্ষমতা 90,000 লক্ষ ঘন ফুট।

4. উপনদীগুলির নিয়ন্ত্রণ : দামোদরের উপনদী জামুনিয়া, কোনারি এবং গোয়াই-এর পরিবাহ ক্ষেত্র যথাক্রমে 350, 730 ও 450 বর্গমাইল অর্থাৎ সবসমেত 1530 বর্গমাইল। বন্যা নিয়ন্ত্রণের বাঁধ নির্মাণের জন্যে এরা খুব উপযোগী নয়। কারণ এদের সকলের খাতই অত্যন্ত খাড়া—এটাই হলো বিশিষ্ট ভূতাত্ত্বিকদের অভিমত। কিন্তু এগুলিতে বাঁধ দিলে প্রচুর বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। পারজোরি ও বরাকর সঙ্গমের মাঝামাঝি জায়গায় একটি স্থানে বাঁধ নির্মাণ করলেও এই দুই জায়গায় উচ্চতার তারতম্য (540 ফুট ও 285 ফুট) কাজে লাগানো যেতে পারে এবং তা থেকে প্রায় 2500 লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। নদীগুলির মোট শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা : 6880 লক্ষ ইউনিট (পারজোরি : 2000 লক্ষ, আয়ার 1330 লক্ষ, রামগড় : 550 লক্ষ, উপনদীসমূহ : 1000 লক্ষ, পারজোরি ও বরাকরের মধ্যে বাঁধ : 2000 লক্ষ ইউনিট)

বরাকর অববাহিকা

বরাকর দামোদরের দীর্ঘতম উপনদী। মোট জলভাগের প্রায় 40 শতাংশই বরাকর বহন করে আনে। এ কারণে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য প্রকল্পের জন্যে বরাকর নদীর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। বরাকর ও তার শাখা নদীগুলির উপরে বাঁধের প্রস্তাবিত জায়গা—

1 হর্ণ : এটি দুর্গাপুরগ্রামের কাছে একটি সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত। বাঁধের উচ্চতা 70 ফুট এবং জলধারণ ক্ষমতা 864 কোটি ঘন ফুট।

2. দেওলবাড়ি : হর্ণ-এর 23 মাইল উপরে অবস্থিত। এখানে নদীর ঢাল প্রায় প্রতি মাইলে 7 ফুট। বাঁধের প্রস্তাবিত উচ্চতা 130 ফুট, জলধারণ ক্ষমতা 1700 কোটি ঘন ফুট।

3. পালকিয়া ও বালপাহাড়ি : দেওলবাড়ি থেকে প্রায় 16 মাইল উপরে অবস্থিত। প্রস্তাবিত 125 ফুট উঁচু পালকিয়া বাঁধ উশ্রী নদীকেও বাঁধবে। এর পরিবাহক্ষেত্র 2000 বর্গমাইল। পালকিয়ার তিন মাইল নীচে বালপাহাড়িতেও একটি জায়গা আছে, যা কতক দিক থেকে আরও উপযুক্ত। এই দুটির মধ্যে একটিকে নির্বাচন করতে হবে।

4. তিলিয়া : উশ্রী-বরাকর সঙ্গমের 50 মাইল উপরে অবস্থিত। পরিবাহক্ষেত্র 270 বর্গমাইল।

5. উশ্রী : বরাকরের উপনদী উশ্রীতেও একটি বাঁধের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার উচ্চতা হবে 70 ফুট এবং পরিবাহক্ষেত্র 280 বর্গমাইল।

দামোদর ও বরাকরের এই সব কয়টি বাঁধ থেকে সবসমেত প্রায় 114 কোটি ইউনিট বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাবে, যার শতকরা 75 ভাগ ব্যবহারযোগ্য হলেও আমরা পাচ্ছি প্রায় 85 কোটি ইউনিট।

বাঁধগুলি নির্মাণের পর সেগুলি এবং সংলগ্ন জলাধারগুলিকে রক্ষা করবার জন্যে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেসব নতুন সমস্যা দেখা দিতে পারে তাদের সমাধানের জন্যেও কতকগুলি ব্যবস্থা নিতে হবে।

দামোদর ও তার উপনদীগুলির উৎস যে ছোট-নাগপুর অঞ্চলে, সেখানকার মাটি খুব আলগা এবং গাছপালা কম। এই মাটি নদীর টানে সহজেই ধসে আসে। বিপুল পরিমাণ বালি ও পলির ভার বহন করতে গিয়ে নদীর খাত অগভীর হয়ে যায়। ফলে বাঁধের আয়ু কমে আসে। আলগা মাটির ক্ষয় নিবারণের জন্যে বনসংরক্ষণ ও বৃক্ষ রোপণ দরকার। এছাড়া উদ্ভিদের আচ্ছাদন থাকলে ভূমির জল শোষণের ক্ষমতা বেড়ে যায় বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এর পক্ষে ও বিপক্ষে যা বলা যায় তা থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় :

1. বৃক্ষরোপণ ও অন্যান্য ভূমিসংরক্ষণ ব্যবস্থার

প্রধান উপযোগিতা হল বাঁধের আয়ু দীর্ঘতর করা। স্বাভাবিক বন্যার সীমা-শীর্ষ এর ফলে খুব বেশী হলে 20 শতাংশ পর্যন্ত মন্দীভূত হতে পারে।

2 বৃক্ষরোপণ ও বনসংরক্ষণ জাতীয় কাজ বৃষ্টিপাতের উপর প্রভাব বিস্তার করে বলে যে দাবি করা হয়, তার মূলে ভিত্তি নেই। এর ফলে মাটির তলার জলের তল উঁচুতে ওঠে বলে যে দাবি তোলা হয়, তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে।

3. প্রলয়ঙ্কর বন্যা যেসব কারণের যোগাযোগে সৃষ্টি হয়, তার বিরুদ্ধে বৃক্ষরোপণ জাতীয় ব্যবস্থা কার্যকর নয়।

নদীখাতে এবং বাঁধের জলাধারে পলি পড়ার সমস্যাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নদীর পরিবাহক্ষেত্র যত বড় হবে, পলি তত বেশী পড়বে। দামোদরের ক্ষেত্রে সমস্যার আয়তন দেখে অনেকেই হতাশ বোধ করেন। কষ্ট সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিস্তৃত আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, বর্তমান হারে পলি পড়লেও প্রস্তাবিত বাঁধগুলির আয়ু অন্তত 200 বছর হবে। এই আয়ু আরও বাড়ানোর জন্যে নীচের ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন :

1. পরিবাহক্ষেত্রে উপযুক্ত জায়গায় বন-সংক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ।

2. ধাপ তৈরি এবং উঁচু করে বেড় দেওয়া।

3. উৎসমুখে ছোটখাটো জলস্রোতগুলিকে থিতানোর জন্যে উপযুক্ত জলাধার তৈরি করে দেওয়া।

4. বাঁধের জলাধারের নীচের দিকের স্লুইস গেটগুলি ব্যবহার করে তলার জমে-থাকা বালি খুলিয়ে দেওয়া, যাতে তা স্রোতের টানে বাইরে গিয়ে পড়ে। জলপ্রবাহ-শক্তিচালিত তলকর্ষণ-এর এই পদ্ধতি পুরনো এবং কার্যকরী।

5 যান্ত্রিক তলকর্ষণ অর্থাৎ আবর্জনা অপসারণ। কিছুটা ব্যয়সাধ্য হলেও অপসারিত বস্তু অন্য কোথাও অর্থকরীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। দামোদর উপত্যকায় কয়লাখনিগুলিতে বালির বিরাট চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া বাড়ি তৈরির উপকরণ হিসাবেও প্রচুর বালির দরকার হয়। একারণে দামোদর অঞ্চল থেকে কলকাতায় এবং তার আশপাশের জায়গায় প্রচুর পরিমাণ বালি নিয়ে আসা হয়। জলপথে বজরায় করে বালি নিয়ে আসার সুব্যবস্থা করতে পারলে এই চাহিদা আরও বাড়বে। এইসব ব্যবস্থা অবলম্বন করলে নির্মিত বাঁধগুলির আয়ু আরও কয়েক শ' বছর বেড়ে যাবে।
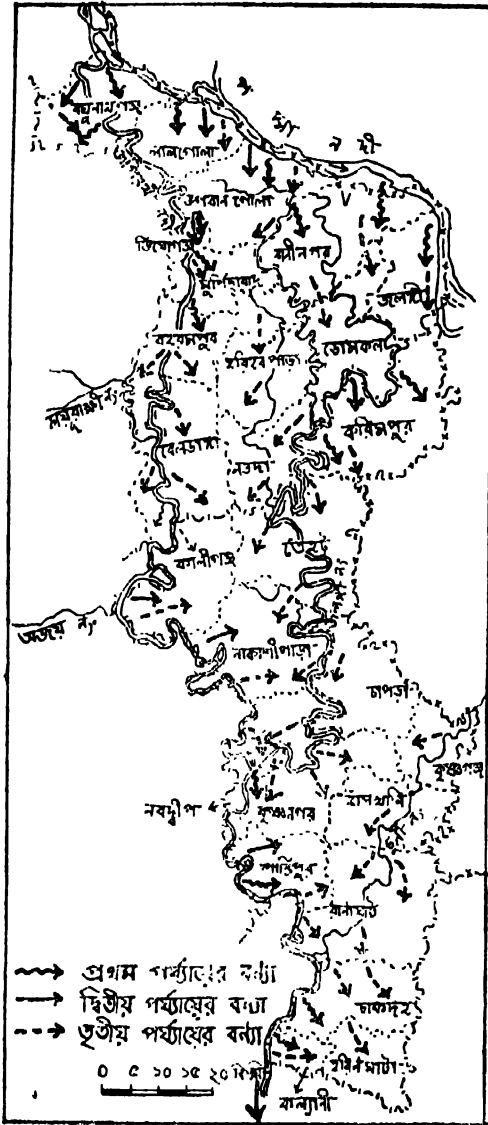
পশ্চিম বাংলার বন্যার তিন পর্যায়

[বারোমাস পত্রিকার সৌজন্যে]

দামোদর ও ময়ূরাক্ষীর বন্যা প্লাবিত অঞ্চল
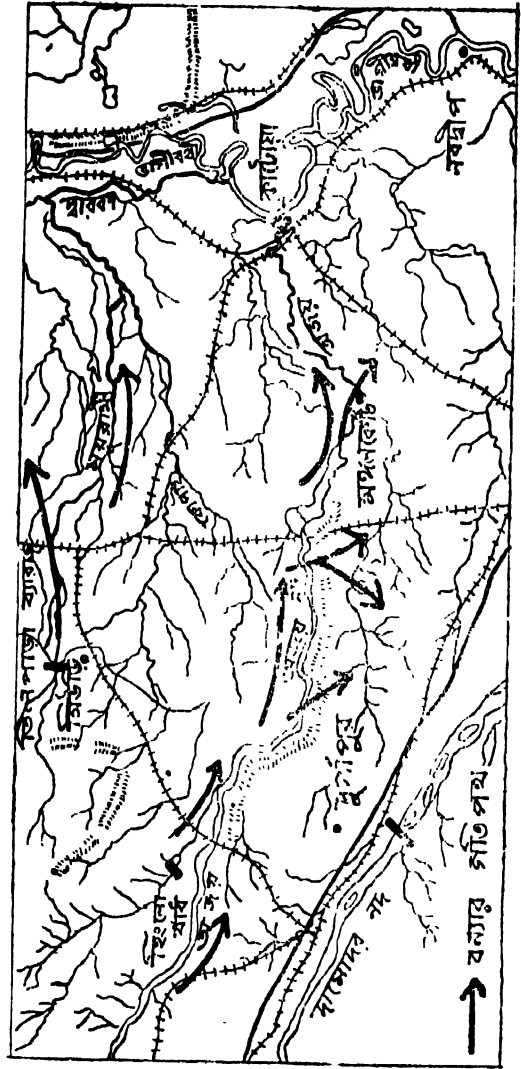
[বারোমাস পত্রিকার সৌজন্যে]

পরিষদ-বিজ্ঞপ্তি

নিবেদন

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র গ্রাহক চাঁদা এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা ডাকযোগে যদি পাঠান তবে নিম্নোক্ত নামে পাঠাবেন (কোন ব্যক্তিগত নামে গ্রহণযোগ্য হবে না):

কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ,
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

চেকে পাঠালে—কেবল **Bangiya Bijnan Parishad** লিখবেন।

কলিকাতার বাইরের চেক গ্রহণ করা হবে না

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিশেষ সাধারণ অধিবেশন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গত বার্ষিক সাধারণ সভায় বিধি-নিয়মাবলীর সংস্কার বিষয়ে যে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বানের কথা ছিল, বর্তমান কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্তানুযায়ী আগামী 21. 4. 79 বিকাল 5টায় 'সত্যেন্দ্র ভবনে', (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006) ঐ বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সমস্ত সভ্য-সভ্যাদের ঐ সভায় যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিবেদক
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জনপ্রিয় বক্তৃতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে নিম্নোক্ত বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বিষয় : তথ্যের জগৎ : তথ্যবিজ্ঞান ও টেকনোলজি
বক্তা : সুবীরকুমার সেন
স্থান : 'সত্যেন্দ্র ভবন', বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
(পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006)
তারিখ : 25শে এপ্রিল, 1979
সময় : বিকেল 5টা

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

রাজশেখর বসু স্মৃতি-বক্তৃতা

বক্তা : অধ্যাপক তপেন রায়

বিষয় : বর্তমান পরিস্থিতিতে শক্তির উৎস

তারিখ ও সময় : 12ই মে, 1979, বিকাল 4টা

স্থান : 'সত্যেন্দ্র ভবন, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-বক্তৃতা

আগামী 19শে মে'79 শনিবার বৈকাল 4টায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের "সত্যেন্দ্র ভবনে" (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 বিশ্বরূপা থিয়েটারের পূর্বে)—'শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করবেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। বক্তৃতার বিষয় : 'মৃত্তিকা-বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ'। সর্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি নিবেদন

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে—আপনারা যেন জানুয়ারী '79 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান-এর সংলগ্ন 'সমীক্ষা' শীর্ষক প্রশ্নগুলির উত্তর যথাসম্ভব শীঘ্র লিখে প্রকাশনা সচিব, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 (ফোন 55-0660) এই ঠিকানায় পাঠান। আপনাদের প্রেরিত উত্তরসমূহ পর্যালোচনা করে পত্রিকার উন্নতিসাধন করা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হবে।

প্রকাশনা সচিব—রতনমোহন খাঁ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা ; ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসে প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি 'ডাকযোগে' পাঠানো হয় ; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট অপিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয় ; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। টাকা, চেক ইত্যাদি কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে পাঠাবেন না। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করিবেন।
6. কলিকাতার বাইরের কোন চেক প্রেরণ করলে গ্রহণ করা হবে না।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্যবিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। কিশোর বিজ্ঞানীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা : প্রকাশনা সচিব, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন : 55-0660.
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন ; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রকাশনা সচিব
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

JNAN-O-BIJNAN

Regd. No. C 3684
(G.P.O. Calcutta)

February, 1979

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে প্রকৃত জনকল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য পরিষদের বর্তমান
কর্মসমিতি একান্তই সচেষ্ট, সেই বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাকে সফল করতে
হলে সকলের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা চাই। এই উদ্দেশ্যে
পরিষদের সদস্যবৃন্দ, দেশের বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞানকর্মী, বিজ্ঞান-
সংগঠন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সমাজসেবা সংগঠন, সমাজ ও
রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং জনসাধারণের কাছে
আমাদের আবেদন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
প্রতিষ্ঠিত এই মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের
উন্নতি ও প্রসারকল্পে সকলে আন্ত-
রিকভাবে এগিয়ে আসুন,
সাহায্য করুন ও পরামর্শ
দিন।

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—নীলাচল প্রেস, কলিকাতা-700 009

মূল্য- 1·50 টাকা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 3, মার্চ, 1979

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

জন্ম : 14ই মার্চ, 1879

মৃত্যু : 18ই এপ্রিল, 1955

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাত্রিংশত্তম বর্ষ মার্চ, 1979 তৃতীয় সংখ্যা

আইনষ্টাইন ঃ শতবর্ষের আলোকে

কোন দেশেই মহাকবি বা মহাবিজ্ঞানীর আবির্ভাব সচরাচর ঘটে না। বহু যুগের প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষার পর আবির্ভাব ঘটে এক একজন মহাকবি বা মহাবিজ্ঞানীর। আমদের দেশে মহাকবি কালিদাসের পর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়েছিল কয়েক শতাব্দী পরে। আর রবীন্দ্রনাথের জন্মের শতবর্ষ পার হয়েও আর একজন কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটে নি এখনও। বিজ্ঞান জগতেও তেমনি মহাবিজ্ঞানী নিউটনের আবির্ভাবের পর কয়েক শতাব্দী প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল আইনষ্টাইনের আগমনের জন্যে। আজ আইনষ্টাইনের জন্মের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপিত হচ্ছে সারা বিশ্বে। ইতিমধ্যে আর একজন নিউটন বা আইনষ্টাইনকে আমরা পাই নি।

ধর্মগ্রন্থে বলা হয়, বহু যুগের বহু মানুষের সাধনা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে যুগাবতারের আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেই উপযুক্ত মহামানব দেখা দেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন বলেই যুগসন্ধিক্ষণে আইনষ্টাইনকে আমরা পেয়েছিলুম। বিজ্ঞানজগতে 'নিউটন না এলে আইনষ্টাইনকে আমরা পেতুম কিনা সন্দেহ।

মহাবিশ্বের কার্যকারণ সম্পর্কে নিউটন যে তত্ত্ব পেশ করেছিলেন তা অবিসংবাদীরূপে গ্রাহ্য হয়ে এসেছিল প্রায় দু'শতাব্দী কাল। কিন্তু নিউটনীয় ব্যাখ্যায় আইনষ্টাইন সন্তুষ্ট হতে পারেন নি. তাঁর মনে জাগলো নানা সংশয়, নানা প্রশ্ন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আলোক-তরঙ্গের উপর দ্রষ্টা গতিবৈশিষ্ট্যের কোন প্রভাব আছে কিনা তা আলোচনা প্রসঙ্গে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে চাক্ষুস অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিউটনীয় বিজ্ঞানের অসামঞ্জস্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। এই অসঙ্গতি নিরাকরণের জন্যে আইনষ্টাইন 1905 সালে তাঁর 'বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব' নিয়ে এগিয়ে এলেন। তাঁর এই তত্ত্বের আগে আলোক-তরঙ্গের বাহক ঈথার ও তা থেকে উদ্ভূত তরঙ্গের স্পন্দনকাল বিজ্ঞানীদের কাছে নিউটনীয় স্বতঃসিদ্ধ দেশকালের মূর্ত প্রতীক হিসাবে গণ্য হতো। এই ধারণা যে ভ্রান্ত এবং এটিই যে আলোক-বিজ্ঞান সম্পর্কিত সমস্ত অসঙ্গতির কারণ তা আইনষ্টাইন তাঁর তত্ত্বের সাহায্য খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন।

এর 10 বছর পরে তিনি তাঁর 'সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে' মহাকর্ষের নতুন ব্যাখ্যা দিলেন। নিউটনীয় বিজ্ঞান অনুযায়ী আমরা এতদিন জেনে এসেছিলুম, মহাকর্ষ হচ্ছে দুটি জড়বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ-জনিত। নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব অনুযায়ী গতি-শাস্ত্রের ভিত্তি ব্যক্তিনিরপেক্ষ দেশকালের পরি-কল্পনার উপর নির্ভরশীল এবং ইউক্লিডীয় জ্যামিতি সেখানে দেশবোধের একমাত্র অবলম্বন। আইনষ্টাইন বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে বললেন, মহাকর্ষ ব্যাপারটা আদৌ আকর্ষণজনিত নয়। ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে বিসর্জন দিয়ে রীমান-কল্পিত দেশবোধ তত্ত্বের আশ্রয় নিয়ে তিনি দেখালেন, জড়ের গতি-বৈচিত্র্যের কারণ দ্রষ্টার দেশকালরূপ প্রক্ষেপ ভূমির অসমতা ও কুব্জতা। তিনি বললেন, সৌরজগতে গ্রহগুলির আবর্তনের কারণ সূর্যের কোন বলের দ্বারা আকৃষ্ট হবার জন্যে নয়, কারণ হলো সূর্যের চারিদিকের দেশে একটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের অস্তিত্বের জন্যে গ্রহগুলি সহজ পথ ধরে গড়িয়ে যেতে পারে।

আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে আলোক রশ্মির উপর মহাকর্ষের প্রভাব। তিনি বললেন, জড় বস্তুর মত আলোকের উপরও দেশকালের অসমতা ও কুব্জতার প্রভাব আছে। গণিতের সাহায্যে তিনি দেখালেন, সুদূর নক্ষত্র থেকে আগত আলোক-রশ্মি সূর্যের কাছ দিয়ে যাবার সময় কতটা বেঁকে যাবে। 1919 সালের 29 মে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় ইংরেজ জোতির্বিজ্ঞানীরা যে পরীক্ষা সম্পাদন করলেন, তাতে জানা গেল আইনষ্টাইনের এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। এতে সারা বিশ্বে বিপুল আলোড়ন পড়ে গেল এবং আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব যুগান্তকর বলে স্বীকৃত হলো। তখন থেকেই বিজ্ঞান সম্পর্কশূন্য সাধারণ মানুষের মধ্যেও তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্বের স্বরূপ জানবার কৌতূহল জেগে ওঠে এবং তিনি হয়ে দাঁড়ান প্রবাদ-পুরুষ।

আবার 1945 সালে পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারলুম, জড় ও শক্তি সম্পর্কিত আইনষ্টাইনের সমীকরণ সূত্র $E=mc^2$) কতখানি সত্য।

জীবনের শেষ ত্রিশ বছর আইনষ্টাইন তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র ও মহাকর্ষ ক্ষেত্র এক সূত্রে বাঁধবার প্রয়াসে 'একক ক্ষেত্র তত্ত্ব' Unified Field Theory) সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকালের নিরলস প্রয়াস সত্ত্বেও তিনি সফলকাম হতে পারেন নি। আইন-ষ্টাইন তাঁর 'আলোক-তড়িৎ তত্ত্বে'র দ্বারা কোয়াণ্টাম তত্ত্ব বা কণাবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা দেখলুম, সেই আইনষ্টাইনই আবার বোর, হাইজেনবার্গ, শ্রোয়েডিঙ্গার, ডিরাক প্রমুখ বিজ্ঞানীদের প্রবর্তিত কণা-বলবিদ্যাকে (কোয়াণ্টাম মেকানিক্স্) সমর্থন জানালেন না। কণা-বলবিদ্যার আবির্ভাবে কণিকা পদার্থবিদ্যার জগতে

সামঞ্জস্য ও পূর্ণতার স্থানে সম্ভাব্যতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দিলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। নতুন মতবাদের প্রবক্তাদের সঙ্গে তিনি কিছুতেই সহযোগিতা করলেন না। তাঁর মনে সনাতন নিয়মাবলীভিত্তিক জ্ঞান এতদূর ছিল যে, তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করলেন, কণিকা জগতের চিন্তাধারায় একটা গলদ রয়ে গিয়েছে, যার জন্যে প্রকৃত মূল সত্যকে জানা যাচ্ছে না, সত্যকে জানা যাচ্ছে বিচ্ছিন্নভাবে। আমৃত্যু নিঃসঙ্গভাবে বিজ্ঞান জগতে তিনি একাকী চললেন দেখে নবীন বিজ্ঞানীরা ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা হলো, আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কারের সময় তাঁর যে একাকীত্বকে মনে করা হতো তাঁর সমকালীন চিন্তাজগৎ থেকে অনেক দূর অগ্রগামী এক চিন্তাশীলের মনোভাব, সেই একাকীত্বকে এখন মনে করা হতে লাগলো পথ হারানো ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল না রেখে চলা এক বিজ্ঞানীর বিচ্ছিন্নতা। আইনষ্টাইন সম্পর্কে কণা-বলবিদ্যার প্রবক্তাদের এই ধারণা যথার্থ কিনা তার উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ। আইনষ্টাইনের বিজ্ঞানী ভূমিকা ছাড়াও তাঁর আরেকটি দিক, তাঁর মানবতা বোধের দিক আজ মূল্য বোধহীন প্রজন্মীতে, আমাদের বারংবার বিস্ময়ে আপ্লুত করে। বিজ্ঞানীর যে একটি সামাজিক সাযুজ্যের দিক, একটি সামাজিক দায়িত্ব বোধের দিক আছে সে দায়িত্ব বোধে তিনি ছিলেন একান্ত সচেতন। ব্যষ্টি এবং সমষ্টির কল্যাণবোধে, মমতায় তাঁর হৃদয়ের বসুধারা ছিল নিয়তই উৎসারিত—আর ছিল তাঁর সামাজিক অন্যায়ের প্রতি নিরলস নির্ভীক ধিক্কার। এহটি দিকও আজ শতবর্ষের স্মরণে একান্ত ভাবে স্মরণীয়।

আজ তাঁর জন্মশতবর্ষের পূর্তিতে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি—তাঁর প্রখর ও অলোক-সামান্য অন্তর্দৃষ্টির কল্যাণে আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক জটিল রহস্যের মর্ম আজ সকলের পক্ষে সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। যে মহারথীরা আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন ও দিচ্ছেন তাঁদের পুরোভাগেই আইনষ্টাইনের স্থান স্বীকৃত হয়ে থাকবে চিরকাল।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রলোক

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বালকেরা শৈশবে পড়িয়া থাকে চন্দ্র উপগ্রহ। কিন্তু উপগ্রহ বলিলে, সৌরজগতের সঙ্গে চন্দ্রের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হইল না। পৃথিবী ও চন্দ্র যুগলগ্রহ। উভয়ে এক পথে, একত্র সূর্য প্রদক্ষিণ করিতেছে উভয়েই উভয়ের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের বশবর্তী—পৃথিবী গুরুত্বে চন্দ্রের একাশীগুণ এজন্য পৃথিবীর আকর্ষণীশক্তি চন্দ্রাপেক্ষা এত অধিক যে, সেই যুক্ত আকর্ষণে কেন্দ্র পৃথিবীস্থিত; এজন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহ বোধ হয়। সাধারণ পাঠক বুঝিবেন যে, চন্দ্র একটি ক্ষুদ্রতর পৃথিবী; ইহার ব্যাস 1050 ক্রোশ, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের চতুর্থাংশের অপেক্ষা কিছু বেশী। যে সকল কবিগণ নায়িকাদিগকে আর প্রাচীন প্রথামত চন্দ্রমুখী বলিয়া সন্তুষ্ট নহেন—নূতন উপমার অনুসন্ধান করেন—তাঁহাদিগকে আমরা পরামর্শ দিই যে, এক্ষণ অবধি নায়িকাগণকে পৃথিবীমুখী বলিতে আরম্ভ করিবেন। তাহা হইলে অলঙ্কারের কিছু গৌরব হইবে, বুঝাইবে যে, সুন্দরীর মুখমণ্ডলের ব্যাস কেবল সহস্রক্রোশ নহে—কিছু কম চারি সহস্রক্রোশ।

এই ক্ষুদ্র পৃথিবী আমাদিগের পৃথিবী হইতে একলক্ষ বিংশতি সহস্র ক্রোশ মাত্র—ত্রিশ হাজার যোজন মাত্র। গাগনিক গণনায় এ দূরতা অতি সামান্য—এ পাড়া ও পাড়া, ত্রিশটি পৃথিবী গায় গায় সাজাইলে চন্দ্রে গিয়া লাগে। চন্দ্র পর্যন্ত রেলওয়ে যদি থাকিত তাহা হইলে ঘণ্টায় বিশ মাইল গেলে, দিন রাত্র চলিলে, পঞ্চাশ দিনে পৌছান যায়।

সুতরাং আধুনিক জ্যোতির্বিদগণ চন্দ্রকে অতি নিকটবর্তী মনে করেন। তাহাদিগের কৌশলে

এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক কায করিয়াছেন। বর্ণনায়, উপমায়—বিচ্ছেদে, মিলনে—অলঙ্কারে, খোশামোদে—তিনি উলটপালট খাইয়াছেন। চন্দ্রবদন, চন্দ্ররশ্মি, চন্দ্রকরলেখা, শশী, মাসি ইত্যাদি সাধারণ ভোগ্য সামগ্রী অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন, কখন স্ত্রীলোকের স্কন্ধোপরি ছড়াছড়ি, কখন তাঁহাদিগের নখরে গড়াগড়ি গিয়াছেন, সুধাকর হিমকরকরানিকর, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক কলঙ্ক প্রভৃতি অনুপ্রাসে, বাঙ্গালী বালকের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল সাহিত্য-কুঞ্জে লীলাখেলা করিয়া, কার সাধ্য নিস্তার পায়? বিজ্ঞান-দৈত্য সকল পথ ঘেরিয়া বসিয়া আছে। আজি চন্দ্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়াছাড়ি নাই। আর সাধের সাহিত্য বৃন্দাবনে লীলাখেলা চলে না। কুঞ্জদ্বারে, সাহেব অক্রুর রথ আনাইয়া দাঁড়াইয়া আছে; চল, চন্দ্র বিজ্ঞান-মথুরায় চল; একটা কংস বধ করিতে হইবে।

যখন অভিমন্যু-শোকে ভদ্রার্জুন অত্যন্ত কাতর, তখন তাঁহাদিগকে প্রবোধার্থ কথিত হইয়াছিল যে, অভিমন্যু চন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমরাও যখন নীলগগন সমুদ্রে এই সুবর্ণের দ্বীপ দেখি, আমরাও মনে করি বুঝি এই সুবর্ণময় লোকে সোনার মানুষ সোনার থালে সোনার মাছ ভাজিয়া সোনার ভাত খায়, হীরার সরবত পান করে, এবং অপূর্ব পদার্থের শয্যায় শয়ন স্বপ্নশূন্য নিদ্রায় কাল কাটায়। বিজ্ঞান বলে, তাহা নহে এপোড়া লোকে যেন কেহ যায় না—এ দগ্ধ মরুভূমি মাত্র। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

এক্ষণে এমন দূরবীক্ষণ নির্মিত হইয়াছে যে, তদ্দারা চন্দ্রাদিকে 2400 গুণ বৃহত্তর দেখা যায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে চন্দ্র যদি আমাদিগের নেত্র হইতে পঞ্চাশৎ ক্রোশ মাত্র দূরবর্তী হইত তাহা হইলে আমরা চন্দ্রকে যেমন স্পষ্ট দেখিতাম, এক্ষণেও এসকল দূরবীক্ষণ সাহায্যে সেইরূপ স্পষ্ট দেখিতে পারি।

এরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ চন্দ্রকে কিরূপ দেখা যায়? দেখা যায় যে, তিনি হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেবতা নহেন, জ্যোতির্ময় কোন পদার্থ নহেন, কেবল পাষাণময়, আগ্নেয় গিরি পরিপূর্ণ, জড়পিণ্ড। কোথাও অত্যুন্নত পর্বতমালা—কোথাও গভীর গহ্বররাজি। চন্দ্র যে উজ্জ্বল তাহা সূর্যালোকের কারণে। আমরা পৃথিবীতেও দেখি যে, যাহা রৌদ্রপ্রদীপ্ত তাহাই দূর হইতে উজ্জ্বল দেখায়। চন্দ্র ও রৌদ্র প্রদীপ্ত বলিয়া উজ্জ্বল। কিন্তু যে স্থানে রৌদ্র না লাগে, সে স্থান উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় না। সকলেই জানে যে, চন্দ্রের কলায় কলায় হ্রাস-বৃদ্ধি এই কারণেই ঘটিয়া থাকে। সে তত্ত্ব বুঝাইয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যাইবে, যে স্থান উন্নত, সেই স্থানে রৌদ্র লাগে—সেই স্থান আমরা উজ্জ্বল দেখি - যে স্থানে গহ্বর অথবা পর্বতের ছায়া, সে স্থানে রৌদ্র প্রবেশ করে না - সে স্থলগুলি আমরা কালিমাপূর্ণ দেখি। সেই অনুজ্জ্বল রৌদ্রশূন্য স্থানগুলি 'কলঙ্ক'—অথবা 'মৃগ'—প্রাচীনদিগের মতে সেইগুলিই 'কদমতলায় বুড়ি চরকা কাটিতেছে।'

চন্দ্রের বহির্ভাগের এরূপ সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান হইয়াছে যে, তাহায় চন্দ্রের উৎকৃষ্ট মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে; তাহার পর্বতাবলী ও প্রদেশ সকল নাম প্রাপ্ত হইয়াছে—এবং তাহার উচ্চতা পরিমিত হইয়াছে। বেয়র ও মাল্লর নামক সুপরিচিত জ্যোতির্বিদদ্বয় অন্যূন 1095 চান্দ্র পর্বতের উচ্চতা পরিমিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে মনুষ্যে যে পর্বতের নাম রাখিয়াছেন নিউটন। তাহার উচ্চতা 22,823 ফিট। এতাদৃশ উচ্চ পর্বতশির, পৃথিবীতে আন্দিস ও হিমালয় শ্রেণী ভিন্ন আর কোথাও নাই। চন্দ্র পৃথিবীর পঞ্চাশৎ ভাগের এক ভাগ মাত্র এবং গুরুত্বে একাশী ভাগের এক ভাগ মাত্র; অতএব পৃথিবীর তুলনায়, চান্দ্র পর্বতসকল অত্যন্ত উচ্চ। চন্দ্রের তুলনায় নিউটন যেমন উচ্চ, চিম্বারোজো নামক পার্থিব শিখরের অবয়ব আর পঞ্চাশৎ গুণে বৃদ্ধি পাইলে পৃথিবীর তুলনায় তত উচ্চ হইত।

চান্দ্র পর্বত কেবল যে আশ্চর্য উচ্চ, এমত নহে; চন্দ্রলোকে আগ্নেয় পর্বতের অত্যন্ত আধিক্য। অগণিত আগ্নেয় পর্বতশ্রেণী অগ্ন্যুদগারী বিশাল রন্ধ্রসকল প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছে যেন কোন তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থ কটাহে জ্বালপ্রাপ্ত হইয়া কোন কালে টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া জমিয়া গিয়াছে। এই চন্দ্রমণ্ডল সংস্রধা বিভিন্ন, সহস্র সহস্র বিবরবিশিষ্ট;—কেবল পাষাণ, বিদীর্ণ ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন, দগ্ধ পাষাণময়। হায়! এমন চাঁদের সঙ্গে কে সুন্দরীদিগের মুখের তুলনা করার পদ্ধতি বাহির করিয়াছিল?

এই তো পোড়া চন্দ্রলোক! এক্ষণে জিজ্ঞাসা, এখানে জীবের বসতি আছে কি? আমরা যতদূর জানি, জলবায়ু ভিন্ন জীবের বসতি নাই; যেখানে জল বা বায়ু নাই সেখানে আমাদের জ্ঞান-গোচরে জীব থাকিতে পারে না। যদি চন্দ্রলোকে জলবায়ু থাকে, তবে সেখানে জীব থাকিতে পারে; যদি জলবায়ু না থাকে তবে জীব নাই; একপ্রকার সিদ্ধ করিতে পারি। এক্ষণে দেখা যাউক তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ আছে।

মনে কর, চন্দ্র পৃথিবীর ন্যায় বায়বীয় মণ্ডলে বেষ্টিত। মনে কর, কোন নক্ষত্র, চন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া গতি করিবে। ইহাকে সমাবরণ (occulation) বলা যাইতে পারে। নক্ষত্র চন্দ্র কর্তৃক সমাবৃত হইবার কালে প্রথমে, বায়ুস্তরের পশ্চাদ্বর্তী হইবে; তৎপরে চন্দ্রশরীরের পশ্চাতে লুকাইবে। যখন বায়বীয় স্তরের পশ্চাতে নক্ষত্র যাইবে; তখন নক্ষত্র পূর্বমত উজ্জ্বল বোধ হইবে: কেননা বায়ু আলোকের

কিয়ৎপরিমাণে প্রতিরোধ করিয়া থাকে। নিকটস্থ বস্তু আমরা যত স্পষ্ট দেখি, দূরস্থ বস্তু আমরা তত স্পষ্ট দেখিতে পাই না—তাহার কারণ, মধ্যবর্তী বায়ুস্তর। অতএব সমাবরণীয় নক্ষত্র ক্রমে হ্রস্বতেজা হইয়া পরে চন্দ্রান্তরালে অদৃশ্য হইবে। কিন্তু এরূপ ঘটিয়া থাকে না। সমাবরণীয় নক্ষত্র একেবারেই নিবিয়া যায়—নিবিবার পূর্বে তাহার উজ্জ্বলতা কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। চন্দ্রে বায়ু থাকিলে কখন এরূপ হইত না।

চন্দ্রে যে জল নাই, তাহারও প্রমাণ আছে, কিন্তু সে প্রমাণ অতি দুরূহ—সাধারণ পাঠককে অল্পে বুঝানো যাইবে না। এবং এই সকল প্রমাণ বর্ণ-রেখা-পরীক্ষক (Spectroscope) যন্ত্রের বিচিত্র পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে; চন্দ্রলোকে জলও নাই—বায়ুও নাই, যদি জলবায়ু না থাকে তবে পৃথিবীবাসী জীবের ন্যায় কোন জীব তথায় নাই।

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা উপসংহার করিব। চান্দ্রিক উত্তাপও এক্ষণে পরিমিত হইয়াছে। চন্দ্র এক পক্ষকালে আপন মেরুদণ্ডের উপর সম্বর্তন করে, অতএব আমাদের এক পক্ষকালে এক চান্দ্রিক দিবস। এক্ষণে স্মরণ করিয়া দেখ যে, পৌষ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে আমরা এত তাপাধিক্য ভোগ করি তাহার কারণ—পৌষ মাসে দিন ছোট, জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন তিন চারি ঘণ্টা বড়। যদি দিনমান তিন-চারি ঘণ্টা মাত্র বড় হইলেই, এত তাপাধিক্য হয়, তবে পাক্ষিক চান্দ্র দিবসে না জানি, চন্দ্র কি ভয়ানক উত্তপ্ত হয়। তাহাতে আবার পৃথিবীতে জলবায়ু মেঘ ইত্যাদি পার্থিক সন্তাপ বিশেষ প্রকারে সমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু জলবায়ু মেঘ ইত্যাদি চন্দ্রে কিছুই নাই। তাহার উপর আবার চন্দ্র পাষাণময়। অতি সহজে উত্তপ্ত হয়। অতএব চন্দ্রলোক অত্যন্ত তপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। বিখ্যাত দূরবীক্ষণ নির্মাণকারীর পুত্র লর্ড রস চন্দ্রের তাপ পরিমিত করিয়াছেন। তাহার অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, চন্দ্রের কোন কোন অংশ এত উষ্ণ, তত্তুলনায় যে জল অগ্নিসংস্পর্শে ফুটিতেছে, তাহাও শীতল। সে সন্তাপে কোন পার্থিব জীব রক্ষা পাইতে পারে না—মুহূর্ত জন্যও রক্ষা পাইতে পারে না। এই কি শীতরশ্মি, হিমকর, সুধাংশু? হায়! হায়! অন্ধ পুত্রকে পদ্মলোচন আর কেমন করিয়া বলিতে হয়।*

অতএব স্বপের চন্দ্রলোক কি প্রকার তাহা এক্ষণে আমরা এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছি।† চন্দ্রলোক পাষাণময়, বিদীর্ণ ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন, বন্ধুর দগ্ধ, পাষাণময়! জলশূন্য, সাগরশূন্য, নদীশূন্য, বায়ুশূন্য, বৃষ্টিশূন্য, জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন, উত্তপ্ত, জলন্ত, নরককুণ্ডতুল্য এই ভদ্রলোক! এই জন্য বিজ্ঞানকে কাব্য আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কাব্য গড়ে—বিজ্ঞান ভাঙ্গে।

---

*যদি কেহ বলেন যে, চন্দ্র স্বয়ং উত্তপ্ত হউন, আমরা তাহার আলোকের শৈত্য স্পর্শের প্রত্যক্ষ দ্বারা জানিয়া থাকি। বাস্তবিক একথা সত্য নহে—আমরা স্পর্শ দ্বারা চন্দ্রলোকের শৈত্য বা উষ্ণতা কিছুই অনুভূত করি না। অন্ধকার রাত্রের অপেক্ষা জ্যোৎস্না রাত্রি শীতল এ কথা যদি কেহ মনে করেন, তবে সে তাঁহার মনের বিকার মাত্র। বরং চন্দ্রালোকে কিঞ্চিৎ সন্তাপ আছে; সেটুকু এত অল্প যে, তাহা আমাদিগের স্পর্শের অনুভবনীয় নহে। কিন্তু জান্তেদেশী, মেলনি, পিয়াজি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষার দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন।

†কেন না, বায়ু নাই।

বিজ্ঞানীর জীবনী

পরমাণু-বিজ্ঞানী অটো হান

রতনমোহন খাঁ

1944 সাল। রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান। দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা অটো হানের এই সম্মানকে স্বাগত জানালেন। আচার্য বসুর 1952 সালে জার্মান থেকে আনা একটি ছবিতে দেখা যায়—বিজয়মাল্যে ভূষিত হানকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন মাক্স্ প্লাঙ্ক। কিন্তু কে জানত এই বিজয়মালা মণিহার না হয়ে কাঁটার হারের মত পীড়িত করবে সারা জীবন। এল 1945। সারা বিশ্বের মানুষ ভয়ে আতঙ্কে হতবাক হলো হিরোসিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে। পরমাণু বিভাজনের একি নিদারুণ পরিণতি! বিভাজন পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে ওপেনহাইমারের নেতৃত্বে আমেরিকা যে মারণাস্ত্র বানাল, তার প্রথম বলি জাপানের ঐ দুই শহরের হাজার হাজার অসহায় শিশু ও নরনারী। যারা বেঁচে রইল তারা বংশানুক্রমে হলো তেজস্ক্রিয়ার শিকার। অটো হান তাঁর কাজের এই অপব্যবহারের জন্যে নিজেকে অপরাধী ও দায়ী মনে করলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—এ দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করবেন সারা জীবন ধরে পরমাণু-বিভাজনকে মানব কল্যাণে কাজে লাগিয়ে এবং পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ব-জনমত গঠন করে।

1879 সালে 8ই মার্চ জার্মানের ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে এক বিত্তশালী ব্যবসায়ীর ঘরে অটো হানের জন্ম হয়। ইনি ছাত্রজীবনে বিশেষ করে স্কুলজীবনে মোটেই লেখাপড়ায় ভাল ছাত্র ছিলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল স্থপতি হবার, কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়াশুনায় ও পেশায় তথাকথিত স্থপতি না হয়ে হলেন রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যার এক অতুলনীয় স্থপতি এবং এই দুই শাস্ত্রে তাঁর সৃষ্ট স্থাপত্য বিজ্ঞানে সূচনা করল এক নবযুগের। হঠাৎ খেয়ালবশতঃ স্কুলজীবনের শেষ দিকে তিনি রসায়নে আকৃষ্ট হন। এরপর মারবুর্গ ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নে পড়াশুনা করে 1901 সালে মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। আরো দু-বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে কাজ করার পর 1904 সালে তিনি লণ্ডনে আসেন উইলিয়ম র‍্যাম্‌জের কাছে। ইংলণ্ডে আসার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভাষা শিক্ষা। কিন্তু র‍্যাম্‌জের গবেষণাগারেই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্দেশিত হলো। থোরিয়ানাইট আকরিক থেকে বিশুদ্ধ রেডিয়ামের যৌগিক বের করতে যেয়ে হান পেয়ে গেলেন রেডিও-থোরিয়াম। আবিষ্কৃত হলো একটি নূতন মৌলের। রেডিও-রসায়নের উপর আরও জ্ঞানলাভের জন্যে তিনি কানাডায় আসেন 1905 সালে α-β-γ রশ্মির প্রবক্তা আরনেষ্ট রাদার-ফোর্ডের কাছে। 1906 সালে ফিরে আসেন স্বদেশে এবং যোগ দেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষকতা ও গবেষণায় ডুবে গেলেন এই জ্ঞানতপস্বী। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের কয় বছর (1914-1918) দ্বিতীয় উইলিয়ম কাইজারের উচ্চাশা পূরণে হানসহ বহু বিজ্ঞানী বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে সমরসজ্জায় সাহায্য করতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানে হিটলারের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। বিজ্ঞানীদের কাছে আসে গবেষণার সুযোগ। 1928 সালে হান কাইজার ইনষ্টিটিউটের অধিকর্তা হন এবং 1946-1960 পর্যন্ত ঐ সংস্থার সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। কাইজার উইলিয়ম ইনষ্টিটিউটের বর্তমান নাম মাক্স্ প্লাঙ্ক ইনষ্টিটিউট।

এই গবেষণা কেন্দ্রেই 1938 সালে পরমাণু-বিজ্ঞানে নবযুগের সূত্রপাত হয়। হান ও তাঁর দুই সহযোগী স্ট্রাস্‌ম্যান ও মাইট্‌নার এই গবেষণা কেন্দ্রে দীর্ঘ চার বছর পরমাণু বিভাজনের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যখন প্রায় সাফল্যের ঘরে পৌঁছেছেন, তখন নাৎসীদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মাইট্‌নারকে জার্মান ছেড়ে চলে আসতে হয় কোপেনহেগেনে নীলস্ বোরের গবেষণাগারে। নিজেদের হাতে তৈরী সামান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে হান ও স্ট্রাস্‌ম্যান নিউট্রন ও ইউরেনিয়ামের সংঘাত ঘটিয়ে পেয়ে গেলেন বেরিয়াম। অবিশ্বাস্য ঘটনা। ডাল্টনীয় ধারণা কি পাল্টে গেল? বার বার পরীক্ষা করে দুই বিজ্ঞানী নিঃসন্দেহ হলেন যে সত্যই ইউরেনিয়াম ভেঙ্গে দু-টুকরো হয়ে যাচ্ছে। বিভাজনের ফলে পাওয়া যাচ্ছে যে শক্তি তা মোটেই তুচ্ছ নয়। এই শক্তিই পারমাণবিক শক্তি। Naturwissenschaften পত্রিকায় 22শে ডিসেম্বর, 1938 এই কাজের সারাংশ বের হল, আর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল মাইট্‌নার ও রোবার্ট ফ্রিসের গবেষণাপত্রে। ঠিক এর পরেই হান ও ষ্ট্রাসম্যান তাঁদের গবেষণালব্ধ চক্রপদ্ধতি এবং নিউট্রন ও ইউরেনিয়ামের সংঘাতে বেরিয়াম ও ক্রিপ্টন উৎপন্ন হওয়ায় বিষয়টি প্রকাশ করেন।

পরমাণু-বিজ্ঞানী অটো হান

দ্রুতগামী নিউট্রনের সংঘাতে থোরিয়াম বিভাজনে সমর্থ হলেন এই দুই বিজ্ঞানী এবং ইউরেনিয়াম

বিভাজনে অতিরিক্ত নিউট্রন পাওয়ার সম্ভাবনার কথাও প্রকাশ করলেন। এই অনুমান যথার্থ বলে প্রমাণিত হলো জোলিও কুরি ও তাঁর সহযোগীদের কাজে। 1942 সালে এনরিকো ফের্মি এই তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করলেন পরমাণু স্তূপ। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিহিত শক্তির ঘটল বন্ধন মুক্তি, তৈরি হলো পরমাণু-বোমা। হিসাব করে দেখা গেছে এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম বিভাজনে প্রায় 10^7 কিলোওয়াট ঘণ্টা সমান তাপশক্তি পাওয়া যায়। এই বিরাট শক্তি উৎপাদনে প্রয়োজন হয় 3×10^6 পাউণ্ড কয়লার দহন। এই বিপুল শক্তিই হিরোসিমা ও নাগাসিকায় কলঙ্কিত করেছে মানব-ইতিহাস। হিটলারের রুদ্ররোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে হান চুক্তিপত্রে সই করতে বাধ্য হন। এই পত্রে ছিল—হানের গবেষণালব্ধ ফল জার্মানের সামরিক কাজে ব্যবহৃত হবে। হিটলারের পতনের পরই হান তাঁর সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে পরমাণু বিজ্ঞানকে মানব-কল্যাণে কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর হন। 1957 সালের এপ্রিলে হান ও আরো 17 জন জার্মান বিজ্ঞানী এক যুক্ত ইস্তাহারে সমস্ত রাষ্ট্রের নিকট পরমাণু অস্ত্রের নির্মাণ ও পরীক্ষা বন্ধের আবেদন করেন। পরমাণু বিভাজন হানের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ হলেও তাঁর জীবনে কাজের তালিকা যেমন দীর্ঘ তেমনি বৈচিত্র্যে ভরা। 1917 সালে মাইট্নারের সঙ্গে একত্রে তিনি প্রোটাক্টিনিয়াম মৌলের এবং পরে নিউক্লিয়ার আইসোটোপের আবিষ্কার করেন। তাঁর রচিত পুস্তকগুলি বিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদ।

অটো হানের মৃত্যু হয় 1968 সালের 28শে জুলাই। মৃত্যুর দু-বছর আগে হান যে স্বপ্ন দেখতেন তা হলো—হাইড্রোজেন পরমাণুর সংযোজন (fusion) ঘটিয়ে হিলিয়াম উৎপন্ন করা। এর ফলে ভবিষ্যতে ইউরেনিয়াম (235) ছাড়াই কৃত্রিম মৌল উৎপাদন সম্ভব হবে। ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম জ্বালানীর নিউক্লিয়াস চুল্লীর জায়গায় সংযোজন চুল্লী স্থান পাবে। এই সংযোজন চুল্লী থেকে পাওয়া তাপশক্তি থেকে সহজেই বিদ্যুতের চাহিদা মিটানো সম্ভব হবে। পারমাণবিক শক্তির দৌলতে সাগরের নোনা জল বিজ্ঞানের আশীর্বাদ বলে গণ্য হবে। কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের নিঃশেষিত হবার ভয় থেকে মানুষ মুক্তি পাবে, কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রসায়ন, পদার্থ ও জীববিদ্যায় মানব-কল্যাণে ব্যবহৃত হবে এবং ইউরেনিয়াম ও তার ভয়াবহ পরিণতি থেকে অব্যাহতি মিলবে।

এই মহান পরমাণু-বিজ্ঞানীর স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে ফেডারেল রিপাবলিক জার্মানী বিশ্বের প্রথম নিউক্লিয়ার শক্তিচালিত বাণিজ্য জাহাজের নামকরণ করে 'অটো হান'। যতই দিন যাচ্ছে, মানব জাতির অস্তিত্বের কথা ও কল্যাণের কথা চিন্তা করে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের দিকে বিশ্বজনমত সোচ্চার হচ্ছে। 1979 সালের 8ই মার্চ এই মানব প্রেমিক বিজ্ঞানীর জন্মশতবার্ষিকী। শতবর্ষ আগে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করেছিল, সারা বিশ্বের সঙ্গে আমরাও তাঁকে স্মরণ করি এবং তাঁর স্বপ্নকে রূপ দেবার শপথ গ্রহণ করি।

দূরবীন আবিষ্কার

অরুণকুমার ঘোষ*

"প্রায় দশ মাস আগে শুনতে পেলাম ফ্লেমিং নামে এক ভদ্রলোক এমন একটা গোয়েন্দাগিরি করার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যা দিয়ে দেখলে খালিচোখে দূরের যে সমস্ত জিনিস দেখা যায় না, তা বেশ পরিষ্কার দেখা যায়—মনে হয় জিনিসগুলি যেন কাছেই রয়েছে। এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কেউ কেউ বলল, সত্যি খবর; অন্যরা বলল, বাজে কথা। অল্পদিনের মধ্যে পারীর এক সম্রান্ত ভদ্রলোক, জ্যাকুইস বাদোভারের চিঠি থেকে জানলাম খবরটা সত্যি। এরপরই ঐরকম একটা যন্ত্র তৈরি করতে আমি উঠে পড়ে লেগে গেলাম। অবশেষে প্রতিসরণের তত্ত্ব ব্যবহার করে আমি একটা যন্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হলাম।

(গ্যালিলিও, Sidereus nuncius. 1610 খ্রী)

পরে 1623 সালে প্রকাশিত Il Saggiatore গ্রন্থেও গ্যালিলিও একই কথা লিখেছেন, তিনি দূরবীনের আবিষ্কারক নন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও কিভাবে যেন গ্যালিলিওই দূরবীনের আবিষ্কর্তা এই ধরণের একটা কথা পরবর্তীকালে প্রচারিত হয়ে যায়।

দূরবীন তাহলে কে আবিষ্কার করেছিলেন? কবে? গ্যালিলিও-উক্ত এই 'ফ্লেমিং নামে এক ভদ্রলোক'টি কে? তাঁর বাড়ি কোথায়? দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে অবশ্য এমন একটি বাক্যাংশ আছে "...সেই হল্যাণ্ড দেশীয় ভদ্রলোক যিনি দূরবীন আবিষ্কার করেছিলেন...।" বোঝা গেল, গ্যালিলিওর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে ফ্লেমিং নামে এক হল্যাণ্ড দেশীয় ভদ্রলোক দূরবীন আবিষ্কার করেছিলেন।

কিন্তু হল্যাণ্ড একটা বেশ বড়সড় জায়গা। সেখানে শয়ে শয়ে ফ্লেমিং থাকতে পারে। কোন্ ফ্লেমিং দূরবীন আবিষ্কার করেছিলেন? মজার ব্যাপার হলো, দূরবীন চালু হবার কমবেশী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে-সব বই, চিঠি বা নথিপত্তর পাওয়া গেছে তা থেকে দূরবীন আবিষ্কারের দাবিদার হিসেবে যে তিনজনের নাম বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় তাঁদের নামের কোনও অংশে 'ফ্লেমিং' শব্দটাই নেই। এই তিনজন হলেন, নেদারল্যাণ্ডের মিডলবার্গ শহরের জ্যাকারিয়াস যানসেন (Sacharias Janssen) এবং হানস লিপারহী (Hans Lipperhey) আর আল্‌কমার শহরের জেকব মেটিয়াস (Jacob Metius)।

ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের অন্যতম চিকিৎসক ছিলেন পীয়ের বোরেল। দূরবীন আবিষ্কার সম্পর্কে 1656 সালে বোরেল একখানা বই লেখেন। এই বইয়ের মারফত জ্যাকারিয়াস যানসেনের নাম দূরবীন আবিষ্কারক হিসেবে প্রথম চালু হয়। বোরেল বইখানা লেখার আগে আবিষ্কারকের নাম সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য রাজা চতুর্দশ লুইয়ের দরবারে ডাচ রাজদূত বোরীলের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বোরীল মিডলবার্গের লোক। সুতরাং তিনি সরাসরি মিডলবার্গ শহরের কৌন্সিলের কাছে এই মর্মে একখানা চিঠি লিখলেন যে, দূরবীনের প্রকৃত আবিষ্কর্তা কে

*নেহেরু বিজ্ঞান কেন্দ্র, ওরলি, বোম্বে 400 018

তাঁকে জানানো হোক। চিঠিতে তিনি আরও লিখলেন, মনে আছে তাঁর বাল্যকালে মিডলবার্গ শহরের ক্যাপোয়েন ষ্ট্রীটে চার্চের ধারে যে তরিতরকারীর বাজার আছে সেখানে এক চশমাওয়ালার দোকান ছিল। লোকটার অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিল না, অনেকগুলি ছেলেপিলেও ছিল। কিন্তু সে দূরবীনের মত একটা জিনিস তৈরি করত বটে। বোরীলের চিঠি পেয়ে কৌন্সিলররা এই ব্যাপারে তত্ত্বতালাশ সুরু করলেন। মিডলবার্গে যে দু-জন এই ধরণের জিনিস তৈরি করতেন তাঁরা দু-জনেই তখন পরলোকগত। কিন্তু তাদের একজনের ছেলে, যোহানেস জ্যাকারিয়াসেন, এক লিখিত বিবৃতিতে জানালেন,

"1590 সালে জীল্যাণ্ডের (নেদারল্যাণ্ডের এক প্রদেশ) মিডলবার্গ শহরে জ্যাকারিয়াস যানসেন প্রথম দূরবীন তৈরি করেন। প্রথম দিকে তিনি 15-16 ইঞ্চি লম্বা দূরবীন তৈরি করতেন। প্রিন্স মরিস এবং আর্চডিউক অ্যালবার্টকে তিনি দুটো যন্ত্র উপহারও দিয়েছিলেন। 1618 সাল পর্যন্ত তিনি 15-16 ইঞ্চি লম্বা দূরবীনই বানাতেন। তারপর আমি এবং আমার বাবা এর থেকে লম্বা দূরবীন তৈরি করতে সক্ষম হই। এ সব যন্ত্র দিয়ে আমরা রাত্রে তারা, চাঁদ এসব দেখতাম। 1620 সালে মেটিয়াস আমাদের একখানা যন্ত্র পেয়ে তার থেকে কপি করে নিজে একটা তৈরি করেন; কর্ণেলিস ড্রেবেলও তাই করেন। যখন এইসব যন্ত্র তৈরি করতাম তখন আমরা গির্জার ধারে, যেখানে এখন সবজি-বাজার, সেইখানে থাকতাম। রেনে দেকার্তে, কর্নেলিস ড্রেবেল এবং যোহানেস লুফ এখন বেঁচে থাকলে সাক্ষ্য দিতে পারতেন যে আমিই প্রথম লম্বা দূরবীন তৈরি করি।"

যোহানেসের পিসি, সারা গোয়েডার্টেরও সাক্ষ্য নেওয়া হয়। তিনি বলেন, তাঁর মৃত ভাই জ্যাকারিয়াস এইসব যন্ত্র তৈরি করতেন এবং সেগুলি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতেন।

কিন্তু মিডলবার্গের কৌন্সিল, আরও তিনজনকে জেরা করে অন্য একজনের নামও জানতে পারলেন। এই তিনজন হলেন, মিডলবার্গের এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের পোর্টার 70 বছরের বৃদ্ধ জেকব উইলেমসেন, এণ্টওয়ার্প শহরগামী ডাকহরকরা 60 বছরের বৃদ্ধ ইয়ুড কিয়েন এবং শহরের নামকরা কামার 77 বছরের বৃদ্ধ এব্রাহাম ডি ষং। এঁরা তিনজনেই একবাক্যে হানস লিপারহীর পক্ষে রায় দিলেন। হানসও ক্যাপোয়েন ষ্ট্রীটে গির্জার ধারে থাকতেন। তাঁরও চশমার দোকান ছিল। অবশ্য হানস মিডলবার্গের আদি বাসিন্দা নন, ওয়েসেল শহর থেকে এই শহরে এসে বাসা বেঁধেছিলেন।

এইখানেই বাধল গণ্ডগোল। হানস মিডলবার্গের আদি বাসিন্দা নন। দ্বিতীয়তঃ, দেখা গেল জ্যাকারিয়াস হয়ত বাল্যকালে বোরীলের খেলার সাথী ছিলেন। সুতরাং বোরীল জানালেন, জ্যাকারিয়াস যানসেনই দূরবীনের আবিষ্কর্তা।

এদিকে 1637 সালে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ রেনে দেকার্তে তাঁর Dioptrigue নামক গ্রন্থে লিখেছেন, জেকব মেটিয়াসই দূরবীনের আবিষ্কারক। ব্যাপারটা কিরকম খিচুড়ি পাকাচ্ছে দেখুন

1682 খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত তরঙ্গতত্ত্ববিদ খ্রীষ্টিয়ান হাইগেন্স আর একখানা বমশেল ছাড়লেন। তিনি জেকব মেটিয়াসের দাখিল করা 15 অক্টোবর, 1608 তারিখ সম্বলিত একখানা পেটেণ্ট দরখাস্ত পেশ করলেন যাতে মেটিয়াস লিখছেন, 'অবশ্য এর আগেই মিডলবার্গ শহরের এক ভদ্রলোক এরকম একখানা যন্ত্র পেটেণ্টের জন্য স্টেটস জেনারেলকে দেখিয়েছেন।' হাইগেন্স মেটিয়াসকে দূরবীনের আবিষ্কারক হিসেবে কখনও মানতে রাজি হন নি। তাঁর মতে এটা যানসেন অথবা লিপারহীর কৃতিত্ব।

অনেক পরে 1816 খ্রীষ্টাব্দে মিডলবার্গ শহরের যে বাড়িতে জ্যাকারিয়াস যানসেন থাকতেন, সেখানে একটা স্মৃতিফলক বসাবার প্রস্তাব হয়। স্মৃতিফলকে লিখিতব্য সাল তারিখ ইত্যাদি প্রামাণ্য করার জন্য দি হেগ শহরে স্টেটস জেনারেলের মহাফেজখানার

নথিপত্র ঘাঁটা হল। কিন্তু, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ল। দেখা গেল 1608 সালের 2 অক্টোবর থেকে 1609 সালের 13 ফেব্রুয়ারির মধ্যে দূরবীনের পেটেন্ট চেয়ে হানস লিপারহীসহ বেশ কয়েকজনের দরখাস্ত আছে—কিন্তু জ্যাকারিয়াস যানসেনের দরখাস্ত? নেই নেই। মিডলবার্গপ্রেমীরা তখন ভাবলেন, লিপারহীর বাড়িতেই না হয় স্মৃতিফলক বসাবেন। কিন্তু, লিপারহীর দরখাস্ত থেকে দেখা গেল তিনি মিডলবার্গের আদি বাসিন্দা নন, তাঁর দেশ ওয়েস্টফেলিয়া প্রদেশের ওয়েসেল শহর। ফলে উৎসাহে ভাটা পড়ল। স্মৃতিফলক বসানো আর হলো না।

কর্ণেলিস ডি-ওয়ার্ড দূরবীন আবিষ্কার নিয়ে পরবর্তীকালে বিস্তর গবেষণা করেছেন। তিনি এ বিষয়ে প্রচুর তথ্যসহ একখানা বইও লিখেছেন। তার থেকে জানা যায়, জ্যাকারিয়াস যানসেনও মিডলবার্গের আদি বাসিন্দা নন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি দি হেগ শহরে। ভবঘুরে প্রকৃতির এই লোকটির চরিত্রও খুব সুবিধের ছিল না। টাকা ধার নিয়ে ফেরৎ না দেবার মজ্জাগত বদ্‌রোগ ছিল। একে ওকে মারধোর করার অভ্যাস ছিল, এমনকি মুদ্রা জাল করার অভিযোগও ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। দু-বার মুদ্রা জাল করার জন্য তাঁর বিচার হয়। প্রথমবারে অর্থদণ্ড দিয়ে খালাস। দ্বিতীয়বারে হয়তো তাঁর প্রাণদণ্ডই হতো—কিন্তু তিনি পালিয়ে বেঁচেছিলেন।

ডি-ওয়ার্ড-এর আর এক আবিষ্কার গণিতজ্ঞ দে-কার্তের বন্ধু আইজাক বীকম্যানের লেখা এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। বীকম্যানের ধান্দা ছিল নিজে ভাল দূরবীন তৈরি করা। তদুদ্দেশ্যে 1630 সালে তিনি মিডলবার্গে জ্যাকারিয়াস যানসেনের ছেলে যোহানেস জ্যাকারিয়াসেনের কাছে তালিম নিতে যান। বীকম্যান লিখছেন, যোহানেস তাঁকে বলেছেন তাঁর বাবা জ্যাকারিয়াস 1604 সালে নেদারল্যাণ্ডে প্রথম দূরবীন তৈরি করেন। কোন ইতালীয়ের দূরবীনের অনুকরণে তাঁর বাবা এই যন্ত্রটা তৈরি করেন। ইতালীয়ের দূরবীনে খোদাই করা ছিল সেটা 1590 সালে তৈরি।

এর আগে আমরা দেখেছি যোহানেস মিডলবার্গের কৌন্সিলরদের লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন, 1590 সালে তাঁর বাবা প্রথম দূরবীন যন্ত্র তৈরি করেন। সেই বিবৃতি অবশ্য উপরের ঘটনার 25 বছর পরে দেওয়া এবং কৃতিত্ব আত্মসাৎ করার জন্যে মিথ্যা বিবরণে ভর্তি। যোহানেসের বাবা জ্যাকারিয়াসের পক্ষে 1590 সালে দূরবীন তৈরি অসম্ভব ব্যাপার। জ্যাকারিয়াসের প্রথম বিয়ে হয় 1610 সালে। বিয়ের সময় তার 20 বছরের কাছাকাছি বয়স হলে, 1590 সালে তাঁর হয়তো জন্ম হয়েছিল। বড় জোর হয়তো তখন তাঁর দুই-তিন বছর বয়েস। দ্বিতীয়তঃ, মিডলবার্গের গির্জার ব্যাপ্টাইজেশন রেকর্ড থেকে দেখা যায় জ্যাকারিয়াসের ছেলে জোহানেসের জন্ম হয় 1611 সালে। সুতরাং তাঁর বিবৃতিমত 1618 সালে 7 বছর বয়েসে বাবাকে মদত দিয়ে তাঁর পক্ষে লম্বা দূরবীন তৈরি করা অসম্ভব ব্যাপার মনে হয়। কিন্তু তিনি 1590 সালকেই দূরবীনের আবিষ্কার সাল হিসেবে লিখতে গেলেন কেন? লক্ষণীয় যে, বীকম্যানকেও তিনি বলেছিলেন, ইতালীয় ভদ্রলোকের দূরবীনে খোদাই করা ছিল সেটা 1590 সালে তৈরি।

আমরা এবার দেখি, ইতালি সেই সময় এ-ব্যাপারে কতখানি প্রাগ্রসর ছিল। 1538 খ্রীষ্টাব্দে জিরোলামো ফ্রাকাসটোরো নামে একজন ইতালীয় লিখছেন,—

"চশমার দুটো লেন্স একটার উপর আরেকটা ধরে দেখলে সবকিছুই বেশ বড় বড় দেখায় এবং দূরের জিনিস নিকটতর মনে হয়।"

গিয়োভানব্যাপতিস্তা দেল্লা পোর্তা, আর একজন নামকরা ইতালীয়, 1589 খ্রীষ্টাব্দে লিখছেন,

"অবতল লেন্সের সাহায্যে দূরের জিনিস খুব স্পষ্ট কিন্তু ছোট দেখায়; উত্তল লেন্সের সাহায্যে কাছের জিনিস খুব বড় দেখায়, যদিও সবসময় ততটা পরিষ্কার নয়। এই দুই ধরণের লেন্স একসঙ্গে

ব্যবহার করতে জানলে আপনি কাছের এবং দূরের জিনিস পরিষ্কার বড় আকারে দেখতে পারেন।"

এই উদ্ধৃতি থেকে অবশ্য মনে হতে পারে বোধ হয় পোর্তা দূরবীনের নির্মাণ-কৌশল জানতেন। এমনকি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ কেপ্লারও তাই মনে করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকরা এই বাক্যগুলির আগে পিছে পোর্তা যা লিখছেন তন্ন তন্ন করে পড়ে, নানা বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, পোর্তা দূরবীন কি বস্তু জানতেন না। জানলে নিশ্চয়ই সবিস্তারে তার সম্বন্ধে লিখতেন। যিনি সাধারণ উত্তল, অবতল দর্পণ এবং লেন্স বিষয়ে এত পাতার পর পাতা সরস বর্ণনা করেছেন, নানা চমৎকার ব্যবহারের কথা লিখেছেন, তিনি দূরবীন সম্পর্কে জানলে কি আর ছেড়ে কথা কইতেন?

কিন্তু ঐতিহাসিকরা এবিষয়েও একমত যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে ইতালীয়রা কাচ তৈরিতে খুব পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁরা ইউরোপের নানা জায়গায় নানারকম লেন্স সরবরাহ করতেন।

1609 সালে অগাস্টমাসে, যখন দূরবীনের ব্যাপার চতুর্দিকে রাষ্ট্র হলো, তখন পোর্তা বন্ধুকে লিখলেন,

"চশমা (occhiali; 1611 সালের আগে দূরবীন telescopium, শব্দ চালু হয় নি) আমি দেখেছি; পুরো ধাপ্পাবাজি। আমার De refractione বইয়ের নবম খণ্ড থেকে নেওয়া।"

পণ্ডিতেরা পোর্তার ঐ বইয়ের নবম খণ্ড ঘেঁটে দূরবীন বা তার লেন্সসজ্জা সম্পর্কে কিছুই পান নি। লক্ষণীয়, পোর্তা দূরবীনকে 'ধাপ্পাবাজি' বলছেন। যদি এটা তাঁর নিজের আবিষ্কার হতো, অন্যে চুরি করলেও, আবিষ্কারটাকে তিনি 'ধাপ্পাবাজি' বিশেষণে ভূষিত করতেন কি? মনে হয়, দূরবীন জিনিসটাকে তিনি একদম গুরুত্ব দিতে চান নি; দূরবীনের তৎকালীন কম বিবর্ধন ক্ষমতা হয়তো এর কারণ ছিল। শুধু পোর্তা নন। 1610 সালের এপ্রিলে যখন গ্যালিলিওর Sidereus nuncius প্রকাশিত হলো, ইতালির ফ্লোরেন্স শহরের রাফায়েল গুয়াল্তেরত্তি তাঁকে লিখলেন,

'12 বছর আগে, তারা দেখার জন্য নয়, অশ্বারোহী সৈন্যদের দূরদর্শনের সুবিধার জন্য আমি একখানা যন্ত্র বানিয়েছিলাম। সেটা পবিত্র গ্র্যাণ্ড ডিউক ফার্দিনান্দ এবং অনুকরণীয় লর্ড ডিউক ডন ভার্জিনো অর্সিনোকে দেখিয়েওছিলাম। কিন্তু জিনিসটা আমার কাছে উচ্চাঙ্গের কিছু মনে হয় নি, সুতরাং ও-ব্যাপারে আর চর্চা করি নি।"

পোর্তার মত গুয়ালতেরত্তিরও দূরবীনের বিবর্ধন ক্ষমতা হয়তো খুব কম ছিল। হয়তো সেটা গ্র্যাণ্ড ডিউক বা লর্ড ডিউককে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে কিছুমাত্র উৎসাহিত করে নি। করলে, গুয়ালতেরত্তির চর্চা নিশ্চয়ই বন্ধ হতো না। কিন্তু, সে যাই হোক, এইসব চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায়, সেই সময় ইউরোপে নানা জায়গায় দূরবীন-জাতীয় একটা যন্ত্র তৈরির চেষ্টা চলছিল।

দি হেগ থেকে 1761 সালে পীয়ের দ্য লাভোয়া নামক এক ফরাসী ভদ্রলোকের এক ডায়েরী প্রকাশিত হয়। তার 1609 সালের 30 এপ্রিলের বিবরণ

"30 এপ্রিল বৃহস্পতিবার Pont Marchand দিয়ে যেতে যেতে এক চশমার দোকানে আসতে হলো। সেখানে দোকানী অনেক লোককে সম্প্রতি আবিষ্কৃত এক নতুন ধরনের চশমা দেখাচ্ছিল। চশমাগুলি 1 ফুট মত লম্বা এবং সামনে পিছনে দুটো লেন্স (লেন্সগুলি একই ধরনের নয়)। এই চশমা দিয়ে দেখলে দূরের জিনিস—যা খালি চোখে ধোঁয়াটে দেখায়—বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। এক চোখ বুজে অন্য চোখে এই চশমা লাগিয়ে দেখলে প্রায় আধমাইল দূরের জিনিস বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। শুনলাম জীল্যাণ্ডের মিডলবার্গ শহরের এক ভদ্রলোক এর আবিষ্কারক। গত বছর প্রিন্স মরিসকে তিনি নাকি এই ধরণের দু-খানা চশমা দিয়েছেন যা দিয়ে 3/4 মাইল দূরের জিনিস বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

এই প্রিন্স সংযুক্ত প্রদেশের স্টেটস জেনারেলের কাছে সেগুলি পাঠান। তিনি আবিষ্কারককে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই শর্তে তিন-শ' গিল্ডার দেন যে তিনি কাউকে এই যন্ত্র তৈরির পদ্ধতি জানাবেন না।"

স্টেটস জেনারেলের মিনিটসের (2 অক্টোবর, 1608) অংশবিশেষ,

"মিডলবার্গের বাসিন্দা, ওয়েসেলে জন্ম, হানস লিপারহী, চশমা প্রস্তুতকারক, দূরদর্শনের জন্য একটা যন্ত্র প্রস্তুত করেন এবং স্টেটসের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের তা প্রদর্শন করেন। তাঁর অনুরোধ, যেহেতু যন্ত্রের প্রস্তুতপ্রণালী সাধারণের গোচর না হওয়াই মঙ্গলকর, তাঁকে তিরিশ বছরের জন্য এই পেটেন্ট দেওয়া হোক যে অন্য কেউ যেন এই ধরণের যন্ত্র না তৈরি করেন…"।

স্টেটস জেনারেলের হিসেবের খাতা থেকে দেখা যায়, 1608 সালের 5 অক্টোবর লিপারহীকে 300 পাউণ্ড দেওয়া হয়েছে দূরবীন তৈরির জন্য।

এই খবর পেয়ে 14 অক্টোবর মিডলবার্গ শহরের কৌন্সিলররা স্টেটস জেনারেলকে জানাচ্ছেন, লিপারহীকে সম্মানদক্ষিণা দেওয়া হয়েছে ভাল কথা। কিন্তু আরও একজন যুবক বলছেন, তিনিও ঐরকম একটা যন্ত্র তৈরি করেছেন। সুতরাং ব্যাপারটা আর গোপন থাকছে কোথায় ?

15 অক্টোবর, 1608 আল্‌কমার শহরের জেকব মেটিয়াস দূরবীনের পেটেন্ট চেয়ে স্টেটস জেনারেলের অফিসে দরখাস্ত করেছেন। 17 অক্টোবর স্টেটস জেনারেল তাঁকে যন্ত্রের উন্নতিসাধন করার জন্যে এক-শ' পাউণ্ড দিচ্ছেন।

খাতায়কলমে অন্ততঃ হানস লিপারহীর দূরবীন আবিষ্কারক হিসেবে দাবি অগ্রগণ্য

মনে রাখতে হবে, তখন স্পেনের সঙ্গে নেদারল্যাণ্ডের উত্তরের সাতটা প্রদেশের যুদ্ধ চলছিল। স্পেনীয় সৈন্যবাহিনীতে প্রচুর ইতালীয় সৈন্য ছিল। জীল্যাণ্ডের মিডলবার্গ ছিল এই সৈন্যবাহিনীর অবতরণের প্রথম জায়গা। এমনও হতে পারে, গুয়ালতেরেত্তির বা অন্য কারো তৈরি একটা কম ক্ষমতার দূরবীন কোনও ইতালীয় সৈন্য মিডলবার্গে এনেছিলেন। তাই দেখে হানস লিপারহী বা জ্যাকারিয়াস যানসেন হয়তো বেশি ক্ষমতার দূরবীন বানিয়েছিলেন। এই অনুমান ঠিক হলে, সম্ভাব্যতার দিক থেকে বিচার করলে যানসেনের দিকেই পাল্লা ভারি। যানসেন ভবঘুরে প্রকৃতির, স্পেনীয় মুদ্রা জাল করেন। এই ধরণের লোকের বহু লোকের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে।

জেকব মেটিয়াস সম্ভ্রান্ত গণিতজ্ঞ ঘরের ছেলে। তাঁর বাবা ইঞ্জিনীয়ার, দাদা গণিতের অধ্যাপক। এমন হতে পারে, মেটিয়াস নানারকম বইপত্তর পড়ে একই সময়ে দূরবীন তৈরির কথা ভাবেন। তিনি নিজে লেন্স তৈরি করতে জানতেন না। তাই হয়তো মিডলবার্গে হানস লিপারহীর (?) কাছে লেন্স তৈরি করাতে এসেছিলেন। এটা একেবারে আজগুবি কল্পনা নয়। জিরোলামো সির্তরি 1618 সালে প্রকাশিত এক বইয়ে লিখছেন,

"1609 (?) সালে জীল্যাণ্ডের মিডলবার্গ শহরে যোহানেস লিপারসীন নামে সুদর্শন এক চশমা প্রস্তুতকারকের দোকানে হল্যাণ্ডের এক অজ্ঞাত, সম্ভ্রান্ত, প্রতিভাবান ব্যক্তি উপস্থিত হন। শহরে আর কোনও চশমা প্রস্তুতকারক ছিল না সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি কয়েকটা উত্তল ও অবতল লেন্স তৈরির অর্ডার দেন। ডেলিভারির দিন লেন্সগুলি পেয়ে, আগ্রহাতিশয্যে (দোকানের মধ্যেই) তিনি একটা উত্তল ও একটা অবতল লেন্স নিয়ে, দুটোর মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে বাড়িয়ে, কি যেন দেখতে থাকেন। ভদ্রলোক দাম দিয়ে চলে যাবার পর চতুর দোকানীও দুটো লেন্স নিয়ে ঐরকম করতে করতে ব্যাপারটার চমৎকারিত্ব বুঝতে পারলেন। তারপর তিনি লেন্স দুটোকে একটা টিউবে ঠিকমত সাজিয়ে দূরবীন তৈরি করলেন এবং তড়িঘড়ি প্রিন্স মরিসের দরবারে পৌঁছে সেটা তাঁকে দেখালেন।"

সির্তুরির এই কাহিনী থেকে মনে হয় 'অজ্ঞাত সম্ভ্রান্ত প্রতিভাবান' ব্যক্তিটি জেকব মেটিয়াস হতে পারেন। যোহানেস লিপারসীন কে? হানস লিপারহী (লিপারহীর নাম নানা জায়গায় নানা ভাবে, যথা Laprey, Lippershey অথবা Lipperhey পাওয়া যায়। স্টেটস জেনারেলের খাতায় তাঁর 'লিপারহী' নাম পাওয়া যায়)?

মেটিয়াস, লিপারহী এবং যানসেনের মধ্যে কে প্রথম দূরবীন বানান, মিডলবার্গ শহরের দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটলে হয়তো তার কিছু হদিশ মিলতে পারত। দুঃখের ব্যাপার, 1940 সালে যুদ্ধের সময় বোমাবর্ষণে শহরের মহাফেজখানাটি ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে এই সূত্র থেকে কোনও নতুন তথ্য পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা আর নেই।

আমরা আগেই দেখেছি, 1609 সালে ফ্রান্সে দূরবীন বিক্রি হচ্ছিল। ইতালিতে গ্যালিলিও কেবল নির্মাণ-কৌশল সম্পর্কে খবর পেয়ে, নিজের তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রয়োগ করে একই বছরে দূরবীন তৈরি করেন। শুধু তাই নয়, দূরবীনকে বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার প্রয়োজনে তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন এবং সৌরমণ্ডল সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছতে সমর্থ হন। এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায়, লেন্স তৈরি তখন ইউরোপের বহু জায়গায় হচ্ছিল। প্রথম কে লেন্স নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে দূরবীন বানালেন, এতদিন পরে তা নিশ্চিত করে বলা খুব শক্ত, অন্ততঃ এখনও পর্যন্ত কেউ পারেন নি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

1. Discoveries and Opinions of Galileo, Stillman Drake, 1957, Doubleday, Garden City.
2. The History of the Telescope, H. C. King, 1955, Charles Griffin, London.
3. The naming of the telescope, E. Rosen, 1947, Abelard-Schuman, New York.
4. A concise history of astronomy, P. Doig, 1950, Chapman & Hall, London.
5. The invention of the telescope, A. V. Helden, 1977, American Philosophical Society, Philadelphia.

সূর্য থেকে সৌর জগতে ছড়িয়ে পড়ছে—আলো, অতিবেগুনী আলো, অবলোহিত রশ্মি, এক্স-রে, রেডিও-তরঙ্গ, গামা রশ্মি, বিটা রশ্মি, প্রভৃতি। এছাড়া আসছে প্লাজ্‌মা প্রবাহ। যদিও এই প্রবাহমাত্রা খুবই ক্ষীণ তবুও কৃত্রিম উপগ্রহের যন্ত্রাংশে এর অস্তিত্ব দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের মতে গামা রশ্মি, এক্স-রে ও প্লাজ্‌মার মিলনই ব্যোম রশ্মির উৎপত্তির কারণ।

চুম্বকীয় এক-মেরুর অস্তিত্ব

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়*

[চুম্বকীয় এক-মেরুর অস্তিত্ব সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আজও এটি একটি আকর্ষণীয় বিষয়। গবেষণালব্ধ ফল থেকে এখনও এই এক-মেরুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পাওয়া যায় নি। আলোচ্য প্রবন্ধে এর অস্তিত্বের সম্ভাবনা বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।]

চুম্বকের দু-প্রান্তে যেখানে আকর্ষণবল সবচেয়ে বেশী, তাকে চুম্বকের মেরু বলা হয়। একটি চুম্বককে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে রাখলে দেখা যায়, সেটি উত্তর-দক্ষিণ দিকে তার অক্ষকে রেখে স্থির হয়। যে প্রান্ত উত্তর দিকে থাকে, তাকে উত্তর-সন্ধানী এবং যে প্রান্ত দক্ষিণদিকে থাকে তাকে দক্ষিণ-সন্ধানী মেরু বা সংক্ষেপে যথাক্রমে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু বলা হয়ে থাকে। বিভিন্ন তত্ত্বের দ্বারা চুম্বকমেরুর অবস্থান এবং অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চুম্বকত্বের আণবিক তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, পদার্থের মধ্যে অনেকগুলি অতি ক্ষুদ্র আণবিক চুম্বক বিশৃঙ্খলভাবে বা আবদ্ধ শৃঙ্খলের আকারে সাজানো থাকে, ফলে সাধারণ অবস্থায় পদার্থের চুম্বকধর্ম প্রকাশ পায় না ; কিন্তু যদি কোন উপায়ে আণবিক চুম্বকগুলিকে একমুখী করা যায়, তবে চুম্বকধর্মের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। আরও বলা হয়েছে যে, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা সম্ভব নয়, কারণ কোন বস্তুকে যতই ভাঙা হোক, শেষ পর্যন্ত আণবিক চুম্বকগুলির দু-প্রান্তে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থেকে যায়। আমরা গবেষণালব্ধ বিভিন্ন ফলাফল থেকে দেখবো এই মেরুগুলি পৃথকভাবে পাওয়া যায় কিনা।

পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

তড়িৎপ্রবাহের অস্তিত্বের জন্য দায়ী তড়িৎ-আধান ; এই তথ্য মাইকেল ফ্যারাডে, আঁদ্রে মারী অ্যাম্পীয়র প্রমুখ বিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে জানা যায় এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলেন, অনুরূপ কোন চৌম্বক আধান (যা চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে) পাওয়া যায় কিনা। 1873 সালে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্বের অবতারণা করেন ; সেখানে তড়িৎ-আধানের ঘনত্ব এবং তড়িৎ-প্রবাহের ঘনত্বের কথা ভাবা হয়েছে, কিন্তু অনুরূপ চৌম্বক আধান বা চৌম্বক প্রবাহের ঘনত্বের কথা ভাবা হয় নি। চুম্বকত্বের ক্ষেত্রে অনুরূপ আধান এবং প্রবাহ ঘনত্বের অবতারণা করা যায় কিনা—এই বিষয়ে দীর্ঘকাল বিজ্ঞানীরা গণনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ম্যাক্সওয়েলের সূত্রগুলিতে সাম্য বজায় রেখে পি. এ. এম ডিরাক এবং মেঘনাদ সাহা স্বতন্ত্রভাবে চৌম্বক আধান-ঘনত্ব ও চৌম্বক প্রবাহ-ঘনত্বের অবতারণা করেন এবং চৌম্বক আধানগুলিকে কণাবদ্ধ (quantize) করেন। তাঁদের তত্ত্বগত গবেষণার ফলাফল থেকে চৌম্বক আধানের সঙ্গে তড়িৎ-আধানের সম্পর্ক জানতে পারা গেছে। যদি e তড়িৎ-আধান, h প্লাঙ্কের ধ্রুবক এবং c আলোকের বেগ হয়, তবে চুম্বকীয় আধান g-এর মান নিম্নলিখিত সূত্র থেকে পাওয়া যায় :

$$g=\frac{hc}{8\pi e}.\,n \text{ (} n \text{ হল যে কোন ধনাত্মক সংখ্যা)}$$

$$=\frac{hc}{8\pi e^2}.\,ne = 68{\cdot}5\ ne$$ অর্থাৎ চুম্বক আধানের মান তড়িৎ আধানের মানের 68·5 গুণ (যদি n ধ্রুবকের মান = 1 ধরা হয়)।

চুম্বকীয় এক-মেরুর অস্তিত্বের পক্ষে কতকগুলি প্রাথমিক যুক্তি লেখা যায় :

(1) এক-মেরুর অবতারণা করলে অর্থাৎ তড়িৎ-আধানের অস্তিত্বের সঙ্গে চৌম্বক আধানের অস্তিত্ব কল্পনা করলে ম্যাক্সওয়েলের সব তড়িচ্চুম্বকীয় সূত্রগুলির সুষম রূপ পাওয়া যায়।

(2) পদার্থ-বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব এই এক-মেরুর অস্তিত্ব থাকার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি দেয় না।

(3) তড়িৎ-আধানের কণাবদ্ধকরণ (quantization) তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা করতে চুম্বক এক-মেরুর অস্তিত্ব সাহায্য করে।

তাই অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, প্রকৃতিতে চুম্বকীয় এক-মেরু থাকা সম্ভব। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়: কিভাবে এরা সৃষ্ট হয় এবং শোষিত হয়? এদের ভৌত ধর্মাবলী কি কি এবং পদার্থের সঙ্গে এরা কিভাবে ক্রিয়া করে? কিভাবে এদের অস্তিত্ব বুঝতে পারা যায়?

চুম্বকমেরুর আধানজোড় সৃষ্টি করতে হলে চুম্বক-মেরুকে আধানের নিত্যতা সূত্র মেনে চলতে হবে অর্থাৎ একই সঙ্গে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মেরুর সৃষ্টি হতে হবে। এ দুটি একমাত্র ফোটন, প্রোটন বা এই জাতীয় দুটি কণার প্রবল (strong) ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে। এই ক্রিয়ায় যে ফোটন অংশ গ্রহণ করবে, তার শক্তি চুম্বকীয় এক-মেরুর ভর এবং c^2-এর গুণফলের চেয়ে বেশী হতে হবে; এই শক্তির পরিমাণ হিসাব করে দেখা গেছে যে, ফোটনের শক্তি 17 গেগা ইলেকট্রন ভোল্ট (1 গেগা $= 10^9$) হলে এই ক্রিয়া সংঘটিত হতে পারে। এই এক-মেরুগুলিকে সাধারণ সলিনয়েড-এর সাহায্যে 200×10^6 ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন করা যাবে। এক-মেরুর আধান তড়িৎ-আধানের 68.5 গুণ, তাই এগুলি উচ্চতর আয়নীভবনের ক্ষমতাসম্পন্ন। এই অসাধারণ আয়নীভবনের ক্ষমতা থাকার জন্য এগুলি ফটোগ্রাফিক অবদ্রবে (photografic emulsion) ভারী দাগ (heavy track) ফেলবে এবং সহজেই পরীক্ষার সাহায্যে এগুলির অস্তিত্ব জানতে পারা যাবে। অধিকতর মানের আধান থাকার দরুণ অন্যান্য ক্রিয়াতেও এগুলির শক্তি বেশী ব্যয়িত হবে এবং সেইসব শক্তিব্যয় উপযুক্ত যন্ত্রাদিতে ধরা পড়বে। সুতরাং তত্ত্বগত গবেষণা থেকে জানা যায়, কিভাবে পরীক্ষাগত দিকগুলি বিজ্ঞানীদের ঠিক করতে হবে যাতে এই কণার অস্তিত্ব বুঝতে পারা যাবে।

পরীক্ষামূলকভাবে এক মেরু আবিষ্কারের বহু চেষ্টা করা হয়েছে। 1951 সালে ম্যানকাস একটি দীর্ঘ সলিনয়েড-এর সাহায্যে একটি পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষায় এক-মেরুর উৎস হিসাবে তিনি ফোটন ও প্রোটনের বিক্রিয়া ঘটান এবং অনুমান করেন যে, এতে চুম্বকীয় এক-মেরুর সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভাব্য এক-মেরুগুলিকে সলিনয়েডে ত্বরণ ঘটানোর পর পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্র বরাবর চালিয়ে একটি অভ্রপর্দার ভিতর দিয়ে বের করা হয়। পরিশেষে অন্য একটি ত্বরণ প্রক্রিয়ায় এই কণাগুলিকে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন করে সেগুলিকে ফোটোগ্রাফিক অবদ্রবে শোষিত হতে দেওয়া হলো। দুর্ভাগ্যবশতঃ এক-মেরুর কোন ভারী দাগ দেখা গেল না। এছাড়া এ যাবৎ অনেক বিজ্ঞানী বহু পরীক্ষা করেছেন এবং প্রতি ক্ষেত্রেই ঋণাত্মক ফল পাওয়া গেছে। মহাজাগতিক (cosmic) রশ্মির মধ্যেও এই কণার সন্ধান করা হয়েছে। প্রতিক্ষেত্রে এই এক-মেরু পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে 10^{-40}-এর কাছাকাছি। অর্থাৎ সারা পৃথিবীর চারপাশের বায়ুমণ্ডলে প্রতি সেকেণ্ডে মোটামুটিভাবে মাত্র দুটি এক-মেরুর সৃষ্টি হয়। তাই আমরা বলতে পারি চুম্বকীয় এক-মেরু ধরা পড়ে নি এবং ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

তবে এই ধরণের পরীক্ষালব্ধ ফল ডিরাক ও সাহার সূত্রকে অস্বীকার করে না। এই সূত্রে যে সংখ্যা $n=1$ ধরা হয়েছে, তার মান শূন্যও হতে পারে। কিন্তু, যেহেতু পদার্থবিদ্যায় কোন তত্ত্ব চুম্বকীয় এক-মেরুর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি দেয় না, তাই বলা যায় যে, উন্নততর তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক গবেষণার ফলে হয়তো একদিন এই এক-মেরুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হবে।

এনসেফালাইটিস

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়*

বর্তমানে এনসেফালাইটিস রোগ সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এবং জনসাধারণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। সুতরাং এ রোগ সম্বন্ধে কিছু জানবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। এনসেফালাইটিস (গ্রীক শব্দ *kephalos*=brain) শব্দার্থ মস্তিষ্কের প্রদাহ (inflammation)। মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্কের আবরণ– মেনিঞ্জিসের প্রদাহজনিত রোগ, মেনিন্-জাইটিস বহুদিন পূর্ব থেকেই চিকিৎসকদের পরিচিত। এনসেফালাইটিস রোগ নানা কারণে উৎপন্ন হতে পারে। ভাইরাস ছাড়া, ছত্রাক এবং বিভিন্ন জীবাণুঘটিত রোগের পরিণতিতেও মস্তিষ্কের প্রদাহ হতে পারে। ভাইরাসজনিত মস্তিষ্কের প্রদাহকে আলাদাভাবে এনসেফালাইটিস বলা হয়। এনসেফালাইটিসেরও প্রকারভেদ আছে।

এক-শ' বছর আগে, বসন্তের টিকা দেওয়ার প্রথম যুগে, দেখা গেল টিকা দেবার পর কদাচিত এনসেফালাইটিস রোগ হয়। কিন্তু হাইড্রোফোবিয়া রোগের টিকা দেওয়ার পরে কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ রোগ দেখা দিল। এগুলিকে টিকার 'অ্যালার্জি-জনিত এনসেফালাইটিস' বলা হতো। তারও পরে নজরে এল যে হাম, বসন্ত, মাম্প্‌স্‌, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হারপিস্ (harpiz) প্রভৃতি ভাইরাসঘটিত রোগের পরিণতি হিসাবেও এনসেফালাইটিস হয়। এগুলিকে এসব রোগের 'আনুষঙ্গিক এনসেফালাইটিস' বলা হত।

60/70 বছর আগে রুমানিয়ায় একপ্রকার এনসেফালাইটিস দেখা গেল, যাতে অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে গভীর নিদ্রাচ্ছন্নভাব দেখা যায়। সেজন্য তার নাম রাখা হল 'এনসেফালাইটিস লেথার্জিকা' (lethergy—অবসাদ)। সে সময় এর প্রকৃত কারণ অজ্ঞাত ছিল। পরে আবিষ্কৃত হলো এটিরও কারণ একপ্রকার ভাইরাস। এরও বছর 15 বাদে উত্তর আমেরিকার সেণ্ট লুইতে একপ্রকার এনসেফালাইটিসের মহামারী দেখা যায়। তার নাম রাখা হলো 'সেণ্ট লুই (St. louis) এনসেফালাইটিস'। এনসেফালাইটিস লেথার্জিকা ও সেণ্টলুই এনসেফা-লাইটিস- এই দুটি এনসেফালাইটিস বিভিন্ন ধরণের ভাইরাসজনিত। অনেক এনসেফালাইটিসেরই ভাইরাস ইঁদুর ও বাঁদরের মধ্যে বেশী দেখা যায়। তখনই অনুমান করা হয়েছিল যে মশা, মাছি, উকুন জাতীয় প্রাণীর দ্বারা মানুষের মধ্যে এ রোগ ছড়ায়। এই সেণ্ট লুই এনসেফালাইটিসের ভাইরাস আবার জাপানে ও রাশিয়াতে পাওয়া একপ্রকার ভাইরাসের স্বগোত্রীয়। এইসময় নাগাদ ক্যালিফোর্নিয়ায় আর এক ধরণের এনসেফালাইটিস দেখা গেল যে রোগ ঘোড়া ও অশ্বতরদের মধ্যেই প্রকট কিন্তু মানুষও আক্রান্ত হয়। তাই তার নাম রাখা হলো 'ইকুইন্ (Equine) এনসেফালাইটিস', এবং ঈড্‌স্ ঈজিপ্টাই (Aedes Egypti) নামে এক প্রজাতির অ্যানোফিলিস মশাই এই রোগের মূল বাহক।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী প্রদেশে যে এনসেফালাইটিসের মহামারী দেখা গেছে এটিও ভাইরাসজনিত; এবং এই ভাইরাসের প্রজাতির নাম 'জাপানী ভাইরাস'। সুতরাং এ রোগের নাম রাখা হয়েছে 'জাপানীস্ এনসেফালাইটিস (Japanese Encephalitis)। বর্তমানে মহামারীরূপে এ প্রদেশে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বটে কিন্তু ভারতে এই জাপানী এনসেফালাইটিসের অস্তিত্ব বছর পঁচিশ আগেই ধরা পড়েছিল। 1955 সালে ভেলোরে এই

* 25A, নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006

রোগ প্রথম দেখা যায় এবং সেই থেকেই ভারতীয় চিকিৎসক এবং ভাইরাস বিশেষজ্ঞগণ এই রোগ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা সুরু করেন। এর পর ভারতের নানা প্রান্তে এই রোগ দেখা দিতে থাকে।

1955 থেকে 1965 সালের মধ্যে উত্তর আর্কটে, 1973, 1975, 1976 এবং 1978 সালে পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল ও বাঁকুড়া জেলায়, 1978-এর ফেব্রুয়ারীতে তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি জেলায় এবং সম্প্রতি কয়েক মাস আগে ধানবাদ, আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চলে, আসামের ডিব্রুগড়ে এবং উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর এলাকায় এই রোগ ধরা পড়ে। দেখা যাচ্ছে 'জাপানী এনসেফালাইটিস' এনসেফালাইটিস নিয়ে নিরলস গবেষণা চালাচ্ছেন। এই গবেষণার ফলে এ রোগের কারণ, ধারক, রোগ-বাহক ও সংক্রমণের মতিগতি এবং প্রতিরোধের বিষয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে।

এনসেফালাইটিসের লক্ষণের বিষয় পূর্বেই কিছু বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে কারণেই মস্তিষ্ক প্রদাহ হোক না কেন; লক্ষণ মোটামুটি প্রায় এক ধরণের হয়। জাপানী এনসেফালাইটিসের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। যদিও যে কোন বয়সের মানুষই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে, কিন্তু মহামারীর সময় শিশু ও তরুণদের মধ্যেই এর প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা গেছে। প্রথম দিকে সামান্য জ্বর, শারীরিক অস্বস্তি
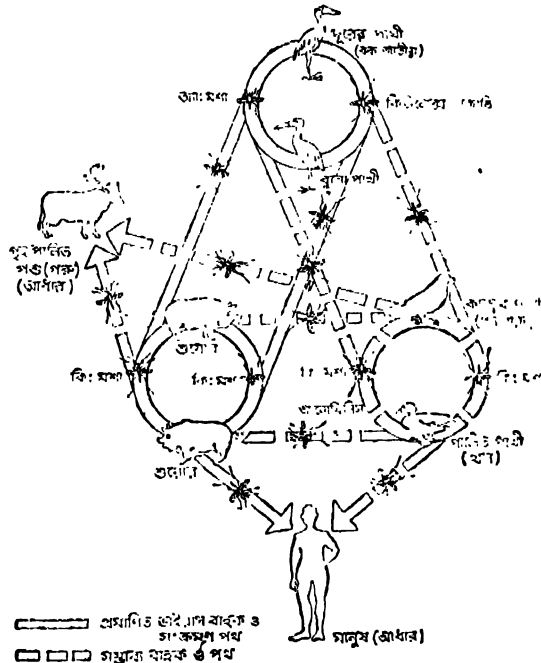
গত কয়েক বছর ধরেই ভারতে জেঁকে বসে আছে এবং মাঝে মাঝেই তা মহামারীরূপে প্রকাশ পাচ্ছে।

কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং পুণের ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরলজি ও আচ্ছন্নভাব। ক্রমশঃ জ্বর প্রবল হয় এবং শেষে রোগী সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। রোগের প্রথম সপ্তাহেই এইসব বাড়াবাড়ি চলে। বলা হয়েছে অন্যান্য কারণেও এনসেফালাইটিস হতে পারে।

সুতরাং রোগী যে জাপানী এনসেফালাইটিসেই আক্রান্ত তা কেমন করে নির্ধারিত হবে—এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই করা যায়। বাস্তবে, নিশ্চিতভাবে এখন নিদান (diagnosis) করা সত্যিই কঠিন। ভাইরাসগুলি মস্তিষ্কের তন্তুতেই বাসা বাঁধে। সুতরাং মস্তিষ্কের তন্তুর মধ্যে ঐ ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া ছাড়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ করবার আর কোন উপায় নেই। যে কোন ভাইরাসের প্রতিক্রিয়ায় মানুষের রক্তে একপ্রকার 'অ্যান্টিবডি' (antibody) তৈরি হয়। বিশেষ বিশেষ অ্যান্টিবডির অস্তিত্ব, বিশেষ বিশেষ পরীক্ষায় ধরা পড়ে এবং সেইভাবেই বিশেষ ভাইরাস ও তার থেকে বিশেষ রোগের নির্দিষ্ট নিদান করা সম্ভব। কিন্তু বিশেষ অ্যান্টিবডির পরীক্ষামূলক সনাক্তকরণ আধুনিক লেবরেটরী ছাড়া করা যায় না। কাজেই গ্রামাঞ্চলে, জরুরী নিদান নির্ণয়ে লেবরেটরী লভ্য নয় ধরে নিয়েই—অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে যেমন লক্ষণাদি দেখে এবং রোগী পরীক্ষা করে নিদান করা হয়, এক্ষেত্রেও সেইভাবেই নিদান করা মহামারীর সময় নিদান করা চিকিৎসকদের পক্ষে সহজতর হয়।

গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মশার দ্বারাই এ রোগ ছড়ায় এবং এর মূল বাহক এবং আধার হলো গৃহপালিত পশু এবং পাখী। মশা এই বাহক-পশুদের দংশন করে ভাইরাস আহরণ করে এবং পরে দংশনের দ্বারা মানুষের রক্তে ঐ ভাইরাস প্রবিষ্ট করায়। প্রকৃতপক্ষে ঐ পশুপাখীগুলি নীলকণ্ঠের মত ভাইরাসগুলিকে ধারণ করে রাখে। কালান্তক মশারা যদি পশুদের থেকে ঐ ভাইরাস আহরণের কাজ না করত তাহলে এ রোগ মানুষের মধ্যে নাও ছড়াতে পারত এবং পশুদের মধ্যেই সীমিত থাকত। সুতরাং পশুপক্ষীর বিস্তার এবং বসতির নৈকট্য এবং মশাদের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে এ রোগ বিস্তারের অতি নিকট সম্বন্ধ। সাধারণতঃ কিউলেক্স বিষ্ণুই'র (Culex Visnui) নানা প্রজাতি এই রোগ ছড়ানোয় প্রধানঅংশ গ্রহণ করে। কিছু প্রজাতির অ্যানোফিলিস মশাও বাদ যায় না। মানুষের এই ক্ষুদ্রকায় শত্রুগুলি—জলাভূমি, পানা-পুকুর, ধানক্ষেত, জমে থাকা স্বল্প পরিমাণ জলের মধ্যেই বাস ও বংশবৃদ্ধি করে। এইজন্য বর্ষাকালেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। ধানক্ষেত ও জলাশয়ে যে সাদা বক, কালো বক, হাঁস দেখা যায় তারাই এনসেফালাইটিস ভাইরাসের ধারক বলে দেখা গেছে।

'জাপানী এনসেফালাইটিস' খুবই মারাত্মক রোগ। আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে শতকরা 25 থেকে 45 ভাগ রোগীর মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা। এই ভাইরাস প্রত্যক্ষভাবে প্রতিহত করবার আজও অবধি কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয় নি। লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা করা হয়। এবং দেখা গেছে দক্ষ শুশ্রূষা (nursing) ও পরিচর্যার দ্বারা মুমূর্ষ রোগীও শেষ অবধি নিরাময় হতে পারে। সুতরাং রোগাক্রান্ত হলেই হতাশার কারণ নেই। ধৈর্যসহকারে শুশ্রূষার দ্বারাও শেষ রক্ষা করা সম্ভব।

চিকিৎসকের উপর যখন ভরসা কম তখন এর প্রতিষেধের বিষয় অবহিত এবং সতর্ক থাকাই বাঞ্ছনীয়। গৃহপ্রাঙ্গণ যতদূর সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। মশা যাতে বৃদ্ধি না পায় সেই জন্য ভিজে আবর্জনা, গর্ত বা পরিত্যক্ত পাত্রে জল জমতে বা পচতে দেওয়া উচিত নয়, এবং সেই সঙ্গে মশা মারবার জন্য কীটঘ্ন তেল মধ্যে মধ্যে ছড়ানো ভাল। মশার কামড় থেকে রক্ষা পাবার জন্য রাত্রে মশারি ব্যবহার করা অবশ্যই উচিত এবং প্রয়োজন হলে মশা নিবারক মলমও ব্যবহার করা যেতে পারে। গরু, মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু, বিশেষ করে শুয়োরকে বাসস্থান থেকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখা বাঞ্ছনীয়। মহামারীর সময় বিশেষ করে শিশুদের সন্ধ্যার পর বাইরে থাকা উচিত নয়। প্রতিষেধক টিকা নেওয়া হলে বহুলাংশে নিরাপদ হওয়া যায়। টিকা মেলা এক সমস্যা। একমাত্র জাপানেই এ রোগের প্রতিষেধক টিকা তৈরি হয়। ভারতের জন্য জাপান

থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঐ টিকা পাওয়া সম্ভব নয়। ভারতে অদূর ভবিষ্যতেও ঐ টিকা তৈরির কোন সম্ভাবনা এখনো পর্যন্ত নেই।

ভাগ্যের কথা, জনাকীর্ণ কলকাতায় এ রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব এখনো দেখা যায় নি। তবু সতর্কতা নিরাময়ের থেকে ভাল—এই আপ্তবাক্যটি ভুলে যাওয়া সংগত নয়। শেষ কথা, এ রোগ সম্বন্ধে খুব একটা আতংকিত হবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু সাবধানতার প্রয়োজন চিরকালই আছে, থাকবে।

পাখীর দেখা

রণতোষ চক্রবর্তী*

আমাদের চারপাশে বহু পাখীর বাস। এছাড়া বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে, জলাশয়েও অনেক ধরণের পাখী রয়েছে। মানুষ যেমন বুদ্ধি খাটিয়ে জগতে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তেমনি পাখীও উন্নত ধরণের দৃষ্টিশক্তি দিয়ে ওদের জীবনপ্রবাহ পরিচালনা করে। এক কথায় মানুষের বুদ্ধির মত পাখীর দৃষ্টিও প্রখর। বহুদূরের শিকার পাখীরা অনায়াসে দেখতে পায় ও নিপুণভাবে সংগ্রহ করতে পারে। মাথার বিরাট অংশ জুড়ে আছে পাখীর চোখ। অন্য যে কোনও প্রাণীর চেয়ে এদের চোখ মাথার তুলনায় বড় ও উন্নত। বৃহদাকারের এদের মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্র বা অপটিক্ লোব (optic lobe)। এত বড় দৃষ্টিকেন্দ্র অন্য কোনও প্রাণীর মস্তিষ্কে আছে বলে জানা নেই।

মূলতঃ পাখীর চোখের গঠন আমাদের মতই। অক্ষিগোলকের তিনটি স্তর—বাইরের দিক থেকে শ্বেতমণ্ডল (sclera), কৃষ্ণমণ্ডল (coroid) ও অক্ষিপট বা রেটিনা। সবচেয়ে ভিতরের স্তর রেটিনা অনেকটা ফটোগ্রাফিক ফিল্মের মত। এই স্তরে 'রড্' ও 'কোন্' (rod ও cone) নামে দু-ধরণের বিশেষ কোষ আছে। দৃশ্যবস্তু থেকে আলোকরশ্মি রেটিনায় এসে পড়ে—তখন 'রড্' ও 'কোন্' কোষের রাসায়নিক পরিবর্তন এক ধরণের উত্তেজনার সৃষ্টি করে—যা দৃষ্টি-নার্ভপথে মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে পৌছায়—তবেই দেখা যায়।

পেলিকান, গাল্ এরকম কিছু পাখী ছাড়া বেশীর ভাগ পাখীর অক্ষিগোলক অক্ষিকোটরে প্রায় স্থির ভাবে বসানো, অর্থাৎ এরা আমাদের মত ইচ্ছামত চোখকে ঘোরাতে পারে না। এর কারণ এদের অক্ষিপেশী অত্যন্ত কম আর যাও আছে সেগুলি দুর্বল। যার ফলে প্রায়ই পাখীর মাথা নাড়িয়ে আশেপাশের দিকে নজর রাখতে হয়—কাকের ঘন ঘন মাথা সঞ্চালনের কারণ এটিই।

কাক, শালিক, পায়রা, প্রভৃতি পাখীর চোখ মাথার দু-পাশে। চোখ মাথার পাশে থাকায় দু-চোখেরই আলাদা দৃষ্টিক্ষেত্র বা visual field আছে। এরকম একটি চোখের দৃষ্টিক্ষেত্রকে একনেত্রিক দৃষ্টি ক্ষেত্র (monocular visual field) বলা হয়। যদিও একনেত্রিক দৃষ্টিক্ষেত্রের লক্ষ্যবস্তুকে পাখীরা দেখতে পায়, কিন্তু আরও স্পষ্টতর দৃষ্টির জন্য এদের দ্বিনেত্রিক দৃষ্টি (binocúlar vision) প্রয়োজন, যেমন করে আমরা সবকিছু দেখছি। পায়রা, কাক, মোরগ—এসব পাখীর দ্বিনেত্রিক দৃষ্টিক্ষেত্র খুব অল্প যায়গায় সীমাবদ্ধ—সাধারণতঃ

*নবপল্লী, শিববাড়ী, বারাসত, 24 পরগণা

20—25° ডিগ্রীর বেশী নয়—এমন কি অনেক পাখীর আরও কম মাত্র 5—10° ডিগ্রী (চিত্র-1)।
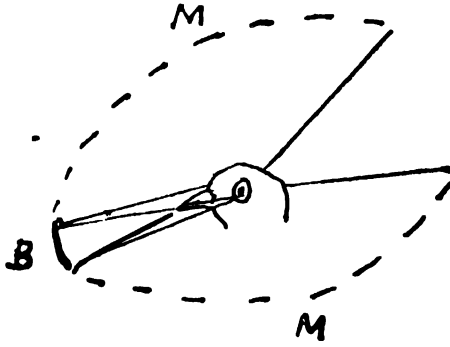
চিত্র 1
B = দ্বিনেত্রিক দৃষ্টিক্ষেত্র বা বাইনোকুলার ফিল্ড অব ভিসন
M = একনেত্রিক দৃষ্টিক্ষেত্র বা মনোকুলার ফিল্ড অব ভিসন

এই দু-প্রকারের দৃষ্টিক্ষেত্র প্রধানতঃ পাখীর মাথা ও ঠোঁটের আকৃতির উপর বিশেষ করে নির্ভর করে। এক জাতীয় কাঁদাখোচা পাখীর চোখ মাথার পাশে কিছুটা উপরের দিকে থাকায় এদের দ্বিনেত্রিক দৃষ্টি সামনের দিক ছাড়া মাথার পিছনের দিকেও বিস্তৃত
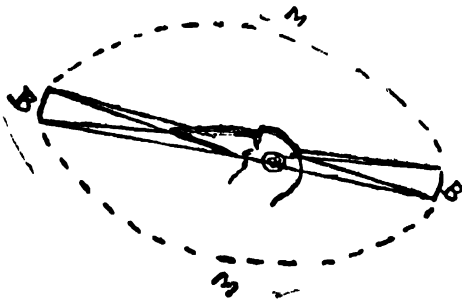
চিত্র 2
B = দ্বিনেত্রিক দৃষ্টিক্ষেত্র বা বাইনোকুলার ফিল্ড অব ভিসন
M = একনেত্রিক দৃষ্টিক্ষেত্র বা মনোকুলার ফিল্ড অব ভিসন

(চিত্র-2)। সম্ভবতঃ পিছনের দিক থেকে শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনায় চোখের এই পরিবর্তন।

ঈগল, বাজপাখী এধরণের শিকারী পাখীর চোখ গোলাকার। এদের একনেত্রিক ও দ্বিনেত্রিক দৃষ্টি বেশ দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। অনেক শিকারী পাখীর অক্ষিগোলক গোলাকার তরুণাস্থির কাঠামোর ভিতর বসানো থাকে—যাতে আকাশপথে উড়বার সময় প্রবল বায়ুচাপ থেকে রক্ষা পায়—অনেকটা মোটর সাইকেল আরোহীর গগ্‌লসের মত। বিশেষজ্ঞদের মতে অধিকাংশ পাখীর অক্ষিপটে একটির বেশী 'ফোবিয়া' আছে—আমাদের চোখে Fovea centralis নামে মাত্র একটিই। অক্ষিপটের খুব ছোট যায়গা যেখানে শুধুমাত্র 'কোন্' কোষই থাকে—সেটুকু অংশই fovea, দৃষ্টিকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও নিখুঁত করে দেখাতে সাহায্য করে। পাখীর অক্ষিপটে প্রায় মাঝখানে Fovea centralis একনেত্রিক দৃষ্টির জন্য এছাড়া Temporal fovea দ্বিনেত্রিক দৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়।

সাধারণতঃ রাত পাখী অর্থাৎ রাতে চলাফেরায় অভ্যস্ত যেমন পেঁচা, নাইটজার বা রাতচরা এদের চক্ষুগোলক লম্বাকৃতি। বিশেষ করে অল্প আলোকে দেখার জন্য এই চোখ তৈরী। চোখের আকার বেশ বড়, প্রায় আমাদের সমান। মাথার আকৃতির জন্য পেঁচার দ্বিনেত্রিক দৃষ্টিক্ষেত্র অন্য পাখীর থেকে অনেক বেশী বিস্তৃত (চিত্র-3)। সাধারণতঃ 'রড্' কোষ স্বল্পালোকে দেখতে সাহায্য করে। এইসব রাত পাখীর রেটিনায় 'রড্' কোষের সংখ্যা দিন পাখীর চেয়ে অনেক বেশী—প্রায় প্রতি বর্গ মিলিমিটারে 56 হাজারের মত। অন্ধকারে এদের দৃষ্টিশক্তিও আমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশী। এক candle power আলোর দশ লক্ষ ভাগের কমেও এরা ইঁদুরের মত শিকার সংগ্রহ করতে পারে। এদের রেটিনায় 'কোন্' কোষের সংখ্যা অত্যন্ত কম থাকায় এরা উজ্জ্বল আলোকে দেখতে অক্ষম। সেজন্য দিনে সাধারণতঃ এদের বাইরে দেখা যায় না। রাত পাখীর চোখে আর একটি মজার ব্যাপার হচ্ছে রাতের অন্ধকারে কারও কারও যেমন রাতচরা

চোখ জলজলে দেখায়। কারণ এদের চোখেও বাঘ ইত্যাদি প্রাণীর মত tapetum lucidum ধরণের রাসায়নিক পদার্থ আছে।
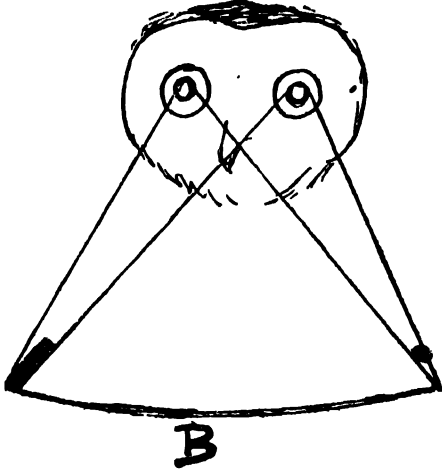
B = দ্বিনেত্রিক বা দৃষ্টিক্ষেত্র বাইনোকুলার ফিল্ড অব ভিসন
M = একনেত্রিক দৃষ্টিক্ষেত্র বা মনোকুলার ফিল্ড অব ভিসন

পাখীর চোখে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো - পেকটিন্। এই চিরুণী আকৃতির রেটিনা-সংলগ্ন অংশটি আমাদের চোখে একেবারেই নেই। বিজ্ঞানীদের মতে অক্ষিপটে প্রয়োজনবোধে বেশী পরিমাণে খাদ্য যোগান দেওয়া ছাড়াও হয়তো বিশেষ প্রক্রিয়ায় চলন্ত বা উড়ন্ত শিকার রেটিনায় প্রতিফলনে পেক্‌টিন সাহায্য করে।

পাখীর চোখে সবচেয়ে বাইরের দিকে 'নিকৃটিটিটিং পর্দা' বা তৃতীয় চক্ষু-পর্দা বিশেষ লক্ষ্য করার মত। আমাদের চোখে এই পর্দা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় এক কোণে নামমাত্র আছে। পাখীর কিন্তু এটি বেশ প্রয়োজনীয়। উঁচু আকাশে উড়বার সময় অর্ধভেদ্য এই পর্দা দিয়ে চোখ ঢেকে রাখতে পারে। রাত পাখীরা দিনের তীব্র আলো থেকে চোখকে রক্ষার জন্য এই পর্দা সানগ্লাস-এর মত ব্যবহার করে। এছাড়া পাখীর চোখের জলের একান্ত অভাব, কেননা এদের অশ্রুগ্রন্থি নেই। এই তৃতীয় চক্ষুপর্দা ঘন ঘন ওঠানামা করে চোখ ধুলোবালি থেকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।

কাক, চড়ুই, মুরগী, পায়রা—এইসব পাখীরা রাত-কানা। অন্ধকার হলেই নিজেদের বাসায় আশ্রয় নেয়—আর বেরোতে চায় না। আমাদের আলিপুর চিড়িয়াখানায় যেসব অতিথি পাখী আসে—এরা অনেকেই কিন্তু দিনে ও রাতে প্রায় সমান দেখতে পায়। দিনে চিড়িয়াখানায় এসে বিশ্রাম নেয়, দিন অবসানে খাদ্যের সন্ধানে বহুদূর চলে যায়।

আধুনিক গবেষণায় দেখা যায় বিশেষ করে যাযাবর পাখীরা রাতের অন্ধকারে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রকে লক্ষ্য করেই সম্ভবতঃ দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করে।

পাখী কি আমাদের মত রঙীন দৃশ্য বুঝতে সক্ষম? এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে ময়ূরের পেখমে রংয়ের বাহার বা মোরগের রঙীন পুচ্ছ এগুলি কি নিছক আমাদের আনন্দদানের জন্য, না ময়ূরী বা মুরগীর হৃদয় হরণের জন্য? বিজ্ঞানীদের মতে পাখীরা রং বুঝতে পারে। কেবল মাত্র রেটিনার 'কোন্' কোষই রং বুঝবার জন্য অপরিহার্য। সুতরাং শুধু মাত্র দিন পাখীরাই বিভিন্ন রং বুঝতে পারে। রাত পাখীরা এ থেকে বঞ্চিত। সেজন্য রাতে লাল আলো ফেলে রাত পাখী পেঁচার ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা সুবিধা। পাখীরা কেমন করে বিভিন্ন রং বুঝতে পারে—এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। তবে পাখীর অক্ষিপটে বা রেটিনায় 'কোন্' কোষের মাঝামাঝি জায়গায় বিভিন্ন রঙয়ের তৈলবিন্দু (oil-globule) দেখা যায়। খুব সম্ভবতঃ ক্যামেরা বা কলরিমিটার যন্ত্রের ফিল্টারের মত এই সব তৈল বিন্দু বিভিন্ন রং বুঝতে সাহায্য করে।

গবেষণাগারে ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গিয়েছে পাখীদের বিভিন্ন রং বুঝবার ক্ষমতা আমাদের থেকে কম। বিজ্ঞানীদের মতে এর কারণ অবশ্য এদের চোখের অক্ষমতা নয়, বরং বুদ্ধির স্বল্পতাই এর জন্য দায়ী।

দামোদর আজও দুঃখের নদ কেন ?

(1)

শিবরাম বেরা*

সূচনা—বিহারের পার্বত্য উপত্যকা থেকে যে সকল নদী পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চলে প্রবাহিত হয়েছে, তাদের মধ্যে দামোদর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নদীটির পার্বত্য অববাহিকা যথেষ্ট বড় হওয়ায় বর্ষাকালে দামোদর প্রচুর জলধারা নিয়ে আসে এবং চলার পথে পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রায়ই প্লাবন ডেকে আনে—যাদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীতে 1901, 1905, 1913, 1916, 1923, 1927, 1935, 1943, 1956, 1959, 1971 ও 1978 সালের প্লাবনগুলি উল্লেখযোগ্য। 1943 সালে যুদ্ধের সময় দামোদর বর্ধমানের কাছে বামতীর ভেঙে পূর্ব রেলপথ ও গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড চুরমার করে গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে সোজা পূর্বমুখী হয়ে বেহুলা নদীপথ ধরে এগিয়ে চলে ভাগীরথীতে মিলিত হওয়ার জন্য। ফলে ঐ সময় প্রায় দু'মাস পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে কলিকাতার রেল ও সড়ক পথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন যুদ্ধোপকরণ চলাচলে বিঘ্ন হওয়াতেই ব্রিটিশ সরকার দামোদরের বন্যা-নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর দামোদর উপত্যকায় বহুমুখী প্রকল্প, যথা বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, সেচের জন্য জল সরবরাহ, জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য 1948 সালের 7ই জুলাই দামোদর ভ্যালী করপোরেশন বা ডি. ভি. সি. গঠিত হয়। আমেরিকার টেনেসী ভ্যালী অথরিটির ইঞ্জিনীয়ার মি. ভরডুইন দামোদর উপত্যকায় 10 লক্ষ কিউসেকের প্রবাহকে 2·5 লক্ষ কিউসেকে কমিয়ে আনার জন্য আটটি জলাধার নির্মাণ করার পরামর্শ দেন। [প্রতি সেকেণ্ডে 1 ঘনফুট জল প্রবাহিত হলে প্রবাহমাত্রা 1 কিউসেক হয়।] কিন্তু পরবর্তীকালে 1953 সালে বরাকর নদের উপর তিলাইয়া, 1955 সালে কোণার নদের উপর কোণার, 1957 সালে বরাকর নদের উপর মাইথন ও 1959 সালে দামোদর নদের উপর পাঞ্চেত—এই চারটি জলাধার নির্মিত হয়, যাদের দ্বারা 6·5 লক্ষ কিউসেকের প্রবাহকে 2·5 লক্ষ কিউসেকে কমিয়ে আনা যাবে বলে অনুমান করা হয়। এছাড়া সেচের জল সরবরাহের জন্য 1955 সালে দুর্গাপুরে দামোদর নদে একটি ব্যারাজ বা সেচবাঁধ নির্মাণ করা হয়। তবুও 1958, 1959, 1971 ও 1978 সালে দামোদর উপত্যকায় প্রবল বন্যা হয়, যাদের মধ্যে 1978 সালের বন্যা সকল পূর্ব-ইতিহাসকে ছাপিয়ে গেছে। কাজেই জলাধারগুলির বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

জলাধারগুলির বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা—ডি. ভি সি.-র উল্লিখিত চারটি জলাধারের জলধারণ ক্ষমতা বর্তমানে 10·5 লক্ষ একর ফুট, যদিও মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার দুটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে মোট 15 লক্ষ একর ফুট করা যায়। [1 একর ফুট=1 একর জমির উপর 1 ফুট জল দাঁড়ালে যতটা জল হয়।] ঐ চারটি জলাধারে যে পার্বত্য অঞ্চলের জল এসে জমা হয় বা যাদের আবহক্ষেত্র 6,620 বর্গ-মাইল বা প্রায় 42 লক্ষ একর। [1 বর্গমাইল=640 একর।] যদি কখনও ঐ অঞ্চলে তিনদিনে গড়ে 16 বা 18 ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, তবে কিছু জল শোষিত হলে ও কিছু জল জমে থাকলেও তিনদিনের মধ্যে 10 বা 11 ইঞ্চি বৃষ্টিজল নদীপথ বেয়ে জলাধারগুলিতে আসবে বলে অনুমান করা যায়। 72 ঘণ্টায় প্রবাহিত-হয়ে-

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা-700 006

আসা সেই জলের পরিমাণ হবে 35 লক্ষ বা 38·5 লক্ষ একর-ফুট। ফলে প্রতি ঘণ্টায় গড়ে প্রায় 0·5 লক্ষ একর ফুটের অধিক জল দামোদরে নেমে আসবে, যাতে গড় প্রবাহমাত্রা হবে 6 লক্ষ কিউসেকের অধিক। [ঘণ্টায় 1 একর ফুট জল এলে প্রবাহমাত্রা প্রায় 12 কিউসেক দাঁড়ায়।] অর্থাৎ কোন পার্বত্য উপত্যকায় তিনদিনে 16 ইঞ্চির মত বৃষ্টি হলে প্রতি 1 হাজার বর্গমাইল আবহক্ষেত্রের জন্য প্রায় 1 লক্ষ কিউসেক হারে জল আসতে পারে এবং 36 ঘণ্টায় অনুরূপ বৃষ্টির জন্য প্রতি 1 হাজার বর্গমাইল আবহ-ক্ষেত্রে থেকে 2 লক্ষ কিউসেক হারে জল আসার সম্ভাবনা থাকবে। তখন জলাধারগুলিতে প্রবাহিত হয়ে আসা জলের অর্ধেক বা 3 লক্ষ কিউসেক হারে জল দামোদর নদীপথে ছেড়ে দিলেও জলাধারগুলি ও দুর্গাপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের বাড়তি জলের জন্য দুর্গাপুর ব্যারাজের কাছে দামোদর নদের প্রবাহমাত্রা দাঁড়াবে 5 লক্ষ কিউসেকের কাছাকাছি। কিন্তু অবশিষ্ট 3 লক্ষ কিউসেক হারে জল ধরে রাখায় প্রতি ঘণ্টায় জলাধারগুলির 0·25 লক্ষ একর-ফুট অঞ্চল ভরে যাবে। যদি মোট জলধারণক্ষমতা 10·5 লক্ষ একর ফুটের মধ্যে 6 লক্ষ একর-ফুট বন্যা-নিয়ন্ত্রণে খালি রাখা হয়, [সাধারণত 3/4 লক্ষ একর ফুট বা 30/35 শতাংশ খালি রাখা হয়ে থাকে।] তবুও মাত্র 24 ঘণ্টায় তা ভরে যাবে এবং পরবর্তী 48 ঘণ্টা বন্যা-নিয়ন্ত্রণে জলাধারগুলির কোন ক্ষমতা থাকবে না, অর্থাৎ সব জলই নদীপথে ছেড়ে দিতে হবে। যদি প্রস্তাবিত আটটি জলাধার নির্মাণ করে জলধারণ ক্ষমতা 30 লক্ষ একর ফুট করা হয়, তবুও তিন দিনের অর্ধেক জল ধরে রাখতে প্রায় 18 লক্ষ একর ফুট বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য খালি রাখা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত হবে না, কারণ সেক্ষেত্রে অধিকাংশ বৎসরই সেচের জল দেওয়া যাবে না বা জলবিদ্যুৎ পাওয়া যাবে না। কাজেই এরূপ প্রবল বর্ষণে জলাধারগুলির দ্বারা মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্যা-নিয়ন্ত্রণের পর ওগুলি সম্পূর্ণ ভরে যাবে এবং পরবর্তী দিনগুলিতে জলাধারগুলি থেকে গড়ে 6 লক্ষ কিউসেক হারে জল নদীপথে ছাড়তে হবে। ফলে দুর্গাপুরের পর দামোদর নদে প্রায় 8 লক্ষ কিউসেক হারে জল নামবে। কাজেই জলাধার নির্মাণ নয়, দামোদরের বন্যা-নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় হলো, একে এরূপভাবে সংস্কার করা যাতে নদীটি 7.8 লক্ষ কিউসেক জলের প্রবাহ নিয়ে সাগরে পৌঁছে যেতে পারে।

1978 সালের বন্যায় ডি. ভি. সি.-র ভূমিকা—1978 সালের 26শে সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই সমগ্র দামোদর উপত্যকায় প্রবল বর্ষণ সুরু হয় এবং জলাধারগুলির জলতল দ্রুতহারে বাড়তে থাকে। ঐ দিন রাত তিনটায় জলাধারগুলিতে যে হারে জল আসে, তা সর্বকালের রেকর্ড ছাপিয়ে 8·5 লক্ষ কিউসেকে দাঁড়ায়। ঐ হারে জল আসতে থাকলে জলাধারগুলিতে খালি রাখা 3·5 লক্ষ একর-ফুট অঞ্চল মাত্র 5 ঘণ্টায় ভরে যেত এবং পরবর্তী সময়ে জলাধারগুলিতে প্রবাহিত হয়ে আসা সমস্ত জলই নদীপথে ছেড়ে দিতে হতো। কিন্তু ঐ হারে জল খুব অল্প সময়ের জন্য আসায় জলাধারগুলি থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ 1·6 লক্ষ কিউসেক হারে রাখা সম্ভব হয়, কারণ যদিও দামোদরের নিম্নউপত্যকায় তিন দিনে 16 ইঞ্চি থেকে 30 ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছিল, তবুও উচ্চউপত্যকার যে অংশের জল জলাধারগুলিতে সঞ্চিত হয়, সেখানে অঞ্চলবিশেষে তিন দিনে 4 ইঞ্চি থেকে 16 ইঞ্চি পর্যন্ত এবং গড়ে 8 ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। ফলে গড়িয়ে-আসা আনুমানিক 4 ইঞ্চি বৃষ্টিজল জলাধারগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার দুটির নিম্নঅঞ্চলে তিন দিনে প্রায় 20 ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়ায় দুর্গাপুর ব্যারাজের কাছে দামোদর নদের প্রবাহমাত্রা অতিরিক্ত 2·2 লক্ষ কিউসেক হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে দুর্গাপুর ব্যারাজ দিয়ে 26শে সেপ্টেম্বর 3·6 লক্ষ কিউসেক, 27শে সেপ্টেম্বর 3·8 লক্ষ কিউসেক ও 29শে সেপ্টেম্বর 2·5 লক্ষ কিউসেক হিসাবে বিপুল পরিমাণ জল দামোদরের পথে ছেড়ে দিতে হয়।

এর পর এক সপ্তাহের মধ্যে আর একটি ঘূর্ণিঝড় আসায় 6ই, 7ই ও 8ই অক্টোবর দুর্গাপুর ব্যারাজ দিয়ে বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলগুলিতে আবার প্রচুর জল ছাড়তে হয় এবং নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়। হাইড্রোগ্রাফ পদ্ধতিতে হিসাব করে দেখা যায় যে, 26শে সেপ্টেম্বর থেকে 12ই অক্টোবর পর্যন্ত পর পর দুটি বন্যার দিনগুলিতে দুর্গাপুর ব্যারাজ দিয়ে দামোদর নদীপথে যে জল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তার আয়তন হলো 37 লক্ষ একর-ফুট। এছাড়া ডি. ভি. সি-র দক্ষিণদিকের ক্যানাল পথের জল দুর্গাপুর ব্যারাজের কাছেই দুর্গাপুর-বাঁকুড়া রোডের প্রায় 300 ফুট উড়িয়ে দেয় এবং শালি নদীপথের অ্যাকোয়াডাক্ট [নদী পারাপারের জন্য ক্যানালের পাকা প্রণালী] ভেঙে শালি নদীপথে প্রবাহিত হয়। ফলে দুর্গাপুর ব্যারাজের কাছ থেকে সোমসার পর্যন্ত দামোদরের দক্ষিণতীরবর্তী বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া, সোনামুখী, পাত্রসায়র ও ইন্দাস অঞ্চলের প্রায় 25 মাইল দীর্ঘ ও 10 মাইল বিস্তৃত এলাকা সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত হয়, যাতে প্রায় 40 জনের জীবনহানি ঘটে। যদি বাঁকুড়া জেলার ঐ 250 বর্গমাইল অঞ্চলে বন্যার জলের গভীরতা প্রায় 5 ফুট ধরা হয়, তবে ঐ পথে প্রবাহিত জলের পরিমাণ হবে 8 লক্ষ একর-ফুট। এছাড়া ডি. ভি. সি.-র উত্তর দিকের ক্যানাল পথ বেয়ে আরও কয়েক লক্ষ একর ফুট জল বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলকে প্লাবিত করে এবং যে টাম্বলা ক্যানাল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের জল বয়ে নিয়ে আসে, সে তার পথের বাধা ব্রীজ ও রাস্তা চুরমার করে ব্যারাজের নীচের অংশের দামোদরে বিপুল পরিমাণ জল ঢেলে দেয়।

সব মিলিয়ে দেখা যায় যে, 26শে সেপ্টেম্বর থেকে পরপর দুটি বন্যার সময় দামোদর ও তার সংলগ্ন ক্যানালগুলির পথ ধরে কমপক্ষে 45 লক্ষ একর ফুট জল ছুটে এসে দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী ও শিলাবতী বাহিত আরও অন্ততঃ 10 লক্ষ একর-ফুট জলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমগ্র নিম্নদামোদর উপত্যকাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে প্রায় 15 দিন ধরে জলমগ্ন করে রেখেছে, আর আমরা ঐ সময়ে মাত্র 3/4 লক্ষ একর ফুট জল জলধারগুলিতে ধরে রেখে একটা বিরাট বিপর্যয় রোধ করা গেল বলে মনে করছি। আমার মনে হয় যে, 1978 সালের বন্যার সময় যে সব অঞ্চলে 7 8 ফুট জল জমেছিল, জলাধারগুলি না থাকলে তাতে অতিরিক্ত 1 ফুট জলও বাড়তো না। ফলে বন্যার ধ্বংসলীলা বা তীব্রতা এমন কিছু বেশী হতো না বা দোতলা বাড়ীগুলি ডুবে যেত না।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমান শতাব্দীর অন্য 4টি প্রবল বন্যায় দুর্গাপুর দিয়ে দামোদরের পথে যে জল নেমে এসেছে বলে অনুমান করা হয়, তার আয়তন হলো 1913 সালের অগাষ্টে 32 লক্ষ একর-ফুট, 1935 সালের অগাষ্টে 22 লক্ষ একর-ফুট, 1943 সালের জুলাই-এ 22 লক্ষ একর-ফুট ও 1959 সালের অক্টোবরে জলাধারগুলিতে জল ধরে রাখার পর 21 লক্ষ একর ফুট। এছাড়া 1770, 1823, 1840, 1855 ও 1882 সালগুলিতে দামোদরের উপত্যকায় প্রবল বন্যা হয় বলে জানা যায়।

মনে রাখা দরকার যে, যেখানে নদীর জলবহন ক্ষমতা খুব কম, সেখানে বন্যায় প্লাবিত অঞ্চল সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রার চেয়ে প্রবাহিত জলের আয়তনের উপর অধিক নির্ভর করে। যেমন 1943, 1959 ও 1978 সালের বন্যাগুলিতে দুর্গাপুরে দামোদরের সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রা যথাক্রমে 3.5 লক্ষ, 3.5 লক্ষ ও 3.8 লক্ষ কিউসেক রাখা সত্ত্বেও প্রবাহিত জলের আয়তন বেশী হওয়ায় এক বিশাল অঞ্চলে প্রবল প্লাবন হয়েছে, কিন্তু 1941 সালের বন্যায় সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রা 6.5 লক্ষ কিউসেকের অধিক হলেও প্রবাহিত জলের আয়তন কম হওয়ায় বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি। তাহলে যে নদীপথে এক একটি বন্যার সময় 25/30 লক্ষ একর ফুট জল নেমে আসে, সেখানে মাত্র 3/4 লক্ষ একর-ফুট জল ধরে রেখে বন্যার তীব্রতাকে কতটুকু প্রশমিত করা যাবে? এতেই বোঝা যায় যে, ছোটখাটো বন্যা-নিয়ন্ত্রণে জলাধারগুলি কার্যকরী

ভূমিকা গ্রহণ করলেও এরূপ প্রবল বর্ষণে ওদের দ্বারা বন্যা-নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং তা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। পরন্তু পশ্চিমাংশের জল নির্গমনে বাধা হওয়াতে ঐ আধা উপত্যকা অঞ্চলে বন্যা হয়। অর্থাৎ যে বন্যা শুধু নিম্ন দামোদর উপত্যকাতে সীমিত থাকতো, সে বন্যা
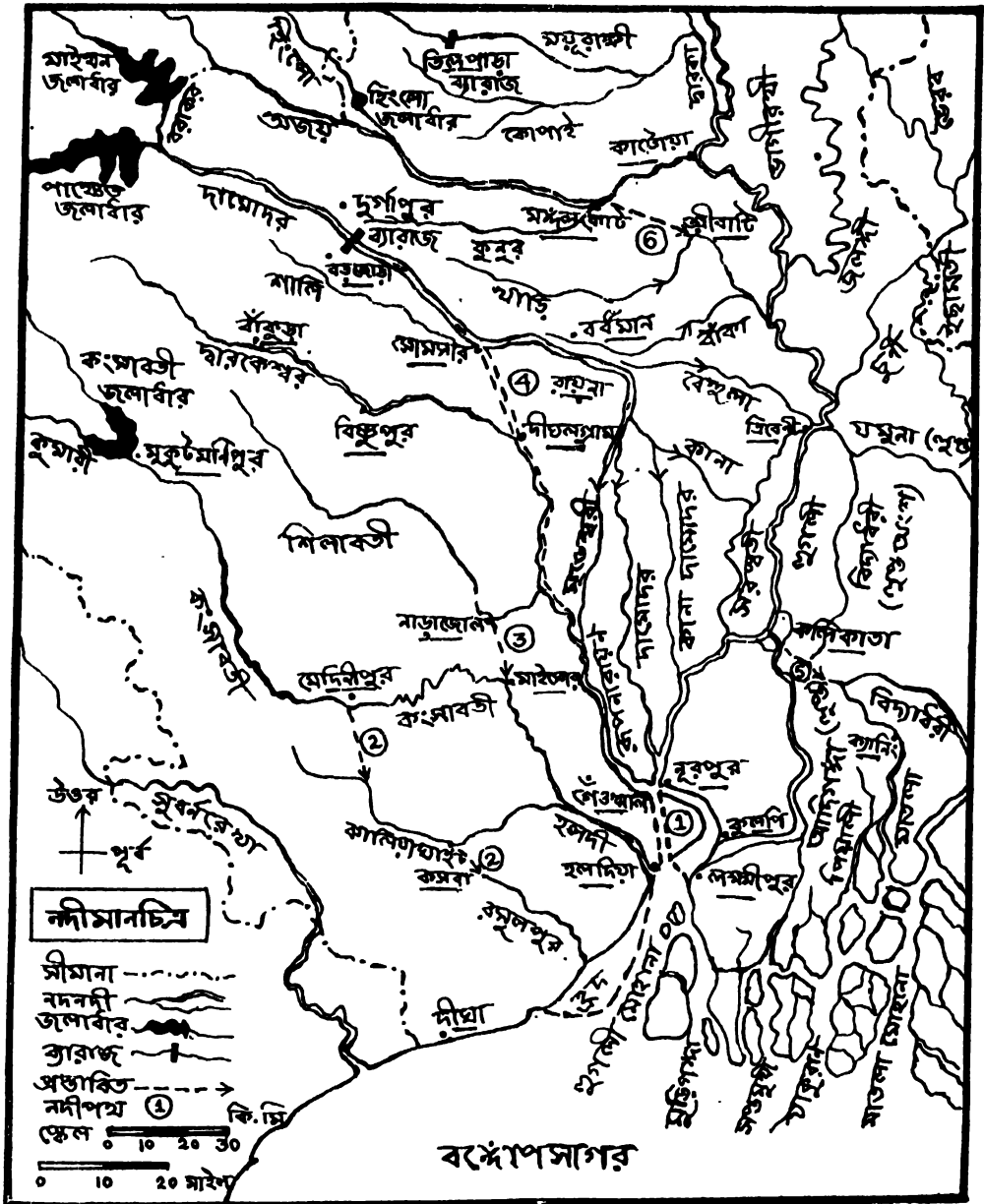
দুর্গাপুর ব্যারাজের জন্য আসানসোল—রাণীগঞ্জের কয়লা খনি অঞ্চলসহ বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার দুর্গাপুর ব্যারাজের জন্য উচ্চ উপত্যকাতেও ছড়িয়ে পড়ে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যদিও 1978 সালের সেপ্টেম্বরে দামোদরের উচ্চ উপত্যকায় তিন-দিনে গড়ে 8 ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, তবুও ভাগীরথী হুগলী নদীর পশ্চিমাংশের এক বিশাল অঞ্চলে অর্থাৎ সাঁওতাল-পরগণা, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার সর্বত্র এবং নদীয়া ও চব্বিশপরগণা জেলার পশ্চিমাংশে 1978 সালের 27শে 28শে ও 29শে সেপ্টেম্বর 16 ইঞ্চি থেকে 30 ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে। এমন কি 26শে ও 27শে সেপ্টেম্বর অজয় ও ময়ূরাক্ষী নদী দুটির অববাহিকায় মাত্র 36 ঘণ্টাতেই 20 ইঞ্চির মত বৃষ্টি হয় এবং প্রতি 1 হাজার বর্গমাইল আবহ-ক্ষেত্রের জন্য 2 লক্ষ কিউসেক হারে জল নেমে এসে তিলপাড়া ও হিংলো নদীবাঁধ দুটির পার্শ্বসংলগ্ন বাঁধ ভেঙে সমগ্র বীরভূম জেলাকে ধ্বংস করে দেয়। কাজেই এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তিন দিনে গড়ে 16 ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয় এবং ভবিষ্যতে দামোদরের উচ্চ উপত্যকাতেও অনুরূপ পরিমাণ বৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে দুর্গাপুর ব্যারাজের জলনির্গমন ক্ষমতা প্রয়োজনমত বাড়িয়ে দামোদরের জলবহন ক্ষমতা 6/7 লক্ষ কিউসেক করে না রাখলে সমগ্র দামোদর উপত্যকা অনিবার্যভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

দামোদরের বন্যার প্রকৃত কারণ - যেহেতু দামোদরে 6 লক্ষ থেকে 8 লক্ষ কিউসেক হারে জল নেমে আসে, সেই হেতু এর খাত 4 লক্ষ বা 5 লক্ষ কিউসেক হারে জলবহন ক্ষমতার উপযোগী হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু নদীটির খাত বর্ধমান জেলায় বেশ বড় থাকলেও হাওড়া ও হুগলী জেলায় তা অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। এর কারণ জানতে হলে উক্ত নদীটির ইতিহাস জানতে হবে। দুই শত বৎসর পূর্বে দামোদর পূর্ববাহিনী হয়ে বেহুলা নদীপথে প্রবাহিত হতো ও ত্রিবেণীর কাছে ভাগীরথীতে পতিত হতো। পরে ত্রিবেণী থেকে দামোদর ও ভাগীরথীর মিলিত জলধারা প্রধানত তিনটি পথে সাগরের দিকে এগিয়ে চলতো। যেমন উত্তর প্রদেশের ত্রিবেণীতে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী যুক্তধারা হতো, তেমনি পশ্চিম-বঙ্গের ত্রিবেণীতে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নামে আবার মুক্তধারা হতো। যমুনা নদী পূর্বমুখী ও পরে দক্ষিণপূর্বমুখী হয়ে পড়তো ইছামতীতে। গঙ্গানদী বয়ে চলতো বর্তমান হুগলী নদীপথে কলিকাতা পর্যন্ত ও পরে আদিগঙ্গার পথে সাগরদ্বীপের পাশ দিয়ে সাগরে। আর সরস্বতী নদী বর্তমান পথে আন্দুল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে হুগলী নদীর পথ ধরে রূপনারায়ণে পতিত হতো। যেহেতু সে যুগে রেলপথ আদৌ ছিল না, সড়ক পথ খুবই দুর্গম ছিল, তাই জলপথই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ও সংস্কৃতি বিনিময়ের প্রধান সহায় এবং ঐ সব নদীর কূলে কূলে গড়ে উঠেছিল সে যুগের বন্দর, শহর, সংস্কৃতি কেন্দ্র ও তীর্থক্ষেত্র। গঙ্গানদী বা আদিগঙ্গা সুন্দরবনের গহন অরণ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় সরস্বতী নদী ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের জলপথ। কিন্তু এর উপরাংশে হয়তো অনেক বাঁক গড়ে উঠায় সরস্বতী দ্রুত মজে যেতে থাকে। তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবাব আলীবর্দী খাঁ কলিকাতা থেকে আন্দুল পর্যন্ত একটি খাল সংস্কার করে গঙ্গার সঙ্গে প্রায় মজে যাওয়া সরস্বতীকে যুক্ত করে দেন। গঙ্গানদীর উপরাংশ ও সরস্বতী নদীর নিম্নাংশ অপেক্ষাকৃত সরল থাকাতে এবং পরবর্তীকালে নিম্নাংশটি দামোদরের বন্যার ফলে গভীর হওয়াতে এদের নিয়ে বর্তমান হুগলী নদী গড়ে উঠে। গঙ্গা ও সরস্বতীর অবশিষ্টাংশ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এরপর প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে 1770 সালের এক প্রবল বন্যায় দামোদর তার পূর্বমুখী বেহুলা নদীপথকে পরিত্যাগ করে হঠাৎ দক্ষিণমুখী হয়ে গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে দু-তিনটি নতুন পথে চলতে সুরু করে, যাদের মধ্যে প্রধান শাখাটি ফলতা কাছে হুগলীতে পতিত হয় ও অপর একটি শাখা বর্তমান কানা নদীপথ ধরে সরস্বতীতে মিলিত হয়। দামোদরের নতুন প্রধান শাখার পথটি পূর্বপথের তুলনায় প্রায় 35 মাইল সংক্ষিপ্ততর হওয়ায় সামগ্রিক ভাবে অপেক্ষাকৃত ঢালু। ফলে নদীটি নতুন পথে

চলতে সুরু করে এবং পূর্বপথটি দ্রুত মজে যেতে থাকে। কিন্তু শক্তিগড়ের কাছে প্রায় 90° কোণের একটি বাঁক থাকায় ও নতুন পথটি বেশ দীর্ঘ হওয়ায়-দামোদর আজও তার নিজস্ব পথটি কেটে নিতে পারে নি। ফলে শক্তিগড়ের কাছে 90° কোণের বাঁকের জন্য জলপ্রবাহ ব্যাহত হওয়ায় বর্ধমান জেলার পূর্বাংশ এবং নতুন পথটি বেশ সংকীর্ণ থেকে যাওয়ায় হাওড়া ও হুগলী জেলা বারবার দামোদরের বন্যার কবলে পড়ে। এই কারণে দামোদর পশ্চিমবঙ্গের দুঃখের নদ বলে পরিচিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দামোদরের পূর্বমুখী গতি ত্রিবেণী থেকে যমুনা নদীকে সজীব করে রাখতো এবং দামোদর তার পথ পরিবর্তন করায় বিদ্যাধরীসহ যমুনা নদী দ্রুত বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলে। এইভাবে ত্রিবেণীর ত্রিধারা একটি মাত্র ধারায় বা হুগলীতে রূপান্তরিত হয়।

আসলে দামোদর শুধু একবার নয়, কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বহুবার পথ পরিবর্তন করেছে। যেমন খাড়ি, বাঁকা, বেহুলা, কানা, কানা দামোদর প্রভৃতি নদীগুলি দামোদরের পরিত্যক্ত খাত। এমন কি এই শতাব্দীতে নদীটি হুগলী ও হাওড়া জেলার দামোদর নামে পথটি পরিহার করে বেগের ও মুচির হানা দিয়ে মুণ্ডেশ্বরীর পথে তার প্রধান ধারাটি প্রবাহিত করে চলেছে এবং বর্তমানে ঐ পথে দামোদরের শতকরা প্রায় 80 ভাগ জল রূপনারায়ণে পৌঁছে যায়। এখানে বলা দরকার যে, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে দামোদর যখন বাঁকা নদীপথ ধরে বয়ে যেত, তখন তার একটি শাখা ঢলকিশোর নামে দক্ষিণমুখী হয়ে বর্তমান মুণ্ডেশ্বরীর কাছাকাছি পথ ধরে রূপনারায়ণে মিলিত হতো। পরে বেহুলা পথটি গড়ে ওঠায় ঢলকিশোর মিলিয়ে যায়। কাজেই বর্তমান মুণ্ডেশ্বরী ও দামোদরের একটি প্রাচীন খাত। এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নদীটির সকল পথ পরিবর্তনই একটি বিশেষ অঞ্চলে বা বর্ধমান জেলার পূর্ব-অংশেই সীমাবদ্ধ। এর কারণ কি ?

দামোদরের পথ পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ—যখন দেখি, অজয়, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদীগুলি বড় একটা পথ পরিবর্তন করে না, তখন দামোদরই বা বারবার পথ পরিবর্তন করে কেন? নদীপথে বাঁক বা নদীখাতে পলি জমার জন্য নদীর ছোটখাটো পথ পরিবর্তন হলেও তার মূল প্রবাহ নির্ভর করে প্রধানত প্রবাহিত অঞ্চলের ঢালের উপর। এছাড়া নদীর গতিমুখ বা ভরবেগের দিকও নদীপথকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে। এখন নদী মানচিত্রে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন নদীর যথা খাড়ি, বাঁকা, বেহুলা, কানা, কানা দামোদর, দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরীর পথগুলি লক্ষ্য করা যাক। ঐ সব নদীগুলি ঐ অঞ্চলটি থেকে বহির্মুখী হয়ে তীরচিহ্নিত দিকে বয়ে চলেছে। ফলে ঐ অঞ্চলটি নিশ্চিতভাবে একটি অধিত্যকা—যা অনেকটা কচ্ছপের পিঠের মত। এর উত্তর পূর্ব থেকে পূব ও দক্ষিণ ঘুরে দক্ষিণ পশ্চিম পর্যন্ত সকল দিকেই ঢাল কম-বেশী বিদ্যমান। সুতরাং ঐ অঞ্চলটি থেকে যে কোন দিকের ঢালু পথই দামোদরের পথ হতে পারে।

আমার অনুমান যে, যেহেতু বর্ধমান জেলা নদীয়া ও চব্বিশ-পরগণা জেলাগুলি থেকে উচ্চতর ও প্রাচীন ছোটনাগপুর মালভূমির অংশবিশেষ, সেই হেতু যখন নদীয়া ও চব্বিশ-পরগণা জেলাগুলি যথেষ্ট নীচু ছিল ও সুন্দরবন অঞ্চল গড়ে ওঠে নি, তখন দামোদর খাড়ি নদীর পথ ধরে উত্তর-পূর্ব দিকে বয়ে যেত এবং সমুদ্র বা ভাগীরথীর কোন প্রাচীন খাতে মিলিত হতো। কিন্তু ঐ অঞ্চলটি ক্রমে পলি জমে উঁচু হয়ে ওঠায় খাড়ি নদী শ্রীবাটির নিকট থেকে দক্ষিণ-পূব দিকে বইতে থাকে। পরবর্তীকালে কোন এক প্রবল বন্যায় দামোদর তার পথকে সংক্ষেপ করে বাঁকা নদীপথে প্রবাহিত হয়। কিন্তু ভাগীরথী ও বাঁকা বাহিত পলিতে ঐ অঞ্চল ক্রমাগত উঁচু হওয়ায় নদীটি পূর্বমুখী হয়ে বেহুলা পথে চলতে থাকে। বর্তমান ঐ অঞ্চল আরও উঁচু হওয়ায় ও সমুদ্র বহু দক্ষিণে সরে যাওয়ায় নদীটিকে সমুদ্র পর্যন্ত তার পথটি

সংক্ষেপ করার জন্য দক্ষিণবাহিনী হয়ে উঠতে হয়েছে। নদী মানচিত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সামগ্রিক ভাবে সমুদ্র পর্যন্ত সম্পূর্ণ পথের কথা বিচার করলে খাড়ি, বাঁকা, বেহুলা, কানা, কানা দামোদর, দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরীর পথগুলি ক্রমানুসারে সংক্ষিপ্ততর। অর্থাৎ নদীটি বারবার পথ পরিবর্তনকালে ক্রমান্বয়ে সংক্ষিপ্ততর পথেই চলতে চেয়েছে, কারণ সংক্ষিপ্ততর নদীপথই অপেক্ষাকৃত ঢালু ও অধিকতর গতিসম্পন্ন।

এখন নদীটির বর্তমান পথের কথা ভাবা যাক। ছোটনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে বর্ধমান পর্যন্ত ঢাল প্রায় পূর্বমুখী থাকায় নদীটি পূর্বমুখী গতি পায়। কিন্তু শক্তিগড়ের কাছে হঠাৎ সে 70° কোণ ঘুরে দক্ষিণবাহিনী হয়ে রয়েছে। ফলে ঐ অঞ্চলে নদীটি পূর্বলব্ধ গতির জন্য চলতে চায় পূর্বদিকে, আবার সামগ্রিকভাবে অধিকতর ঢালের জন্য সে বইতে চায় দক্ষিণদিকে। তাই প্রবল বন্যায় যখন নদীর বাম-তীরের বাঁধ ভাঙে, সে তখন প্রচণ্ড গতির সাহায্যে পথ কেটে ছুটে চলে পূর্বদিকে ভাগীরথীতে মিলিত হতে। আবার যখন গতি কিছু কম থাকে ও দক্ষিণতীরের বাঁধ ভাঙে, তখন সে পূর্বমুখী গতি ও ও দক্ষিণমুখী ঢালের জন্য চলতে চাইবে দক্ষিণ-পূর্বমুখী কোন পথে। অর্থাৎ ঐ অধিত্যকা অঞ্চলের ঢালের বৈচিত্র্য ও নদীর গতিমুখের এই অসম সমাবেশের জন্য দামোদর আজও তার নিজস্ব পথটি গড়ে নিতে পারে নি। তাই আজও সে অশান্ত, অস্থির। এই অস্থিরতাই তাকে বারবার নতুন পথে ঠেলে দিয়েছে ও তাই সে যুগ যুগ ধরে প্রবল বন্যার কারণ হয়েছে।

দামোদরের বন্যা-প্রতিরোধের উপায়— উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, অশান্ত দামোদরকে বর্ধমান জেলার পূর্বাংশের ঐ অধিত্যকা অঞ্চলটি থেকে মুক্ত করতে না পারলে সে কখনও নিজস্ব পথ গড়ে নিতে পারবে না এবং তার বার বার পথ পরিবর্তন বা বন্যার কবল থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। কাজেই নদীটিকে এমন একটি পথে পরিচালিত করতে হবে, যাতে তা ঐ অধিত্যকা অঞ্চলটি থেকে মুক্ত হয় এবং নদীর গতিমুখ ও প্রবাহিত অঞ্চলের ঢাল পরস্পরের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য হয়ে ওঠে। এরূপ পথের সন্ধান বর্তমান নদী-মানচিত্রে দেওয়া হলো। পথটি হবে বাঁকুড়া জেলার সোমসার থেকে 4নং পথে দীঘলগ্রাম পর্যন্ত, তারপর বাঁকমুক্ত দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণ নদের পথ ধরে গেঁওখালি এবং শেষাংশ মেদিনীপুর জেলায় গেঁওখালি থেকে 1নং পথে সোজা হলদিয়া হয়ে সাগর পর্যন্ত। এটিই দামোদরের সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত ঢালুপথ।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন

মণি দাশগুপ্ত*

বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক জায়গায় বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠেছে। এ ব্যাপারটি এখন প্রায় আন্দোলনের পর্যায়ে। দেশের সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য এ রকম বিজ্ঞান ক্লাব সংখ্যায় খুবই কম। মনে রাখা দরকার, দেশের 75 ভাগ এখনও নিরক্ষর। মেয়েরা আরো অনেক বেশী। বর্তমানে প্রশ্ন উঠেছে 'বিজ্ঞান ক্লাব কেনই বা আমরা গড়ে তুলব, কি তার উদ্দেশ্য'—নীচে আরও কিছুর উত্তর সমেত ব্যাপারটি আলোচনা করা যেতে পারে।

বিজ্ঞান ক্লাব কেন ? কি তার উদ্দেশ্য ?

ডিস্‌কভারি এবং ইনভেনসন (উদ্‌ঘাটন এবং আবিষ্কার)—এই মহৎ চেষ্টায় জীবনমুখী পরিবেশ সৃষ্টি করতে দেশের মানুষকে বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের বিজ্ঞান মনস্ক, তীক্ষ্ণ অনিসন্ধিৎসু এবং প্রশ্নশীল করে তোলা। এর জন্যে দরকার ভাবনা, পড়াশুনা এবং নিজের হাতে ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা; তথ্য সংগ্রহ ও প্রমাণ করা, মডেল, চার্ট, অঙ্কন ও প্রদর্শনীর সাহায্যে বিজ্ঞানকে সহজবোধ্য ও জনপ্রিয় করা, দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে যুক্তিবাদী মানসিকতা তৈরি করা, স্রষ্টা ও আত্ম-প্রত্যয়শীল হওয়া। এই বিজ্ঞান ক্লাবে কখনও সস্তা মনোরঞ্জন চিত্তবিনোদন প্রশ্রয় পাবে না। Roger Becon-এর কথায় Take nothing on Trust', এই যুক্তিবহ অন্বেষাই বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠার আদর্শবাণী হওয়া উচিত। আর এই বিজ্ঞান ক্লাবগুলি তাদের প্রাণচঞ্চল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে স্থানীয় পরিবেশে একটি নবজাগরণ সৃষ্টি করতে পারবে।

কিভাবে বিজ্ঞান ক্লাব গড়তে হবে ?

এ বিষয়ে অবশ্য কোন বাঁধাধরা নিয়মকানুন নেই। সুবিধামত ব্যবস্থা করে নিতে হবে। অবশ্য ক্লাবের নিজস্ব সংবিধানে সরকারী অনুমোদনের জন্য কিছু নিয়মকানুনের প্রয়োজন। স্থানিক পরিবেশের যথাযথ মূল্যায়ণে যাঁরা অগ্রসর হবেন, তাঁদের সাহস, দূরদৃষ্টি এবং আঁকড়ে ধরার ক্ষমতার উপর তা নির্ভর করে। তবে সাধারণ স্কুল কলেজের উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়েই এই ক্লাব দরকার। পরিচালনায় দায়িত্বে থাকবেন শিক্ষক, অধ্যাপক কিংবা কোন উদ্যোগী সমাজসেবী। স্থানীয় উৎসাহী তরুণ-তরুণীরা ক্লাবের সদস্য হবেন। বাস্তব জীবনে অভিজ্ঞ অথচ নিরক্ষর এরকম নাগরিকদের সাহায্য নেয়াও দরকার। এ প্রসঙ্গে লুই পাস্তুর-এর কথা মনে করা যেতে পারে। তিনি প্রত্যক্ষতঃ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জলাতঙ্ক রোগের ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন। মনে রাখা দরকার পৃথিবীর অনেক যুগান্তকারী আবিষ্কার ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেই হয়েছে। তাই বর্তমান অবস্থায় সভ্যদের তৎপর, দায়িত্বশীল, জিজ্ঞাসু, সৃজনশীল, সহযোগী, সাহসী ও দুর্জয় কল্পনাশক্তির অধিকারী হওয়া দরকার। যে কোন ধরণের অবস্থার মুখোমুখী হওয়ার মত মানসিকতা থাকা প্রয়োজন; ঘোট পাকানো, পরছিদ্রান্বেষী মনোভাব একান্তই অবাঞ্ছনীয়।

*গোবরডাঙা রেনেশাঁস ইনস্টিটিউট, পোঃ খাটুরা, 24 পরগণা

পরিচালন ব্যয়ভার

অর্থ জোগাড় করা সম্পূর্ণভাবে ক্লাবের সভ্যদের উদ্যোগের উপর নির্ভর করে, তবে বিজ্ঞান ক্লাবের প্রয়োজনের অনুপাতেই অর্থসংগ্রহ করা প্রয়োজন। আর্থিক কৃচ্ছ্রতা অথবা প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্য উভয়ই উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হতে পারে।

তাহলে কর্মসূচী কি হবে ?

প্রথমতঃ এর কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। মাপ এবং ওজন নেওয়ার শিক্ষা প্রাথমিক দরকার। মাপমাফিক বিভিন্ন মডেলতো করতেই হবে। আমাদের সমাজে ও দেশে একজন কল্পনাপ্রিয় পরিচালকের কাছে, সভ্যদের নিয়ে মডেল এবং প্রকল্প নিয়ে কাজ করার অজস্র দিক খোলা রয়েছে। আচারসর্বস্ব মধ্যযুগীয় বদ্ধ-চিন্তার দেশ এই ভারতবর্ষ। অর্থনৈতিক দিক থেকেতো পশ্চাৎপদ। প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের আধুনিক প্রয়োগও এখানে সার্বজনীন নয়। অবৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য ও আধুনিক বিজ্ঞানের জোড়াতালি চলছে সার্বিক উন্নয়নে কি কৃষিতে, কি শিল্পে, বিজ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজনের তুলনায় অতি কম, আর্থিক অসংগতিও এই পথে বাধা বিশেষ। কি গ্রামে, কি শহরে বিজ্ঞান ক্লাবের কর্মসূচী এই পটভূমি মনে রেখে রচনা করতে হবে; যেমন স্বল্প অর্থ বিনিময়ে যুগপৎ কর্মসংস্থান ও উৎপাদনে বৃদ্ধিমূলক প্রকল্পসমূহের উদ্ভাবন। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতিও অপূর্ণ। যেমন, বিদ্যুৎশক্তি ছাড়া তৈরী গ্রামীণ রেফ্রিজারেটর, জ্বালানির অভাবে হে-বক্স—এরকম বিভিন্ন প্রকল্পে উদ্যোগী হয়ে সমাজের সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ক্লাবকে কিছু দিতে হবে। এছাড়া আমাদের কৃষি, খাদ্য, পশুপালন, পক্ষীপালন, মাছ-মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়, প্রজননবিদ্যা, বিভিন্ন ধরণের সেচ, সার ও বিষয়ে গবেষণা, বনসংরক্ষণ, জমির ক্ষয় নিবারণ, বৃষ্টিহীনতা, জমির নীরসতা, কি ভাবে বায়ু, জল, মৃত্তিকা, দূষিত হচ্ছে তা' তথ্য ও ব্যাখ্যা; সামাজিক সমীক্ষা, কীট-পতঙ্গ সংরক্ষণ, ফলের চাষ এবং ফল ও মাছ কৌটা করে চালান দেবার বিদ্যা, শহরে এবং গ্রামের পরিবহন ব্যবস্থা এরকম অজস্র কর্মসূচী রয়েছে, যা প্রতিনিয়ত অনাদরে ও উপেক্ষায় নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করছে এবং সমস্যাগুলি জমে জমে সংকটের চেহারা নিচ্ছে। এসব কর্মসূচীর যে কোন প্রকল্প বিজ্ঞান ক্লাব নিজস্ব মেজাজ অনুযায়ী গ্রহণ করতে পারে। এর নাম আমরা দিতে পারি Patriotic Science বা স্বদেশী বিজ্ঞান। এই হলে extra curricular scientific activities, এবং প্রতিটি বিজ্ঞান ক্লাবই হয়ে উঠবে ল্যাবোরেটারী। নতুন নতুন চিন্তার প্রয়োগস্থল।

প্রতিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের ফলাফল বিজ্ঞান ক্লাবের মুখপত্রে এবং অন্যভাবে প্রকাশে উদ্যোগী হতে পারে। বিজ্ঞানের দেশী-বিদেশী নানান পত্র-পত্রিকার খোঁজখবর রাখতে হবে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের প্রগতি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। এর জন্য বিজ্ঞান পুস্তক-গ্রন্থাগার দরকার।

বিজ্ঞান ক্লাবের কর্মসূচীর অন্যতম ভিত্তি হবে স্থানীয় প্রয়োজন। বিজ্ঞান ক্লাবগুলির সমন্বয় সাধনের দায়িত্বও শহরের বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে নিতে হবে। পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য আলোচনা সভা, বক্তৃতামালা, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ইত্যাদির আয়োজন করা দরকার। শিক্ষামূলক ভ্রমণ এবং দুঃসাহসী অভিযান এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়া প্রয়োজনবোধে অন্যান্য গঠনমূলক কর্মসূচীও রাখা হবে। নিয়মিত বিভিন্ন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের কর্ম ও জীবন সম্পর্কে আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়।

সভ্যদের কি কি গুণ দরকার ?

প্রথমেই সভ্যদের উদ্যোগী হওয়ার অসুবিধা স্থানিক অবস্থার পটভূমিতে খুঁজে বের করতে হবে। নানারকম অবস্থায় সংগ্রাম করে টিকে থাকার গুণাবলীর অনুশীলন দরকার। যেমন ঝুঁকি নেওয়ার

মানসিকতাসম্পন্ন, উদ্যোগী এবং সহনশীল, প্রাণবন্ত তো হতেই হবে। একটা জিনিষকে নিয়ে বাধাবিপত্তির ভিতরেও আঁকড়ে থাকার অভ্যাস এবং প্রচুর পড়াশুনা করতেই হবে। সর্বোপরী মানুষকে নিয়ে যেখানে কারবার সেখানে সভ্য-সভ্যাদের ভালবাসতে হবে, মর্যাদা দিতে হবে এবং রোগে, শোকে, দুঃখে, দৈন্যে, আনন্দে পাশে দাঁড়াতে হবে। প্রতিভাসম্পন্ন সভ্যকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ধরতে হবে। আর এই ভাবেই মুক্তচিন্তার আদর্শে দীপ্ত যৌবনের দল সটান সূর্যমুখীর মত তীব্র সূর্যের দিকে দাঁড়িয়ে থাকবে। জীবনের জলে ও রৌদ্রে, পাথরে ও সমতলে বলিষ্ঠ মনোভঙ্গীতে তারা এগিয়ে যাবে প্রকৃতি ও মানুষের অগাধ রহস্যের উন্মোচনে।

তাহলে কি এই বিজ্ঞান ক্লাব গঠনে দুর্জয় অভিযান সম্ভব নয়?

মৌপালন শিল্পে প্রতিবন্ধকতা

দীপককুমার দাঁ*

স্বনির্ভর কর্মপ্রযুক্তিতে অল্প পুঁজিতে যে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাটি আস্তে আস্তে পরিপূর্ণতা লাভ করছিল—তা হলো 'মৌমাছি পালন প্রকল্প'। মৌমাছিরা পতঙ্গশ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের মধ্যে মানুষের কাছে সর্বাধিক উপকারী। ফুলের পরাগ সংযোগ ঘটিয়ে যেমন, কৃষিফলন বাড়াতে সাহায্য করে। তেমনই ফুলের রেণু সংগ্রহ করে জৈব প্রক্রিয়ায় এরা 'মধু' তৈরি করে জমা রাখে চাকে। বাক্সে মৌমাছি পালন করে মধু সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আধুনিক ছেলেমেয়েদের কাছে ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বারুইপুর এলাকায় প্রতি বাক্সে যেখানে গড়ে চার কিলোর মত মধু পাওয়া যায় বছরে, সেখানে উত্তর 24 পরগণা, নদীয়া, মালদা প্রভৃতি অঞ্চলে গড়ে বছরে সাড়ে পাঁচ কিলোর মত মধু পাওয়া যায়। একটি বাক্সে বছরে প্রায় 100 টাকার মত উপার্জন সম্ভব। 20 থেকে 25টি বাক্সে এই কাজ করলে বছরে দেড় থেকে দু-হাজার টাকারও বেশি উপার্জন সম্ভব। প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদ হেলায় নষ্ট না করে মানুষের কল্যাণে কাজ লাগাবার চেষ্টায় খাদি কমিশন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেকেই এ নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বর্তমানে এটি লাভজনক ক্ষুদ্র শিল্প। কিন্তু বড় রকমের কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এই শিল্প। সমস্যাগুলি নিম্নরূপ।

(1) আম, লিচু, সরিষা, সজনে, তেঁতুল, জাম, তিল, কুমড়োর ফুল, কুল ইত্যাদির ফুল থেকেই সর্বাধিক মধু সংগৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু জমিতে (গাছে) কীটনাশক দ্রব্যের স্প্রে করার জন্য মাছির অকল্পনীয় ক্ষতি হচ্ছে। গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট গত 5 বছরে গ্রামীণ বিজ্ঞান প্রজেক্ট হিসাবে এই বিষয়ে গবেষণামূলক সমীক্ষা-কার্যে নিযুক্ত আছে। এই সংস্থার দু-জন অভিজ্ঞ মৌপালক যুবক শ্রীনীলমণি রক্ষিত ও শচীসুন্দর দাসের অভিমত এই যে, কীটনাশক ওষুধের স্প্রে যখন আম, লিচু, সরিষা, তিল, কুমড়োর উপর অপরিহার্য [এগুলি অর্থনৈতিক ফসল], তখন এই স্প্রে দিনের শেষে বৈকাল—সন্ধ্যায় করা একান্ত আবশ্যক। কর্মী-মৌমাছিরা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন ফুলের

*গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট পোঃ খাটুরা, 24 পরগণা

মধু সংগ্রহকার্যে ব্যস্ত থাকে। এ ছাড়াও মৌমাছির একটা বিশেষ স্বভাব হলো, যে, যখন কোন একটি গাছের ফুলে বসে, যেমন, আম—তখন সমস্ত কর্মী-মৌমাছিরা ঐ একই গাছের ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করবে। পাশে অন্য ফুল থাকলেও, সাধারণতঃ সেখানে যায় না। লক্ষ্য করে দেখা গেছে, কোন আমবাগানে সকালে সমস্ত গাছে স্প্রে করার ফলে সন্ধ্যায় বাক্সের ভিতর সমস্ত মাছি মরে গেছে। কারণ হলো, কর্মী-মৌমাছিরা যখন ফুলের কাছে যায়, তখন কীটনাশক পদার্থের তীব্র গন্ধে প্রায় অবশ হয়ে ঐখানে মরে গাছতলায় পড়ে থাকে বা অর্ধমৃত অবস্থায় চাকে ফিরে এসে মরে পড়ে থাকে। এটি একটি বড় ধরণের প্রাকৃতিক সমস্যা, যার জন্য প্রাকৃতিক ভারসাম্যে (ecological balance) বিপর্যস্ত হতে পারে। মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে কীটনাশক দ্রব্যের ব্যবহারে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, মৌমাছি উপযুক্ত পরাগ সংযোগের দ্বারা শতকরা 15 ভাগ শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেয়।

(2) দ্বিতীয়তঃ ক্ষেতের ধারে, বাগানে বাক্স রাখার নিরাপত্তা দিনকে দিন কমছে। অভিজ্ঞ মৌপালক রবীন ভট্টাচার্যের মতে এটি বর্তমানে গুরুতর আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে এক কে.জি বাক্সের মধুর দাম 16 টাকা থেকে 2) টাকা পর্যন্ত। সারা বছর যত্ন করে সিজনের ঠিক যে সময়ে মধু সংগ্রহ করার অবস্থা আসে, তখনই একদল যুবক ছেলেরা (যারা এই সমাজেরই অধিবাসী) রাত্রে বাক্সের চাকের ক্ষতি করে মধু বের করে নিয়ে পালায়। বর্তমানে মধু চুরির হিড়িক এত বেড়েছে, যে, এই শিল্পকর্মে নিযুক্ত থাকাই এক সমস্যা। পুকুরে যেমন শত্রুতা করে কীটনাশক ওষুধ মেশানো হয়ে থাকে, তেমনি বাক্সের চাক বের করে জলে ডুবিয়ে মাছি মেরে মধু খাওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। এভাবে গ্রামবাসী যুবক সম্প্রদায় মৌপালকদের সর্বনাশ করলে, মৌমাছি পালনের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ও মধুর উৎপাদন দুই-ই বন্ধ হয়ে যাবে।

(3) মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে আর একটি বড় সমস্যা হলো প্রাকৃতিক পরিবেশে মৌচাকের ক্ষতি করা। অনেক সময়ই গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা আমগাছ, কাঁঠালগাছ প্রভৃতি ঝোপে জঙ্গলের চাক ক্ষতি করে। কিন্তু এদের চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতি করে তারাই যারা জঙ্গলে ঢুকে আগুন জ্বালিয়ে মাছি পুড়িয়ে চাক টিপে মধু নিষ্কাশন করে। এতে রাণী পুড়ে মারা পড়ে, ফলে মৌমাছির জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়। দ্বিতীয়তঃ চাক নষ্ট করাও ক্ষতিকর; কারণ ঐ মোম কোন কাজে লাগানো যায় না। প্রকৃতিতে এক জাতের আদিবাসী সম্প্রদায় (যাদের গ্রামে বুনো বলা হয়) জঙ্গল থেকে এই মধু সংগ্রহ করে বাজারে 5-6 টাকা কিলো দরে বিক্রী করে। অনেক সময় মধু ব্যাপারীরাও এদের শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করে। চাক টিপে যে মধু বের করা হয়, তা খাদ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ ঐ মধুর মধ্যে রাণীর ডিম লার্ভা শূককীট থেকে যায় এবং কিছুটা মোমও থাকে। এগুলি হজমের পক্ষে বাধার সৃষ্টি করে এবং এই মধু পনেরো দিন থেকে একমাসের মধ্যে গেঁজে (fermentation) গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। অথচ, আধুনিক বাক্সে মৌমাছি পালন করলে, সেই মধু [নিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে মধু বের করে এবং 135° ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপে বিশুদ্ধ করে নিয়ে] 5-10 বছর পর্যন্ত ভাল থাকে। বর্তমানে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার, যে যাতে কেউ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে চাক নষ্ট করে মধু সংগ্রহ না করে; কারণ এর ফলে প্রকৃতিতে মৌমাছি, বিশেষ করে রাণীর সংগ্রহ দুর্লভ হয়ে পড়বে এবং এর ফলে, মৌপালন শিল্পে বন্ধ্যাত্ব আসতে বাধ্য।

(4) বিদেশে মৌমাছি পালন একটি আধুনিক শিল্প হিসেবে পরিগণিত। এখানে বহুবিধ যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই শিল্প গড়ে উঠেছে। বর্তমানে মধুর

তুলনায় পরাগ, মৌমাছির হুলের বিষ এবং রয়াল জেলী—এগুলির সংগ্রহ অধিকতর মূল্যবান। অথচ দুঃখের বিষয়, যে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে এগুলির সংগ্রহের কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই গড়ে উঠে নি। উপরিউক্ত বিষয়গুলি ঔষধশিল্পে অতি মূল্যবান। এগুলির অর্থনৈতিক মূল্যও খুব বেশী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পরাগ, হুলের বিষ ও রয়াল জেলী সংগ্রহের কোন কার্যকরী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারে নি। এগুলির জন্য যে প্রায়োগিক গবেষণাকার্য হওয়া দরকার, তার আগ্রহও সরকারী মহলে বিরল। পুনার কেন্দ্রীয় মৌমাছি গবেষণা কার্যালয়ে এসব বিষয়ে অনুসন্ধান হয়ে থাকলেও, তা সম্পূর্ণ নয়। অথচ এই বিষয়ের গবেষণায় দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে মৌমাছি পালনের প্রধান বিষয়টি আজও অবহেলিত।

ভারতবর্ষে মধুর ব্যবহারের ঘটনা তিন হাজার বছরের পুরানো। অথচ, সারা পৃথিবীতে আমরাই এই বিষয়ে আজ সবচেয়ে পিছিয়ে। কারণ হলো, কোনও কাজকে ভালভাবে গ্রহণ না করে ব্যাগার মন নিয়ে লেগে থাকা। মুফতে কিছু পেতে আগ্রহ আমাদের সর্বাধিক, আর যে পরিশ্রমী হয়, তাকে আমরা সন্দেহের চোখে দেখি। এই হলো আমাদের বৈজ্ঞানিক মন। নিউজীল্যাণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশ যখন নতুন নতুন আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে মধু-মোমের উৎপাদন প্রতি বছরে দ্বিগুণ হারে বাড়ছে, সেখানে আমাদের দায়সারা মনোভাব কোনক্রমে এই শিল্পকর্মকে টিকিয়ে রেখেছে। বৈজ্ঞানিক সমাজও অত্যন্ত নিরুৎসাহী। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেয়ে চাকরী করাকেই বেশী পছন্দ করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির প্রতি নিষ্ঠা না বাড়াতে পারলে গ্রাম উন্নয়নে বিজ্ঞান ফাঁকাবুলীতে পর্যবসিত হতে বাধ্য।

[খাদি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ভরতুকীমূল্যে মৌপালকদের মধ্যে 100 বাক্স বিলি করেছে—গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনষ্টিটিউট।]

টেপির—বৃহদাকার স্তন্যপায়ী জীব। কতকটা শূকরের মত দেখতে। এদের লম্বা নাক হাতীর শুঁড়ের মত। এরা ঘাস, পাতা ও জলজ উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে টেপির দেখা যায়। এককালে এঁরা চীনেও বাস করত।

ভাষান্তর বিজ্ঞান

বিকিনিতে চতুর্থ পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর মাইকেল অ্যামরিনের সঙ্গে সাক্ষাতকারে আইনস্টাইন যে কথা বলেছিলেন 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় (4 জুলাই, 1946), প্রকাশিত হয়েছিল। 'দি স্টেটসম্যান'-এর শতবর্ষ উপলক্ষে (1975) প্রকাশিত '100 Years of The Statesman' গ্রন্থে আইনস্টাইনের সেই প্রবন্ধটি (My Answer To The Atomic Terror) পুনর্মুদ্রিত হয়। 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকার সৌজন্যে এই প্রবন্ধটির বাংলা অনুবাদ এখানে প্রকাশ করা হলো।

পারমাণবিক ভীতির প্রশ্নে আমার জবাব

মূল লেখক : অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

ভাষান্তর : যুগলকান্তি রায়

মানুষকে বাঁচতে হলে এবং আরও উন্নত হতে হলে নতুন চিন্তা ভাবনা দরকার বলে যে কথা আমি সম্প্রতি বলেছিলাম সে সম্পর্কে বহু মানুষ আগ্রহী হয়েছেন। বিবর্তনের ইতিহাসে এটা প্রায়ই দেখা গেছে যে, আত্মরক্ষার তাগিদে একটি প্রজাতি নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। জগৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণা আজ পারমাণবিক বোমা বদলে দিয়েছে। এর ফলে মানবজাতি যে নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে তার উপযোগী চিন্তা-ভাবনা তাকে করতেই হবে।

নতুন অভিজ্ঞতা থেকে এখন বলা যায় যে, ভ্রাতৃত্বের নামে একটি বিশ্বকর্তৃত্ব অর্থাৎ একটি বিশ্ব-সরকার এখন শুধু অভিপ্রেতই নয়, মানবজাতিকে রক্ষার জন্য তা অত্যন্ত প্রয়োজন।

পুরাকালে একটি জাতি ও তার সংস্কৃতিকে সৈন্যবাহিনী এবং জাতীয় প্রতিযোগিতার দ্বারা কিছুটা রক্ষা করা যেত। আজ প্রতিযোগিতা পরিহার করে সহযোগিতা অর্জন করতে হবে।

আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি পর্যালোচনার সময় একথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার। নচেৎ, আমরা নিশ্চিত বিপদের সম্মুখীন হব। অতীতের চিন্তা-ভাবনা দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করা যায় নি; ভবিষ্যতে তা করতেই হবে।

আধুনিক যুদ্ধে বোমা এবং অন্যান্য আবিষ্কার বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের উপস্থিত করেছে। সীমান্ত পারে সৈন্য না পাঠিয়ে কোন দেশের পক্ষে আর একটি দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করা আগে সম্ভব ছিল না। রকেট ও পারমাণবিক বোমা উদ্ভাবনের পর এখন আর পৃথিবীর কোন স্থানই নিরাপদ নয়। একটি মাত্র আকস্মিক আক্রমণে তা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

অস্ত্রসম্ভারে আমেরিকার সাময়িক প্রাধান্য থাকলেও এটা নিশ্চিত যে, সে কোন কিছুই চিরদিন গোপন রাখতে পারবে না। একদল মানুষ প্রকৃতির সম্পর্কে আজ যা জেনেছে, জানার আগ্রহ ও ধৈর্য থাকলে অন্য যে কোনও মানুষ সে কথা একদিন জানতে পারবে।

আমেরিকার সাময়িক প্রাধান্য আছে বলেই মানবজাতিকে সংকট থেকে রক্ষার দায়িত্ব তারই বেশী। আমেরিকানরা প্রযুক্তিবিদ্যায় নিপুণ;

তাঁরা মোটেই বিশ্বাস করেন না যে, পারমাণবিক বোমা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই।

কিন্তু মূল কথা এটাই; এমন কি বিজ্ঞানীরাও সেরকম কিছু বলতে পারছেন না যা থেকে আমরা যথাযথ প্রতিরক্ষার কোন আশা করতে পারি।

যুদ্ধবাজ মানুষেরা পুরানো চিন্তা আঁকড়ে রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের একটি সরকারী বিভাগ যুদ্ধের সময় মাটির নীচে চলে যাওয়ার কথা বলছেন এবং কলকারখানাগুলিকে বড় বড় গুহার মধ্যে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা ভাবছেন। অনেকে আবার (রোম্যান ক্যাথলিকদের গুপ্ত সমিতির ন্যায়) কোন 'গুপ্তনগরী'-তে লোকজনকে সরিয়ে নিতে চাইছেন।

মানুষের সংস্কৃতি কোন গুপ্ত শহরে বা ভূগর্ভে কোন রকমে বেঁচে থাকবে এমন এক ভবিষ্যতের কথা কোন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কিছুতেই ভাবতে পারছেন না। উপকূল বরাবর র‍্যাডারের সাহায্যে এক লক্ষ মানুষকে সতর্ক প্রহরায় রাখার প্রস্তাবেও কেউ আশ্বস্ত হতে পারছেন না।

ভি-2-র আক্রমণকে র‍্যাডার দিয়ে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা নেই। কয়েক বছর গবেষণার পর কোন 'প্রতিরোধ' ব্যবস্থা গড়ে উঠলেও এটা ঠিক যে, কোনও প্রতিরোধ ব্যবস্থাকেই নিখুঁত করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

পারমাণবিক অস্ত্রসহ কোন রকেট মিনিয়াপোলিশ শহরে আঘাত হানলে সেই শহরের অবস্থা নাগাসাকির মতই হবে বলতে পারি। রাইফেলের গুলিতে মানুষ মরে; পারমাণবিক বোমায় শহরের পর শহর ধ্বংস হয়। ট্যাংকের সাহায্যে বুলেট ঠেকানো যায়, কিন্তু যে অস্ত্রে সভ্যতা ধ্বংস হয় তাকে প্রতিরোধ করার কিছু নেই। অবস্থা এমন কি বিজ্ঞানও আমাদের রক্ষা করতে পারে না; কোথাও লুকিয়ে পড়েও আমরা পরিত্রাণ পাব না। যা আমাদের রক্ষা করতে পারে তা হলো নিয়ম ও শৃঙ্খলা। এখন থেকে প্রতিটি দেশের বৈদেশিক নীতি একটি প্রশ্নের উপর বিচার করা দরকার: এই নীতি পৃথিবীতে আইন-শৃঙ্খলা আনবে, না নৈরাজ্য ও ধ্বংস ডেকে আনবে?

একই সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তৈরি হব এবং বিশ্ব সমাজ গঠনেও প্রয়াসী হব এরকম কথা আমি বিশ্বাস করি না। আত্মনিধন করার অস্ত্র মানুষের হাতে যখন আছে তখন সেই অস্ত্রের ক্ষমতা বাড়ানোর মানেই বিপর্যয়কে আরও এগিয়ে নিয়ে আসা।

নারী, শিশুর বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব বিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করে জার্মানী যে যুদ্ধ শুরু করেছিল, আমেরিকার মহাশক্তিশালী অস্ত্রের একটি আঘাতে হাজার হাজার মানুষ নিহত হওয়ার পর সেই যুদ্ধ শেষ হল।

অন্যান্য দেশের বহু মানুষ আমেরিকাকে বেশ সন্দেহের চোখে দেখেন; ভয় শুধু বোমার নয়, তাঁরা ভয় করেন আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠবে।

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার মোড় নেওয়ার আগে পর্যন্ত আমিও ঐ ভয় থেকে একেবারে মুক্ত ছিলাম না। আমি প্রিন্সটনে আমেরিকানদের চিনেছি সৎ, বিনয়ী প্রতিবেশী হিসাবে। সেভাবে যাঁরা আমেরিকানদের দেখেন তাঁরা তাঁদের ভয় নাও করতে পারেন। কিন্তু, অন্য দেশের মানুষ এটা জানেন যে, জয়ের নেশায় একটি জাতি উন্মত্ত হতে পারে।

জার্মানী যদি 1870 সালের যুদ্ধে জয়লাভ না করত তাহলে মানবজাতি কি একটা সংকট থেকেই না রক্ষা পেত! আমরা এখনও বোমা, শুধু বোমাই তৈরি করে যাচ্ছি এবং তার সঙ্গে ঘৃণা, সন্দেহ বাড়িয়ে চলেছি। আমরা সব কিছু গোপন করে অবিশ্বাস সৃষ্টি করছি।

আমি বলছি না যে, বোমা তৈরির গোপন তথ্য এখনই সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু, আমরা কি এমন জগতের কথা সত্যিই ভাবি যেখানে কোন বোমার প্রয়োজন হবে না, কোন কিছু গোপন বলে থাকবে না, মানুষ যেখানে স্বাধীন থাকবে,

বিজ্ঞানের চর্চা হবে আপন গতিতে? একদিকে আমেরিকা ও রাশিয়া পরস্পরকে অবিশ্বাস করে চলছে, অপরদিকে আমরা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

পদ্ধতির আইনগত দিকের উপর বড় বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে। মানুষের কু-প্রবৃত্তিকে বদ্‌লানোর চেয়ে প্লুটোনিয়ামের প্রকৃতি বদ্‌লানো সহজ।

ভাল ফল পেতে হলে একমাত্র রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমেই আমাদের কাজ করতে হবে। কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারে রাশিয়ার ন্যায্য বক্তব্যকেও নস্যাৎ করার জন্য আমেরিকা রাষ্ট্রসংঘ ও তার নিয়ম-কানুনকে নিজের কাজে ব্যবহার করেছে।

অবশ্য কোন দেশ সব সময় ঠিক কাজ করবে বা সব সময় ভুল করবে এরকম আমি মনে করি না। কোন কিছু আলোচনার সময় তা স্পেন, আর্জেন্টিনা, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি দেশের সমস্যা নিয়েই হোক বা খাদ্য, পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কেই হোক এতদিন আমরা কতকগুলি প্রথার উপর নির্ভর করেছি এবং সামরিক শক্তির ভয় রেখে দিয়েছি। এর অর্থ, যে জগৎ চিরদিনের মত পরিবর্তন হয়ে গেছে সেখানে আমরা এখনও পুরানো পদ্ধতিই প্রয়োগ করছি।

লক্ষ লক্ষ মানুষ হতাশ হয়ে ইউ এন. ও-র উপর শেষ ভরসা রেখেছিলেন। ইউ এন ও যে তাঁদের আশা পূরণ করেছে সে কথা কেউ অস্বীকার করবেন না; কিন্তু বিজ্ঞান এবং যুদ্ধ যে সমস্ত সমস্যা সৃষ্টি করেছে সেগুলি সমাধানের সময় খুবই কম। রাজনীতিতে শক্তিশালী গোষ্ঠীরা দ্রুত সংকটের দিকে এগোচ্ছেন।

আমরা যখন বিগত যুদ্ধের কথা ভাবি তখন মনে হয় দশ মাস নয়, দশ বছর আগে যেন সেটা থেমে গেছে। সমস্ত পৃথিবীকে তদারকি করার জন্য বহু নেতা একটি কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ একটি বিশ্বসরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন। কিন্তু সেজন্যে যে পরিকল্পনা নেওয়া দরকার, যে কাজ করা দরকার, তা বেশ এগোচ্ছে না। তাই ভয়ও বাড়ছে।

মানুষ এটাই ভাবতে অভ্যস্ত যে, অস্ত্র একবার ব্যবহার হলে বারবার তা ব্যবহার হতে পারে। সেদিক থেকে আমেরিকা পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে খুবই ভুল করেছে বলব।

নিউ মেক্সিকোতে যে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল সেটা যদি অন্যান্য দেশকে দেখানো হতো তাহলে আমরা সেই ঘটনাকে নতুন বিষয়ে শিক্ষাদানের কাজে ব্যবহার করতে পারতাম। যুদ্ধকে চিরতরে বিদায় দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি, শৃঙ্খলা আনার কথা বলার সেটাই ছিল উপযুক্ত সময়।

এই বিপজ্জনক অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি তাহলে আরও বেশী গুরুত্ব পেত এবং কল্যাণের কাজে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের যে আবেদন আমরা জানাচ্ছি তার আন্তরিকতায় কারও মনে সন্দেহ থাকত না।

পুরানো চিন্তা-ভাবনা আঁকড়ে থাকার জন্যই এই সহজ সরল কথার বিরুদ্ধে হাজার রকমের আপত্তি তোলা হয়। কিন্তু এই ধরণের চিন্তার ফলেই মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। সমস্ত মানুষ পারমাণবিক যুদ্ধকে ভয় করেন। সকলেই আশা করেন এই নতুন শক্তি থেকে মানুষের কিছু ভাল হোক। মানুষের প্রকৃত আশা-আকাঙ্খা ও তার বিপদের মধ্যে সামরিক প্রতিরক্ষার কথা কি এখন অচল নয়?

যুদ্ধের সময় বহু মানুষ স্বাধীন চিন্তার অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের যা করতে বলা হতো শুধু তাই তাঁরা করতেন। আজ আগ্রহের অভাব হলে মারাত্মক ভুল হবে, কেন না, এই বিপদে এমন অনেক কাজ আছে যা সাধারণ মানুষ করতে পারেন। গণতান্ত্রিক দেশে সাধারণ মানুষের কথা সরকার শোনেন।

বোমার বিষয়ে শুধু পড়াশুনা করলে কিছু জানা যায় কিন্তু মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। প্রত্যেক মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ;

এমনকি বিজ্ঞানীরাও পারমাণবিক শক্তির ব্যাপারটা পুরোপুরি বোঝেন না। খুব কম লোকই এ পর্যন্ত পারমাণবিক বোমা দেখেছেন। কিন্তু কিছু তথ্য জানালে সকলেই বোমার ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং এটাও বোঝনে যে, যুদ্ধের ভয় আর নিছক কল্পনা নয়—তা খুব সামনেই। এর সঙ্গে সভ্য জগতের প্রতিটি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।

যুগ যুগ ধরে আমরা এর সমাধানের দায়-দায়িত্ব সৈন্যাধ্যক্ষ, সিনেটর এবং কূটনীতিকদের উপর ছেড়ে দিতে পারি না। সম্ভবতঃ আর পাঁচ বছরের মধ্যে বহু দেশ বোমা তৈরি করে ফেলবে ; তখন আর বিপদ ঠেকানোর সময় থাকবে না।

এখন মানুষের কথা বলার ও ভাবার সময় এসেছে। চুক্তিবদ্ধ করার জন্য আমরা অবশ্যই পারমাণবিক শক্তি কমিশনের মাধ্যমে কাজ শুরু করব ; কিন্তু ইউ. এন. ও.-র টেবিলে বসে কোন রাষ্ট্রই নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। নিউইয়র্ক, লণ্ডন প্যারিস বা মস্কোর প্রতিনিধিদের শেষপর্যন্ত তাঁদের গ্রামের মানুষের মতামতের উপর নির্ভর করতে হবে।

গ্রামের মানুষের কাছে পারমাণবিক শক্তির কথা আমাদের পৌছে দিতে হবে। সেখান থেকেই জনসাধারণের মতামত আসবে। এই বিশ্বাস নিয়েই পদার্থবিদ্‌রা আমেরিকাতে একটি জরুরী কমিটি গঠন করেছিলেন ; পারমাণবিক তথ্য সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির (National Committee on Atomic Information) মাধ্যমে সারা দেশ জুড়ে এই সব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই কমিটির উদ্দেশ্য।

আলাপ-আলোচনায় জনসাধারণের সঙ্গে ভাল সংযোগ থাকলেই বিশ্বসমাজ গঠনের বিস্তারিত পরিকল্পনা নেওয়া আরও সহজ হবে। তখন আমেরিকার প্রস্তাব শুধু একটা কাজ-চালানো দলিল বলে গণ্য হবে না, অন্যান্য সরকারের কাছে তখন এটি একটি সরকারের একঘেয়ে, নীরস বিবৃতি বলেও মনে হবে না। বরং মানবতার প্রতি একটি দেশের মানুষের আবেদন হিসাবে এটি চিহ্নিত হবে।

বিজ্ঞান এই বিপদ আনলেও মানুষের মনে, তার অন্তরেই সত্যিকার সমাধান রয়েছে। আমরা নিজেরা যদি সাহস করে কথা বলি, নিজেদের হৃদয় পরিবর্তন করি তবেই অপরের হৃদয় পরিবর্তন করা সম্ভব—কোন প্রযুক্তিবিদ্যায় সে কাজ হয় না।

(1) প্রকৃতির রহস্য আমাদের যা জানা আছে তা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে জানানোর মত উদার মানসিকতা আমাদের চাই। অবশ্য এর অপপ্রয়োগ কেউ যেন না করতে পারে সে ব্যাপারে আগেই ব্যবস্থা নিয়ে রাখতে হবে।

(2) পৃথিবীর নিরাপত্তার জন্য একটি কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণের শুধু ইচ্ছা থাকলেই চলবে না কার্যত আগ্রহীও হতে হবে।

(3) আমাদের এটা উপলব্ধি করতেই হবে যে, একই সঙ্গে যুদ্ধ এবং শান্তির জন্য কাজ করা যায় না।

যখন আমাদের মনে, আমাদের হৃদয়ে কোন আবিলতা থাকবে না শুধু তখনই আমরা সেই ভয়কে দূর করার সাহস পাব, যে ভয় সারা পৃথিবীকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

[শারদীয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' (1978)এ প্রকাশিত প্রবন্ধ 'বজ্রপাত-বজ্রপরিবাহী-বজ্রনাদ' সম্পর্কে গৌতম প্রামাণিকের কয়েকটি প্রশ্ন এবং লেখক কর্তৃক প্রশ্নগুলির উত্তর।]

প্রশ্ন 1. বজ্রপাতের পর আমরা শাঁক, ঘণ্টা বা বাদ্যযন্ত্র বাজাই কেন?

2. রক্ষণ-শঙ্কু বাড়ীতে তৈরি করার জন্যে কত খরচ পড়তে পারে?

3 মাইক্রো-অ্যাম্পিয়ার কাকে বলে?

4. মাইক্রো সেকেণ্ড কাকে বলে।

5. বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেওয়া কি সম্ভব?

উত্তর 1. কোথাও বজ্রপাত ঘটলে শঙ্খ, ঘণ্টা বা বাদ্যযন্ত্র বাজানোর পশ্চাতে কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে বলে মনে হয় না। এ-রকম করা হয় বলেও আমার জানা নেই। যদি বজ্রাঘাতে কেউ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে, তবে উচ্চ ধ্বনিতে তার জ্ঞান ফিরে আসা সম্ভব।

2. রক্ষণ-শঙ্কু অনুযায়ী বজ্রপরিবাহী স্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত জিনিসগুলি প্রয়োজন।

(ক) ভবনের ভূমির ক্ষেত্রফল অনুযায়ী $1\frac{1}{2}$ মিটারের মত দীর্ঘ এক বা একাধিক লোহার রড (ব্যাস—কম-বেশী 6 মি মি.);

(খ) ভবনের উচ্চতা অনুযায়ী লম্বা একটি তামা (ব্যাস 2-3 মিমি) বা লোহার (ব্যাস 5-8 মিমি.) তার;

(গ) মাটির নীচে জল পর্যন্ত দীর্ঘ তামা বা লোহার তার, পাত বা সরু রড (ব্যাস কম-বেশী 5 মিমি. হলেও চলবে। এ-রকম তারের রোধ 1 ওহ্‌ম্ থেকেও অনেক কম হবে)।

নীচের দিকে জল কাদার মধ্যে এই তার বা পাত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হবে যুক্ত থাকবে পাঁচ-সাতটি তামা, লোহা বা অ্যালুমিনিয়ামের চাকতির (ব্যাস কম-বেশী 15 সেমি) সঙ্গে। নিকটে নলকূপ বা জলের পাইপ থাকলে, নীচের দিকের তারটি সরাসরি তেমন ধাতব পাইপের সঙ্গেও যোগ করা চলবে।

এইসব ব্যবস্থার জন্য মোট মূল্য এক-শ' টাকার বেশী হবে না মনে হয় (মাত্র একটি ভবনের জন্য)।

3. এবং 4 মাইক্রো-অ্যাম্পিয়ার এবং মাইক্রো-সেকেণ্ড যথাক্রমে তড়িৎ-প্রবাহ এবং সময়ের অতি ক্ষুদ্র একক।

1 অ্যাম্পিয়ার = 10 লক্ষ মাইক্রো-অ্যাম্পিয়ার

1 সেকেণ্ড = 10 লক্ষ মাইক্রো-সেকেণ্ড।

5. রেডারের সাহায্যে বিদ্যুৎ-মেঘ থেকে বেতার তরঙ্গের প্রতিফলন ঘটিয়ে মেঘের মধ্যে জলবিন্দু, তুষার-ঝর্ণা প্রভৃতি গঠনের অবস্থা বুঝতে পারা যায়। আর তা থেকেই জানতে পারা যায় মেঘের তড়িতের অবস্থা, অর্থাৎ বজ্রপাতের লক্ষণ।

আকাশে মেঘের অবস্থা থেকেও বজ্রপাতের কিছুটা পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। সৃষ্টিকালে বিদ্যুৎ-মেঘ আকাশের একটা বিরাট অংশ জুড়ে ফুলকপির ধরণের একটা বিশাল মাথা তুলতে থাকে উপরের দিকে; রঙ থাকে অনেকটা সাদাটে। পরিণত বিদ্যুৎ-মেঘের রঙ দাঁড়ায় অনেকটা ধূসর-কালো; তখন এর ভূমি রেখা এবড়ো-খেবড়ো এবং ঈষৎ সবুজ দেখায়। পরিণত সুউচ্চ ধূসর-কালো মেঘের দিক থেকে ঠাণ্ডা-বাতাস আরম্ভ হবার কয়েক মিনিটের মধ্যে সুরু হয়ে যায় বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বৃষ্টি। ঠাণ্ডা বাতাস সুরু হলেই বজ্রাঘাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে, খোলা-জায়গা থেকে সরে গিয়ে (খোলা জায়গায় বজ্রাঘাতে মৃত্যুর হার শতকরা 52) উপযুক্ত আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন। বজ্রপাত সাধারণতঃ অপরাহ্নের দিকেই হয় বেশী।

গণেশ বিশ্বাস
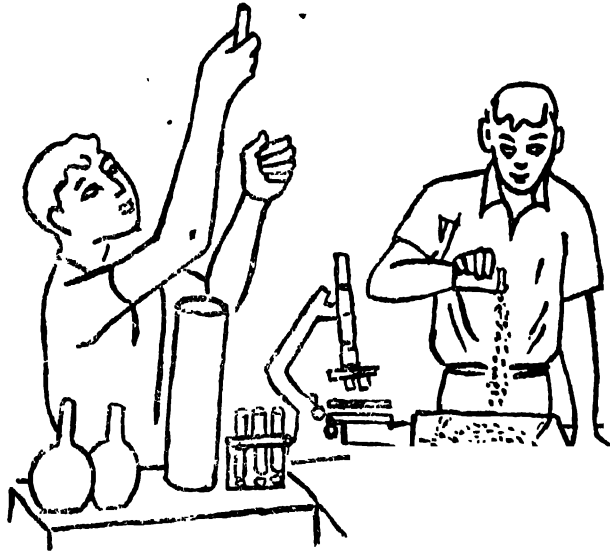
ভক্ষক ও ভক্ষ্য

সৌমেন দাস*

আমরা খাদ্য গ্রহণ না করে বাঁচার কথা চিন্তাই করতে পারি না। একবেলা উপোস করলেই ও বেলায় হাত-পা যেন চলতেই চায় না। অর্থাৎ কিনা, খাদ্যই আমাদের দেহ-কলের জ্বালানী। ব্যাপারটা ঠিক ইঞ্জিনে তেল পোরার মতই। তেল পুড়িয়ে প্রদীপ জ্বালানোর মতই খাদ্য পুড়িয়ে বা জারিত করে জীবনদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়। দেহের যন্ত্রগুলির কোনটি ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তা বেশীর ভাগ সময় দেহ-ই নতুন কোষ গঠন করে দরকারী জায়গাগুলি সারিয়ে নেয়। প্রয়োজনবোধে খাদ্য থেকে পাওয়া জিনিষপত্র দিয়ে দেহের বৃদ্ধিও ঘটায়। খাদ্য থেকে উৎপন্ন তাপ দিয়ে দেহকে এক বিশেষ তাপমাত্রায় রাখে এই দেহের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি। আবার বাইরের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য খাদ্যও বিশেষ অস্ত্র। সুতরাং আমাদের দেহের অস্তিত্ব রক্ষায় খাদ্য যে কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, তা প্রধানতঃ প্রোটিন, ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেটজাতীয়। এছাড়া ভিটামিন, বিভিন্ন ধাতব লবণ, এগুলিও আমাদের গৃহীত খাদ্যে থাকে,—যা দেহের বিভিন্ন

---

* বি. এস. মেডিক্যাল কলেজ, বাঁকুড়া।

কাজকর্ম চালাতে বিশেষ সাহায্য করে। আমাদের খাওয়া যে কোন রকম খাদ্য আমাদের পৌষ্টিক নালীতে এনজাইম দ্বারা সরলীকৃত হয়ে রক্তের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন স্থানে চলে যায়। আবার রক্তবাহিত অক্সিজেনই ঐ খাদ্যকে জারিত করে তাপশক্তি উৎপন্ন করে, যা আমাদের দেহের বিভিন্ন পেশীতে যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদন করে দেহের তাপমাত্রা ঠিক রাখে। কার্বনডাইঅক্সাইড আর জল সাধারণতঃ এই দহনের ফলে তৈরী হয়। কার্বোহাউড্রেট, ফ্যাটজাতীয় খাদ্যের সবটাই প্রায় এভাবে তাপশক্তিতে পরিণত হয়—কিন্তু প্রোটিনের কিছু অংশ শক্তি উৎপন্ন না করেই দেহের বাইরে চলে আসে। মূত্রের মধ্যে দিয়ে ইউরিয়াজাতীয় রাসায়নিক পদার্থের নিষ্কাশনে প্রোটিনের কিছু নাইট্রোজেন ঘটিত অংশ দেহের মধ্যে জারিত হয় না। এছাড়া, সব খাদ্যের সবটাই দেহের জ্বালানীর কাজ করে না, কারণ, খাদ্যকে সরলখণ্ডে ভাজককারী এনজাইম সবরকম খাদ্যকে ঠিক কারদা করতে পারে না—মানুষের ক্ষেত্রে 'সেলুলোজ' এজাতীয় কার্বোহাইড্রেট। এগুলি বর্জ্য পদার্থরূপে নিষ্কাশিত হয়।

আবার সব খাদ্যই দেহের ভিতরে একই রকম শক্তি উৎপাদন করে না, এদের কিছু অংশ দেহ গঠন আর রক্ষণের ভার নেয়। খাদ্য জ্বালানীর তাপ-শক্তি মাপা হয় যে এককে, তা হলো ক্যালোরি। এক গ্রাম জলকে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত করতে যে তাপ প্রয়োজন, তাই হলো ক্যালোরি। আর এই তাপের এক হাজার গুণ তাপকে বলা হয় কিলোক্যালোরি। খাদ্যের তাপ উৎপাদন ক্ষমতা মাপা হয় সাধারণত কিলোক্যালোরিতে। খাদ্যের তাপ-মূল্য মাপা হয় এক বিশেষ ধরণের তাপ মাপন যন্ত্রে বা ক্যালোরিমিটারে। নির্দিষ্ট ওজনের খাদ্যকে অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত করে উৎপাদিত শক্তির মাত্রা নির্ণয় করা হয়। কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাটজাতীয় খাদ্য (যেমন, চিনি এবং তেল) দেহের মধ্যে জারিত হলে যে তাপ দেবে, বাইরে পোড়ালেও সেই তাপ দেবে। তাই আবদ্ধ ক্যালোরিমিটারের ভিতরে তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে নির্দিষ্ট ওজনের খাদ্য জারিত করে তাপ উৎপাদন করা হয়, যা ঐ ক্যালোরিমিটার সংলগ্ন বিশেষভাবে বায়ুশূন্য দেয়ালযুক্ত পাত্রের জলকে উত্তপ্ত করে। আর ঐ জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি দেখেই বলা যায় কত ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয়েছে—সেই বিশেষ খাদ্য থেকে। দেখা গেছে যে, আমাদের খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাটজাতীয় খাদ্যেই দেহের তাপ উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে সক্রিয়, তাই এগুলি জ্বালানী খাদ্য। দেহগঠন এবং পুষ্টির কাজ করে প্রোটিনজাতীয় খাদ্য, অন্যান্য খাবারের সঙ্গেই। আঠারো রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে প্রোটিন গঠিত। যে প্রোটিনে এই আঠারোটি অ্যামিনো অ্যাসিড নেই, সেগুলি অসম্পূর্ণ প্রোটিন নামে অভিহিত। আর এটাই একমাত্র খাদ্য যা দেহকে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। প্রোটিন দেহের মধ্যে তাদের গঠনের অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়, যেগুলি পরে নিজেদের মধ্যে স্থান বদল করে নতুন দরকারী প্রোটিন তৈরি করে নেয় বৃদ্ধি ও রক্ষার জন্য। এ যেন পুরানো বাড়ী ভেঙে তার ইট দিয়ে নতুন বাড়ী তৈরি। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ওজনের 20 শতাংশই প্রোটিনের। তবে দেহের কলার ক্ষতিপূরণ ও বৃদ্ধির পরও অতিরিক্ত প্রোটিন গৃহীত হলে তা জ্বালানীর কাজই করবে, আর প্রোটিনের তাপ উৎপাদক ক্ষমতা অন্যান্য যে কোন খাদ্যের চেয়ে অনেক বেশী। কেউ অনশন শুরু করলে সঞ্চিত কমদামী জ্বালানী কার্বোহাইড্রেট আগে জারিত

হবে, তারপর সঞ্চিত ফ্যাট আর শেষে জরুরী দরকার পড়লে দিনে হাজার ভাগের পাঁচ ভাগের মত প্রোটিন তাপ রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকবে।

কি পরিমাণ কাজ করলে কি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তা-ও পরিমাপ করা হয়েছে। একজন লোক একটি বিশেষ কক্ষে সাইকেলের উপর চড়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করেন। তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশেষ খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়। ঐ কক্ষকে ঘিরে নল দিয়ে জলপ্রবাহ চালানো হয়। কক্ষের মধ্যে লোকটি কর্তৃক উৎপাদিত তাপ ঐ জল দিয়ে বাহিত হয় এবং তা পরিমাপ করা হয়। বলা বাহুল্য যে, ঐ কক্ষটির দেয়াল বিশেষ উপায়ে তাপ-নিরুদ্ধ থাকে—যাতে উৎপন্ন তাপ নষ্ট না হয়।

আর এই ভাবেই তাপশক্তি খরচের হার হিসেব করে দেখা গেছে যে, সব মানুষের তাপশক্তি খরচের পরিমাণ এক নয়। কারো কম শক্তি হলেও চলে যায়, কারও বা বেশী তাপশক্তি প্রয়োজন। যাঁরা বেশী পরিমাণ দৈহিক পরিশ্রম করেন, তাঁদের দরকার বেশী। সবচেয়ে কম দরকার এক বছরের নীচের বাচ্চাদের—দিনে মাত্র 600 ক্যালোরি তাপশক্তি ব্যয় করে তারা। সাধারণ বালক-বালিকাদের প্রয়োজন দিনে 1700 থেকে 2000 ক্যালোরি। মহিলাদের সাধারণত দিনে 2700 ক্যালোরি শক্তির প্রয়োজন—বেশী পরিশ্রমীদের ক্ষেত্রে তা দাঁড়ায় 3300 ক্যালোরিতে। আর অধিক কায়িক পরিশ্রমী ব্যক্তিদের দিনে খরচ হয় প্রায় 4000 ক্যালোরি যা সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে দাঁড়ায় 33000 ক্যালোরিতে।

কেবল প্রয়োজনীয় তাপই দেহকে চালাতে পারে না—তার রক্ষণাবেক্ষণ আর বৃদ্ধির জন্য কিছু লবণ জাতীয় পদার্থও অতি প্রয়োজনীয়, যদিও স্বল্পমাত্রায়। লোহা, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার, সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনিসিয়াম, আয়োডিন এই জাতীয় 'খনিজ' পদার্থ। এদের অভাবে রক্তশূন্যতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, হার্টের দোষ ইত্যাদি গুরুতর অসুস্থতা দেখা দিতে পারে।

তাছাড়াও 'ভিটামিন' নামের এক জাতীয় পদার্থেরও দরকার আমাদের শরীর ঠিক রাখার জন্যে। কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন এবং প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থকে দেহের গ্রহণীয় অবস্থায় আনার জন্য এরাও দায়ী। ভিটামিন 'এ', 'বি', 'সি', 'ডি', 'ই' 'কে'—এগুলিই দেহের জন্যে মোটামুটি প্রয়োজন। রাতকানা রোগ, ওজনহ্রাস, মস্তিষ্কের গোলযোগ, স্কার্ভি, বেরিবেরি, ডায়াবেটিস, জণ্ডিস এইসব গুরুতর রোগই ঐ অল্পমাত্রার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রকমের ভিটামিনের অভাবে হতে পারে। কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট স্বয়ংচালিত শরীরের জ্বালানী, প্রোটিন ও লবণজাতীয় খাদ্য ঐ যানের যন্ত্রাংশ হলে ভিটামিনকে তার 'লুব্রিকেটিং' তেলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

আমাদের খাদ্য তালিকায় কোন্ খাদ্য থেকে দেহ কি পরিমাণ শক্তি অর্জন করে তা-ও দেখা গেছে। প্রাতঃরাশের কোকোমল্ট ½ কাপ, জমানো মিষ্টি দুধ 2 চামচ, দুধ ⅝ কাপ, বিস্কুট 2টি,

কেক 1 টুক্‌রো, রুটি 2 টুক্‌রো, চিনি বা গুড় 2 চামচ, সর $1\frac{2}{3}$ চামচ, 1 চামচ মাখন ইত্যাদির প্রত্যেকটি থেকে 100 ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায়। আর প্রাতঃরাশটি ভালই হয় এসব দিয়ে। তেমনি ঐ শক্তি পাওয়া যায় $1\frac{1}{2}$ চামচ মধু, 1টি আপেল, 1টি কলা, একটুক্‌রো আনারস, 1টি কমলা বা 1 কাপ রস, 40টি আঙুর, 3টি লেবু, 4টি টম্যাটোর প্রত্যেকটি থেকে। মধ্যাহ্নভোজের ভাত 2 চামচ, 1 চামচ ডাল (রান্না করা), রান্না আলু 1টি, রান্না বরবটি 2 চামচ, ডিম $1\frac{1}{3}$টি, সাধারণ পরিবেশনের মাছ, কম পরিবেশনের মাংস 4টি পেঁয়াজ, 1টি বিট্, 2টি গাজর, 1 চামচ টম্যাটোর চাট্‌নী, পায়েস $\frac{1}{3}$ কাপ, আইসক্রীম $\frac{1}{4}$ কাপ—এসবই 100 কালোরি করে শক্তি যোগায়।

আর এগুলির মধ্যে সবুজ তরিতরকারী, ফল, মাছ, মাংসতে ভিটামিন এ, আটার রুটি, কলা, শস্যখাদ্য, মাছজাতীয় খাদ্যে 'বি' ভিটামিন, কাঁচা ফল ইত্যাদিতে ভিটামিন 'সি', তেল, ঘি, দুধ এসব থেকে ভিটামিন 'ডি', উদ্ভিজ্জ তেল, দুধ ইত্যাদি থেকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন 'ই' পাওয়া যায়।

এইসব খাদ্য থেকে প্রয়োজনমত প্রত্যেকের খাদ্যসম্ভার তৈরি করে নেয়া উচিত। কম খাদ্য মূল্যের খাবার গ্রহণ যেমন অনুচিত, তেমনি অনুচিত অতিবেশী খাদ্য গ্রহণও। শক্তির ঘাট্‌তি হলে দেহযন্ত্র সাধারণভাবে চলবে না ; বৃদ্ধির বদলে ক্ষয়ই হবে। শক্তি উদ্বৃত্ত হতে থাকলে তা' আবার অহেতুক মেদ হিসেবে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমে দৃষ্টিকটু ব্যাপার ঘটাতে ছাড়বে না। অবশ্য এটা কিছুটা শরীরের গঠনের উপরও নির্ভর করে।

আর আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খাদ্যসম্ভারেরও পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের খাদ্যের বেশীর ভাগই পূরণ করা হয় শর্করাজাতীয় কার্বোহাইড্রেট, প্রাণীজ ফ্যাট এবং প্রোটিন দিয়ে। কিন্তু এ সবই আমাদের 'দেহরক্ষা'র কারণ হতে পারে। খাদ্যের শতকরা 40 ভাগ শর্করা, 40 ভাগ সম্পৃক্ত প্রাণীজ চর্বি গৃহীত হলে তা রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়, হার্টের রোগকে ত্বরান্বিত করে, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার ঘটায়। এগুলি রক্তের মধ্যে কোলেস্টরলের মাত্রা বাড়ায়, কিড্‌নীতে অতিরিক্ত আম্লিকতা ঘটায়, দেহের বিভিন্ন অবাঞ্ছিত চর্বি জমা করে, আর খাদ্যে অসারবস্তু না থাকায় কোষ্ঠকাঠিন্য বাড়ায়—যা এসব রোগের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তাই কম শর্করা, কম মাংস, কম প্রাণীজ চর্বি, কম প্রাণীজ প্রোটিন গ্রহণ করে কাঁচা ফল, তরকারী, উদ্ভিজ্জ তৈল, শাঁসযুক্ত খাদ্য, উদ্ভিজ্জ প্রোটিন বেশী গ্রহণ করা উচিত। আর এসব খাদ্য বাইরে থেকে অতিরিক্ত ভিটামিন খাবার প্রয়োজন রোধ করে, যাতে বেশী ভিটামিনঘটিত মূত্রাশয়ের রোগ, স্নায়ু, হাড়ের রোগ, কিড্‌নীর, খাদ্যনালীর রোগ থেকে দেহযন্ত্র রক্ষা পায়। পরিমাণমত খাদ্য নির্বাচনের উপরই শরীরের গঠন নির্ভর করছে—এটা বলাই বাহুল্য।

গ্রামীণ শল্যচিকিৎসা

অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায়

আকুপাংচার বা সূচ-চিকিৎসা পদ্ধতি চিকিৎসা জগতে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। এই পদ্ধতিটা কিন্তু মোটেই নূতন নয়। তবে এই পদ্ধতির স্রষ্টা ভারত না চীন, সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে এই চিকিৎসা পদ্ধতির স্রষ্টা যে প্রাচ্য, সে বিষয়ে সকলেই একমত। প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অনেক আগে আকুপাংচার পদ্ধতি শুধু সূচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সূচ ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। শতকরা পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ অসুখের ক্ষেত্রেই ইলেকট্রনিক যন্ত্র প্রয়োগ করা হয়।

রোগ একাঙ্গিক নয়, রোগ সর্বদৈহিক। এই রোগসমূহের কারণ বিবিধ। তবে প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদিকগণ বায়ু, পিত্ত, কফ—এই তিনটি বস্তুর অসমতাকেই রোগের মূল কারণ বলে অভিহিত করেছেন। আর এই রোগ নিরাময়ে আকুপাংচার এক আশ্চর্য পদ্ধতি। মানুষের শরীরে আকুপাংচারের প্রধান কাজ হলো স্নায়ুতন্ত্রকে ঠিক মত কাজ করতে সহায়তা করা এবং প্রতিটি কোষের সজীবতা রক্ষা করা। রোগের কারণ সম্বন্ধে ভারত, চীন, তিব্বত, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতের মিল দেখা যায়। বর্তমানে চীনেই আকুপাংচার পদ্ধতি অধিক প্রচলিত। চৈনিক বিশেষজ্ঞদের মতে দেহের মধ্যে যে চোদ্দটি মেরিডিয়ান আছে তার বারোটিই জল, মাটি, ধাতু, কাঠ, আগুন—এই পাঁচটি পদার্থের মধ্যে বর্তমান। কিন্তু তাঁদের মনে এই ধারণা যে সময় এসেছিল তার কয়েক-শ' বছর আগেই বৌদ্ধেরা এই তথ্য অনুধাবন করেছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে এর প্রমাণ আছে। এমন কি প্রায় দু-হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দেও ভারতে এই পদ্ধতি যে প্রচলিত ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায় চীনা শাস্ত্রে।

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় "ছাড়ি তোলা" বলে এক রকমের চিকিৎসা পদ্ধতি চালু আছে। রোগ নির্ণয় এবং রোগ নিরাময়ের—এই পদ্ধতি সাধারণতঃ আদিবাসী এবং তপশীলী জাতির মধ্যেই প্রয়োগ করতে দেখা যায়। পদ্ধতিটি এক অদ্ভুত রকমের। সাধারণতঃ বারোমেসে জ্বর সারাবার জন্যে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। যেমন: (1) ঘুষঘুষে জ্বর, (2) নিদ্রাহীনতা, (3) গ্যাসসাইট্রিস, (4) হাঁপানী, (5) বাত, (6) নপুংসকতা, (7) নিউরালজিয়া প্রভৃতি। পদ্ধতিটা হলো এরূপ—যার (স্ত্রী বা পুরুষ) শরীর খারাপ হয়েছে বা দীর্ঘদিন ধরে রোগ ভোগ করছে তার পিঠের দিকে যেখানে মেরুদণ্ড আছে, সেই মেরুদণ্ডের মাঝামাঝি অঞ্চলটা বেছে নেওয়া হয়। তারপর ঘাড়ের ঠিক নীচ থেকে মেরুদণ্ডের বাঁ-দিক ঘেঁসে চাপ দিয়ে টেনে এনে ঐ মাঝামাঝি অঞ্চলে চাপ ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যেখানে চাপ ছেড়ে দেওয়া হলো সেখানে জোরে টোকা দেওয়া হয়। ফলে ঐ

স্থানটি সুপারির মত ফুলে ওঠে। একই ভাবে মেরুদণ্ডের ডান দিক ঘেঁসে ঘাড়ের নীচে থেকে চাপ টেনে এনে ঐ মাঝামাঝি অঞ্চলটিতে মেরুদণ্ডের ডান দিকে আর একটি টোকা দেওয়া হয় এবং ঐ স্থানটিও সুপারীর মত ফুলে-ওঠে। এভাবে দুটি ফুলে-ওঠা স্থান দেখা যায়। টোকা দেওয়া সত্ত্বেও যার পিঠের ঐ স্থানগুলি ফুলে না ওঠে, তার ঐ "ছাড়ি তোলা" পদ্ধতিতে রোগ সারবে না বলে ধরে নেওয়া হয়। তারপর ঐ ফুলে-ওঠা স্থান দুটির উপরের দিকে একটি করে মোট দুটি, নীচের দিকে অনুরূপে মোট দুটি ওই ফুলে-ওঠা স্থান দুটির উপর একটি করে মোট দুটি এবং মাঝখানে মেরুদণ্ডের উপর একটি অর্থাৎ মোট সাতটি প্রলেপ দেওয়া হয়। প্রলেপগুলি গোলাকার। এই প্রলেপ আর কিছুই না। গুলচিত্র (গুলচিত্তির) বলে এক রকমের গাছ আছে সেই গাছের পাতা বেটে বা হাতে করে চট্‌কে নিয়ে এই প্রলেপগুলি দেওয়া হয়। এই গাছগুলি এমনই যে এর পাতা বা কাণ্ডের রস যেখানে লাগবে (বিশেষতঃ মানুষের শরীরের নরম স্থানে) সেখানেই ফোস্কা তুলে দেবে। তারপর ঐ সাতটি স্থানে ঘা হয়ে যায় এবং কিছুদিন পরে ঘা শুকিয়ে যায়। ক্রমশঃ রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে।

এটিও আকুপাংচার পদ্ধতিরই একটা বিশেষ প্রকৃতি, কারণ ছাড়ি তোলা হয় মেরুদণ্ডের ঠিক দু-পাশে। আর মেরুদণ্ডের ভিতরকার ফাঁকের মধ্য দিয়েই সুষুম্নাস্নায়ু প্রবাহিত, আবার আকুপাংচার পদ্ধতির প্রধান কাজ হলো স্নায়ুতন্ত্রকে ঠিকমত কাজ করতে সাহায্য করা। মানুষের করোটি মেরুদণ্ডের যে অংশের উপর অবস্থিত, তার ঠিক নীচের অংশটিকেই অ্যানাটমিতে বলে অ্যাটলাস। চীনা আকুপাংচার পদ্ধতি থেকে জানা যায় যে এই অ্যাটলাসে দুটি সুচ বসিয়ে দিতে পারলেই যে কোন মানুষ পাগল হয়ে যায়। এই অ্যাটলাস নামক স্থানটি বেশীর ভাগ চিকিৎসকই খুঁজে পান না বাইরে থেকে। এই স্থানেই স্নায়ু অতি সক্রিয়, তাই অনুভূতিকে এরই পাশাপাশি স্থান থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয় ছাড়ি তোলার সময়। অনেকের ধারণা যে স্থান দুটি ফুলে ওঠে সেগুলি শিরা, কিন্তু ওগুলি পেশী। যখন গুলচিত্র পাতার প্রলেপ দেওয়া হয় তখন ঐ সাতটি স্থানেই ফোস্কা পড়ে এবং ঘা হয়। তারপর ঐ পেশীগুলির রক্তজালকের রক্তের মধ্যস্থিত জীবাণুকে মেরে ফেলে ঐ পাতায় অবস্থিত রাসায়নিক পদার্থ। ভেষজবিদ্যায় গুলচিত্র পাতার অবদান অপরিসীম। স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে এই ছাড়িতোলা পদ্ধতির যদি বিশেষ যোগ না থাকত তাহলে শরীরের যে কোন স্থানেই ছাড়ি তোলা সম্ভব হতো। কিন্তু তা সম্ভব নয়, তাই কেবল মেরুদণ্ডের দু-পাশেই ছাড়ি তোলা হয়। আর একমাত্র মেরুদণ্ডের অবস্থিতি দেখেই বাইরে থেকে শরীরের ভিতরে স্নায়ুর সঠিক অবস্থান বোঝা সম্ভব, কারণ মেরুদণ্ডের ফাঁকের মধ্য দিয়েই সুষুম্নাস্নায়ু প্রবাহিত, যদিও এই ছাড়িতোলা পদ্ধতিতে সুচ ব্যবহার করা হয় না। তবুও এর সঙ্গে আকুপাংচার পদ্ধতির কিছুটা যোগ আছে বলে মনে হয়।

তাছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলা, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, রাজস্থান, জম্মু, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলে আকুপাংচার ধরনের পদ্ধতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। তবে এ সকল পদ্ধতিও অতি প্রাচীন।

সপ্তবর্ণা

অমিলেন্দু চক্রবর্তী*

পিতৃদেব সূর্য বললেন পৃথিবীকে—'সৃষ্টির উৎসবে
আমার ভাণ্ডার উজাড় করে নিয়ে যাও যত পার রঙ্।'
গন্ধরাজ-মালতী-যূথী বৃক্ষলতা অমনি সাতরঙে মাখামাখি
হাসতে লাগল আলোক-শুভ্র।
লতানো-কলমী আর ভোর সোহাগী বললে আহা,
দেখলাম না শুধু বেগুনী আলোটি কেমন।'
রঙ্সায়রে ডুব দিয়ে অপরাজিতা বললে—
'খুঁজে পেলাম না নীলার মত নীলটুকু।'
জল থেকে মাথা তুলেই বলে উঠল কুমুদ—'আহা,
কবে হব আমি আকাশ-নীল।'
লতাপাতার ভিড় থেকে বলল কাঁঠালীচাঁপা '—ভেবেছিলাম
রঙের উৎসবে সবুজ সুরভি হব।'
অতসী আর কলকে বললে—'সবই তো হল,
আমাদের গায়ে হলুদের ছোঁয়া লাগলো না শুধু।'
সূর্যপ্রিয়া হলেও এমন যে সূর্যমুখী—তারও
সাধ শুধু কমলা-সাজের।
করবী আর জবা বললে—'বড়ো সাধ ছিল
সৃষ্টির উৎসবে হৃৎপিণ্ডের মতো রাঙা হব।'
পিতৃদেব সপ্তবর্ণ সূর্য তখন বললেন—'তথাস্তু!
তোমাদের সবাইএর আকাঙ্খা প্রকাশ হউক বর্ণে'
বিশ্বসৃষ্টিতে বনানী অমনি হেসে উঠল
বিচিত্র আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতায় রঙীন দলগুলি—
মেলে দিল আকাঙ্ক্ষিত বর্ণের পর্ণে।

---

* সিটি কলেজ, কলিকাতা-700009

আলোর প্রতিসরণের ধাঁধা
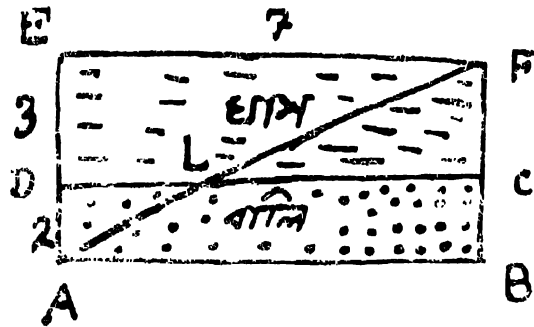
সদাশিব বাবু যাবেন A থেকে F-এ। ছবির মত প্রথমে 2 মাইল চওড়া, 7 মাইল লম্বা বালির মাঠ ABCD; তারপর 3 মাইল চওড়া, 7 মাইল লম্বা ঘাসে ভরা মাঠ DGFE। বালির উপর দিয়ে যেতে ঘাসের উপর দিয়ে যাওয়ার দ্বিগুণ সময় লাগে। সোজা A থেকে F-এ যেতে সময় কিন্তু বেশী লাগবে। কেননা, AF-এর দূরত্ব মোটামুটি 8·6 মাইল। এর মধ্যে পাঁচভাগের দু-ভাগ বালির পথ। অর্থাৎ, 3·44 মাইল রাস্তা (AL) বালির, আর 5·16 মাইল রাস্তা (LF) ঘাসের। বালির রাস্তায় যেতে ঘাসের রাস্তার দ্বিগুণ সময় লাগে। তার মানে 3·44 মাইল বালির রাস্তা 6·88 মাইল ঘাসের রাস্তার সমান। সুতরাং, ALF পথ ধরে তাঁকে মোট 12·04 মাইল ঘাসের রাস্তা অতিক্রম করতে হবে। এর থেকে ADF পথ ধরে গেলে তাঁর আরও কম সময় লাগবে। কেননা,

AD + DF = 2 মাইল বালির রাস্তা
+
7·61 মাইল ঘাসের রাস্তা
= 4 মাইল ঘাসের রাস্তা
+
7·61 মাইল ঘাসের রাস্তা
= 11·61 মাইল ঘাসের রাস্তা

কিন্তু, এর থেকেও আগে সদাশিববাবু F-এ হাজির হয়েছিলেন। তিনি কোন্ পথে গেছলেন?

[ধাঁধা পত্রিকার সৌজন্যে]

ভেবে কর

অনন্তকুমার খাটা*

সঠিক উত্তরটির পাশে ✓ চিহ্ন বসাতে হবে :—

1. "Desent of Man". "The variation of Animals and plants under Domestication". "The origin of species"—গ্রন্থগুলির রচয়িতা হলেন—
(অ) বিজ্ঞানী লিনীয়াস, (আ) গ্রেগর যোহান মেণ্ডেল, (ই) ডারউইন।

2. ব্যাক্‌টিরিয়া কোষের বিভাজন হয় সাধারণতঃ—
(অ) প্রস্থ বরাবর, (আ) দৈর্ঘ্য বরাবর, (ই) কোন বিভাজন হয় না।

3. মানুষের রক্তের লোহিত কণিকাস্থ নিউক্লিয়াসের সংখ্যা—
(অ) এক, (আ) একাধিক, (ই) শূন্য।

4. আধুনিক জীববিদ্যার জনক ও প্রাচীন গ্রীক প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হলেন—
(অ) অ্যারিস্টটল, (আ) আলবার্ট আইনস্টাইন, (ই) চার্লস ডারউইন।

5. সবচেয়ে আদিম (প্রাচীন) মানুষের নাম দেওয়া হয়েছে—
(অ) হোমোইরেকটাস (Homo erectus), (আ) পিতেকানত্রোপাস ইরেকটাস (Pithecanthropus erectus), (ই) নিয়ানডারথালেনসিস (Neanderthalensis)।

6. খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম—এমন একটি প্রাণীর নাম হলো—
(অ) অ্যাসকারিস, (আ) ইউগ্লিনা, (ই) মনোসিস্‌টিস।

7. শ্বেত-তন্তুকণা (white fibrous tissue)-র তন্তুগুলি প্রধানতঃ—
(অ) কোলাজেন (collagen), (আ) ইলাসটিন (elastin), (ই) কনড্রোমিউকয়েড (chondromucoid) নামক প্রোটিন দ্বারা গঠিত।

8. যে সকল যৌগের আণবিক সংকেত এক (অভিন্ন); কিন্তু আণবিক গঠন ও ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন তাদেরকে বলা হয়—
(অ) আইসোবারস্‌ (isobars), (আ) আইসোটোপস্‌ (isotopes), (ই) আইসোমার (isomer)।

9. উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রতিরোধক একটি হর্মোনের নাম—
(অ) ক্যালোক্যালিন (caulocaline), (আ) ডরমিন, (ই) অক্সিন।

10. ম্যাগনেশিয়ামের একটি যৌগের নাম—
(অ) ক্যালামাইন, (আ) কার্নেলাইট, (ই) ক্রায়োলাইট।

---

*15/1 ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা-70006

11. রক্তকণিকার সংখ্যা গণনার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রবিশেষের নাম—

(অ) হিমোগ্লোবিনোমিটার, (আ) হিমোসাইটোমিটার, (ই) হিমাটোক্রিট।

12. ট্র্যাক্টর আবিষ্কার করেন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী—

(অ) কোল্ট, (আ) হাল্ট, (ই) হোল্ট।

13. "$_{92}U^{238}$ থেকে" "$_{82}Pb^{206}$" পেতে হলে যথাক্রমে—

(অ) 6টি আলফা কণা (α-part.), ও 8টি বিটা কণা (β-part.), (আ) 8টি আলফা কণা, ও 6টি বিটা কণা, (ই) 6টি আলফা কণা 4টি বিটা কণা নির্গত হতে হবে।

14. W∝E.c.t. সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করেন বিজ্ঞানী—

(অ) কুলম্ব, (আ) ফ্যারোডে, (ই) ভোল্ট।

15. ভুট্টার বৈজ্ঞানিক নাম হলো।

(অ) Zea mays (linu), (আ) Mangifera indica, (ই) Oryza satioa (linu).

(সমাধান 162 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মডেল তৈরি

সুনীল বিশ্বাস* ও বেলা সেন

জলীয় প্রাস (Water-projectile) পদ্ধতিতে 'g' (অভিকর্ষজ ত্বরণ)-এর মান নির্ণয়

গতিবিদ্যার নিয়ম থেকে এটা প্রমাণিত যে শূন্যস্থানে কোন প্রাসের গতিপথ অধিবৃত্ত (parabola)। বায়ুর বাধাকে অগ্রাহ্য করলে অনুরূপভাবে কোন নির্গম-নল থেকে বেরিয়ে আসা জলের ধারা প্রাসের পথ অবলম্বন করে মাটিতে এসে পড়ে। এই গতিপথে গতিবিদ্যার সূত্র প্রয়োগ করে আমরা 'g'-এর মান নির্ণয় করতে পারি। নিম্নে পদ্ধতির কথা চিত্রসহ আলোচনা করা হলো।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ :—
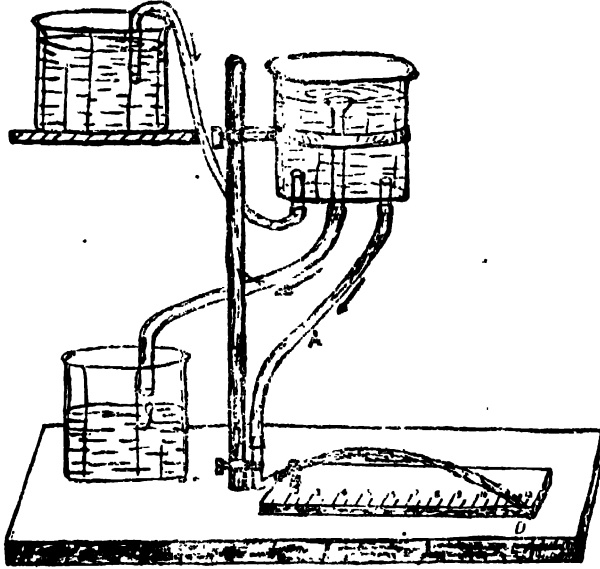
(1) 50″ লম্বা তিনটি রবারের নল।
(পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত সাধারণ নল)

(2) একটি কাঠের স্ট্যান্ড (36″ লম্বা)

(3) 60° কোণে বাঁকানো কাচনল (1)

(4) 6″ উচ্চতা এবং 4″ ব্যাসের একটি টিনের কৌটা এবং এর তলায় চিত্র অনুযায়ী ঝালাই করা তিনটি টিনের নল।

(5) কাঠের সাধারণ স্কেল (1)

(6) 3′×6′×2″ মাপের একটি কাঠের প্লাটফর্ম,

গঠন এবং পদ্ধতি : কাঠের স্ট্যান্ডটিকে প্লাটফর্মের উপর আটকিয়ে এর নিম্নপ্রান্তে কাচ-নলটিকে খাড়াভাবে আটকাতে হবে, ফলে নলের বাঁকানো অংশটি ভূমির সঙ্গে 30° কোণ সৃষ্টি করে। নলের শেষপ্রান্ত থেকে কাঠের স্কেলটিকে অনুভূমিকভাবে আটকাতে হবে। এখন রবারের তিনটি নলকে

* গোবরডাঙ্গা রেনেশাঁস ইনস্টিটিউট, পোঃ খাঁটুরা, 24 পরগণা।

স্ট্যান্ডের সঙ্গে আটকানো কৌটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নলগুলির সঙ্গে আটকাতে হবে এবং তাদের শেষ প্রান্তগুলি যথাক্রমে জলের ট্যাঙ্ক, জলের পাত্র ও কাচনলের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। কৌটার মধ্যে, টিনের নল তিনটিকে চিত্র অনুযায়ী আটকানোর অর্থ জলের চাপকে সর্বদা সমান রাখা। A নল দিয়ে জল কাচনলে প্রবেশ করে এবং প্রাসের আকারে স্কেলের উপর পড়তে থাকে। জলের এই অশান্ত গতি (streamline motion) থেকে 'g'-এর মান নির্ণয় করা যায়।

মনে করি জল-প্রবাহ স্কেলের উপর B বিন্দু থেকে R (horizontal range) দূরত্বে D বিন্দুতে পড়ে। নলটি ভূমির সঙ্গে α (angle of projection) কোণ এবং B বিন্দুতে জলের প্রাথমিক বেগ u হলে গতিবিদ্যার সূত্র থেকে লেখা যায়।

$$g=\frac{u^2 \sin 2\alpha}{R} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(i)$$

প্রাথমিক বেগ (u) নির্ণয় ঃ—

যদি কাচনলের ব্যাসার্ধ r এবং প্রতি সেকেণ্ডে নলের মুখ থেকে Q আয়তনের জল নির্গত হয় তাহলে লেখা যায়,

$$Q=\pi r^2 u$$

$$\text{বা}\quad u=\frac{Q}{\pi r^2}$$

Q নির্ণয় পদ্ধতি ঃ—স্টপ্ ওয়াচ-এর সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সংগৃহীত জলের ভরকে ঐ নির্দিষ্ট সময় ও ঘনত্ব দ্বারা ভাগ করলে Q পাওয়া যায়।

(i)নং সমীকরণ থেকে লেখা যায়,

$$g=\frac{Q^2 \sin 2\alpha}{\pi^2 r^4 R}$$

R-এর মান স্কেল থেকে পাওয়া যায়।

গতিবিদ্যার অন্য একটি সূত্র থেকেও 'g'-এর মান নির্ণয় করা যায়।

ভূমি থেকে প্রাসের গতিপথের কোন অংশের সর্বাধিক উচ্চতা H হলে লেখা যায়,

$$H=\frac{u^2 \sin^2\alpha}{2g}$$

$$\text{বা}\quad g=\frac{u^2 \sin^2\alpha}{2H}$$

H সহজেই পরিমাপ করা যায়।

'ভেবে কর'র সমাধান

1. (ই), 2. (অ), 3. (ই), 4. (অ), 5. (আ), 6. (আ), 7. (অ), 8. (ই), 9. (আ), 10. (অ), 11. (আ), 12. (ই), 13. (আ), 14. (আ), 15. (আ)।

বিজ্ঞান প্রসার পরিচিতি

আইনস্টাইন শতবর্ষ

(1)

গত 13ই এবং 14ই ফেব্রুয়ারি, বারাসাত গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুলে আইনস্টাইন জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে দু-দিনব্যাপী একটি সেমিনার ও বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের বিজ্ঞান প্রদর্শনীটিতে অংশগ্রহণ করেন নেহেরু যুব সংস্থা এবং স্থানীয় ও আমন্ত্রিত নানা জায়গার নানা বিজ্ঞান ক্লাব। প্রায় দুই শতাধিক বিজ্ঞানের মডেল —বিষয় বৈচিত্র্যে ও উপস্থাপনার মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে, সকলের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে। আইনস্টাইনের নানা চিত্র, এবং আইনস্টাইন স্মারকে প্রকাশিত একটি স্মারক পত্রিকাও বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। সেমিনারে আমন্ত্রিত বক্তাদের মধ্যে ছিলেন—দ্বিতীয় দিনের সেমিনারে বিশেষ আমন্ত্রিত রূপে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা 'আইনস্টাইন—বিজ্ঞানী ও মানুষ' এই শীর্ষকে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। গান্ধী মেমোরিয়াল বিদ্যায়তনের সেক্রেটারী অধ্যাপক অমূল্যভূষণ গুপ্ত একটি ভাষণে প্রদর্শনী ও আইনস্টাইন জন্মশতবর্ষ উদযাপনের সার্থকতা আলোচনা করেন।

(2)

বিড়লা ইনডাসট্রিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের উদ্যোগে পক্ষব্যাপী একটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক কর্মসূচীর মাধ্যমে আইনস্টাইন শতবর্ষ উদযাপিত হয়। প্রদর্শনী, নানা আলোচনা ও চলচ্চিত্র মাধ্যমে আইনস্টাইনের জীবন ও কর্মের নানা দিক তুলে ধরে, জনসাধারণের কাছে, এই মহান বিজ্ঞানীকে যে ভাবে তুলে ধরেছিলেন মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ—তাতে তাঁরা অকুণ্ঠ প্রশংসা ও ধন্যবাদ অর্জন করেছেন। এ জাতীয় অনুষ্ঠান, এ দেশে বিজ্ঞান প্রসারের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বারান্তরে, এঁদের কর্মসূচী বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

(3)

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিট্যুটের উদ্যোগে আইনস্টাইন শতবর্ষ স্মারকে একটি ধারাবাহিক আইনস্টাইন বিষয়ক আলোচনামালার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচীতে 21শে ফেব্রুয়ারি 1979, প্রথম দিনের বক্তৃতার উদ্বোধন করেন, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা "সাধারণ মানুষের কাছে আইনস্টাইন" এই বক্তব্যের উপর, অধ্যাপক সেনশর্মার আলোচনাটি বিশেষ আদৃত হয়।

তৃতীয় রাজ্য শিল্প-বিজ্ঞান শিবির

সম্প্রতি বেহালার ড্রাগ্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের প্রাঙ্গণে, দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব্ বেঙ্গল ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তরের যুগ্ম সহযোগিতায় তৃতীয় রাজ্য শিল্প ও বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই প্রদর্শনী 9, 10, 11ই মার্চ, তিনদিন চলে। শিল্প-বিজ্ঞানমেলার শুভ উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ মন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস। দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব্ বেঙ্গলের পক্ষ থেকে ভাষণ দেন, সংস্থার সম্পাদক শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী। 11ই মার্চ, বাৎসরিক বিজ্ঞান অধিবেশনের উদ্বোধন করেন, রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পমন্ত্রী শ্রীচিত্তব্রত মজুমদার। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ডঃ দ্বিজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজ্ঞানকে কিভাবে সর্বসাধারণের কাছে উপস্থিত করা যায়, শিশুদের কাছে বিজ্ঞানকে কিভাবে তুলে ধরতে হবে, এই বিষয়ে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন শ্রীসুনীত রায়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে, তপন মিত্র, নিত্যগোপাল মাঝি ও যুগ্মভাবে দেবাশীষ চ্যাটার্জী এবং ইন্দ্রজিত রায়।

এই বিজ্ঞান মেলায়, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেকনিকের ছাত্র অশোক ঘোষের থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশন মডেলটি প্রথম স্থান অধিকার করে।

পুস্তক পরিচয়

সুনীলকুমার সিংহ*

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ—লেখক মণি বাগচি, প্রকাশক গোপালচন্দ্র বল, শৈব্যা পুস্তকালয়, 8/1 সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-700 073, পৃষ্ঠা সংখ্যা 60, দাম চার টাকা।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের জীবন ও সাধনার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় বইটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু যেভাবে গৃহীত হয়েছিলেন, লেখক শ্রীমণি বাগচি তাঁর বিশিষ্ট রচনাশৈলীর মাধ্যমে জনমানসে প্রতিভাত সেই চিত্রটি সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু শুধু বিজ্ঞানী নন, তিনি সাহিত্য, সংগীত এবং সাধারণভাবে মানব-সংস্কৃতির সর্ববিষয়েই বিশেষভাবে আগ্রহশীল ছিলেন। সর্বক্ষেত্রেই যে-জীবনদর্শন তাঁর কথা ও কাজকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তা হলো তাঁর মানবতা-বোধ। মানুষের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ যে সব চর্চায় প্রতিহত হয় তিনি তা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন। আলোচ্য বইটিতে সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাল্যকাল, তাঁর যৌবনের স্বপ্ন ও কর্মধারা এবং বার্ধক্য এই মহাজীবনের পরিণতির কথা অল্পকথায় চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে বর্ণিত হয়েছে। বইটি পাঠক সমাজে গৃহীত হলে এবং এর বহুল প্রচারে আমরা আনন্দিত হব।

সুলিখিত এবং মূল্যবান এই বইটির, আশা করা যায়, আরও সংস্করণ হবে। ভবিষ্যত সংস্করণে বর্তমান বইটির কতকগুলি স্থানে পরিবর্তন প্রয়োজন। আইনষ্টাইন প্রসঙ্গে লেখকের কতকগুলি মন্তব্য, যথা, 18 পৃঃ 25/26 লাইন, 19 পৃঃ 6/7 এবং 16/17 লাইন, এবং 20 পৃঃ 9/10 লাইন, কিছুটা অতিভাষণ এবং তথ্যগত ত্রুটিযুক্ত। 24 পৃঃ 20 লাইনের মন্তব্যটিও একটি অতিভাষণ। 37 পৃঃ 12/13 লাইনের এবং 25 পৃঃ 19 লাইনের মন্তব্য দুটি ভুল।

1921 সালে ঢাকা যাওয়ার প্রাক্কালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে সত্যেন্দ্রনাথ বসু যে মূলতঃ বিদেশযাত্রার সম্ভাবনার কথা ভেবেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে দেন, সেকথার উল্লেখ বোধহয় প্রয়োজন। আলোচ্য বইটিতে তৎকালীন সামাজিক পটভূমিকার আলোচনা নেই। হয়তো, এই অল্পপরিসরে লেখকের পক্ষে সে আলোচনার সূত্রপাত করা সম্ভব হয় নি। আমরা আশা করবো, পরবর্তী সংস্করণে বইটির কলেবর কিছু বাড়িয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ব্যক্তিচরিত্রকে তৎকালীন সামাজিক পটভূমিকার আলোকে লেখক আলোকিত করে তুলবেন।

পরিশেষে, পরিচ্ছন্ন এবং সুখপাঠ্য এই বইটি লেখার জন্য লেখক শ্রীমণি বাগচিকে, এবং সুন্দর ছাপা ও মনোরম প্রচ্ছদপটের জন্য প্রকাশককে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

*সাহা ইনস্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স কলিকাতা-700009

পরিষদ সংবাদ

সত্যেন্দ্র ভবনের নবনির্মিত ত্রিতলের দ্বারোদ্ঘাটন ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন

গত 2রা মার্চ (1979) সত্যেন্দ্র ভবনের নবনির্মিত ত্রিতলের দ্বারোদ্ঘাটন এবং ধাঁধা পত্রিকার উদ্যোগে ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ। উক্ত সভায় কর্মসচিব ডঃ রতনমোহন খাঁ শ্রীঘোষ, শ্রীমতী ঘোষ ও উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার করতে এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষকে বিজ্ঞান সচেতন করে তুলতে পরিষদের কাজে সবার সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করেন। পরিষদ সভাপতি ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা গত কয়েক মাসে পরিষদের বিভিন্ন কাজকর্ম ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন কাজের প্রকল্পগুলির বিবরণ দেন এবং পরিষদকে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করতে সরকারী বেসরকারী সবরকম সাহায্যের আবেদন জানান। বন্যাক্লিষ্ট জনগণের সাহায্যের জন্যে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে নগদ 501 টাকা পরিষদের তরফ থেকে পরিষদ সভাপতি ডঃ সেনশর্মা শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষের হাতে প্রদান করেন।

অমরেন্দ্র বসু স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী তিনজনকে পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী ঘোষ।

সভাপতির ভাষণে শ্রীঘোষ পরিষদের বিভিন্ন কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন প্রকল্পগুলির রূপায়ণে সরকারী সাহায্যের অভাব হবে না বলে আশ্বাস দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন কেবল সরকারী সাহায্যে কোন প্রতিষ্ঠান চলে না, মহৎ উদ্দেশ্য ও শুভ প্রচেষ্টাই এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের চলার পথের পাথেয়। উপস্থিত সভ্যদের হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে ত্রিতলের দ্বারোদ্ঘাটন ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অধ্যাপক ঘোষ। নবনির্মিত ত্রিতলের নামকরণ করা হয় 'নীরেন রায় হল'। সভার শেষে ধন্যবাদ দেন শ্রীসর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আইনস্টাইন শতবর্ষিকী উপলক্ষে জনপ্রিয় বক্তৃতা

14ই মার্চ (197) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে "সত্যেন্দ্র ভবনে" আইনস্টাইন শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি" শীর্ষক জনপ্রিয় বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। বক্তৃতাটি প্রদান করেন অধ্যাপক হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা।

সভার প্রারম্ভে পরিষদের কর্মসচিব অধ্যাপক রতনমোহন খাঁ সকলকে স্বাগত জানান। অধ্যাপক হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় বিজ্ঞান বক্তৃতার পর, যুগলকান্তি রায় ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়—'আইনস্টাইন ও আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানকর্ম' সম্পর্কে ভাষণ দেন। সভাপতি 'আইনস্টাইন বিজ্ঞানী ও মানুষ' শীর্ষক আলোচনায়, আইনস্টাইনের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

পরিষদ-বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে আগামী জুন '79 মাস থেকে প্রতি শনিবার বিকাল 4টায় 'সত্যেন্দ্র ভবনে', (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006) "ওরিগামি শিক্ষার ক্লাশ" সুরু হবে। সর্বসাধারণই এই ক্লাশে যোগদান করতে পারবেন। ওরিগামি, শেখাবেন শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ইণ্ডিয়ান অরিগ্যামিষ্ট)। বিশদ বিবরণের জন্য পরিষদ দপ্তরে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সমগ্র বাংলা রচনাবলী প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে। জনসাধারণের নিকট আমাদের অনুরোধ—তাঁদের কাছে সত্যেন্দ্রনাথের কোন বাংলা রচনাবলী (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত) থাকলে তা পরিষদ কার্যালয়ে জুন মাসের (1979) মধ্যে পাঠালে উপযুক্ত স্বীকৃতিসহ রচনা সংকলনে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

অভূতপূর্ব লোড-সেডিং-এর জন্য ছাপাখানার কাজ প্রায়শই বন্ধ থাকায়—আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও—পত্রিকার প্রকাশন যথা সময়ে করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

অমূল্যধন দেব স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা (প্রথম বর্ষ)

বিষয়: "স্বয়ং নির্ভর ক্ষুদ্র শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ"

প্রবন্ধ দাখিলের শেষ তারিখ—30শে জুন '1979

পুরস্কার:—প্রথম পুরস্কার—150.00 টাকা (নগদে)

দ্বিতীয় পুরস্কার—100.00 টাকা (নগদে)

বিঃ দ্রঃ (ক) প্রবন্ধ অনধিক 2000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। (খ) প্রবন্ধ ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিস্কারভাবে লিখে পাঠাতে হবে।

(গ) যোগদানকারীগণের বয়স অনধিক একুশ বৎসর হতে হবে। (ঘ) প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানা কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006)

(ঙ) প্রবন্ধ নির্বাচন বিষয়ে পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং প্রবন্ধগুলি পরিষদ কর্তৃক প্রয়োজনবোধে প্রকাশ করবার অধিকার থাকবে।

প্রকাশন সচিব—রতনমোহন খাঁ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা। আজীবন সদস্য চাঁদা 200 টাকা। যদি কেউ পরপর পাঁচ বৎসর সাধারণ সদস্য থাকেন তবে তিনি 150 টাকা দিলে আজীবন সদস্য হতে পারবেন।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি "আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং"-এ 'ডাকযোগে' পাঠানো হয়; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোস্ট অফিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। টাকা, চেক ইত্যাদি কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে পাঠাবেন না। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করিবেন।
6. কলিকাতার বাইরের কোন চেক প্রেরণ করলে গ্রহণ করা হবে না।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্যবিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। কিশোর বিজ্ঞানীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা: প্রকাশনা সচিব, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন: 55-0660.
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন. প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে 2-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রকাশনা সচিব
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

JNAN-O-BIJNAN   Regd. No. C 3684 (G.P.O. Calcutta)   March, 1979

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে প্রকৃত জনকল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য পরিষদের বর্তমান

কর্মসমিতি একান্তই সচেষ্ট, সেই বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাকে সফল করতে

হলে সকলের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা চাই এই উদ্দেশ্যে

পরিষদের সদস্যবৃন্দ দেশের বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞানকর্মী, বিজ্ঞান

সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজসেবা সংগঠন, সমাজ ও

রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং জনসাধারণের কাছে

আমাদের আবেদন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

প্রতিষ্ঠিত এই মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের

উন্নতি ও প্রসারকল্পে সকলে আজ

একভাবে এগিয়ে আসুন

সাহায্য করুন ও পরামর্শ

দিন

অফসেট মুদ্রণ —নীলাচল প্রেস কলিকাতা-700 00৮   মূল্য—1·50 টাকা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 4, এপ্রিল, 1979

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাত্রিংশত্তম বর্ষ | এপ্রিল, 1979 | চতুর্থ সংখ্যা

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বন্য প্রাণী

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

একদা মরিসাস দ্বীপে প্রচুর ডোডো-পাখি বিচরণ করতো। নিরীহ এই পাখি ছিল পায়রার স্বগোত্র। ইউরোপের নাবিকরা সেখানে পদার্পণ করে দেখল, এই মাংস খুব সুস্বাদু। এরা উড়তে পারত না, তাই সহজেই ধরা পড়তো। এমনি করে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই শেষ পাখিটিও নিহত হলো। আধুনিক সভ্যতা নিয়ে যতই গর্ব করি না কেন, আমরা কি একটি ডোডো-পাখি সৃষ্টি করতে পারবো?

একটি হিসেবে দেখা যায়, 1940 সালে ভারতে মোট বাঘের সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার, কিন্তু 1969 সালে এই সংখ্যা নেমে আসে মাত্র আড়াই হাজারে। প্রাচীনকালে ভারতের অনেক অরণ্যেই সিংহ পাওয়া যেত, কিন্তু এখন গুটি কয়েক কোন প্রকারে টিকে আছে শুধু গির অরণ্যে। তেমনি সামান্য কয়েকটি গণ্ডারের দেখা মেলে শুধু জলদাপাড়া এবং কাজিরাঙ্গার অভয়ারণ্যে। আবার, প্রাচীন সাহিত্যে এমন অনেক পাখির বর্ণনা আছে, যেগুলি এখন আর চোখেই পড়ে না।

তাই অনেকেরই জিজ্ঞাসা,—'বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, হাতী প্রভৃতি প্রাণীগুলিও কি একে একে এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে?' বাস্তবিক, এইসব প্রাণী এবং এই রকম আরও শত শত প্রাণী একেবারে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রহর গুণছে।

এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী কিন্তু মানুষ নিজেই। সত্যি, প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বাভাবিকতায় কী নিদারুণ হস্তক্ষেপ করছে মানুষ, প্রতিনিয়ত। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ

ক্রমাগত বন কেটে বসত গড়ে তুলছে, যেখানে-সেখানে ড্যাম বা জলাধার নির্মাণ করছে, গজদন্ত, শিং, মাংস, চামড়া, ফার প্রভৃতির লোভে নির্বিচারে বন্যপ্রাণী হত্যা করছে, চাষবাসের জন্যে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার করে কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করছে, আর যেখানে-সেখানে কল-কারখানা স্থাপন করে মাটি, জল ও বাতাসকে ক্রমাগত কলুষিত করছে। এসবের কুফল হয়তো এখনই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এর ফল হচ্ছে সুদূরপ্রসারী।

প্রকৃতির ভারসাম্য যেন এক সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছে! একটু এদিক-ওদিক হলেই সর্বনাশ। তখন এমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যাতে মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে।

এখন একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে, প্রকৃতির ভৌত পরিবেশ, উদ্ভিদ এবং প্রাণী পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। সেজন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ, উদ্ভিদ এবং বন্য প্রাণী সংরক্ষণে আরও বেশী তৎপর হওয়া দরকার।

সম্প্রতি কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে বিখ্যাত পক্ষিতত্ত্ববিদ্ ডঃ সেলিম আলি সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন,--কেরলের জল বিদ্যুৎ-প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে বিখ্যাত 'সাইলেন্ট ভ্যালি' বা 'নীরব উপত্যকা'র বিস্তীর্ণ অঞ্চল চিরকালের মতো জলপ্লাবিত হয়ে যাবে। এর ফলে সেখানকার একটি বিরাট এলাকার গাছপালা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। কী সাংঘাতিক কথা!

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গুজরাটের কান্দলা বন্দরের নির্মাণ-প্রকল্পের ফলশ্রুতি রূপে ভীত ও সন্ত্রস্ত ফ্লেমিংগো বা কানঠুটিয়া পাখির বিরাট উপনিবেশ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আরও একটি সমস্যার দিকে ডঃ আলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গত কয়েক বছরে ইঁদুর, ছুঁচো, কাঠবিড়ালী, খরগোস প্রভৃতি তীক্ষ্ণদন্ত-প্রাণী বা রোডেন্টদের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। এরা মাটি খুঁড়ে মরুভূমিকে বাড়িয়ে তোলায় সাহায্য করছে। হাজার হাজার মণ ধান-গম এবং আরও নানারকম ফসল খেয়ে নষ্ট করছে। এদের সংখ্যা এতো বাড়লো কেন? আগে প্রিডেটররা অর্থাৎ শিকারী প্রাণীরা (যেমন—প্যাঁচা, বাজপাখি, ঈগল প্রভৃতি) এদের অনেক খেয়ে ফেলতো। কিন্তু এখন ঐসব শিকারী প্রাণীদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। কারণ, ওরা তো গৃহস্থের শত্রু, হাঁস-মুরগি ধরে নিয়ে যায়। তাই ওদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। শুধু তাই নয়, লোকালয়ের কাছাকাছি যেসব অরণ্যে ওরা বাস করতো, সেগুলি কেটে সাফ করা হচ্ছে। ওরা থাকবে কোথায়?

সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—এক জোড়া মেঠো ইঁদুরের সকল সন্তান-সন্ততি যদি অবাধে বংশ-বিস্তার করার সুযোগ পেত, তাহলে এক বৎসরের মধ্যেই তাদের সংখ্যা দাঁড়াতো প্রায় দশ লক্ষ। আর এই বিরাট ইঁদুর বাহিনীর জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন হতো প্রায় বারো লক্ষ টন। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে ঐ সব শিকারী প্রাণীরও কত প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে Sportsmen's Organizations'-এর একটি বুলেটিনে বলা হয়েছে—There is more in the predator-prey relationship than meets the eye. Dame Nature fitted them for their role and she is a wise old Dame and knows what she is doing. Don't forget that you, Mr. Man, are the greatest predator of them all, and a wanton destroyer if ever there was one.

বাঘ, সিংহ, কুমীর প্রভৃতি প্রাণীর বেলায়ও এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য।

হাতীর সংখ্যাও কিন্তু এখন অনেক কমে গেছে। এর কারণ কি? হাতীর বাসস্থান হলো নিবিড় অরণ্য। বিজ্ঞানীরা বলেন, অরণ্যে হাতী থাকলে বুঝতে হবে যে, সেই অরণ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। দুঃখের বিষয়, নির্বিচারে বন-জঙ্গল কেটে সাফ করা হচ্ছে। হাতীরা আর আগের মতো খাবার পাচ্ছে না। তাই তারা মাঝে মাঝে লোকালয়ে গিয়ে হানা দিচ্ছে, ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে তছনছ করছে, খেতের ফসল খেয়ে ফেলছে। ক্ষতির পরিমাণ তো নেহাৎ কম নয়! এজন্য হিংসায় উন্মত্ত মানুষ ঐসব হাতীকে হত্যার সঙ্কল্প নিয়ে হন্যে হয়ে ঘুরছে। এতে হাতীর সংখ্যা দিন দিন কমছে। হয়তো আরও কমবে।

অনেকেই বলেন, ভারতে যে বাঘের সংখ্যা এতো হ্রাস পেয়েছে, তার একটি বড় কারণ হলো, অরণ্যে বাঘের খাদ্য-প্রাণীর একান্ত অভাব। নিতান্ত ক্ষুধার তাড়নায়ই বাধ্য হয়ে বাঘ লোকালয়ে এসে হানা দেয়, গরু-বাছুর নিয়ে পালায়। আর এজন্যই তারা অনেক সময় মানুষের শিকার হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই বন্য প্রাণী সংরক্ষণের সমস্যাটি বিশেষভাবে চিন্তনীয়। সংরক্ষকের প্রধান চিন্তার বিষয়, বনের বিশেষ বিশেষ পশু ও পাখিকে সমূহ বিলুপ্তির সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা।

কিন্তু অনেকেই হয়তো বলবেন, এইসব হিংস্র শিকারী প্রাণীদের, অর্থাৎ প্রিডেটরদের, রক্ষা করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। কারণ, এরা তো মানুষের চির-শত্রু। এদের তো মেরে ফেলাই উচিত। তাদের সব সময় মনে রাখা দরকার যে, বন্য প্রাণী সংরক্ষণের পরিকল্পনা প্রধানতঃ চারটি স্তম্ভের উপরে দাঁড়িয়ে আছে; যেমন—

1. **নৈতিক (Ethical)**—আমাদের সামনে দুটি পথই খোলা আছে—কোন একটি প্রজাতিকে আমরা সমূলে বিনাশ করতে পারি, নতুবা সমূহ বিনাশ থেকে তাদের রক্ষা করতে পারি। কোন্ পথ আমরা বেছে নেব?

2. **সৌন্দর্য-বিজ্ঞানসম্মত (Aesthetical)**—প্রাকৃতিক পরিবেশে বন্য প্রাণী দর্শন করে অপার আনন্দ উপভোগ করা যায়। এসব দৃশ্য যেমন সুন্দর, তেমনি রোমাঞ্চকর। এবিষয়ে কারও মনে কোন রকম সন্দেহ থাকলে, তিনি একটু লক্ষ্য করে দেখবেন, বন্য প্রাণী সংক্রান্ত টেলিভিশনের বা সিনেমার প্রোগ্রাম ছোট-বড় সকলের কাছেই কত জনপ্রিয়, এবং সেগুলি কত দর্শক আকর্ষণ করে।

3. **বৈজ্ঞানিক (Scientific)**—জীব-বিজ্ঞান অনুশীলনে, বন্য প্রাণীই হলো সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান। ব্যাপক অনুসন্ধানের আগেই এদের নিশ্চিহ্ন হতে দেওয়ার মতো মূর্খতা আর কিছুই নেই।

4. **অর্থনৈতিক (Economical)**— প্রতিটি অভয়ারণ্যেরই এক বিশেষ আকর্ষণ আছে। একটু সচেষ্ট হলেই সেসব জায়গায় অনেক পর্যটক আকর্ষণ করা যায়, এবং তাতে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, মাংস, চামড়া বা ফার আহরণের উদ্দেশ্যে উদ্বৃত্ত পশু-পাখিগুলিকে অনায়াসে ছাঁটাই করে ফেলা যায়। তবে সে সময় লক্ষ্য রাখা দরকার, যাতে প্রকৃতির ভারসাম্য কোন প্রকারে বিনষ্ট না হয়। সবকিছু সুপরিকল্পিতভাবে করতে পারলে, চাহিদা অনুযায়ী মাংস, চামড়া কিংবা ফার সরবরাহ করার কোন সমস্যাই আর থাকবে না। উপরন্তু সমগ্র পরিকল্পনাটি লাভজনক হয়ে উঠবে।

ভরসার কথা এই যে, বন্য প্রাণী সংরক্ষণের ব্যাপারে এখন অনেকেই অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এইটুকুই তো যথেষ্ট নয়। এজন্য সুষ্ঠু ও ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন। প্রথমে একটি বিরাট এলাকা নিয়ে গাছপালা, ঝোপঝাড় লতাগুল্ম লাগিয়ে এমন কৃত্রিম অরণ্যের সৃষ্টি করতে হবে, যা হুবহু প্রাকৃতিক অরণ্যের মতো না হলেও তার কাছাকাছি যেন হয়। তাহলে প্রকৃতির ভার-

সাম্য বজায় থাকবে, এবং পশুপাখি, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সব পরস্পরের উপর নির্ভর করে সেখানে বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে। খাদ্য-খাদক সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে দেখতে হবে, কারও যাতে খাদ্যাভাব না হয়। তারপর দেখতে হবে, কোন্ প্রাণীর উপরে পরিবেশের প্রভাব কেমন হচ্ছে। তাদের সংখ্যা বাড়ছে, না কমছে, না অপরিবর্তিত থাকছে, সে-সব দেখার জন্যে অবিরাম গবেষণা চালাতে হবে। আর তারই উপরে নির্ভর করে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন অবশ্যই করতে হবে।

দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে এই সব পশু-পাখির জীবন রক্ষার ব্যাপারে সতত সচেতন থাকেন, এটাকে তাদের এক নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন, সেটাও আমাদের দেখতে হবে। এর একমাত্র উপায় হলো, এবিষয়ে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া, এবং জীব-বিজ্ঞান সম্পর্কে সকলকে আরও আগ্রহী করে তোলা।

আর একটি কথা। স্বল্প বেতনভুক্ অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত কর্মচারীদের উপরে এই সব অভয়া-রণ্য পাহারা দেওয়ার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না। কারণ, একটি বন্য প্রাণীর বিনিময়ে কয়েক হাজার টাকার প্রলোভন জয় করা যার-তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এজন্যে দরকার হবে উপযুক্তভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত এমন সব কর্মী, যারা বন্য প্রাণী সংরক্ষণের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক অব-হিত—যাদের কখনও উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করা যাবে না, আর যাদের জ্ঞাতসারে কখনই বন্যপ্রাণী সংহার করা সম্ভবপর হবে না।

চোরা শিকারী অবৈধ সংহার-ক্রিয়া গোপনে সেরে যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আর অপরাধী ধরা পড়লে, তার যাতে কঠোর সাজা হয়, তাও সকলকে দেখতে হবে। এজন্যে প্রয়োজন হলে আইনের শাসন আরও কঠোর করতে হবে। তবেই এরূপ পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হবে, নতুবা নয়।

1964 সালে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে সমীক্ষা চালিয়ে যে তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে তা হলো—(1) গণ্ডার—72, (2) গৌর—14, (3) বাঘ—2, (4) হাতী—2, (5) সম্বর—20, (6) বারসিঙ্গা—4, (7) চিতল—11, (8) গয়াল—6টি।

পৃথিবী

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

পৃথিবী যে গোলাকার, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীদের এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না; এমন কি, পৃথিবী কত বড়, তাহারও একটা মোটামুটি মাপ তাঁহাদের জানা ছিল। একালের মাপ তার চেয়ে সূক্ষ্ম। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গোলাকার পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দূরত্ব প্রায় 4000 মাইল। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের 4000 মাইল নিম্নে পৃথিবীর কেন্দ্র বর্ত্তমান; পৃথিবীর পরিধি প্রায় 25000 মাইল অর্থাৎ রেলওয়ে গাড়ী ঘণ্টায় 25 মাইল বেগে একটানা চলিতে পারিলে 1000 ঘণ্টায় অর্থাৎ প্রায় 42 অহোরাত্র কাল অবিরাম চলিলে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পারিবে।

পৃথিবীর মত বৃহৎ বর্ত্তুলটার বস্তুপরিমাণ আপাততঃ বাতুলের প্রলাপ মনে হইতে পারে। তুলদাঁড়িতে বা নিক্তিতে ওজন করিয়া আমরা সকল দ্রব্যের বস্তুর পরিমাণ করি। কোন্ নিক্তিতে পৃথিবী ওজন করিব? ক্যাবেণ্ডিশের নাম পূর্ব্বে করিয়াছি,—তিনি পৃথিবী ওজনের উপায় বাহির করেন। একটা সীসার গোলার মাধ্যাকর্ষণের সহিত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের তুলনা করিয়া পৃথিবীর বস্তু সীসার গোলকের বস্তুর কত গুণ অধিক, তাহা তিনি স্থির করেন। নিউটন মাধ্যাকর্ষণের যে নিয়ম বাহির করিয়াছিলেন, তাহার জোরেই এই তুলনা সাধ্য হইয়াছিল। কোন দ্রব্যকে এক দিক্ হইতে পৃথিবী টানিতেছেন, অন্য দিক্ হইতে সীসার গোলক টানিতেছেন; উভয়ের অভিমুখে ঐ দ্রব্যের গতিবিধি দেখিয়া এই তুলনা হইয়াছিল। স্থির হইয়াছিল, সীসার গোলার কতগুণ বস্তু পৃথিবীতে আছে। এই পরিমাপ কার্য্য ক্যাবেণ্ডিশের পরেও কয়েক জনে আরও সূক্ষ্ম যন্ত্রসাহায্যে সম্পাদন করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে, পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের গুরুত্বের প্রায় 5।।০ গুণ।

পৃথিবীর ব্যাস 8000 মাইল, ব্যাসার্দ্ধ 4000 মাইল ও পরিধি প্রায় 25000 মাইল। ব্যাসার্দ্ধের বর্গ 1,60,00,000কে পরিধির পরিমাণ 25000 দিয়া গুণ করিয়া তাহার দুই-তৃতীয়াংশ লইলে পৃথিবী কত বড়, পৃথিবীর ঘনফল কত ঘন মাইল, তাহা পাওয়া যায়। পৃথিবীর বস্তু বাহির করা ত্রৈরাশিকের আঁক। এক ঘনফুট জলের বস্তু ওজনে ত্রিশ সের মাত্র; এত ঘন মাইল পৃথিবীর ওজন কত হইবে, পাঠশালার ছেলেতে আঁক কষিয়া বলিয়া দিবে। মনে রাখিতে হইবে, জলের তুলনায় পৃথিবী 5।।০ গুণ গুরু।

যাহা হউক, এত বড় পৃথিবীটা মোটের উপর কোন্ জিনিসে গঠিত, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। পৃথিবীর অভ্যন্তর যে কঠিন অবস্থায় আছে, তাহাই অনেকে অনুমান করেন। আমরা মাটি খুঁড়িয়া ভূগর্ভে অতি অল্প দূরে নামিতে পারি। পৃথিবীর যাহা ব্যাস, তাহার তুলনায় সেটা কিছুই নহে। উহাতে পৃথিবীর পিঠের চামড়াটার যৎকিঞ্চিৎ খবর পাওয়া যায় মাত্র। মাটি খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিয়া বা খনির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই চামড়াটারও কয়েক ফুটের অধিক দেখা যায় না। তবে পৃথিবীর পিঠের চামড়াট' জায়গায় জায়গায় উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও বা নামিয়া গিয়া গভীর গর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে।

পৃথিবীর পিঠ যেখানে উঠিয়া আছে, তাহাকে বলি মহাদেশ, আর যেখানে নামিয়া গিয়া গর্ত্ত হইয়াছে, তাহাকে বলি মহাসাগর। ঐ গর্ত্ত লোনা জলে পূর্ণ। মহাদেশের পিঠে পাহাড়-পর্ব্বতগুলি কয়েক মাইল পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে ঠেলিয়া উঠিয়াছে। আমাদের হিমালয়ের এক একটা শৃঙ্গ নিম্নস্থিত ভূপৃষ্ঠে ভারতবর্ষের জমি ছাড়িয়া পাঁচ মাইলের উপর উঠিয়াছে। চামড়াটা ঐরূপ উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে আবার ফাটিয়া গিয়া বা ক্ষয় হইয়া উহার অভ্যন্তর প্রকাশ করিতেছে, কাজেই সেই চামড়াটার অবস্থা কতক বুঝা যায়।

এই চামড়াটা বস্তুতই পাষাণ-নির্ম্মিত। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যাহাই থাকুক, পৃথিবীর পিঠ যে চামড়ায় ঢাকা আছে, তাহা পাষাণের চামড়া। সেই পাষাণই স্থানে স্থানে পাহাড়-পর্ব্বত নামে অভিহিত। নানাবিধ ধাতু, বিশেষতঃ আলুমিনম ধাতু, কি জানি কোন্ কালে অক্সিজনে দগ্ধ হইয়া ভস্ম হইয়াছিল, এবং পরে সেই আলুমিনম-ভস্ম বালুকার সহিত মিলিত হইয়া এই পাষাণের উৎপত্তি করিয়াছে। যুগ ব্যাপিয়া, কত লক্ষ বৎসর ধরিয়া, জলে বাতাসে নীহারে, সেই পাষাণ ভগ্ন চূর্ণ শিথিল হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে এবং সেই মৃত্তিকা উচ্চ ভূমি হইতে জলস্রোতে নিম্ন ভূমিতে আনীত হইয়া সমতল দেশের গঠন করিয়া উহাকে শস্যশালী ও জীব-জন্তুর আবাস-যোগ্য করিয়াছে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ কোমল মৃত্তিকায় নির্ম্মিত, এরূপ মনে করা ভুল; উহা কঠিন পাষাণে নির্ম্মিত। বসুন্ধরার পিঠ পাষাণের পিঠ; ঐ পাষাণের পিঠের উপর স্থানে স্থানে মৃত্তিকার একটু প্রলেপ আছে মাত্র। যেখানে মৃত্তিকা দেখিবে, তাহার নীচে পাষাণ আছে বুঝিতে হইবে। ছোট-নাগপুর অঞ্চলে মাটির অল্প নীচেই পাষাণ পাওয়া যায়; এমন কি, বহু স্থলে মাটি ছাড়িয়া পাষাণ বাহির হইয়া রহিয়াছে; উহাই পাহাড়। ঐ পাষাণও ক্রমে মাটিতে পরিণত হইতেছে; কিন্তু সেই মাটি অত উঁচুতে দাঁড়াইতে পারে না, জল-স্রোতে, নদীস্রোতে নিম্নতর ক্ষেত্রে নামিয়া আসে। বাঙ্গলা দেশের মাটির নীচেও পাষাণ আছে; তাহা এত নীচে পড়িয়া আছে যে, এ পর্যন্ত মাটি খুঁড়িয়া পাষাণটা কেহ বাহির করিতে পারেন নাই।

মোটামুটি এখন বলিতে পারি, পৃথিবীর ভিতর কেমন জানি না, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের বাহিরটা পাষাণ-ময়। সেই পাষাণ পিঠের বার আনা ভাগ লোনা জলে আবৃত। সমুদ্রের এই জলটা কোনকালে হাইড্রোজন দহনে উৎপন্ন হইয়াছে। আর উহার নুনটা সোডিয়াম ধাতুর সহিত ক্লোরিনের মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে। নুনটা জলে গলিয়া গিয়া জল লোনা হইয়াছে। এইরূপে জলাবৃত ভূপৃষ্ঠের উপরে আবার অনিলের আবরণ। তাহাই বায়ু-সমুদ্র। উহার চারি ভাগ নাইট্রোজন, এক ভাগ অক্সিজন, আর যৎকিঞ্চিৎ কয়লাপোড়া অনিল ও জলীয় বাষ্প।

হয়ত এককালে বায়ুসমুদ্রে অক্সিজনের ভাগ আরও ছিল। হাইড্রোজন অনিল ও নানা ধাতু-পদার্থ কালে সেই অক্সিজনে যুক্ত হইয়া মহাসমুদ্র ও ভূপৃষ্ঠ প্রস্তুত করিয়াছে। সেই দহন ঘটনার পরে যে অক্সিজনটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহাই এখন বায়ুসাগরে বর্তমান। যদি সমস্ত অক্সিজনটাই দহন ক্রিয়ায় ফুরাইয়া যাইত, তাহা হইলে আমাদের নিশ্বাস ফেলিবার জন্য বায়ু থাকিত না; তাহা হইলে পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি ও উপদ্রব সম্ভবপর হইত না।

ভিন্ন দেশের প্রাণিকুলের জ্ঞাতিত্ব

ত্রিদিবরঞ্জন মিত্র*

প্রতিবছর শীতকালে কলকাতার চিড়িয়াখানায় দর্শকদের যে ভীড় দেখা যায় তার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে ঐ সময় চিড়িয়াখানায় বাংলাদেশের নানা পাখির সঙ্গে তিব্বত ও সাইবেরিয়ার পাখিদের সম্মেলন। কলকাতা ছেড়ে পৃথিবীর অন্য অঞ্চলের দিকে তাকালেও দেখা যাবে সেখানেও পৃথিবীর নানা দেশের পাখিদের ভীড়। যেমন, স্যার জুলিয়ান হাক্সলে 1949 খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে আইসল্যাণ্ড গিয়ে জানতে পারলেন যে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, উত্তর আটলান্টিক, সুমেরু বৃত্তীয়, কুমেরু বৃত্তীয় অঞ্চলের পাখিদের সম্মেলন ঘটেছে ঐ বরফ ঢাকা অঞ্চলে। ভারতের আকাশেও আমেরিকার পাখিদের উড়তে দেখা যায়। তবে বলতে বাধা নেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 750টি প্রজাতির পাখির মধ্যে ভারতে দেখা যায় মাত্র 18টি প্রজাতি।

প্রজাতি পর্যায়ের সাদৃশ্য ছেড়ে বাহ্যিক সাদৃশ্য বিচার করলে দেখা যাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আরও বহু রকমের পাখির মিল আছে ভারতের বহু রকম পাখির সঙ্গে। বাহ্যিক সাদৃশ্য ও প্রজাতি পর্যায়ের সাদৃশ্যের তফাৎ কি? এই প্রশ্নের জবাবে বলতে হয় প্রজাতি পর্যায়ের সাদৃশ্যে থাকে বংশগতি সম্পর্ক (সাধারণ ভাষায় রক্তের সম্পর্ক)। আর বাহ্যিক সাদৃশ্যে বংশগতির সম্পর্ক থাকতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন, আমেরিকার শজারু ও আফ্রিকার শজারুর মধ্যে যে সাদৃশ্য বর্তমান। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন সুদূর অতীতে ওদের পূর্বপুরুষ ছিল একই ধরণের প্রাণিকুল। কিন্তু আধুনিক যুগে দুটি ভিন্ন প্রজাতি এবং তাদের মধ্যে বংশগতির কোন সম্পর্ক নেই (G. G. Simsom 1961, Priciples of Animal taxonomy).

প্রাণী-বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন এখন যে সকল প্রাণিকুলকে বিচরণ করতে দেখা যায় তাদের অভিব্যক্তির আগে নানারকম ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে, সেই সঙ্গে পৃথিবীর আবহাওয়ার অনেক পরিবর্তন হয়। ফলে নানা কারণে জীবদের জিনের পরিবর্তন (mutation) আসে এবং কোটি কোটি বছর ধরে পূর্বপুরুষদের জিন ও জিন-বিন্যাসের পরিবর্তনের জন্যই আধুনিক জীবকুল সংখ্যাতীত বাহ্যিক রূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। এই কারণেই প্রত্যেকটি প্রজাতি তার পূর্বপুরুষ থেকে অনেকাংশে পৃথক। তবে ফসিলের সাহায্যে বোঝা যায়—কে কার সম্ভাব্য পূর্বপুরুষ। প্রজাতির অভিব্যক্তি ছাড়াও প্রাণিকুলের ইতিহাসও আবিষ্কার হয় ফসিলের সাহায্যে। ভূবিজ্ঞানীরা শিলা পরীক্ষা করে বলতে পারেন কোন্ ভূতাত্ত্বিক যুগে কোন্ কোন্ ধরণের প্রাণী কত বেশি সংখ্যায় ও কত বেশি ধারায় বিস্তারলাভ করেছিল। তাঁরা আবিষ্কার করেছেন

*398, দমদম, পার্ক, কলিকাতা-700055

প্রথম উড্ডয়নক্ষম মেরুদণ্ডী প্রাণী পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় প্রায় পনেরো কোটি বছর আগে। কিন্তু পক্ষী-সাম্রাজ্যের বিস্তার শুরু হয় তার আট কোটি বছর পরে। ঐ আট কোটি বছরের শিলা-স্তর থেকে পাওয়া যায় পক্ষিকুলের অভিব্যক্তির ইতিহাস। বিজ্ঞানীরা মনে করেন পক্ষী-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির যুগে ভূমণ্ডলের তাপ বৃদ্ধি পায়, ফলে তৎকালীন বিশ্বশাসক ডাইনোসোর, টাইরোনোসোর প্রভৃতি সরীসৃপদল দৈহিক তাপ-মাত্রাকে পরিবেশের সকল অবস্থায় সমান রাখায় অক্ষম হওয়ায় ও আরও নানা কারণে প্রাণিজগতের ইতিহাসে যক্ষ হয়ে যায়। তবে সব সরীসৃপ কিন্তু সহজে ঐ পরাজয় মেনে নেয় নি। তাদের মধ্যে কয়েক দল নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। তাদের দুটি প্রাণিকুলের বংশধরেরা জন্ম দিয়ে যায় পক্ষী ও স্তন্যপায়ীদের। পরিবেশের সকল অবস্থায় শরীরের তাপমাত্রাকে সমান রাখার ব্যবস্থা করে ও অন্যান্য পরিবর্তন এনে তারা পৃথিবীর নতুন পরিবেশকে যেন চ্যালেঞ্জ করে দেখা দিল ওদের পূর্বপুরুষদের কথা বলার জন্য। এই সব কথা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন আধুনিক প্রাণিজগৎ, তাদের ফসিলভূত পূর্বপুরুষ ও নানা শিলা পরীক্ষা করে। বলতে বাধা নেই তর্কের খাতিরে এই ধারণাকে নস্যাৎ করে দেওয়া যায়, কারণ ফসিলের সাহায্যে সব সময় প্রমাণ হয় না অনেক কথা। বেশির ভাগ ফসিল-ই অসম্পূর্ণ; তার উপর তাতে থাকে না কোন নরম অংশ। এই কারণেই বহু বিজ্ঞানী ফসিলকে অভিব্যক্তির পরোক্ষ প্রমাণ হিসেবে গণ্য করার পক্ষপাতী। যাই হোক পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে পক্ষী ও স্তন্যপায়ীকুল স্ব স্ব বেগে, নিজেদের সুবিধামত ধারায় বিস্তার-লাভ করতে থাকে। পাখির গায়ে দেখা দিল দুর্বল তাপ পরিবাহক পালক, বেশির ভাগ হাড় খুব শক্ত, বাতাসপূর্ণ হওয়ায় দেহ হলো হাল্কা, আকাশে ওড়ার জন্য সামনের পা ডানায় পরিবর্তিত হলো। একই সঙ্গে বেশির ভাগের দৃষ্টি হলো খুব প্রখর। স্তন্যপায়ীদের দেহে দেখা দিল লোম, হাড় হলো শক্ত, নিরেট, নানা আকৃতির দাঁত বেশ মজবুত হয়ে খাপে বসলো। এই সঙ্গে বিকশিত হলো সবচেয়ে বড় ভারী মস্তিষ্ক। সাধারণ ভাবে বলা হয় আধুনিক কাক পক্ষিকুলের অভিব্যক্তির শেষবিন্দু (তবে কয়েকজন বিজ্ঞানীর মতে আমেরিকার song sparrow, কাক নয়); স্তন্যপায়ীকুলের শেষবিন্দু মানুষ। স্বীকার করতে বাধা নেই এই ধারণার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। যখন সরীসৃপকুল পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছিল তখন কিছু সংখ্যক সরীসৃপ তাদের সুবিধামত অঞ্চলে আশ্রয় নেয় ও পরিবর্তনের মুখে বাঁচিয়ে রাখে। তাদের বংশধরেরা আজ টিকটিকি, গিরগিটি, সাপ, কুমীর, কচ্ছপ ও টুয়াটারা। টুয়াটারা একমাত্র নিউজিল্যাণ্ডে পাওয়া যায়। ওদের শরীরে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক জ্ঞাতিদের বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানীরা ওকে বলেন জীবন্ত ফসিল। সত্যিই টুয়াটারা অভিব্যক্তির অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করে। জীবন্ত ফসিল অন্য প্রাণিকুলেও পাওয়া যায়। যেমন অস্ট্রেলিয়ার হংসচঞ্চু-প্লাটি-পাস, একিডনা নামে দুই প্রজাতি। এদের শরীরে রয়েছে একাধারে আদিম স্তন্যপায়ী ও অন্যদিকে তাদের সরীসৃপ পূর্বপুরুষদের বৈশিষ্ট্য।

স্তন্যপায়ীকুল ও পক্ষিকুলের অভিব্যক্তি কালে উভয়কুলের প্রাণীরা নিজেদের ও তাদের বংশ-ধরদের খাদ্য, বাসস্থান প্রভৃতির জন্য প্রতিযোগিতা এড়াতে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক দূর দূর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার ফলে বাসস্থানের দূরত্বের ব্যবধান যায় বেড়ে। আবাস-স্থলের পরিবেশ অনুযায়ী ক্রমে ক্রমে প্রাণিকুলের জিনের পরিবর্তন আসে। ঐ সকল ভিন্ন আঞ্চলিক জাতি যে সকল ক্ষেত্রে নিজেদের জ্ঞাতির সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রজননে সক্ষম হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে আঞ্চলিক জাতি থেকে নতুন প্রজাতি সৃষ্টি

হয় নি। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন আঞ্চলিক জ্ঞাতির মিলন সম্ভব হয় নি সেই সেই ক্ষেত্রে নতুন প্রজাতির অভিব্যক্তি ঘটেছে। এই কারণেই পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেই অঞ্চলে এমন কতকগুলি প্রজাতি পাওয়া যায় যা পৃথিবীর অন্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে পাওয়া যায় না। যথা, অস্ট্রেলিয়ার হংসচঞ্চু প্লাটিপাস, একিডনা, নিউজিল্যাণ্ডের টুয়াটারা, আফ্রিকার জিরাফ, জলহস্তী প্রভৃতি। যে সব প্রজাতি যে অঞ্চলে অভিব্যক্ত হয়, যদি সেই অঞ্চলেই কেবলমাত্র পাওয়া যায় তবে ঐ প্রজাতিটিকে ঐ অঞ্চলের এণ্ডেমিক প্রজাতি বলে। যেমন হিমালয়ে ফড়িঙকুলের (dragonfly) লিভিং বা জীবন্ত ফসিল *Epiophlebia laidlawi* পাওয়া যায়। পৃথিবীর সর্বত্র ফড়িং পাওয়া যায় তবে ঐ প্রজাতিটিকে পাওয়া যায় না। তাই *Epiophlebia laidlawi* হিমালয়ের এণ্ডেমিক (endemic) প্রজাতি। রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে ঐ প্রজাতিটিকে দার্জিলিঙ ও নেপালে পাওয়া যায়। তাই এটি ভারত বা নেপাল কোন দেশেরই এণ্ডেমিক নয়।

বৈচিত্র্যময় প্রাণী-জগতকে সহজে জানার আশায় বিজ্ঞানীরা প্রাণিবিজ্ঞানে শ্রেণীবিন্যাস উপবিজ্ঞান সৃষ্টি করেছেন। শ্রেণীবিন্যাস উপ-বিজ্ঞান অনুযায়ী প্রাণিরাজ্যকে কয়েকটা পর্বে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক পর্বকে শ্রেণীতে, শ্রেণীকে বর্গে, বর্গকে গোত্রে, গোত্রকে গণে ও গণকে প্রজাতিতে বিভক্ত করা হয়। যেসব প্রাণীর মধ্যে জ্ঞাতিত্বের ঘনিষ্ঠতা যত বেশি সেই সব প্রাণী প্রজাতি থেকে শুরু করে উপরের দিকে পর্ব পর্যন্ত এক বিভাগের অন্তর্গত হয়। যথা, মাছ, ব্যাঙ, সাপ, কুমীর ও মানুষ এক পর্বের অন্তর্গত, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জীব। আবার মানুষ, বাঘ, ঘোড়া, এক শ্রেণীর প্রাণী হয়েও ভিন্ন ভিন্ন বর্গের অন্তর্গত। অনুরূপভাবে পক্ষিকুলের শালিক ও গাংশালিক এক গণের দুটি ভিন্ন প্রজাতি। শালিক ও তেলেময়না এক গোত্রের দুটি ভিন্ন গণের প্রজাতি; শালিক ও গগনবেড় এক শ্রেণীর (Class-Aves) দুই বর্গের প্রজাতি। অর্থাৎ বলা যায় শালিক ও গগনবেড়ের মধ্যে বংশগতির কোন সম্পর্ক নেই। শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীদের হিসেব মত সারা পৃথিবীতে পক্ষিশ্রেণীর অন্তর্গত 29টি বর্গ, 154টি গোত্র, 2012টি গণ ও প্রায় 8580 প্রজাতি দেখা যায়। ঐ সংখ্যাগুলির 62% বর্গ, 46% গোত্র, 2% গণ ও 0·2% প্রজাতির পাখি ভারত ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উভয় দেশে পাওয়া যায়। এক কথায় বলা যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের পাখিদের পূর্ব-পুরুষ ছিল এক; কিন্তু কালের ব্যবধানে বিশ্বের নানা অঞ্চলে নানা পরিবর্তন আসায় ঐ পূর্ব-পুরুষদের বংশধররাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। উভয় দেশে যে সকল পাখি পাওয়া যায় তাদের জনপ্রিয় নাম বাচ্‌কা, গোবক, নীলশির, পিন্নিংহাঁস, বড়দীঘর, পান্তমুখী হাঁস, বালিহাঁস, কুররী, শাহীবাজ, পানপায়রা, সোনাবাটান, গিও-ওয়ালা, লক্ষ্মীপেঁচা, আবালি, ক্যারকাটা, তেলেময়না, চড়ুই। যদি কেউ প্রশ্ন করেন কেন মাত্র এই আঠারোটি প্রজাতি ভারত ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পাওয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে কত রিম কাগজ লাগবে ও কত শিশি কালি দরকার তা বলা শক্ত তবে নীচে কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হলো।

পঞ্চহংস—নীলশির, পিন্নিংহাঁস, বড়দীঘর, পান্তমুখী হাঁস, বালিহাঁস একটি গণের অন্তর্গত প্রজাতি। উত্তরায়ণের সময় আনাস (*Anas*) গণের এই পাখিরা সুমেরু বৃত্তীয় অঞ্চলে ভীড় করে। তার উপরে এরা সকলেই বহুকামিনী প্রেমিক। ফলে আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার পাখিদের মিশ্রণের সুযোগ থাকায় এদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে বিভেদ প্রকট হওয়ার সুবিধা নেই

বললেই চলে। তাই আমেরিকার নীলশির ও ভারতের নীলশিরের কোন তফাৎ নেই। মজার কথা আমেরিকার রাজহাঁস ও ভারতীয় রাজহাঁস সুমেরুবৃত্তের নিকটবর্তী নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বাসা বাঁধে, তবুও ওদের মধ্যে তফাৎ সহজে লক্ষ্য করা যায়। কারণ প্রজনন ক্ষেত্রের ব্যবধান। আমেরিকার রাজহাঁস বাসা বাঁধে আমেরিকার মহাদেশের যে ভাগ সুমেরু বৃত্তের অংশ সেই অঞ্চলে; আর ভারতীয় রাজহাঁস বাসা বাধে সুমেরু বৃত্তের ইউরেশিয় অঞ্চলে, বা তার নিকবর্তী অঞ্চলে। এছাড়াও এদের প্রজনন ক্ষেত্রের বিস্তার নিজের নিজের ক্ষেত্রে সীমিত; মিশ্রণের সুযোগ তেমন নেই। এর উপরে আছে ওদের স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি প্রেম। কেউ অন্য স্ত্রী বা পুরুষের দিকে তাকায় না।

বিশ্বপরিক্রামক কুররী (Osprey) অবিরাম বহুদূর উড়তে সক্ষম। প্যানডিওনিনি (Pandioninae) উপগোত্রের একটিমাত্র প্রজাতি, আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল ও দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল ছাড়া প্রায় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত। দক্ষিণায়ণের সময় উষ্ণ অঞ্চলে প্রব্রজন (migration) করে। ব্যাপক এলাকায় বিস্তৃত হওয়ার ফলে বিভিন্ন জলাশয়ের (লোনা ও স্বাদু) মাছ খেয়ে জীবন কাটায় স্বচ্ছন্দে। তাই বিচিত্র ভৌগোলিক পরিবেশে এদের প্রতিভূ বিদ্যমান। পুরানো দুনিয়ার গোবক 1935 খ্রীষ্টাব্দে আটলান্টিক ছাড়িয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছায়; সেখান থেকে 1942 খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এদের স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ ও স্বজাতির সঙ্গে প্রজনন দেখে বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করেন হয়তো ভবিষ্যতে ওরা ভারতীয় সহোদর থেকে আলাদা হয়ে ও শ্রেণীবিন্যাসীদের কাছে নতুন প্রজাতি হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। অন্যদিকে সোয়ালো (Swallo), উইলো ওয়ারবলার (Willow warbler) কুলের কিছু পাখি প্রতি গ্রীষ্মেই আইসল্যাণ্ডে আসে কিন্তু এখনো পর্যন্ত ওদের ওখানে ঘর বাঁধার কোন খবর পাওয়া যায় নি। এদের দেখে মনে হয় নানা প্রজাতি নতুন নতুন অঞ্চলে রাজত্ব স্থাপনের আশায় সব সময় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পাঠিয়ে থাকে। কিন্তু এতে অপচয় বেশি হয়। কারণ সবাই সাফল্য লাভ করে না। এই কারণেই কি মোঘল আর ইংরেজ ছাড়া ভারতে বাদশাহী চালে শাসন আর কেউ চালাতে পারে নি? ধন্য প্রকৃতির বিচার! সে কেবল অপচয় পছন্দ করে, না হলে যদি পৃথিবীতে যত জীব অভিব্যক্ত হয়েছে তারা আজ বেঁচে থাকতো তবে হয়তো অনেকদিন আগেই মালথুসের (Malthus) থিওরির যথার্থ্যতা প্রমাণ হয়ে যেত।

সবচেয়ে বড় পরিব্রাজক প্রজাতি, মানুষ (*Homo sapiens*), নিজের সঙ্গে তেলেময়না ও চড়ুইকে নিয়ে গেছে নিজেদের গন্তব্যস্থলে। চড়ুই 1842 খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় পৌঁছায়, সম্প্রতি হাড্‌সন উপকূলে আস্তানা গেড়েছে। তেলেময়না 1890 খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্কে যায় এবং কয়েক বছর আগে লাব্রাডরের দক্ষিণ ভাগে পৌঁছায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা তেলেময়না ও চড়ুই ইওথিপিয়ান (সাধারণভাবে আফ্রিকার সাহারার দক্ষিণ থেকে পুরো আফ্রিকা) অঞ্চলে অভিব্যক্ত হয়েছে। দিগ্বীজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ থেকে ময়ূর চালান করেন, তাই গ্রীস ও রোমে তার বিস্তার ঘটেছে। ভারতীয়েরা শালিক নিয়ে যায় ফিজি দ্বীপপুঞ্জে ও বেজি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। মানুষ শুধু পাখি বা স্তন্যপায়ী নয় আরও অনেক জীবকেই তার উৎপত্তি স্থল থেকে বহুদূরে নিয়ে গেছে। যেমন রাক্ষুসে শামুক আকাটিনা ফুলিকা (*Achatnia fulica*) 1847 সালে কলকাতায় পৌঁছায় ওখান থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। শামুকটির বৈজ্ঞানিক নাম ওপিয়াস গ্রাসিল (*Opeas gracile*)। মানুষের সাহায্যে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে

পড়েছে। ফলে ওদের প্রকৃত উৎপত্তিস্থল কেউ জানেন না। সম্প্রতি বর্তমান লেখক অরথোমরফা কোয়ারক্‌টাটা (*Orthomorpha coarctata*) নামে একটি কেন্নকে ভারতবর্ষ থেকে আবিষ্কার করেছেন। ঐটিও মানুষের সাহায্যে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যান্য উদাহরণের সাহায্যে বলা যায় সভ্যতার ফলে মানুষ জীবশক্তি থেকে ভূতাত্ত্বিক শক্তিতে পরিণত হতে চলেছে। প্রাগৈতিহাসিক ভূতাত্ত্বিক শক্তির ন্যায় সে আজ নদীর গতিপথ, প্রাণী ও উদ্ভিদের ভৌগোলিক বিস্তৃতি সবই পরিবর্তিত করে চলেছে। তবে আধুনিক প্রজাতি বিকাশনে প্রকৃতির প্রভাব আছে। উদাহরণ স্বরূপ, হামিংবার্ডের অসংখ্য প্রজাতি; তারা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতেই সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর আর কোন মহাদেশে এদের দেখা যায় না। ভারতে এদের জ্ঞাতিভাই বাতাসী থাকে। হামিংবার্ড ও বাতাসী এক বর্গের কিন্তু ভিন্ন গোত্রের অন্তর্গত। বিজ্ঞানীদের ধারণা বাতাসী-হামিংবার্ড বর্গের (Apodi-formes) প্রজাতির সংখ্যাবৃদ্ধি শুরু হয় প্রায় চার কোটি বছর আগে। দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডর অঞ্চলে বাতাসীর জ্ঞাতিভাই একাধিক প্রজাতিতে বিভক্ত হতে শুরু করে প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে। একমাত্র ইকুয়েডরে দেখা দেয় 163টি প্রজাতি। ইকুয়েডর ঐ বিরাট সংখ্যার চাপ সহ্য করতে না পারায় এবং প্রজাতিগুলি খাদ্য ও বাসস্থানের তাগিদে এবং নিজেদের মধ্যে আন্তঃপ্রজাতি প্রতিযোগিতা এড়ানোর জন্য ইকুয়েডরে উত্তরে ও দক্ষিণে চলে যায়। ক্রমে ক্রমে সেখানেও নতুন প্রজাতির বিকাশ ঘটে। একটি পৌঁছায় দক্ষিণ আমেরিকার শেষপ্রান্ত টিএরা ডেল ফুগোতে, একটি যায় নিউইংল্যাণ্ড এবং আর একটি যায় আলাস্কায়। নিউইংল্যাণ্ডবাসী প্রতিবছর ঘণ্টায় 50 কিলোমিটার বেগে অবিরাম উড়ে মেক্সিকো উপসাগর পার হয়ে ইকুয়েডর আসে, পরে আবার নিউইংল্যাণ্ডে ফিরে যায়। কিন্তু এত ক্ষমতা সত্ত্বেও উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে ইউরোপে পৌঁছুতে পারে নি। কারণ উত্তর আটলান্টিক পার হতে আরও শক্তি দরকার। আলাস্কার অধিবাসী জলের উপর দিয়ে উড়তে অক্ষম। সে স্থলে যাতায়াত করে। তাই সামান্য বেরিং প্রণালী পার হয়ে এশিয়ার মধ্যে দিয়ে ভারতে পৌঁছুতে পারে নি। যদি কোনদিন মানুষ অথবা অন্য কোন প্রজাতি বেরিং প্রণালী পার করে ওদের ভারতে পৌঁছে দেয় তবে ভারতের মৌটুসী ও পরাগপাখির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে। কারণ পশ্চিম গোলার্ধের হামিংবার্ড যে পরিবেশে থাকে ভারতের সেই পরিবেশে থাকে মৌটুসী ও পরাগপাখি। তবে হামিংবার্ড যদি ভারতে ঠিক মতো পৌঁছুতে পারে তবে হয়তো ওদের দেহ ও মনে নানা পরিবর্তন আসবে যা বিজ্ঞানীর চোখে দেখা দেবে পাশ্চাত্ত্যের প্রজাতিগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা নতুন প্রজাতি।

বিজ্ঞানীরা চুলচেরা যুক্তি দিয়ে বৃহৎ পরিবারকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করলেও সাধারণ মানুষের কাছে আমেরিকার কানঠুঁটি, কাক, ঈগল, বাতাসী, মাছরাঙা, পেঁচা, বক সারস, গয়ার ভারতের আকাশে উড়ে বেড়ায়, জলে সাঁতার কাটে, গাছে চড়ে রাত কাটায়। অনেক সময় বাহ্যিক সাদৃশ্য ছাড়াও চলনভঙ্গীতে সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন, তেলেময়না ও ময়নার গমনভঙ্গী, ভারতের রামগঙ্গা ও আমেরিকার চিকাড়ির খাদ্যগ্রহণ-পদ্ধতি; আমেরিকার কালচুরী ও ভারতীয় কালচুরীর সাদৃশ্য সত্যিই দৃষ্টি আকর্ষক। বাংলার শকুন ও আমেরিকার শকুনের রূপ ও আচরণে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পুরাতন দুনিয়ার ফ্লাই-ক্যাচার ও নতুন দুনিয়ার (অর্থাৎ আমেরিকার) ফ্লাইক্যাচারের মধ্যে এত সাদৃশ্য যে একমাত্র ফসিলের সাহায্যেই প্রমাণ করতে হয় ওদের মধ্যে বংশগতির কোন সম্পর্ক নেই।

ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের পাখিদের এত মিল সত্ত্বেও দুই দেশের কিছু সংখ্যক পাখি নিজেদের অঞ্চল ছেড়ে অন্য অঞ্চলে কোনদিনই যায় নি। যেমন আমেরিকার গ্যানেট, পাফিন, ম্যুরি, টার্কি প্রভৃতি ভারতে দেখা যায় না। আবার ভারতের তিলুর, টিয়া, বাঁশপাতি, ধনেশ, বুলবুল, বসন্তবউরি আমেরিকার আকাশে ওড়ে না। মনে হয় সুদূর অতীতে হারানো শক্তি ও স্বভাবের ফলে ওরা নিজেদের দেশ ছেড়ে কোথাও বাস করতে পারবে না কোনদিন।
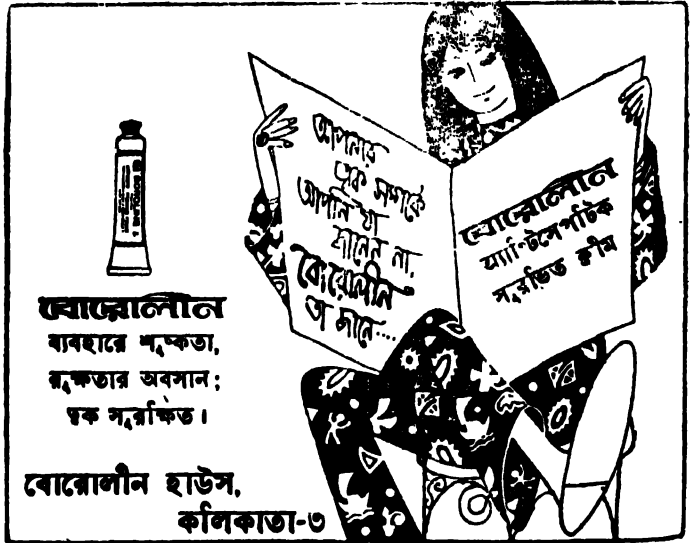
পাখিদের জগত ছেড়ে যদি অন্য জীবদের দিকে তাকাই সেখানেও দেখা যাবে অনুরূপ অবস্থা। তাই বলা যায় ভ্রমণ কেবল অন্তরের প্রসারতা বাড়ায় না জিনের বন্দীদশাও ঘোচায়। এই কারণেই প্রাণিজগতের সবচেয়ে বড় পরিব্রাজক প্রজাতি মানুষ থেকে এখনও কোন প্রজাতির সৃষ্টি হয় নি। মাপ চেয়ে বলতে হয় যদি ভারতে আন্তঃপ্রাদেশিক, আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ জোর কদমে চালু হয় তবে হয়তো একদিন জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি আমাদের মন থেকে ঘুচে গিয়ে সুস্থ-সবল দেহ-মনসম্পন্ন জাতিতে পরিণত হতে পারব।

লেখতত্ত্ব

প্রদীপকুমার দত্ত*

বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে যেমন নানা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে তেমনই কখনও কখনও আবার. খুব সাধারণ সমস্যার সমাধান করতে গিয়েও গুরুত্বপূর্ণ কোন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। এমনি একটি তত্ত্ব হলো লেখতত্ত্ব (graph theory)। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ লেখতত্ত্বের প্রয়োগ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায়, বিশেষ করে কম্প্যুটর বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতিতে লেখতত্ত্বের প্রয়োগ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে হতে দেখা যায়। তাছাড়া পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, জননবিদ্যা (genetics), মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি এমনকি ভাষাতত্ত্বেও লেখতত্ত্বের প্রয়োগ আজ সুপ্রচলিত। গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা যথা মেট্রিক্স তত্ত্ব (matrix theory), টপোলজি (toplogy) প্রভৃতির সঙ্গেও এই তত্ত্বের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

এই তত্ত্বের জন্ম হয়েছিল আজ থেকে প্রায় 250 বছর আগে 1736 খৃষ্টাব্দে যখন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ অয়লার (Euler) তখনকার দিনের বিখ্যাত কোয়েনিগ্‌স্‌বার্গ সেতু সমস্যা (Koinigs-berg bridge problem) সমাধান করে লেখতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটিই লেখতত্ত্বের জন্ম সূচিত করছে পরবর্তীকালে অবশ্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী তাঁদের সমাস্যার সমাধান করতে গিয়ে স্বাধীন ভাবে এই তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। 1847 খৃষ্টাব্দে কার্চফ্‌ (Kerchhoff) বৈদ্যুতিক জালকের (electrical network) ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য তরুতত্ত্বের (theory of trees) উদ্ভাবন করেন। তরু হলো এক প্রকারের লেখ (graph)। 1857 খৃষ্টাব্দে কোন সংপৃক্ত হাইড্রোকার্বনের (saturated hydrocarbon) C_nH_{2n+2} (যেখানে n=কার্বন পরমাণুর সংখ্যা) সমাংশের (isomer) সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য আবার স্বাধীনভাবে তরুর আবিষ্কার ও প্রয়োগ করেন কেলি (Cayley)। 1859 খৃষ্টাব্দে হ্যামিলটন (Hamilton) একটি ধাঁধা (puzzle) উদ্ভাবন করেন ও 25 গিনির বিনিময়ে ডাবলিনের একটি ক্রীড়াসরঞ্জাম প্রস্তুত-কারককে বিক্রয় করেন। ধাঁধাটি সমাধানের জন্য লেখতত্ত্বের সাহায্য লাগে। এর পর 1869 খৃষ্টাব্দে জরডান (Jordan) স্বাধীনভাবে গাণিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তরু আবিষ্কার করেন। পরবর্তী-কালে চারবর্ণ নিয়ম (four colour conjecture) (অর্থাৎ কোন সমতলে ম্যাপ অঙ্কিত করতে, যাতে দুটি পাশাপাশি দেশের বর্ণ এক না হয়, মাত্র চারটি বর্ণই যথেষ্ট) লেখতত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এখন দেখা যাক, কোয়েনিগ্‌স্‌বার্গ সেতু সমস্যা—যা লেখতত্ত্বের জন্ম দিয়েছিল—কি এবং কিভাবে লেখতত্ত্বের সাহায্যে অয়লার সমস্যাটির সমাধান করেছিলেন। এক কথায় সমস্যাটি হলো পূর্ব প্রুশিয়ার প্রেগেল (Pregel) নদীর দুই তীর (R ও S) ও নদীর মাঝের দুটি দ্বীপ (P ও Q) (চিত্র-1) নিয়ে গঠিত কোয়েনিগ্‌স্‌বার্গ শহরের [যা তখন পূর্ব প্রুশিয়ার রাজধানী ছিল এবং বর্তমানে ক্যালিনিনগ্রাদ (Kaliningrad) নামে পরিচিত] সাতটি সেতু পরিক্রমার সমস্যা। চিত্র-1-এ

*ইন্‌স্‌টিটিউট অফ্‌ রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিস, 92, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-700009
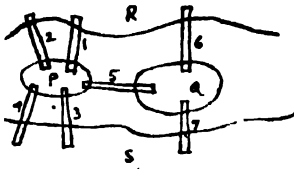
চিত্র-1

যেমন দেখানো হয়েছে সাতটি সেতু দ্বীপ দুটি ও নদীর দুই তীরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করত। এখন সমস্যা হলো এই শহরের যে কোন স্থান P, Q, R, বা S থেকে শহর পরিক্রমা শুরু করে সাতটি সেতুর প্রত্যেকটি মাত্র একবার করে পার হয়ে (এবং অবশ্যই নদী না সাঁতরে) পুনরায় সেই স্থানে ফিরে আসার কোন পন্থা নির্ণয় করা যায় কিনা। অয়লার সমস্যাটিকে একটি লেখের
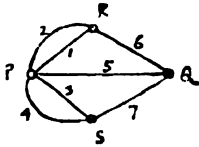
চিত্র-2

সাহায্যে প্রকাশ করেন (চিত্র-2)। সংজ্ঞা অনুযায়ী একটি লেখ গঠিত হয় একটি শীর্ষবিন্দুর সেট (set of vertices) $V=\{v_1, v_2..., v_n\}$, পার্শ্বরেখার সেট (set of edges) $E=\{e_1, e_2\cdots, e_m\}$ এবং এদের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক (relation) ψ দ্বারা। সম্পর্কটি প্রতিটি পার্শ্বরেখা e_k-এর সঙ্গে লেখের দুটি শীর্ষবিন্দুর (v_i ও v_j;) সংযোগ নির্দেশ করে $\psi(e_k)=(v_i, v_j)$। উদাহরণ স্বরূপ, চিত্র-2-এর লেখটির ক্ষেত্রে $V=\{P, Q, R, S\}$, $E=\{1, 2, 3,..., 7\}$, $\psi(1)=(P,R)$, $\psi(2)=(P,S)$, $\psi(3)=(R,Q)$ প্রভৃতি। চিত্র-2-এর লেখটির শীর্ষবিন্দু সমূহ (vertices) P, Q, R, S যথাক্রমে শহরের P, Q, R, S চিহ্নিত স্থলভাগগুলিকে এবং পার্শ্বরেখাগুলি (edges) স্থলভাগ সংযোজক সেতু সাতটিকে নির্দেশ করে। ফলে সমস্যাটি দাঁড়ায় এই রকম—কলমের একটানে অর্থাৎ একবারও কলম না তুলে এবং কোন রেখার উপর দিয়ে একাধিকবার কলম না বুলিয়ে কোন একটি শীর্ষবিন্দু থেকে চিত্রটিকে অঙ্কন করা সম্ভব কিনা যাতে কলমের টান শেষ হয় যে শীর্ষবিন্দু থেকে টান শুরু হয়েছিল সেই শীর্ষবিন্দুতে এসে। অয়লার দেখান যে এভাবে চিত্রটি অঙ্কন করা সম্ভব নয়। কেন নয় তা বুঝতে গেলে আমাদের লেখতত্ত্বের কয়েকটি বিষয় জানতে হবে।

কোন লেখে যদি $\psi(e_k)=(v_i\ v_j)$ হয় তবে বলা হয় পার্শ্বরেখা e_k, v_i ও v_j শীর্ষবিন্দুদ্বয়ের উপর আপতিত হয়েছে বা শীর্ষবিন্দু দুটিতে মিলিত হয়েছে এবং v_i ও v_j শীর্ষবিন্দুদ্বয় পার্শ্বরেখা e_k-এর প্রান্তবিন্দু (end vertices)। এ থেকে v_i ও v_j-কে সন্নিহিত (adjacent) বলা হয়। কোন শীর্ষবিন্দুতে যুগ্ম সংখ্যক পার্শ্বরেখা মিলিত হলে শীর্ষবিন্দুটিকে যুগ্ম শীর্ষবিন্দু (even vertex) এবং অযুগ্ম সংখ্যক পার্শ্বরেখা মিলিত হলে অযুগ্ম শীর্ষবিন্দু (odd vertex) বলা হয়। কোন শীর্ষবিন্দু (ধরা যাক v_1) থেকে শুরু করে শীর্ষবিন্দুটিতে মিলিত হয়েছে এমন একটি পার্শ্বরেখা e_1 বরাবর গেলে আর একটি শীর্ষবিন্দু (ধরা যাক v_2)-তে পৌঁছানো যাবে, v_2-তে মিলিত হয়েছে এমন একটি পার্শ্বরেখা e_2 বরাবর গেলে আর একটি শীর্ষবিন্দু v_3-তে পৌঁছানো যাবে। এভাবে কোন শীর্ষবিন্দু v_i থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি পৃথক পার্শ্বরেখা (distinct edges) $e_1\ e_2...,e_m$ অতিক্রম করে কোন একটি শীর্ষবিন্দু v_j-তে পৌঁছানো গেলে বলা হয় v_i ও v_j একটি পথ (path) $e_1, e_2...,e_m$ দ্বারা সংযুক্ত। যদি v_i ও v_j অভিন্ন হয় তবে বলা হয় পথটি মুক্ত (open); আর যদি v_i ও v_j একই শীর্ষবিন্দু হয় তবে বলা হয় পথটি বদ্ধ (closed) পথ বা চক্র (cycle)। যদি কোন লেখের প্রত্যেক জোড়া শীর্ষবিন্দুর মধ্যে অন্ততঃ একটি পথ থাকে তবে লেখটিকে সংযুক্ত (connected) বলা হয়, না হলে

তা বিচ্ছিন্ন (disconnected)। কোন সংযুক্ত লেখ যদি এমন হয় যে তার থেকে কোন একটি পার্শ্বরেখা বাদ দিলেই লেখটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তবে লেখটি একটি তরু (tree)। অন্যভাবে বলা যায় কোন সংযুক্ত লেখতে কোন চক্র না থাকলে লেখটি একটি তরু। যদি কোন সংযুক্ত লেখের কয়েকটি পার্শ্বরেখা এমনভাবে নির্বাচন করা যায় যাতে লেখের শীর্ষবিন্দু সমূহ ও নির্বাচিত পার্শ্বরেখা-গুলির দ্বারা গঠিত লেখটি একটি তরু হয় তবে এই তরুটিকে লেখটির একটি স্প্যানিং তরু (spanning tree)। চিত্র-2-এ যদি 1, 5 ও 7 নং পার্শ্বরেখাগুলি নির্বাচন করা হয় তবে একটি স্প্যানিং তরু পাওয়া যাবে। পার্শ্বরেখাগুলি অন্য ভাবে নির্বাচন করলে অন্য একটি স্প্যানিং তরু পাওয়া যাবে। এভাবে অনেকগুলি স্প্যানিং তরু পাওয়া যেতে পারে।

এবার আলোচ্য সেতু সমস্যায় ফিরে আসা যেতে পারে। অয়লার দেখান যে কোন সংযুক্ত লেখের সব কয়টি শীর্ষবিন্দু যুগ্ম না হলে কোন একটি শীর্ষবিন্দু থেকে শুরু করে সব কয়টি পার্শ্বরেখা মাত্র একবার পরিক্রমা করে আবার সেই শীর্ষবিন্দুতে ফিরে আসা সম্ভব নয়। অবশ্য কেবলমাত্র দুটি অযুগ্ম শীর্ষবিন্দু থাকলে লেখটিকে একটানে অঙ্কন করা সম্ভব, কিন্তু প্রথম শীর্ষবিন্দুতে ফেরা যাবে না। চিত্র-2-এর লেখটি সংযুক্ত এবং এর সবকয়টি শীর্ষবিন্দুই অযুগ্ম। সুতরাং কোয়েনিগ্‌স্‌বার্গ সেতু সমস্যার সমাধান নেতিবাচক।

এখন লেখতত্ত্বের কয়েকটি ব্যবহারিক প্রয়োগের উল্লেখ করা যাক। ধরা যাক, কয়েকটি শহর কয়েকটি রাস্তার দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বল স্থানগুলি নির্ণয় করতে হলে লেখতত্ত্বের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এজন্য শহরগুলিকে লেখের শীর্ষবিন্দু দ্বারা ও রাস্তাগুলিকে পার্শ্বরেখার দ্বারা নির্দেশ করা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতা দু-ধরণের হতে পারে: (1) কত কম সংখ্যক রাস্তা নষ্ট হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং (2) কত কম সংখ্যক শহর বিপক্ষের অধিকারে চলে গেলে বা ধ্বংস হয়ে গেলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। লেখতত্ত্বের পরিভাষায় প্রথমটি ন্যূনতম ছেদ সেট (cut set) নির্ণয় করার সমস্যা এবং দ্বিতীয়টি ন্যূনতম ছেদ শীর্ষবিন্দু (cut vertices)
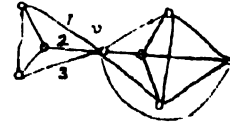
চিত্র-3

নির্ণয়ের সমস্যা। উদাহরণ স্বরূপ চিত্র-3-এ মাত্র তিনটি পার্শ্বরেখা (1, 2, 3) একটিমাত্র শীর্ষবিন্দু V লেখটি থেকে বাদ দিলেই লেখটি বিচ্ছিন্ন হয়ে
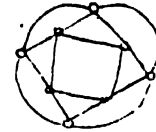
চিত্র-4

যায় অর্থাৎ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু চিত্র-4-এ অন্ততঃপক্ষে চারটি শীর্ষবিন্দু বা চারটি পার্শ্বরেখা বাদ দিলে তবেই লেখটি বিচ্ছিন্ন হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত দৃঢ়। দেখা যাবে যে দুটি লেখতেই শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা ও পার্শ্বরেখার সংখ্যা সমান। সমস্যাটিকে অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে। ধরা যাক কয়েকটি শহর নির্দিষ্ট সংখ্যক রাস্তার দ্বারা সংযুক্ত করতে হবে। কিভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুললে তা সর্বাপেক্ষা দৃঢ় হবে তা নির্ণয়ের জন্যও লেখতত্ত্বের সাহায্য নেওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ চিত্র-3 ও চিত্র-4-এ শীর্ষ-বিন্দুর সংখ্যা 8 ও পার্শ্বরেখার সংখ্যা 16, কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত দৃঢ়।

ধরা যাক, কোন গোপন বার্তা প্রেরণের জন্য কয়েকটি সাংকেতিক শব্দ (code word) রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকটি প্রায় অনুরূপ

তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা দুরূহ। এখন সমস্যা হলো এর মধ্য থেকে সর্বাধিক কোন্ কোন্ শব্দ বার্তা প্রেরণের জন্য নির্বাচন করলে ভ্রমের কোন সম্ভাবনা থাকবে না তা নির্ণয় করা। এক্ষেত্রে সাংকেতিক শব্দগুলিকে কোন লেখের শীর্ষবিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে। কোন দুটি শব্দ প্রায় অনুরূপ হলে সেই শীর্ষবিন্দু দুটিকে একটি পার্শ্বরেখা দ্বারা যুক্ত করা হয়। এভাবে যে লেখ পাওয়া যাবে তার শীর্ষবিন্দুগুলিকে আমরা কয়েকটি সেটে (set) এমনভাবে ভাগ করতে পারি যাতে কোন সেটের অন্তর্ভুক্ত শীর্ষবিন্দুগুলির কোনটিই সেটের অন্তর্ভুক্ত অন্য কোন শীর্ষবিন্দুর সন্নিহিত না হয়। এই সেটগুলির মধ্যে যেটিতে শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা সর্বাধিক সেটিকে নির্বাচন করলেই নির্ণেয় সাংকেতিক শব্দগুলি পাওয়া যায়।
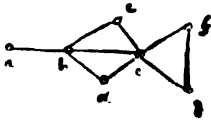
চিত্র-5

চিত্র-5-এ এরূপ একটি লেখ দেখানো হয়েছে। সাংকেতিক শব্দগুলিকে শীর্ষবিন্দু a, b, c, d, e, f, g দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। a ও b প্রায় অনুরূপ, তাই তারা একটি পার্শ্বরেখা দ্বারা সংযুক্ত। অনুরূপভাবে অন্য পার্শ্বরেখাগুলি পাওয়া গেছে। এই লেখের ক্ষেত্রে (a, c. d, f) ও (b, f) সেট দুটিতে শীর্ষবিন্দুগুলিকে ভাগ করা যেতে পারে। দেখা যাবে যে প্রথম এবং দ্বিতীয় সেটে কোন শীর্ষবিন্দুই সেটের অন্তর্ভুক্ত অন্য কোন শীর্ষবিন্দুর সন্নিহিত নয়, কিন্তু এই সেট দুটিতে অন্য কোন শীর্ষবিন্দু অন্তর্ভুক্ত করলেই সেটের এই ধর্ম বর্তমান থাকবে না। যেহেতু প্রথম সেটে শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা সর্বাধিক তাই a, c, d, f শব্দগুলিকে বার্তা প্রেরণের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

ধরা যাক কয়েকটি কাজের জন্য কয়েকজন লোককে নির্বাচন করা হলো যারা একাধিক কাজে দক্ষ। কাকে কোন্ কাজে নিয়োগ করা হবে তা লেখতত্ত্বের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। লোকগুলিকে ও কাজগুলিকে একটি লেখের শীর্ষবিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয় এবং কোন ব্যক্তি যে কাজ সমূহে দক্ষ সেগুলিকে পার্শ্বরেখা দ্বারা যুক্ত করা হয়।
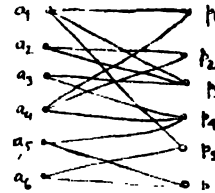
চিত্র-6

উদাহরণস্বরূপ, চিত্র-6-এ a_1, a_2,..., a_6 হলো ছয় জন লোক যারা প্রত্যেকে p_1, p_2...p_6 কাজের মধ্যে কয়েকটি কাজে দক্ষ। a_1 দ্বারা নির্দেশিত ব্যক্তি p_1, p_3 ও p_5 কাজে দক্ষ, a_2 দ্বারা নির্দেশিত ব্যক্তি p_2 ও p_3 কাজে দক্ষ, ইত্যাদি। ফলে a_1-কে p_1, p_3, p_5, a_2-কে p_2 ও p_3-এর সঙ্গে পার্শ্বরেখা দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্য পার্শ্বরেখাগুলি যুক্ত হয়েছে। লেখতত্ত্বের সাহায্যে নির্ণয় করা যায় যে a_1, a_2,..., a_6-কে যথাক্রমে (p_1, p_2, p_3, p_4, p_6, p_5) বা (p_5, p_2, p_3, p_1, p_4, p_6) কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে।

ধরা যাক, তিনটি বাড়ীতে জল, বিদ্যুত ও গ্যাস সরবরাহ করতে হবে। স্পষ্টতঃই যদি সরবরাহ কেন্দ্রগুলি থেকে সংযোগকারী নল বা তারগুলি এমনভাবে নিয়ে যাওয়া যায় যে তারা একে অপরকে ছেদ করে না অর্থাৎ পরস্পর আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত না হয় তা হলে সংযোগ স্থাপনের ও পরবর্তীকালে রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা হবে। যদি বাড়ীগুলিকে ও সরবরাহ কেন্দ্রগুলিকে কোন লেখের শীর্ষবিন্দু দ্বারা ও সংযোগগুলিকে পার্শ্বরেখার

দ্বারা চিহ্নিত করা হয় তবে যে লেখ পাওয়া যায় তা যদি সমতালিক (planar) হয় (অর্থাৎ লেখটিকে কোন সমতলে এমনভাবে অঙ্কিত করা যায় যাতে পার্শ্বরেখাগুলি পরস্পর ছেদ না করে) তবেই চাহিদা অনুযায়ী সংযোগ স্থাপন সম্ভব। লেখতত্ত্বের সাহায্যে কোন লেখ সমতালিক কি না তা নির্ণয় করা যায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে লেখটি অসমতলিক (nonplanar)। ফলে চাহিদা অনুযায়ী সংযোগ সম্ভব নয়।

প্রবন্ধ দীর্ঘায়িত হয়ে যাচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে লেখতত্ত্বের প্রয়োগ ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত। তাই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সবগুলির উল্লেখ সম্ভব নয়। কেবলমাত্র সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে কিভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে লেখতত্ত্ব কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ছাড়া সদিক লেখের (directed graph) বিষয়ে কোন আলোচনা করাও স্থানাভাবে সম্ভব হলো না।

1967 সালেই বিশ্ব আবহ সংস্থা ও আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ইউনিয়ন পরিষদ বিশ্বব্যাপী আবহ গবেষণার একটি কর্মসূচী রূপায়িত করতে শুরু করেন। বেশ কয়েকটি পরীক্ষাকার্যও সম্পন্ন হয়। তার মধ্যে যেটি প্রধান, প্রথম বিশ্বব্যাপী পরীক্ষাকার্য, সেটি শুরু হয়েছে গত বছর। এই পরীক্ষাকার্যের লক্ষ্য আবহ প্রক্রিয়ার উৎকৃষ্টতর মডেল নির্মাণ, আবহাওয়ার পূর্বাভাষ-দানের সীমানা নির্ধারণ, আবহাওয়ার গড়নের নিয়মিত লক্ষণগুলি বিশদীকরণ। সমগ্র কর্মসূচীর চূড়ান্ত লক্ষ্য তাই।

প্রথম বিশ্বব্যাপী পরীক্ষাকার্যের ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা হয় এই ঘটনা থেকে যে এই পরীক্ষাকার্যে যোগ দিয়েছিল পঞ্চাশটিরও অধিক দেশ, প্রায় 2,700 আবহ স্টেশন, 800-এরও অধিক বিমান কেন্দ্র, কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ, বিমান, স্বয়ংক্রিয় বেলুন ও অন্যান্য যান ও ব্যবস্থা, এবং তদুপরি পাঁচটি সোভিয়েত জাহাজ সমেত কুড়িটিরও অধিক গবেষণা-জাহাজ।

গত কয়েক বছরের মধ্যে রেডিও অনুসন্ধান, কম্পিউটর ও কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহের দৌলতে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ-দানের ব্যাপারে সঠিকতা বহুল পরিমাণে উন্নত হয়েছে।

এনজাইম

(1)

হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়*

প্রকৃতি ও পরিচয়—প্রোটিনঘটিত এবং সহজাত অন্য কতক কার্মিক যৌগ মূলক (prosthetic group) যুক্ত (conjugated) দ্রবণীয় এবং আঠালো (colloidal) আর এক প্রকার জৈব অনুঘটক জীবকোষে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের অনুঘটন তৎপরতা জীবকোষের বাইরেও সমান থাকে (নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত, E. Buchner, 1907)। ছত্রাক জীবাণু ঈস্ট্ কোষেই সর্বপ্রথম এদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে বলে নাম হলো এনজাইম (en-zyme মানে "in yeast") বা উৎসেচক। এরা জীবদেহের সকল ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে, যথা—পরিবেশন, পরিবর্ধন, চলন, শ্বসন, প্রজনন, সালোক-সংশ্লেষণ (photosynthesis), শক্তি উৎপাদন ও কর্মে নিয়োজন। এরাই উদ্ভিদ এবং প্রাণিকুলের প্রাণ-সঞ্জীবনী সুধা।

একটি নির্দিষ্ট এনজাইম শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়কেরই (substrate) পরিবর্তন ঘটাতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই জীবকোষে বিভিন্ন রকম প্রাণরাসায়নিক পরিবর্তন সাধনের জন্য অসংখ্য এনজাইম রয়েছে। এদের প্রভাবিত (catalytic) যৌথ ক্রিয়ায় (action) প্রাণের দীপশিখা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বিকৃতির ফলে বিপর্যয় ঘটে। শরীরে কোন এনজাইমের অভাব হলে কিম্বা এর কাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কোন পদার্থ বা ত্রুটিপূর্ণ কোন এনজাইম থাকলে তা নানা বংশগত ব্যাধির কারণ হতে পারে। কোন কোন রোগের প্রকোপে মানুষের সিরামে, মানে রক্তের জলীয় অংশে, এনজাইমের স্বাভাবিক মাত্রায় গুরুতর পরিবর্তন হতে পারে, তখন এই মাত্রার (যথা—LDH আইসোজাইম) আপেক্ষিক হ্রাস-বৃদ্ধি

অনুঘটন—জড় জগতে যে পদার্থ অন্য পদার্থের সঙ্গে মিলে মিশে তার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়, সেটা তাড়াতাড়ি কিংবা ধীরে ধীরে শেষ হতে প্রভাবিত করে, অথচ নিজের কোন স্থায়ী পরিবর্তন হয় না, যদিও কিছু ভৌতিক বা বাহ্যিক পরিবর্তন হতে পারে, সে পদার্থকে অনুঘটক বা প্রভাবক (catalyst) এবং বিক্রিয়াকে অনুঘটন বা প্রভাবন (catalysis) বলা হয়। অনুঘটকের কয়েকটি সাধারণ ধর্ম হচ্ছে—(1) খুব সামান্য মাত্রায় প্রচুর পরিমাণ পদার্থের বিক্রিয়া ঘটাতে পারে; (2) মাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়ার গতিও বাড়তে পারে; (3) অনুঘটক বিক্রিয়ায় সাময়িক অংশগ্রহণ করলেও বিক্রিয়াশেষে নবজাত পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে নিজে মূল পদার্থে পরিণত হয়, বাইরের চেহারা অন্য রকম দেখাতে পারে। যেমন—পটাসিয়াম ক্লোরেট থেকে উচ্চ তাপাঙ্কে (600° সে.) অক্সিজেন নির্গত হয়, ম্যাঙ্গানীজ ডাইঅক্সাইড থেকে হয় না, কিন্তু ক্লোরেটের সঙ্গে এক-চতুর্থাংশ ম্যাঙ্গানীজ ডাইঅক্সাইড মিশিয়ে দিলে মাত্র 200° সে. উষ্ণতায়ই দ্রুত অক্সিজেন নির্গত হয়। ম্যাঙ্গানীজ ডাইঅক্সাইড অবিকৃত থাকে, যদিও এর গুঁড়াগুলি আগের চেয়ে মিহি হয়। এ বিক্রিয়ায় এটি অনুঘটক। হাইড্রোজেন পারক্সাইড এমনি রেখে দিলে ধীরে ধীরে জল ও অক্সিজেনে পরিণত হয়, কিন্তু একটুমাত্র ফসফরিক অ্যাসিড মিশিয়ে রাখলে তা দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে। এক্ষেত্রে ফসফরিক অ্যাসিড অনুঘটক। চকচকে প্লাটিনাম তার সহযোগে অ্যামোনিয়া জারিত হওয়ার পর সেই তারই হয় খসখসে।

* 602, ব্লক O, নিউ আলিপুর, কলিকাতা700053

নির্ণয় করা রোগ বিনিশ্চয়ের একটি প্রকৃষ্ট পন্থা (ল্যাকটেইট ডি-হাইড্রোজিনেজ আইসোজাইম)। দীর্ঘকাল বহু ক্লেশ, গবেষণা ও অর্থব্যয় করেও রসশালায় যা করা যায় না. তাই জীব-কোষে স্বচ্ছন্দে, শান্ত এবং ধীর পরিবেশে এনজাইমকুল অনুঘটন প্রক্রিয়ায় সাধন করে। চার শতাংশ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড একমাসে যতটা দুগ্ধশর্করা (lactose) আর্দ্রবিশ্লেষণ (hydrolysis) করতে পারে এনজাইম ল্যাকটেজ (lactase) এক ঘন্টায় তার চেয়েও বেশি করে থাকে। মদ্যাদি চোলাইয়ের জন্য ব্যবহৃত ঈষ্ট্‌ কোষে (yeast cell) 'মলটেড' (maltase), 'ইনভারটেজ' বা 'সুক্রেজ' (invertase or sucrase) ও 'জাইমেজ' (zymase) —এই তিনটি এনজাইম থাকে। ঝোলাগুড়ের দ্রবে সামান্য একটু ঈষ্ট্‌ নির্যাস মিশিয়ে দিলে তা গাঁজিয়ে ওঠে (fermented) এবং প্রচুর ফেনা ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ((CO_2) উদ্গত হয় (fermentation)। প্রথমে চিনি বা ইক্ষুশর্করা (sucrose) সুক্রেজের সাহায্যে আর্দ্রবিশ্লেষ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ (glucose) বা দ্রাক্ষাশর্করা ও ফ্রাক্‌টোজ (fructose) বা ফল শর্করায় পরিণত হয়। পরে এ দুটি থেকে জাইমেজের সাহায্যে কোহল উৎপন্ন হয়: (চিত্র-1)।

$$\underset{\text{চিনি}}{C_{12}H_{22}O_{11}} + H_2O \xrightarrow{\text{সুক্রেজ}} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ফ্রাক্‌টোজ}}{C_6H_{12}O_6}$$

$$\xrightarrow{\text{জাইমেজ}} 4\,\underset{\text{কোহল}}{C_2H_5OH} + 4\,C_2O_2$$

চিত্র-1
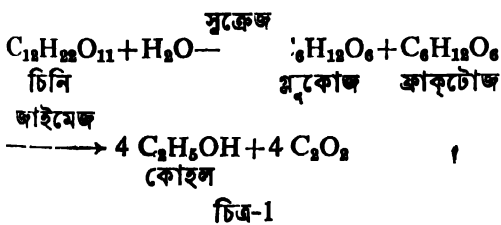
এনজাইমগুলি সবই প্রোটিন পদার্থ, কাজেই সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা (test) অন্য প্রোটিন থেকে এদের সনাক্ত করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র বিক্রিয়কের উপর অনুঘটন কুশলতা পরীক্ষা করেই এদের অস্তিত্ব জানা যায়। ভিজা অবস্থায় 100° সে. তাপাঙ্কে এদের সক্রিয়তা নষ্ট হয়ে যায়। একটি প্রশমিত (neutral) দ্রবে একটু স্টার্চ বা ময়দা গুলে 37° সে. উষ্ণতায় রেখে দিয়ে পরে পরীক্ষা করে যদি চিনি পাওয়া যায়, তবে কোন অনুঘটক আছে বুঝা যাবে। আর একটু দ্রব ফুটিয়ে (100° সে.) পরে পরীক্ষা করে চিনি পাওয়া না গেলে বুঝা যাবে অনুঘটকটি এনজাইম ছাড়া অন্য কোন অজৈব পদার্থ নয়। সাধারণতঃ 37-50° সে. উষ্ণতায় দ্রবীভূত অবস্থায় এরা সক্রিয় থাকে, 37° সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা। কখনো কখনো এনজাইম প্রভাবিত বিক্রিয়ায় প্রতি 10° উষ্ণতা বাড়ালে বা কমালে বিক্রিয়ার গতি যথাক্রমে প্রায় দ্বিগুণ বা অর্ধেক হয়। এক-একটি এনজাইম দ্রবস্থিত হাইড্রোজেন আয়নের (H^+ ion) একেকটি নির্দিষ্ট গাঢ়তায় সর্বাধিক কর্মক্ষম।

পরিভাষা—টায়ালিন (ptyalin), পেপসিন (pepsin), ইরেপসিন (erepsin), প্রভৃতি কয়েকটি পুরানো নাম বাদে, বিক্রিয়া বা বিক্রিয়কের নামের শেষাংশ বদলে, "-ase" যোগ করে যা হয় তাই হবে সংশ্লিষ্ট এনজাইমের নাম। এরূপ নামকরণ বিশেষ অর্থপূর্ণ, কার্মিক (functional) এবং বিজ্ঞানসম্মত। যথা—

এনজাইম	বিক্রিয়া/বিক্রিয়ক	লব্ধ পদার্থ
মলটেজ (maltase)	মলটোজ (maltose)	গ্লুকোজ
ল্যাকটেজ (lactase)	ল্যাক্‌টোজ (lastose)	গ্লুকোজ+ গ্যালাক্‌টোজ
সুক্রেজ (sucrase)	সুক্রোজ (sucrose)	গ্লুকোজ+ ফ্রাক্‌টোজ
হাইড্রোলেজ (hydrolase)	[আর্দ্রবিশ্লেষণ] (hydrolysis)	—

অক্সিডেজ (oxidase) [জারণ] (oxidation)—

গবাদিপশু ও অন্যান্য প্রাণীর শারীরকলা (tissue) থেকে দেড় শতাধিক বিশুদ্ধ ও

কেলাসিত (crystalline) এনজাইম প্রস্তুত করা হয়েছে। রাসায়নিক পদ্ধতিতে (chromatography) বিশ্লেষণ করে এগুলি থেকে সর্বাধিক 22 বিভিন্ন আলফা অ্যামিনো অ্যাসিড উপাদান পাওয়া গেছে। ∝-অ্যামিনো অ্যাসিডের আণবিক গঠনে একই কার্বন পরমাণুর সঙ্গে অ্যামিনো (NH_2—) ও কার্বক্সিল (—COOH) মূলক যুক্ত থাকে। এরূপ শতাধিক অণু পর পর একের কার্বক্সিল অন্যের অ্যামিনো মূলকের সহযোগে জল (H_2O)—বিযুক্ত হয়ে মিলিত হয়।

লগ্ন (NH) হাইড্রোজেন ও তৃতীয় সেতুর কার্বনিলের (CO) অক্সিজেন অংশগ্রহণ করে (চিত্র 3)। এমনিভাবে এনজাইমের অণুশৃঙ্খল গোল অথবা ডিমের আকারে জটপাকানো অবস্থায় জীবকোষের অভ্যন্তরে প্রোটোপ্লাজমে (protoplasm) সক্রিয় থাকে এবং জন্মাবধি জীবনের মহাস্রোত নিয়ন্ত্রণ করে।

অনেক এনজাইম কতগুলি অপ্রোটিন কার্মিক যৌগমূলক (prosthetic groups) যুক্ত (conjugated)। মূলক বিভিন্ন জৈব ও অজৈব উপাদানে

HO.CO.CHR.NH2 + HO.CO.CHR′.NH2 + HO.CO.CHR″.NH2 + HO.CO.CHR‴.NH
HO.CO.CHR.NH.CO.CHR′.NH.CO.CHR″.NH.CO.CHR‴.NH.
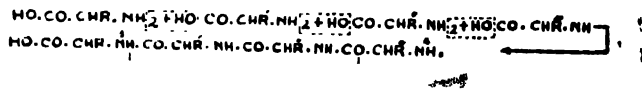
চিত্র-2

এভাবেই প্রোটিনের বহুযৌগ অণু (polymer) বা পলিপেপটাইড শৃঙ্খল (polypeptide chain) সৃষ্টি হয় (চিত্র-2)।

"NH.CO." পেপটাইড সেতু (peptide link) দিয়ে অ্যামিনো অ্যাসিড ইউনিট বা উপাদানগুলি (—NH. CH. CO—) যুক্ত রয়েছে। R,R′.. মানে এক অণু অ্যামিনো অ্যাসিড—(বিয়োগ $CH(NH_2)$, COOH. একই অণুতে সিস্টিন (cystein) জনিত (R.SH) এক বা একাধিক পেপটাইড শৃঙ্খল আড়াআড়িভাবে যুগ্ম সালফার (S—S) বা ডাইসালফাইড বন্ধনে (disulphide link) আটক থাকতে পারে: $R.SH + HS.R' \xrightarrow{O} R.S{-}S.R'$ (R, R′ শৃঙ্খলের বাকী অংশ)। এনজাইমের প্রতিটি ∝-পলিপেপটাইড শৃঙ্খল পাকদণ্ডী বা ঘুরানো সিঁড়ির মত (spiral stair-case) যার ধাপগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের শাখা-শৃঙ্খল, অথবা গদি-আঁটা স্প্রিংয়ের মত প্যাঁচানো, প্যাঁচগুলি হাইড্রোজেন বন্ধনী দ্বারা আঁটা থাকে, যাতে একটি পেপটাইড সেতুর নাইট্রোজেন-

চিত্র-3
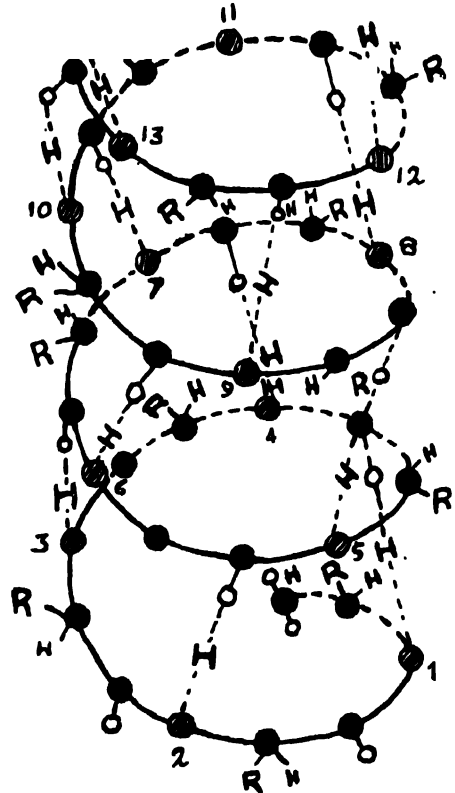
গঠিত, যথা—(ক) দু-রকম নিউক্লিক অ্যাসিড (nucleic acid)। এ থেকে বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেছে—ফসফরিক অ্যাসিড, দু-জাতীয় শর্করা, পিউরিন (purine) ও পিরিমিডিন (pyrimidine) ঘটিত উপক্ষারীয় পদার্থ; (খ) ফসফরাস, নাইট্রোজেন ও শর্করাঘটিত চর্বি ও জৈব মোমজাতীয় পদার্থ (lipids); (গ) লৌহঘটিত রঞ্জক পদার্থ। এদের বাস নিউক্লিয়াসে (nucleus)। কিছু কিছু মূলক শাখা-প্রশাখার মত পেপটাইড শৃঙ্খলের গায়ে বিশেষ বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড ইউনিটের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। এ অঞ্চল বা অকুস্থলেই (active site or substrate site) এনজাইম-বিক্রিয়ক (substrate) প্রথম মুখোমুখি হয়। এদের মধ্যে কয়েকটি ঝিল্লী-বিশ্লেষণ (dialysis) দ্বারা পেপটাইড শৃঙ্খল থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়; এ ছাড়া আরও কতগুলি সহজাত অপ্রোটিন পদার্থ বহু এনজাইম প্রভাবিত বিক্রিয়ার পক্ষে অত্যাবশ্যক। এদেরকে বলা হয় কোএনজাইম (coenzyme) বা দ্বিতীয় বিক্রিয়ক। কোএনজাইম ও ভিটামিন-বি প্রায়ই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, কার্মিক মূলকের উপাদান। অ্যামিনো অ্যাসিডের বিপাক প্রক্রিয়ায় (metabolism) যে সকল এনজাইম অংশ-গ্রহণ করবে তাদের ঐ ভিটামিন বি-সমৃদ্ধ কো-এনজাইম একান্ত প্রয়োজন। কোএনজাইমের কাজ সাধারণতঃ বিক্রিয়ক থেকে পরমাণু বা মূলক গ্রহণ করা বা অন্যত্র বর্জন করা।

একই তলে সমবর্তিত (plane polarised) একবর্ণ (monochromatic) আলোকরশ্মি কোন কোন গলিত পদার্থের মধ্য দিয়ে যেতে দিলে তার গতিপথ ডানে বা বামে বেঁকে যায়। তাই পদার্থকে দক্ষিণাবর্ত (dextro-rotatory) বা বামাবর্ত (levo-rotatory) বলে চিহ্নিত করা হয়।

বিশ্লেষণ—জীবকোষ থেকে যে বিশুদ্ধ ও কেলাসিত এনজাইম প্রস্তুত করা হয়েছে সেগুলির গুণাবলী পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তাদের অনুঘটন-তৎপরতা (catatytic activity) স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। ঘালমূলো (horse-raddish) থেকে বিজ্ঞানী উইল্‌স্টেটর ও পোলিঙ্গার (Willstatter & Pollinger) পারক্সিডেজ (peroxidase) নামে যে বিশুদ্ধ এনজাইমটি নিষ্কাশন করেছেন তার প্রতি গ্রাম পদার্থের সক্রিয়তা 20,000 গ্রাম স্বাভাবিক বস্তুর সক্রিয়তায় সমতুল। রাসায়নিক প্রণালীতে বিশুদ্ধ ইনসুলিনের (অন্তঃক্ষরা হর্মোন প্রোটিন) উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এই প্রথম একজন বিজ্ঞানী প্রোটিন অণুর মৌলিক নির্মাণ কৌশল (primary structure) ও সংযুতি-সঙ্কেত (structural formula) সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, (F. Sanger, নোবেল পুরস্কার, 1958)। গোমাংসলব্ধ এই প্রোটিনে আছে দুটি পেপটাইড শৃঙ্খল আড়াআড়ি দুটি ডাইসালফাইড (—S—S—) বন্ধনে সংবদ্ধ এবং 17 বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের যথাক্রমে 30 ও 21 অ্যাসিড ইউনিট দ্বারা গ্রথিত বা গঠিত। শৃঙ্খল বরাবর অ্যাসিডগুলির ক্রম, নাম, রকম ও সংখ্যা (order, kind and number or sequence) জানা গেছে। আণবিক গুরুত্ব—12,000 ড্যালটন, প্রতি ইউনিট (pH 5.4)। অল্পমাত্রায় নিউক্লিক অ্যাসিড ও পিউরিন প্রোটিন খাদ্যের বিশেষতঃ মাংসের সাধারণ উপাদান। হজমের প্রক্রিয়ায় অগ্ন্যাশয় (pancreas) নিঃসৃত দুটি এনজাইম—'রিবোনিউক্লিয়েজ (ribonuclease) ও ডিঅক্সিরিবোনিউক্লিয়েজ (deoxyribonuclease)' নিউক্লিক অ্যাসিডের বিশ্লেষণ ঘটায়। বিশুদ্ধ রিবোনিউক্লিয়েজ (গো) এনজাইমটি পারফরমিক অ্যাসিড (performic acid) দিয়ে জারিত করে এর অণুশৃঙ্খলের অ্যামিনো অ্যাসিড ইউনিটগুলির ক্রম, নাম ও সংখ্যা (sequence) নিশ্চিতরূপে নির্ণয় এবং অণুশৃঙ্খলের প্রাথমিক গঠন-প্রণালী স্থির করেছেন বিজ্ঞানী হার্স, মুর ও স্টীন (Hirs,

Moore & Stein, 1960)। এর অণুও 17টি বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের 124 ইউনিট দ্বারা গঠিত একটি মাত্র পেপটাইড শৃঙ্খল, গুটানো এবং চার জায়গায় ডাইসালফাইড বন্ধনে বাঁধা থাকে। অ্যামিনো অ্যাসিড ইউনিট 119 এবং 12-য়ের মধ্যে অণুশৃঙ্খলের ফাঁকে (cleft) ফসফেট আয়নের(PO'''_4) বন্ধন অকুস্থল বা বিক্রিয়ক স্থলের নিশানা (চিত্র-4)।

লাইসোজাইম (lysozyme) নামক একটি এনজাইম অশ্রু, শ্লেষ্মা, দুধ ও ডিমের সাদা অংশে পাওয়া যায়। এরও আণবিক গঠন-প্রণালী জানা গেছে। একটিই পেপটাইড শৃঙ্খল, 20 বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের 129 ইউনিট দিয়ে তৈরী। নিজের কুণ্ডলীর চার জায়গায় ডাইসাল-ফাইড বন্ধনে রয়েছে। আণবিক গুরুত্ব 15,000 ড্যালটন। রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে এনজাইমের ত্রিমাত্রিক গঠন-প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে।
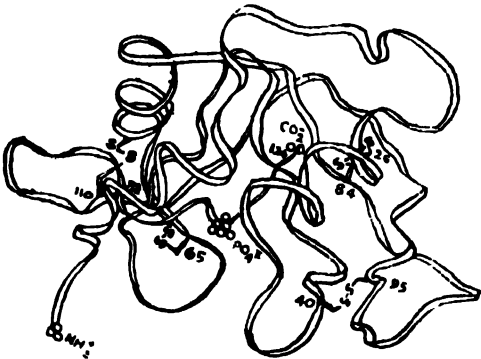
চিত্র-4

বিক্রিয়া ঘটাতে এনজাইমবর্গের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য—এমিল ফিশারের (Emil Fisher) আদর্শমত এনজাইম-বিক্রিয়ক জুড়ির মধ্যে তালা-চাবি সম্পর্ক (চিত্র-5)। যেমন একটি তালায় একটি নির্দিষ্ট চাবিই লাগে, চাবি ঘুরালে লীভার-গুলি ঠিক ঠিক চাবির খাঁজে খাঁজে বসে, তেমনি একটি এনজাইম সাধারণত একটি নির্দিষ্ট পদার্থেই বিক্রিয়া ঘটাতে পারে। দৃষ্টান্ত: আরজিনেজ (arginase), ক্যাটালেজ (catalase) ইউরিয়েজ (urease), যথাক্রমে কেবল আরজিনিন (arginine), হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ও ইউরিয়ার সঙ্গে (urea) বিক্রিয়া করতে পারে। মলটেজ, ল্যাকটেজ যথাক্রমে মলটোজ ও ল্যাকটোজ আর্দ্রবিশ্লেষণ করতে পারে, কিন্তু এরা কেউই অন্যকে বা সুক্রোজকে বিক্রিয়াধীন করতে পারে না। সুক্রেজই সুক্রোজের সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারে। অন্য কোন শর্করার সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারে না। এসব শর্করার আণবিক সঙ্কেত একই, $C_{12}H_{22}O_{11}$। এনজাইমের বহুমুখী রাসায়নিক প্রভাবের (catalytic activity) কারণ প্রোটিন ও অপ্রোটিন কার্মিক (functional) যৌগমূলক—অ্যামিনো, কার্বক্সিল, সালফার(—SH) ও নিউক্লিক অ্যাসিড, যা পেপটাইড শৃঙ্খলের শাখায় থাকতে পারে। এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়কের সহযোগে একটি অস্থায়ী জটিল যুগ্ম গঠন। এটা সম্ভব হয় যদি উভয় অণুর যথাযথ কার্মিক মূলক ত্রিমাত্রিক সহাবস্থানের মাধ্যমে বিক্রিয়কের অণুর অন্ততঃ তিনটি যোগ্য বিন্দুতে পরস্পর মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। একটি নির্দিষ্ট জুড়ির পক্ষেই এটা সম্ভব। এ মিলন ঘটে হাইড্রোজেনের কোমল বন্ধনে (hydrogen bonds):

এনজাইম + বিক্রিয়ক → এনজাইম-বিক্রিয়কযুগ্ম → লব্ধ পদার্থ + এনজাইম
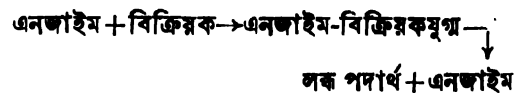
সহজাত অপ্রোটিন মূলক 'কো-এনজাইম' এই যুগ্ম ছিন্ন করে এনজাইম মুক্ত করে, সঙ্গে সঙ্গে নতুন পদার্থের জন্ম হয়।

চিত্র-5

শ্রেণীবিভাগ—সাধারণতঃ প্রভাবিত বিক্রিয়ার

ধরণ অনুসারে এদের শ্রেণীভুক্ত করা হয়. (1) জারক-বিজারক এনজাইম (oxido-reductases) জারণ ও বিজারণ বিক্রিয়ার সহায়ক, যথা—'ক্যাটালেজ' (catalase) জীবকোষের ক্ষতিকর হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বিজারিত করে নষ্ট করে। 'পারক্সিডেজ' (peroxidase) দ্বারা জারিত হয়ে কোহল টকে যায়; (2) আর্দ্রবিশ্লেষক এনজাইম (hydrolases)—এরা সরাসরি জলীয় উপাদান ($H+OH^-$) সুযোগে খাদ্যপরিপাকক্রিয়ার সহায়ক। যথা—পলিস্যাকারেজ, গ্লাইকোসিডেজ কার্বহাইড্রেটকে, এস্টারেজ, লাইপেজ ফ্যাটকে এবং পেপটিডেজ বা পেপসিন, ট্রিপসিন প্রোটিনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত করে; (3) প্রতিস্থাপক এনজাইম (transferases)—এরা একটি মূলকের R, A অণু থেকে B অণুতে প্রতিস্থাপনের সহায়ক: $A.R+B \rightleftharpoons A+B.R$। শরীর গঠনে বা জৈব সংশ্লেষণে (biosynthesis) এদের ভূমিকা অপরিহার্য; (4) লায়াজেজ (lyases)—এরা আর্দ্রবিশ্লেষণ, জারণ বা বিজারণ ছাড়া কোন মূলক যৌগে সংযুক্ত বা বিযুক্তকরণে সহায়তা করে, যথা—'ডিকার্বক্সিলেজ' অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বিতাড়িত করতে পারে:

$$R.COOH \xrightarrow{-CO_2} R.H$$

; (5) সংশ্লেষক এনজাইম (synthetasis or ligases)—এরা একাধিক অণু যোগসূত্রে গেঁথে বৃহৎ অণুশৃঙ্খল তৈরির সহায়ক। যথা—গ্লুট্যামিন সিনথেটেজ; ডি.এন.এ. পলিমারেজ—(DNA polymerase) এর প্রভাবে নিউক্লিয়োটাইড (nucleotides) অণুসমূহ জুড়ে জুড়ে ডি. এন. এ. পলিনিউক্লিয়োটাইড শৃঙ্খল তৈরি হয়। এই শৃঙ্খলের দুটি প্রান্ত±আবার "ডি.এন.এ. লিগেজ"-এর সাহায্যে যুক্ত হয়ে কাচপাত্রে জন্ম নিল "সারকিউলার ডি. এন. এ" (circular DNA), ভাইরাসের (viral strain) একটি নতুন সংস্করণ।

সংশ্লেষণ—পিট্স্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বিজ্ঞানী 51 অ্যামিনো অ্যাসিড ইউনিট সংযুক্ত করে স্বাভাবিক ইনসুলিনের মতই ফলপ্রদ কৃত্রিম ইনসুলিন, একটি হরমোন প্রোটিন, সংশ্লেষণ করেছেন (1963)। কিন্তু পণ্য হিসেবে এই প্রস্তুত প্রণালী সার্থক হয় নি। হারুনা ও স্পীগেলম্যান (Haruna & Spiegelman, 1965) প্রাণ-রাসায়নিক পদ্ধতিতে একটি পলিমারেজ (Poly merase)-এর সাহায্যে কাচপাত্রে স্বাভাবিক ভাইরাসের মত সংক্রামক একটি প্রোটিন—"রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড (RNA)" প্রস্তুত করেছেন। অনুরূপভাবে তিন বিজ্ঞানী (Goulian, Kornberg & Sinsheimur, 1967) কোলাই জীবাণু (E coli) ফাজ (phage) থেকে লব্ধ ডি. এন. এ (DNA) পলিমারেজের সাহায্যে কাচপাত্রে আর একটি প্রোটিন—"ডিঅক্সিনরিবোনিউক্লিক অ্যাসিডের (DNA)" সংশ্লেষণ সম্পন্ন করেছেন। এটি স্বাভাবিক পদার্থের মতই সক্রিয়। রিবোনিউক্লিয়েজের সম্পূর্ণ গঠন-প্রণালী এবং রাসায়নিক পরিচয় জানবার ফলশ্রুতি—গবেষণাগারে এর সংশ্লেষণ—মানুষের প্রথম এনজাইম সংশ্লেষণের গৌরব [H. A. Harper's Review, 1971]। (ক্রমশঃ

দামোদর আজও দুঃখের নদ কেন ?

শিবরাম বেরা*

(2)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এ কথা ঠিক যে, ঐ পথের উপরাংশে দামোদরের ও নিম্নাংশ দ্বারকেশ্বরের বর্তমান জল-বহন ক্ষমতা 2 লক্ষ কিউসেকের কম। কিন্তু (1) পথটি পূর্বপথের তুলনায় ছোট হওয়ায় ঢাল বেড়ে প্রবাহমাত্রা বাড়বে; (2) পথটিতে বাঁক প্রায় না থাকায় জলের গতি কোথাও ব্যাহত হবে না ; ফলে প্রবাহমাত্রা বেড়ে যাবে ; (3) নদীর গতিমুখ ও প্রবাহিত অঞ্চলের ঢালের দিকে নদীর সরল পথটি গড়ে ওঠায় নদী নিজ গতিতে তার পথ কেটে চলবে ও (4) উপরের পাহাড়ী পথের অর্জিত দ্রুতগতি অনেক দূর বজায় থাকায় নদীপথে জলের গতি যথেষ্ট বাড়বে। উপরিউক্ত চারটি কারণে প্রবাহমাত্রা বহুগুণ বেড়ে যাবে। এছাড়া বর্তমানে কংসাবতীসহ শিলাবতী ও হুগলী নদী প্রায় লম্বভাবে রূপনারায়ণে পতিত হওয়াতে রূপনারায়ণ ও ঐ নদী দুটি পরস্পরের বিরুদ্ধে জলের প্রাচীর গড়ে তুলছে। কিন্তু কংসাবতীকে মেদিনীপুর থেকে 2 নং পথে কালিয়াঘাই নদীতে ও পরে কসবা অঞ্চল দিয়ে রসুলপুরের নদীতে পরিচালিত করা যেতে পারে। তখন শিলাবতীকে নাড়াজোল থেকে 3 নং পথে হলদীতে প্রবাহিত করলে কংসাবতী ও শিলাবতীর জল আর রূপনারায়ণে জলের প্রাচীর গড়ে তুলবে না। এছাড়া গেঁওখালি থেকে হলদিয়া পর্যন্ত প্রস্তাবিত 1 নং পথটি রূপনারায়ণ ও হুগলী নদী দুটির পথের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় ঐ জলের প্রাচীরটিও মিলিয়ে যাবে। ফলে প্রবাহমাত্রা যথেষ্ট বাড়বে। [দ্রষ্টব্য - লেখকের পরিকল্পিত নদী সংস্কারই বন্যা-নিয়ন্ত্রণের সঠিক পথ, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ফেব্রুয়ারী 1979 সংখ্যা] এর পর নদীটির বিস্তার সুষমভাবে গড়ে তুললে নদী নিজেই তার পথকে গভীর করে নেবে এবং তখন ঐ পথে প্রায় 7 লক্ষ কিউসেক হারে জল প্রবাহিত হওয়া অসম্ভব হবে না। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, গেঁওখালি থেকে কুলপি পর্যন্ত পথটি রূপ-নারায়ণের খাত এবং কুলপি থেকে হুগলী মোহানার পথটি অধুনালুপ্ত আদিগঙ্গার খাত হওয়ায় ঐ নদীপথটি প্রায় অর্ধ-বৃত্তাকার রূপ পেয়েছে, যাকে দামোদর ও হুগলী উভয় নদীর স্বার্থেই সরল করা একান্ত দরকার।

অতীতে দামোদর বারবার সংক্ষিপ্ততর পথে চলতে চেয়েছে এবং প্রবল প্লাবনের কারণ হয়েছে। এবার 1978 সালে সে সোমসারের কাছে কয়েকটি হানাপথ কেটে দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে ছুটে চলেছিল খণ্ডঘোষ ও রায়না অঞ্চল দিয়ে তার পথকে কিছুটা সংক্ষেপ করার জন্যে, যা মানুষের বাধা-দানের ফলে ব্যর্থ হয়ে যায়। হয়তো অনেক বিপর্যয়ের পর দামোদর তার সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত পথটি খুঁজে পাবে। কিন্তু এখন তাকে ঐ পথে পরিচালিত করলে ভবিষ্যতের সেই বিপর্যয়গুলি এড়ানো যাবে। তখন নিবন্ধে বর্ণিত পথটি স্থায়ীভাবে ভবিষ্যতের দামোদর রূপে গড়ে উঠবে,--যে দামোদর আর অশান্ত অস্থির থাকবে না, সে হয়ে উঠবে শান্ত সমাহিত।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, নদীগুলিকে ঠিক কোন্ পথে সরল করা হবে, তা নির্ভর

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা-700006

করবে ঐ অঞ্চলে অবস্থিত আমাদের সম্পদগুলির উপর এবং বর্তমান নিবন্ধে ঐ পথের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মনে রাখা দরকার যে, কোন একটি নদীকে নতুন পথে পরিচালিত করতে হলে এখনই ঐ পথে তার পূর্ণ প্রবাহের উপযোগী খাত খননের প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন শুধু একটি মাঝারি ধরণের খাত খনন করে নদীটির চলার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা। কারণ নদীকে সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলা মানুষের সাধ্যাতীত। সেই কাজ করতে পারে একমাত্র নদী নিজেই, যদি সে ঐ কাজের উপযুক্ত পরিবেশ পায়, অর্থাৎ ঢাল ও গতিমুখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরল পথ হলে নদী নিজেই তার পথকে কয়েক বৎসরের মধ্যে গভীর করে কেটে নিয়ে প্রবাহিত হবে এবং পুরানো পথটি পরিহার করবে। অতীতে প্রাকৃতিক কারণে অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় উত্তরবঙ্গে তিস্তা, পূর্ববঙ্গে ব্রহ্মপুত্র, বিহারে কুশী প্রভৃতি নদীগুলি তাদের পথকে পরিবর্তিত করেছে।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, যেহেতু প্রবল বন্যার তীব্র গতি নদীখাত কাটায়, সেইহেতু 1770 সালে দামোদর নদ ও 1787 সালে তিস্তা নদী মাত্র একটি বন্যাতেই তার পথের অনেকটাই কেটে নিয়েছিল:এবং 3 বা 4 বৎসরের মধ্যে তারা নতুন পথে চলা সুরু করেছিল। পূর্ববঙ্গে যে যমুনা নদীতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাত্র 1 বা 2 লক্ষ কিউসেক ধারা বয়ে চলতো, আজ সেখানে তিস্তা-ব্রহ্মপুত্রের 20 বা 25 লক্ষ কিউসেক ধারা বয়ে চলেছে। ব্রহ্মপুত্র তার উপরিউক্ত 100 মাইল দীর্ঘ পথটি গড়ে তুলতে প্রায় 37 বৎসর [1787—1824 সালে] সময় নিয়েছিল। এছাড়া গড়াই নদী 10 বৎসরে (1820—1830 সালে) তার পথটি গড়ে নিয়েছিল। কাজেই কংসাবতী, শিলাবতী, দামোদর প্রভৃতি পাহাড়ী নদী হওয়ায় নিবন্ধে বর্ণিত পথগুলি কাটাতে 3 বা 4টি বন্যার প্রয়োজন হবে, তবে হুগলী নদীর মোহানার কাছের পথটি কাটাতে নদীর 7 বা 8 বৎসর সময় লাগতে পারে।

পথের বাধা—আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, দামোদরের উচ্চ উপত্যকায় তিন দিনে গড়ে 16 ইঞ্চি বৃষ্টি হলে জলাধারগুলি থাকা সত্ত্বেও দুর্গাপুরের কাছে দামোদরে 7 বা 8 লক্ষ কিউসেক হারে জল আসতে পারে। তখন দামোদরের নিবন্ধে বর্ণিত পথে প্রায় 7 লক্ষ কিউসেক হারে জল প্রবাহিত করা গেলেও ঐ পথের সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে মানুষের তৈরী দুর্গাপুর ব্যারাজ, যার সমস্ত গেট সম্পূর্ণ খুলে দিলেও 5·5 লক্ষ কিউসেকের অধিক হারে জল নির্গমন করা সম্ভব হবে না। ফলে দুর্গাপুর ব্যারাজের উপরাংশে দামোদরের জলতল দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাবে এবং আসানসোল-রানীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলসহ বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশের শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলের জল নিকাশ করা সম্ভব হবে না। 1978 সালের সেপ্টেম্বরে দামোদরের উচ্চ উপত্যকায় তিনদিনে 8 ইঞ্চি ও ঐ শিল্পাঞ্চলে প্রায় 20 ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়ায় ঐ শিল্পাঞ্চলটি 2/3 দিন প্রায় 4 ফুট জলের তলে ডুবেছিল এবং বহু কোটি টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হয়, পরে ডি. ভি. সি-র দক্ষিণ দিকের ক্যানাল পথের জল বাঁকুড়া জেলার প্রায় 250 বর্গমাইল এলাকা প্লাবিত করাতে এবং টাম্বলা ক্যানাল পথের উপর ব্রীজ ও রাস্তা ভেঙে যাওয়াতে ঐ শিল্পাঞ্চলটিকে জলমুক্ত করা সম্ভব হয়। কিন্তু সেদিন ভারতের রূঢ় বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশ হয়তো 8/10 ফুট জলের তলে কয়েকদিন ডুবে থাকতে পারে। ফলে যে দুর্গাপুর ব্যারাজ ঐ শিল্পাঞ্চলটিকে জল সরবরাহ করে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই দুর্গাপুর ব্যারাজের জন্য তাহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হতে পারে। এতে শুধু যে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে তাই নয়, কয়লার অভাবে সমগ্র ভারতের অর্থনীতি ভেঙে পড়তে পারে বলে আমার অনুমান।

এছাড়া কয়েক ঘণ্টা উক্ত হারে জল আসার পর দুর্গাপুর ব্যারাজ বা তার পার্শ্ব সংলগ্ন বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। তখন 1978-এর ময়ূরাক্ষী ও হিংলো নদী দুটির মত নদীর জল ও সঞ্চিত জল ছুটে এসে জেলার পর জেলা নিশ্চিহ্ন করে দামোদর হয়তো কোন নতুন পথে চলবে। 1978-এ আমরা শত শত জীবন দিয়ে ময়ূরাক্ষী ও হিংলো নদীর হঠাৎ-আসা 4 লক্ষ বা 2 লক্ষ কিউসেক হারে প্রবাহিত জলের ক্ষমতা দেখেছি, সেদিন হয়তো দামোদরের 7 বা 8 লক্ষ কিউসেক হারের জলের সঙ্গে সঞ্চিত জল মিলিত হয়ে 10 বা 12 লক্ষ কিউসেক হারে হঠাৎ-প্রবাহিত জলের ক্ষমতা সহস্র সহস্র মানুষের জীবনের বিনিময়ে উপলব্ধি করতে হতে পারে। এইভাবে ভবিষ্যতে কোনদিন আমাদের ভুলের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলটিসহ সমগ্র নিম্ন-দামোদর উপত্যকা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে এবং মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতির ন্যায় তা একটা বিশাল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে।

ভুলের কারণ কি ?—আসলে আমরা যে বৃষ্টির হিসাবের ভিত্তিতে পরিকল্পনাগুলি গড়ে তুলেছি, তাতেই ভুল রয়ে গেছে। আমরা দেখেছি গত 70/80 বৎসরে দামোদরে 6·5 লক্ষ কিউসেকের বেশি হারে জল আসে নি, তাই 6·5 লক্ষ কিউসেকের প্রবাহকে 2·5 লক্ষ কিউসেকে কমিয়ে এনে বন্যা রোধ করতে চেয়েছি। কিন্তু তার জন্যে কত ঘণ্টায় কত পরিমাণ ধরে রাখতে হবে এবং তা রাখা সম্ভব কি না, সে হিসাবটি এবারের প্রবল বর্ষণের পর নতুনভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। কারণ আগের 'হিসাবটি করা হয়েছে গত 70/80 বৎসরের বৃষ্টিপাতের ভিত্তিতে, কিন্তু নদীর জীবন তো মানুষের মত 70/80 বৎসর নয়, এমনকি শত বা সহস্র বৎসর নয়, শত সহস্র বৎসর। কাজেই নদীর জীবন ও তার অববাহিকায় বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে আমরা কতটুকু বা জানি। আমরা কি ঠিকমত জানি, যে বন্যায় দামোদর দু'শ বৎসর আগে 1770 সালে পূর্বমুখী থেকে হঠাৎ দক্ষিণমুখী খাত কেটেছিল, তখন কত লক্ষ কিউসেক জল কত দিন বা কত ঘণ্টা ধরে এসেছিল ? কিংবা ঠিক এক-শ' বৎসর বা দেড়-শ' বৎসর আগে [1823 সালে] যে বন্যাগুলিতে বর্ধমান জেলার এক বিশাল অঞ্চল প্লাবিত হয়েছিল, তখনই বা কত পরিমাণ জল এসেছিল ? আমরা কি বলতে পারি, কি পরিপ্রেক্ষিতে বা কি পরিস্থিতিতে দামোদর অতীতে খাড়ি নদীপথ থেকে বাঁকা নদীপথ এবং বাঁকা নদীপথ থেকে বেহুলা নদীপথ নতুন করে গড়ে নিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল ? আর তা না জেনে আমরা আমাদের পরিকল্পনাগুলি রচনা করেছি বলে সেগুলি ভুল হওয়া স্বাভাবিক এবং সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত যে কি ভয়ঙ্কর হতে পারে, সে কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

মুক্তির পথ—ভবিষ্যতের সেই ভয়ঙ্কর দিনটি থেকে মুক্তি পেতে হলে দুর্গাপুরের জলনির্গমন ক্ষমতা কয়েকটি অতিরিক্ত স্লুইস্-গেটের সাহায্যে 8 লক্ষ কিউসেকসে পরিণত করে দামোদরকে নিবন্ধে বর্ণিত পথে পরিচালিত করতে হবে, যাতে নদীটি ঐ সরল সংক্ষিপ্ত ঢালু পথটিকে নিজেই তার প্রবাহমাত্রার উপযোগী করে গড়ে নিতে পারে। এছাড়া, যেহেতু অজয় ও ময়ূরাক্ষী নদী দুটি অববাহিকায় 1978-এর সেপ্টেম্বরে 36 ঘণ্টাতেই 20 ইঞ্চি হওয়ায় প্রতি 1 হাজার বর্গমাইল আবহক্ষেত্রের জন্য 2 লক্ষ কিউসেক হারে জল এসেছিল, সেহেতু মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার দুটির জল নির্গমন ক্ষমতা অনুরূপ প্রবাহের উপযোগী করে রাখা দরকার।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কংসাবতী ও শিলাবতী তাদের নির্ধারিত পথে প্রবাহিত হওয়ায় ঐ নদী দুটির জল রূপনারায়ণে যে অতিরিক্ত জলের চাপ সৃষ্টি করতো তা আর থাকবে না। নিবন্ধে আলোচিত পথে শুধু

দ্বারকেশ্বর ও দামোদরের উচ্চ উপত্যকার জলই প্রবাহিত হবে। মুণ্ডেশ্বরীর খাতকে বন্ধ করে ও দামোদরের পরিত্যক্ত খাতটি সংস্কার করে দামোদর ও ভাগীরথীর মধ্যবর্তী বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলাগুলির মধ্যাঞ্চলের 2 হাজার বর্গমাইলবিশিষ্ট প্রায় সমতল অঞ্চলের জল ফলতার কাছে হুগলী নদীতে নেমে আসবে। এক কথায় বলা যায় যে, বিভিন্ন নদীর উচ্চ উপত্যকার জলসহ বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলাগুলির জল সুষমহারে বণ্টিত হয়ে বিভিন্ন নদীপথ ধরে দ্রুত সাগরে পৌঁছে যাবে এবং এইভাবে আমরা ভারতের রূঢ় বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশসহ সমগ্র দামোদর উপত্যকাকে ভবিষ্যত প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি।

এর ফলে শুধু যে দামোদর উপত্যকায় প্লাবনের সম্ভাবনা কমে যাবে তাই নয়, দ্বারকেশ্বর ও দামোদর নদের জলের দ্রুত গতি নদীখাতমুখী হওয়ায় তাদের নিজস্ব খাত পরিষ্কার রাখা ছাড়াও হুগলী মোহানার জমা পলি সরিয়ে দেবে এবং ঐ নদীগুলির দ্বারা বাহিত পলি দূর সাগরে নিক্ষিপ্ত হবে। ফলে হুগলী নদীর নাব্যতা বজায় থাকবে এবং কলিকাতা ও হলদিয়া বন্দর দুটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। এছাড়া রূপনারায়ণ নদীটি আরামবাগ পর্যন্ত সর্ব-ঋতুতে নাব্য হয়ে উঠবে এবং বর্ষাকালে দুর্গাপুর পর্যন্ত জলপথে পরিবহন সম্ভব হবে। কোলাঘাট থেকে হলদিয়া পর্যন্ত পথটিতে সড়ক ও রেলপথে যোগাযোগের সঙ্গে জলপথে যোগাযোগ গড়ে ওঠায় হুগলী নদীর মত রূপনারায়ণ নদের তীরে তীরে বহু শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠবে। বিশেষ করে কোলাঘাটে একটি সুপরিকল্পিত নগরী গড়ে তুললে কলিকাতার উপর চাপ যথেষ্ট কমানো যাবে।

আবার যেহেতু দামোদর ঐ পথে তার পূর্ণ প্রবাহ নিয়ে সাগরে পৌঁছে যেতে পারবে ও প্লাবনের সম্ভাবনা প্রায় থাকবে না, সেহেতু জলাধারগুলিতে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য যে শতকরা 30 ভাগ অংশ প্রতি বৎসর খালি রাখা হয়, সে অংশটি জলে ভরে নেওয়া যাবে এবং ডি. ভি. সি-র জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বা সেচসেবিত এলাকা বর্তমান ক্ষমতার প্রায় 40 শতাংশ বাড়ানো যাবে। অর্থাৎ ডি. ভি. সি-র জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানের 100 মেগাওয়াট থেকে 140 মেগাওয়াটে পরিণত করা যাবে এবং খরিফ মরশুমে সেচসেবিত এলাকা বর্তমানের 3 লক্ষ হেক্টরের পরিবর্তে 4·2 লক্ষ হেক্টরে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে অথবা রবি মরশুমে অনেক বেশি জমিতে সেচের জল দেওয়া যাবে। ফলে কয়েক কোটি টাকার সম্পদ ও ফসল প্রতি বৎসর উৎপাদন করা যাবে। তখন দামোদর তার দু'কূল প্লাবিত করে আর দুঃখের নদ হয়ে থাকবে না, সে তার দুই তীরভূমি শস্যশ্যামল ও সমৃদ্ধ করে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের কাছে সুখের নদ হয়ে উঠবে।

পরিশিষ্ট—এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমান যুগে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আর বিশালায়তন জলাধারের প্রয়োজন হয় না। সারাদিন ধরে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে যে জল জেনারেটরের পথ বেয়ে নেমে আসে, সেই ব্যবহৃত জল নীচে একটি ছোট জলাধারে সঞ্চিত করে রাখা হয়। পরে রাত্রিতে যখন বিদ্যুতের চাহিদা কম থাকে, তখন উৎপন্ন অতিরিক্ত তাপবিদ্যুৎ নষ্ট না করে সেই বিদ্যুতের সাহায্যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেটরকে মোটরে এবং টারবাইনকে পাম্পে রূপান্তরিত করে নীচের জলাধারের ব্যবহৃত জলকে আবার উপরের জলাধারে পৌঁছে দেওয়া হয় পরদিন ব্যবহারের জন্য। এইভাবে একই জলকে প্রতিদিন কাজে লাগিয়ে রাত্রিকালীন অপচিত তাপবিদ্যুতের পরিবর্তে দিবাভাগে চাহিদার সময় প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। ডি. ভি. সি-র তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে উপরিউক্তভাবে অতি অল্প খরচে

অপচিত তাপবিদ্যুতের পরিবর্তে প্রয়োজনের সময় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করার সম্ভাবনা বিবেচনা করা যেতে পারে। বিশেষ করে, আমাদের দ্রুত নিঃশেষিত-হয়ে-আসা কয়লা সম্পদের কথা মনে রেখে অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিতে অনুরূপ পরিকল্পনা সর্বাগ্রে রূপায়িত করা দরকার।

মনে রাখতে হবে যে, বর্ষায় নেমে-আসা বিপুল জলের প্রবল গতিই নদীর প্রাণ। সেইজন্য উপরিক্তভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেই বিদ্যুতের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জল পাম্প করে তুলে নিয়ে সেচের ব্যবস্থা করা দরকার। তাহলে বিশালায়তন জলাধারগুলিতে বর্ষার প্রচুর জল ধরে রেখে নদীর প্রাণধারাটুকু কেড়ে নিয়ে দামোদর তথা হুগলী নদীর নিম্নাংশকে ধ্বংস করা প্রয়োজন হবে না। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে দামোদর যখন বেহুলা নদীর খাতে বয়ে যেতো, তখন তার পূর্বমুখী গতি যমুনা নদীতে সঞ্চারিত হতো এবং পরে যমুনা নদীর একটি দক্ষিণমুখী শাখা বিদ্যাধরীর পথ বেয়ে ঐ গতি মাতলা নদীতে ছুটে চলতো। এইভাবে দামোদরের বন্যার প্রবল গতি এককালে মাতলা নদীকে গভীর করেছে বলে আমার অনুমান। কারণ ভাগীরথীর চেয়ে দামোদরের ঢাল বেশি হওয়ায় তার জলের গতি অনেক বেশি এবং নদীখাত কাটানোর ক্ষমতাও অধিক। তাই দামোদরের বন্যার তীব্র গতির জন্য মাতলা ও হুগলী নদী দুটির খাত পদ্মা-মেঘনা বা গড়াই-মধুমতীর চেয়ে আজও এত গভীর, যদিও শেষোক্ত দুটি নদীতে অধিক পরিমাণে জল প্রবাহিত হয়। কাজেই দামোদরের স্বাভাবিক ও নিবন্ধের শেষে আলোচিত কৃত্রিম বন্যার প্রবল গতিকে নিরুদ্ধ না করে তাকে নিবন্ধে বর্ণিত পথে সুপরিকল্পিত-ভাবে নদীখাতমুখী করে দামোদর, রূপনারায়ণ এবং হুগলী নদীর নিম্নাংশকে সহজেই গভীর করে নেওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ বন্যার যে প্রচণ্ড শক্তি এতদিন ধরে দুই তীরভূমিতে ধ্বংসলীলায় মত্ত আছে, সেই শক্তিকে সংহত করে নদীকে গভীর ও সাবলীল করার কাজে নিয়োজিত করতে হবে। ফলে একদিকে দেশ যেমন প্লাবনের কবল থেকে মুক্ত হবে, অন্যদিকে তেমনি পরিবহনের উপযোগী জলপথ গড়ে উঠবে।

একথা ঠিক যে দামোদরকে নিবন্ধে বর্ণিত পথে পরিচালিত করতে কয়েক কোটি টাকা লাগবে। কিন্তু বারবার প্লাবনের জন্য যে কোটি কোটি টাকার সম্পদ ও ফসল নষ্ট হতো, তা আর হবে না এবং জলাধারগুলির পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রতি বৎসর কয়েক কোটি টাকার সম্পদ ও ফসল পাওয়া যাবে। এছাড়া হুগলী নদীকে ড্রেজিং করতে প্রতি বৎসর যে কয়েক কোটি টাকা খরচ হতো, তার আর প্রয়োজন হবে না। প্রসঙ্গত বলব, যে নদী আমাদের জল, শস্য ও সম্পদ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে, আবার সংহার মূর্তি ধারণ করলে মুহূর্তেই সব কিছু ধ্বংস করে দিতে পারে, সেই নদীর উপর সুষ্ঠু গবেষণা ও গভীর চিন্তা করে আমাদের পরিকল্পনা-গুলি গড়ে তোলা দরকার। নইলে নদীর দ্বারা আমরা যত না সম্পদ আহরণ করবো, তার অধিক সম্পদ ভ্রান্ত পরিকল্পনার ফলে নদীর দ্বারাই ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন বন্যার প্রবল গতি যেহেতু নদীখাত কাটায়, সেহেতু জলাধারগুলির দ্বারা বন্যা-নিয়ন্ত্রণের অর্থ হলো নদীকে ধ্বংস করা বা পরবর্তীকালে স্বল্প বৃষ্টিতেই বন্যার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলা—যা আজকের দামোদর উপত্যকায় বারবার অনুভূত হচ্ছে। অর্থাৎ বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরে প্লাবনের কারণ হয়ে উঠছে। একটি হিসাবে দেখা যায়, যে টেনেসি উপত্যকা প্রকল্পের অনুসরণে আমাদের দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেখানে প্রকল্প রূপায়ণের পরবর্তী 25 বৎসরে প্লাবনের ফলে ক্ষতি প্রকল্প রূপায়ণের

পূর্ববর্তী 25 বৎসরের তুলনায় পরিমাণগত-ভাবে দ্বিগুণ হয়েছে। [টাকার অঙ্কে অবশ্য বহুগুণ]

বর্তমানে যেহেতু জলাধারগুলির সাহায্যে আমরা সহজেই কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টি করতে পারি, সেহেতু একটি প্রবল বর্ষণের পর যখন জলাধার-গুলি পরবর্তী বর্ষণের জন্য খালি করা হয়, তখন সেই জল ধীরে ধীরে না ছেড়ে, যে সময়ে নিম্ন উপত্যকায় ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে না, সেই সময়ে জনসাধারণকে সতর্ক করে বন্যা সৃষ্টি করে ছাড়া দরকার। ফলে নদীর খাত কাটানোয় যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাবে। অবশ্য তার পূর্বে নদীপথটিকে যতদূর সম্ভব সরল করা প্রয়োজন। এরূপ কৃত্রিম বন্যার ফলে যদি ছোটোখাটো প্লাবনও হয়, তাহলে সে প্লাবন অধিক দিন স্থায়ী না হওয়ায় তা নদী ও কৃষিভূমি উভয়ের পক্ষে মঙ্গলকারক হবে। কাজেই জলাধারগুলির দ্বারা বন্যা নিরুদ্ধ করা আমাদের লক্ষ্য না হয়ে ওদের দ্বারা কৃত্রিম বন্যার সাহায্যে নদীখাত কাটানো এবং সীমিত প্লাবনের মাধ্যমে [নদীর সমান্তরাল বাঁধের মাঝে মাঝে স্লুইস্-গেট ও সেচখালের সাহায্যে] নিম্ন উপত্যকাকে উঁচু ও উর্বর করাও আমাদের লক্ষ্য হওয়া একান্ত দরকার। নদীকে ধ্বংস করার পরিবর্তে জলাধারগুলি এইভাবে নদীকে গড়ে তুলতে পারে।

সবশেষে বলব যে, 1978-এর সেপ্টেম্বরের নিম্ন-চাপটি ময়ূরাক্ষী, অজয় ও নিম্ন দামোদর উপত্যকায় তার বৃষ্টি ঝরিয়ে না দিয়ে যদি একটু পশ্চিমে সরে গিয়ে দামোদরের উচ্চ-উপত্যকায় সেই বৃষ্টি ঝরিয়ে দিতো, তাহলে দুর্গাপুর ব্যারাজটিকে রক্ষা করা হয়তো সম্ভব হতো না। এমনকি আমাদের বিশালায়তন জলাধারগুলি থেকে বিপদ আসতে পারতো। যেমন পাঞ্চেত জলাধারের আবহক্ষেত্র 4·2 হাজার বর্গমাইল হওয়ায় প্রতি 1 হাজার বর্গমাইলে 2 লক্ষ কিউসেক হিসাবে এতে 8 লক্ষ কিউসেক হারে জল আসতে পারতো, কিন্তু এর সর্বোচ্চ জল-নির্গমন ক্ষমতা রাখা হয়েছে 5·86 লক্ষ কিউসেক। *

* বর্তমান নিবন্ধে পরিবেশিত বিভিন্ন তথ্য (1) শ্রীকপিল ভট্টাচার্যের 'বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা' (2) শ্রীরাধাকমল মুখার্জির 'The changing face of Bengal' (3) শ্রী এস. সি. মজুমদারের 'Rivers of the Bengal Delta' (4) ডি. ভি. সি. কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাগুলি এবং (5) বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

সোভিয়েত ইন্‌জিনিয়াররা একটি রেডিও-নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংচালিত ক্ষুদে হেলিকপ্টার নির্মাণ করেছেন ও কাজে লাগিয়েছেন। হেলিকপ্টারে টেলিভিশন বসানো আছে। এই হেলিকপ্টারের সাহায্যে সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের কাজ করা চলে।

হেলিকপ্টারটি উচ্চতায় 56 সেন্টিমিটার, দৈর্ঘ্যে 1·37 মিটার। নানা কাজে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে—যথা, ইন্‌জিনিয়ারিং কাঠামো, ঝুলন্ত পুল, হাইটেনশন বৈদ্যুতিক লাইন ইত্যাদির নির্মাণ-কার্যে পর্যবেক্ষণ। দমকলের কর্মীরাও এটিকে কাজে লাগাচ্ছেন।

ডাক্তার বিজ্ঞান

মূল লেখা : ডঃ উইলিয়াম বয়েড
ডঃ আর্থার সি. গাইটন
ও
ডঃ টি. এস. এল. বেসউইক

ভাইরাস

ভাষান্তর : গুণধর বর্মন*

[ভাইরাস জনজীবনের একটি সন্ত্রাস ও জীবন-বিজ্ঞানের কৌতূহল। এ নিয়ে বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশিত হলেও আমাদের শিক্ষিত তথা বিজ্ঞানানুরাগী মহলে ভাইরাস সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা নাই। স্কুল-কলেজের জীবন-বিজ্ঞান শিক্ষায় এমন কি তাদের প্রশ্নপত্রেও এবিষয়ে বেশ বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে। সেইজন্য ভাইরাস সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ জ্ঞাতব্য কথা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কয়েকজন প্রখ্যাত লেখক-অধ্যাপকের লেখা থেকে সংক্ষিপ্ত করে তুলে ধরা হচ্ছে।]

ভাইরাস-এর যথার্থ সংজ্ঞা সহজভাবে ছোট্ট কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। বলা যেতে পারে ভাইরাস হচ্ছে এই পৃথিবীতে ক্ষুদ্রতম ও আদিমতম জীবনের প্রকাশ। এই উক্তিতে অবশ্যই অনেক প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। জীবন ও জড় পদার্থের (living and nonliving) যে মৌলিক প্রভেদ ও একই সঙ্গে এই উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্রের যে সীমারেখা সেই অংশেই ভাইরাসের স্থান। সাধারণভাবে 'সেল' (cell) বা জীবকোষকেই জীবনের আদি ও প্রাথমিক একক (unit) হিসাবে ধরা হয়। সেই দিক থেকে ভাইরাস জীবজগতের মধ্যে পড়ে না। ভাইরাস দেহে অতি সহজ ও সরলতম প্রাণসত্তার আবির্ভাব। তাতে জীবকোষের পূর্ণ বিকাশ ঘটে নি। এক-কোষী জীব হিসাবে জীবনের যে আদি বিকাশ তা পরিস্ফুট হয়েছে ব্যাকটিরিয়া ও প্রোটোজোয়ার মধ্যেই। পূর্ণজীবনধারার আদি একক সেই জীবকোষের মধ্যে যে নানান জটিল যান্ত্রিকতার উদ্ভব তা কিন্তু সহজে বা স্বল্প সময়ের মধ্যে সংগঠিত হয় নি। জীবকোষের অন্তর্নিহিত সেইসব স্বয়ংক্রিয় জটিল যন্ত্রাংশগুলি যথাস্থানে সুসংগঠিত হতে অতি দীর্ঘকাল—মানে শত শত কোটি বছর (several billion years) সময় লেগে গেছে। আদিতে এই জীবকোষের কি অবস্থা ছিল সেকথা ভাবতে গেলে আজকের দিনের ভাইরাসদের কথাই গুরুত্বসহকারে ভাবতে হয়। সুদূর অতীতের এক বিশেষ পরিবেশে প্রাকৃতিক জড়কণাদের অসংখ্য আবর্তন বিবর্তনের ফলে সেই কোন অনাদিকালে 'নিউক্লিয়িক অ্যাসিড' ও অ্যামাইনো অ্যাসিড (প্রোটিন)এর সংমিশ্রণে জীবনের আদিসত্তার উৎপত্তি হয় সম্ভবতঃ এই ভাইরাসরূপেই। সেই দিক থেকে ভাবতে গেলে এই ভাইরাস-গোত্রীয়রাই পৃথিবীতে জীবনের আদিমতম সোপান। তারপর ক্রম-

* জে. এন. রায়—শিশু সেবা ভবন, কলিকাতা-700006

বিকাশের ধারায় সেই সহজ সরল ভাইরাস দেহে নানাবিধ জৈব রসায়ন ও জটিল যন্ত্রাংশের সংযোজন ঘটে; আকার আয়তন ও কর্মপদ্ধতির বিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়ে ক্রমে ক্রমে রিকেট্‌সিয়া, ব্যাকৃটিরিয়া, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি ক্রমোন্নত জটিল জীবকোষের উৎপত্তি এবং পরবর্তী অভিব্যক্তির (evolution) ধারায় এককোষী জীব থেকে বহুকোষীজীব ও বিশাল জীবজগতের উদ্ভব।

ভাইরাস হচ্ছে জীবন ও জড়ের সংযোজক (link line)—

(ক) জীবনের আদি একক জীবকোষের মূল উপাদানকে বলে প্রোটোপ্লাজম। ভাইরাসে সেই প্রোটোপ্লাজম নেই। তাই ভাইরাসরা একা একা স্বাধীনসত্তা হিসাবে বেঁচে থাকতে পারে না বা জীবনের কোন লক্ষণও দেখাতে পারে না। সেই-দিক থেকে এদের জীবজগতের মধ্যে ধরা উচিৎ নয়। কেবল অন্য জীবকোষের আশ্রয় নিয়েই এরা বাঁচে এবং বৃদ্ধি পায়। এরা সম্পূর্ণরূপে পরজীবী। আশ্রয়দাতা জীবকোষের বাইরে এরা একেবারে নির্জীব জড়কণার মতই অবস্থান করে। সেই অবস্থায় এদের মধ্যে কোন জীবনচিহ্ন থাকে না।

(খ) অনেক ভাইরাসকে জল বা অন্য কোন দ্রাবকে (solvent) মিশিয়ে আশ্রয়দাতা জীবকোষ থেকে পৃথকীকরণ ও নিষ্কাশিত করে সেই দ্রবণ বা মিশ্রণকে অধঃক্ষেপণ (precipitate) করলে ভাইরাস দেহের বিভিন্ন ধরণের কেলাস (Crystal) উৎপন্ন হয়। কোন ব্যাকৃটিরিয়া বা অন্য কোন জীবকোষের উপাদানকে এইভাবে কেলাসিত (crystallised) করা যায় না। এই থেকে ভাইরাসকে জীবজগতের বাইরের বস্তু হিসাবে ভাবতে হয়। তাই অনেকে ভাইরাসকে রাসায়নিক যৌগকণারূপেই ভাবেন। বস্তুতঃ 1935 সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী ডঃ ওয়েণ্ডেল স্ট্যান্‌লী তামাক পাতার ভাইরাসকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথক ও পরিশোধন করে বিশুদ্ধ কেলাসে রূপান্তরিত করেন। বার বার পরিশোধিত সেই শুদ্ধ ভাইরাস কেলাসকে আবার জলে গুলে সেই দ্রবণকে তামাকগাছে প্রয়োগ করে তামাকপাতায় পুনরায় সেই একই ভাইরাস রোগের প্রকোপ প্রমাণ করে দেখান। এতে তিনি জোর দিয়েই বলতে চান যে ভাইরাসের যদি প্রাণ থাকত তবে এই প্রক্রিয়ায় তামাক পাতায় পুনরায় রোগ-সংক্রমণ সম্ভব হতো না। অন্য কোন রোগজীবাণু বা ব্যাকৃটিরিয়ার উপর এই জাতীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া চালিয়ে তা দিয়ে রোগসংক্রমণ করা যায় না। ভাইরাস নিয়ে এই পরীক্ষা ও গবেষণার জন্য ডঃ স্ট্যান্‌লী 1946 সালে যুক্তভাবে রসায়নে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। অনেক ভাইরাসকেই এইভাবে কেলাসিত করা যায় তবে সবাইকে নয়। এসব কেলাস অবশ্যই অসংখ্য ভাইরাসদেহের সমষ্টি বলে এখন প্রমাণিত। যাই হোক ডঃ স্ট্যানলীর গবেষণায় ভাইরাসরা জীব না অ-জীব এই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। পরবর্তী উন্নততর গবেষণায় নিশ্চিতভাবে বলা হয় ভাইরাসরা জীব-জগতেরই অন্তর্ভুক্ত। সেই সব গবেষণায় প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত যে ভাইরাসদের জীবন আছে এবং নির্দিষ্ট জীবনচক্র আছে। যথা:—

(1) জীবনের সাধারণ প্রকাশ, তার বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার ক্ষমতা ভাইরাসদের আছে এবং প্রবল-ভাবেই আছে। উপযুক্ত পরিবেশে তাদের বিকাশ বৃদ্ধি ও অপরিমেয় বংশবিস্তার ক্ষমতা দেখা যায়— যা কোন জড়কণায় সম্ভব নয়।

(2) যে কোন উন্নত জীবের মতই পরিবেশের সংগে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকার বিশেষ দক্ষতা, জীবন-বিজ্ঞানে যাকে বলে অভিযোজন (adaptation) সেই শক্তি ভাইরাসদের আছে। তাই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ শোধন ও কেলা

সিক্ত করা সত্ত্বেও ভাইরাসের জীবনধর্ম নষ্ট হয়ে যায় না—শুধু উপযুক্ত পরিবেশ পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করে থাকে। কোন উন্নত জীবকোষের আবার এই শক্তি নেই। একটা শুষ্ক বোতলে ভাইরাসরা বছরের পর বছর নির্জীব অবস্থায় পড়ে থাকতে পারে। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে তারা আবার জীবনধর্ম প্রকাশ করে।

(3) জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম তার বংশগতি (heredity). যে কোন উন্নত জীবের মতই ভাইরাসদের সেই নির্দিষ্ট বংশগতি ও বংশধারা রয়েছে। এই বংশগতির মূল উপাদান হচ্ছে নিউক্লিয়িক অ্যাসিড ও প্রোটিন—যা সমস্ত জীবন ও জীবকোষের কর্মধারার মূল চাবিকাঠি—এবং যা দিয়ে জীবের বংশাণু বা 'জিন' তৈরি হয়—তা ভাইরাস মাত্রেরই আছে।

(4) জীবের বংশগতিতে প্রচলিত নিয়মের বিশেষ পরিবেশে ও সময়ে তার বংশাণু বা জিনে কিছু স্থায়ী রূপান্তর ঘটে, যাকে বলে মিউটেশান (mutation)। জীবজগতে নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতে এই মিউটেশান প্রক্রিয়াই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 'ভাইরাস-জিনে' এই মিউটেশান ধর্ম যে কোন উন্নত জীবের মতই দেখা যায় এবং তারই ফলে এক ভাইরাস থেকে অন্য প্রজাতির ভাইরাস সৃষ্টি হয় যাতে তাদের নতুন ধরণের জীবনীশক্তির প্রকাশ ঘটে। কোন জড়কণায় বা রাসায়নিক যৌগে এইরকম মিউটেশান সম্ভব নয়।

এইভাবে ভাইরাসের মধ্যে জীবন এবং অচেতন জড়জগৎ—উভয় অংশেরই কিছু বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ ও ধর্ম এমনভাবে একই সঙ্গে বিদ্যমান যে এদিগকে জড় ও জীবনের অন্তর্বর্তী সংযোজক বা যোগসূত্র (link line) হিসাবেই ভাবতে হয়। ভাইরাসরাই এই পৃথিবীতে জড় থেকে জীবনের আদিমতম ও প্রাথমিক প্রকাশ বলে মনে হয়।

ভাইরাস দেহের উপাদান ও তার প্রকৃতি

আগেই বলা হয়েছে ভাইরাসদেহ পূর্ণ কোষ নয়, তাতে প্রোটোপ্লাজম নেই, নিউক্লিয়াস নেই, কোন কোষ-উপাঙ্গ বা অর্গানেলিজ (organelles) নেই। তাই জীবনযাত্রা নির্বাহের কাজে ভাইরাস দেহে নিজস্ব উৎসেচক (enzyme) উৎপাদনের কোন যন্ত্র বা উপায়ই নেই। এই উৎসেচক অভাবেই নিজেদের খাদ্য ও শক্তি (energy) সংগ্রহের জন্য এরা সম্পূর্ণরূপে পরজীবী হতে বাধ্য। কারণ শারীরধর্মের অতি প্রয়োজনীয় বিপাকীয় কাজে (metabolic activity) উপযুক্ত উৎসেচক চাই। তাই না থাকায় সক্রিয়-প্রাণশূন্য কোন উপাদানে, এমন কি মৃত জীব-কোষেও ভাইরাইদের জীবনের বিকাশ ও বৃদ্ধি হতে পারে না—যা ব্যাকৃটিরিয়ারা পারে। এই জন্যই সাধারণ উপাদানের কোন মাধ্যমে (medium) বা মিডিয়াতে ভাইরাস-কাল্চার (culture) করা যায় না, যেভাবে ব্যাকৃটিরিয়াদের করা হয়। ভাইরাসদের বৃদ্ধি ও বিস্তার বা কালচারের জন্য জীবন্ত জীবকোষই দরকার। আর সেই কোষ যত তরুণ ও সক্রিয় হয় ভাইরাসদের বৃদ্ধি ও বিস্তার তত সহজ ও দ্রুত হয়। যেমন মুরগী ডিমের ভ্রূণ (chick embryo)। আশ্রয়-দাতা (host-cell) কোষের তৈরি খাদ্য ও শক্তি আত্মসাৎ করে ভাইরাসরা বংশবৃদ্ধি করে ও শেষপর্যন্ত কোষটিকে ধ্বংস করে ফেলে। প্রকৃত পক্ষে আশ্রয়দাতা কোষে প্রবেশের পর 'ভাইরাসজিন্' অতি ক্ষিপ্রগতিতে সেই কোষের বিপাকীয় যন্ত্রগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করে তাদের কর্মপদ্ধতিও সম্পূর্ণরূপে বদলে দেয়। ফলে সেই কোষের যন্ত্রাংশগুলি কোষপুষ্টির উপাদান ও উৎসেচক তৈরি না করে তারা ভাইরাসদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানই তৈরি করতে থাকে। তাতে তড়িৎগতিতে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি ঘটে এবং কোষের নিজস্ব স্বাভাবিক কার্যকলাপ

বন্ধ হয়ে যায়, তার অন্তর্নিহিত যন্ত্রাংশগুলিতে কর্ম-বিকৃতি ঘটে। ফলে হয় কোষটির মৃত্যু ঘটে না হয় তাতে অদ্ভুত ধরণের অস্বাভাবিক কিছু কর্মকাণ্ড দেখা দেয়, যেমন করে ঐসব কোষ থেকে কিছু ক্যান্সার বা টিউমার প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

ভাইরাসদেহে আসলে আছে একটি নিউক্লিয়িক অ্যাসিড কেন্দ্রক (core) আর তার উপরে প্রোটিনের এক সূক্ষ্ম আল্‌গা আস্তরণ (coating), যাকে বলে ক্যাপসিড (capsid)। এই আস্তরণটিকে সহজে কেন্দ্রক থেকে আলাদা করে সরিয়ে নেওয়া যায়। জীবকোষের সেল-মেমব্রেনের মত এটা কোষের অবিচ্ছেদ্য সক্রিয় অংশ নয়। সুতরাং ঐ নিউক্লিয়িক অ্যাসিডই হচ্ছে ভাইরাসদেহের মূল সক্রিয় উপাদান। ভাইরাসদেহের যাবতীয় জীবনধর্ম ও বংশগতি নির্ভর করে ঐ নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের ওপর। ওতেই আছে ভাইরাসের বংশাণু বা জিন'। এই নিউক্লিয়িক অ্যাসিড দু-রকমের হয়। একটির নাম রাইবো-নিউক্লিয়িক অ্যাসিড সংক্ষেপে—আর. এন. এ., অপরটি ডি-অক্সি-রাইবোনিউক্লিয়িক অ্যাসিড বা ডি. এন. এ.। এক জাতীয় ভাইরাসে একরকমেরই নিউক্লিয়িক অ্যাসিড থাকে। কোন ভাইরাসে দু-রকমের নিউক্লিয়িক অ্যাসিড থাকে না অর্থাৎ যে কোন ভাইরাসদেহে হয় আর. এন. এ. না হয় ডি. এন. এ. আছে, দুটি একসঙ্গে নেই। উদ্ভিদ ভাইরাসে থাকে শুধু আর. এন. এ., আর প্রাণী ভাইরাসে হয় আর. এন. এ.—না হয় ডি. এন. এ., (যে কোন একটি)। এই নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের তারতম্য অনুসারে ভাইরাসদের দুটি দলে ভাগ করা হয়। (1) আর. এন. এ. ভাইরাস (2) ডি. এন. এ. ভাইরাস। ঐ প্রথম দলে আছে—হাম, মাম্প্‌স্‌, পোলিও-মায়েলাইটিস্‌, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সাধারণ সর্দি (common cold) ও অন্যান্য শ্বসনতন্ত্রের ভাইরাসরোগ। আর. ডি. এন. এ ভাইরাস দলে আছে বসন্ত, হার্পিস, অ্যাড্রিনোভাইরাস প্রভৃতি।

ভাইরাসের প্রোটিন ক্যাপ্‌সিড বিভিন্ন ভাইরাসে বিভিন্ন ধরনের হয় প্রধানতঃ প্রোটিনের তারতম্য অনুসারে কখনও কখনও ঐ প্রোটিনের সঙ্গে কিছু শর্করা (polysaccharide) ও স্নেহজাতীয় (lipids) উপাদান যুক্ত থাকে—বিশেষ করে প্রাণী-ভাইরাসে। আবার কিছু ভাইরাসে ঐ প্রোটিন আস্তরণ বা ক্যাপসিডের বাইরে আর একটা সুস্পষ্ট স্নেহ পদার্থের আবরণ (lipid-envelope) দেখা যায়। সেই আবরণে কিছু আলাদা ধরনের প্রোটিন যুক্ত থাকে। এই আস্তরণও আবরণের প্রধান কাজ ভাইরাসের মূল দেহ-উপাদান ঐ নিউক্লিয়িক-অ্যাসিডকে সযত্নে রক্ষা করা। তবে এদের উপাদানের বিভিন্নতা ও পার্থক্যের উপরেই বিভিন্ন ভাইরাসের বিভিন্ন কোষের প্রতি বা নির্দিষ্ট কলার (tissue) দিকে বিশেষ আকর্ষণ প্রকাশ পায়—যাকে বলে ভাইরাসের কোষ-নির্দিষ্টতা বা কলানির্দিষ্টতা ধর্ম (cell বা tissue specificity)। এর ফলে নির্দিষ্ট ভাইরাস নির্দিষ্ট ধরণের কোষ বা কলার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সেখানে আশ্রয় নেয় বা আক্রমণ করে। যেমন পীতজ্বর ও হেপাটাইটিস ভাইরাস শুধু যকৃৎ কোষকেই আক্রমণ করে, পোলিও ও জলাতঙ্ক ভাইরাস শুধু স্নায়ুকোষ (নার্ভ সেল) আক্রমণ করে, এইভাবে বসন্ত ভাইরাস চর্মকোষকে এবং মাম্প্‌স্‌, প্যারটিড গ্ল্যাণ্ডকে—ইত্যাদি। একইভাবে যে কোন ভাইরাস যে কোন জীবকে আক্রমণ বা আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করে না। নির্দিষ্ট ভাইরাস নির্দিষ্ট প্রাণী বা উদ্ভিদকে আশ্রয় বা আক্রমণ করে, বিশেষ করে রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাসরা। ভাইরাসদের এই ধর্মকে বলে হোস্ট-স্পেসিফিসিটি (host-specificity) তবে একথা সত্য যে কোন জীব বা জীবকোষে ভাইরাসরা আশ্রয় নিলেই ওই জীব বা কোষে ভাইরাস রোগ হয় না এবং ভয়ংকর রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাসদের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। আশ্রয়দাতা কোষে

তারা তখন শুধু আশ্রয় নেয়, সহযোগী (commensal) হিসাবে জীবনধারণ করে কিন্তু তাকে ধ্বংস করে ফেলে না। তাই ঐ জীবদেহে কোন রোগলক্ষণ দেখা যায় না। এইসব জীব ও কোষ তখন সেই ভাইরাসের বাহক (carrier) হিসাবে কাজ করে। তাদের থেকে অন্যজীব বা একই প্রজাতির অন্যেরাও আক্রান্ত হতে পারে। আর সেই জীবের নিজদেহের আভ্যন্তরীণ পরিবেশে বিশেষ পরিবর্তন ঘটলে ঐ নির্দোষ ভাইরাসরাও সেখানে রোগের প্রকোপ ঘটাতে পারে।

এখন পর্যন্ত প্রায় 300 রকমের ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে মানবদেহে কম করে 150 রকমের ভাইরাসের বাস। এদের থেকে প্রায় 50 প্রকারের ভাইরাস মানবদেহে রোগসৃষ্টি করে। তাদের সবাই আবার সব সময় পূর্ণ রোগের প্রকোপ ঘটায় না। তাকে বলে অপূর্ণ আক্রমণ (abortive attack)। মানুষের মত গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বেড়াল, শূকর, বানর, পাখি, মাছ, ব্যাঙ, কীটপতঙ্গ (বিশেষ করে সন্ধিপদ বা আর্থ্রোপড (Arthropod) গোষ্ঠী প্রভৃতি জীব এমন কি ব্যাক্টিরিয়া দেহেও বিভিন্ন রকমের ভাইরাসের বাস ও আক্রমণ দেখা যায়। এদের অনেকে আবার মধ্যবর্তী বাহক (intermediate host) হিসাবে কাজ করে, সেই বাহক বা হোস্টদের মধ্যে কিন্তু ঐ রোগ প্রকোপ দেখা যায় না। কিছু ভাইরাস বিভিন্ন উদ্ভিদদেহে বাস করে। তারা প্রাণীদেহে আসে না, তাদিগকেই উদ্ভিদ ভাইরাস বলে।

ভাইরাসের চেহারা

ভয়ংকর এই ভাইরাসদের আকার এতই ক্ষুদ্র যে খালি চোখে তো দূরের কথা সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও এদের দেখাই যায় না, সেইজন্য এদের বলা হতো অনণুবীক্ষণীয় (ultra-microscopic)। আবার ব্যাক্টিরিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবাণুদের যেভাবে চীনামাটি (porcelain) দিয়ে পরিস্রাবণ (filtration) প্রথায় ছেঁকে ধরা যায় ভাইরাসকে তাও করা যায় না। সেইজন্যই বলা হত এরা পরিস্রাবণ-অযোগ্য (filter passing)। এইকথা প্রথম প্রমাণ করেন রাশিয়ান বিজ্ঞানী আইভানোভস্কি (Iwanowski) 1892 সালে তামাক পাতার ভাইরাস নিয়ে। এখন কিন্তু ভাইরাসদের বিশেষ পরিস্রাবণ প্রথায় মলিকুলার ছাঁকনি (molecular-sieve) দিয়ে ধরা যায় এবং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে এদের আকার প্রকার ভালভাবেই দেখা ও জানা যাচ্ছে। এতে জানা গেছে এই ক্ষুদ্রতম জীবগুলির বিভিন্ন প্রজাতির আকারের (dimension) যেমন বিরাট বৈষম্য রয়েছে এদের সামগ্রিক চেহারায় (figure) তেমনি বহুবৈচিত্র্য। কোনটিকে দেখতে অতিক্ষুদ্র বিন্দুমাত্র, কোনটি অতি সূক্ষ্ম রেখা—যাকে রড, সূচ বা আলপিনের সঙ্গেই তুলনা করা হয়েছে। কোনটিতে ঐ পিনের সরু অংশই লেজের মত লম্বা হয়ে যেতে দেখা যায়। কোনটি আবার ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বহুকোণ প্রভৃতি বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারেই দেখা যায়। আর আকারের পরিমাণে (dimension) একটি ক্ষুদ্রতম ভাইরাস দেহের ব্যাস প্রায় 15 মিলিমাইক্রন, বৃহত্তম ভাইরাস প্রায় 300 মিলিমাইক্রন। সেই তুলনায় একটি রিকেটসিয়ার সাইজ প্রায় 350 মিলিমাইক্রন একটা সাধারণ ব্যাক্টিরিয়া প্রায় 1000 মিলিমাইক্রন বা এক মাইক্রন এবং একটি সাধারণ জীবকোষের ব্যাস 5 থেকে 10 মাইক্রন [এক মাইক্রন হচ্ছে এক মিলিমিটারের হাজার ভাগ ($\frac{1}{1000}$ m. m.) আর মিলিমাইক্রন হচ্ছে এক মাইক্রনের হাজার ভাগ] সুতরাং দেহের ব্যাসের দিক থেকে একটি সাধারণ জীবকোষ একটি ছোট ভাইরাসের প্রায় হাজারগুণ। আর সামগ্রিক আয়তনে (volume) এই উভয়ের প্রভেদ প্রায় একশত কোটিগুণ। অর্থাৎ একটা ছোট ভাইরাস সাধারণ

জীবকোষের প্রায় একশত কোটিভাগের একভাগ মাত্র। সুতরাং ছোট্ট বলতে ভাইরাসরা যে কত ছোট তা কল্পনা করতেই কষ্ট লাগে। সেই ক্ষুদ্রাতিতম দেহে যে অপরিসীম জীবনশক্তির বিকাশ দেখা যায়—তাই হচ্ছে জীবন-বিজ্ঞানের বিস্ময়।

উপসংহার

ভাইরাসের উৎপত্তি ও জীবন-বিজ্ঞানে তার স্থান (position) নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে কিছু মতভেদ আছে। এদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বিজ্ঞানী বিপরীতগামী অভিব্যক্তির (retrograde evolution) থিওরি (theory) দিয়ে ভাবতে চান। সেই মতে ব্যাক্টিরিয়া বা অন্য কোন উন্নত জীবকোষ দীর্ঘকাল ধরে ক্রমাগত বিরুদ্ধ পরিবেশে পড়ে তাদের বিভিন্ন কোষ-উপাঙ্গ বা অর্গানেলী-গুলি একের পর এক হারাতে থাকে। সুদীর্ঘকাল ধারাবাহিকভাবে সেই আপজাত্য (continuous degeneration) চলার ফলে শেষ পর্যন্ত এখন কয়েক টুকরা বংশাণু সমন্বিত এক একটি নিউক্লিয়িক অ্যাসিড সম্বল করে অতিক্ষুদ্র ভাইরাস আকারে তারা পরজীবী জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। এই ধরণের চিন্তায় যেমন বিজ্ঞানীমনের স্ব-বিরোধিতা রয়েছে তেমনি এই মতবাদের বাস্তবমুখিতা কতখানি? এই প্রশ্ন স্বাভাবিক। ব্যাক্টিরিয়া বা অন্য কোন ক্ষুদ্র কোষ এইভাবে ধারাবাহিক অঙ্গহানির ফলে তার আদি দেহের শতকোটি ভাগে রূপান্তরিত হয়েও কেমন করে এখনও বেঁচে আছে? সেই অবক্ষয়ী জীবনের শেষ অস্তিত্বটুকুর মধ্যে আবার অপরিসীম জীবনী-শক্তির স্ফুরণ কি করে সম্ভব? ভাইরাসরূপে সেই ক্ষুদ্রাতিতম জীবনাবশেষ কি ভাবে শক্তিশালী জীবকোষগুলিতে অপ্রতিরোধ্য ধ্বংসক্রিয়া ঘটাতে পারে? শরীরের আকারের অবক্ষয়ের সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত শক্তির অবক্ষয়ে বিপরীত গতি কেন?

বেশি দিনের কথা নয়, এই 1918 সালেই সারা পৃথিবীব্যাপী হঠাৎ যে এক অভাবনীয় ভাইরাস তাণ্ডব ঘটে গেছে—ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের ক্ষুদ্র ভাইরাসদের আক্রমণে, তাতে ঐ বছর পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশ কোটির বেশি লোক আক্রান্ত হয় এবং দু'কোটির বেশি মানুষ সেই রোগে মারা যায়। অন্য কোন বিধ্বংসী শক্তি আজ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে এত ব্যাপকভাবে মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে নি। এতে প্রমাণ করে, কী সাংঘাতিক আক্রমণ শক্তি ঐ ক্ষুদ্র ভাইরাসদেহে আছে। এই দুর্জয় জীবনী-শক্তির উৎসরা কি অবক্ষয়ী (degenerated) জীবনের লক্ষণ? না, এতে ক্রমোন্নত জীবনীশক্তির অভিব্যক্তি? আজকের উন্নত বিজ্ঞানচিন্তায় জীবনের সামগ্রিক বিকাশধারাকে ক্রমোন্নত বিবর্তনবাদ বা অভিব্যক্তি (evolution) মতবাদ দিয়েই প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। সেখানে তার বিপরীত চিন্তা — বিপরীতগামী বিবর্তনবাদ (retrograde evolution theory)-এর গুরুত্ব কতখানি? এই বিপরীতগামী মতবাদ জীবনের অন্যক্ষেত্রেও কি প্রয়োগ করা যাবে? সমগ্র জীবনপ্রবাহের বিকাশধারায় এই মতবাদের স্থান আছে কি? একই মতবাদকে সর্বক্ষেত্রে একইভাবে প্রয়োগ না করা তো বৈজ্ঞানিক রীতি নয়—এই সব প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা দরকার। এদেশে সেই জাতীয় বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত আজও হয় নি। ভাইরাস নিয়ে এদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণাও অতি সীমিত। তাই ভাইরাস সম্পর্কে আরও অনেক কথাই বলার থাকলো।

পুস্তক পরিচয়

রতনমোহন খাঁ

প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান: লেখক অরূপরতন ভট্টাচার্য, প্রকাশক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (1975), পৃষ্ঠা সংখ্যা—287, মূল্য—আট টাকা।

পুস্তকখানি প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার ইতিবৃত্ত, সাহিত্য ও তুলনামূলক আলোচনার ত্রয়স্পর্শে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে অনন্য। পরিশিষ্টসহ দশটি অধ্যায়ে লেখক প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্‌দের প্রায় একটি পূর্ণ ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মহাকাশ নিয়ে চিন্তাভাবনা আজকের নয়, বৈদিক যুগে ভারতীয় মনীষীরা যে বিশ্ব পরিক্রমা শুরু করেছিলেন, তারই চরম বিকাশ বিংশ শতাব্দীতে চাঁদের বুকে মানুষের পদচিহ্নে। বৈদিক যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার সূচনা হলেও ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রকৃত পথিকৃৎ আর্যভট। বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা ও গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আর্যভট ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে চিন্তাধারা গড়ে তুলেছিলেন, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য পর্যন্ত উত্তরসূরীরা সেই ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন মাত্র। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমীর সঙ্গে তুলনীয় এই মনীষীর নামেই ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম আর্যভট।

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস, কালমাপের পদ্ধতি, নক্ষত্র, রাশি ও তিথির পরিচয়, গ্রহণের সঠিক কারণ, পৃথিবীর আকার ও আবর্তন, বর্ষারম্ভ ও ঋতুচক্র প্রভৃতি বিষয়ে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌দের চিন্তাধারার বিশদ বিবরণ ও অন্যান্য বহু তথ্য পুস্তকখানিতে বিভিন্ন অধ্যায়ে সুসংহতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌রা যে কেবল যুক্তিনির্ভর ছিলেন না, কিছু কিছু যন্ত্রও ব্যবহার করতেন—তার উল্লেখ ও বর্ণনা আছে সপ্তম অধ্যায়ে। নবম অধ্যায়ে লেখকের স্বকীয়তা ও মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের মধ্যে মহাকাশ-ঘটনাবলীর রূপক সমন্বয়ে। পরিশিষ্টে বৈদিক সাহিত্যের কাল নির্ণয়, সংজ্ঞা ও পরিভাষার সংযোজন পুস্তকখানির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

বাংলা ভাষায় এধরণের রচনা প্রায় নেই বললেই চলে। সেই হিসাবে লেখকের এই প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। অসীম ও বিরাট বিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের ঔৎসুক্য আগেও ছিল, এখন আছে এবং পরেও থাকবে। মানব মনের এই ঔৎসুক্যেই পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পুস্তকখানি দিন দিন আরো সমাদৃত হবে বলে আশা করি।
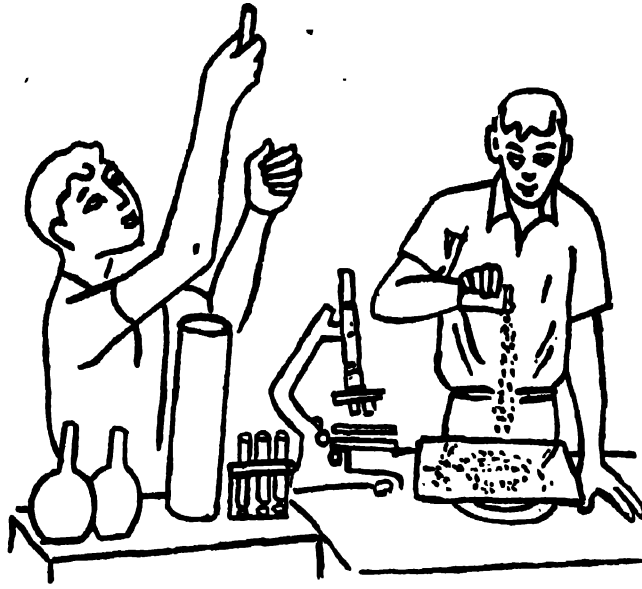
কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

গ্রামীণ উন্নয়নে বিজ্ঞানের প্রয়োগ**

শিলাদিত্য ভট্টাচার্য *

ভূমিকা

ভারতবর্ষের অধিকাংশ গ্রামবাসীদের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তারা অন্নদাতা হয়েও অন্নহীন ; বস্ত্রদাতা হয়েও বস্ত্রহীন, নিরক্ষর, নির্জীব, রোগগ্রস্ত—অথচ এরাই দেশের মেরুদণ্ড ও দেশের জনসমষ্টির শতকরা 60 ভাগ। তাই রোবট, রকেট আর কম্পিউটারের যুগে এদের চিত্র আঁকতে গেলে সত্যই দুঃখ হয়—মনে পড়ে, পঙ্গুজাতির দুর্দশায় ব্যথিত কবিচিত্তের ব্যাকুল আহ্বান—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা ; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা,......"

দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ও দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে মহামান্য লেনিনের ঐতিহাসিক উক্তিটি "Only when the country is educated, electrified ; industry, agriculture and transport are placed on a technical basis, will our

---

** 1976 সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত "অমরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পাঠাগার" কর্তৃক আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত।

* এ-ই-12, সল্ট লেক, কলিকাতা-700064

victory be complete." সত্যই এককালের বর্বরদেশ বলে কথিত বর্তমান রাশিয়ার সর্বাঙ্গীন উন্নতি তাঁদের নেতৃবর্গের দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করছে।

এযুগে খাদ্যাখাদ্য বিচার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রনীতি পর্যন্ত স্থির হচ্ছে বিজ্ঞানের সাহায্যে। তাই স্বর্গত নেহেরুজী বলেছিলেন "My interest largely consists in trying to make the Indian people and even the Government of India conscious of scientific work and necessity for it." এবং তিনি লোকসভায় ভারতের বিজ্ঞান নীতি ঘোষণা করে বলেন "The Govt. of India have decided that the aims of their scientific policy will be to fosterh, promote and sustain, by all appropriate means, the cultivation of science and scientific research in all its aspects, pure, applied and educational." এবং উন্নয়নকামী ভারতের বহুবিধ সমস্যা ও তার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান প্রসঙ্গে বলেন "It is science alone that can solve the problem of hunger and proverty ; of insanitaion and illiteracy ;...of vast resources running into waste ; of a rich country inhabited by starving people. At every time we have to seek its aid. The future belongs to science and those who make friends with science." ভারতের উন্নয়নে এটা অত্যন্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

গ্রামে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

এই বিজ্ঞানের যুগে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষই বিজ্ঞান-সচেতন আর দেশের অগণিত জনসাধারণ এবিষয়ে অজ্ঞ। আজও তারা কবজ, তাবিজ বা মাদার উপর নির্ভরশীল—অবশ্য এর জন্য আমাদের সামাজিক অবস্থাই দায়ী—অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর—গ্রামে চিকিৎসার সুযোগ নেই। অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও স্বীকার করতেই হবে যে অন্ধবিশ্বাস শুধু অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জনসমাজের মনেই বদ্ধমূল নেই—আছে বেশ কিছু উচ্চশিক্ষিতের মধ্যেও তাই নেহেরুজীর আক্ষেপ, "All countries, I said, are normally conservative. But I think our country is more than normally conservative.... I find it even in the thinking of scientists who praise science, and practice it in the laboratory but discard the ways of science, its method of approach and the spirit of science in everything else they do in life. They become completely unscientific."

এদেশে এখনও বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা গড়ে ওঠার পথে অন্তরায় অনেক। ধর্ম, প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রাদেশিকতা প্রভৃতিকে ভিত্তি করে আমাদের দেশে অনেক রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে যারা জনসাধারণের বিজ্ঞান চেতনা উন্নত হতে সাহায্য তো করেই না বরং বিপরীতটাই করে। বিশেষ কতক-গুলি কারণে সমাজ ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হতে পারে না যেমন—(1) বিজ্ঞানীরা নিজেদের বিষয়ে দক্ষতা অর্জনকেই গর্বের বিষয় বলে ধরেন কিন্তু আয়ত্ত-করা বিষয়ে সমাজকে আগ্রহী করেন না; (2) শুধু আত্মনিমগ্ন বিজ্ঞানচর্চায় সমাজের মঙ্গল হতে পারে না ; (3) বাস্তব জগতের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখায় বিজ্ঞানীরা সমাজের বহুমুখী সমস্যাগুলিকে ছোট করে দেখেন এবং মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষাকে উপেক্ষা করেন।

আমাদের দেশে বিজ্ঞানের প্রয়োগ শহরকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, স্বাধীনোত্তরকালে শহরে অনেক কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে—তা গ্রামের মানুষকে শহরমুখী করেছে কিন্তু গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হয় নি, গ্রামে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান ও গ্রামের উন্নতিসাধনই বর্তমান বেকার সমস্যার অন্যতম সমাধান। কৃষিব্যবস্থা, সেচ, পথঘাট, বৈদ্যুতিককরণ প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতি না করলে আমাদের পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হবে না, বিগত 28 বছরে ভারতবর্ষে উন্নয়ন প্রকল্পের অধিকাংশই শহরের জন্য নিয়োজিত হয়েছে এখন প্রয়োজন গ্রামভারতের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বেকারী-সমাধান প্রভৃতি গ্রামভারতের আশু সমস্যাগুলি নিরসন করতে পারলে বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে উঠবে। সেদিন বিজ্ঞানের বাণী সাধারণ মানুষের মর্মস্থলে নূতন স্পন্দন এনে দেবে, গড়ে উঠবে এক নূতন ভারতবর্ষ।

এদেশে অধিকাংশই নিরক্ষর আর সমাজের এই অংশ থেকেই যখন কর্মীরা জমিতে শস্য উৎপন্ন করে, পথঘাট-আবাস তৈরি করে, শিল্পের কাজ করে, বিজ্ঞানের নানা প্রয়াসের সঙ্গে সাধারণ কর্মী হিসাবে সমাজের এই অংশের মানুষ যখন যুক্ত, দেশের, সমাজের উন্নয়নের জন্য চাই—এদের মধ্যেও যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্যের সহজ পরিচয় করিয়ে দেওয়া—এর জন্য শুধু মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের পুস্তক প্রচারই একমাত্র নয়—প্রয়োজন টেলিভিশন, রেডিও প্রভৃতির মাধ্যমে বিজ্ঞানের তথ্যভিত্তিক চিত্র ও তত্ত্বের প্রচার এবং জটিল প্রয়োগ সমস্যাগুলির সহজ প্রদর্শন, চাই বিজ্ঞানের তথ্য বোঝাবার জন্য ব্যক্তিজীবনে, সমাজ-জীবনে, কৃষিতে, বিশেষ প্রয়োজনীয় কর্মপ্রচেষ্টায়, শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে, স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপনে এক একটি সুপরিকল্পিত মডেল যাতে বাস্তব চিত্রটি প্রতিফলিত হয়। দেশের নানা স্থানে বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে ঐসব মডেলের সাহায্যে সম্যক শিক্ষায়-বঞ্চিতদের প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের সঙ্গে যথাসম্ভব পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার। আমরা নিরক্ষরতার কথা বলি অথচ তা দূরীকরণের কোন বাস্তব পন্থার কথা চিন্তা করি না—এক্ষেত্রে দেশের ছাত্রসমাজ যদি এগিয়ে আসে—বিভিন্ন ছুটির দিনগুলিকে যদি নিরক্ষরতা দূরীকরণে নিয়োজিত করে তবে নিরক্ষরতা অনেকটা হ্রাস পাবে। তামিলনাড়ু, রাজস্থান, বিহার, উত্তর ও মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কেরালা পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে মোট 12টি Rural Institute গড়ে উঠেছে, ফলে 1971-'72-এ 29·45% লোক সাক্ষর হয়েছে অথচ 1951 সালে ছিল 16·6%।

এ-দশকে ট্রানজিস্টর মারফত কৃষিবিষয়ক আলোচনা গ্রামের কৃষকসাধারণের কাছে বিজ্ঞান-ভিত্তিক কৃষিপদ্ধতির স্বরূপ তুলে ধরেছে। সামান্য প্রচেষ্টা হলেও এটি ফলপ্রসূ। রাসায়নিক সার, কীটনাশকদ্রব্য, উন্নততর বীজ প্রভৃতির ব্যবহার কৃষকদের নিকট ক্রমশঃ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। হরিয়ানা-পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে যেভাবে কৃষির সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন হচ্ছে অন্যান্য রাজ্যে ততটা দেখা যাচ্ছে না। কৃষিবিপ্লব সার্থক করতে হলে গ্রাম-বৈদ্যুতিককরণের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। বর্তমান পরিকল্পনায় প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—গ্রাম-বৈদ্যুতিককরণ সম্ভব হলে শুধু কৃষির জন্য জলসেচই নয়, ক্ষুদ্রশিল্পের মাধ্যমে বেকার-সমস্যার সমাধানও সম্ভব হবে। এই সঙ্গে গ্রামীণ উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে।

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ

কৃষি উন্নয়ন ও বিজ্ঞান : ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ—শতকরা 70 ভাগ লোকই কৃষিজীবী এবং জাতীয় আয়ের প্রায় 47% কৃষি থেকেই আসে তাই জাতীয় স্বার্থে কৃষিতে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ

সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে। চিরঘাটতির দেশ বলে কথিত ভারত খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ভবিষ্যতে খাদ্য রপ্তানীর কথা চিন্তা করতে চলেছে এই উন্নতির প্রধান স্তম্ভ আমেরিকার কৃষিবিজ্ঞানী N. E. Borlaug-এর যুগান্তকারী গবেষণা। তিনি ভারতে এসে কৃষকভাইদের উচ্চফলনশীল বীজ ও তার প্রয়োগসংক্রান্ত বিষয়ে হাতেকলমে শিক্ষা দেন। কৃষিতে ভারতের উৎপাদন বহুগুণ বেড়েছে কিন্তু উন্নত সংরক্ষণের অভাবে প্রতি বছর প্রায় 50 লক্ষ টন খাদ্যশস্যের অপচয় হয়। ভারতে খাদ্যশস্য অপচয় রোধে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ যে ভারতে উৎপন্ন বা আমদানীকৃত খাদ্যের প্রায় 9·3% পরিবহণকালে বা রাখার অব্যবস্থায় নষ্ট হয় ফলে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 700 কোটি টাকা; তাছাড়া ইঁদুর, পাখি ও পোকামাকড়ের পেটে যায় বহু। এই ক্ষতির একটি বড় অংশ পরিহার করা সম্ভব উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রথায় খাদ্য সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে। এর জন্য হাপরে U.N.O-র সহযোগিতায় National Grain Storage Institute স্থাপন করা হয়েছে, খড়্গপুরস্থ I. I. T. প্রতিষ্ঠানের Agriculture Engineering Department এবং আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এবিষয়ে উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভাবন ও কৃষকদের উপযুক্ত শিক্ষাদানে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। উন্নত দেশগুলির মত আমরাও উপযুক্ত তাপ ও ঠাণ্ডা প্রয়োগ বা বিকিরণ শক্তির প্রয়োগে উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে পারি। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সংরক্ষণাগার সংস্থার বহু বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণাগার গড়ে উঠেছে যেখানে খাদ্যশস্য দীর্ঘদিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা হচ্ছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি ও অন্যান্য উপকরণের অভাবে এদের সংখ্যা, বিশেষত গ্রামের দিকে অতিসামান্য—তাই এব্যাপারে গ্রামকে অগ্রাধিকার দিতে হবে অন্যথায় উৎপন্ন খাদ্যশস্যের বেশ কিছু পরিমাণের অপচয় রোধ করা যাবে না।

সেচব্যবস্থা ও সারের প্রয়োগ ঃ—কৃষির অঙ্গ হিসাবে প্রয়োজন আধুনিক সেচব্যবস্থা—যার সাহায্যে ভারতীয় কৃষকদের আর ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হবে না। 1974 সাল পর্যন্ত প্রায় 45. কোটি হেক্টর জমি বিভিন্ন উপায়ে সেচের আওতায় এসেছে। বিগত চতুর্থ পরিকল্পনায় এই খাতে প্রায় 2261·2 কোটি টাকা খরচ হয়েছে। পঞ্চম পরিকল্পনায় এই খরচ আরও বাড়বে। ভারতীয় কৃষকেরা বিজ্ঞান শিক্ষার অভাবে এখনও আধুনিক সারের যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানে না—উন্নতিকামী দেশের পক্ষে এটা বেদনাদায়ক, অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় আধুনিক রাসায়নিক সারের উৎপাদন আমাদের দেশে অনেক কম—যে সকল দেশ এই সমস্ত সার রপ্তানী করত—তারাও নিজেদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তাগিদে রপ্তানী বন্ধ করে দিতে বসেছে; কাজেই আমাদের কৃষকদের জৈব সারের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে—অথচ সহজলভ্য উৎকৃষ্টতম জৈব সার গোবরকে আমরা জ্বালানীরূপে ব্যবহার করে অপচয় করি। একটি সমীক্ষায় প্রকাশ সিন্দ্রিতে যে পরিমাণ সার উৎপন্ন হয়, কেবল জ্বালানীরূপে গোবর পুড়িয়ে তার প্রায় 10 গুণ নষ্ট করা হচ্ছে। এই অযথা অপচয়ের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে, অবশ্য এখন গ্রামে গ্রামে গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের কথা চিন্তা করা হচ্ছে যাতে জ্বালানী ও সার উভয়ই পাওয়া যায়। এছাড়া অ্যাজোটোব্যাক্টর জীবাণুসার ব্যবহার করে প্রায় $1\frac{1}{2}$ গুণ বেশি ফসল উৎপাদন সম্ভব অথচ খরচ পড়ে প্রতি হেক্টরে মাত্র 4-6 টাকা এবং এই জীবাণুসার প্রায় 3 থেকে 10 কিলো পর্যন্ত নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে যা প্রায় 15 থেকে 50 কিলো অতি মূল্যবান অ্যামোনিয়াম সালফেটের সমান। উন্নত সার, বীজ; উন্নত কৃষিপদ্ধতি, সেচব্যবস্থা, কৃত্রিম বৃষ্টি প্রভৃতির উদ্ভাবন করে যখন বিজ্ঞানী সমাজ কৃষকদের সঙ্গে হাত মেলাবেন তখনই আমাদের কৃষিবিপ্লব সার্থক হবে।

মহাকাশ গবেষণা আমরা জানি যে ভারতকে নিয়ে পৃথিবীর বহু দেশই ঘূর্ণিবাত্যার দ্বারা আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত। একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে ভারতের আবহাওয়ার পূর্বাভাষ নির্ভুত হলে বার্ষিক প্রায় 600 কোটি টাকা বেঁচে যাবে, যা মহাকাশ গবেষণার দ্বারা সম্ভব। ভারত অন্যান্য দেশের সহযোগিতায় Space-Meteorology-র গোড়াপত্তন করেছে এবং এর দ্বারা কৃষকদের উপযুক্ত সময়ে আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাষ জানানো গেলে মোট উৎপাদনের প্রায় 5% বাঁচানো যাবে। এই প্রকল্পকে সার্থক করে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি Storm Detecting Radar দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে, বেশ কয়েকটি Cyclone Detecting Radar স্থাপন করা হচ্ছে, আবহাওয়া বিষয়ক গবেষণার জন্য বেশ কয়েকটি রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে এবং কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভটের উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। 'উপগ্রহ মারফত শিক্ষামূলক টেলিভিসন পরীক্ষা' বা (SITE) প্রকল্প অনুযায়ী বহু গ্রামবাসী উপকৃত হবেন।

যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতিকামী দেশের পক্ষে একটি সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। ব্যবসা-বাণিজ্য, আঞ্চলিক যোগাযোগের জন্য, সহজে পচনশীল কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনকেন্দ্র থেকে বাজারে প্রেরণের জন্য সর্বঋতুতে উপযোগী পাকা রাস্তার যোগাযোগ অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ Road System প্রয়োজন, অথচ পরিকল্পনামাফিক কাজ থেকে আমরা অনেক পেছিয়ে। যথেষ্ট সংখ্যায় নূতন রাস্তা না করলে আমাদের গ্রামগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি হবে না, যেখানে রাস্তা আছে আর যেখানে নেই তাদের মধ্যে একটি অসমতার সৃষ্টি হবে।

বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার : ভারতকে শিল্পোন্নত হতে গেলে বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন বাড়াতেই হবে। 1967 সালে আমাদের মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন দাঁড়ায় 79 ইউনিটে। 1971-এ পৌঁছায় 111 ইউনিটে, অনুমান করা হচ্ছে যে সত্তর দশকের শেষ দিকে যদি 250 লক্ষ কিলোওয়াট ক্ষমতার শক্তিকেন্দ্র গড়ে তোলা যায় তবে বর্ধিত জনসংখ্যাকে নজরে রেখে বলা যেতে পারে যে মাথা-পিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন 125 ইউনিট অতিক্রম করবে যা অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় খুবই কম, 1974 সালে ভারত সরকারের বার্ষিক রিপোর্টে দেখা গেছে যে 16·35 কোটি হেক্টর কৃষিক্ষেত্রের মাত্র 28% সেচের আওতায় এসেছে। বাকি জমিতে সেচের জন্য প্রায় 320 লক্ষ KW শক্তিকেন্দ্র প্রয়োজন যদিও 5-6 মাসের জন্য—কাজেই বাকি সময় এই শক্তিকেন্দ্রগুলি সার ও অন্যান্য শিল্প উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারবে—গত 1968 সালে P. R. Stout এইরকম Agro-Industrial Complex-এর পরিকল্পনা এদেশের জন্য দেন। এতে গ্রামে শিল্পের প্রসার ও খাদ্যসমস্যার বাড়তি সমাধান হতে পারবে। 1974 সালের শেষে আমাদের প্রায় 27·4% গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছায়, পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে প্রায় 35-40% গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছাবে বলে অনুমান। তাতেও আগামী দশ বছরে বিদ্যুতের চাহিদা যা হবে জলপ্রবাহ, কয়লা বা খনিজ তেলের মিলিত শক্তি দিয়ে ঐ চাহিদা পূরণ করা অসম্ভব—তাই পারমাণবিক বিদ্যুৎপ্রকল্প ছাড়া গতি নেই। ইতিমধ্যেই কয়েকটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু হয়েছে, বহু ভারতীয় বিজ্ঞানী থোরিয়াম থেকে পরমাণু-বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টায় গবেষণারত। ভারতে থোরিয়াম প্রচুর রয়েছে কাজেই এই গবেষণা সফল হলে ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চাহিদা পূরণ হয়ত সম্ভব হবে।

সৌর ও বায়ুশক্তির প্রয়োগ : ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চল বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল সারাদিন অফুরন্ত সূর্যরশ্মি পায়। এই সৌরশক্তিকে সরাসরি তাপে রূপান্তরিত করে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করা যেতে পারে। দিল্লীর National Physical I aboratory সৌরশক্তি চালিত গ্রামে

ব্যবহারের উপযোগী Solar Power Plant তৈরির প্রকল্পে হাত দিয়েছেন এটা সত্যই আশার বাণী। এই সঙ্গে আমাদের বায়ুশক্তির কথাও ভেবে দেখতে হবে। পৃথিবী বিভিন্ন দেশ বায়ুশক্তি ব্যবহার করছেন। ডেনমার্কে প্রায় 4500 Industrial Windmill থেকে প্রায় 1·5 লক্ষ KW শক্তি উৎপন্ন করা হয়। ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পালাঘাট নামে একটি প্রায় 20 মাইল দীর্ঘ ফাঁক আছে, এখানে প্রায় 3000 বর্গমাইল এলাকায় যে বায়ুপ্রবাহ হয় তাকে প্রায় 15000 windmill-এর সাহায্যে কাজে লাগিয়ে বহু গ্রামে বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে—পর্বতময় আসামেও এরকম প্রকল্প চালু করা সম্ভব। এইসব সস্তা অথচ কার্যকরী শক্তি উৎপাদন প্রকল্পের প্রতি আমাদের এখন নজর দিতেই হবে।

জনসংখ্যা, জনস্বাস্থ্য ও পশুচিকিৎসা

জনসংখ্যার বিশালতার কথা আমাদের আর অজানা নয়, দরিদ্র দেশগুলির উপর কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে এই অসম স্ফীত জনসংখ্যার ভার চেপে বসেছে তা জানা যায় নি—আগামী দিনের কথা চিন্তা করে আমরা সত্যই বিব্রত, তাই পরিবার পরিকল্পনা আমাদের জীবনে অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে—অবশ্য সরকার এবিষয়ে নজর দিয়েছেন এবং তার ফলও পাচ্ছি কিছুটা। পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের '69-এর জন্মহার 3·9% পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে 3%-এ নামিয়ে আনা যাবে এবং '84-'85 নাগাদ এই হার 2·5%-এ নেমে যাবে বলে সমীক্ষায় প্রকাশ। এর জন্য ইতিমধ্যে প্রায় 1·6 কোটি দম্পতির মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে যদিও পরিকল্পনানুযায়ী প্রায় 4 কোটি করার কথা ছিল। গ্রামবাসীদের এবিষয়ে শিক্ষিত করা প্রয়োজন, গ্রামে স্বাস্থ্যের চিত্রটি আরও ভয়াবহ। শিক্ষিত ডাক্তার তো দূরের কথা হাতুড়ে চিকিৎসকও পাবার সম্ভাবনা নেই এরকম গ্রামের সংখ্যাই বেশি—অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত উপকরণের অভাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতো অবহেলারই সামিল। তবুও সরকারী উদ্যোগে গত মার্চ '74 পর্যন্ত প্রায় 5200টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত হয়েছে যেখানে 1951 সালে একটিও ছিল না। এখন প্রতি হাজারে স্বাস্থ্যবিভাগের শয্যাসংখ্যা 0·53, ডাক্তার 0·21 নিতান্তই নগণ্য—তাসত্ত্বেও আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ গ্রামবাসীরা কিছু কিছু পাওয়ায় ম্যালেরিয়া, বসন্ত, যক্ষা প্রভৃতির প্রকোপে মৃত্যুর হার যথেষ্ট কমেছে। সরকার চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রায় 343·91 কোটি টাকা এই খাতে খরচ করেন—চলতি পরিকল্পনায় প্রায় 796·00 কোটি টাকা খরচ করার কথা আছে—তাই আমরা আশা করব গ্রামীণ উন্নয়নে স্বাস্থ্যদপ্তর আরও সক্রিয় হবেন। এর উপর পশুচিকিৎসার ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের এবিষয়ে নজর দেবার সময় এসেছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রকল্প

ভারতের মাথাপিছু আয়ের কথা ধরলে দেখা যায় 1960-'61-তে আয় ছিল 306·3 টাকা যা 1969-'70-এ দাঁড়ায় 589 টাকায়, '60-'61-র মুদ্রামূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয় দাড়ায় 339·4 টাকায়—যতই কম হোক না কেন—এই বর্ধিত আয় দেশের অগ্রগতির পরিচয় দেয় তবুও বণ্টন ব্যবস্থার অসমতায় ধনী আরও ধনী হচ্ছে আর গরিবী বাড়ছে? প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর বিশদফা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সফল রূপায়ণের দ্বারা হয়ত কিছুটা সমতা আসবে। জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ আজ 30টি জাতীয় গবেষণাগারে খরচ হচ্ছে। শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্যই পরমাণু ও মহাকাশ-বিজ্ঞানে এত ব্যয় করা হচ্ছে না—অন্যতম উদ্দেশ্য এর সার্থক প্রয়োগ বিষয়ে

উপযুক্ত জ্ঞান লাভ, এই সকল প্রয়োগ প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করা হবে তার দ্বারা অধিকতর কল্যাণকর অন্য কোন বৈজ্ঞানিক কর্মধারার বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখতে হবে; কারণ বিলাসে অর্থের অপচয় করার ক্ষমতা এখনও আমাদের নেই আর বিদ্যুৎ ঘাটতি, খাদ্যাভাব, বেকারী প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যা যখন এদেশে এখনও প্রকট রয়েছে।

উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল দেশেই আজ প্রগতি ও জনকল্যাণের কাজে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের ভূমিকার গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে, গত 1973 সালে কলকাতায় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের সম্মেলনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটির সভাপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম কয়েকটি যুক্তি-সঙ্গত প্রশ্ন তুলে ধরেন :—(1) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাখাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তার উপযুক্ত প্রতিদান কি আমরা পাচ্ছি? (2) মৌলিক ও ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা হচ্ছে কি? (3) উপযুক্ত লোকই কি বিজ্ঞানশিক্ষা পাচ্ছে? (4) পঞ্চম যোজনায় আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কর্মকাণ্ডের রূপরেখা কি হওয়া প্রয়োজন?

তিনি আরও বলেন—রাজনীতি ও প্রশাসকদের আধিপত্যের দিন শেষ হয়ে এসেছে—এখন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের আধিপত্যের দিন। অথচ এখনও সমাজব্যবস্থার শেষ কথা বলার অধিকার বিশেষজ্ঞদের নেই—তাঁরা শুধু দাবী করেন—তাই প্রশাসকেরা যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন, সেটা যেন সঠিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত তথ্যের ভিত্তিতে করা হয় আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কাজে পরিণত করার সময় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে সেখানে প্রশাসকদের খবরদারী অবাঞ্ছনীয়। এতে পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ ব্যাহত হয়।

ভারত সরকার সম্প্রতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জন্য National Committee of Science and Technology সংক্ষেপে NCST গঠন করেছেন। এই প্রথম NCST-র মত একটি কমিটি বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ্, প্রযুক্তিবিদ্‌দের সহায়তায় এদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পরিকল্পনা রচনা করেছেন। '58-'59 সালে যেখানে জাতীয় আয়ের প্রায় 29 কোটি টাকা বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়নে (R & D) খরচ হয়েছিল, '71-'72-এ তা 214 কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এত ব্যয় সত্ত্বেও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে গ্রামভারতের কোটি কোটি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মোচনে বিগত 25 বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে নি তা বর্তমান সরকার বেশ হৃদয়ঙ্গম করেছেন এবং NCST গঠন করে একটি বাস্তবানুগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। যেখানে 1970-'71 সালে কৃষিখাতে আয় ছিল মোট জাতীয় সম্পদের প্রায় অর্ধেক, সেখানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি তার 21% এই খাতে খরচ করেন। মহাকাশ ও পরমাণু প্রকল্পগুলিতে R & D খাতে মোট ব্যয়ের 20%, চিকিৎসা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণে 5%, প্রতিরক্ষায় 12%, সেচ ও শক্তিতে 2%-এর কম খরচ করা হয়েছে। সরকারী মতে এই ব্যয়গুলি সুষম হয় নি। NCST-র পকিল্পনায় কৃষিবিভাগ প্রাধান্য পেয়েছে—কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে শুধু খাদ্য নয় জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির দ্বারা বর্ধনশীল জনসাধারণের জীবনধারণের মানও উন্নীত করা যাবে। তাছাড়া দুগ্ধ, মৎস্য, গ্রামীণ গৃহনির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ উন্নত করার চেষ্টাও প্রাধান্য পেয়েছে। সন্দেহ নেই যে এই প্রতিবেদনে পরিকল্পনার যে কাঠামো উপস্থাপিত করা হয়েছে তাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে জাতীয় উন্নয়ন ও নিরাপত্তা রক্ষায় আমরা কি করতে চাই তা সম্পূর্ণ-রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনামাফিক কাজ অনেকাংশে ব্যাহত হয়। প্রথমতঃ আমলা-তন্ত্রের ধীর পদক্ষেপের ফলে; দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থব্যয়ের অপরিসীম জটিলতার জন্য;

তৃতীয়তঃ সুদূর পল্লীঅঞ্চলের লোকের পক্ষে রাজধানীতে গিয়ে তদারক করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই NCST একটি শেষ কথা বলেছেন "We can formulate and we can project ; we can envisage and we can programme ; we can define and we can budget ; but if we cannot implement with speed and efficiency we would have failed a new generation and forefeited our mandate to plan."

আমরা যত করি তার থেকে অনেক বেশি কথা বলি—কিন্তু শুনেছি সাম্যবাদী রাশিয়ার জনক লেনিন পরিকল্পনা রূপায়ণ প্রসঙ্গে বেশি কথা বলতেন না। বার্ষিক রিপোর্টে তিনি শুধু কি হয়েছে, কি হচ্ছে এবং কি হবে তাই জানাতেন। বিদেশী সাহায্য ও সহযোগিতা কমিয়ে দেশের মানুষ ও দেশের সম্পদ দিয়ে একটি সুখী ভারত গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের প্রশাসক, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের নিতে হবে—তাই এই পরিকল্পনার শ্লোগান হোক "কথা কম—কাজ বেশি।"

উপসংহার

গ্রীক পুরাণের প্রমিথিয়ুস মাটির তৈরী মানুষের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত করার মহান উদ্দেশ্যে স্বর্গ থেকে যা চুরি করে এনেছিলেন তা বোধ হয় অগ্নি নয়, বিজ্ঞানচেতনা—আজ বোধ হয় সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় মানুষের মস্তিষ্ক—মানুষের চিন্তাশক্তি। আজ মানুষের অস্তিত্বের সংগ্রামে বিজ্ঞানের আরও শ্রীবৃদ্ধি প্রয়োজন, কিন্তু সে বিজ্ঞান জীবনমুখী হওয়া আবশ্যক। নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী বিজ্ঞানী Salvador Luria-র ভাষায় "We needed more rather than less science but a social technology and a social science of human living." উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত এবং দুটি বিশ্বযুদ্ধ কারিগরীবিদ্যাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও তার পরিমার্জিত প্রয়োগ তৃতীয় বিশ্বকে আরও সুস্থ ও সুন্দর করে গড়ে তুলেছে। জীবনধারণের সর্বক্ষেত্রেই আজ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। আমরা জানি গণতন্ত্রীরাষ্ট্রে জনগণই প্রভু—তাদের শিক্ষায় অনগ্রসর রেখে দেশের শক্তি ও সংহতি রক্ষা অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে "আমাদের প্রভুদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে।" এই উক্তির সফল রূপায়ণের ফলে ইউরোপ ও আমেরিকার কৃষি ও শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল ; সেক্ষেত্রে গণশিক্ষার ভূমিকাই ছিল মুখ্য, আমরা যে এখনও এত পেছিয়ে তার বোধ হয় একমাত্র কারণ এই গণশিক্ষার অভাব—এযুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ সমস্যা যতই জটিল হচ্ছে শিক্ষার ভূমিকা ততই বাড়ছে। তাই জনস্ফীতির চাপে ভয় না পেয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও গণশিক্ষার মাধ্যমে এই বিশাল জনবলকে অমূল্য সম্পদে পরিণত করে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আগামী দিনের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার পথে ভারতের উত্তরণকে স্বাগত জানাই।

সমুদ্রকন্যা

হরিমোহন কুণ্ডু*

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সমুদ্রউপকূলবর্তী দেশগুলিতে ছড়িয়ে আছে 'সমুদ্রকন্যার' গল্প। ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের প্রাচীন সাহিত্যে সমুদ্রকন্যাকে নিয়ে রচিত হয়েছে নানা রূপকথা,—যা আজও সুখপাঠ্য। সমুদ্রকন্যাকে কোথাও বলা হয় 'মৎস্যকন্যা'—কোথাও বা বলা হয় পাতালপুরীর রাজকন্যা। আদর্শ সমুদ্রকন্যার মাথা এবং ঊর্ধ্বাঙ্গ স্ত্রীলোকের মত, এবং কোমরের নীচের অংশ মাছের মত। বিভিন্ন উপকথায় উল্লেখিত আছে এরা নাকি মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে সক্ষম। মানুষের সঙ্গে ভালবাসা পাতিয়ে আদর্শ স্ত্রী হিসাবে বসবাস করে। মাঝে মাঝে সমুদ্রে চলে যায়:—কিন্তু আবার ঘর সংসারে ফিরে আসে। এদের স্নেহ, মায়া, মমতা অপরিসীম। এদের নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক গল্প ও কবিতা।

আসলে সমুদ্রকন্যা হলো এক ধরণের সামুদ্রিক প্রাণী,—যার মাথা এবং ঊর্ধ্বাংশ কিছুটা মানুষের মতই,—কিন্তু নিম্নাংশ মাছের মত। এদের ইংরাজীতে বলা হয় sea-cow বা সমুদ্রগাভী। তিমি, ডলফিন, সমুদ্রসিংহের মত সমুদ্রগাভীও এক ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী। এরা অত্যন্ত নিরীহ বলে শিকারীর কাছে খুবই সহজলভ্য। দীর্ঘদিন ধরে নির্বিচারে শিকারের ফলে এরা আজ অবলুপ্তির পথে।

সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে। তবে বিজ্ঞানীদের যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এটা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত যে এই সব স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আদি বংশধর স্থলচর। খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবে জীবন-সংগ্রামের মাধ্যমে এদের পূর্বপুরুষেরা স্থলচর থেকে হলো উভচর। পরে এরা পুরোপুরি হলো জলচর। আবার সব সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বংশধর কিন্তু এক নয়। সমুদ্রসিংহ, সীল প্রভৃতিদের বংশধর ছিল মাংসাশী প্রাণী। বর্তমানে এরা উপবর্গ পিনিপিডিয়ার অন্তর্ভুক্ত (Sub-order—Pinnipedia)। তিমিদের পূর্বপুরুষ ছিল বহু প্রাচীন স্তন্যপায়ী প্রাণী। বর্তমানে এরা সিটেসিয়া বর্গের (Order-Cetacea) অন্তর্ভুক্ত। আর সমুদ্রগাভীদের পূর্বপুরুষ ছিল উদ্ভিদভোজী। বর্তমানে এরা সাইরেনিয়া বর্গের (Order-Sirenia) অন্তর্ভুক্ত। বৈজ্ঞানিক রোমার ও সিম্পসনের মতে (Romer & Simpson) আফ্রিকার বর্তমান স্থলচর প্রাণী হাইর‍্যাক্স (Hyrax), হাতী এবং সমুদ্রগাভীর পূর্বপুরুষ ছিল এক। সেই পূর্বপুরুষদের কোন এক শাখা খাদ্যের অন্বেষণে জলাশয়ে চড়ে বেড়াতো। হাজার হাজার বছর ধরে জলীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে দেহের পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তনের ফলস্বরূপ বর্তমান সমুদ্রগাভীর উৎপত্তি।

ভারতীয় সমুদ্রগাভীর বৈজ্ঞানিক নাম হলো ডুগং (Dugong dugon)। ভারতের কচ্ছ প্রণালী, মালাবার উপকূল, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আশেপাশে এবং সিংহলের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে একদিন

* প্রাণিবিদ্যাবিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া

এদের প্রচুর দেখা যেত। বর্তমানে খুব কমই দেখা যায়। লোহিত সাগর এবং অস্ট্রেলিয়া ও ফরমোজা উপকূল থেকে যে সব প্রজাতির সমুদ্রগাভী পাওয়া যায় তাদের বৈজ্ঞানিক নাম হেলিকোর (Helicore)। কিন্তু বর্তমানে এদের Dugong গণের (genus) মধ্যেই ধরা হয়।

ডুগং-এর দৈর্ঘ্য 10 থেকে 12 ফুট; দেহের ঘের 6 থেকে 8 ফুটের মত। ওজন প্রায় 1 টন। স্ত্রী-ডুগং পুরুষদের চেয়ে ছোট। ডুগং-এর দৈহিক আকৃতি মোটামুটি বড় সীলের মত অথবা ছোট তিমির মত। পেটের তলা চ্যাপ্টা; কিন্তু পিছন দিক ও পার্শ্বদিক গোলাকৃতি, ঘাড় নেই। মাথাটি সরাসরি ধড়ের উপর অবস্থিত। ধড় ও মাথার মাঝে একটু খাঁজ থাকে। মাছের মত লেজটি দেহের অক্ষের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে (horizontal) অবস্থিত এবং পুরু ত্বক দিয়ে তৈরী। ঊর্ধ্ববাহু সাঁতার কাটার জন্য চওড়া 'প্যাডেল' (paddle) রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। নিম্নপদ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। স্ত্রী-ডুগংদের বাহুর নীচে আছে বাচ্চাদের দুগ্ধপানের জন্য স্তনযুগল। দেহের তুলনায় মুখ ছোট। উপরের ঠোঁট নীচের ঠোঁটের চেয়ে অনেক বড়। ঐ ঠোঁট কিছুটা নীচের দিকে ঝুলে থাকে এবং হাতীর শুঁড়ের মত দেখায়। সমস্ত দেহের উপর এমনকি 'প্যাডেল' এবং লেজের উপরেও ছোট ছোট লোম থাকে। তবে মুখপ্রান্ত ও নীচের চোয়ালের লোম একটু লম্বা। চোয়ালের দুই প্রান্তে ভোতা কাঁটার মত বস্তু দেখা যায়। বাচ্চা সমুদ্রগাভীর ঊর্ধ্ব চোয়ালে 4টি এবং নিম্ন চোয়ালে 8টি করে কৃন্তক দাঁত (incisor) থাকে এবং পেষক দাঁত (molar) থাকে 5টি করে। পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হলে ঊর্ধ্ব চোয়ালে 3 এবং নিম্ন চোয়ালের একদিকে 2টি করে কৃন্তক দাঁত থাকে। পুরুষদের ক্ষেত্রে সামনের কৃন্তক দাঁতগুলি হাতীর 'গজদন্তের' মত ঊর্ধ্ব ঠোঁট ভেদ করে সামনে বেরিয়ে আসে। স্ত্রী-ডুগং-এর ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায় না। নাসারন্ধ্র দুটি অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি হয়ে মাথার উপর অবস্থান করে, যাতে মাথা জলের উপর তুললেই শ্বাসক্রিয়ার জন্য সহজে বাতাস নিতে পারে। এদের শ্বাস-অঙ্গ আজও ফুসফুস। এদের চোখ ছোট এবং দু-পাশে দুটি গর্তের মধ্যে অবস্থিত। বহিঃকর্ণ থাকে না তবে দু-পাশে দুটি ক্ষুদ্র গোলাকৃতি কর্ণ-ছিদ্র দেখা যায়। গায়ের রং ধূসর অথবা পিঙ্গল বর্ণের। তবে পেটের তলা মাংসের মত লাল।

জন্তুটি চালচলনে অত্যন্ত ধীরস্থির, দ্রুত পলায়নে অক্ষম। প্রায়ই সমুদ্রের অগভীরে উদ্ভিদের জন্য চড়ে বেড়ায়। মাঝে মাঝে শিরদাঁড়ার উপর ভর করে ঊর্ধ্বাঙ্গ জলের উপর তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। তখন লাল অথবা পিঙ্গলবর্ণের পেটের তলায় রৌদ্রের ঝলকানিতে কালো মাথা সহ দূর থেকে রূপসী সমুদ্রকন্যা বলেই ভ্রম হয়। জাহাজের নাবিকদের এ দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে। তীরে এসে তারা এদের সম্বন্ধে নানা গল্প ছড়ায়। সেই গল্প থেকেই বিশ্ব সাহিত্যে সমুদ্রকন্যাদের নিয়ে রূপকথার সৃষ্টি হয়।

এরা একসঙ্গে একটি করেই বাচ্চা পাড়ে। বাচ্চাকে অত্যন্ত স্নেহভরে স্তনপান করিয়ে লালন করে। কখনও কখনও স্ত্রী সমুদ্রগাভী বাচ্চাকে ঊর্ধ্ববাহু বা 'প্যাডেল' দিয়ে জড়িয়ে ধরে, লেজের উপর ভর করে জলের উপর ঊর্ধাংশ তুলে ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। লোহিত সাগরে এরকম দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে।

জেলেদের জালে ধরা পড়লে এদের চক্ষুগ্রন্থি থেকে জলধারা নির্গত হতে দেখা যায়। হয়তো আসন্ন মৃত্যুর জন্য এই জলধারার মাধ্যমে পরিত্রাণ পাবার আকুতি জানায়। কিন্তু মালয়ের অধি-

বাসীরা মনে করেন এই জলধারা ভালবাসার প্রতীক। সন্তানকে আদর করার সময় অথবা স্ত্রী পুরুষের মিলনের সময়েও নাকি এই জলধারা দেখা যায়। এরা প্রায় 70-80 বছর বেঁচে থাকে।

ভারতের মানা প্রণালীতে এদের একসময় প্রচুর দেখা যেত। কিন্তু এরা দ্রুত পলায়নে অক্ষম হওয়ায় এবং এদের মাংস স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রিয় খাদ্যরূপে বিবেচিত হওয়ায়, স্থানীয় জেলেরা বিশেষ ধরনের জাল দিয়ে এদের শিকার করে। ফলে এরা মানা প্রণালীতে আজ প্রায় অবলুপ্ত। কালেভদ্রে দেখা যায়। এদের চর্বি থেকে যে তেল পাওয়া যায়, তাও মানুষের কাছে লোভনীয়। একটি পূর্ণবয়স্ক ডুগং থেকে 10 থেকে 12 গ্যালন তেল পাওয়া যায়। এই তেল জ্বালানী, সাবান কারখানায় নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।

সাইরেনিয়া বর্গের (Sirenia) প্রধান গণ দুটি ;—যথা ম্যানাটি (Manatee) এবং ডুগং (Dugong)। দুটি গণের মধ্যে মূল তফাৎ হলো ম্যানাটির পেষক দাঁতের উপর এনামেলের আবরণ আছে এবং এই দাঁতের সংখ্যা ঊর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়ালের একদিকে 20টি করে। সব দাঁত একসঙ্গে ব্যবহার হয় না। এদের ঘাড়ে 6টি কশেরুকা আছে এবং 'প্যাডেলের' আঙ্গুলে নখ আছে। অপর
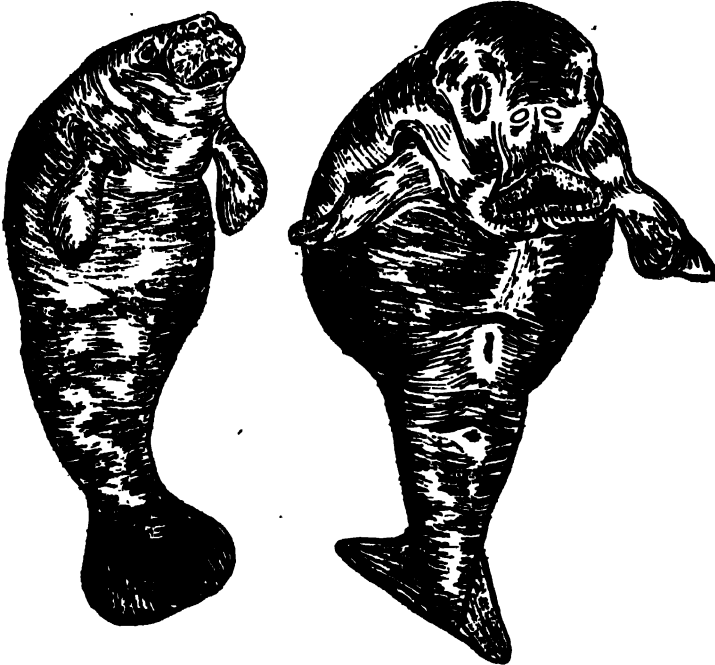
ম্যানাটি ডুগং

দিকে ডুগং-এর 5 থেকে 6টির বেশি পেষক দাঁত থাকে না। এদের ঘাড়ে 7টি কশেরুকা এবং আঙ্গুলে নখ নেই। তাছাড়া ম্যানাটির লেজটি মোটামুটি গোলাকৃতি ; কিন্তু ডুগং-এর লেজের মাঝে খাঁজ আছে।

'ম্যানাটি' সাধারণতঃ উত্তর আমেরিকার নদীগুলিতে, আটলাণ্টিক মহাসাগরে, মধ্য আমেরিকা, মেক্সিকো ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নদীগুলিতে এবং আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলে দেখা যায়। এরা 7 থেকে 13 ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। এরাও অগভীর জলে থাকতে ভালবাসে। যখন নদী অথবা সমুদ্রের তলে চড়ে বেড়ায় তখন হাত বা 'প্যাডেল'দুটি জলজ উদ্ভিদগুলিকে মুখের কাছে টেনে আনার কাজে ব্যবহার করে। গভীর জলে এরা মাথাটি নত করে ধনুকের মত বেঁকে খাড়া হয়ে থাকে। যখন বিশ্রাম নেয় তখন জলের তলায় উবুড় হয়ে শুয়ে থাকে। কখনও কখনও নাকি এরা অল্প-ক্ষণের জন্য প্যাডেলের সাহায্যে তীরে উঠে আসে।

প্রশান্ত মহাসাগরের বেরিং উপকূলে রাইটিনা (Rhytina) নামক এক ধরনের সমুদ্রগাভী দেখা যেত। এরা 25 ফুট পর্যন্ত লম্বা হতো। অতি সাম্প্রতিককালে এরা অবলুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষের লোভ থেকে আজ ভারতীয় ডুগংকেও বাঁচানো দরকার। নতুবা এরাও আমাদের জীবদ্দশাতেই অবলুপ্ত হয়ে যাবে।
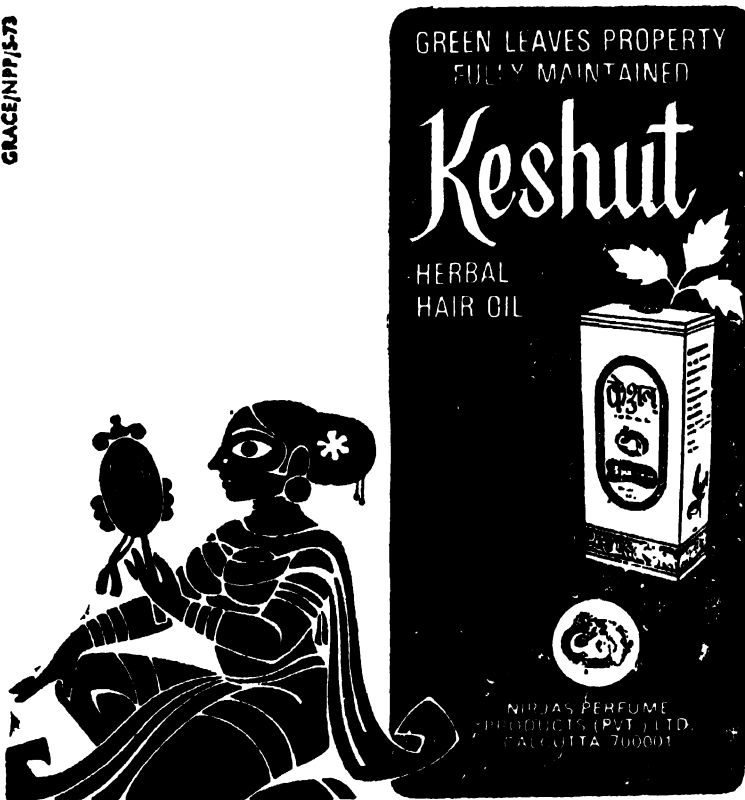
মডেল তৈরি

গ্যারেজের স্বয়ংক্রিয় দরজা

গৌতম ব্যানার্জী*

এই শতকে বিজ্ঞানে গৌরবময় আবিষ্কার ট্রানজিস্টর (transistor)। ট্রানজিস্টরের সাহায্যে যে সকল জিনিষ তৈরি হয়েছে তার মধ্যে সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত রেডিও। এছাড়াও, টেলিভিশন (television), সিনেমা প্রোজেকশন (cinema projection), পুলিশের কাজে ব্যবহৃত ওয়াকি টকি (walkie talkie), বধিরদের কানে শুনতে পাওয়ার যন্ত্র (tarnsistoriel hearing-aid) প্রভৃতি ট্রানজিস্টরের দান। এই ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরি'র (Bell Telephone Laboratories) দুই বিজ্ঞানীর—জন বার্ডিন (Jhon Bardeen) এবং ওয়ালটার এইচ ব্রাটেন (Walter H Brattain।)

এই ট্রানজিস্টরের কার্যপদ্ধতিকে প্রয়োগ করে বর্তমানে অনেক দেশে মোটর গ্যারেজের দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খোলা বা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থাটিতে ইলেকট্রনিক্স-সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হওয়ায় এই ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হয় (চিত্র-1), কিন্তু এই ব্যবস্থাকে আমরা যদি চিত্রে প্রদর্শিত (চিত্র 2, 3, 4) মডেলের মত করতে পারি তাহলে খরচ অপেক্ষাকৃত কম হবে (এখানে খরচ বলতে নির্মাণ খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ উভয়কেই ধরা হয়েছে)। এখন দেখা যাক এই ব্যবস্থাটি কি করে কার্যকর করা যায়।
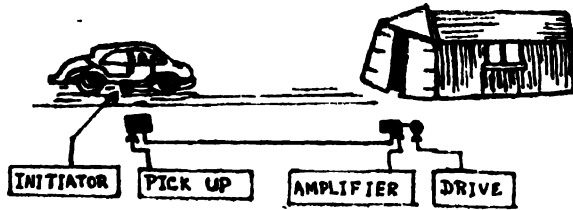
চিত্র-1

মডেলের প্রয়োজনীয় উপকরণ :—

(1) একটি পিজবোর্ডের তৈরী বাক্স; (2) একটি পিজবোর্ডের তৈরী বাড়ী; (3) একটি কাঠের পাত (প্লাইউড হলে ভাল হয়); (4) চারটি ধাতব পাত; (5) 16টি স্প্রিং; (6) একটি মোটর (3v. থেকে 9v.—যে কোন একটি); (7) দাঁতওয়ালা দুটি চাকা; (8) একটি ধাতব দণ্ড; (9) থার্মোকলের পাতলা পাত এবং (10) প্রয়োজনীয় তার।

---

* বেশোহাটা, পোঃ চন্দননগর, হুগলী

মডেলটি তৈরির প্রথম কাজ হলো একটা পিজবোর্ডের বাক্স তৈরি করা। বাক্সের উপর একটা কাঠের পাত থাকবে যেটি রাস্তা হিসাবে ব্যবহৃত হবে। রাস্তার উপর একদিকে থাকবে একটি পিজবোর্ডের ঘর যেটি ব্যবহৃত হবে গ্যারেজ হিসাবে। গ্যারেজের ভিতরে এবং বাইরে রাস্তার উপর চার জায়গায় গাড়ীর চাকার পরিধি অনুযায়ী (track অনুযায়ী) গর্ত করতে হবে। প্রতিটি গর্তের উপরে যে কোন ধাতুর পাতলা একটি করে পাত রাখতে হবে, যেগুলি সুইচ হিসাবে ব্যবহৃত হবে। প্রতিটি গর্তের ভিতর থেকে ধাতব পাতের তলায় চারদিকে চারিটি স্প্রিঙ (spring) এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে ধাতব পাতের উপর দিয়ে গাড়ী গেলে তার ভারে পাতটি যখন সামান্য নীচে নামবে তখন এই স্প্রিঙ-এর সঙ্গে ধাতব পাতের সংযোগ ঘটবে। স্প্রিঙগুলিতে সর্বদা তড়িৎপ্রবাহ পাঠাতে হবে, ফলে ধাতব পাত স্প্রিঙগুলি স্পর্শ করলেই একটি স্প্রিঙ-এর সঙ্গে আর একটি স্প্রিঙ-এর সংযোগ ঘটবে অর্থাৎ বর্তনী (circuit) সম্পূর্ণ হবে (চিত্র-2)।
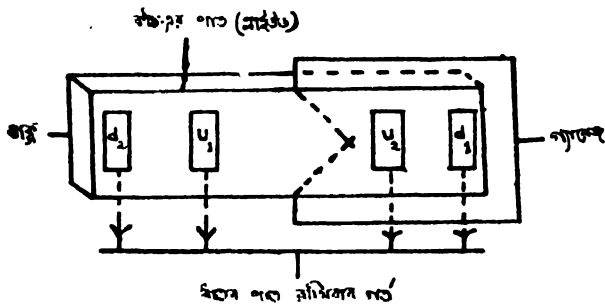
চিত্র-2

গ্যারেজের দরজাটি থার্মোকলের করা যেতে পারে। গ্যারেজের দু-পাশের দেয়ালের মধ্য দিয়ে উপরের দিকে একটি সরু দণ্ড রাখতে হবে, দণ্ডের যে কোন প্রান্তে একটি দাঁতওয়ালা চাকা লাগাতে হবে এবং মোটরের (M) দণ্ডের উপরও একটি দাঁতওয়ালা চাকা লাগাতে হবে। দণ্ডের সঙ্গে থার্মোকলের একটি পাতলা পাতা রোল করে রাখতে হবে। দরজার দণ্ডের চাকা ও মোটরের দণ্ডের চাকার দাঁতগুলি যেন মিলে যায় (চিত্র-3)।
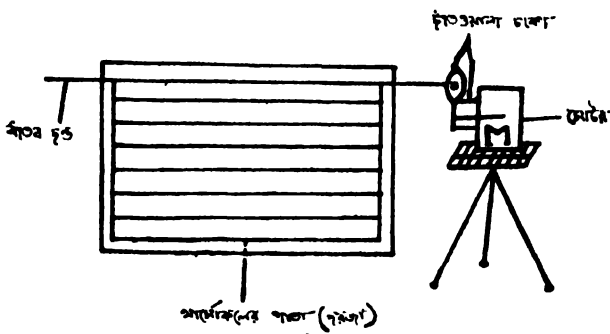
চিত্র-3

এইবার বর্তনীটি দেখা যাক (চিত্র-4)। এখানে একটি মোটর (M) দরজাটিকে খুলবে

ও বন্ধ করবে। আমরা জানি কোন বর্তনীতে যুক্ত মোটর যে দিকে ঘুরতে শুরু করে, বর্তনীর তড়িদ্দ্বার (electrode) পরিবর্তন করলে মোটরের ঘূর্ণনের দিকও পরিবর্তিত হবে। চিত্র-4 থেকে

চিত্র-4
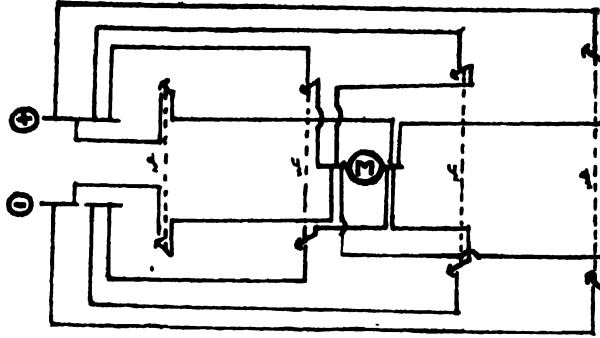
দেখা যাচ্ছে যে গ্যারেজের বাইরের ও ভিতরের দরজা খোলার সুইচের (u_1 ও u_2) বর্তনীর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িদ্দ্বার মোটরের যে দুটি দিকে অবস্থিত, গ্যারেজের ভিতরের ও বাইরের দরজা বন্ধ করার সুইচের (d_1 ও d_2) ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িদ্দ্বার ঠিক তার বিপরীত দিকে অবস্থিত। সুতরাং যখন গাড়ী গ্যারেজে প্রবেশ করতে যাবে তখন বাইরের u_1 সুইচের উপর গাড়ী এলেই দরজা খুলে যাবে ও ভিতরে d_1 সুইচের উপর গাড়ী গিয়ে দাঁড়ালেই দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে বেরোবার সময় u_2 সুইচের উপর এলে দরজা খুলে যাবে ও d_2 সুইচের উপর গাড়ী গিয়ে দাঁড়ালেই দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

মডেলটি করতে তিনটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে। যথা—স্প্রিং সুবেদী হওয়া প্রয়োজন, ধাতব পাত এমন পাতলা হবে যেন গাড়ী গেলে সে নীচু হয় আবার পরক্ষণেই পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং পাতটি লোহার হলে যেন মরিচা না ধরে।

ভেবে বল

অনন্তকুমার ঘোষ*

নীচের প্রশ্নগুলির উপযুক্ত স্থানে কোন্ সংখ্যা বা বর্ণদ্বয় আসবে তা বল।

1. 9, 10, 8, 11, 7, 12, 6, 13, ?, ?
2. $\frac{C}{K}$, $\frac{F}{M}$, $\frac{I}{O}$, $\frac{L}{Q}$, $\frac{O}{S}$, ?, ?
3. যদি $4\times6=1624$ হয় এবং $3\times7=921$ হয় তা হলে $5\times6=?$
4. যদি $7\times4=4916$ হয় এবং $8\times5=425$ হয়, তা হলে $3\times2=?$
5. যদি $2\times5=8125$ এবং $3\times4=2764$ হয়, তবে $5\times6=?$
6. যদি $20\div4=10$ হয় এবং $30\div6=10$ হয়, তবে $40\div8=?$
7. যদি $52\div36=97$ হয় এবং $46\div78=1510$ হয় তবে $53\div62=?$
8. যদি $9+5=144$ হয় এবং $7+6=134$ হয়, তবে $2+2=?$
9. 1+2, 3+3, 6+4, 10+5, ?, ?
10. 81, 69, 58, 48, 39, ?, ?

---- উত্তর ----

1. (5. 14) 2. $\left(\frac{R}{U}, \frac{U}{W}\right)$ 3. 2530, 4. 94 5. 125216

6. 10 7. 88 8. 44 9. 15+6, 21+7 10. 31, 24

---

* বিপ্রদাস পালচৌধুরী, ইন্‌স্টিটিউট অব টেকনোলজি, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

2রা মার্চ' 79 'সত্যেন্দ্র ভবনের' নব-নির্মিত ত্রিতলের দ্বারোদঘাটন ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ ভাষণ দিচ্ছেন।

পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে পরিষদের পক্ষ থেকে উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর হাতে অর্থ প্রদান করছেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত "অমরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পাঠাগার" কর্তৃক আয়োজিত প্রবন্ধপ্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারবিজয়ী শিলাদিত্য ভট্টাচার্য পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ী আলাপন ব্যানার্জী পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

নবনির্মিত ত্রিতলের দ্বারোদঘাটন ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন উচ্চ-শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ।

বিজ্ঞান প্রদর্শনীর দৃশ্য

বিজ্ঞান প্রসার পরিচিতি

চিনসুরা সায়েন্স ক্লাব

গত 11ই মার্চ, 1979 চিনসুরা সায়েন্স ক্লাবের উদ্যোগে চুঁচুড়ার দেশবন্ধু মেমোরিয়াল হাই স্কুলে 'পৃথিবীর আকার কিরূপ ?' সম্পর্কে এক বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা, শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রদীপ রায় তাঁর ভাষণে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে মানুষের প্রাচীন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত সহজ এবং সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেন।

কোলাঘাট সায়েন্স হবি সেণ্টার

1 এপ্রিল 1979 তারিখে মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটে 'কোলা ইউনিয়ন যোগেন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে' কোলাঘাট সায়েন্স হবি সেণ্টার আয়োজিত বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিড়লা মিউজিয়ামের কিউরেটর শ্রীজয়ন্ত স্থানপতি এবং সভাপতিত্ব করেন যুব কল্যাণ আধিকারিক শ্রীশশাঙ্ক মুখার্জী। প্রদর্শনীর প্রথম দিনে 16টি স্কুল এবং 2টি ক্লাব অংশ গ্রহণ করে। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিজের হাতে তৈরী মডেল প্রদর্শন করা হয় এবং বেশির ভাগ মডেল সাধারণের নিকট প্রশংসা অর্জন করে। বিশেষ করে মাত্র আট বছরের শিশু বোরাডাঙ্গী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীজয়ন্তকুমার মিত্রের 'বৃষ্টিমাপক যন্ত্র' মডেলটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া কোলা ইউনিয়ন যোগেন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী তৃপ্তিরাণী দত্ত প্রদর্শিত এপিডায়োস্কোপ; পাঁশকুড়া ব্যাডলী-বার্ট হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীশান্তনু পাল প্রদর্শিত স্টীমের সাহায্যে গমকল চালানো; বৈষ্ণবচক এম. সি. হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীদেবাশীষ ঘড়া প্রদর্শিত—জ্ঞানের আলো প্রভৃতি মডেলগুলির গঠননৈপুণ্য প্রশংসনীয়। বিমলা আর্ট কলেজের ছাত্র শ্রীত্রিলোচন জানার অঙ্কিত জল রং ও পেনসিলের চিত্রগুলি প্রদর্শনীতে দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছিল।

আলোচনা সভা

গত পয়লা এপ্রিল মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারততত্ত্ব বিভাগের প্রধান, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ শিবনারায়ণ রায় গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটে 'গ্রামীণ উন্নয়নে আধুনিক মন ও ছাত্র-যুব সমাজ-এর ভূমিকা' বিষয়ে আলোচনা করেন। ঐদিন তিনি ইনস্টিটিউট পরিচালিত 'এলেন রায় আদিবাসী শিক্ষাকেন্দ্র' পরিদর্শন করেন। দুপুরে 'বিজ্ঞান সংস্কৃতি ও সমাজ' নিয়ে স্থানীয় তরুণরা এক ঘরোয়া আলোচনায় বসেন। বিকালের আলোচনায় তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল আধুনিক মন কাকে বলে এবং মধ্যযুগীয় সংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে গ্রামের মানুষ কিভাবে এই আধুনিক মানসিকতা অর্জন করতে পারে। প্রসঙ্গত তিনি বলেন এদেশে প্রকৃত নাগরিক চেতনা যা আধুনিকতার জন্মদাতা তা এখনও পুরোপুরি গড়ে ওঠে নি। এব্যাপারে পাশ্চাত্য দেশগুলির উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন। আলোচনার পরে শ্রোতারা নানা প্রশ্ন রাখেন। আলোচনার শুরুতে মৌমাছি পালনের প্রশিক্ষণের শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট বিলি করা হয়।

আমি আপনাদের পত্রিকা পড়ে সত্যিকারের আনন্দ পাই। আমি হয়তো বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য নই এবং অনেক দূরে থাকি তাই আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগও সম্ভব হয় না, তবু 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' আমাকে আনন্দ দেয়। শুধু আমিই নই, আমরা প্রায় পঁচিশজন ছেলে, এখানে সবাই মিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের লেখা আলোচনা করি।

আমাদের এবং আমার বিশেষ ভাল লেগেছে—আশিষ চট্টোপাধ্যায়ের ইনসুলিন ও ডায়াবেটিস', মণীষকুমার ব্যানার্জীর 'মজার কলিংবেল', মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহের 'মানুষের উদ্ভব', প্রবীরকুমার দাসের 'যান্ত্রিক গরু'। গৌতম ব্যানার্জীর 'সহজ বা গ্রামীণ রেফ্রিজারেটর', মলয় সিকদারের

একটি ছোট পাঠকের চিঠি

'শতবর্ষের আলোকে আইনস্টাইন', সমর বসাকের 'কৃত্রিম কিডনী' এবং ডায়ালিসিস' এবং 'ভেবে কর'।

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহকে আমার ধন্যবাদ। তিনি একটি বিজ্ঞান পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের 'মানুষের উদ্ভব' সম্বন্ধে কেমন সুন্দর ধারণা দিলেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে, এমনি সব লেখা কত মানুষের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে ভেঙে তছ্‌নছ করে দেয়।

আপনাদের পত্রিকায় আরো ভাল লেখার অপেক্ষায় আমরা থাকবো।

অমরেন্দ্রনাথ মন্নরা
॥ কাশীপুর ॥ 24 পরগণা
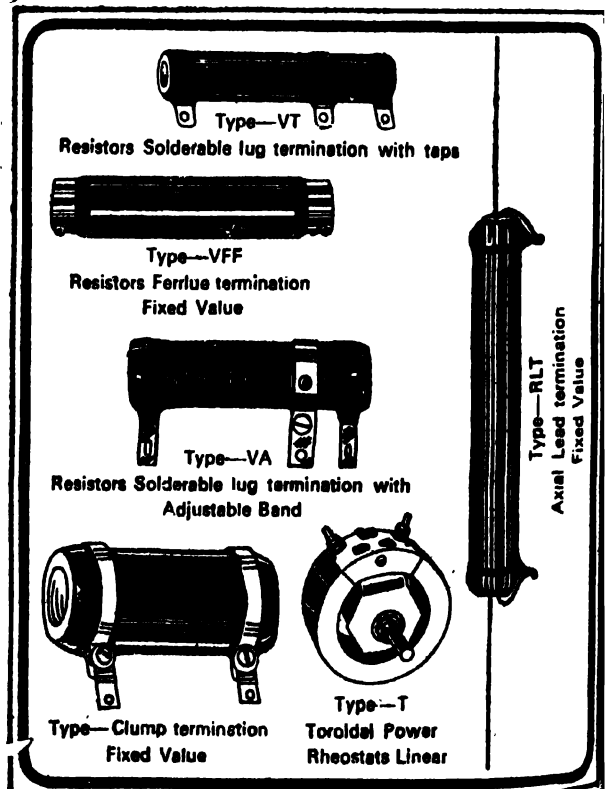
পরিষদ সংবাদ

জনপ্রিয় বক্তৃতা

গত 5. 4. 79 তারিখে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কুমার প্রমথনাথ হলে 'সমাজ রূপান্তর ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়। আলোচনা সভার সূত্রপাত করেন পরিষদ সভাপতি শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা এবং অধ্যাপক রায়ের পরিচিতি দেন শ্রীদীপক দাঁ। সমাজে পরিবর্তন ও বিবর্তন, আদর্শ সমাজ, মানব বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞান, সমাজ-রূপান্তরের উৎস, পশ্চিমের রূপান্তরের মূলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ, সমাজ রূপান্তরে আমাদের বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপর অধ্যাপক রায়ের বহু তথ্যসহ মনোজ্ঞ ভাষণটি শ্রোতাদের কাছে নানা দিকে কৌতূহলের কারণ হয়। বক্তা ও শ্রোতাদের ধন্যবাদ জানানোর পর সভাটি শেষ হয়।

* * *

গত 25. 4. 79 তারিখে বিকাল 5 টায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কুমার প্রমথনাথ রায় হলে 'তথ্যের জগৎ : তথ্যবিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজি' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন শ্রীসুবীরকুমার সেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের কোষাধ্যক্ষ ডাঃ গুণধর বর্মন।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফল

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত "অমরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পাঠাগার"-এর উদ্যোগে আয়োজিত "গ্রামীণ উন্নয়নে বিজ্ঞানের প্রয়োগ" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফল :

প্রথম--শিলাদিত্য ভট্টাচার্য, সল্ট লেক সিটি, কলিকাতা-700064

দ্বিতীয়—আলাপন ব্যানার্জী, পাণ্ডবেশ্বর, বর্ধমান।

তৃতীয়—বাসন্তী দাস, পোঃ ও জেলা মেদিনীপুর।

1976 সালে এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, নানা কারণে প্রতি-যোগিতার ফল ঘোষণায় বিলম্ব ঘটে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিশেষ সাধারণ অধিবেশন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিধি ও নিয়মাবলীর সংশোধন ও সংযোজন

গত 21শে এপ্রিল 1979 তারিখে বিকাল পাঁচটায় "সত্যেন্দ্রভবনে" অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিশেষ সাধারণ সভায় পরিষদের বিধি-নিয়মাবলীর সংশোধন ও সংযোজন সংক্রান্ত পূর্ব-প্রচারিত খসড়া প্রস্তাবগুলি ধারাবাহিকভাবে যথাযথ উপস্থাপিত, সমর্থিত ও বিশদভাবে পর্যায়ক্রমে আলোচিত হয়। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত সভ্যদের বিভিন্ন লিখিত বক্তব্য, ভাষ্য ও মন্তব্য উক্ত অধিবেশনে যত্নসহকারে আলোচিত ও বিবেচিত হয়।

1. শ্রীযুগলকান্তি রায় (সাঃ 1709)
2. শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় (সাঃ 1237)

বিস্তারিত আলোচনার পর পরিষদের বিধি ও নিয়মাবলীর সংশোধন ও সংযোজনের পুনঃ সংশোধিত প্রস্তাবের যে বিভিন্ন ধারাগুলি অধিবেশনে যথাযথরূপে অনুমোদিত ও গৃহীত হয় তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল :—

৭ (গ) নং ধারার তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে যে অংশটুকু আছে, তাহার পরিবর্তে ভাষ্যটি হইবে—[পরিষদ হইতে কোন প্রকার পারিশ্রমিক, ভাতা, সম্মানী বা লেখক দক্ষিণা বাবদ কোন অর্থ গ্রহণ কার্যকরী সমিতিতে সদস্য হইবার বাধার কারণ হইবে না। যে সমস্ত সভ্য পূর্বে গৃহীত পারিশ্রমিক, ভাতা, সম্মানী বা লেখক দক্ষিণা বাবদ অর্থ ভাতা, সম্মানী বা লেখক দক্ষিণা বাবদ অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়া কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচন প্রার্থী হইয়াছিলেন, পরিষদ কর্তৃক সেই অর্থ তাঁহাদের প্রত্যর্পণ করা হইবে।] এই সংশোধিত এবং গৃহীত বিধি ও নিয়মাবলী উক্ত তারিখ হইতে বলবৎ হইবে বলিয়া গৃহীত হইল।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ ঃ আলোচনাচক্র ও প্রদর্শনী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মূল উদ্যোগে ও কিশোর কল্যাণ পরিষদের সহযোগিতায়, 'সত্যেন্দ্র ভবনে' আগামী 23শে ও 24শে জুন, 1979—আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের স্মারকে একটি কর্মসূচী উদ্‌যাপিত হবে।

এই কর্মসূচীতে যে সব প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ করবেন, তাঁদের মধ্যে, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, রেডক্রশ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া, ক্যানসার রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি থাকবে।

শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা বিশেষজ্ঞদের আলোচনা, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রদর্শনী, এবং শিশুদের আনন্দমূলক কিছু অনুষ্ঠান এই কর্মসূচীতে থাকবে।

অনুষ্ঠানটিকে পূর্ণাংগ করার জন্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্য, শুভানুধ্যায়ী ও জনসাধারণকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে আবেদন জানাই।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

প্রকাশনা সচিব—রতনমোহন খাঁ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা। আজীবন সদস্য চাঁদা 200 টাকা। যদি কেউ পরপর পাঁচ বৎসর সাধারণ সদস্য থাকেন তবে তিনি 150 টাকা দিলে আজীবন সদস্য হতে পারবেন।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি "আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং"-এ 'ডাকযোগে' পাঠানো হয়; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোস্ট অফিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। টাকা, চেক ইত্যাদি কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে পাঠাবেন না। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করিবেন।
6. কলিকাতার বাইরের কোন চেক প্রেরণ করলে গ্রহণ করা হবে না।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্যবিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং **মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন।** কিশোর বিজ্ঞানীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা: প্রকাশনা সচিব, জ্ঞান ও বিজ্ঞান বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23 রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন: 55-0660.
2. **প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।**
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রকাশনা সচিব
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে প্রকৃত জনকল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য পরিষদের বর্তমান কর্মসমিতি একান্তই সচেষ্ট, সেই বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাকে সফল করতে হলে সকলের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা চাই। এই উদ্দেশ্যে পরিষদের সদস্যবৃন্দ, দেশের বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞানকর্মী, বিজ্ঞান-সংগঠন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সমাজসেবা সংগঠন, সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং জনসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রতিষ্ঠিত এই মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও প্রসারকল্পে সকলে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসুন, সাহায্য করুন, ও পরামর্শ দিন।

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—নীলাচল প্রেস, কলিকাতা-700 009

মূল্য—1·50 টাকা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 5, মে, 1979

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাত্রিংশত্তম বর্ষ | মে, 1979 | পঞ্চম সংখ্যা

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে

রতনমোহন খাঁ

1924 সালে জাতিপুঞ্জ শিশুদের অধিকার বিষয়ে প্রথম সনদ তৈরি করে। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে জাতিসংঘ আবার শিশুদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ পালনের ডাক দিয়ে এবং এক স্মারক প্রকাশ করে। স্মারকটির শিল্পী ডেনমার্কের এরিক জেরিকু। এতে দেখা যায়—প্রসারিত দু-হাতের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে শিশু দু-হাত তুলে যেভাবে মা-বাবার কোলে উঠে।

শিশুবর্ষের ডাকে এটা সুস্পষ্ট যে বিগত 50 বছরে দু-চারটি রাষ্ট্র ছাড়া সারা বিশ্বে শিশুদের অধিকার স্থাপিত হয় নি। শিশুদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনা নূতন নয়, বহু শতাব্দীর। তবুও 1957 সালে বিশ্ব-মানবাধিকার সংসদ শিশু অধিকারের উপর যে দলিল প্রণয়ন করে, তার উপর ভিত্তি করেই 1979 সালকে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ হিসাবে পালন করা হচ্ছে। ঐ দলিলের কয়টি মূল কথা হলো—(1) জাতি-নির্বিশেষে সব শিশু সমান, (2) প্রতিটি শিশুকে সব রকম সুযোগ-সুবিধা দান, (3) বাসস্থান, পুষ্টি, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা, (4) নিরাপত্তা ও চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা, (5) মায়া, মমতা, ভালবাসা, সহানুভূতি দান, (6) বঞ্চনা, অবহেলা, নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা, (7) বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্যে পরিচর্যা, বাসস্থান, শিক্ষার ব্যবস্থা, ইত্যাদি।

সারা বিশ্বের শিশুসমস্যার কথা চিন্তা না করে ভারতের কথাই ধরা যাক। ভারতীয় সমাজ কল্যাণ সংসদের এক সমীক্ষায় প্রকাশ—ভারতে 100টি শিশুর মধ্যে 90টি শিশু চরম বঞ্চনা ও অবহেলার

মধ্যে দিয়ে মানুষ হয়। এই সব শিশুর সংখ্যা ভারতের জনসমষ্টির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এই চরম অবমাননার হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্যে 1973 সালে ভারতীয় সংবিধানে বিশ্ব-মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক ঘোষিত শিশু অধিকারের মূল বয়ানটি গৃহীত হয়। এ ছাড়াও বলা হয় 14 বছরের কম বয়সের কোন শিশুকে কোথাও শ্রমিক হিসাবে কাজে লাগানো যাবে না। 45নং ধারায় আছে যে 14 বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অবৈতনিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

আমরা সবাই জানি কেবলমাত্র আইন করে কোন সমস্যার সমাধান করা যায় না। ভারতীয় সংবিধানে শিশু-অধিকার সংরক্ষিত, বহু অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র গ্রামে ও শহরে স্থাপিত, জাতি সংঘে শিশু-অধিকার ফলাও করে ঘোষিত, তবুও সমগ্র উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কোটি কোটি শিশু ন্যূনতম চাহিদা থেকে বঞ্চিত কেন? প্রশ্ন হলো শিশুকে অধিকার দেবে কে? শিশুর সবচেয়ে আপনজন মা ও বাবা। ভারতে বছরে প্রায় পাঁচ কোটি শিশুর জন্ম দেয় যে সব পুরুষ ও রমণী তাদের কয়জন মানবাধিকার পেয়েছে? এদেরই প্রায় 90 শতাংশ জীবনের ন্যূনতম অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত। যে নিজেই বঞ্চিত সে কেমন করে দেবে তাঁর সন্তানকে সুষ্ঠুভাবে বাঁচার অধিকার।

তাই দেখা যায় ভারতে শতকরা 90টি শিশু অপুষ্ট হয়ে জন্মায়, 12 শতাংশ জন্মের পরে মারা যায়, আর অবশিষ্টের দল অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগতে ভুগতে সমাজের জঞ্জালের মত অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের মধ্যে বড় হয়ে উঠে। এরা কি গড়ে তুলতে পারে সুস্থ সমাজ, স্বপ্নের ভারত, না হতে পারে সুনাগরিক?

ভারতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ শিশু শারীরিক দিক দিয়ে কোন না কোনভাবে অক্ষম। শতকরা 70টি শিশু প্রায় নিরক্ষর। আর এই সব হতভাগ্য শিশুদের মা-বাবা নিজেদের বাঁচার তাগিদে সব স্নেহ-মায়া-মমতা বিসর্জন দিয়ে নিজের কোলের সন্তানকে এগিয়ে দেয় নানা অসামাজিক কাজে ও ভিক্ষাবৃত্তিতে। এ-কারণেই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে শিশুশ্রম ভারতে সবচেয়ে সুলভ।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে শিশুদের জন্যে নানা আইন প্রণয়ন, নানা পরিকল্পনা গ্রহণ, কবিমনে শিহরণ, সভা-সমিতিতে কতিপয় শিশুদের নিয়ে নাচ-গান, বস্তিতে যেয়ে একদিন মিষ্টান্ন বিতরণ কেবল রাষ্ট্রনায়ক বা জননেতাদের আত্মসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে, মূল সমস্যার সমাধান হয় না। স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরেও তাই ভারতের অধিকাংশ শিশুরই জন্মলগ্নে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সমস্যার সমাধানের জন্য পুরাপুরি সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন। যখন সেই আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়, সেখানে পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ছোট ছোট পরিকল্পনা (স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী গ্রহণ করা যেতে পারে। রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেছে নিতে হবে কয়েকটি বিষয় যেমন—(1) সহজে ও সুলভে শিশুর পুষ্টি ও পালন বিষয়ে সকলকে সচেতন করে তোলা, (2) থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা, (3) শিক্ষার ব্যবস্থা, (4) শিশু উপার্জনের উপর পরিবারের নির্ভর না করার ব্যবস্থা। যদিও এই সব ব্যবস্থা গ্রহণে ও রূপায়ণে আছে নানা বাধা, তবুও আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে সারা বিশ্বের সঙ্গে আমরা আশা রাখি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকারগুলি রূপায়িত হবে এবং প্রতিটি শিশুকে ফুলের মত সুন্দর হয়ে ফুটে উঠতে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা যথোচিত ভূমিকা নেবে।

কবিতা ও বিজ্ঞান

জগদীশচন্দ্র বসু

বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে ত প্রমাণ বাহির করিতে পারে না! এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইহার পুরস্কার এই যে, তিনি যেটুকু পান তাহার চেয়ে কিছুমাত্র বেশী দাবী করিতে পারেন না বটে, কিন্তু সেটুকু তিনি নিশ্চিতরূপেই পান এবং ভাবী পাওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি কখনও কোন অংশে দুর্বল করিয়া রাখেন না।

কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোকরশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একেবারেই শূন্য হইয়া যাইতেছে এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্ত্যনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে তখন মুহূর্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসম্বরণ করিতে বিস্মৃত হন এবং বলিয়া উঠেন 'যেন নহে—এই সেই'।

কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব-ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।

এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন; মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদকে, সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, একথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক্ না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতি-তত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।

খনিজ জল ও উষ্ণ প্রস্রবণ

সবুজ তাওয়াল*

আকাশপথে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন এক ভদ্রলোক। তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে একটু জল চাইলেন বিমান সেবিকার কাছে। বিদেশী বিমানসংস্থার সুবেশা সেবিকাটি মিষ্টি হেসে একটি মুখবন্ধ কৌটো এনে হাজির করলেন। জলের বদলে বেল এনে দেবার প্রবাদবাক্যটি মনে পড়লো ভদ্রলোকের। টিনের কৌটোর ওপর লেখাটি পড়ে আসল ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করলেন তিনি। দেখলেন ওটি সত্যি সত্যিই একটি জলের কৌটো যার ইংরেজী নাম 'মিনারেল ওয়াটার'। এই মিনারেল ওয়াটার,—বাংলায় যাকে 'খনিজ জল' বলা যেতে পারে, এই বস্তুটি কি? সহজ কথায় বলতে গেলে এই জল হচ্ছে প্রাকৃতিক প্রস্রবণের জল।

সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে প্রায় 300টি উষ্ণ জলের প্রস্রবণ ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে রাজগীর ও বক্রেশ্বরের কথা আমাদের সবারই জানা। বিহারের ছোটনাগপুর এলাকা, এর সন্নিহিত মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলে, এবং রাঁচী জেলার পশ্চিমে প্রায় 20টি বিভিন্ন উষ্ণ প্রস্রবণের সমষ্টি আবিষ্কৃত হয়েছে। উত্তর ভারতে এ ধরণের প্রস্রবণের সমষ্টি রয়েছে 12টি। এদের মধ্যে অনেকগুলিই উচ্চ তাপমাত্রার। দামোদর উপত্যকার কয়লাখনি অঞ্চলে প্রায় 8-10টি প্রস্রবণের সমষ্টি রয়েছে। হাজারিবাগ জেলার সুরযকুণ্ডে জলের তাপমাত্রা 87° সেঃ। বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর এবং তাতলই প্রস্রবণের তাপমাত্রা যথাক্রমে, 67° এবং 70° সেঃ। উত্তর মধ্যপ্রদেশের সরগুজা জেলার তাতাপানি প্রস্রবণের ক্ষেত্রে তাপমাত্রার উচ্চমান লক্ষ্য করা যায়। এই তাপমাত্রার মানের উচ্চসীমা 90° সেঃ এবং নিম্নসীমা 69° সেঃ। যদিও সাধারণের বিশ্বাস যে এই সব প্রস্রবণগুলির জলের একটা রোগ নিরাময় ক্ষমতা রয়েছে, তবুও ভারতবর্ষে এই খনিজ জলের ব্যবহার এখনও মোটেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি, যতটা হয়েছে ইয়োরোপের দেশগুলিতে। বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানীতে খনিজ জলের প্রস্রবণের আধিক্য থাকায় এই জল ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই দেশটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। তাই সে দেশে পানীয় জল মানেই হলো খনিজ জল।

পশ্চিম জার্মানীতে প্রায় 300টি প্রস্রবণের জল একাধারে পানীয় জলরূপে এবং স্নানের মাধ্যমে রোগ আরোগ্যের উপায় রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই জলের উৎসগুলির বেশ কিছু স্বতস্ফূর্তভাবে ঝরণার আকারে ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে আর বাকিগুলি কৃত্রিম উপায়ে ভূপৃষ্ঠ ছিদ্র করে তৈরি হয়েছে। এদের বেশির ভাগের অবস্থানই হলো জার্মানীর পার্বত্য অঞ্চলে।

প্রথমে দেখা যাক, খনিজ জলের সংজ্ঞা কি? 1934 খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী জানা যায় যে, সেই প্রস্রবণের জলকেই খনিজ জলরূপে চিহ্নিত করা হবে যার এক কিলোগ্রামের মধ্যে কমপক্ষে 1000 মিলিগ্রাম কঠিন খনিজ পদার্থ অথবা 250 মিলিগ্রাম CO_2 দ্রবীভূত রয়েছে। এই প্রকারের জলই উৎস থেকে আহরণ করে বিশেষ ধরণের আধারে পূর্ণ করে খনিজ জল ছাপ মেরে বিক্রি করা যাবে। কাজেই বিস্তারিত আলোচনা সুরু করার আগে জেনে নেওয়া যাক যে, কি কি খনিজ পদার্থ কতটা পরিমাণে এই জলে বর্তমান রয়েছে। নীচের তালিকাটিই আমাদের সেই খবর দেবে।

*রসায়ন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতি কিলোগ্রাম জলে প্রাপ্ত ধাতব ও অধাতব পদার্থের পরিমাণ

দার্থ ('আয়ন'রূপে চিহ্নিত)	পরিমাণ (মিলিগ্রাম)
Na^{+}	602·5
K^{+}	28·1
NH_4^{+}	1·37
Mg^{+2}	53·2
Ca^{+2}	122·0
Mn^{+2}	1·24
Fe^{+3}/Fe^{+2}	1·95
Cl^{-}	105·7
SO_4^{-2}	65·5
NO_3^{-}	0·2
HCO_3^{-}	1950·0
$H_2 SiO_3$	20·5
CO_2	1472 0

পানযোগ্য করে বাজারে বিক্রির জন্য পাঠাবার আগে এই জলকে অনেক সময়ই লৌহ ও গন্ধকমুক্ত করা এবং এর সঙ্গে CO_2 যুক্ত করা দরকার। তার কারণ লৌহঘটিত যৌগসমূহ ধীরে ধীরে বাদামী রংয়ের অধঃক্ষেপরূপে পতিত হয় আর গন্ধকঘটিত যৌগ অধিক পরিমাণে দ্রবীভূত থাকলে জলে একটি অপ্রিয় গন্ধ বিরাজ করে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কিছু পরিমাণ লৌহ ও গন্ধক বিমুক্ত করলেও সম্মিলিত খনিজের পরিমাণের খুব একটা তারতম্য ঘটে না আর তার ফলে এই জলের ধর্মেরও খুব একটা হেরফের লক্ষ্য করা যায় না। তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই মন্তব্য করা হলেও ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এই তথ্যের সমর্থন মেলে। ভূপৃষ্ঠস্থিত জল পাতাল প্রবেশের পথে এক দীর্ঘ পরিস্রাবণ-ক্রিয়ার মাধ্যমে চালিত হয়। ফলস্বরূপ, জলমধ্যস্থিত অবিশুদ্ধি দূরীভূত হয় এবং জল এক বিশেষ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। উপরন্তু এই পথ পরিক্রমণ কালে মানবদেহের পক্ষে উপকারী বহু খনিজ পদার্থ এবং CO_2 জলে দ্রবীভূত হয়। বিভিন্ন প্রকার শিলাস্তরের মধ্য দিয়ে প্রবেশের সময় এই জল লোহা, পটাশিয়াম, গন্ধক প্রভৃতি মৌল দ্রবণীয় যৌগরূপে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়। অবশেষে এই জল সঞ্চিত হয়ে থাকে শিলাস্তরের অভ্যন্তরে। ভূ-পৃষ্ঠের বিশেষ বিশেষ স্থানে যেখানে টেক্‌টোনাইটিক বিচ্যুতি (Tektonitic defect) রয়েছে সেখান দিয়ে এই সঞ্চিত জল স্বতস্ফূর্তভাবে প্রস্রবণের আকারে বেরিয়ে আসতে পারে। অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্রবণ সৃষ্টি করেও এই সঞ্চিত জলকে বাইরে বের করে আনা যায়। দ্রবীভূত মৌল পদার্থ সমূহের পরিমাণ অনুসারে এই প্রস্রবণগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন প্রতি লিটার জলে কমপক্ষে 10 মিলিগ্রাম লৌহ দ্রবীভূত থাকলে সেই প্রস্রবণকে আখ্যা দেওয়া হয় 'লৌহপ্রস্রবণ'। এইভাবে 1 মিলিগ্রাম গন্ধক প্রতি লিটারে থাকলে 'গন্ধক প্রস্রবণ', 1 মিলিগ্রাম আয়োডিন থাকলে 'আয়োডিন প্রস্রবণ' এবং 1 গ্রাম খাদ্যলবণ (ব্রোমাইড ও আয়োডাইড যৌগসহ) থাকলে তাকে 'লবণাক্ত প্রস্রবণ' নাম দেওয়া হয়ে থাকে। শিলাস্তরের মধ্যে অবস্থানকালে উচ্চচাপ অবস্থার জন্য এই জল বেশ কিছু পরিমাণ CO_2 দ্রবীভূত করতে পারে। বিশেষ করে যদি আগ্নেয় শিলাস্তরের মধ্যে এই জল সঞ্চিত থাকে তবে CO_2 দ্রবীভূত অবস্থায় থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশি। এই প্রকার প্রস্রবণ সমূহের জলে প্রতি লিটারে 10 গ্রাম CO_2 দ্রবীভূত থাকতে পারে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'অম্ল-প্রস্রবণ'। CO_2 গ্যাসের চাপে স্বতস্ফূর্তরূপে সৃষ্ট প্রস্রবণসমূহকে 'প্রাকৃতিক প্রস্রবণ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট প্রস্রবণগুলি ভূ-পৃষ্ঠের নীচে 500 মিটার অথবা তারও বেশি দূরত্বে ছিদ্রপথ প্রস্তুত করে তৈরি করা হয়।

এবারে মানবদেহে এই প্রস্রবণসমূহের জল, যাকে খনিজ জল আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে, কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সেই আলোচনায় আসা যাক। দেখা গেছে এই জলপানের মাধ্যমে মানবদেহের

প্রয়োজনীয় বহু খনিজ পদার্থের যোগান দেওয়া সম্ভব। এই সব পদার্থ মানবদেহের বিপাকক্রিয়ায় (metabolism) খুবই প্রয়োজনীয়। সাধারণ উষ্ণ আবহাওয়ায় প্রত্যহ মানবদেহে 2-3 লিটার জলের প্রয়োজন। এর অর্ধেকটা খাদ্যদ্রব্য থেকে আহরণ করা সম্ভব। বাকিটা পূরণ করতে হয় জলপানের দ্বারা। গরমকালে অথবা শীতেও দারুণ পরিশ্রমের কাজ করলে সাধারণত প্রতি ঘণ্টায় 1·5 লিটার জল মানবদেহ থেকে পরিত্যক্ত হয়। এই পরিত্যক্ত জলের সঙ্গে প্রভূত পরিমাণ খাদ্যলবণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মৌল বেরিয়ে আসে যাদের প্রতিস্থাপন অবশ্য কর্তব্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে খনিজ জলের ব্যবহার খুবই সুবিধাজনক এবং কার্যকরী। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি মৌলের প্রয়োজনীয়তার কথা। ক্যালসিয়াম মানবদেহের গ্রন্থি, কোষ, হাড় এবং অন্যান্য অনেক আভ্যন্তরীণ অঙ্গের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। ম্যাগনেসিয়াম অংশগ্রহণ করে বিপাকপ্রক্রিয়ায় এবং এটি এনজাইমসমূহের একটি বিশিষ্ট অংশ। সোডিয়াম প্রয়োজন হয় দেহকোষের বহির্ভাগে অবস্থিত জলীয় পদার্থের অসমোটিক চাপের স্থিতিস্থাপকতার কাজে। HCO_3', SO_4'' এবং Cl_1' মানবদেহের নানা অঙ্গের প্রয়োজনীয় বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে। CO_2-এরও মানবদেহের উপরে উপকারী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। বিজ্ঞানীরা বলেন CO_2 হৃদযন্ত্রের কাজে সহায়তা করে এবং শ্বাসকার্যেও এই গ্যাস সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছে। খনিজ জলে উপরিউক্ত সমস্ত পদার্থই বর্তমান। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই জলপান স্বাস্থ্যপ্রদ। এই কারণেই পশ্চিম জার্মানীতে অধুনা এই খনিজ জলপানের প্রতি আকর্ষণ অনেকাংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

জার্মানীর একটি প্রবাদ, "যখন এই প্রস্রবণগুলি বয়ে যাচ্ছে, তখন মানুষ কেন এদের জলপান করবে না!" প্রাচীনকাল থেকেই এই প্রস্রবণের জলকে মানুষ 'আরোগ্যবারি' আখ্যা দিয়ে এসেছে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, এই জল পান করলে অথবা এই জলে স্নান করলে অনেক রোগ সেরে যায়। সাধারণ পানীয় জলের তুলনায় খনিজ জলের ধর্মে অনেক বৈশিষ্ট্য আছে এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে এই জলপানের উপকারিতা আমরা আলোচনা করেছি। রোগ আরোগ্যের ক্ষেত্রেও যে এই জলের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে এ সম্বন্ধে অনেক গবেষকই একমত। প্রকৃতপক্ষে আরোগ্যবারি রূপে চিহ্নিত হতে গেলে এই জলে লৌহ, আয়োডিন এবং CO_2 বর্তমান থাকা অবশ্য প্রয়োজন। এই আরোগ্যবারিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ক্লোরাইডঘটিত জল, বাইকার্বোনেটঘটিত জল এবং সালফেটঘটিত জল। রোগ-আরোগ্যের জন্য এই জলের প্রয়োগ করা হয় দু-প্রকারে। একটি স্নানের মাধ্যমে, যেটি বহিরঙ্গ প্রয়োগ, আর একটি পানের মাধ্যমে, যেটি অন্তরঙ্গ প্রয়োগ। স্নানের মাধ্যমে রোগ আরোগ্যের চেষ্টায় প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ ভীড় করেন এই উষ্ণজলের প্রস্রবণগুলিতে। অবশ্য ভুললে চলবে না যে এই পান অথবা স্নান-চিকিৎসা কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ চিকিৎসা নয়। অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে এই আরোগ্যবারিকে যুক্ত করেই কোন কোন রোগের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। এই জলপানের উপকারিতার কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। স্নানের মাধ্যমে চিকিৎসাকালে এই জলের প্রধান ক্রিয়া ঘটে থাকে তাপ ও জলের স্থিতিশক্তিজনিত চাপের মাধ্যমে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি উষ্ণ-প্রস্রবণগুলির তাপমাত্রা ঊর্ধ্বে 90^0 সেঃ পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণত 20^0 থেকে 40^0 সেঃ-এর সহনীয় তাপমাত্রার প্রস্রবণগুলিই স্নানের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চলাফেরা করার জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির যোগে উচ্চতম সহনীয় তাপমাত্রার প্রস্রবণই উপযুক্ত। তাই ডাক্তারেরা স্থির করেন যে, কোন্ ধরনের প্রস্রবণে স্নান করলে কোন্ কোন্ রোগের উপশম হবে। জলের স্থিতিশক্তিজনিত

চাপ (hydrostatic pressure) ক্রিয়া করে সাধারণত শিরাসমূহের উপর (vein system)। এই চাপের ফলে পেট ও বুকের মধ্যস্থিত এলাকায় রক্ত চলাচল সহজ হয় এবং তার ফলে শিরাসমূহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য হৃদযন্ত্রের দৌর্বল্য থাকলে এই চাপের ক্রিয়ায় হিতে বিপরীত হতে পারে। স্নান-চিকিৎসার উপকারিতা নির্ভর করে জলে রাসায়নিক ধর্মের উপর, অর্থাৎ ঘুরিয়ে বলতে গেলে জলে দ্রবীভূত খনিজ পদার্থের উপর। এই ধরনের জলে স্নান করার ফলে খনিজ লবণসমূহ দেহত্বকের উপর একটি পাতলা আস্তরণ সৃষ্টি করে। তার ফলে ত্বকের কোষসমূহ উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। তাই চর্মরোগের জন্য স্নান-চিকিৎসা উপকারী। জলের স্থিতিশক্তিজনিত চাপে জলস্থিত CO_2 এবং এবং H_2S গ্যাস ত্বকের কলাসমূহে (tissue) শোষিত হয় এবং কলাসমূহ আয়তনে বর্ধিত হয়। এই কারণে tissue-ঘটিত রোগের চিকিৎসা স্নানের মাধ্যমে হওয়া সম্ভব। খনিজ জলের মধ্যে সোডিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম সালফেট থাকার জন্য এই জল অনেক সময়ই মৃদু জোলাপের কাজ করে থাকে। আবার বেশি পরিমাণ সোডিয়াম সাধারণভাবে রক্ত চলাচল ক্রিয়ার পক্ষে ক্ষতিকারক। অন্যদিকে বাই-কার্বনেটঘটিত জল শরীরের পক্ষে উপকারী। বিশেষ করে কিড্‌নির রোগে খনিজ জল পান অত্যন্ত উপকারী বলে পরিগণিত হয়েছে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে বিশেষ ধরনের খনিজ জল প্রচুর পরিমাণে পান করলে কিড্‌নিতে পাথর জমা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং সঞ্চিত পাথরও অনেক সময় দ্রবীভূত হয়ে বেরিয়ে আসে। প্রচুর জলপানের ফলে নিয়মিত প্রস্রাব নির্গমনের হওয়ায় কিড্‌নিতে পাথর তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কমে যায় এবং এছাড়াও রোগসৃষ্টিকারী অনেক পদার্থ নিয়মিত ভাবে শরীর থেকে নিষ্ক্রমণের সুযোগ পায়। অবশ্য কিড্‌নির চিকিৎসায় ব্যবহৃত জলের মধ্যে প্রস্রাব বৃদ্ধিকারী CO_2-এর আধিক্য থাকা দরকার এবং একই সময়ে Ca এবং Mg-র মাত্রা কম থাকা প্রয়োজন। কারণ Ca এবং Mg কিড্‌নির পাথর সৃষ্টির জন্য দায়ী। গন্ধকযুক্ত প্রস্রবণসমূহের জল সাধারণভাবে পেশীর রোগে, গেঁটে বাতে, মহিলাদের বিশেষ অসুখে এবং বিশেষ করে চর্মরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লৌহযুক্ত জল আন্ত্রিক রোগে, কিড্‌নির অসুখে, রক্তাল্পতা রোগে এবং রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ায় আশাপ্রদ সুফল প্রদান করে। পান-চিকিৎসা ঘরে বসেও সম্ভব, কিন্তু স্নান-চিকিৎসার জন্য প্রস্রবণগুলির উৎস স্থানে বসবাস করা দরকার, অন্তত সাময়িকভাবে। এই উষ্ণ প্রস্রবণগুলির উৎস স্থানের শান্ত ও নিরুদ্বেগ পরিবেশে বাস করে এদের জলে স্নান এবং জলপানের মাধ্যমে যেমন রোগ নিরাময় ঘটে থাকে তেমনি স্নানমাহাত্ম্যের ফলে মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াও যে একটু-আধটু হয়ে থাকে একথাও সত্য। অস্বীকার করা বোধ হয় সম্ভব নয় যে জল হচ্ছে এমন একটি ক্যালরিবিহীন পানীয় যা দেহ ও মনকে সতেজ করে তোলে। কাজেই জল শুধু জলই নয়। আজ সুকুমার রায় বেঁচে থাকলে হয়তো 'অবাক জল-পানে'র তালিকায় খনিজ জলও অন্তর্ভূক্ত হতো।
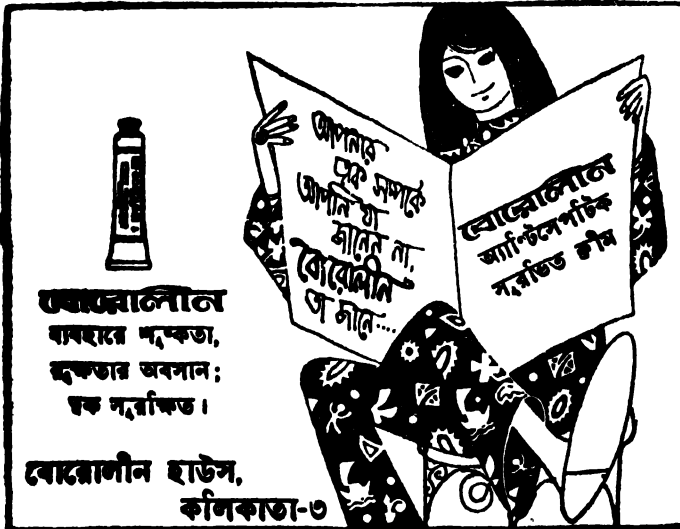
পরিশেষে একটি বিষয় আলোচনা না করলে বর্তমান প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য পরিপূর্ণরূপে সাধিত হবে না। বিষয়টি হলো এই যে, এই সব উষ্ণপ্রস্রবণ সমূহ থেকে শক্তি আহরণ করা যায় কিনা। বস্তুতপক্ষে এইরূপ প্রস্রবণ থেকে শক্তি আহরণের বিষয়টি বিজ্ঞানীদের টনক নড়িয়েছে অনেক আগেই। 1974 সালে জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় পৃথিবীর 80টিরও বেশি দেশ এই উষ্ণ জল থেকে আহরিত শক্তি কাজে লাগাচ্ছে। এই সব দেশে উষ্ণ জলের তাপশক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে, বাড়ীঘর উষ্ণ রাখার কাজে, শিল্পে শীতলীকরণের কাজে, শস্য শুষ্ককরণের কাজে এবং খাদ্য জলশূন্য-করণের কাজে। এই দেশগুলি হচ্ছে ইটালী,

রাশিয়া, আইসল্যাণ্ড, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড, মেক্সিকো, কেনিয়া, ইথিয়োপিয়া, হাঙ্গেরি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, এল সালভাডোর এবং ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষেও যে এই ভূ তাপশক্তিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা চলছে এই খবরটি খুবই আশার সঞ্চার করে। 1971 সালে জাতিসঙ্ঘের তরফ থেকে একদল বিজ্ঞানী ভারতে এক সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। সেই সমীক্ষায় হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ এবং হাজারীবাগ জেলায় উষ্ণ প্রস্রবণসমূহ থেকে শক্তি আহরণ করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের পাগ্‌গা উপত্যকায় এবং হিমাচল প্রদেশের মাণিকরণে প্রায় 100° সে. উষ্ণতার প্রস্রবণ সৃষ্টি করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে লাদাখের পাগ্‌গা উপত্যকায় প্রায় ষোলটি স্থানে কৃত্রিম প্রস্রবণ সৃষ্টি করে (প্রায় 50-70 মিঃ গভীরে) প্রতি ঘণ্টায় 100 টন বাষ্প ও গরম জল (140° সেঃ) বের করে এনে সেই তাপশক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে 7 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সৃষ্টির কাজে। তাছাড়া মাণিকরণ উষ্ণ প্রস্রবণের তাপশক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে ফল সংরক্ষণ, এবং খাদ্য ও ওষুধ সংরক্ষণের কাজে। তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের চাইতে ভূ-তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্পের খরচ কম এবং সবচাইতে বড় কথা এতে আবহাওয়া দূষিত হবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভূ-তাপ-শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা আরও অধিক সংখ্যায় বাস্তবায়িত হবে।*

*Possibilities of harnessing geothermal energy in high heat flow zones of peninsular and extra peninsular India. By S. Deb, Bulletin of O. N. G. C., Vol. 14, No 1 & 2, June & Dec., 1977 দ্রষ্টব্য।
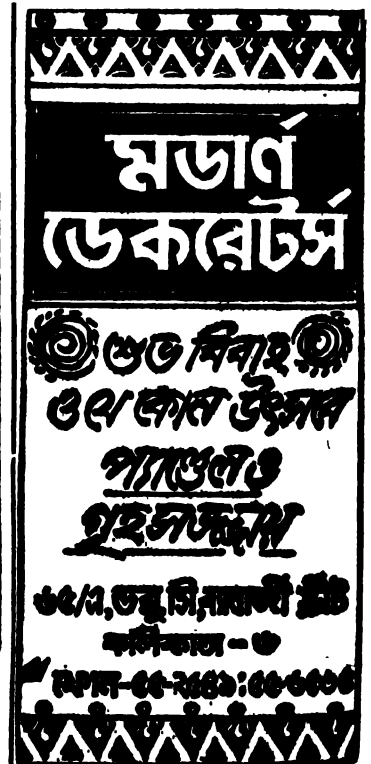
ভারতবর্ষে বায়ুরেণু-বিজ্ঞান

সুখেন্দু মণ্ডল ও সুনির্মল চন্দ*

বায়ুরেণু-বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে মানবকল্যাণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত পরাগরেণু-বিজ্ঞানের একটি ব্যবহারিক শাখা। পরাগরেণু সপুষ্পক উদ্ভিদের পুং-জননের একক (male sexual unit), যার ত্বক দুটি ভাগে বিভক্ত থাকে। বাইরের ত্বকটিকে বহিঃত্বক (exine) ও ভেতরের ত্বকটিকে অন্তঃত্বক (intine) বলা হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদের রেণুর বহিঃত্বক বিভিন্ন প্রকার হয়। যার সাহায্যে একটি উদ্ভিদের রেণুকে অপর একটি থেকে পৃথক করা সম্ভব। এই বহিঃত্বকের ওপর একটি বা কতগুলি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রগুলি আবার সরল ও জটিল দু-রকমেরই হতে পারে। ছিদ্রগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন প্রকার হয়। সুতরাং একটা পরাগরেণু চিনতে হলে প্রথমেই সেই রেণুর চরিত্র এবং ছিদ্রের আকার-প্রকার জানা দরকার।

সাধারণত: ফুলের রীতি অনুযায়ী পরাগরেণুগুলি কীট, বাতাস বা অন্য বাহকের মাধ্যমে পরাগকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং ফুলের গর্ভমুণ্ডের ওপর পড়ে। তারপর পরাগনালীকার সৃষ্টি করে গর্ভাধান ঘটায়। প্রজননের মুখ্য কর্তব্যই হচ্ছে এই প্রক্রিয়া। কিন্তু এ ছাড়াও বিভিন্ন ফুলের অসংখ্য পরাগরেণু দীর্ঘকাল বায়ুতে ভাসমান থাকে এবং মানুষের অজান্তে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সুস্থ মানুষের দেহে পরাগরেণু বিশেষ কোন ক্ষতি করে না কিন্তু পরাগরেণুর প্রতি সংবেদনশীল (sensitive) মানুষের দেহে প্রবেশ করলে নানারকম প্রতিক্রিয়ার শুরু হয় যার লক্ষণগুলিকে আমরা অ্যালার্জি, ঋতুগত শ্বাসকষ্ট, হাঁপানী, সর্দি, কাশি, একজিমা ইত্যাদি বলে চিহ্নিত করি। প্রকৃত পক্ষে অ্যালার্জি হলো অতিপ্রতিক্রিয়া (an excessive reaction) অথবা কোন কারণে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার চাইতে প্রকাশের অধিকতর তীব্রতা (A response much more than the normal response to a given situation). এই প্রতিক্রিয়াকে আগে বলা হতো anaphylaxis বা অরক্ষিত অবস্থা (without protection). 1909 খৃষ্টাব্দে ভন প্রিকে (Von Priquet) এই ধরণের প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ বোঝাবার জন্য অ্যালার্জি বলে একটি নতুন শব্দ চালু করেছিলেন যা পরে সর্বদেশে এবং ভাষায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলা অভিধানে অ্যালার্জি শব্দের অর্থ হলো 'খাদ্যগ্রহণ, কীটদংশন প্রভৃতির ফলে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা বা অত্যধিক অস্থিরতা।' সরল ভাষায় যার অর্থ হলো আপাত দৃষ্টিতে কোন নিরীহ বস্তু দ্বারা একটি অত্যধিক সংবেদনশীল অবস্থার উদ্ভব যা পরে বিষবৎ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে (Development of hipersensitivity to usually harmless substances which subsequently behaves as poison)।

মানুষের শরীরে পরাগরেণুর প্রতিক্রিয়ার মূল কারণ হলো পরাগরেণুর মধ্যে কতগুলি রাসায়নিক বস্তুর উপস্থিতি যাদের সংবেদনশীল অ্যালার্জিন (allergin) বলা হয়। অর্থাৎ উক্ত রাসায়নিক বস্তুগুলি আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল অবস্থার উদ্ভব করে যা, পরে বিষবৎ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যে সমস্ত অ্যালার্জিন সুস্থ বা স্বাভাবিক মানুষের কোন ক্ষতি করে না সেগুলিও কিন্তু ধাতগত ত্রুটিযুক্ত (with constitutional defect) মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে।

*রেণু-বিজ্ঞান বিভাগ, বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-700 009

পরাগরেণু যে হাঁপানীসহ নানারকম অ্যালার্জির মুখ্য কারণ তা সর্বপ্রথম জানান বৃটেনের বিজ্ঞানী ব্ল্যাকলে (Blackley)। উনি 1873 সালে প্রথম প্রমাণ করেন যে পরাগরেণুই Hay Fever-এর অন্যতম মুখ্য কারণ। তারপর ওয়াইম্যান (Wyman) 1876 খৃষ্টাব্দে প্রথম দেখান যে *Ambrosia* গাছের পরাগরেণু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের seasonal Hay Fever-এর জন্য মুখ্যতঃ দায়ী। ডুনবার্গ (Dunbarg) 1903 সালে, ওয়াইম্যান এবং ব্ল্যাকলের এই মতবাদ পুনরায় পরীক্ষা করে তাঁদের সঙ্গে একমত হন।

পরাগরেণু সংক্রান্ত এই তথ্য জানার পর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন বিজ্ঞানী গবেষণা আরম্ভ করেছেন। ভারতবর্ষে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বল্লভভাই প্যাটেল চেষ্ট ইন্‌স্টিটিউট, লক্ষ্ণৌ-এর কে. জি মেডিকেল কলেজ, জয়পুরের এস. এম. এস. মেডিকেল কলেজ, কলকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দির ও স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন এই ধরণের গবেষণায় অগ্রগণ্য। ভারতবর্ষে প্রথম 1883 খৃষ্টাব্দে ডাঃ ডি. ডি. কানিংহাম নামক একজন সরকারী চিকিৎসক তদানীন্তন ভারতের রাজধানী কলকাতার বায়ুমণ্ডলে ভাসমান নানারকম সূক্ষ্মকণার একটি বিবরণ প্রকাশ করেন। তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ কানিংহামের বিবরণ বায়ুমণ্ডল দূষিতকরণের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। তারপর প্রায় এক শতাব্দী ধরে এই ধরণের কাজ এই মহানগরে আর হয় নি। ইতিমধ্যে কলকাতার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আয়তনে কলকাতা মহানগরী এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিপুলতর অবস্থা ধারণ করেছে, জনসংখ্যায় ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর অন্যতম ঘন বসতিযুক্ত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। সেই সঙ্গে ধাপে ধাপে বায়ুমণ্ডলের দূষিতকরণও বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে হাঁপানী এবং আনুষঙ্গিক ব্যাধি অনেকগুণ বিস্তারলাভ করেছে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার দশ শতাংশ মানুষ এই ধরণের রোগে প্রতি বছর আক্রান্ত হন। শুধু ভারতবর্ষে নয় সমগ্র পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ হাঁপানী বা ঋতুগত শ্বাসকষ্ট, Hay Fever নামক এই ধরণের দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে যা নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি অধুনা চিকিৎসা-বিজ্ঞান এখনও দিতে পারে নি।

অ্যালার্জিজনিত ব্যাধি মানুষের কোন্ অঙ্গে স্থিতিলাভ করবে, তা কিছুটা নির্ভর করে সংবেদনশীল অ্যালার্জেনদের প্রবেশপথের ওপর। উদাহরণস্বরূপ পরাগরেণু দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে, নাসিকা ও শ্বাসপ্রশ্বাসের অঙ্গের মাধ্যমে। ফলে নাসিকা হয় ঋতুগত সর্দিকাশির আবাসস্থল এবং হাঁপানীর লক্ষ্যস্থল হয় ফুসফুস।

পরাগরেণুজনিত অ্যালার্জির চিকিৎসার জন্য প্রথমেই জানা প্রয়োজন কোন্ রোগী কোন্ ধরণের পরাগরেণুর প্রতি সংবেদনশীল। এটা জানার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন ঋতুতে বায়ুতে ভাসমান পরাগরেণুর গতিবিধির বিবরণ সংগ্রহ করতে হয়। তারপর সেগুলির সঠিক পরিচয় নির্ধারণ করা হলে পুরো একটি বছরের প্রতিদিনকার বায়ুতে ভাসমান পরাগরেণুদের বিবরণ সংগ্রহ করতে হয়। তারপর সেগুলির সঠিক পরিচয় নির্ধারণ করা হলে পুরো একটি বছরের প্রতিদিনকার বায়ুতে ভাসমান পরাগরেণুদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা থাকলে রোগী কোন্ পরাগরেণু বা পরাগরেণুদের প্রতি সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করা খুব শক্ত নয়। যেমন একটি রোগী বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে অ্যালার্জি বা হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হয়, অন্য ঋতুতে সেই রোগী ভালই থাকে। যেদিন রোগী প্রথম রোগাক্রান্ত হয়েছিল নির্দিষ্ট ঋতুর বিবরণ থেকে সেই দিনটিতে হয়তো দেখা গেল 7 রকমের পরাগরেণু বা কয়েকটি বা একটি এই রোগের সৃষ্টির কারণ।

বায়ুতে ভাসমান পরাগরেণুর সঠিক পরিচয় নির্ধারণ করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। আগেই বলা হয়েছে প্রতিটি সপুষ্পক উদ্ভিদের পরাগরেণু সেই জাতের বংশগত ধারা বজায় রেখে কতগুলি

নির্দিষ্ট চরিত্রের অধিকারী হয়। এইসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একজাতীয় পরাগরেণু অপর জাতীয় পরাগরেণুর পার্থক্য বহন করে। বায়ুতে ভাসমান-পরাগরেণু সংগ্রহ করার পর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তার বৈশিষ্ট্য দেখে কোন্ গাছের পরাগরেণু তা নির্ধারণ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট এলাকার ভাসমান পরাগরেণু বিজ্ঞানীকে সেই অঞ্চলের প্রতিটি গাছের ফুল থেকে পরাগরেণু সংগ্রহ করে প্রতিটি রেণুর বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করতে হয় এবং তার ফলে তাদের নিখুঁত পরিচয় নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

বায়ুতে ভাসমান পরাগরেণুর সংখ্যা জানার সময় জানা গেছে যে একটি র‍্যাগউইড গাছ (Ambrosia) প্রতি পাঁচ ঘণ্টায় 8,000,000,000 পরাগরেণু উৎপন্ন করে। একটি সমীক্ষায় প্রকাশ সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ঋতুতে ওই গাছে 1,000,000 টন পরাগরেণু উৎপন্ন হয়। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে একটি সমীক্ষায় জানা গেছে একটি অ্যান্টিরাইনাম গাছ (Antirshinum) 55,000,000টি রেণু সৃষ্টি করে। পরাগরেণুগুলি পরাগকোষ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। বিমানের সাহায্যে 2000 থেকে 2300 মিটার ওপরেও প্রচুর পরিমাণ রেণুর সন্ধান পাওয়া গেছে। পশ্চিমবাংলায় কলকাতা, কল্যাণী ও ফলতার বাতাসে বিভিন্ন ঋতুতে কি কি ধরণের পরাগরেণু আছে তা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে। এই ধরণের কাজ পশ্চিমবাংলায় গত আট বছর ধরে বসু বিজ্ঞান মন্দির এবং স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন যুগ্মভাবে পরিচালিত করছে। কলকাতা, কল্যাণী ও ফলতার আশেপাশে যেসব গাছপালা আছে তাদের অনেকগুলির পরাগরেণুই ক্ষতিকারক অ্যালার্জিন বলে পরিগণিত হয়েছে। এরকম কতগুলি অ্যালার্জি সৃষ্টিকারক গাছের নাম হলো ল্যানটানা (Lantana camara) যেটা সর্বত্র পোড়ো জমিতে যেখানে-সেখানে হয়, কুমড়ো (Cucurbita maxima), পেঁপে (Carica papaya), দূর্বাঘাস (Cyanodon dactylon), একরকম ঘাস (Eleusine indica), বেতুয়া শাক (Chenopodium album), শিয়ালকাঁটা (Argemone maxicana), কাঁটানটে (Amaranthus spinosus), রেড়ী (Riecinus communis), নিম (Azadaricta indica), কুর্চী (Holarhena antidysentrica), পুত্রঞ্জীব (Putranjiba roxburghiana), ক্রোটোন (Croton bonplandianum), বাবলা (Acacia arabica), বাঁদর লাঠি (Casoia fistula) ইত্যাদি।

এই ধরণের রোগের প্রতিকারের জন্য রোগীর ত্বক পরীক্ষার (skin test) প্রয়োজন। ত্বক পরীক্ষায় পরাগরেণু থেকে তৈরী যেসব অ্যান্টিজেন হাঁধর্মী (+reaction) প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সেগুলিকেই রোগের কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সেই ক্ষতিকারক পরাগরেণুগুলিকে জানার পর—

(1) সংশ্লিষ্ট গাছগুলির বিনাশ করতে হবে (কিন্তু এদের অনেকগুলিই আবার মানুষের উপকারী যেমন ফল গাছ, পুষ্পোদ্যানের গাছ ইত্যাদি। কাজেই কাজটা খুব সহজসাধ্য নয়)।

(2) রোগীদের এমন জায়গায় স্থানান্তরিত করতে হবে যেখানে ক্ষতিকারক এই ধরণের উদ্ভিদ একেবারেই নেই।

(3) নিদানিক পরীক্ষা (clinical investigation) করতে হবে। এই পদ্ধতিতে রোগীকে ধীরে ধীরে সংবেদনশীলতা থেকে মুক্ত করা যায়। যেসব পরাগরেণুগুলি রোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ তাদের পরিশ্রুত তরল নির্যাস (sterile aquous extract) বা অ্যান্টিজেন প্রস্তুত করে সেগুলি ক্রমশঃ ধাপে ধাপে অল্প থেকে অধিক পরিমাণে রোগীর দেহে প্রবেশ করাতে হবে। যতদিন না রোগী যথেষ্ট পরিমাণে সহিষ্ণু হয়ে ওঠে (Tolerance to large doses)। এই পদ্ধতিতে দেহ ওই বিশেষ অ্যালার্জেনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি আয়ত্ত করে।

অবশ্যই এইরকম অ্যালার্জি সংক্রান্ত ব্যাধিতে ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদের রেণুর ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভিটামিন-‘এ’ ও আমাদের দৃষ্টিশক্তি

নরেন্দ্রকুমার দত্ত*

আমাদের প্রাণধারণের জন্যে ছয়টি অপরিহার্য জিনিসের মধ্যে ভিটামিন অন্যতম। প্রথমে দেখা যাক ভিটামিন কথাটি এলো কোত্থেকে। ‘ভাইটাল’ (vital) কথার অর্থ অতি গুরুত্বপূর্ণ আর ‘অ্যামিন’ (amine) বলতে বোঝায় এক নাইট্রোজেনঘটিত যৌগকে। ডাঃ ম্যাক্স নাইরেনস্টাইনের পরামর্শে লণ্ডনের লিস্টার-ইনষ্টিটিউটের ডাঃ ক্যাসিমির ফাঙ্ক (Casimir Funk) ‘ভিটামিন’ (vitamine) কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। পরে অবশ্য এর ইংরেজী বানানে শেষাক্ষর ‘e’ বাদ পড়ে।

1913-14 সালে ম্যাক-কোলাম ও ডেভিস মাখন ও ডিমের কুসুম থেকে ভিটামিন ‘এ’-কে আলাদা করেন।

রাসায়নিক ধর্ম

ভিটামিন-‘এ’ অসম্পৃক্ত-প্রাথমিক-কোহলজাতীয়। দু-ধরণের ভিটামিন-‘এ’ আছে; A_1 ও A_2। রাসায়নিক নাম রেটিনল-ওয়ান এবং রেটিনল-টু। এরা বিভিন্ন সমাংশরূপে (isomeric form) এবং পামিটেট, অ্যাসিটেট প্রভৃতি এস্টার-রূপে প্রকৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে। মূল ভিটামিন ও তার অ্যালডিহাইড-রূপ (retinene) আমাদের অক্ষিপটে রয়েছে।

অক্ষিগোলক (eyeball): দু-একটি প্রাথমিক কথা

অক্ষিগোলকের বাইরে থেকে ভিতরের দিকে তিনটি স্তর রয়েছে।

(1) শ্বেতমণ্ডল (schlera) ও অচ্ছোদপটল (cornea)।

(2) কৃষ্ণমণ্ডল (choroid), সিলিয়ারি বডি ও কনীনিকা (iris)।

(3) অক্ষিপট (retina)

অক্ষিগোলকের ভিতরে আছে লেন্স। লেন্স ও অচ্ছোদপটলের মাঝে আছে অ্যাকুয়াস হিউমার এবং অক্ষিপট ও লেন্সের মাঝে রয়েছে ভিট্রেয়াস হিউমার নামে ঘন তরল পদার্থ। কনীনিকা ক্যামেরার ডায়াফ্রামের মত লেন্সের সামনে ঝুলে রয়েছে।

অক্ষিপটের বিভিন্ন স্তর

অক্ষিপটে আলোর ক্রিয়া

অক্ষিপটের বেধ 0.1-0.56 মি. মি.। এই অতি পাতলা পর্দার মধ্যেও রয়েছে দশটি স্তর। প্রধানত এতে দুটি স্তর আছে—বাইরেকার রঞ্জক-কোষস্তর

*9এ, অক্ষয় মুখার্জি রোড, কলিকাতা-700 0...

(pigment layer) ও ভিতরকার স্নায়বিক স্তর। দ্বিতীয় থেকে দশম স্তর, স্নায়বিক স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এই দ্বিতীয় স্তরেই রয়েছে আলোক-সংবেদনশীল রড্ ও কোন্ কোষ। রড্ স্তিমিত আলোতে (dimlight) কার্যকরী। সূক্ষ্ম, বর্ণগ্রাহী উজ্জ্বল আলোতে দৃষ্টিশক্তির জন্যে কোন্ কোষগুলি দায়ী।

অক্ষিপটের রঞ্জক-কোষস্তরে থাকে ভিটামিন 'এ'। রড্ ও কোন্ কোষগুলিতে রয়েছে যথাক্রমে রোডোপসিন ও আয়োডোপ্সিন নামে দুটি ক্রোমো-প্রোটিন। কোষগুলির আলোক-সংবেদনশীলতার জন্য এরাই দায়ী। ক্রোমোপ্রোটিনগুলি ক্যারোটিন-জাতীয় রঞ্জক রেটিনিন ও প্রোটিনের যৌগ। রোডোপ্সিন ও আয়োডপ্সিনে প্রোটিনগুলি যথাক্রমে স্কোটোপ্সিন ও ফোটোপ্সিন।

আলো পর পর অচ্ছোদপটল, অ্যাকুয়াস হিউমার, লেন্স, ভিট্রিয়াস হিউমার এবং অক্ষিপটের (ভিতর থেকে বাইরে) আটটি স্নায়বিক স্তর অতিক্রম করে আলোক-সংবেদনশীল রড্ ও কোন্ কোষস্তরে পৌঁছায়।

আলোর প্রভাবে রোডোপ্সিন ভাঙতে শুরু করে। এই জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়ার ধাপগুলি উপরে দেখানো হয়েছে। আলো রেটিনিনের সিস্-রূপকে তার সমাংশ (isomer) ট্রান্সে পরিবর্তিত করে। ফলে রেটিনিনের রাসায়নিক ধর্ম অপরিবর্তিত থাকলেও আণবিক গঠনের কিছু রদবদল হয় এবং তাই স্কোটোপ্সিন আর রেটিনিনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারে না। রোডোপ্সিন সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়ার আগের মুহূর্তে অস্থায়ী যৌগ মেটারোডোপ্সিন-III তৈরি হয়। আলোর উপস্থিতিতে শুধুমাত্র রেটিনিনই তৈরি হয় না, এই রেটিনিন আবার, রেটিনিন-রিডাক্টেজ নামে বিজারক-উৎসেচক ও NADর উপস্থিতিতে অলট্রান্স ভিটামিন-'এ' তৈরি করে। অক্ষিপটের রঞ্জক-কোষ স্তরে এই ভিটামিন সঞ্চিত হয়।
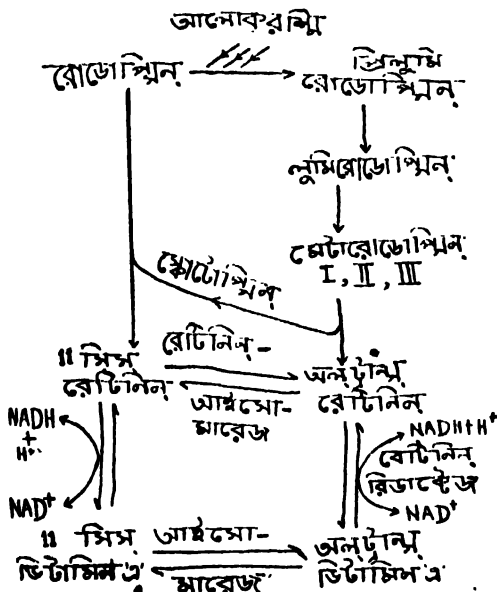
রড্ কোষগুলির উত্তেজনার উপায় বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে দেখা গেছে আলোর অনুপস্থিতিতে রড্কোষে কোষপর্দার সোডিয়াম-ভেদ্যতা (permea-bility) খুব বেড়ে যায়, ফলে কোষাভ্যন্তরের অপরা-তড়িৎ-ধর্মিতা অনেকটা প্রশমিত হয়। আলোর উপস্থিতিতে রোডোপ্সিন ভাঙতে শুরু করলে রডকোষ উত্তেজিত হয় এবং কোষপর্দার সোডিয়াম-ভেদ্যতা হ্রাস পায়। ফলে কোষের অপরা-তড়িৎধর্মিতাও বাড়ে। একে বলে হাইপারপোলারাইজেশান, যা থেকে একটা গ্রাহীবিভব (receptor potential)-এর সৃষ্টি হয়। গ্রাহীবিভবই পরে স্নায়ুস্পন্দনের (nerve impulse) সৃষ্টি করে। এই স্নায়ুস্পন্দন ক্রমে অক্ষিপটের বিভিন্ন স্নায়ুকোষ ও অপ্টিক্ স্নায়ুর মাধ্যমে ডাইএনসিফালনের ল্যাটারাল-জেনিকুলেট-বডিতে এবং অবশেষে সেরিব্রাল-হেমিস্ফিয়ারের অক্সিপিটাল-লোবে দৃষ্টিসংবেদন-অঞ্চলে পৌঁছায় এবং আমরা দেখতে পাই।

অন্ধকারে বিপরীতমুখী ক্রিয়ার ফলে অলট্রান্স

রেটিনিন, 11 সিসরূপে পরিবর্তিত হয় ও পরে স্কোটোপ্‌সিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রোডোপ্‌সিন উৎপন্ন করে। শুধু তাই নয়, অক্ষিপটের রঞ্জক-কোষ স্তরের সঞ্চিত ভিটামিন 'এ' জারিত হয়ে নতুন রেটিনিন তৈরি করে রোডোপ্‌সিন তৈরি অব্যাহত রাখে।

কোন্‌ কোষগুলিতেও রড্‌ কোষের মত একই রকম জৈব রাসায়নিক-ক্রিয়া দেখা গেছে।

ভিটামিন-'এ'-র অভাবে দৃষ্টিশক্তি

রাতকানা—ভিটামিন-'এ'-র অভাবে রড্‌ ও কোন্‌ কোষের আলোক-সংবেদনশীলতা কমে যায়। রাতের অপর্যাপ্ত আলো রড্‌ ও কোন্‌ কোষগুলিকে ঠিকভাবে উত্তেজিত করতে না পারায় দৃষ্টিশক্তির যে ত্রুটি দেখা যায় তাই 'রাতকানা' রোগ।

অন্ধকার-অভিযোজন-ক্ষমতার হ্রাস

অন্ধকার-অভিযোজন বলতে বোঝায় যে কত তাড়াতাড়ি একজন তার চোখকে উজ্জ্বল আলো থেকে অন্ধকারে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এই ক্ষমতা নির্ভর করবে কত তাড়াতাড়ি বেশি পরিমাণ ভিটামিন-'এ' রঞ্জক-কোষস্তর থেকে রেটিনিনে পরিবর্তিত হয়ে রড্‌ কোষে পৌঁছতে পারে। আবার দেখা গেছে ভিটামিন-'এ' রেটিনিনে পরিবর্তিত হতে প্রয়োজনীয় সময়, রেটিনিনের রোডোপ্‌সিনে পরিবর্তিত হতে প্রয়োজনীয় সময়ের চেয়ে বেশি। তাহলে বোঝা গেল যে পর্যাপ্ত ভিটামিন-'এ'-ই এই ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে।

এছাড়া 'এ' ভিটামিনের অভাবে জেরোপ্‌থ্যালমিয়া, কেরাটোম্যালাশিয়া প্রভৃতি চক্ষুরোগ দেখা যায়।

শেষকথা

এত প্রয়োজনীয় যে ভিটামিন, তার উৎস সম্বন্ধে অবশেষে কিছু জানা যাক।

সমস্ত প্রাণীজ চর্বি, মাছের তেল, ডিম, দুধ প্রভৃতিতে প্রচুর ভিটামিন-'এ' রয়েছে। উদ্ভিদ রাজ্যে বিশেষত সবুজ শাকসব্জী, গাজর, হলুদ রঙের ফল যেমন, পাকা আম, টমাটোতে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন নামে এক প্রকার রঞ্জক পাওয়া যায়, যা আমাদের যকৃত ও অন্ত্রে ভিটামিন 'এ'-তে পরিবর্তিত হয়। ক্যারোটিনকে তাই বলে 'প্রোভিটামিন-'এ'।

প্রাপ্তবয়স্কদের 5000 আন্তর্জাতিক একক, বাড়ন্ত বাচ্চা, যুবক-যুবতী ও গর্ভবতীদের 6000—8000 আন্তর্জাতিক একক ভিটামিন-'এ' দেওয়া দরকার।

[1 আন্তর্জাতিক একক ≡0 3 মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন-'এ'-র কার্যকারিতা]

বৈদ্যুতিক চুম্বকের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করে সোভিয়েট রাশিয়ায় রেশম উৎপাদন বাড়ানোর একটি অভিনব পদ্ধতি চালু হয়েছে। উজবেকিস্তানের খামারের কর্মীরা ঐরকম চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে গুটিপোকা রেখে প্রায় দশ-শতাংশ বেশি রেশম পেয়েছেন। এই রেশম আগের চেয়ে বেশি শক্ত এবং দৈর্ঘ্যেও বেশি হয়।

লেসার রশ্মির সাহায্যে আঙ্গুলের ছাপ বিশ্লেষণ

শক্তিপদ কুইলা*

আসবাবপত্রে বা কাগজ-কাপড় ইত্যাদিতে গোয়েন্দাগিরিতে আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষা করে অপরাধীকে খুঁজে বের করার একটি প্রচলিত পদ্ধতি আছে। এর জন্তে সাধারণত ডাস্টিং পাউডারে সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক সময় ডাস্টিং পাউডারের সাহায্যে আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। সম্প্রতি লেসার রশ্মির সাহায্যে এই অসম্ভবকে সম্ভব করা সহজ হয়ে উঠেছে।

লেসার রশ্মি পদ্ধতির মূল কথা হলো—এমন কিছু পদার্থ আছে যারা এক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি শোষণ করে, অন্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি বিকিরণ করে। এই ঘটনাকে বলা হয় প্রতিপ্রভা এবং সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহকে প্রতিপ্রভ বস্তু বলে। যেমন কুইনিন সালফেট দ্রবণে অতিবেগুনি (কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের) আলো এসে পড়লে দ্রবণটি ঐ রশ্মি শোষণ করে দৃশ্যমান নীল রং-এর (বেশি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের) আলো বিকিরণ করে। তেমনি জিঙ্ক সালফাইড, বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড ইত্যাদি আরো অনেক প্রতিপ্রভ বস্তু আছে।

পরীক্ষণীয় আঙ্গুলের ছাপের উপর যদি আরগন-আয়ন লেসারের নীল আলো ফেলা হয় তবে ঐ আঙ্গুলের ছাপ শোষিত আলোর কিছু অংশকে হলুদ রং-এর আলো হিসাবে বিকিরণ করে। এই আলো আঙ্গুলের ছাপের একটি প্রতিবিম্ব গঠন করে। ফিল্টার গগ্‌লস্ (যা কেবল হলুদ রং-এর আলোকে পেরিয়ে যেতে দেয়)-এর সাহায্যে এই প্রতিবিম্ব দেখা যায় এবং প্রয়োজন বোধে সাধারণ আঙ্গুলের ছাপের মত ফটোগ্রাফ করে নেওয়া যায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে আঙ্গুলের ছাপে ঐ জাতীয় প্রতিপ্রভ পদার্থ এলো কোথা থেকে? মানুষের আঙ্গুল প্রায় সব সময় কিছু না কিছু প্রতিপ্রভ বস্তুকণার দ্বারা দূষিত থাকে। ঐ প্রতিপ্রভ বস্তুকণা মোটর তেল, রং এবং কালি অথবা ঐ জাতীয় পদার্থ (যেগুলিতে ব্যবহারিক জীবনে আমাদের হাতের ছোঁয়া লাগে) থেকে এসে থাকে। এ ছাড়া কোন কোন মানুষের শরীর থেকেও প্রতিপ্রভ পদার্থ নিঃসৃত হয়।

ডাস্টিং পদ্ধতিতে আঙ্গুল ছাপের জলে লেগে থাকা ধূলিকণা অথবা উদ্বায়ী তেলের স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করতে হয়। জল শুকিয়ে গেলে বা উদ্বায়ী তেল বাষ্পীভূত হয়ে গেলে আঙ্গুলের ছাপের বিশ্লেষণ তখন এই পদ্ধতিতে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। কিন্তু প্রতিপ্রভ অণুগুলি বাষ্পীভূত হতে পারে না বলে লেসার রশ্মি পদ্ধতি আঙ্গুলের ছাপ পড়ার দীর্ঘ দিন পরেও তা সঠিক বিশ্লেষণ করতে পারে।

কোন কোন পদার্থের, যেমন—প্লাস্টিক ব্যাগ, রবারের মোজা, টায়ার এবং নানা যন্ত্রের হাতল ইত্যাদি পদার্থের পৃষ্ঠের এমন ধর্ম যে আঙ্গুলের ছাপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুল সংলগ্ন ধূলিকণাসহ তরল পদার্থে সমানভাবে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং যার ফলে আঙ্গুলের ছাপ সুস্পষ্ট হয় না। এছাড়া উপরিউক্ত পদার্থগুলি অতিমাত্রায় তড়িতের কুপরিবাহী। এ কারণে ডাস্টিং পদ্ধতি এসব ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। কিন্তু এসব আঙ্গুলের ছাপে অল্প পরিমাণ প্রতিপ্রভ পদার্থ থাকলে লেসার রশ্মির সাহায্যে সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়, সাঁইথিয়া, বীরভূম

দলিলপত্রে বা কাপড়চোপড়ে লেগে থাকা বহু-দিনের পুরানো আঙ্গুলের ছাপকেও লেসার পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায়। এ সবের আঙ্গুলের ছাপগুলিতে অত্যল্প পরিমাণ স্থায়ী অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। আর এই অ্যামিনো অ্যাসিড কোন কোন রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া করে প্রতিপ্রভ পদার্থের জন্ম দেয়। এই প্রতিপ্রভ পদার্থ লেসার রশ্মির উপস্থিতিতে আঙ্গুলের ছাপের প্রতিবিম্ব গঠন করে।

পূর্বোক্ত লেসার রশ্মির জন্যে জটিল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। এ ছাড়া পরীক্ষাগার ব্যতীত লেসার রশ্মি অন্যত্র চালানো অসম্ভব। তাই সহজে এবং ঘটনাস্থলে ব্যবহার করার জন্যে লেসার উৎসের বিকল্প হিসাবে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক বাতিকে কাজে লাগানো হয়। এগুলি সাধারণ গৃহস্থালীর তড়িৎ-বর্তনীতে চালানো সম্ভব। তবে লেসার রশ্মির মত এ বাতিগুলির সাহায্যে অত নিখুঁত সনাক্তকরণ সম্ভব হয় না।

আঙ্গুলের ছাপ যদি অসম্পূর্ণ বা আংশিক হয় তবে ডাস্টিং পদ্ধতিতে তা বিশ্লেষণ করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিপ্রভ আঙ্গুলের ছাপ আংশিক হলেও তার সূক্ষ্ম রেখা, কুণ্ডলী বা লোমকূপের প্রকৃতি দেখে তার সঠিক বিশ্লেষণ করা হয়। কারণ এগুলি মানুষের আঙ্গুলের রেখার অনুপম সাদৃশ্য বহন করে।

সুতরাং আঙ্গুলের ছাপ বিশ্লেষণ করে অপরাধী নির্ধারণে লেসারের ব্যবহার নিঃসন্দেহে একটি কুশলী পদক্ষেপ। বিজ্ঞানীরা এর সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আশা করা যায় তাঁদের পরীক্ষাপ্রসূত ফল অদূর ভবিষ্যতে আরও নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

এনজাইম

(2)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়*

সজীব দেহে শক্তির উৎস—শরীরের পুষ্টি ও শক্তি তার খাদ্য হতেই হয়। এতে লুকিয়ে আছে রাসায়নিক শক্তি। খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্যে আণবিক ভাঙা-গড়ার কাজ পাশাপাশি চলতে থাকে। ভাঙার ফলে রাসায়নিক শক্তি তাপ হয়ে দেখা দেয়। গড়ার কাজে ঐ শক্তি ব্যয়িত বা শোষিত হয়। বাঁচার জন্য কিভাবে ঐ শক্তি কাজে লাগে এবং মজুত থাকে? শরীরের স্বাভাবিক অবস্থায় 'অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট' (adenosin triphosphate, ATP) নামক উচ্চ শক্তিসম্পন্ন একটি যৌগ জল-বিশ্লেষে (hydrolysis) –8,000 ক্যালরি/অণু (–8,000) তাপ ছেড়ে দেয়। পক্ষান্তরে একই অবস্থায় গ্লুকোজ 6—ফসফেট (6-phosphate) ছাড়ে মাত্র –3,300 ক্যালরি। অ্যাসিটাইল 'কো-এনজাইম-এ' আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চশক্তিসম্পন্ন যৌগ। এ.টি.পি-র (A.T.P.) উৎপত্তি স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়ার ফলে, অর্থাৎ সে সব বিক্রিয়ায় যাতে অণুর ভাঙন ঘটে। মোট সম্ভাব্য শক্তির যে ভগ্নাংশ এ.টি.পি-তে সঞ্চিত থাকে তা দিয়েই এ প্রণালীর যোগ্যতা নির্ণয় হয়। যাতে 'এ.টি.পি' সংশ্লেষণজনিত বিক্রিয়ায় শক্তি যোগাতে পারে সেই জন্য এ.টি.পি-র আর্দ্রবিশ্লেষণ ও শক্তিশোষক বিক্রিয়া (synthetic) সংযোজিত (coupled) করা দরকার, অবশ্য 8,000 ক্যালের কম হলেই এবং উভয় বিক্রিয়ার মধ্যে একটি সাধারণ বিক্রিয়ক থাকা চাই। যেমন শরীরে গ্লুকোজ 6-ফসফেট সংশ্লেষণে ফসফরিক অ্যাসিড হচ্ছে সাধারণ বিক্রিয়ক এবং সহায়ক এনজাইম—'হেক্সোকাইনেজ' (hexokinase).

গ্লুকোজ + ফসফরিক অ্যাসিড
+ ATP + H_2O —এনজাইম→ গ্লুকোজ 6-ফসফেট—5,000 ক্যাল, এ.ডি.পি (ADP, adenosin diphosphate) আরও একটি শক্তিসম্পন্ন যৌগ, এতে 3,000 ক্যাল, রাসায়নিক শক্তি সঞ্চিত থাকে।

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প বর্জিত হয় এবং অক্সিজেন গৃহীত হয়। কার্যকরী শক্তিও উৎপন্ন হয়। এসব জারণজনিত (oxidative) বিক্রিয়ার ফল। জীবকোষে হাইড্রোজেন পরমাণু এবং ইলেকট্রনের সুষ্ঠু পরিবহণ প্রণালীর ফলে শরীরের বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের উপযুক্ত অথচ উৎপাদন, সঞ্চয় এবং সংরক্ষণযোগ্য রাসায়নিক শক্তি উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় জারণসহ ফসফরাস সংযোজন ঘটে (oxidative phosphorylation)। এক যৌগ থেকে আরেক যৌগে হাইড্রোজেন পরিবহণের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা দিয়ে এ.ডি.পি. সহযোগে ফসফরিক অ্যাসিড থেকে এ.টি.পি. তৈরি হয়। জারণ বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেনের গ্রাহক হিসেবে কতগুলি যৌগ ব্যবহৃত হয়, যথা—এন. এ. ডি (NAD-nicotinamide dinucleotide), এন.এ.ডি পি (NADP—phosphate),

*502, ব্লক 'O' নিউ আলিপুর, কলিকাতা 700 053

কো-এনজাইম I ও II (coenzyme I & II), প্রোটিনের কার্মিক যৌগমূলক—ফ্ল্যাভোপ্রোটিন (flavoproteines) ইত্যাদি। এগুলি যথাযথ এনজাইমের প্রভাবে স্বচ্ছন্দে চলেফিরে (reversibly) জারিত ও বিজারিত হয়। এফ. এ. ডি (FAD-flavinadenine dinucleotide) কোএনজাইম এবং হাইড্রোজেন গ্রাহক হিসেবে অ্যামিনো অ্যাসিড-গুলিকে পাইরিউভেটে (pyruvate) রূপান্তরিত করার সহায়ক।

শ্বসন সংক্রান্ত বিক্রিয়াধারা—জীবকোষের অভ্যন্তরে সাইটোপ্লাজমে (cytoplasm) বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে 'মাইটোকনড্রিয়ন'। (mitochondrion) নামে এক বিশেষ উপাদান, সংখ্যায় অনেক। একে বলা হয় কোষের 'পাওয়ার হাউস' (power house)। খাদ্যের উপাদানসমূহকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে এই মাইটোকণ্ড্রিয়া ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড, কার্বহাইড্রেট প্রভৃতির জারণজনিত যাবতীয় শক্তি উৎপন্ন হয় এখানেই। এ কাজ করার জন্যে মাইটোকণ্ড্রিয়ার উভয় আবরণে (membrane) রয়েছে শ্বসন সংক্রান্ত একদল এনজাইম, যারা ক্রমান্বয়ে জোড়ায় জোড়ায় হাইড্রোজেন পরমাণু ও ইলেকট্রন পরিবহণ করে 'সাইট্রিক অ্যাসিড' চক্রে (citric acid cycle) বিজারণ ও জারণ ঘটিয়ে শেষ পর্বে অক্সিজেনকে জলে পরিণত করে। এই সব বিক্রিয়াধারা (reaction chain) সংগঠনের প্রধান হলো—এন এ. ডি., এন. এ. ডি. পি., এফ. এ. ডি., এ. টি. পি., এবং সাইটোক্রোম (cytochrome) ঘটিত রঞ্জক মূলক-সমৃদ্ধ এনজাইম বাহিনী।

জীবদেহে খাদ্যের পরিণাম (metabolism) —দেহের অভ্যন্তরে যে রাসায়নিক বিক্রিয়াধারা অবিরাম ঘটে চলছে সে সবই প্রায় এনজাইম প্রভাবিত। জড় ও শক্তি উভয়েরই পরিবর্তন হচ্ছে। কার্বহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন, খাদ্যের প্রধান উপাদানগুলি ক্রমান্বয়ে জল-বিশ্লেষে (hydrolysis) গ্লুকোজ, গ্যালাক্টোজ (galactose) ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসারিন ও অ্যামিনো অ্যাসিড প্রভৃতির দ্রবে পরিণত হয়। এগুলি শরীরে শোষিত হয় এবং এ থেকে সঞ্চিত শক্তির সাহায্যে সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় (anabolism) গ্লাইকোজেন, জৈব ফ্যাট ও প্রোটিন নূতন করে পুনর্গঠিত হয়। পাশাপাশি শক্তিজনক খাদ্য মুখ্যতঃ কার্বহাইড্রেট ও ফ্যাট সবাত (aerobic) ও অবাত (anaerobic) পরিবেশে জারিত হয়ে রাসায়নিক শক্তি উৎপাদন ও এ.টি.পি-র (A.T.P) মাধ্যমে তা সঞ্চয় করে। অবাত পরিবেশে জারণের ফলে কার্বহাইড্রেট, ফ্যাট এবং কতগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের শেষ পরিণতি পাইরিউভেট, c_3 (pyruvate)। এই পাইরিউভেট 'কোএনজাইম'-এ (coenzyme A) সহযোগে অ্যাসিটাইল কো-এ' (acetyl co. A) হয়। ঐ যৌগটি আবার সবাত পরিবেশে এক বাহিনী বিশিষ্ট এনজাইমের প্রভাবে একটি বিক্রিয়া ধারার মাধ্যমে অক্সেলো অ্যাসিটেটের (oxalo acitate) সহযোগে সাইট্রিক অ্যাসিড (C_6) সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। সাইট্রিক অ্যাসিড (citric acid) জারিত হয়ে জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্জন করে ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পরিশেষে পাইরিউভেট ও অক্সেলো অ্যাসটেট (C_4) পুনরুদ্ধার লাভ করে :

$$\begin{array}{ccc} C_3 \rightarrow C_2 \cdot\rightarrow C_6 \\ \uparrow \qquad\qquad \uparrow \\ \downarrow \qquad\qquad \downarrow \\ C_4 \leftarrow\text{-------}\cdot C_5 \end{array}$$
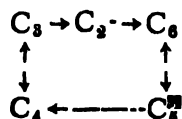
এই বিক্রিয়াধারা সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র (Krebs cycle) বলে পরিচিত। এর কাজ অ্যাসিটেটকে জারিত করে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলে পরিণত করা। প্রায় সব স্বাভাবিক ফ্যাটি অ্যাসিডের অণুতেই জোড় সংখ্যক কার্বন পরমাণু থাকে। একই কার্বন পরমাণুর সঙ্গে কার্বক্সিল ও কার্বন যুক্ত থাকলে দ্বিতীয়টি হলো বিটা (β-) কার্বন। ফ্যাটি অ্যাসিড জারিত হলে এক সঙ্গে দুটি করে কার্বন পরমাণু বর্জিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না অ্যাসিটেট অবশিষ্ট থাকে।

একে বলে β জারণ পদ্ধতি। অর্থাৎ বিটা-কার্বন কার্বক্সিলে পরিণত হয়। বিটা-জারণের ফলে ফ্যাটি অ্যাসিড 'কোএনজাইম-এ' সহযোগে শেষ পর্যন্ত 'অ্যাসিটাইল কো-এ' হয়ে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে যোগ দেয়।

জীবকোষ-গাত্রাবরণের ভেদ্যতা—কোষ এবং এর কয়েকটি উপাদান এক বা একাধিক আবরণ (membrane) দিয়ে সীমাবদ্ধ। এগুলি ফ্যাটযুক্ত বা তৈলাক্ত প্রোটিন (lipoprotein) দিয়ে গঠিত আণবিক ছাঁকনি বিশেষ। কিন্তু কিভাবে দ্রবণীয় সঞ্জীবনী পদার্থ (solutes) এই আবরণীর মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে? স্পষ্টতই আবরণীর ভেদ্যতা (permeability) সর্বাগ্রে দ্রাবের (solute) আণবিক ছোট-বড় আকারের উপর নির্ভর করে। বৃহৎ অণুগুলি ছাঁকনির উপর থেকে যায়, ক্ষুদ্রগুলি গলে যায়। ভেদ্যতার সঙ্গে ঐসব অণুর তৈলাক্ত পদার্থে দ্রবণীয়তার মাত্রা সংশ্লিষ্ট। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দুটি দ্রাবের আণবিক আকার একরকম হলেও যদি তৈলাক্ত পদার্থে (fat) একটির দ্রবণীয়তা বেশি হয় তবে আবরণের মধ্য দিয়ে তার ভেদ্যতাও বেশি হয়। অন্ত্রের (intestine) অন্তরাবরণ বা শ্লেষ্মা ঝিল্লীর মধ্য দিয়ে ভুক্তদ্রব্য প্রায় পুরোপুরি ক্ষুদ্র অন্ত্র থেকেই শোষিত হয়। এর প্রধান কারণ এখানে এনজাইম—প্রভাবিত সুদক্ষ পরিবহণের ব্যবস্থা রয়েছে যেমন—(1) বিশিষ্ট বাহক এনজাইম অ্যামিনো অ্যাসিড, গ্লুকোজ ও অনুরূপ একক শর্করাগুলি (monosaccharide) অন্ত্রের ভিতর থেকে ঝিল্লীর গা বেয়ে দ্রুতবেগে এপার-ওপার করে; এ প্রণালী সক্রিয় রাখতে প্রয়োজনীয় শক্তি এনজাইমের সহযোগিতায় এ. টি. পি. থেকে মিলতে পারে; (2) 'অ্যাসাইল কোএনজাইম-এ' ঘটিত পদার্থ 'মাইটোকণ্ড্রিয়ন' আবরণ ভেদ করে যাতায়াত করতে পারে না। এক্ষেত্রে 'অ্যাসাইল' মূলকটি অন্য একটি যৌগের (carnitine) সহযোগে ওপারে যেতে পারে এবং ওপারে 'অ্যাসাইল কো-এ' যৌগ পুনর্গঠিত হয়। এভাবে ফ্যাটি অ্যাসিড এপার-ওপার পরিবাহিত হয়। এছাড়া, অন্ত্রকুণ্ডলীর ঝিল্লীকোষ (epithelium) গঠন-বৈচিত্র্যে অতুলনীয় ক্ষরণ ও শোষণ ক্ষমতার অধিকারী হয়। ঝিল্লীর আণুবীক্ষণিক ছেদ থেকে জানা যায় যে স্তরটি স্থূল, শ্লেষ্মা স্তরে বা মিউকোসায় (mucosa) বহু ভাঁজ আছে, মিউকোসাতল (surface) প্রায় 1 মি. মি. উচ্চতা-বিশিষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় বহু অভিক্ষেপ (finger-like projections) খাড়াভাবে পাশাপাশি সজ্জিত। এগুলিকে শোষকনালী বা ভিলাই (villi) বলে। এদের শীর্ষতলের উপরিভাগে অসংখ্য মাইক্রোভিলাই থাকায় বুরুশের ন্যায় (brush-border) দেখায়। ফলে, আয়তন বৃদ্ধি হয়ে শোষণের সহায়তা করে। মানুষের অন্ত্রকুণ্ডলী প্রায় সাতাশ ফুট দীর্ঘ। উপরন্তু এর মধ্যেকার অসংখ্য ভিলাই মিলে প্রায় দশ বর্গ মিটার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রফল অন্নরস (chyle) শোষণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। শোষকনালীর কেন্দ্রস্থলে আছে লসিকানালী (lacteal), তা থেকে জালক (lymphaties), আর রক্তবাহী ধমনী, শিরা প্রভৃতি। পাচিত সরল খাদ্য বস্তুগুলি এদের দ্বারা শোষিত হয়ে, কতক জালকে ও কতক লসিকানালীর মধ্যে প্রবেশ করে। পরে রক্তপ্রবাহে মিলে ছড়িয়ে পড়ে।

পরিপাক প্রণালী—খাদ্য পরিপাক প্রণালী কতগুলি স্বাভাবিক প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমষ্টি মাত্র। কার্বহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন প্রভৃতি খাদ্যের জটিল উপাদানগুলি প্রথমে সরল দ্রবণীয় ও শোষণীয় পদার্থে পরিণত হয়, পরে আবার এগুলি সংহত হয়ে শরীরোপযোগী মূল যৌগের অনুরূপ যৌগে রূপান্তরিত ও অঙ্গীভূত হয়। কোষ-নিঃসৃত ভিন্ন ভিন্ন এনজাইম এসব বিক্রিয়া প্রভাবিত করে এবং অবশেষে অবিকৃত থাকে। বিশ্লেষণ (katabolism) সংশ্লিষ্ট এনজাইম থাকে কোষের সাইটোপ্লাজমে (cytoplasm), নিউক্লিয়সের বাইরে। এদের বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত, বাইরে থেকে শক্তি যোগানো বা এ. টি. পি. (ATP)-এর প্রয়োজন নেই। কিন্তু সংশ্লেষণজনিত

(anabolism) বিক্রিয়ার জন্য এ. টি. পি.-এর একান্ত দরকার।

মুখ, দন্ত ও জিহ্বা, উদরস্থ পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয় (pancreas), যকৃৎ ও অন্ত্র (intestine) পাচনতন্ত্রের (digestive system) প্রধান অংশ। পৌষ্টিক নালী (alimentary canal) মুখগহ্বর থেকে বৃহদন্ত্র এবং পরিপাক সহায়ক গ্রন্থি যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়—এদের সমবায়ে পৌষ্টিকতন্ত্র গঠিত (চিত্র-6)। খাদ্যদ্রব্য চর্বিত ও পিষ্ট হয়ে জিহ্বার সাহায্যে লালাস্রাবে মিশে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। ভাত, আলু, আটা, ময়দা প্রভৃতি স্টার্চ ও মিষ্ট দ্রব্য (carbohydrate) লালাস্থিত 'ক্লোরাইড' আয়নসহ এনজাইম 'টায়ালিন'-এর (ptyalin) অনুঘটন প্রক্রিয়ায় জলসংযোগে বিশ্লিষ্ট হয়ে ক্রমান্বয়ে ডেক্স্ট্রিন (dextrin) ও প্রায় আশি শতাংশ মলটোজে বা যবশর্করায় পরিণত হয়। লালার প্রশমিত দ্রবে (ph 7) টায়ালিন সক্রিয় থাকে এবং পাকস্থলীর নড়নচড়ন কাজের সহায়ক হয়। এ কাজ প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পাকস্থলীর অম্লরস মিশ্রণটিকে সম্পৃক্ত করে পুরোপুরি অম্লে পরিণত করতে পারে। পাকস্থলীর জারক রসে 0·4 শতাংশ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে (PH 1·4)। এখানে ফ্যাট জীর্ণ হয় না। কারণ এখানকার অম্ল পাচক রসে হজমি এনজাইম লিপেজ' (lipase) নিষ্ক্রিয় থাকে। অন্য দুটি এনজাইম 'পেপসিন ও রেনিন' (pepsin and rennin) ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি প্রোটিন খাদ্য হজম করায় এবং তিন চার ঘণ্টার মধ্যে এ সব আংশিক জীর্ণ হয়ে প্রোটিয়োজ (proteose) ও পেপটোনে (peptone) পরিণত হয়। এখান থেকে ক্ষুদ্র অন্ত্রে যাবার মুখে জীর্ণ এবং অজীর্ণ খাদ্যাবশেষ গ্রহণীতে (duodeum) অগ্ন্যাশয়-নিঃসৃত এনজাইম 'অ্যামাইলেজ' এবং 'মলটোজে' (ph 7) যথাক্রমে স্টার্চ সম্পূর্ণরূপে গ্লুকোজে এবং মলটেজ পরিণত করে। প্রোটিয়োজ, পেপটোন প্রভৃতির অম্লাক্ত পাকমণ্ড বা কাইম (chyme) এখানে অগ্ন্যাশয়ের জারক রস ও পিত্তরস দ্বারা প্রশমিত (neutralised) হয়ে এর তিনটি এনজাইম 'ট্রিপসিন (trypsin), কাইমো ট্রিপসিন (chymotrypsin) ও 'কার্বক্সি পেপটিডেজ'-

চিত্র—6. 1—লালাগ্রন্থি, 2—সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি, 3—সাবম্যাক্সিলারি গ্রন্থি, 4—অন্ননালী, 5—পিত্তাশয়, 6—যকৃৎ, 7—পিত্তনল, 8—পাকস্থলীর নির্গমদ্বার, 9—গ্রহণী, 10—পাকস্থলীর আগমদ্বার, 11—পাকস্থলী, 12—অগ্ন্যাশয়, 13—বৃহদন্ত্র, 14—ক্ষুদ্রান্ত্র, 15—অ্যাপেণ্ডিক্স, 16—মলদ্বার।
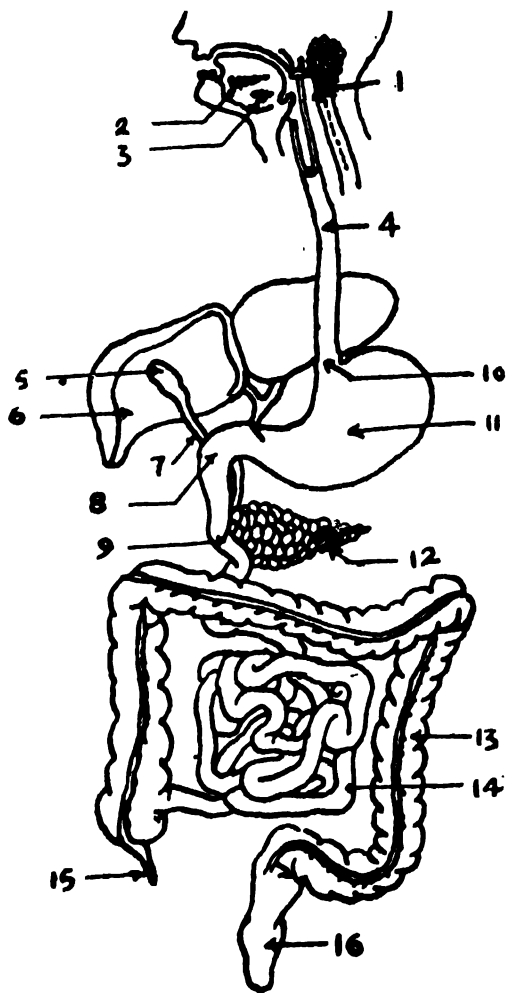
এর 'carboxy peptidase) প্রভাবে সরল পেপটাইড (peptide) ও অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। অগ্ন্যাশয় নালী এবং যকৃৎ থেকে পিত্তনালী গিয়ে

মিশেছে গ্রহণীতে। অগ্ন্যাশয় রসের 'লিপেজ' সহ অন্ত্ররসের 'অ্যামাইলেজ', 'মলটেজ', 'সুক্রেজ', 'ল্যাকটেজ', 'লিপেজ' ও 'ইরেপসিন' (erepsin) প্রভৃতি এনজাইমবর্গ মিশ্র পাচকরসে অন্ত্রকুণ্ডলীর বিস্তৃত আয়তক্ষেত্রে শেষবারের মত নিজ নিজ অনুঘটন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে। ক্ষুদ্র অন্ত্রে অগ্ন্যাশয় নালীর কাছে পিত্তরসের সাহায্যে ক্ষারীয় দ্রবে ফ্যাট দুগ্ধবৎ নির্যাসে বা অবদ্রবে (emulsion) পরিণত হয়ে লিপেজের প্রভাবে গ্লিসারিন ও ফ্যাটি অ্যাসিডে বিভক্ত হয়। গ্লিসারিনসহ শর্করা সবই প্রায় গ্লুকোজে পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে আন্ত্রিক জারক রস, অগ্ন্যাশয় ও পিত্তরস সবই ক্ষারধর্মী। এ ভাবে ভুক্ত দ্রব্য থেকে এখানে গ্লুকোজ, ভিটামিন, লবণ, ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড প্রভৃতির সাদা তরল অন্নরস (chyle) প্রস্তুত হয়ে যথাযথ এনজাইম বাহিনীর দ্বারা সক্রিয়ভাবে পরিবাহিত, শোষিত ও অঙ্গীভূত হয়। বাকী অজীর্ণ ও অশোষ্য পদার্থ জল, মিউকাস প্রভৃতি জীবাণুসহ বৃহদন্ত্র দিয়ে মলরূপে বর্জিত হয়।

বিশোষণ ও আত্তীকরণ—পাকস্থলী থেকে শুধুমাত্র মদ্যাদি কোহলীয় তরল বিশোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যেই প্রায় সব পরিপাকলব্ধ সরল পদার্থগুলি জল, ভিটামিন, তড়িৎ-বিশ্লেষ্য ইত্যাদি বিশোষিত হয়। এ প্রসঙ্গ '-আবরণের ভেদ্যতা' অনুচ্ছেদে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। কার্বহাইড্রেট থেকে মুক্ত হয়ে অধিকাংশ একক শর্করা সোডিয়াম ও পটাসিয়াম আয়নসহ ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লেষ্মাস্তর ভেদ করে রক্তের মধ্যে সক্রিয়ভাবে পরিবাহিত হয়। কিছু কিছু আবার আস্রবণ (osmosis) প্রণালীতেও শোষিত হয়ে রক্তে মিশে। অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনরূপে যকৃতে সঞ্চিত থাকে। ফ্যাট কিভাবে শোষিত হয় সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। ফ্যাট বিশ্লেষণ প্রকল্প (lipolytic hypothesis) অনুসারে শোষিত হওয়ার আগে ফ্যাট পুরোপুরি আর্দ্রবিশ্লিষ্ট (hydrolysed) হওয়া চাই। আবার পার্টিশন প্রকল্প (partition hypothesis) অনুসারে আংশিক দুগ্ধবৎ নির্যাসরূপে (emulsion) ফ্যাট শোষিত হতে পারে। ফ্যাট-মুক্ত গ্লিসারিন শ্লেষ্মাঝিল্লীর রক্তবাহী শিরায় (portal

খাদ্য পরিপাকের কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

সক্রিয় এনজাইম	উৎসস্থল ও পি. এইচ (চিত্র 6)			বিক্রিয়া
টায়ালিন	1, 2, 3 লালা গ্রন্থিচয়	6·5	(ক)	স্টার্চ → ডেক্স্ট্রিন → মলটোজ
অ্যামাইলেজ	12 অগ্ন্যাশয়	7·0		স্টার্চ → ডেক্স্ট্রিন → মলটোজ
ঐ	14 ক্ষুদ্রান্ত্র	7·0		ঐ
সুক্রেজ	ঐ	1·4		সুক্রোজ → গ্লুকোজ + ফ্রাকটোজ
ল্যাকটেজ, ইরেপসিন	ঐ			ল্যাকটোজ → গ্লুকোজ + গ্যালাকটোজ
মলটেজ	12, 14 অগ্ন্যাশয়, ক্ষুদ্রান্ত্র	8·0		মলটোজ → গ্লুকোজ
লিপেজ	ঐ ঐ	ঐ	(খ)	ফ্যাট → ফ্যাটি অ্যাসিড + গ্লিসারিন
পেপসিন, রেনিন	11 পাকস্থলী	1·5—2·0	(গ)	প্রোটিন → প্রোটিয়োজ + পেপটোন
ট্রিপসিন ও কাইমো ট্রিপসিন	12, 14 অগ্ন্যাশয়, ক্ষুদ্রান্ত্র	8·0		প্রোটিন → পেপটোন + পলিপেপটাইড + অ্যামিনো অ্যাসিড
ইরেপসিন ও কার্বক্সিপেপটিডেজ	14 ক্ষুদ্রান্ত্র	8·0		পেপটাইড → অ্যামিনো অ্যাসিড

(ক) কার্বহাইড্রেড, (খ) ফ্যাট, (গ) প্রোটিন

vein) শুষে নেয়। ফ্যাটি অ্যাসিড ও আংশিক জীর্ণ ফ্যাট কোষাবরণের তৈলাক্ত ক্ষেত্রাংশের মধ্য দিয়ে আস্রবণ পন্থায় শোষিত হতে পারে। অন্নরস বা কাইলে (chyle) ফ্যাট সূক্ষ্ম কণিকাকারে বেমালুম মিশে থাকে আর লসিকানালী (lacteale) ও লসিকায় (lymphatics) ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে বক্ষনালীর (thoracic duct) মধ্য দিয়ে ঘাড়ের ধমনীতে jugular vein) রক্তের সঙ্গে মিশে যকৃতে ও অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে যায়। ভুক্ত প্রোটিন খাদ্য অন্ত্রকুণ্ডলীর নিম্নভাগে যেতে যেতে প্রায় (চিত্র 6) 60—70% পুরাপুরি হজম ও শোষিত হয়ে যায়। বিশিষ্ট এনজাইমের পরিবহণ প্রণালীর দৌলতে শোষকনালীর (villi) অন্তঃস্থ জালকে (capillary) সরাসরি শোষিত হয়ে রক্তবাহী শিরার মাধ্যমে তা যকৃতে চলে যায়। (1) সোডিয়াম আয়ন ও ভিটামিন B_6 সহ প্রশমিত (neutral) অ্যামিনো অ্যাসিড; (2) আরজিনিন, লাইসিন প্রভৃতি ক্ষারীয় অ্যামিনো অ্যাসিড; (3) L-অ্যামিনো অ্যাসিড (বামাবর্ত, D-অ্যামিনো অ্যাসিড (দক্ষিণাবর্ত) অপেক্ষা দ্রুত অন্ত্রঝিল্লীর মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়। এসব বিভিন্ন পরিবহণ এবং বিশোষণ ব্যবস্থা বিভিন্ন এনজাইমের উদ্দীপনায় কার্যকরী হয়।

আত্তীকৃত বা শরীরে ক্ষয়প্রাপ্ত প্রোটিনের প্রায় 60% এবং মেদের প্রায় 10% কার্বহাইড্রেটে পরিণত হয়। গ্লাইকোজেন জান্তব স্টার্চ, উদ্ভিজ্জ স্টার্চ থেকে স্বতন্ত্র। স্বাভাবিক অবস্থায় যদিও খাদ্যের গ্লুকোজ থেকেই যকৃৎ এবং অন্যান্য কোষে গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ হয় তবুও অন্য কয়েকটি শর্করা, পাইরিউভিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড গ্লিসারিন, ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড প্রভৃতি থেকেও (চিত্র 7) গ্লাইকোজেন তৈরি হতে পারে। যকৃৎ থেকে রক্তের মধ্যে সততই গ্লুকোজের সরবরাহ থাকতেও তা ব্যবহারের জন্য কোষের মধ্যে সহজেই পাওয়া যেতে পারে। যকৃৎ এবং পেশীকোষ তাদের ওজনের যথাক্রমে 8 শতাংশ এবং 1 শতাংশ পর্যন্ত গ্লাইকোজেন মজুত রাখতে পারে। গ্রন্থি ও পেশীতে কার্যকরী শক্তি যোগাবার জন্য এদের গ্লুকোজ থেকে প্রচুর গ্লাইকোজেন তৈরি হয়ে থাকে। বাস্তবিক শরীরের সকল কোষই কিছু কিছু কার্বহাইড্রেট গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চিত রাখতে সক্ষম। কিন্তু যকৃত ছাড়া অন্য পেশীর গ্লাইকোজেন ছিন্ন হয়ে রক্তের গ্লুকোজ যোগাতে পারে না, যদিও যকৃৎ সবাইকে গ্লুকোজ বিতরণ করে। স্বাস্থ্যবান মানুষের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা 100-108 মি. গ্রাম (mg.) প্রতি 100 মি. লিটারে (ml.)। অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত একটি হর্মোন প্রোটিন—'ইনসুলিন' সুস্থ মানুষের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাবৃদ্ধি রোধ করে স্বাভাবিক রাখে, যাতে অতিরিক্ত গ্লুকোজ যকৃতে সঞ্চিত থাকে। বহুমূত্র রোগীর অগ্ন্যাশয়ের এই ব্যবস্থাপনা থাকে না তখন অন্যত্র ইনসুলিন সংগ্রহ করে রোগীর রক্তে ইনজেকশন দিয়ে রক্তের গ্লুকোজ স্বাভাবিক মাত্রায় নামানো হয়। অনাহারী থেকেও স্বাভাবিকের তুলনায় কম হলেও তার যকৃতে গ্লাইকোজেন থাকবেই। এ অবস্থায় এ বস্তু তৈরি হয় আপন শরীরের মাংস (প্রোটিন) এবং মেদ (ফ্যাট) থেকে। মৃত্যুর প্রায় দু ঘণ্টার মধ্যেই যকৃতের গ্লাইকোজেন গ্লুকোজে মিলিয়ে যায় কিন্তু তখনো তা পেশীতে থাকে। স্পষ্টতই জীবিত অবস্থায় এনজাইমের সক্রিয়তা এতই নিয়ন্ত্রিত যে রক্তের গ্লুকোজ মাত্রা বজায় রাখতে যতটুকু গ্লুকোজ দরকার ঠিক ততটুকুই যকৃতের গ্লাইকোজেন থেকে মুক্ত হয়।

গ্লুকোজ – গ্লাইকোজেন জুড়ির পারস্পরিক রূপান্তর—গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন এবং তদ্বিপরীত প্রস্তুত প্রণালী নিম্নবর্ণিত বিক্রিয়ার ধাপগুলির দ্বারা দেখানো হচ্ছে :

গ্লুকোজ ⇌ গ্লাইকোজেন

এ. টি. পি

গ্লুকোজ ————→ গ্লুকোজ 6-ফসফেট

গ্লুকোকাইনেজ

ফসফোগ্লুকো-
মিউটেজ
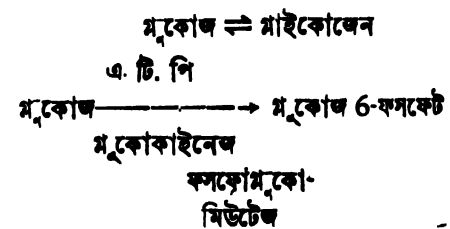
গ্লুকোজ 6-ফসফেট ⇌ গ্লুকোজ 1-ফসফেট
ইউ. টি. পি
গ্লুকোজ 1-ফসফেট ⇌ ইউ ডি পি-গ্লুকোজ
গ্লাইকোজেন সিন্‌থেটেজ
ইউ. ডি. পি-গ্লুকোজ————————→গ্লাইকোজেন
ব্র্যান্‌চিং এনজাইম

একটি করে 'গ্লুকোজ 1-ফসফেট' অণু গ্লাইকোজেন থেকে মুক্ত করে দেয় সক্রিয় ফসফোরিলেজ-এ (phosphorylase-a)। এই প্রক্রিয়া (ph 7·2) এনজাইম এবং হর্মোনের যৌথ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। 'গ্লুকোজ 6-ফসফেটেজ' এনজাইম পেশীতে থাকে না। কাজেই সেখানে গ্লুকোজ তৈরি হয় না।
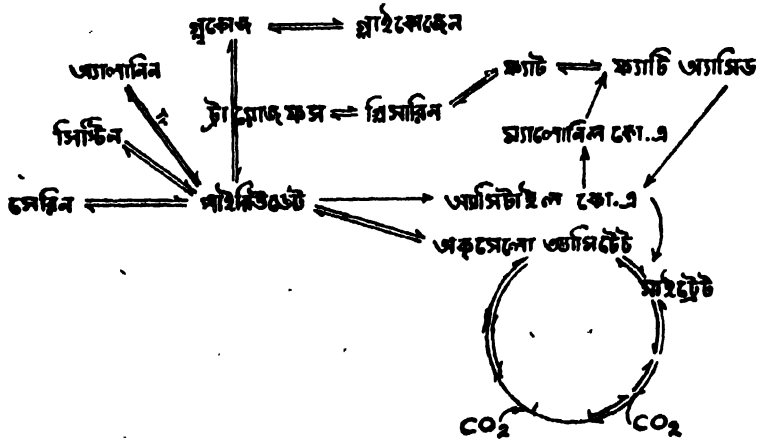
চিত্র-7

ইউ. টি. পি. (UTP or uridine triphosphate), ইউ. ডি.পি-গ্লুকোজ (UDP glucose or uridine-diphophate-glucose), গ্লাইকোজেন সিনথেটেস (glycogen synthetase) এবং ব্র্যান্‌চিং এনজাইম (branching enzyme) প্রভৃতি উচ্চশক্তিসম্পন্ন যৌগ এবং এনজাইমগুলি জীবের শরীরেই তৈরি হয়।

ফসফোরিলেজ
গ্লাইকোজেন—————→গ্লুকোজ 1-ফসফেট
ফসফোগ্লুকো—
গ্লুকোজ 1 ফসফেট —————→গ্লুকোজ 6-ফসফেট
মিউটেজ
গ্লুকোজ 6—
গ্লুকোজ 6-ফসফেট—————→গ্লুকোজ হয়ে রক্তে
ফসফেটেজ
মিশে যায়।

যকৃতের ফসফোরিলেজ সক্রিয় (a) এবং নিষ্ক্রিয় (b) অবস্থায় জীবকোষে বিদ্যমান। প্রয়োজনমত একবারে

কার্বহাইড্রেট, ফ্যাট এবং প্রোটিনের বিপাকে পারস্পরিক রূপান্তর—প্রধান বিক্রিয়া পথ এবং সাধারণ অন্তবর্তী যৌগগুলির সম্বন্ধ সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে (চিত্র-7)—(1) তিন শ্রেণীর অণু কোন অন্তর্বর্তী যৌগের মাধ্যমে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে প্রবেশ করে এ.টি.পি সংশ্লেষণের জন্য রাসায়নিক শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। (2) সাধারণ অন্তর্বর্তী যৌগ—'পাইরুভেট' এবং 'অ্যাসিটাইল কো-এ'—এদের মাধ্যমে গ্লুকোজ ফ্যাট কিংবা অ্যামিনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত হতে পারে। (3) অনুরূপভাবে অ্যামিনো অ্যাসিড ফ্যাটে রূপান্তরিত হতে পারে। (4) কতগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড গ্লুকোজে রূপান্তরিত হতে পারে। (5) গ্লিসারিন থেকে গ্লুকোজ তৈরি হতে পারে। পুষ্টিবিধানের পক্ষে এই রূপান্তর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবিক পশুর খাদ্যে কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ বাড়িয়ে

তাদের স্থূলকায় বানানো যায়। শূকরছানাকে বার্লি খাওয়ালে বার্লিতে ফ্যাট ও প্রোটিনের স্বাভাবিক পরিমাণের তুলনায় তার শরীরে অনেক বেশি মেদ জমে, যদি ধরে নেওয়া হয় যে খাদ্যের প্রোটিন সবটাই ফ্যাটে পরিবর্তিত হয়েছে তবুও। গ্লাইকোজেন ($\frac{1}{2}$ কি.গ্রা) হিসেবে পেশীতে যে পরিমাণ কার্বহাইড্রেট জমে তা খুব বেশি হয় না কিন্তু মেদ (6 কি.গ্রা.) জমে থাকে বেশি, চর্বিশূন্য খাদ্য খেয়ে পশুরা বাঁচতে পারে, মোটাও হতে পারে। এটা এমন সুনিশ্চিত যে শরীরে অ্যাসেটিক অ্যাসিড থেকে স্বচ্ছন্দে ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হয়। পশুদের প্রোটিন খাদ্য খাওয়ানোর ফলে তাদের শরীরে, প্রোটিন এবং কোন কোন অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে গ্লুকোজ বা গ্লাইকোজেন তৈরি হয়, এর অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। ফ্যাটের মাত্র 10% গ্লিসারিন হয়েও তা গ্লুকোজ তৈরি করতে পারে। কিন্তু ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লুকোজ তৈরি করতে পারে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কার্যত মানুষের শরীরে প্রোটিন ফ্যাটে রূপান্তরিত বিশেষ হয় না, কারণ পশুকে কেবল অত্যধিক প্রোটিন খাদ্য খাইয়ে এবং কম খাটিয়ে তার মধ্যে মেদ সৃষ্টি দেখানো যেতে পারে। কার্বহাইড্রেট বা ফ্যাট প্রোটিনে আংশিক মাত্র পরিবর্তিত হতে পারে।

[চিত্রগুলি শিল্পী শ্রীসুনীল শীলের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—লেখক]

তথ্যপঞ্জী

1. হ্যারোল্ড্ এ. হার্পার (Harold A. Harper), Review of Physiological Chemistry, 13th Edition, 1971.
2. ডবলিউ. ভি. থর্প (W. V. Thorpe), এইচ. জি. ব্রে H. G. Bray) ও সীবিল পি. জেইম্স্ (Sybil P. James), Biochemistry for Medical Students, 9th Edition 1970.

ভাষান্তর বিজ্ঞান

রজার বেকনের যুগ

মূল লেখক: এম. এন. রায়
ভাষান্তর: দীপককুমার দাঁ*

[রজার বেকন (1214—94) অক্সফোর্ড ও প্যারিসে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর লেখা গ্রন্থাদির মধ্যে, Major Work (Opus Majus), A Compendium of the Study of Theology (1292) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 1263 খৃষ্টাব্দে তিনি প্রচলিত ক্যালেণ্ডারের একটি বৈজ্ঞানিক সংস্করণ প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর যুগান্তকারী ধারণাবলী সমাজে এক নতুন বৈপ্লবিক ভাবনার সূত্রপাত ঘটায়। এরই ফলশ্রুতিতে তাঁর বই পড়া নিষিদ্ধ হয় এবং অবশেষে তাঁকে দশ বছর কারারুদ্ধ থাকতে হয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের এই স্থপতি সম্পর্কে বিখ্যাত বিপ্লবী দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তাঁর 'From Savagery to Civilisation' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে। এই বইটিতে আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভবের বিবর্তনধারাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিশেষ যুক্তির মাধ্যমে। লেখকের চিন্তাদীপ্ত বিশ্লেষণী প্রতিভা বিস্ময়কর বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রন্থ থেকে 'Age of Bacon' শিরোনামায় একটি অধ্যায়ের আংশিক ভাষান্তর প্রকাশ করা হলো।]

জ্যোর্তিবিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আলোক বিষয়ক যন্ত্রাদির ব্যবহারের বিষয়ে বেকন সর্বপ্রথম চিন্তা করেন। তিনি টেলিস্কোপ ও মাইক্রোস্কোপ তৈরির গঠন-প্রণালীর তাত্ত্বিক সম্ভাবনার বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এমন কি লেন্স তৈরির উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কেও তিনি নতুন পথ নির্দেশও করেছিলেন। জলে এবং স্থলে মাল পরিবহণে যানবাহন চলাচলের যান্ত্রিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কেও তিনি অনেক কিছু আবিষ্কার করেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো, উড়ন্তযানে (flying machine) মানুষের আকাশ পরিভ্রমণ সম্ভব—এটি তাঁরই ধারণায় প্রথম আসে। গ্যাসের ধর্ম বিষয়েও কয়েকটি নিয়ম তিনি উদ্ভাবন করেন। অক্সিজেনের ধর্ম ব্যাখ্যায় তিনি দেখিয়েছিলেন, কীভাবে একটি জলন্ত বাতি বায়ুনিরুদ্ধ স্থানে ধীরে ধীরে নিভে যায়। আধুনিক বিজ্ঞানের নানাবিধ আবিষ্কারের মধ্যে এগুলি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানবসভ্যতায় এই সব মহান আবিষ্কারের জন্য তাঁকে সারাজীবন অন্ধ মানুষের সন্দেহের বলি হতে হয়েছে এবং বলা যেতে পারে সারাজীবন এর জন্য তিনি প্রভূত নির্যাতনও সহ্য করেছেন; যার মধ্যে জীবনের শেষ দশ বছর তাঁকে বন্দীদশায় কারাগারে রুদ্ধ থাকতে হয়েছে।

বারুদের আবিষ্কার

কাঠকয়লা, গন্ধক ও সল্টপিটার বাদে বারুদের আবিষ্কার বেকনের বৈজ্ঞানিক নানা আবিষ্কারের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই আবিষ্কারের মূল কৃতিত্ব অবশ্য তাঁর নিজস্ব নয়। এর প্রকৃত আবিষ্কারক হলেন মারকাস গ্রেকাস (Marcus Graecus)। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই আবিষ্কারলব্ধ জ্ঞান লোপ পায়। পরবর্তীকালে আরবেরা এই জ্ঞান পুনরুদ্ধার করে, এবং

*গোবরডাঙা রেনেশাঁস ইনস্টিটিউট, পোঃ-খাঁটুরা, জেলা—24 পরগণা

গোপনীয়তার সঙ্গে এই জ্ঞানকে রক্ষাও করতে থাকে। বেকন শ্রদ্ধার সঙ্গে এই সব বিদগ্ধ আরব পদার্থবিদ্দের নাম তাঁর পূর্বসূরী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আরব পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও সংযোগ থেকেই তিনি এই জ্ঞান সঞ্চার করেন। পরে রসায়ন-বিজ্ঞানেও তাঁর নিজস্ব জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে তিনি এর অনেক উন্নতিসাধনও করেন।

বারুদের উৎপাদন এবং এর ব্যবহার প্রকৃতিকে জয় করার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার বলে গণ্য করা যেতে পারে। আদিম মানুষ তার দৈহিক শক্তি ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে তীর-ধনুকের ব্যবহার আয়ত্ত করেছিল। হয়তো স্থৈতিক শক্তির এই বিশেষ ব্যবহারিক গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের তেমন কোন সচেতনতা ছিল না। বারুদ তৈরির আবিষ্কারলব্ধ জ্ঞানের ফল হচ্ছে, অল্প পরিমাণ পদার্থের মধ্যেকার বিপুল পরিমাণ অন্তর্নিহিত জমা শক্তি, যার ব্যবহারের কৌশল মানুষ আয়ত্ত করেছে। যদিও এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার মানুষ ধ্বংসের কাজেই বেশি ব্যবহার করেছে, কিন্তু নির্দিষ্ট কয়েকটি পদার্থের শক্তি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান এবং তাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বের করে আনার কৌশল, প্রকৃতিকে জয় করার মানুষের চেষ্টাকে সবচেয়ে ফলপ্রসূ করেছে।

বিজ্ঞানের নামে !

সুব্রত পাল*

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়াতে গ্যালিলিওর সঙ্গে ধর্মযাজকদের সংঘাতের কথা মনে পড়ে? বিজ্ঞানী গ্যালিলিও হাতে টেলিস্কোপ আর রোমের তথাকথিত পণ্ডিতদের অস্ত্র অ্যারিস্টটেলীয় গোঁড়ামি যা গীর্জার ছত্রছায়ায় জনমানসে একাধিপত্য বিস্তার করে বসেছিল। সংগ্রামের সৈনিক গ্যালিলিও অবশ্য আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু পরাজিত হয় নি বিজ্ঞান আর পরাজিত হয় নি বলেই বিংশ শতাব্দীতে মানব সভ্যতা এগিয়ে গেছে অনেক দূরে এবং আমরা গর্ব বোধ করি নিজেদের বিজ্ঞানের যুগের মানুষ বলে।

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী-বিরোধী—এ দুই শিবিরের দ্বন্দ্ব চলে এসেছে যুগ যুগ ধরে। মানুষই সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান এনেছে তার কর্মপ্রচেষ্টায় সচেতনতা, উন্নত করেছে জীবনযাত্রার মান, এগিয়ে নিয়ে গেছে মানব সভ্যতা।

অন্যদিকে সমাজের মুষ্টিমেয় শাসনকর্তারা বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যখনই বোধ করেছে বিপন্ন বিজ্ঞানকে আক্রমণ করেছে তারা ধর্ম, কুসংস্কার, ইত্যাদিকে অবলম্বন করে। কিছু বিজ্ঞানী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, বিজ্ঞান হয়তো আহত হয়েছে কিন্তু থেমে থাকে নি। পিছু হটেছে অজ্ঞানতা, পিছু হটেছে বিজ্ঞান বিরোধীরা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থাটা গেছে অনেকটা পাল্টে।

অবশ্য আজও তো পৃথিবীর এক বিরাট অংশে রয়ে গেছে সেই মুষ্টিমেয়র শাসন। তবে নতুন দিন, নতুন অবস্থা—তাই প্রয়োজন নতুন কায়দার। সম্ভব নয় আর বাইরে থেকে আক্রমণ চালিয়ে বিজ্ঞানকে পর্যুদস্ত করা। অতএব আক্রমণ চালাও ভেতর থেকে। ছড়িয়ে দাও বিজ্ঞানের শিবিরের অভ্যন্তরে গুপ্তঘাতকদের। বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিই ব্যবহার কর কিন্তু বিকৃতভাবে। বিজ্ঞানের নামেই ছড়িয়ে দাও মানুষের মনে যুক্তিবর্জিত অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তাচেতনা। পঙ্গু হোক মানবমন। এতেই তো শাসন সুনিশ্চিত।

শক্‌লের 'বৈজ্ঞানিক' প্রেসক্রিপশন

নিগ্রোদের বিরুদ্ধে বৈষম্য মার্কিন রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু যুগটা যে বিজ্ঞানের। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রতো বিজ্ঞানে অগ্রসর দেশ। তাই সবকিছু করা উচিত বৈজ্ঞানিক (! প্রেসক্রিপসন অনুযায়ী। ডাক্তারও হাজির—না, কোন মামুলী চিকিৎসক নয় স্বয়ং ট্রানজিস্টরের আবিষ্কর্তা অধ্যাপক উইলিয়াম শক্‌লে।

ইতিমধ্যে বংশাণুতত্ত্ব (gene theory) বেশ খানিকটা জনপ্রিয় হয়েছে এবং বংশাণুবিদ্যা (genetics) যথেষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এতত্ত্বের অপব্যাখ্যার সাহায্যেই কাজ হাসিল করতে হবে। কিন্তু অধ্যাপক শক্‌লে যে বংশাণুবিদ্‌ (geneticist) নন। তা হোক ব্যাপক অনবহিত জনসাধারণ তা কতটা বুঝবে।

যেমন ভাবনা তেমন কাজ। ট্রানজিস্টরের আবিষ্কর্তা শক্‌লে জেনেটিক্‌সের এক নতুন 'তত্ত্ব' হাজির করলেন। তাঁর মতে আমেরিকান নিগ্রোদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনগ্রসরতা ও নিকৃষ্টতার কারণ বংশপরম্পরাগত ও প্রজনন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। স্বভাবতই দাওয়াই—নিগ্রোদের মধ্যে সন্তানোৎপাদন ব্যাপক হারে বন্ধ এবং নিগ্রো রমণীদের অপারেশন ও ইনজেক্‌শনের সাহায্যে বন্ধ্যা করে দেওয়া।

শক্‌লে অবশ্য একাই নন। বর্তমান দুনিয়ায় এমন অনেক 'বিজ্ঞানী' আছেন যাঁরা জাতিবৈষম্যবাদের পক্ষে 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যা (বা

*পদার্থ-বিজ্ঞান (জীবপদার্থ-বিজ্ঞান) বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700009

অপব্যাখ্যা) উদ্ভাবন করতে ব্যস্ত। এমনকি বংশাণুস্মৃতি বা হেরেডিটি (heredity) ও বংশাণুবিদ্যা (genetics)-এর তত্ত্বের 'নতুন আলোকে' তাঁরা বোঝাতে চাইছেন যে একই জাতির মধ্যেও বুদ্ধিগত, মানের তফাত থাকাটা খুবই স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী। মুষ্টিমেয় ধনীর তুলনায় ব্যাপক দরিদ্র জনসাধারণের বুদ্ধির নিম্নমান বা শিক্ষায় পশ্চাদ্‌পদতার কারণ জন্মগত –সামাজিক ব্যবস্থার ত্রুটি ও শিক্ষার সুযোগের অভাব নয়। তত্ত্বের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এখানে বোধ করি এধরণের তত্ত্বের ইতিহাস সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে দেয়া খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

উনবিংশ শতাব্দীর কোপারনিকাস

আজ থেকে 120 বছর আগে 1859 সালে প্রকাশিত হয় চার্লস ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural Selection)-এর মাধ্যমে প্রাণী-জগতের- 'বিবর্তন' (evolution)-এর তত্ত্ব। ডারউইন তাঁর তত্ত্বের অবতারণা করেন Origin Of Species বা 'প্রজাতির উৎস' বইতে। বইটাকে একমাত্র নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' (Principia) গ্রন্থের সঙ্গেই তুলনা করা হয়।

ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের মূল বক্তব্য জীব-জগতে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে এক 'অস্তিত্বের সংগ্রাম' (Struggle For Existence)। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে টিকে থাকার জন্য প্রত্যেক প্রজাতির মধ্যেই হয়ে চলেছে রূপান্তর (variation)। বিশেষ পরিবেশে যোগ্যতম বা সবচেয়ে মানানসই প্রজাতিগুলিই তাদের সুবিধাজনক রূপান্তরগুলি পরবর্তী বংশধরদের অর্পণ করতে পারে। বংশ-পরম্পরায় এধরণের রূপান্তরের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের' এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই যোগ্যতম (fittest) প্রজাতিগুলি টিকে থাকে এবং রূপান্তরিত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে যায় কোপারনিকাসের কথা। ষোড়শ শতাব্দীতে কোপারনিকাসের সৌর-কেন্দ্রিক বিশ্বচিত্র উপস্থাপনা করার আগে অ্যারিস্টটল-টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক চিত্রই স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বর কর্তৃক বিন্যস্ত ও অপরিবর্তনীয়—প্লেটো-অ্যারিস্টটল সৃষ্ট এ ধারণার মূলে প্রথমে আঘাত হেনেছিলেন কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও বলবিদ্যায় তাঁদের নতুন তত্ত্বের মাধ্যমে। চূড়ান্ত আঘাত হানল ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্ব। জীবজগতেও প্রাচীন ধারণার কোন স্থান রইল না। কারণ বিবর্তনের তত্ত্ব স্পষ্টই বলল কোন প্রজাতিই চিরস্থায়ী নয়। একটি প্রজাতি থেকেই অন্য একটি প্রজাতির ক্রমবিবর্তন হয় এবং তা হয় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে—কোন দৈব প্রভাবে নয়।

ডারউইনের তত্ত্ব উনবিংশ শতাব্দীতে প্রগতি ও প্রগতিবিরোধী বা প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল। ধর্মযাজকদের বিরোধিতার সম্মুখীন হলেও তত্ত্বটা কিন্তু বিজ্ঞানী মহলে বেশি বেশি করে সমাদৃত হতে লাগল। তৎকালীন পুঁজিপতিরাও এর পক্ষ অবলম্বন করেছিল। কারণ ধনতন্ত্র ছিল তখন বিকাশের যুগে এবং উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে সংরক্ষণশীলদের সংগ্রাম তখনও শেষ হয়ে যায় নি।

'যোগ্যতমের অস্তিত্ব রক্ষা'

বুর্জোয়াদের সমর্থনের অবশ্য আরেকটি কারণ ছিল। ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার আগে রবার্ট ম্যালথাস (1766-1834) নামে এক অর্থনীতিবিদ্‌ সামাজিক ক্ষেত্রে 'যোগ্যতমের অস্তিত্ব-রক্ষা', (Survival of the fittest)-র এক তত্ত্ব হাজির করেন। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষে মানুষে চলেছে এক প্রতিযোগিতা। ধনী তার 'যোগ্যতা'র জন্যই গরীবের ওপর শোষণ করতে পারছে এবং সম্পদ জমা করছে। অন্যদিকে গরীব তার 'যোগ্যতা'র অভাবের জন্য শোষিত হচ্ছে এবং ক্রমশঃ দরিদ্রতর হয়ে চলেছে। তৎকালীন ধনতান্ত্রিক সমাজের 'অবাধ প্রতিযোগিতা'র ধারণার সঙ্গে

ম্যালথাসের এধরণের চিন্তা সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। স্বভাবতই প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে বুর্জোয়া-শ্রেণী তা আপন করে নেয়। ডারউইন প্রাণী-জগতের ক্ষেত্রে যে তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন তার সাহায্যে বুর্জোয়ারা মানব সমাজের ক্ষেত্রে ম্যালথাসের তত্ত্বের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে চাইল।

যুক্তিবাদী মনে অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে—তবে কি মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবন প্রাণী-জগতের বা জৈব প্রক্রিয়ার ওপরে উঠতে পারে নি ? আর যাই হোক মানুষ এবং পশুর মধ্যে একটা অন্ততঃ মৌলিক পার্থক্য রয়েছে—পশুরা তাদের জীবনধারণের উপকরণ কেবল 'সংগ্রহ' করতে পারে কিন্তু মানুষ তা 'উৎপাদন' করে। তাই প্রাণী-জগত ও মানব সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মগুলি হুবহু এক হবে কি করে ? স্বভাবতই বুঝতে কষ্ট হয় না এধরণের ব্যাখ্যা (বা বিকৃতি)-র মধ্যেই নিহিত ছিল জাতি-বৈষম্য বা শ্রেণীবৈষম্যের যুক্তিবর্জিত আবর্জনার বীজ।

হেরেডিটি ও জেনেটিক্স্

1869 সালে গ্রেগর মেণ্ডেল (1822-84) আবিষ্কার করেন হেরেডিটির (heredity) নিয়ম। যে কোন কারণেই হোক তত্ত্বটা তখনকার মত চাপা পড়ে যায়। পরে বিশ শতকের গোড়ার দিকে সেটাকে পুনরুদ্ধার করা হয়। এছাড়া মরগ্যান ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের কাজের মাধ্যমে জেনেটিক্সের তত্ত্ব বিকাশলাভ করতে থাকে। জানা যায় জিন (gene) নামক এক বস্তুকণিকার সাহায্যে প্রত্যেক জীব তার বংশধরকে নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য প্রদান করে—অর্থাৎ এধরণের হস্তান্তরের একক হচ্ছে জিন।

প্রত্যেক জীবের জীবকোষের মধ্যে থাকে কতগুলি জিনের সমষ্টি যাতে তার বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্নিহিত থাকে এবং পরিবেশের সঙ্গে জিনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে বৈশিষ্ট্যগুলির অভিব্যক্তি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ ড্রসোফিলা নামক একটি মাছির জীবকোষে একটি বিশেষ জিন থাকলে তার চোখের রং লাল হয়। মাছিটা যদি তার সেই বিশেষ জিনটা পরবর্তী বংশধরকে হস্তান্তরিত করে তবে উপযুক্ত পরিবেশে সেই মাছিটারও চোখের রং লাল হবে।

জেনেটিক্সের বিকাশ মানুষের কাছে নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। একদিকে জীবন সম্বন্ধে তার জ্ঞানের বিকাশ ঘটে এবং সেই অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে জৈব প্রক্রিয়ার ওপর ক্রমশঃ বেশি বেশি মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে সক্ষম হয়। জীবনের ভৌতিক রাসায়নিক ভিত্তি তার কাছে উন্মোচিত হতে আরম্ভ করে। জীবন কোন ব্যাখ্যাতীত ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া নয় বরং সম্পূর্ণ বস্তুগত নিয়মেই পরিচালিত প্রক্রিয়া—এসত্য ক্রমশঃ তার কাছে স্পষ্টতর হয়।

কিন্তু মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানবিরোধী-প্রগতিবিরোধী গোষ্ঠীও চুপচাপ বসে থাকে নি। তা কি তারা পারে ? সভ্যতার অগ্রগতি তাদের শাসনকে সংকটাপন্ন করে তুলবে আর তারা স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করবে ? তাই সভ্যতার বিরুদ্ধাচরণ করে। মানুষকে বিভ্রান্ত করে সভ্যতার বিরুদ্ধে পরিচালিত করে। যে বুর্জোয়া শ্রেণী ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও প্রগতির ধ্বজা ধরেছিল বিংশ শতাব্দীর সংকটে নিমজ্জিত হয়ে তারাই সভ্যতার বিরুদ্ধে, বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে খড়্গ-হস্ত হলো।

গ্যাল্টন ও ইউজেনিক্স্

মানব সমাজকে পশু সমাজের পর্যায়ে অবনত করে সামাজিক ক্ষেত্রে 'যোগ্যতমের অস্তিত্ব রক্ষায়'র তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার যে 'মহান' প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তার পরিণতি ঘটে গ্যাল্টন (Galton) এর ইউজেনিক (eugenic) আন্দোলনে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমাজবাদীদের বিক্ষোভগুলি উচ্চবিত্ত সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলির সামাজিক অবস্থানের পক্ষে যুক্তি হাজির করার। 'মহান' দায়িত্বভার গ্রহণ

করলেন ফ্রান্সিস গ্যাল্টন (1822-1911)। এক সমীক্ষা চালিয়ে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে সীমিত কয়েকটি পরিবারের মধ্যেই ব্রিটেনের বেশির ভাগ অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্ধান পাওয়া যায়।

পরিসংখ্যানবিদ্যার সাহায্যে গ্যাল্টনের এ-কারসাজি ও বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলির বিকৃতিসাধনের মাধ্যমে (বা বলা যায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যার মাধ্যমে) জন্ম হলো সামাজিক জীববিদ্যাগত এক 'বিজ্ঞান' (Socio-biological science)-এর, যাকে বলা হয়ে থাকে ইউজেনিক্স্। সমস্ত জীবপদার্থের জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলি যখন জিন নির্ধারিত (যেন পরিবেশের কোন ভূমিকাই নেই!) - তখন তার সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিও তাই (এবং তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারও!)। স্বভাবতই উচ্চতর শ্রেণীর 'উচ্চমানের' বংশগুলিকে সযত্নে লালিত-পালিত কর এবং দরিদ্র-শ্রেণীর 'নিম্নমানের' বংশগুলি (আগাছা?) থেকে তাদের রক্ষা কর—এই হচ্ছে ইউজেনিক আন্দোলনের সার কথা। দুর্ভাগ্য (অবশ্য সামাজিক কারণেই) যে এইচ. জি ওয়েলসের মত প্রখ্যাত ঐতিহাসিকও এধরণের বিভ্রান্তির শিকার হন।

কথায় আছে একবার অধঃপতন শুরু হলে তার সীমা থাকে না। যারা মানুষ আর পশুর মধ্যে কোন প্রভেদ দেখল না তাদেরই বংশধরেরা যখন সত্যই পাশবিক হয়ে উঠল—তাদের দেওয়া বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাও হয়ে উঠল মারাত্মক।

'রক্ত ও জাতি'

বর্তমান শতকের সূচনায় ধনতন্ত্র হারায় তার স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য। এ অবক্ষয়ী স্থায়িত্বহীন কলঙ্কিত পুঁজিবাদকে একদিকে পাশবিক শক্তি ও অন্যদিকে অতীন্দ্রিয় যুক্তিবর্জিত ধ্যানধারণার সাহায্যে টিকিয়ে রাখার জন্য বিশ ও তিরিশের দশকে কিছু রাষ্ট্রে কায়েম করা হয় ফ্যাসিবাদ। তার মধ্যে জার্মানী অন্যতম।

জার্মান রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য কায়েম করাই ফ্যাসিবাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। জার্মান চিন্তা জগতের ওপর প্রভুত্ব করাও অপরিহার্য ছিল। নাৎসীরা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিবৈষম্য মূলক, ইহুদীবিদ্বেষী, ইত্যাদি যুক্তবর্জিত ধ্যানধারণার ওপর। যার ন্যূনতম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও ছিল না। তাই জার্মান জনমানস থেকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা অপসারণ করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

জার্মানী থেকে যখন ইহুদী বিতাড়নপর্ব চলছে এবং জার্মানীর বিজ্ঞান থেকে ইহুদী বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত তথ্য ও ধারণাগুলিকে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে তখন দুর্ভাগ্যবশতঃ একদল (খাঁটি জার্মান রক্তের অধিকারী!) বিজ্ঞানী ও দার্শনিকও নাৎসীদের এ দুষ্কর্মের সহযোগী হন। লেনার্ড, স্টার্ক প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের ইহুদী-বিদ্বেষী উন্মাদনা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে নীচের লেখায়:

'দেশ (space) ও কাল (time)-এর স্থানাঙ্ক (coordinates)-এর খেয়ালখুশীমত দেওয়া সংজ্ঞার ওপর প্রতিষ্ঠিত আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব যুক্তিবর্জিত (dogmatic) চেতনার পরিণতির এক স্পষ্ট নিদর্শন। এধরনের আরেকটা উদাহরণ শ্রয়ডিঙ্গার (Schroedinger)-এর তরঙ্গ কণা-বিদ্যার তত্ত্ব (wave-mechanics)।...জার্মানীর ভৌতিক গবেষণার ওপর এই যুক্তিবর্জিত চেতনার ক্ষতিকর প্রভাব বারবার লক্ষ্য করে আমি এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি। এই সংঘাতে আমি জার্মান বিজ্ঞানে ইহুদীদের প্রভাবের বিরুদ্ধে আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি—কেননা তাদের আমি যুক্তিবর্জিত চেতনার প্রধান প্রকাশক ও প্রবক্তা বলে মনে করি।..এ উদাহরণ গবেষণার ও বৈজ্ঞানিকদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে দেখানো যায় যে পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণার প্রতিষ্ঠাতা এবং গ্যালিলিও ও নিউটন

থেকে শুরু করে আমাদের যুগের ভৌতবিজ্ঞানের প্রবর্তকদের মত মহান আবিষ্কারকেরা প্রায় সকলেই ছিলেন আর্য—মূলতঃ নর্ডিক (Nordic) জাতির। এথেকেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে নর্ডিক জাতির মধ্যেই বাস্তববাদী চিন্তার স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যদি আমরা আধুনিক যুক্তিবর্জিত তত্ত্বগুলির উদ্ভাবক প্রতিনিধি ও প্রবক্তাদের অনুসন্ধান করি তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ইহুদী বংশোদ্ভূতদের পাওয়া যাবে। আমরা যদি স্মরণ রাখি যে··· মার্কসবাদ ও কমিউনিষ্ট গোঁড়ামির রচয়িতা ও প্রচারকদের বেশির ভাগই ইহুদী তবে আমাদের এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকার করা উচিত যে ইহুদী বংশোদ্ভূত লোকদের মধ্যে বিশেষ মাত্রায় যুক্তি-বর্জিত চিন্তাধারার প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়।

লেখাটা একজন প্রবীণ ইহুদীবিদ্বেষী এবং তখনকার সময়ে জার্মান বিজ্ঞানের সবচেয়ে সম্মানিত প্রতিনিধি স্টার্ক (Stark)-এর। 1938 সালে 'নেচার' পত্রিকায় সেটা প্রকাশিত হয়। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এ উন্মাদনার শেষ এখনও হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এধরণের জাতিবৈষম্য ও শ্রেণীবৈষম্যমূলক 'গবেষণার' পেছনে কোটি কোটি ডলার ঢালা হয়। শক্লের মত 'ভাড়াটে' বিজ্ঞানীও অবশ্য পাওয়া যায়।

অবশ্য সুখের কথা, এরকম অবৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞান-বিরোধী প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করার মত সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক চেতনা-সম্পন্ন লোকের অভাব নেই। বেশ কিছু প্রকৃতি ও সমাজ-বিজ্ঞানী যুক্তিতর্ক ও বাস্তব তথ্য দিয়ে সকলের অভিমত অবৈজ্ঞানিক ও অসার বলে মত প্রকাশ করেছেন। প্রিন্সটন, নিউ ইয়র্কসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শক্লেকে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর দুর্ভাগ্য—মানুষ যে বিজ্ঞান বুঝতে আরম্ভ করেছে। তাই তাঁর ধাপ্পাবাজি ধরতে তাদের অসুবিধা হয় না।

একটি মাত্র প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রবন্ধ শেষ করছি। 1942 সালে ইহুদীবিদ্বেষী নাৎসীদের যুদ্ধোন্মাদনা যখন চরমে তাদেরই সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত একটি দেশ সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মন্তব্য :

'রাশিয়াতে সমস্ত জাতি এবং সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী-গুলির সাম্য নিছক আনুষ্ঠানিক নয় বরং বাস্তবে রূপায়িত'।

স্বভাবতই সেদেশে জাতিবৈষম্যমূলক তত্ত্ব কেবল অচলই নয় নিষিদ্ধও। একটু অনুসন্ধান করলে যে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই এর কারণ খুঁজে পাবেন।

ভারতের কোয়েম্বাটুরে একটি কারখানায় লুসারন (Lucerne) নামে এক জাতের উদ্ভিদের পাতা থেকে প্রোটিন খাবার তৈরি হচ্ছে; তা শিশুদের মধ্যে বিতরণ করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, ঐ খাবার তাদের পুষ্টির কাজে বেশ ভাল ফল দিয়েছে। লুসারন (যার বৈজ্ঞানিক নাম আলফালফা) একটি শুঁটিজাতীয় উদ্ভিদ; লম্বায় সাধারণতঃ দু-ফুটের বেশি হয় না। এর বৈশিষ্ট্য হলো প্রচণ্ড খরা ও খুব কম তাপেও এ বেঁচে থাকে। প্রচুর প্রোটিন ছাড়াও এর পাতায় রয়েছে 'এ', 'সি' এবং 'ই' ভিটামিন। যে যন্ত্রটির সাহায্যে এতদিনকার পশুখাদ্য থেকে মানুষের জন্য প্রোটিন খাবার তৈরি হচ্ছে সেই যন্ত্রটির উদ্ভাবক হলেন বৃটেনের বিজ্ঞানী এন. ডব্লু. পিরি।

বিজ্ঞান সমীক্ষা

ইনসুলিন সংশ্লেষণ

পরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য*

মূল কথা—কৃত্রিম উপায়ে ইনসুলিন সংশ্লেষণের কথা ক্যালিফোর্ণিয়ায় চার বিজ্ঞানীর একদল সাম্প্রতিককালে ঘোষণা করেছেন।

ক্যালিফোর্ণিয়ার জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চার বিজ্ঞানীর একদল গত বছরের (1978) সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে ঘোষণা করলেন যে তাঁরা কৃত্রিম উপায়ে ইনসুলিন সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই চার বিজ্ঞানীরা হলেন কেইচি ইটাকুরা (Keiichi Itakura), আর্থার ডি. রিগস্ (Arthur D. Riggs), ডেভিড গোয়েডডেল (David Goeddel) আর রবার্টো ক্রিয়া (Roberto Crea)। এই বিজ্ঞানীরা দাবী করেছেন তাঁরা কৃত্রিম উপায়ে যে ইনসুলিন প্রস্তুত করেছেন তা, আর মানুষের প্যানক্রিয়াস (pancreas) থেকে যে ইনসুলিন নির্গত হয়, তা অভিন্ন। এখনও মানুষের উপর এটির পরীক্ষা হয় নি। আশা করা যাচ্ছে অচিরেই ফলাফল জানা যাবে।

ইনসুলিন ডায়াবিটিস মেলিটাসের (Diabetes Mellitus) একটি ঔষধ। বাজারে চালু ইনসুলিন দু-রকমের। একটির নাম বীফ ইনসুলিন আর অপরটির নাম পর্ক ইনসুলিন। এই ইনসুলিন গবাদিপশু এবং শূকর শাবকের প্যানক্রিয়াস থেকেই সংগৃহীত হয়। এর অসুবিধা অনেক। প্রথমত, যদি কোন কারণে এই সব পশুর যোগান বন্ধ হয় তবে ইনসুলিনের যোগানও বন্ধ থাকবে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে ইনসুলিনের দাম ক্রমাগতই বেড়ে চলছে যা সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। তা ছাড়া চাহিদা অনুসারে বাজারে ইনসুলিনের যোগান নেই। তৃতীয়ত, ভারত সরকার গবাদিপশুর নিধন নিষিদ্ধ করার বিষয়ে চিন্তা করছেন। ভারতে সে-আইন প্রযোজ্য হলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতে ইনসুলিন প্রস্তুতিও কমে যাবে। তখন বিদেশ থেকে পুরোপুরি ইনসুলিন আমদানী করা ছাড়া বিকল্প কিছু থাকবে না। সে-অবস্থায় মূল্যও যদি বৃদ্ধি পায় তাতেও আশ্চর্যের কিছুই হবে না। চতুর্থত, জীব থেকে যে ইনসুলিন তৈরি করা হয় তার ব্যবহারে অনেকের ক্ষতি হয়।

নানা কারণে কৃত্রিম উপায়ে ইনসুলিন তৈরি করা যায় কিনা সে বিষয়ে বহুদিন যাবৎ গবেষণা চলছিল। কয়েক বছর আগে চীনারা এই হরমোন প্রস্তুতির কথা জানালেও অদ্যাবধি বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে ইনসুলিন তৈরি হয় নি। ক্যালিফোর্ণিয়ায় যে গবেষণা হয়েছে তার ফলাফল থেকে বৃহৎ আকারে ইনসুলিন ভবিষ্যতে তৈরি করা সম্ভব হবে বলে মনে করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা দু-রকম ; যথা—(1) কৃত্রিম উপায়ে জিন তৈরি করা আর, (2) বিভিন্ন প্রকার জীবাণুতে তাদের সন্নিবেশন ঘটানো। উভয় কাজই জটিল। অনেক দিন ধরে জীবাণুদের মধ্যে জিন অন্তঃপ্রবেশ করিয়ে ইনসুলিন তৈরি করা সম্ভব হতে পারে বলে ভাবা হলেও, এতকাল তা কার্যকরী হয়ে ওঠে নি। জিন তৈরি করাও ছিল কঠিন ব্যাপার আর জীবাণুর নির্বাচনও ছিল অসম্পূর্ণ। তারপর দেখা দিল জিন জীবাণুতে অন্তঃপ্রবিষ্ট করার সমস্যা। বর্তমানে ক্যালিফোর্ণিয়ার বিজ্ঞানীরা যে সব জিন ইনসুলিন তৈরি করতে সক্ষম তাদেরকে ই. কোলাই (E. Coli) নামে এক জীবাণুতে সন্নিবেশিত করেন। এই জীবাণুরাই ইনসুলিনের উপাদানগুলি সংগ্রহ করে ইনসুলিন জোগায়। সুতরাং জীবাণুরাই ইনসুলিনের

*পোঃ—আগরপাড়া, নর্থ ষ্টেশন রোড, জিলা—24 পরগণা—743177

এক কারখানা। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে এরাই ইনসুলিনের যোগান দেবে।

এখনও পর্যন্ত উচ্চজীব বা উদ্ভিদের জিনকে নিম্নজীবাণুতে প্রবেশ করানো হচ্ছে; তাতে ফলও ভাল পাওয়া যায় বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। এইভাবে জীবাণুরা নাকি খুবই সুশৃঙ্খলভাবে ইনসুলিন সংশ্লেষণ করতে পারে।

কৃত্রিম উপায়ে জিন তৈরি, তাদের সংরক্ষণ আর সক্রিয় অবস্থায় জীবাণুতে এদের সন্নিবেশন—এদের কোনটিই সহজ ছিল না। ক্যালিফোর্ণিয়াতে বিজ্ঞানীরা যে জিন কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করেছেন তা মানুষের জিনের মতই, তবে সম্পূর্ণভাবে এক নয়। জেনেটিক বিজ্ঞানীদের কাছে পরের সমস্যা ছিল সন্নিবেশন নিয়ে। এই কাজটির জন্যে একটি বাহকও দরকার। জেনেটিক রিসার্চে এই বাহকটি হচ্ছে প্লাসমিড (plasmid)। ক্যালিফোর্ণিয়াতে বিজ্ঞানীরা এই সর্বপ্রথম কোন না কোন বায়োকেমিক্যাল পদ্ধতি অনুসারে জিনকে প্লাসমিডের সঙ্গে যুক্ত করলেন। প্লাসমিডও এক রকমের ডি. এন. এ (ডি-অক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড, সংক্ষেপে ডি. এন. এ)। যুক্ত করার পর লব্ধ ডি. এন. এ (Recombinant DNA)-টিকে বিজ্ঞানীরা জীবাণুতে প্রবিষ্ট করালেন। কতটা যথাযথভাবে জীবাণুরা ইনসুলিন সংগ্রহ করতে সক্ষম—বিজ্ঞানীরা সে বিষয়ে এখনও সবিশেষ আলোকপাত করেন নি। বিজ্ঞানীদের ঘোষণা যথাযথ হলে এটা নিশ্চিত যে কেবল ইনসুলিনের জোগানই যে এভাবে সম্ভব হবে তা নয় বৈজ্ঞানিক জগতে একটি আলোড়নের সৃষ্টিও হবে। রিকম্বিনেন্ট টেক্নোলজিতে ইনসুলিনই হবে 'সিন্থেটিক ডি.এন.এ' লাইনে গবেষণার প্রথম কার্যকরী প্রয়োগ।

জিনের অন্তঃপ্রবেশ বিষয় নিয়ে ভয়ও আছে। ক্যালিফোর্ণিয়াতে বিজ্ঞানীরা সর্বসম্মতভাবে তেমন ভয় নেই সে কথা জোর দিয়ে বলেন নি। পূর্বেও বায়োহাজার্ড (Biohazard) বিষয়ে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। অন্তঃপ্রবেশের সময় অনেক বহিঃশত্রুও আস্তানা পায়। 1976 সালে এই রকম আশঙ্কা থেকে উন্নতিশীল দেশগুলি রিকম্বিনেন্ট রিসার্চ বিষয়ে কিছু কিছু বাধানিষেধ আরোপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখন ইনসুলিন সংশ্লেষণের পর মনে হয় সে ভয়টা তত নেই যদিও ক্যালিফোর্ণিয়াতে বিজ্ঞানীরা সে বিষয়ে তত বলেন নি। তবে একটা দিক হলো এই—ই. কোলাই শ্রেণীর জীবাণুরা শরীরে বেশি সময় বাঁচে না। আয়ুষ্কাল কম বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, ই. কোলাই নামক জীবাণুরা শরীরের তত ক্ষতি করবে না এবং এরা অন্য রোগজীবাণুর বাহকও তত নয়।

ভালর দিকটা হলো এই যে এই রকম গবেষণা থেকে কেবল ইনসুলিনই যে প্রস্তুত হবে তা নয়, যাঁরা বহু দিন ধরে বংশজনিত পীড়ায় ভুগছেন তাঁদের পক্ষেও আশার কথা এই যে তাঁদের যে সব জিন অকেজো, তাদের বদলে নতুন জিন বসানো যাবে।

আগেও ভারতে রিকম্বিনেন্ট ডি.এন.এ. নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। যখন গবেষণা বিষয়ে ভয় ছিল প্রচুর তখনও দিল্লীর 'ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি' আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করে কি কি বিষয়ে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তার একটা তালিকা স্থির করেছিলেন। এখন যখন ইনসুলিন সংশ্লেষণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল, পরিবর্তিত অবস্থায় ভারতে তার গবেষণার সুযোগ কি হওয়া উচিত তা নির্ণয় করার সময়ও এসেছে। সন্দেহ নেই, ক্যালিফোর্ণিয়ায় বিজ্ঞানীদের ইনসুলিন সংশ্লেষণের ঘোষণা এখন থেকে রিকম্বিনেন্ট ডি. এন. এ রিসার্চে আরও শক্তি জোগাবে।

বিজ্ঞান প্রসার পরিচিতি

আইনস্টাইন জন্মশতবার্ষিকী পালন

শিবপুরে

গত 28শে এপ্রিল শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশনে (কলেজ) অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয় তাঁর জীবনী এবং বৈজ্ঞানিক অবদান সম্পর্কে বক্তৃতা ও আলোচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা স্ফুরণের পশ্চাৎপটের উপর আলোকপাত করে তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলি ব্যাখ্যা করেন ডঃ জয়ন্ত বসু ও ডঃ ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত। দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশনের কয়েক জন শিক্ষক এবং ছাত্রও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে 'মানুষ আইনস্টাইনের' পরিচয় দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার।

বাখরাহাটে

চব্বিশ পরগণার বাখরাহাট পাবলিক লাইব্রেরীর পাঁচ দিনব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের মধ্যে 11ই মে তারিখটি 'আইনস্টাইন দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে আইনস্টাইনের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অবদানের প্রাঞ্জল ও মনোজ্ঞ বিবরণ দেন ডঃ জয়ন্ত বসু। আইনস্টাইনের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিও তিনি উল্লেখ করেন। শ্রীসুব্রত পাল ও শ্রীগৌরাঙ্গ চক্রবর্তী আইনস্টাইনের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রগতিশীল ও মানবদরদী মনোভাব দৃষ্টান্ত সহকারে বর্ণনা করেন। উন্মুক্ত প্রান্তরে যে বিপুল জনসমাবেশে আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়, তা থেকে বোঝা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের মনে বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি গভীর ঔৎসুক্য রয়েছে।

অশোকনগর বিজ্ঞান সংস্থা

গত 8ই ও 9ই এপ্রিল'79 অশোকনগর বাণীপীঠ স্কুলে অশোকনগর বিজ্ঞান সংস্থার পরিচালনায় আইনস্টাইন জন্মশতবার্ষিকী উৎসব ও প্রথম বর্ষ বিজ্ঞান মেলা উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে মহাবিজ্ঞানীর জীবন ও কর্মের ওপর সেমিনার, প্রদর্শনী এবং মডেল প্রতিযোগিতাসহ বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। 8ই এপ্রিলের সেমিনারে ডঃ তপেন রায় ও শ্রীশংকর চক্রবর্তী অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা-সমূহে এতদঞ্চলের মোট 14টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। 9ই এপ্রিল পুরস্কার বিতরণী উৎসবে বিভিন্ন বিভাগে মোট 15টি পুরস্কার দেওয়া হয় এবং সংস্থার তরফে সম্পাদক শ্রীপ্রণব মজুমদার রিপোর্ট পেশ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আইনস্টাইন জন্মশতবর্ষ ও সি ভি. রামনের আবিষ্কারের পঞ্চাশ বছর পূর্তি পালন

গত 6,7ই ও :ই মে বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজের বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে 'আইনস্টাইন জন্মশতবর্ষ' ও 'বিজ্ঞানী সি. ভি. রামনের আবিষ্কারের পঞ্চাশ বছর পূর্তি' মহাসমারোহে পালিত হয়। 6ই মে তারিখে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীতুলসীকান্ত মণ্ডল। এই উপলক্ষে রামানন্দ কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, স্থানীয় কলেজ ও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা আয়োজিত প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্থানীয় কে জি. ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ শ্রীশান্তিভূষণ পাল। 7ই মে সকালে 'মনীষী ও বিজ্ঞানী আইনস্টাইন' শীর্ষক প্রতিযোগিতামূলক আলোচনাচক্রে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ অংশ-গ্রহণ করে। বিকালে আইনস্টাইন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, সত্যেন বসু ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল সায়েন্স-এর ডঃ বিদ্যুৎ দত্ত এবং কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগের ডঃ গগন-বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় শ্রীশংকর চক্রবর্তী 'আইনস্টাইনের আবিষ্কার ও জীবন' সম্পর্কে স্লাইড সহযোগে আলোচনা করেন। ৪ই মে সকালে সি. ভি. রামনের আবিষ্কার ও জীবন সম্পর্কে স্কুল ও কলেজের অনেক ছাত্র-ছাত্রী বক্তব্য রাখে, বিশেষজ্ঞ রূপে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট বিজ্ঞান-লেখক শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। সন্ধ্যায় ব্রিটিশ কাউন্সিল ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য বিভাগের সৌজন্যে বিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। বিজ্ঞান প্রদর্শনী দেখার জন্য তিন দিন প্রচুর জনসমাগম হয়। এই উপলক্ষে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী, বিজ্ঞান অনুরাগী জনসাধারণের মনে বিপুল উৎসাহ সৃষ্টি হয়। শেষ দিনের সর্বশেষ অনুষ্ঠানে রামানন্দ কলেজের বিজ্ঞান পরিষদের সম্পাদক শ্রীরতনকুমার রায় অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠু ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
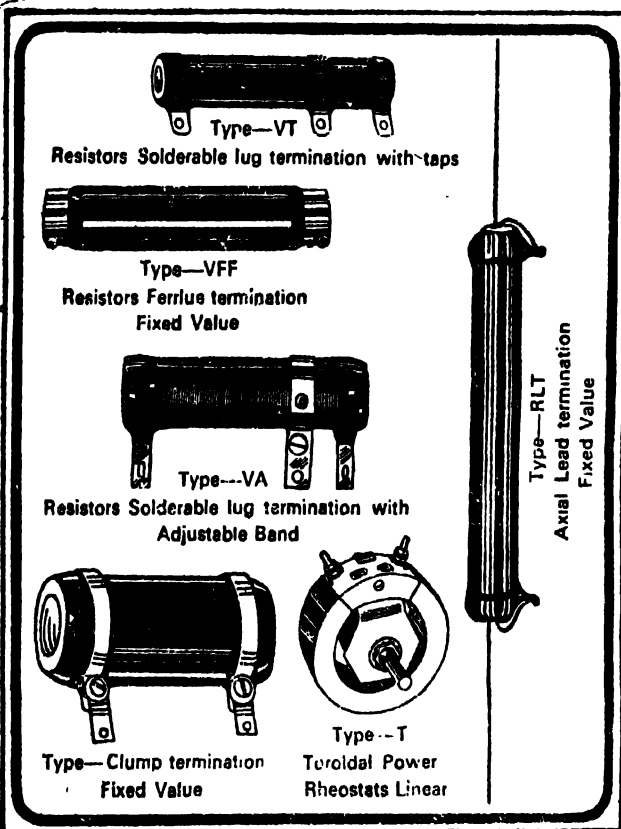
মানব দাশগুপ্ত স্মৃতি বিজ্ঞান প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

গত 22.2.79 তারিখে গোবরডাঙা বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য শ্রীমানব দাশগুপ্ত এক মর্মান্তিক রেল-দুর্ঘটনায় মাত্র পনের বছর বয়সে পরলোকগমন করেছে। শ্রীমান মানব বৈদ্যুতিক মডেল তৈরিতে বিশেষ পারদর্শী ছিল। আমরা এই সম্ভাবনাময় প্রতিভাবান কিশোরের অকালপ্রয়াণে একান্ত ব্যথিত, শোকস্তব্ধ। আমরা তার শোকসন্তপ্ত পিতামাতা ও নিকটজনকে সমবেদনা জানাই।

শ্রীমান মানবের পিতা শ্রীমণি দাশগুপ্ত, মানবের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য বিজ্ঞান পরিষদকে অনুরোধ করেছেন।

প্রবন্ধের বিষয়বস্তু: বিজ্ঞানের কোন্ আবিষ্কার সবচেয়ে মানব কল্যাণমূলক? অনধিক 2000 শব্দের মধ্যে, স্পষ্টাক্ষরে ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখে, প্রবন্ধ—কর্মসচিব: বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ: P-23 রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট কলিকাতা-700 006 এই ঠিকানায় 25শে জুলাই, 1979 এর মধ্যে পাঠাতে হবে। প্রতিযোগীদের বয়ক্রম 18 বৎসরের অনধিক হওয়া চাই। প্রথম পুরস্কার 60·00 টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার 40·00 টাকা।

প্রবন্ধ বিচারে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মতামতই চূড়ান্ত ও পুরস্কৃত প্রবন্ধের প্রকাশনার অধিকারও পরিষদেরই থাকবে।

মানব দাশগুপ্ত

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

মৌমাছির কথা

মান্নু চক্রবর্তী*

ভারতবর্ষে মধুর ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এখনও পর্যন্ত অনেক খেলোয়াড়, পর্বতারোহী, সাঁতারু যাদের প্রচুর দৈহিক শক্তির প্রয়োজন, সকলেই অধিক পরিমাণে মধু খায়। তাছাড়া এটা সহজপাচ্য বলে অসমর্থ রোগী অথবা শিশুদের পক্ষেও খুব উপযোগী। মধুকে নানারকম রোগের ওষুধ হিসাবেও ব্যবহার করা হয়।

মৌমাছিরা অপূর্ব দক্ষতা, বুদ্ধি, কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা মধু উৎপন্ন করে। মৌমাছিদের সংঘবদ্ধ ও সুশৃংখল জীবনযাত্রাপ্রণালী বেশ চমকপ্রদ। প্রাণী-বিজ্ঞানী কার্ল ফন্ ফ্রিস (Karl Von Frish) 1921 সাল থেকে 1973 সাল পর্যন্ত মৌমাছিদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। এই কাজের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। তাঁর গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত থেকে আমরা মৌমাছির অনুভূতি ছাড়াও তাদের নিজস্ব ভাষা সম্বন্ধে নানারকম বিস্ময়কর তথ্য জানতে পারি।

মৌচাকের কুঠুরীগুলি প্রত্যেকটি ছয় কোণবিশিষ্ট এবং নির্দিষ্ট আকারের। কুঠুরীগুলি

---

*মা ঠপাড়া, কুঞ্জনিবাস, ইছাপুর, 24 পরগণা

তিন রকম মাপের—শ্রমিক মৌমাছিদের কুঠুরী, পুরুষ মৌমাছিদের কুঠুরী এবং রাণী মৌমাছিদের সবচেয়ে বড় কুঠুরী। মৌচাক তৈরির সময় প্রতি ক্ষেত্রেই এরা শুঁড়-এর স্পর্শ দ্বারা কুঠুরীর পরিমাপ ঠিক করে। আবার রাণী মৌমাছিও ডিম পাড়বার সময় তার শুঁড় অথবা উদরের কোন অংশের দ্বারা স্পর্শ করে দুই কুঠুরীর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। মৌমাছিদের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়—মৌচাক।

মৌমাছির শ্রবণশক্তি আছে, দেখা গেছে যদি রাণী মৌমাছিকে মৌচাক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তবে রাণীর পরিচারিকা শ্রমিক মৌমাছিরা বিশেষ একপ্রকার শব্দ করে বিলাপ করতে থাকে। অন্য মৌমাছিরাও তখন রাণীর অনুপস্থিতিতে বিলাপ করতে আরম্ভ করে এবং মৌচাকের মধ্যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই শব্দের কম্পন ধরা পড়ে মাছির পায়ের আবরণে, তাছাড়া অন্য কোন প্রকার শ্রবণেন্দ্রিয় এদের নেই। কখনও অপরিচিত অথবা শত্রুভাবাপন্ন কোন মৌমাছি মৌচাকে প্রবেশের চেষ্টা করলে পাহারাদার শ্রমিক মৌমাছিরা প্রবেশপথেই এদের বাধা দেয় এবং প্রতি এক বা দুই মিনিট অন্তর সতর্কতামূলক অথবা বিপদসূচক শব্দ করে। মৌচাকের ভিতরের অন্য মৌমাছিরাও তখন সতর্ক হয় এবং বিপদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়। বিপদের সম্ভাবনা দূর হয়ে গেলে শ্রমিক মৌমাছিরা বিপদমুক্তির শব্দ করে। তখন সকলের সতর্কভাব চলে যায়।

মৌমাছিরা সহজেই মিষ্টি স্বাদ বুঝতে পারে। ধরা যাক কোন মৌমাছিকে নিয়মিত একপাত্র চিনির দ্রবণে আকৃষ্ট করে অভ্যাসে পরিণত করা হলো। কিছুদিন পর সেই পাত্রে চিনির দ্রবণের পরিবর্তে লবণের দ্রবণ দিলে দেখা যাবে যে মৌমাছিটি পাত্রের উপরে বসলেও দ্রবণ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে সরে যাচ্ছে। এরা শুঁড় ও মুখের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করে। কেবলমাত্র প্রকৃতিজাত মিষ্টিদ্রব্য যেমন—চিনি, ফুলের মধু ইত্যাদি এদের কাছে মিষ্টি লাগে, অপরপক্ষে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত মিষ্টি যেমন—স্যাকারিন এদের কাছে স্বাদহীন। মানুষের মুখে মিষ্টি লাগে এরকম মোটামুটি চৌত্রিশ রকমের জিনিষের মধ্যে মাত্র নয়টি এদের কাছে মিষ্টি লাগে।

মৌমাছিদের মধ্যে তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তিও পরিলক্ষিত হয়। মৌচাকের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে যা অন্য মৌচাকের গন্ধ থেকে আলাদা এবং এই গন্ধই একটি মৌচাকের সব মৌমাছিদের সংঘবদ্ধভাবে থাকতে সাহায্য করে। রাণী মৌমাছির মুখের গ্রন্থি থেকে একপ্রকার রস বের হয় এবং এই রস রাণীর পরিচারিকা শ্রমিক মৌমাছিদের মুখ থেকে অন্য শ্রমিক মৌমাছিদের মুখে যায়, তার মুখ থেকে আবার আর একজনের মুখে যায়। এইভাবে সবার মুখে মুখে এই রস ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে প্রতিটি মৌমাছিই এই গন্ধের সঙ্গে পরিচিত থাকে। এই জন্যই রাণী মৌমাছিকে সরিয়ে দিলেই এরা বুঝতে পারে। পাহারাদার শ্রমিক মৌমাছিরা মৌচাকের প্রবেশপথে প্রতিটি মৌমাছিকে শুঁড় দ্বারা সনাক্তকরণের পর প্রবেশ করতে অনুমতি দেয় অপরপক্ষে অপরিচিত মৌমাছিকে তাড়িয়ে দেয়। মৌচাকের ভিতরের কাজ ছাড়া খাদ্যসংগ্রহের ব্যাপারেও ঘ্রাণশক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোন মৌমাছি কোথাও কোন খাদ্যের উৎসের সন্ধান পায় সে তার বিশেষ প্রকারের গন্ধের দ্বারা সংকেত পাঠায়। এই গন্ধ অন্য মৌচাকের মৌমাছি অপেক্ষা নিজের চাকের মৌমাছিদের বেশি আকৃষ্ট করে।

আবার কখনও মৌমাছিরা রাস্তা হারিয়ে ফেললে যদি কোনক্রমে একটি মৌমাছিও রাস্তা চিনে ফিরে আসতে পারে সে তখন মৌচাকের সামনে এসে থেমে যায় এবং তার শরীর ও ডানা আন্দোলিত করে গন্ধকে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়, যার সংকেত পেয়ে দলের অন্যান্যরাও তাদের পথ খুঁজে পায়।

মৌমাছিদের চোখে ছয়টি বিশেষ রং ধরা পড়ে, অতিবেগুনি (ultra violet), নীলাভ সবুজ (bluish green), বেগুনি (violet), হলুদ (yellow), নীল (blue) এবং আর একটি বিশেষ ধরণের রং যা শুধু মৌমাছিদের দৃষ্টিতেই লাল দেখায় (bees' purple)। অন্যান্য সমস্ত রং-এর ফুল মৌমাছিদের চোখে কালো দেখায় কিন্তু এদের পাপড়ি থেকে বিচ্ছুরিত অতিবেগুনি রশ্মি অথবা পাপড়ির বিশেষ আকার মৌমাছিদের আকৃষ্ট করে। এই ছয়টি রং-এর মধ্যে মৌমাছির ক্ষেত্রে মৌলিক রং প্রধানতঃ তিনটি, অতিবেগুনি, হলুদ এবং নীল। মানুষের চোখে এই রং যথাক্রমে নীলাভ বেগুনি (blue violet), লাল (red) এবং সবুজ (green) [চিত্র-1]। বাকী তিনটি রং এই রং-এর মিশ্রিত অবস্থা।
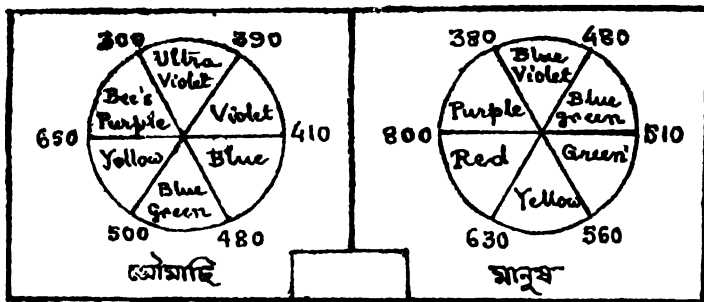
চিত্র—1. মানুষের চোখে এবং মৌমাছির চোখে রঙীন বৃত্তের পার্থক্য। সংখ্যাগুলির দ্বারা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে মিলিমাইক্রনরূপে প্রকাশ করা হয়েছে এবং দুটি বৃত্তের মাধ্যমে তুলনামূলক ভাবে দেখানো হয়েছে।

মৌচাকের ভিতর বাতানুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতেও মৌমাছিদের অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। মৌচাকের ভিতরের তাপমাত্রা সাধারণতঃ $34{\cdot}5^0C$ থেকে $35{\cdot}5^0C$-এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বাতাসের আর্দ্রতা ও বিশুদ্ধতার দিকেও এদের বেশ সজাগ দৃষ্টি। গরমকালে যখন তাপমাত্রা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে তখন বেশির ভাগ শ্রমিক মৌমাছিরাই কুঠুরীর বাইরে চলে আসে যাতে তাদের শরীরের উত্তাপে মৌচাকের ভিতরের উত্তাপ আরও না বাড়তে পারে। কিছু শ্রমিক মৌমাছি কুঠুরীগুলির উপর ডানা দিয়ে বাতাস করতে থাকে যার ফলে বাষ্পীকরণ খুব তাড়াতাড়ি হয় এবং কুঠুরীগুলিও ঠাণ্ডা হয়। তাছাড়াও ভিতরের গরম বাতাস বাইরে আসে এবং ঠাণ্ডা বিশুদ্ধ বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে। কিছু শ্রমিক মৌমাছি মুখে করে জল এনে কুঠুরীগুলির উপর ছড়িয়ে দেয়। আবার ঠাণ্ডার সময় যখন মৌচাকের তাপমাত্রা ক্রমশঃ নীচের দিকে নামতে থাকে তখন সমস্ত শ্রমিক মৌমাছিরা কুঠুরীর উপর জড়ো হয়ে ও খুব ছোটাছুটি করে শরীরের তাপ বাড়াতে

থাকে, মৌচাকের নির্দিষ্ট তাপমাত্রাও বজায় থাকে। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার, যার সঠিক কারণ এখনও জানা যায় নি—তা হলো কি ভাবে মৌমাছিরা বুঝতে পারে, ঠিক কোন্ সময় তাপমাত্রা কমানো অথবা বাড়ানো শুরু করতে হবে।

মৌমাছিরা যে উপায়ে কথাবার্তা বলে অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করে সেটা এক মজার ব্যাপার। খাদ্য-সংগ্রহকারী মৌমাছিরা, খাদ্যের সন্ধান পাওয়ার পর তার মৌচাকের সাথীদের খাদ্যের পরিমাণ, প্রকৃতি, দূরত্ব, দিক প্রভৃতির বিশদ বিবরণ দেওয়ার জন্য, মৌচাকের উপর দু-প্রকারের নৃত্য প্রদর্শন করে, [চিত্র-2] বৃত্তাকার নাচ (round dance) এবং
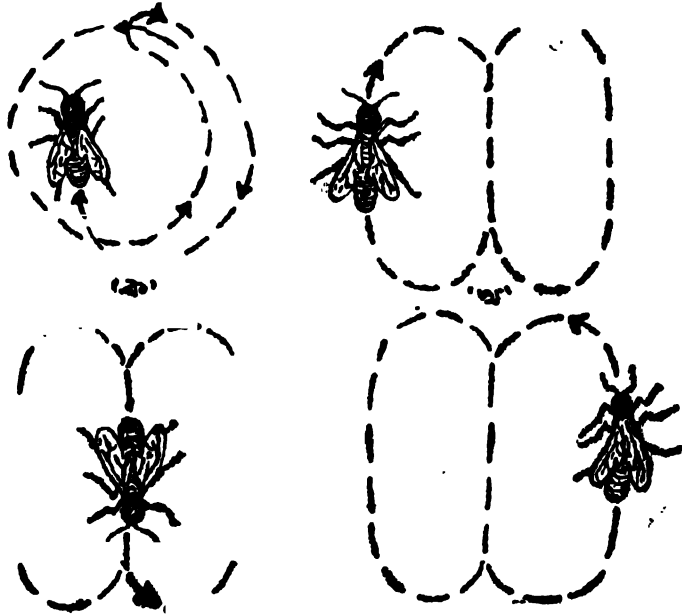
চিত্র—2. নৃত্যরত মৌমাছিদের নৃত্যপথ দেখানো হয়েছে। ক-বৃত্তাকার নাচ, খ, গ, ঘ দেহপ্রান্ত আন্দোলিত নাচ।

দেহপ্রান্ত আন্দোলিত নাচ (tail wagging dance)। প্রথম প্রকারের নৃত্য বৃত্তাকার পথে করতে থাকে যার অর্থ মৌচাকের 50 মাইলের মধ্যে খাদ্যবস্তু অবস্থিত। দ্বিতীয় প্রকারের নৃত্যের দ্বারা খাদ্যবস্তুর দূরত্ব বোঝায় 100 মাইল অথবা আরও বেশি। এই নৃত্যের পথ বাংলা '4' অক্ষরের মত এবং এই সময় মৌমাছি তার উদরকে দু-পাশে নাড়াতে থাকে। আরও লক্ষ্য করা যায় খাদ্যবস্তুর অবস্থানের দিক নির্দেশের জন্য মৌমাছিরা যেখানে নৃত্য করে, সেই স্থান, খাদ্যবস্তু ও সূর্যের মধ্যে একটি কোণের সৃষ্টি করে। সূর্যের অবস্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই কোণেরও পরিবর্তন হয় [চিত্র-3]। অন্যান্য মৌমাছিরা নৃত্যরত মৌমাছিটির সংগে বেশ কিছুক্ষণ নাচতে নাচতে নাচের প্রকৃতি এবং ডানা ও উদর কম্পনের গতির সম্বন্ধে ধারণা

করে নেয়। তারপর নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এই ব্যাপারে তারা গন্ধ ও শব্দের সংকেতকেও কাজে লাগায়।
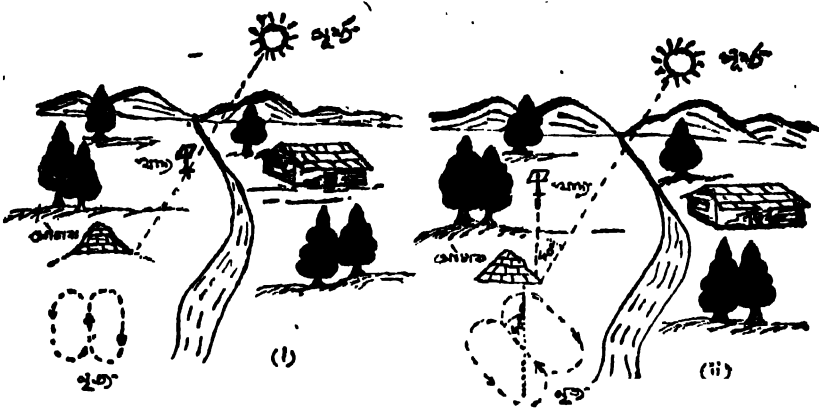
চিত্র-3. সূর্যের অবস্থান অনুসারে মৌমাছি খাদ্যের দিক নির্দেশের জন্য একটি কোণের সৃষ্টি করে।

সময় সম্বন্ধেও মৌমাছিদের অদ্ভুত জ্ঞান-এর পরিচয় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানী এ. ফোরাল [A. Foral (1908)] পরীক্ষার দ্বারা দেখান যে মৌমাছিরা, সকালে ও বিকালে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যখন জ্যামের শিশি খোলা হয়, খাবার টেবিলে এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু কখনই তাদের দুপুরে অথবা রাত্রিতে দেখা যায় না। আবার বিভিন্ন ফুল ফোটার বিভিন্ন সময়ে সেই ফুলের বাগানে উপস্থিত হয়। দিন ও রাত্রিতে সময়ের পার্থক্য ক্ষুদ্র পতঙ্গ মৌমাছি কি ভাবে বুঝতে পারে সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের সীমা নেই। দিনের বেলা সূর্য ও রাত্রিবেলা নক্ষত্রের সাহায্যে এদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পথে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে ও শৃঙ্খলাবদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে বাস করে।

বিজ্ঞানীরা এই অদৃশ্য ইন্দ্রিয়—যার দ্বারা মৌমাছিরা তাদের প্রাত্যহিক, মাসিক ও বাৎসরিক জীবনচক্র সমাপ্ত করে—তাকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও বলেন।

চোখের অচ্ছোদপটলের (cornea) অসম বক্রতার জন্য চোখের দীর্ঘদৃষ্টি, স্বল্পদৃষ্টি বা বিষমদৃষ্টির (astigmatism) ত্রুটি দেখা দেয়। এজন্য মানুষকে সারাজীবন চোখে চশমা লাগিয়ে কাটাতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় চক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি একটি আশার কথা শুনিয়েছেন। তাঁরা এমন বিশেষ ধরণের শক্ত কনট্যাক্ট (contact) লেন্স প্রস্তুত করেছেন বলে দাবী করেছেন, যা কিছুদিন ব্যবহার করবার পর অচ্ছোদপটলের বক্রতাজনিত ত্রুটি দূর হয়ে যায়। ফলে, চশমা ব্যবহারের প্রয়োজন আর থাকবে না। তাঁরা শতকরা আশিটি রোগীর ক্ষেত্রে এই লেন্স ব্যবহার করে আশানুরূপ ফল পেয়েছেন বলে দাবী করেছেন।

ওদের কাছে

সুব্রত সরকার*

দীর্ঘ বালুরাশির ওপর আছড়ে পড়ছে ফেনিল তরঙ্গমালা। ভূমধ্য সাগর—অনেক স্মৃতি নিয়ে আজও সে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে তার চারিধারের বিখ্যাত দেশগুলির বুকে। আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে ওর চারপাশে যে বিশাল সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তার স্মৃতি আজও ওর মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সেই বিশাল সভ্যতার যুগে মানুষ তাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে কতকগুলি জিনিসের ব্যবহার লক্ষ্য করল। আর হঠাৎই যেন আরও কতকগুলি নতুন জিনিস আবিষ্কার করে ফেলল। আজকে তোমরা যাকে মৌল বলছ,—ওদের লক্ষ্য-করা সেই বহুলব্যবহৃত জিনিসগুলি সেই মৌল বা মৌলিক পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ওরা তখন তো এইসব জানত না। তবে এই জিনিসগুলি সম্বন্ধে ওরা বিশেষ দুটি ধর্ম পেয়েছিল—(1) এরা প্রাণহীন অর্থাৎ জড়, (2) এরা অপরিবর্তিতভাবে বহুকাল থাকতে পারে এবং আকারগত দিক দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য।

যদিও তখন এদের মৌল বলে চিহ্নিত করা যায় নি, তবুও তাদের মৌল বলে উল্লেখ করে বলতে পারি যে, 9টি পদার্থকে তারা ঐ বিশেষ ধর্ম দুটি পালন করতে দেখেছে, এগুলি হলো, সোনা, রুপা, তামা, টিন, সীসা, লোহা, পারদ, কার্বন ও সালফার। এগুলি লিখিত সময়-তালিকার বহু আগেই আবিষ্কৃত বলে 'প্রাগৈতিহাসিক মৌল' বলতে পারি। এই 9টি মাত্র মৌলই 1000 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জ্ঞাত ছিল।

এই সকল মৌলগুলি সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি, প্রধানতঃ রোমান সম্রাটের নৌসেনাধ্যক্ষ Gajus Plinius Secundus-এর অসামান্য পরিশ্রমের ফলে। তাঁর বিখ্যাত বইটির নাম 'Natural History', এটি সমাপ্ত হয় 77 খৃষ্টাব্দে। তাঁকে সাধারণতঃ 'বড় প্লিনি' বলা হয়। তিনি কিন্তু আজকের দৃষ্টিভঙ্গীতে সেদিনের ঐ মৌলগুলিকে দেখেন নি। যেমন কার্বনের বহুরূপ 'চারকোল', 'হীরা', আর 'ভুসাকালি'-কে তিনি পৃথক পৃথক পদার্থ ভেবেছিলেন। তবে চারকোল প্রস্তুতির যে প্রণালীর তিনি বর্ণনা দিয়েছেন—কিছুদিন আগেও ঐ ভাবেই চারকোল তৈরি করা হতো।

এবার তাহলে চলো, আমরা সেই প্রাগৈতিহাসিক নয়টি মৌলের বাড়ীতে গিয়ে তাদের কিছু অজানা পুরানো খবর নিয়ে আসি। প্রথমে 'সোনার' কাছেই যাই, কি বলো।

ব্যক্তিগত জীবনে সকলে, বিশেষত: মেয়েরা বোধ হয় সবচেয়ে ভালবাসে সোনাকে। সোনা, রাজাসোনা, সোনামণি কত আদরের নাম। এত আদরের কারণ কি? শুধু কি ঔজ্জ্বল্য?

---

*248, শরৎ চ্যাটার্জী রোড, শিবপুর, হাওড়া-711102

সোনাকে সহজেই নানা আকার দেওয়া যায়। আংটি আর দুল হিসাবে সোনার ব্যবহারের উল্লেখ আছে বাইবেলে, এমন কি মহাভারতেও। পরে রাজার মুকুটে সোনা স্থান পেল। কিন্তু আসল সোনার মুকুট এতভারী হতো যে প্রায়শঃই পরা যেত না। সোনার ভার কমাতে তাই মুকুটে কিছু অংশ দখল করল মণিমুক্তা। বৃটেনে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল। এক পাউণ্ড ওজনের মুদ্রাকে বলা হতো shiner ; তবে সোনা বা গোল্ড শব্দটা এসেছে সংস্কৃত 'হরি' শব্দ থেকে, যার অর্থ হলুদ ও উজ্জ্বল। প্লিনি লিখেছেন, "যাঁরা সোনাকে আকাশের তারার সঙ্গে তুলনা করেন, তাঁরা ভুল করেন……সোনাই একমাত্র পদার্থ যা ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে, চিতায় বা যুদ্ধে কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। প্লিনি জানতেন যে নদীর তীরে প্রায়শঃই স্বর্ণকণা দেখা যায়। তিনি স্পেনের টেগাস, ইটালীর Padus, থ্রেসিয়ার হেব্রাস, এশিয়ার প্যাক্টোলাস নদীর উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে এখনো সোনার খোঁজে আদিবাসীরা দলে দলে থালি হাতে ঘুরে বেড়ায়। প্লিনি জার্মানীর রাইন নদীর উল্লেখ করেন নি। রাইনের বেলাভূমি থেকে এত সোনা পাওয়া যেত যে. তা দিয়ে মুদ্রা নির্মিত হতো। ল্যাতিন গ্রন্থে আছে -"Sic fulgent littoræ Rheni"— "রাইনের তীর এত স্বর্ণময়।"

তখন স্পেনে ও অন্যান্য দেশে কিছু সোনার খনিও ছিল। প্লিনি এ সম্বন্ধে "auripigmentum" বা 'স্বর্ণবর্ণ' নামে একটি কৌতূহলোদ্দীপক রচনা লেখেন। অবশ্য পরে জানা যায় যে auripigmentum প্রকৃতপক্ষে সোনাও নয়, সালফার ও আর্সেনিকের মিশ্রণ। পদার্থটি সোনা পাগল রাজা ক্যালিগুলার খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

সোনার পরেই প্রাচীন যুগের লোকেদের প্রিয় ছিল সম্ভবতঃ রুপা। প্লিনি জানতেন যে সোনার সঙ্গে সহজেই রুপা মিশে গিয়ে মানুষকে ঠকাতে পারে। সোনারুপার এই প্রাকৃতিক সংকরকে গ্রীকেরা বলত "ইলেকট্রন"—শব্দটা এসেছে 'ইলেকটোর' থেকে। যার মানে 'সূর্যের চোখ ঝলসানো আলোক।' গ্রীক ইলেকট্রন ল্যাটিন ভাষায় হয়েছে 'ইলেকট্রাম'। প্লিনি বলেছেন— "কৃত্রিম আলোয় ইলেকট্রাম রুপার চেয়ে শত গুণ উজ্জ্বল। বাস্তব সুবিধা হলো যে সোনার চেয়ে রুপার রোধ বেশি। রামধনুর মত বর্ণচ্ছটা সৃষ্টি করতে পারে। রুপা মৌল অবস্থায় বিরল। খৃঃপূঃ 1780 থেকে খৃঃ পূঃ 1580 অর্থাৎ রাজা হিক্সসের সময় মিশরীয়রা রুপার ব্যবহার জানত, এশিয়ার সঙ্গে ব্যবসার সময় রুপা ব্যবহার করতো। সেই সময় মিশরে রুপা সোনার চেয়ে দ্বিগুণ মূল্যবান ছিল।

খৃঃ পূঃ 1500-তে প্যালেস্টাইনে রুপার প্রাচুর্য ছিল। তখন অধিকাংশ রুপাই ছিল হুড়কো বা গোঁজের আকৃতিবিশিষ্ট। তবে ঐ সময় সর্বাধিক রুপা উৎপন্নকারী দেশ ছিল স্পেন। স্পেনীয় উপনিবেশগুলিতে প্রচুর রুপা উৎপন্ন হতো। গল্প আছে যে, "এক গ্রীক নাবিক একবার স্পেনে গিয়েছিল। যখন সে ফিরল তখন রুপার নোঙর দিয়ে তীরে জাহাজ বেঁধেছিল।"

শোনা যায় স্পেনে রোমের প্রাদেশিক শাসনকর্তা কর্নেল ট্যানটালাস্ (প্রায় খৃঃ পূঃ 200) দেশে ফেরার সময় 43 হাজার পাউণ্ড রুপা এনেছিলেন। প্লিনির রচনাগুলি থেকে আমরা এই

সিম্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে তখন যে সব কাজে র‍ুপা ব্যবহার করা হতো, এখনও সেইসব কাজেই ব্যবহার করা হয়। রোমানগণ র‍ুপাকে বলত argentum ; গ্রীক argyros থেকে এসেছে। আবার argyros শব্দটা এসেছে argos থেকে যার মানে 'সাদা'।

এবার আসা যাক তামার কথায়। সম্ভবত সোনার চেয়েও তামা বয়সে বড়। সাধারণত আকরিক অবস্থায় পাওয়া যায়। প‍ৃথিবীতে সবচেয়ে বড় তামা পাওয়া যায় Minnesota-তে। 45 ফুট লম্বা, 22 ফুট চওড়া আর মাঝামাঝি অংশের প‍ুর‍ুত্ব 8 ফুট। (C.G.S. পন্ধতিতে 13 মি. 71·6 সে. মি, 6 মি. 70·5 সে. মি. ও 2 মি 44 সে মি.)। এটি আবিষ্কৃত হয় 1857 খ‍ৃঃ।

প্রাচীন য‍ুগের মান‍ুষ তামার প্রতি এত আক‍ৃষ্ট হয়েছিল, তার প্রথম কারণ এর রং আর দ্বিতীয় কারণ হলো পাথর দিয়ে পিটিয়ে তামাকে সহজেই নানারকম আকার দেওয়া যেত। শিল্পকাররা যতদিন পর্যন্ত এর প্রসারণ-ক্ষমতা আবিষ্কার করতে পারেন নি ততদিন পর্যন্ত তামার তার তৈরি করা যায় নি। 4000 খ‍ৃঃ-প‍ূর্বাব্দে মিশরই সর্বপ্রথম তামার বাসনপত্রাদির প্রচলন করে। তারপরেই সম্ভবত: স্যমারিয়ানরা এ বিষয়ে অগ্রসর হয় (আন‍ু. 3000 খ‍ৃঃ প‍ূঃ)।

প্লিনির সময় খাঁটি তামাকে পিটনো বা শক্ত করার পরও যথেষ্ট নরম থাকতো। প্লিনি যে কেন এর নাম দিয়েছিলেন 'aes' তা জানা যায় না। ইংরেজী ভাষাবিদ‍্গণ 'aes'-কে brass বা পিতল বললেন। কিন্তু তাঁদের ধারণার পক্ষে স‍ুদ‍ৃঢ় কোন য‍ুক্তি ছিল না। তবে ঐ সময় লোকে জেনেছিল যে তামার সঙ্গে যদি গলিত অবস্থায় টিন যোগ করা যায় (বর্তমানে যাকে সংকর পদার্থ বলে) তবে উৎপাদিত পদার্থটি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়। সে সময় তামার প্রধান উৎপন্নস্থল ছিল ইংল্যাণ্ডের কর্ণওয়াল।

কল্পিত আছে যে প্রাচীন শিল্পীরা নাকি সংকর না করেও শক্ত তামা তৈরি করতে জানত। হয়তো বা তাদের ওই আবিষ্কার আকস্মিক। পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে হাঙ্গেরীর প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রে তামার সঙ্গে 3% অ্যান্টিমনি, মিশরীয় বাসনপত্রে 3-4% অ্যার্সেনিক ও জার্মানীর কিছ‍ু প্রাচীন তামার বাসনে 4% নিকেল মেশানো ছিল। কি আশ্চর্য ব্যাপার বলতো কতকাল আগের এসব নিয়ে কিরকম গবেষণা হতো। সীসা, লোহা, আর গন্ধকের সঙ্গে পরিচয় বাকী রইল, ভবিষ্যতে হবে।

প্লেটো

নন্দলাল মাইতি*

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে প্লেটোর অবদান কম নয়। নানা বিষয়ের উপর তাঁর লেখা প্রায়ই উদ্ধৃত হয়ে থাকে। কিন্তু যে বিষয়টির জন্য তিনি সর্বাধিক পরিচিত, তা হচ্ছে দর্শন। দর্শন শাস্ত্রে এমন সুগভীর পাণ্ডিত্য মানব-মনীষার ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু প্লেটো একজন বিখ্যাত গাণিতবিদ্ ছিলেন বললে অনেকেই আশ্চর্য হবেন। আমরা এখানে তাঁর গাণিতিক-প্রতিভার দিকটি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

প্রাচীনকালে গ্রীসের এথেন্স জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্যে বিখ্যাত ছিল। এই মহান নগরীতেই প্লেটো 429 খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী প্লেটো নানা বিষয়ে শিক্ষার জন্য অনেক দেশ পরিভ্রমণ করেন। তখনকার দিনে সভ্য ও উন্নত দেশগুলি পরিভ্রমণ করে তিনি অনেক জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং নানা বিষয় শিক্ষালাভ করেন; যেমন,—সাইরেনে তিনি থিওডোরাস নামে এক বিখ্যাত গণিতবিদের গণিত অধ্যয়ন করেন, সিসিলিতে তিনি পীথাগোরীয় সম্প্রদায় এবং ঐ গোষ্ঠীর দর্শন ও গণিতের সঙ্গে পরিচিত হন। টরেন্টাসের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আর্কিটাস ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দীর্ঘদিন নানা দেশ ভ্রমণ করে ও নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করে চল্লিশ বছর বয়সে এথেন্সে ফিরে এসে তিনি একটি বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। গ্রীক ভাষায় এই বিদ্যাপীঠের নাম 'অ্যাকাডেমিয়া'। এখানেই তিনি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও নানা বিষয় রচনার কাজে কাটান। অবশেষে 348 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

পাটীগণিত ও জ্যামিতিতে ছিল প্লেটোর অসীম আগ্রহ। এই দুটি বিষয়ের সঙ্গে দর্শনের একটি সংযোগ-সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা তিনি করেছিলেন। প্রায় দু-হাজার বছর পরে ফরাসী গাণিতবিদ্ ও দার্শনিক রেনে দেকার্তে এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলেন।

প্লেটোর প্রতিভারও সম্যক বিকাশ হয়েছে দর্শনের মধ্যে। দার্শনিক চিন্তার অনলস প্রচেষ্টা হচ্ছে সত্যানুসন্ধান। তবু প্লেটো মনে করতেন বিশ্বের রহস্যের চাবিকাঠি আছে পাটীগণিত ও জ্যামিতির মধ্যে। সত্যসন্ধী প্লেটো তাই পাটীগণিতের প্রক্রিয়াগুলির প্রতি মোটেই আগ্রহী ছিলেন না,—তিনি পাটীগাণিতিক-চিন্তনের দিকটির প্রতি ছিলেন সবিশেষ আগ্রহী। কারণ, বিশুদ্ধ সংখ্যা সম্বন্ধে যুক্তি-তর্কের অবতারণা এই শাস্ত্রের অন্যতম ফল। তাঁর বিখ্যাত 'রিপাবলিক' গ্রন্থে আছে:
"Arithmetic has a very great and elevating effect, compelling the mind to reason about abstract number.†

---

*পোঃ—ঠাকুরাণীচক, ভায়া গোরহাটি, মেদিনীপুর

†History of Mathematics—Vol. I—D.E. Smith.

পীথাগোরীয় সম্প্রদায়ের কাছে সংখ্যা বস্তু-নিরপেক্ষ ছিল না। প্রতীটি সংখ্যার তাঁরা রহস্য আরোপ করতেন। প্লেটোও এই সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সংখ্যার এই রহস্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি কিছু কিছু রহস্যময় সংখ্যার কথা বলতেন। কিন্তু তিনি সেই সংখ্যার কথা কোথাও উল্লেখ করেন নি। বর্তমানে 60^4 বা 12,960,000 সংখ্যাটিকে "প্লেটোনীয়-সংখ্যা" বলা হয়। প্লেটো-সংখ্যা-বিজ্ঞানের প্রভূত প্রশংসা করে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেমন করে এ-বিষয়ে তাঁর অ্যাকাডেমিয়া-তে শিক্ষাদান করা হতো—সে-বিষয়ে কিছু জানতে পারা যায় না।

ঈশ্বরের প্রধান কাজ কি? এই প্রশ্নে প্লেটো বলতেন, "তিনি অবিরাম জ্যামিতিক রূপ দিয়ে চলেছেন।" তাঁর অ্যাকডেমিয়ার তোরণ-দ্বারের উপরে লেখা ছিল, "জ্যামিতিতে অজ্ঞ ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ।" এই দুটি উদ্ধৃতি থেকেই বুঝতে পারা যায় প্লেটোর জ্যামিতি সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল। তিনি মনে করতেন, জ্যামিতি মনকে সঠিক ও সতেজ চিন্তনে উদ্বুদ্ধ করে। বিশুদ্ধ চিন্তনে জ্যামিতিক যুক্তি-তর্কের মূল্য অপরিসীম।

প্রকৃতপক্ষে, গণিতে প্লেটোর তেমন বিস্ময়কর কোন অবদান নেই। কিন্তু তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় সঠিক সংজ্ঞা, স্বচ্ছ অনুমান ও যুক্তি-তর্কের সাহায্যে প্রমাণের অবতারণা করেন। তিনিই প্রথম জ্যামিতিতে 'বিন্দু,' 'রেখা,' 'তল,' 'ঘন' প্রভৃতির সংজ্ঞা নিরূপণ করেন। "পিথাগোরীয়রা বিন্দুকে 'অবস্থানের একক' (unity of position) বলে মনে করত; প্লেটো বলেন, বিন্দুতে রেখার আরম্ভ, বিন্দু বাস্তব-নিরপেক্ষ একটি অদৃশ্য রেখা, সেই রেখা হলো প্রস্থহীন দৈর্ঘ্য।"* ইউক্লিডের 'এলিমেণ্টস' গ্রন্থে যে-সব সংজ্ঞা আছে, সে সব এই বিদ্যাপীঠের গণিতজ্ঞদের অবদান বলে মনে করা হয়। "সমান জিনিস থেকে সমান জিনিস বাদ দিলে সমান জিনিস অবশিষ্ট থাকে"—এই স্বতঃসিদ্ধটি কিন্তু ইউক্লিডের আবিষ্কার নয়, এটি প্রকৃতপক্ষে প্লেটোর আবিষ্কার।

প্লেটোর অনেক মতবাদ বিজ্ঞানে প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে। আবার কিছু কিছু মতবাদ উন্নতিতেও সাহায্য করেছে। গণিতে বিশ্লেষণ পদ্ধতির আবিষ্কার প্লোটোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। গণিতে আমরা অনেক সময় এই পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকি।

প্লেটো ঘনবস্তুর চিত্রাঙ্কনে এক নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেন। ফলে এই বিদ্যাপীঠের এক ছাত্র মেনেকমাস 'অধিবৃত্ত,' 'পরাবৃত্ত' ও 'উপবৃত্ত' আবিষ্কার করেন। জ্যামিতির এক নবতম শাখার জন্ম হয়। কিন্তু পরবর্তীকালের গণিতজ্ঞরা এ-বিষয়ে উদাসীন ছিলেন বলে এ-শাখার উন্নতি বহুদিন ব্যাহত ছিল। প্লেটো দার্শনিক নিঃসন্দেহে, কিন্তু তিনি গণিতজ্ঞও।

---

*বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—সমরেন্দ্রনাথ সেন।

ভেবে কর

প্রদীপকুমার দত্ত*

প্রশ্ন : 1. আটটি বল আছে যেগুলি দেখতে অবিকল এক। এদের সাতটির ওজন পরস্পর সমান ও একটির ওজন অপর সাতটির থেকে পৃথক (বেশি বা কম)। কোন সাধারণ তুলাযন্ত্র দ্বারা মাত্র তিনবার ওজন করে কিভাবে কম বা বেশী ওজনের বলটিকে সনাক্ত করবে এবং তার ওজন বেশি বা কম নির্ণয় করবে ?

2. চিত্র-1 ও চিত্র-2-এর মধ্যে কোনটিকে কোন সমতলে এমনভাবে আঁকা যাবে যাতে কোন
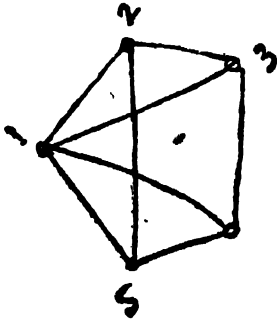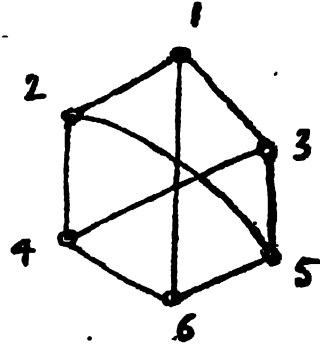
চিত্র 1 চিত্র 2

রেখা পরস্পর ছেদ না করে এবং কেবলমাত্র শীর্ষবিন্দুতে মিলিত হয় ?

3. চিত্র-3 এ 8 টি শীর্ষবিন্দু মোট 16টি রেখাদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। যদি 1নং শীর্ষবিন্দু ও তার উপর আপতিত রেখাগুলিকে মুছে দেওয়া হয় তবে চিত্রটি দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। কিংবা যদি শীর্ষবিন্দু 1-এর সঙ্গে 2, 3, 4নং শীর্ষবিন্দু তিনটির সংযোগকারী রেখা তিনটিকে মুছে দেওয়া হয় তাহলেও চিত্রটি দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। রেখা 16টির দ্বারা শীর্ষবিন্দুগুলিকে কিভাবে সংযুক্ত করলে চিত্রটি এমন হবে যাতে চিত্র থেকে তিনটি শীর্ষবিন্দু কিংবা তিনটি রেখা মুছে দিলেও চিত্রটি সংযুক্তই থাকবে অর্থাৎ চিত্রটি দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যাবে না ?
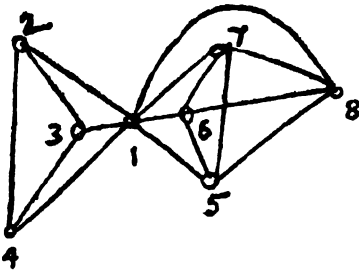
চিত্র 3

উত্তর : 1. বলগুলিকে সমান দুটি ভাগে (A ও B) ভাগ করা হলো। ফলে প্রতিভাগেই 4টি করে বল রয়েছে। কোন একটি ভাগের (ধরা যাক A) যে কোন দুটি বলকে তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় ও অপর বল দুটিকে অপর পাল্লায় রেখে ওজন করা হলো। যদি অসমান ওজনের বলটি এই ভাগে থাকে তবে এই ওজনের সাহায্যে তা বোঝা যাবে। যদি দুটি বলের ওজন অপর দুটি বলের ওজনের সমান হয় তবে বলটি অপর ভাগে (অর্থাৎ B) রয়েছে। সুতরাং প্রথমবার ওজনে কোন্ চারটি বল সমান ওজনের তা জানা যাবে। এবার দুটি ভাগ থেকে তিনটি করে বল নিয়ে তুলাদণ্ডের দুটি পাল্লাতে চাপিয়ে

* ইন্সটিটিউট অফ্ রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, 92, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-9

পুনরায় ওজন করা হলো। যদি ওজন সমান হয় তবে B-এর অবশিষ্ট বলটি অসমান ওজনের। এবার অন্য যে কোন একটি বল তুলাযন্ত্রের এক পাল্লায় ও এই বলটি অপর পাল্লায় রেখে ওজন করলেই বলটির ওজন অন্যগুলির অপেক্ষা বেশি বা কম জানা যাবে। যদি দ্বিতীয় বারের ওজন সমান না হয় তাহলে বোঝা যাবে কোন্ বল তিনটির মধ্যে অসমান ওজনের বলটি রয়েছে এবং তার ওজন বেশি না কম, কারণ কোন্ তিনটি বলের ওজন সমান তা প্রথমবারের ওজনে জানা গেছে। এবার এই বল তিনটির মধ্যে যে কোন দুটিকে তুলাদণ্ডের দু-পাল্লায় চাপিয়ে ওজন করলে যদি ওজন সমান হয় তবে তৃতীয় বলটি অসমান ওজনের। আর ওজন অসমান হলেও কোন্‌টি অসমান ওজনের তা বোঝা যাবে কারণ দ্বিতীয়বারের ওজনে জানা গেছে অসমান ওজনের বলটির ওজন বেশি না কম।

2. চিত্র-1 কে। শীর্ষবিন্দু 2 ও 5-এর সংযোগকারী রেখাটিকে ঘুরিয়ে আঁকলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। চিত্র-2-এর ক্ষেত্রে কোনভাবেই তা করা সম্ভব নয়।

3. চিত্র-4 দ্রষ্টব্য।
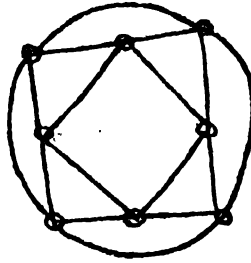
চিত্র

পরিষদ সংবাদ

রাজশেখর বসু স্মৃতি-বক্তৃতা

12ই মে '79 সত্যেন্দ্র ভবনে সপ্তদশ বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি-বক্তৃতা' প্রদান করেন অধ্যাপক তপেন রায়। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল "বর্তমান পরিস্থিতিতে শক্তির উৎস"। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। সভার শুরুতে পরিষদের কর্মসচিব অধ্যাপক রতনমোহন খাঁ সকলকে স্বাগত জানান। অধ্যাপক রায় তাঁর নিজের তৈরী বিভিন্ন মডেলের সাহায্যে বিজ্ঞানের নিরস জটিল বিষয়বস্তু সহজবোধ্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। সভার শেষে ধন্যবাদ প্রদান করেন পরিষদের কোষাধ্যক্ষ ডাঃ গুণধর বর্মন।

শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-বক্তৃতা

19শে মে '79 পঞ্চম বার্ষিক 'শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-বক্তৃতা' প্রদান করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল "মৃত্তিকা বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ।" সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। সভার শুরুতে পরিষদের কর্মসচিব অধ্যাপক রতনমোহন খাঁ সকলকে স্বাগত জানান। ডক্টর মুখার্জী স্লাইড সহযোগে তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। পরিষদের সভাপতির ভাষণের পর সেন্ট্রাল ইনল্যাণ্ড ফিসারীজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৎস্য চাষ বিষয়ে এবং বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ম "গাছের জীবন ও তার রাসায়নিক কার্যকলাপ" সম্পর্কে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন।

প্রকাশনা সচিব—রতনমোহন খাঁ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত
[illegible] 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা ; ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা। আজীবন সদস্য চাঁদা 200 টাকা। যদি কেউ পরপর পাঁচ বৎসর সাধারণ সদস্য থাকেন তবে তিনি 150 টাকা দিলে আজীবন সদস্য হতে পারবেন।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি "আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং"-এ 'ডাকযোগে' পাঠানো হয় ; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোস্ট অপিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয় ; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। টাকা, চেক ইত্যাদি কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে পাঠাবেন না। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করিবেন।
6. কলিকাতার বাইরের কোন চেক প্রেরণ করলে গ্রহণ করা হবে না।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্যবিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। কিশোর বিজ্ঞানীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা : প্রকাশনা সচিব, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23 রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন : 55-0660.
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন ; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক-মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রকাশনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে প্রকৃত জনকল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য পরিষদের বর্তমান
কর্মসমিতি একান্তই সচেষ্ট, সেই বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাকে সফল করতে
হলে সকলের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা চাই। এই উদ্দেশ্যে
পরিষদের সদস্যবৃন্দ, দেশের বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞানকর্মী, বিজ্ঞান-
সংগঠন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সমাজসেবা সংগঠন, সমাজ ও
রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং জনসাধারণের কাছে
আমাদের আবেদন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
প্রতিষ্ঠিত এই মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের
উন্নতি ও প্রসারকল্পে সকলে আন্ত-
রিকভাবে এগিয়ে আসুন
সাহায্য করুন ও পরামর্শ
দিন

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—নীলাচল প্রেস, কলিকাতা-700 009

মূল্য—1·50 টাকা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 6, জুন, 1979

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিজ্ঞপ্তি

"জ্ঞান ও বিজ্ঞান" শারদীয় সংখ্যার (অগাষ্ট-সেপ্টেম্বর, 1979) প্রকাশের জন্য লেখক-লেখিকাদের বিজ্ঞান বিষয়ক লোকরঞ্জক প্রবন্ধ পাঠাবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রবন্ধ "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার অনধিক চারপৃষ্ঠা (ছবিসহ) হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধ পাঠাবার শেষ তারিখ 20শে অগাষ্ট 1979. প্রবন্ধ পাঠাবার ঠিকানা, প্রকাশনা সচিব, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান,' পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006. ফোন: 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাত্রিংশত্তম বর্ষ | জুন, 1979 | ষষ্ঠ সংখ্যা

একটি পুরাতন প্রসঙ্গ

আশিস সিংহ

বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষা নিয়ে কথাবার্তা অনেক দিনের। কিন্তু আজ অবধি উদ্যোগ যা কিছু তা কতিপয় বিচ্ছিন্ন প্রয়াসেই মাত্র সীমাবদ্ধ। হতে পারে, এই প্রয়াসীদের মধ্যে অক্ষয়, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দরের মত ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটেছে, অল্পদিন আগে রাজশেখরের মত পারঙ্গম সমীক্ষাও এ-কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তবু, আমাদের যা প্রয়োজন তেমন কোন স্থায়ী ব্যবস্থা, এমন কি কোন পরিভাষাবিধি, ঈদৃশ উদ্যোগ-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে আজও গড়ে উঠতে পারে নি। পরিভাষা বিষয়ে আমাদের কৌতূহল আছে, কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সাধারণ-ভাবে আমাদের বাস্তব চেতনা সজাগ নয়—এমন কথা সম্ভবতঃ অত্যুক্তি হবে না।

প্রথমে পরিভাষা কেন প্রয়োজন তা নিয়ে আমাদের অভিমতটি বলা যাক। বাংলা বিজ্ঞান রচনার পাঠক-বৈচিত্র্যের কথা আমরা সকলে জানি। সন্দেহ নেই, আন্তর্জাতিক পরিভাষাগুলিকে তৎসম-রূপে ব্যবহারে বাংলা টেকনিক্যাল রচনার ক্ষতি হবে না, কিন্তু সেখানেও শব্দভেদে বিচারের অবকাশ মানতে হয়। 'অ্যালুমিনিয়াম্' শব্দটির তৎসম ব্যবহার কাম্য কিন্তু 'চক্ষু'র পরিবর্তে Eye বাংলা টেকনিক্যাল রচনাতেও চলবে না। তাছাড়া টেকনিক্যাল রচনা কজনেই বা পড়বেন? প্রত্যন্ত পল্লীর নিরক্ষর ব্যক্তিদের কাছেও আজকাল বিজ্ঞান রচনা পৌছয় আকাশবাণীর সহায়তায়। অতএব অধিকাংশ বাঙালী যে রচনা পাঠ বা শ্রবণ করবেন তাতে বাংলা পরিভাষার ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত। 'এণ্ডোক্রাইন্'.শব্দটি বাংলা হরফে জনবিজ্ঞান রচনায় খারাপ দেখাবে না, কিন্তু এর বাংলা পরিভাষা 'অন্তঃস্রাবী' শব্দটির ব্যবহারে রচনাটি সাধারণ বাঙালী পাঠকের কাছে অনেক বেশী অর্থবহ হয়ে উঠবে। এই বিচারে বিজ্ঞানকে সাধারণের কাছে প্রচারের নিমিত্ত পরিভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

কিন্তু শিক্ষাগ্রন্থ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, "শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে মাঠেবাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে"—সেই উক্তি এখানে পরিভাষা প্রসঙ্গেও স্মরণীয়। পরিভাষা গড়ে উঠবে রচনার প্রয়োজনে। লেখক লিখতে লিখতে প্রয়োজনমত পরিভাষা চয়ন বা রচনার দ্বারা ব্যবহার করবেন সাবলীল-ভাবে। তারপরে এইভাবে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলিকে সকলন এবং তাদের মধ্য থেকে সঠিক পরিভাষা নির্বাচন এবং প্রচলনের একটি আয়োজন থাকবে—পরিভাষা ভাণ্ডার ভরে তোলবার এটিই ঠিক পথ বলে আমাদের বিশ্বাস।

বাংলাভাষায় অদ্যাবধি প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকা, বিজ্ঞান প্রবন্ধ এবং বিজ্ঞান গ্রন্থের সংখ্যা নগণ্য নয়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একবার, মাত্র ঐ একবারই, 'প্রকৃতি' পত্রিকায় (স. সত্যচরণ লাহা) ডঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী তাঁর সময় পর্যন্ত প্রকাশিত বিজ্ঞান রচনা বা গ্রন্থ থেকে এইভাবে পরিভাষা সকলন ও বিচারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এর পরে আরও বহু বিজ্ঞান প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম নবায়নের ফলে বাংলায় প্রচুর পাঠ্যগ্রন্থের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু সকলন ও নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এমত উদ্যোগে এখন বাংলা পরিভাষার যেন এক অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিভাষার ভাণ্ডার এতে ভরে ওঠে নি।

এই আরণ্যক পরিস্থিতির চরম দৃষ্টান্ত দেখা যাবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের নুতুন পাঠ্যগ্রন্থ সমূহেই। পর্ষদের নির্দেশ ছিল, পাঠ্যগ্রন্থ রচনায় 'চলন্তিকা' অভিধানের পরিশিষ্টে প্রদত্ত পরিভাষা ব্যবহার করতে হবে, সেখানে যে-সব শব্দের পরিভাষা পাওয়া যাবে না তাদের ক্ষেত্রে আন্ত-র্জাতিক পরিভাষা বজায় রাখতে হবে। কিন্তু 'চলন্তিকা'র পরিভাষা-সম্ভার প্রয়োজনের তুলনায় এত অপ্রচুর যে এই নির্দেশ মানতে হলে পাঠ্যগ্রন্থের ভাষা বিদেশী শব্দের দ্বারা কণ্টকিত হয়ে সাবলীলতা হারাত। তাই সঙ্গত কারণেই লেখকেরা এই নির্দেশ মান্য করতে পারেন নি। অনন্যোপায় হয়ে, যথেচ্ছ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। একই বিজ্ঞান শব্দের পরিভাষা একেক গ্রন্থে একেক রকম। ফলে এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যে কিছুদিন পরে একজন বাঙালী বিজ্ঞান-ছাত্রের কথাবার্তা আর একজন বাঙালী বিজ্ঞান-ছাত্রের বুঝতে অসুবিধা হলে বিস্ময় প্রকাশ অনুচিত হবে। অর্থাৎ মাতৃ-ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার একটি মূল উদ্দেশ্যই এই পরি-কল্পনাহীন প্রয়াসের ফলে ব্যাহত হতে চলেছে।

আমাদের আবেদন, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রক এবং আগ্রহী বিদ্বানমণ্ডলী অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতিকারে এগিয়ে আসুন। পরিভাষা সকলন ও বিচারের জন্য একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম কাজ হবে একটি পরিভাষাবিধি প্রণয়ন ; দ্বিতীয় কাজ, বিজ্ঞান প্রবন্ধ বা গ্রন্থ থেকে আহরিত ব্যবহৃত পরিভাষাগুলিকে ঐ বিধিমতে বিচারবিবেচনা করে মান্যরূপ দান। তার পরে প্রকাশের ব্যবস্থা। একাজে বিজ্ঞানের সকল শাখার ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক এবং ভাষাবিদগণের প্রচেষ্টা একত্র করতে হবে। বছর দশেক আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ীর সভাপতিত্বে একটি পরি-ভাষা কমিটি গঠন করেছিলেন। কোন অজ্ঞাত কারণে সেই কমিটি কোন কাজই করতে পারেন নি। তেমন কোন কমিটি আবার গঠিত হতে পারে। কাজটি অত্যন্ত জরুরী হিসাবে এখনই গৃহীত না হলে ছাত্রদের পঠন-পাঠনে এবং বাংলায় বিজ্ঞান প্রচারের আন্দোলনে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

অগ্নি-ব্যবহার, রন্ধন এবং পাত্রাদি গঠনের পর্য্যায়ক্রম

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

প্রস্তর যুগেরও বহু পূর্ব্বে অবশ্যই এমন একটী সময় ছিল যখন পশ্বাদির ন্যায় মনুষ্যেরাও অগ্নির কোন ব্যবহার জানিত না। কিন্তু সেই অনগ্নিক দশায় মনুষ্যের যে কিরূপ দুরবস্থা ছিল তাহা মনে মনেই অনুমান করিবার চেষ্টা করিতে হয়, তাহার কোন উদাহরণ স্থল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পর্য্যটকেরা দ্বীপনিবাসী কোন কোন বর্ব্বর দশাপন্ন লোকের সম্বন্ধে বলিয়াছেন বটে, যে তাহারা অগ্নির ব্যবহার জানে না। কিন্তু তাঁহাদের সেকথার যাথার্থ্য বিষয়ে তেমন প্রমাণ নাই। আর ভূগর্ভনিহিত প্রাচীনতম মনুষ্যবাসের মধ্যেও সর্ব্বত্রই কাষ্ঠদহনজাত অঙ্গারাদিরূপ অগ্নি ব্যবহারের চিহ্ন সকল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং মনুষ্যেরা যে সময়ে অগ্নির ব্যবহার জানিত না, সে সময়ের কোন চিহ্নই এক্ষণে বিদ্যমান নাই। সে সময়ে নরগণ নিতান্ত পশুভাবাপন্নই ছিল।

কিন্তু অগ্নির প্রয়োজন এত অধিক উহা প্রাপ্ত হইবার উপায়ও এত অধিক এবং উহার ব্যবহার করিতে পারিলে এত বিঘ্ন-বিপত্তির নিবারণ এবং কার্য্যের সুবিধা হয় যে, মনুষ্যের বুদ্ধিশক্তির প্রথম উন্মেষমাত্রেই যে অগ্নির ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথমে মনুষ্যেরা স্বইচ্ছাতঃ অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার কোন উপায়ই আবিষ্কৃত করিতে পারে নাই। এই জন্য তাহারা অতি যত্নপূর্ব্বকই অগ্নির রক্ষা করিত, পরে কাঠে কাঠে ঘষিয়া অগ্নি উৎপাদিত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়। তদনন্তর অরণিযন্ত্রের সৃষ্টি এবং ক্রমশঃ উহার উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় অগ্নি উৎপাদনের পরিশ্রম লঘু হইয়া আইসে। তাহার পর লৌহ এবং প্রস্তরের পরস্পর সংঘাতে অগ্নি উৎপাদনের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়া গেলে অরণিযন্ত্রের ব্যবহার সাধারণতঃ পরিত্যক্ত হয়। পরে লুসিফর শলাকা উদ্ভাবিত হইয়া চকমকির স্থান গ্রহণ করে এবং চকমকির ব্যবহার প্রায় উঠিয়া যায়।

অগ্নির ব্যবহার অবগত হইলেই ইতর জন্তু হইতে মনুষ্যের পার্থক্য বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হইতে থাকে। ইতর হিংস্র জন্তুমাত্রেই অগ্নিকে ভয় করে এবং যেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিতে পায়, সে স্থান হইতে দূরে পলায়ন করে। সুতরাং অগ্নির ব্যবহারের আরম্ভ মাত্রেই মনুষ্যের আবাস-গুলি অনেকটা ভয় ও বিঘ্নশূন্য হইয়া উঠে। প্রস্তর-যুগে মনুষ্যদিগের অস্ত্রশস্ত্রাদি ভাল থাকে না। অগ্নির ব্যবহার শিখিয়া মনুষ্যেরা অগ্নিদ্বারাই উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদির অনেক কার্য্য সাধন করিতে পারে। বড় বড় কাঠ কাটিয়া তাহার অন্তর্ভাগ খুদিয়া ডোঙ্গা প্রস্তুত করা অগ্নির সাহায্যে অনায়াস এবং অল্পকাল সাধ্য হইয়া যায়। তাম্রাদি ধাতু হইতে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্র, যন্ত্র এবং পাত্রাদি নির্ম্মিত হয়, অগ্নির দ্বারা ঐ সকল ধাতুকে গলাইয়া তাহা সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। আর আম মাংস মৎস্যাদি ভক্ষণ করিবার যে রীতি প্রচলিত থাকায় মনুষ্যের বুদ্ধি এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইতে পাইত না, অগ্নির ব্যবহার আরব্ধ হইলে সেই রীতি ক্রমশঃ রহিত হইয়া যায় এবং খাদ্যসামগ্রীর প্রকারভেদ, স্বাদুতা এবং উপকারিতা বর্দ্ধিত হইয়া নরগণকে সুখী, সুধী এবং শান্তশীল করিয়া তুলে।

পাক করিয়া খাওয়া এক্ষণে মানুষের একটী

বিশেষ ধর্ম হইয়া উঠিয়াছে। রন্ধনের প্রকার ভেদ এবং তাহার কৌশল এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সূপকারিতা একটা বিশেষ বিদ্যা এবং ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অগ্নির ব্যবহার যখন প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন পাকের অত পারিপাট্য হয় নাই। তখন খাদ্যসামগ্রীকে অগ্নিতে পোড়াইয়া লওয়া ভিন্ন উপায়ন্তর ছিল না। তাহার পর অগ্নির সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ব্যতিরেকে শূল্যাদি প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়। তদনন্তর খাদ্যদ্রব্য উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সে সময়ের সিদ্ধ করিবার রীতি এক্ষণকার রীতি হইতে স্বতন্ত্র। তখন হাঁড়ি কলসী মালসা প্রভৃতি মৃৎপাত্রের এবং কড়া, বাঁটুলা, বগুণা প্রভৃতি ধাতুপাত্রের কিছুরই সৃষ্টি হয় নাই। তখন ভূমি-মধ্যস্থ গর্ত্তে অথবা মৃগয়ালব্ধ পশুর চর্ম্মে, কিংবা গাছের ডাল কাটিয়া তাহার চেয়াড়ির দ্বারা নির্ম্মিত চুপড়িতে অথবা বৃহদাকার শম্বুকাদির কিম্বা বৃহৎ বৃহৎ ফলের খোলায়, তরল পদার্থ ধারণের উপযোগী পাত্র প্রস্তুত হইত। ঐ সকল পাত্রের কোনটাতেই অগ্নির জ্বাল দিবার যো নাই। এই জন্য তখনকার লোকেরা কোন দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইলে, ঐরূপ কোন পাত্র জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে সেই দ্রব্যটী রাখিয়া অন্য স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিত এবং সেই অগ্নিতে উপলখণ্ডাদি উত্তপ্ত করিয়া ঐ পাত্রস্থ জলে নিক্ষেপ করিত। তাহাতে জল গরম হইয়া উঠিত এবং সেই জলে খাদ্যদ্রব্যটী এক প্রকার সিদ্ধ হইত। এরূপ করিয়া সিদ্ধ করিতে অনেক সময় যায় এবং অনেক পরিশ্রম হয়। সুতরাং ইহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টাই হইতে থাকে। প্রথমে প্রস্তর দ্বারাই জ্বালসহ পাত্রের নির্মাণ চেষ্টা হয়। পরে চেয়াড়ি অথবা পশুচর্ম্ম কিম্বা শম্বুক অথবা ফলের খোলায় যে সকল পাত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহার তলায় খুব পুরু করিয়া মাটির লেপ দিয়া উহাদিগকে জ্বালসহ করা হয়। এইরূপ করিতে করিতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, শুদ্ধ মাটি হইতেও তদ্রূপ পাত্রের গঠন হইতে পারে। মাটির পাত্রকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লওয়াই প্রথম অবস্থা, তাহার পর তাহাকে পোড়াইয়া লইবার রীতিও প্রবর্ত্তিত হইয়া যায়। কুম্ভকারের ব্যবসায়ের এইরূপে অল্পে অল্পে উদ্ভব হইয়াছে। এদেশে উহা এই পর্য্যন্তই উন্নতি লাভ করিয়াছে। চীনের বাসন প্রস্তুত করা এবং সে সকল বাসন চিত্রিত ও অতি দিব্যগঠন করা কুম্ভকার ব্যবসায়ের চরম উন্নতি।

অগ্নির ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে নরগণের যে সকল সৌকর্য্য সাধিত হইয়া গিয়াছে, বারুদের এবং বাষ্পীয় কলের সৃষ্টি হইয়া অবধি তাহা অপেক্ষাও অনেক অধিক প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। এক্ষণে আগ্নেয় অস্ত্রের প্রভাবে মনুষ্য সর্বজয়ী হইয়াছেন। মনুষ্য মনে করিলেই অন্য যে কোন জীব হউক তাহার ধ্বংস সাধন করিতে পারেন। শুদ্ধ অন্য জীব নহে, আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার না জানে এমত কোন নরজাতিও আর আগ্নেয়াস্ত্রধারীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। বাষ্পীয় কলের সহকারিতা লব্ধ হওয়াতে মনুষ্যেরা প্রাকৃতিক শক্তি সকলের সহিতও প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফলতঃ এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, বারুদের এবং বাষ্পীয় ও তাড়িতযন্ত্রের আবিষ্কার পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

বিজ্ঞান প্রবন্ধ

গোপালচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা**

রতনলাল ব্রহ্মচারী*

পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ জন্মেছেন, যাঁরা সারা জীবন ধরেই প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য, গাছপালা, পশুপাখী, কীট-পতঙ্গের রহস্য নিয়ে মেতে থাকেন।

এমনি মানুষ ছিলেন চার্লস ডারউইন, জঁ্যা অ্যারি ফ্যাবার (Jean Hehri Fabre), ওজিন মারে (Eugene Maris),—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

বিবর্তনবাদ বা ইভোল্যুসন থিয়োরীর প্রবক্তা হিসাবে ডারউইনের নাম সবাই জানে। কিন্তু এছাড়াও তাঁর অন্যান্য কাজ, যেমন বিলাতের অর্কিডের পরাগ সংযোজন, কেঁচোর ওপর গবেষণা পতঙ্গভুক উদ্ভিদের জীবন-ইতিহাস, উদ্ভিদের সাড়া দেওয়া (এ-বিষয়ে তাঁর বইখানিকে জগদীশচন্দ্রের সাধনার পূর্বসূরী বলা যায়), মানুষ ও অন্য প্রাণীদের মানসিক প্রবৃত্তির তুলনা,—প্রতিটিই অসাধারণ রকম মূল্যবান এবং সুখপাঠ্য ভাষায় রচিত। সারা বিশ্বেই এগুলি সুপরিচিত, কারণ বইগুলি বর্তমান জগতের সবচেয়ে বহুল প্রচলিত ভাষা—ইংরেজিতে রচিত হয়েছিল। ফ্যাবার, যাঁকে মেটারলিংক বলেছিলেন পতঙ্গ-জগতের হোমার, ফ্রান্সের প্রোভাঁস অঞ্চলে দুঃখ-দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে শেষ জীবনে একটু স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে 'Souvenirs Entomologiques' নামে একটি গ্রন্থাবলী সমাপ্ত করে গিয়েছিলেন। অপূর্ব কাব্য-সুষমায় ভরা এই বৈজ্ঞানিক রচনাবলী বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিল,—তারও কারণ এর ভাষা ছিল ফরাসী, পৃথিবীর সুধীমহলে যার কদর খুব বেশী।

এদিক দিয়ে ব্যতিক্রম মারে এবং গোপাল ভট্টাচার্য। মারে তাঁর প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন Afrikanner ভাষায়। ডাচ এবং ফ্লেমিশ থেকে উদ্ভূত এই ভাষায় লেখা প্রবন্ধগুলি দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, বাইরের দুনিয়ায় তার বিশেষ কোন ছাপ পড়ে নি। উগাণ্ডার মাকেরেরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মারের কতগুলি প্রবন্ধের একটি ইংরেজি সংস্করণ পড়ে বুঝেছিলাম, কি অসাধারণ প্রতিভা বনফুলের মত ফুটেছিল পৃথিবীর এক নির্জন প্রান্তে। পরবর্তীকালে মারে একাকী, একটি তাবু ও রাইফেল নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার অরণ্যে গিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করেন। আজকাল রবার্ট আর্ড্রের বহুল-পঠিত বইগুলির মাধ্যমে অনেকে মারের খবর জানতে পেরেছেন।

গোপাল ভট্টাচার্য তাঁর অধিকাংশ রচনাই লিপিবদ্ধ করেছেন বাংলা ভাষায়। তাতে অনেক বাঙালী পাঠক উপকৃত হয়েছেন, কিন্তু বিশ্বের দরবারে সে খবর পৌছায় নি। টেকনিক্যাল পর্যায়ে তিনি ডজনখানেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন ইংরেজি ভাষায় এবং তার মধ্যে দু-চারটি বিদেশী জার্নালে।

জীববিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল খুবই বিস্তীর্ণ। বায়োলুমিনিসেন্স্ বা জীবদ্যুতি

**গত 30শে জানুয়ারী'79 'শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি' এবং 'গবেষণা' পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

*ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলিকাতা-700035

নিয়ে তার আরম্ভ। যদিও জার্মান বিজ্ঞানী Mollisch-এর সঙ্গে তিনি কিছু কাজ করেছিলেন, শ্রীভট্টাচার্যের নিজের কোন গবেষণাপত্র এ-বিষয়ে প্রকাশিত হয় নি। তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ জলের মাকড়সা নিয়ে।

সে-সময় 'আমেরিকান মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিষ্ট্রি' সারা পৃথিবীর মাকড়সা সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহ করছিলেন। বলা বাহুল্য তখন ভারতে এ-ধরনের পর্যবেক্ষণ প্রায় কেউই করতেন না। যে দেশে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক ছিল, যে দেশে তপোবনের সৃষ্টি হয়েছিল, পঞ্চতন্ত্রের মত কাহিনী রচিত হয়েছিল —সেখানেই সাম্প্রতিক কালে লোকেরা প্রকৃতির সঙ্গে সকল সংযোগ হারিয়ে ফেলেছেন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের এই অংশটিকে গ্রহণ করেন নি। তাই এদেশে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ হলেন কুখ্যাত সাম্রাজ্যবাদী স্যার এলিজ ইম্পে প্রমুখ বিদেশীরা। ভারতীয় চিত্রকরদের শিখিয়ে-পড়িয়ে তাঁদের সাহায্যে এই বিদেশীরা প্রকাশ করেছিলেন অতি সুন্দর সচিত্র পুস্তক—ভারতীয় পশুপক্ষী, সাপ ইত্যাদির বিবরণ দিয়ে।

যাই হোক, গোপাল ভট্টাচার্য মেছো-মাকড়সার ওপর সুদীর্ঘ পর্যবেক্ষণ করে দেশী ও বিদেশী (আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিষ্ট্রীর জার্নাল—ন্যাচারাল হিষ্ট্রী) পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপালেন। এর পর তিনি প্রধানত পোকামাকড় নিয়ে অসংখ্য পর্যবেক্ষণ করে গেছেন।

আজ আমি শুধু তাঁর তিনটি-আবিষ্কারের কথা বলব, যা আমার মতে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম সারির কাজ। প্রথমেই বলছি নালসো পিঁপড়ের ওপর এক ধরনের গবেষণার কথা।

নালসো পিঁপড়ে (বড় বড় গেছো-পিঁপড়ে) আম ইত্যাদি গাছে পাতা জুড়ে বাসা তৈরি করে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন পাখীর বাসা। বাসার মধ্যে পিঁপড়েদের হাল-চাল স্বভাব প্রকৃতি লক্ষ্য করার জন্য তিনি এক "টেকনিক" উদ্ভাবন করেন। এটিই একটি মূল্যবান আবিষ্কার বলে গণ্য হতে পারে। স্বচ্ছ সেলোফেন (cellophane)-এর সাহায্যে তৈরী বাসার মধ্যে পিঁপড়েদের থাকতে দিয়ে তাদের ওপর অনেক পর্যবেক্ষণ চালানো হলো—2-3 বছর ধরে। এক একটি বাসায় কতগুলি রাজা, রাণী, কর্মী, সৈনিক পিঁপড়ের জন্ম হলো—তার সংখ্যাও নির্ণয় করা হলো। পিঁপড়ের সমাজে এই চার শ্রেণী আছে। রাজা, রাণী, বা পুরুষ ও স্ত্রী থাকতেই পারে, কিন্তু তাছাড়া, এই কর্মী বা সৈনিকের উৎপত্তি হয় কেমন করে? তাদের চেহারা ও শারীরবৃত্তের পার্থক্য কি করে সৃষ্টি হতে পারে? জেনেটিক্স্ বা বংশাণুক্রমতা—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট প্রশ্ন। কেউ কেউ বলতেন যে, বোধহয় বিশেষ ধরনের বা পরিমাণের খাদ্যের ওপর নির্ভর করে কোন কোন লার্ভা স্ত্রী বা রাণী পিঁপড়ে হয়, কোনটা কর্মী হয়। এইভাবে জেনেটিক থিয়োরীর এবং ট্রফিক (trophic—খাদ্যনির্ভর) থিয়োরীর দ্বন্দ্ব চলছিল। তৎকালীন বিশ্বের "সামাজিক পতঙ্গের" ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানী Wheeler, এই খাদ্যনির্ভর থিয়োরীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। শ্রীভট্টাচার্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন যে শুধুমাত্র কিছু বিশেষ ধরনের খাদ্য পেলেই নালসো পিঁপড়ের বাসায় নূতন রাজা ও রাণী জন্মাতে পারে। পিঁপড়েদের চড়ে বেড়িয়ে স্বাভাবিক খাদ্য খেতে না দিয়ে, খুব প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য দিলেও বাসাতে শুধুই কর্মী-পিঁপড়ের উৎপত্তি হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে (অন্য সময়ে নয়) আম এবং আরও কয়েক জাতীয় গাছের পাতা, কোড়ক ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে দিলে নূতন রাজা ও রাণী পিঁপড়ের জন্ম হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে পিঁপড়েরা এই সময় এধরনের পাতা ও কোড়ক খায়। কাজেই শ্রীভট্টাচার্যের গবেষণায় প্রমাণ হলো যে ট্রফিক থিয়োরীই সত্য,—বিশেষ গুণসম্পন্ন খাদ্য পেলে তবেই বিশেষ শ্রেণীর পিঁপড়ে জন্ম নিতে পারে।

আজকের দিনে জেনেটিক্‌স্‌ বিজ্ঞান আণবিক পর্যায়ে বহুদূর চলে গেছে, কিন্তু সেই জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতেও ট্রফিক থিয়োরী একটি আকর্ষণীয় মতবাদ, যার নিগূঢ় তাৎপর্য গভীরভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। এই সূত্রে বলা যেতে পারে যে, কোন কোন সামুদ্রিক শামুকের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে লার্ভাগুলিকে বিশেষ ধরণের খাদ্য দিতে পারলে তবেই তাদের রূপান্তর (metamorphosis) সম্ভব হয়। এখাদ্য কোথাও বিশেষ ধরণের শ্যাওলা, কোন ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের এককনালী প্রাণী। এই খাদ্য থেকে নানা রাসায়নিক পদার্থ নিষ্কাশিত করে কোষের ওপর বা কোষের DNA অণুর ওপর তার প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা হয়তো অদূরভবিষ্যতে মলিকুল্যার বায়োলজীর একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী হয়ে দাঁড়াতে পারে।

যাই হোক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নালসো পিঁপড়ে নিয়ে শ্রীভট্টাচার্যের এই গবেষণা বিশ্বের দরবারে প্রায় অজানাই রয়ে গেল। এইগুলি Transactions of Bose Institute পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্যই বোধ হয় জার্মানী, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এবং বিশেষ করে জার্মানীতে প্রচারিত হয় নি। 1937 থেকে 1947 সাল পর্যন্ত জার্মান বিজ্ঞানী গোয়েৎস (Goetsch) যে গবেষণা করেন তাতে তিনি শ্রীভট্টাচার্যের মতবাদের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। শ্রীভট্টাচার্যের পরে তিনি দেখিয়েছিলেন ছত্রাক, ইষ্ট এবং অন্যান্য উৎস থেকে উদ্ভূত কোন কোন পদার্থ পিঁপড়ের লার্ভাকে বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত করতে সাহায্য করে। তাঁর এই মতবাদও অবশ্য উত্তরসূরী বিজ্ঞানীরা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেন নি। 1940 খৃষ্টাব্দে Wesson হলদে ও কালো রঙের দুই প্রজাতির পিঁপড়ে নিয়ে এক পরীক্ষা করেন। রঙের পার্থক্যের জন্য এক প্রজাতির বাসায়, অন্যটিকে আলাদা করে চেনা যেত। বেশী খাদ্যসমৃদ্ধ বাসায় রেখে দিলে লার্ভাগুলি থেকে বেশী সংখ্যক রাণী জন্মায়। Wesson-এর গবেষণার ফলও কতকটা শ্রীভট্টাচার্যের কাছাকাছি, কিন্তু কলকাতার বিজ্ঞানী আরও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। আজকের দিনে পতঙ্গ-বিজ্ঞানের ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য অতি বিখ্যাত পুস্তক—Wilsonকৃত Social Insects (1971). এই বইখানাতে Wesson এবং Goetsch-এর কাজের উল্লেখ আছে; কিন্তু শ্রীভট্টাচার্যের গবেষণাপত্র Wilson কোন দিনই দেখেন নি।

এবার 2নং গবেষণার কথায় আসা যাক। এটা বোঝবার জন্য প্রথমে চলে আসুন আফ্রিকায়। আসুন আমার সঙ্গে, কল্পনার রথে চড়ে। আশা করি ভালভাবেই আপনাদের গাইডের কাজ করতে পারবো, কারণ আমি আটবার আফ্রিকায় গিয়েছি বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ করতে।

চলুন, সোমালিয়ার ঊষর প্রান্তর পেরিয়ে, কেনিয়া টানজানীয়ার ঘাসবন আর কাঁটাঝোপ উজিয়ে উগাণ্ডার কিগেজী অঞ্চল ছাড়িয়ে, আসুন লেক কিভুর পারে, কাহুজীর গহন অরণ্যে, আগ্নেয়গিরির রাজ্যে, রোয়াণ্ডা, উগাণ্ডা, জাইর (প্রাক্তন বেলজিয়ান কঙ্গো)—এই তিন রাজ্যের সীমানায়। ঐ পর্বতের 'অগ্নিদেবতা' নীরাগংগোর ধূম্রকেতন, রাতের আকাশে লক্ষ রংমশাল তুলে ধরেছে তার অগ্নিগর্ভ জ্বালামুখ (দু-বছর আগে নিভে গেছে)। পার্ক ন্যাসিয়নাল দ্যে ভলকাঁ, রোয়াণ্ডার গরিলা রাজ্য। এদিকে জাইরে, কিভুর অরণ্যে, কাহুজীবীনায় গরিলা পর্যবেক্ষণ করেছেন শালার, কাসিমির, এ্যালান গুডাল, আমিও দু-বার গিয়েছি সেখানে,—উগাণ্ডার দিকে জিল ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী যিনি গরিলা নিয়ে গবেষণা করেন, আর রোয়াণ্ডায় ডায়ান ফসী, বছরের পর বছর রয়ে গেছেন গরিলা পর্যবেক্ষণের জন্য। তারপর আসুন টানজানিয়ার গম্বে রিসার্চ স্টেশনে। এখানে জেন গুডাল ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে অনেক বছর গবেষণা করেছেন শিম্পাঞ্জি নিয়ে।

এসব পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে, 'যন্ত্র' ব্যবহার করবার প্রবণতা, অর্থাৎ, বাইরে পড়ে থাকা কোন জিনিষকে ধরে নিয়ে তার সাহায্যে কোন কাজ করে নেওয়া—এই ক্ষমতা শিম্পাঞ্জির মধ্যে ভালভাবেই আছে, গরিলার মধ্যে নেই (বা এখনও দেখা যায় নি)। এ-শতাব্দীর প্রথম দিকে বিজ্ঞানী কোহ্লার পোষা শিম্পাঞ্জির বেলায় এধরনের অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। বন্য শিম্পাঞ্জি একটি গাছের ডাল নিয়ে তার পাতা ভেঙে নিয়ে একটি লাঠির মত তৈরি করে নেয় এবং তার পর তার সাহায্যে উইঢিবির কাছে গিয়ে উই খুঁচিয়ে বের করে খায় বা ছোট ডাল নিয়ে, তার পাতা চিবিয়ে স্পঞ্জের মত করে নিয়ে তার সাহায্যে গাছের গর্তে জমে-থাকা জল শুষে নিয়ে, পাতা থেকে সেটা চুষে খায়,—জেন গুডালের এধরণের পর্যবেক্ষণ খুবই উল্লেখযোগ্য। টানজানিয়ার বিরাট প্রান্তরে তিনি নিওফ্রন ভালচারকে (এই 'সাদা শকুন' ভারতেও আছে) দেখলেন দূর থেকে পাথরখণ্ড এনে তাই ছুড়ে উটপাখীর ডিম ভেঙ্গে খেতে। এটাও এক ধরনের tool using বা যন্ত্রের ব্যবহার, যদিও tool making বা যন্ত্র তৈরি নয়।

পতঙ্গের জগতে বুদ্ধিবৃত্তি কম, সহজাত প্রবৃত্তি বেশী। সেই সহজাত প্রেরণার ফলে তথাকথিত যন্ত্রের ব্যবহার পতঙ্গ-জগতেও আছে। পেক্হাম দম্পতি এক ধরণের কুমুড়ে-পোকা বা হান্টিং ওয়াস্প্ দেখেছিলেন—যারা ডিম পাড়বার পর গর্তের মুখ বন্ধ করবার সময় একটি পাথরকুঁচি মুখে নিয়ে তার সাহায্যে হাতুড়ীর মত গর্তের মুখে মাটি পিটিয়ে গর্ত বন্ধ করে দেয়। ঠিক এই ঘটনা গোপালবাবুও প্রত্যক্ষ করেছিলেন বাংলার এক কুমুড়ে-পোকার বেলায়। এছাড়া তিনি লিখে রেখেছেন কান-কোটারির জীবনের এক আশ্চর্য ইতিহাস। কাটকোটারি নামটি আমার কাছে অপরিচিত কিন্তু বিবরণ দেখে বোঝা যায় কানকোটারি মানে earwig পোকা। এই পোকা ডিমের যত্ন নেয় অনেকেই দেখেছেন। গোপালবাবু লক্ষ্য করলেন, ডিম রক্ষা করবার সময় এরা পায়ে কাদা লাগায়। এই কাদা শুকিয়ে শক্ত হয়, তখন কোন শত্রু কাছে এলেই, পোকাটি পেছনের পা দিয়ে লাথি মারে, যেন লাথি জোরালো করবার জন্য বুট পরে নিয়েছে। জল দিয়ে তখন ঐ কাদা ধুয়ে দিলে, সে আবার কাদা মাখিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু ডিম পাড়বার পর (বা রক্ষা করবার) সময় ছাড়া তার এই প্রবণতা দেখা যায় না।

এবার 3নং গবেষণার কথা। ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ হওয়ার ঘটনা সবাই জানেন। একটু চিন্তা করলে বোঝা যাবে ব্যাপারটা হান্স্ আণ্ডারসনের বিখ্যাত গল্প (দি লিট্‌ল মারমেড)—একটি মৎস্যকন্যার মানুষের মেয়ের রূপ নেওয়ার চেয়ে কম আশ্চর্য নয়। ব্যাঙাচির এই পরিবর্তন বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আয়োডিনঘটিত থায়রোক্সিন হর্মোনের প্রভাবে এই পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু গোপালবাবু লক্ষ্য করলেন যে পেনিসিলিনের প্রভাবে এই পরিবর্তন বন্ধ হয়ে যায়, ব্যাঙাচিগুলি বড় ব্যাঙাচি থেকে যায়,—আর ব্যাঙ হয় না। সে সময় বিখ্যাত বিজ্ঞানী Julian Huxley কলকাতায় এসেছিলেন, তাঁকে দেখানো হয় গবেষণার ফল। তিনি বলেন ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় ঠেকছে, তবে একটা রিপোর্ট 'Nature' (বিখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকী)-এ পাঠিয়ে দেওয়া উচিত এখনই (সেটা কিন্তু আর কখনই করা হয় নি)।

যাই হোক গোপালবাবু পরে আরও সহকারী নিয়ে আরও গবেষণা করে দেখেন যে কয়েক রকম ভিটামিন-বি$_{12}$ সংশ্লেষণকারী ব্যাক্টেরিয়া ব্যাঙাচির দেহে বাসা বাঁধে এবং পেনিসিলিনের প্রভাবে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। পেনিসিলিন প্রয়োগে যারা ব্যাঙাচিই রয়ে গেল, ব্যাঙ হলো না—তাদের ক্ষেত্রে ভিটামিন-বি$_1$ দিয়ে দেখা গেল—এটা metamorphosis আনতে সাহায্য করে। আবার এই সব ব্যাঙাচির ক্ষেত্রে thyroxine দিয়ে নানা

কৌতূহলোদ্দীপক সব গবেষণা করেন শ্রীভট্টাচার্য ও শ্রীমেদ্দা। একটা বিশেষ বয়সের ব্যাঙাচির ওপর এই পরীক্ষা করে দেখা গেল, এর ফলে তাদের আংশিক রূপান্তর (metamorphosis) হয়। ব্যাঙের মত পা বের হয়. কিন্তু লেজ ও কান্‌কো থেকে যায়। শ্রীমতী ঘোষ লক্ষ্য করলেন যে পেনিসিলিন দেওয়ার ফলে যকৃতে acid এবং alkaline phosphotase-এর পরিমাণ কমে যায়। কিন্তু ভিটামিন-বি$_{12}$-এর প্রয়োগে এর পরিমাণ বেড়ে যায়। পেনিসিলিন এবং ভিটামিন-বি$_{12}$ প্রয়োগের ফল এরকম পরস্পরের উল্টোটাই হওয়া উচিত। গোপালবাবুর সহকারী শ্রীমেদ্দা ও শ্রীমতী রমা ঘোষ এ বিষয়ে আরও কাজ করেন।* ব্যাঙাচির রূপান্তর সম্বন্ধে বিজ্ঞানী Weber-এর সঙ্গে পত্রালাপ করি। গোপালচন্দ্রের কাজের কথা জেনে তিনি সে বিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং পরে তাঁর Biochemistry of Animal Development" পুস্তকটিতে "Science And Culture"-এ প্রকাশিত গোপালচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীর উল্লেখ করেন।

যাই হোক, মূল কথাটি হলো—তাহলে বাইরের এই ব্যাক্টেরিয়ারা ব্যাঙাচির জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তিক কাজটি করতে সাহায্য করে। এ-বিষয়ে গবেষণার একটি নূতন দিগন্ত এভাবে খুলে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সালোজেনিক অর্থাৎ স্বাস্থ্যদায়িনী ব্যাক্টেরিয়ার কথা চিন্তা করবার অবকাশ আছে (প্যাথোজেনিক ব্যাক্টেরিয়া অর্থাৎ রোগজীবাণুর কথা সকলেই জানেন)। গরু বা গরিলার পেটে বা অন্ত্রে এমন সব ব্যাক্টেরিয়া আছে যা তাদের ঘাসপাতা হজমের কাজে লাগে, এটাও অনেকেই জানেন। কিন্তু অনেকেই জানেন না 1934 খৃষ্টাব্দে হেনরীর গবেষণার কথা। তিনি দেখলেন আর্শোলার ডিমের মধ্যে কিছু ব্যাক্টেরিয়া আছে, সেগুলি মেরে ফেললে সেই ডিম থেকে জাত আর্শোলার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না, সেগুলি আকারে অনেক ছোট থেকে যায়। আবার 1978 খৃষ্টাব্দে হারিগান এবং আলফন কিছু প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন যে কিছু ব্যাক্টেরিয়ার জন্যই এক রকম সামুদ্রিক শামুকের পূর্ণাঙ্গ বৃদ্ধিলাভ সম্ভব। আজকাল জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে অনেকের কৌতূহল ও আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমি বলি, উন্নয়নশীল দেশে তার চেয়ে বেশী আগ্রহ থাকা উচিত এসব প্রাকৃতিক কিন্তু অনেক পরিমাণে অজানা ব্যাক্টেরিয়া সম্বন্ধে।

গোপালচন্দ্র তাঁর "মনে পড়ে' -তে লিখে গেছেন যোগেন মাষ্টারের কথা। অখ্যাত এক পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক,—তাঁর কাছে প্রেরণা পেয়েছিলেন গোপালবাবু। আর গোপালবাবু লেখা প্রবন্ধ পড়ে ছেলেবেলায় কিছুটা প্রেরণা পেয়েছিলাম আমি। আজ যদি আমাদের এই অধিবেশন এবং শ্রীতুষারকান্তি দত্তের অতি সুন্দর স্লাইডের মাধ্যমে দু-একটি ছেলেমেয়ের মধ্যে জেগে ওঠে প্রকৃতি-সচেতনতা,—তাহলেই আজকের উদ্যোক্তাদের সব আয়োজন সার্থক হয়েছে বলা যাবে।

আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করি না, কিন্তু অন্য অর্থে ডারউইন, ফ্যাবার, মারে আর যোগেন মাষ্টার আজ এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যেই বেঁচে আছেন। ক্ষুদ্র স্বার্থ মানুষের সঙ্গেই মরে—মহত্তর মর্মবাণী প্রকাশ পায় জীবনের উত্তরণে, এক সূর্যোদয় থেকে আর এক সূর্যাস্তে, এক সোনার সিংহদুয়ার থেকে আর এক সোনার সিংহদুয়ারে।

*এসব কাজ 'Science and Culture-এ প্রকাশিত হয়েছে.

মৌলিক সংখ্যা

অমিতোষ ভট্টাচার্য*

বিশ্ববিখ্যাত মনোবিজ্ঞান সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের নিকটবন্ধু ছিলেন বার্লিনের একজন সার্জন—নাম উলহেম ফ্লীম। ফ্রয়েড আর ফ্লীমের দশবর্ষব্যাপী গভীর বন্ধুত্বের মধ্যে ফ্রয়েড তাঁর খ্যাতির চরম সীমায় ওঠেন। ফ্রয়েড 'Interpretation of Dreams'-এর প্রুফ সংশোধন করে বন্ধুবর ফ্লীমকে লিখলেন—বইটিতে যদি 2467 সংখ্যক ভুলও থাকে, তাহলেও আমি তা আর সংশোধন করব না। চিঠি ডাকে ফেলবার মুহূর্তে তিনি ভাবলেন হঠাৎ এই সংখ্যাটি তাঁর মনে এল কেন। একটা আপাত এলোপাতাড়ি সংখ্যা হলেও মনের গভীরে যা কিছু ঘটে, তা তো একেবারে অর্থহীন নয়। পরবর্তী কালে এই সংখ্যাটির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তিনি 'Psychology of Everyday Life'-এ যদিও দিয়েছিলেন, তথাপি সংখ্যাতত্ত্বের উপর ফ্রয়েডের দখল যদি থাকত, জেনে অবাক হতেন 2467 হলো 365-তম মৌলিক সংখ্যা। তাঁর শ্রেষ্ঠ বইটি যে বছরে লিখেছিলেন, সে বছরের 365 দিনের সঙ্গে 365-তম মৌলিক আর অবচেতন মনের রহস্যের ব্যাখ্যা একজন মনোবিজ্ঞানীর কাছে যতটা চিত্তাকর্ষক, 2467 হলো 365-তম মৌলিক—এই তথ্যটুকু একজন সংখ্যাবিজ্ঞানীর মনেও ঠিক ততটা আলোড়ন আনতে পারে।

অঙ্কশাস্ত্রের অতি পুরাতন আর মাথা খারাপ করে দেওয়া সংখ্যাবিজ্ঞানের এই শাখাটি একটি পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের অঙ্গমাত্র। এর নানা তত্ত্ব আর সিদ্ধান্ত 'ক্ষ্যাপার পরশ পাথর খুঁজে বেড়ানো'র মত অন্ধকার হাতড়ে আবিষ্কার করা হয়েছে। কোন ব্যবহারিক বিজ্ঞানে এর উল্লেখ নেই, আলোচনা নেই। এক কথায় ফলিত বিজ্ঞানে প্রায় অব্যবহার্য গণিতশাস্ত্রের এই অধ্যায়টি তথাকথিত বিশুদ্ধতার মুকুটে শোভিত।

মৌলিক সংখ্যার সঙ্গে যতটা রহস্য আর গভীর আকর্ষণ জড়িয়ে আছে, গণিতশাস্ত্রের অন্য কোন শাখার হয়তো তা নেই - নিয়মাতীত একটি মৌলিক সংখ্যা শুধু। আর সেই সংখ্যাটি ছাড়া তৃতীয় কোন সংখ্যার সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য নয়। যে কোন স্কুলের ছাত্রও স্বচ্ছন্দ্যে মৌলিক সংখ্যার কিছু কিছু সমস্যা সহজে অনুধাবন করতে পারে, কিন্তু সমস্যার গভীরে নেমে বড় বড় অঙ্কশাস্ত্রবিদ্‌রাও হার মেনেছেন আর মন্তব্য করেছেন, হয়তো এসব সমস্যার কোন সমাধানই নেই। কিংবা কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার অনিশ্চয়তাবাদের মত মৌলিক সংখ্যারও একটি অনিশ্চয়তাবাদ আছে। সংখ্যাজগতের অলিতেগলিতে মৌলিক সংখ্যাগুলি এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে কোন বিশেষ নিয়মশৃঙ্খলে তাদের বাঁধা যায় না; অথচ একেবারে যে উচ্ছৃঙ্খল তাও বলা চলে না। কিন্তু কোন সহজ নিয়মে সংখ্যার জটাজাল থেকে শুধু মৌলিক সংখ্যাগুলিকে চিনে নেওয়া অসম্ভব। 99-তম মৌলিক সংখ্যাটি কত জানতে হলে একের পর এক 99টি মৌলিক সংখ্যা লেখার মত ক্লান্তিকর একটা প্রচেষ্টার দ্বারাই তা জানা সম্ভব হবে।

যান্ত্রিক মস্তিষ্কের আবির্ভাবের অনেক আগে 6 বা 7 অঙ্কের একটি মৌলিক সংখ্যা খুঁজে বের করা নিতান্ত যাদুকরের মায়া বলে ভাবা হতো। একদা Euler ঘোষণা করেছিলেন 1,000,009 হলো একটা মৌলিক সংখ্যা। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি

*ডিফেন্স ইলেকট্রনিক্স্ রিসার্চ ল্যাবোরেটরী, হায়দরাবাদ-500 005

দেখালেন সংখ্যাটি আসলে দুটি মৌলিক 293 এবং 3413 এর গুণফল। Euler-এর যুগে এই গাণিতিক হিসাব এক কথায় অদৃষ্টপূর্ব ছিল। তাছাড়া Euler তখন জীবনের শেষপ্রান্তে, বয়স 70 আর চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রায় অস্তমিত।

পিঁয়ের ফার্মাকে (Pierre Fermat) একবার 100, 895, 598, 169-এর মৌলিকত্ব প্রমাণ করতে বলা হলে তিনি দেখিয়েছিলেন সংখ্যাটি 898, 423 এবং 112,303-এর গুণফল আর সংখ্যা দুটি মৌলিক। এই ধরনের অঙ্ক কষার ক্ষমতার কথা ভেবে অনেকেই কল্পনা করেছেন অতীতের এই সব দিকপাল অঙ্কশাস্ত্রবিদ্দের উৎপাদক নির্ণয়ের কিছু গুপ্ত কলা-কৌশল জানা ছিল, যা সময়ের ব্যবধানে আর যান্ত্রিক মস্তিষ্কের অবাধ ব্যবহারের ফলে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। 1874 সালে ষ্টানলি জীভনস (Stanley Jevons) একটি বইতে বিনা দ্বিধায় প্রশ্ন করেছিলেন—পাঠক কি বলতে পারেন কোন্ দুটি সংখ্যার গুণফল 8, 616, 460, 799? আমি জানি, আমি ছাড়া আর কেউ এই প্রশ্নের জবাব জানে না। কারণ, দুটি বৃহৎ মৌলিকের গুণফল হলো সংখ্যাটি। জীভনস একটি অঙ্ক কষার যন্ত্র তৈরির সম্ভাবনার কথা ভেবে প্রায় সফলও হয়েছিলেন। বিগত শতাব্দীর পাঠকের কাছে এই প্রশ্ন যতই জটিল হোক না কেন, আজকের একটি যান্ত্রিক মস্তিষ্ক কল্পনাতীত দ্রুতগতিতে মৌলিক দুটি, নির্ণয় করতে পারে। মৌলিক দুটি হলো 96,079 আর 89, 681.

হেনরি অর্নেষ্ট ডুডেনী ছিলেন জাতে বৃটিশ আর একজন নাম করা ধাঁধাবিশারদ। তাঁর সিদ্ধান্ত হলো শুধু একটি মাত্র অঙ্কের পুনরাবৃত্তিতে যদি কোন মৌলিক সংখ্যা দেখা যায়, তাহলে মোট হলো 11। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের উপর বিশ্বাস করে চুপচাপ বসে না থেকে নিউইয়র্কের জনৈক অস্কার হোপ সংখ্যার হিজিবিজি কাটতে কাটতে অবশেষে 1918 সালে দেখালেন ডুডেনীর বক্তব্য সঠিক নয়; কারণ 1-কে 19 বার লিখলে যে সংখ্যাটি দাঁড়ায়, সেটিও মৌলিক। পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হলো 1-এর 23 বার পুনরাবৃত্তিতেও যে সংখ্যাটি দেখা দেয়, সেটিও মৌলিক

ধাঁধাবিশারদ ডুডেনী শুধু মৌলিক সংখ্যা দিয়ে একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করলেন—যার বাহু আর কর্ণের মধ্যবর্তী মৌলিক সংখ্যাগুলির যোগফল 111 আর 111-ই হলো মৌলিক সংখ্যার সমাবেশে এই জাতীয় ম্যাজিক বর্গের সবচেয়ে ছোট ধ্রুবক সংখ্যা।

67	1	43
13	37	61
31	73	7

ডুডেনীর ম্যাজিক বর্গ। বর্গক্ষেত্রের যে কোন বাহু বা কর্ণের মধ্যবর্তী মৌলিক সংখ্যার যোগফল 111. এই ম্যাজিক বর্গের মৌলিক সংখ্যাগুলি 1, 3, 5…ইত্যাদির মত মানের ক্রমানুসারে সাজানো নয়।

ডুডেনীর ম্যাজিক বর্গকে টেক্কা মেরে 1913 সালে J. N. Muncey 1, 3, 5…ইত্যাদি থেকে স্বরু করে প্রথম 144টি মৌলিক সংখ্যা দিয়ে একটা অতিকায় বর্গক্ষেত্র তৈরি করলেন। বর্গক্ষেত্রের এক একটি বাহুতে 12-টি করে মৌলিক সংখ্যা আর প্রতিটি সারি আর মূল কর্ণ দুটির অন্তর্বর্তী সংখ্যাগুলির যোগফল 4514.

1	823	821	809	411	797	19	29	313	31	23	37
89	83	211	79	641	631	619	709	617	53	43	739
97	227	103	107	193	557	719	727	607	139	757	281
223	653	499	197	109	113	563	479	173	761	587	157
367	379	521	383	241	467	257	263	269	167	601	599
349	359	353	647	389	331	317	311	409	307	293	449
503	523	233	337	547	397	421	17	401	271	431	433
229	491	373	487	461	251	443	463	137	439	457	283
509	199	73	541	347	191	181	569	577	571	163	593
661	101	643	239	691	701	127	131	179	613	277	151
659	673	377	683	71	67	61	47	59	743	733	41
827	3	7	5	13	11	747	769	773	419	149	751

প্রথম 144-টি মৌলিক সংখ্যা দিয়ে তৈরী J. N. Muncey-এর ম্যাজিক বর্গক্ষেত্র। প্রত্যেকটি বাহু আর মূল কর্ণের মধ্যবর্তী সংখ্যার যোগফল 4514

ইউক্লিড সর্ববৃহৎ মৌলিক সংখ্যাটি আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে নিতান্ত সহজভাবে প্রমাণ করেছেন সবচেয়ে বড় মৌলিক সংখ্যা বলে কিছু নেই। প্রমাণ হিসেবে মৌলিক সংখ্যা সীমিত অনুমান করে নিয়ে যদি বলি যে N হলো সর্ববৃহৎ মৌলিক সংখ্যা, তাহলে 1 থেকে যে পর্যন্ত সমস্ত মৌলিক সংখ্যার গুণফলের সঙ্গে 1 যোগ করে যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে, তা হলো

$$(1\times2\times3\times5\times7\times11\cdots\cdots\times N)+1$$

এবং নিঃসন্দেহে এই সংখ্যাটি N-এর চেয়ে বড় আর একটি মৌলিক সংখ্যা। কারণ N পর্যন্ত যে কোন মৌলিক সংখ্যা দিয়ে এটি সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য নয়। কাজেই সর্ববৃহৎ মৌলিক সংখ্যা বলে কিছু নেই। শুধু অঙ্ক কষে বা যন্ত্রের সাহায্যে অতিকায় মৌলিক সংখ্যাগুলি নির্ণয় করলেই হলো। কিন্তু এটি সহজসাধ্য নয়। তবে এ পর্যন্ত যত মৌলিক সংখ্যা জানা গেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি হলো

$$(2^{11213}-1)$$

এতে রয়েছে 3,376-টি অঙ্ক। 1963 সালে ডোনাল্ড বি গীলিস ইলিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কম্পুটরের সাহায্যে সংখ্যাটি নির্ণয় করেছেন।

অবশেষে জানা গেল মৌলিক সংখ্যাগুলি দলে ভারী আর সভ্যসংখ্যার কোন শেষ নেই। তাহলে প্রশ্ন জাগে—মৌলিক সংখ্যাগুলিকে চিনে নেবার উপায় কি? সরলতম পদ্ধতি হলো 1 থেকে আরম্ভ করে সংখ্যাগুলিকে পর পর লিখে নিয়ে যৌগিক সংখ্যাগুলিকে বাদ দিয়ে দেওয়া। এই কাজটি নিঃসন্দেহে সময়সাপেক্ষ, আর যন্ত্রণাদায়ক; যদিও একটি যান্ত্রিক মস্তিষ্ক ঠিক একই প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মৌলিক সংখ্যাগুলিকে খুঁজে বেড়ায়।

মৌলিক সংখ্যা নির্ণয়ের এই পদ্ধতির আবিষ্কারক প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক-গণিতবিদ্ Erotosthens। Erotosthens-এর প্রক্রিয়ায় প্রথমে সংখ্যাগুলিকে মানের ক্রমানুসারে লিখে 2, 3, 5.........ইত্যাদি মৌলিক সংখ্যাদ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলিকে বাদ দিয়ে দিতে হয়। বাকী যা পড়ে রইল, তারা সব মৌলিক। এই নিয়মকে একটু ঢেলে সাজালে আরও তাড়াতাড়ি মৌলিক সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। 1 থেকে 100 পর্যন্ত মৌলিকগুলি জানতে হলে একটা আয়তক্ষেত্রের আকারে সংখ্যাগুলিকে লিখে দিতে হবে। প্রথমে 2 ছাড়া 2-এর গুণিতক সংখ্যাগুলিকে লম্বা লাইন টেনে কেটে দিতে হবে। এবার 3-দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলি বাদ গেল। পরবর্তী মৌলিক অঙ্ক হলো 5। 5-এর গুণিতকগুলিকে কোণাকুনি রেখা টেনে সরিয়ে দেওয়া হলো। ঠিক এইভাবে 7 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলিও কাটা হলো। পরবর্তী মৌলিক সংখ্যা হলো 11। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে $\sqrt{100}=10$। এর চেয়ে 11 বড় বলে আর কাটাকুটি করার দরকার হবে না। তবে যদি 100-এর পরবর্তী মৌলিকগুলি জানতে হয়, তাহলে 11, 13......ইত্যাদির গুণিতকগুলি বাদ দিতে হবে। এই আলোচনার সূত্র ধরে বক্তব্যটি নীচে দেখান হলো।

এই নিয়মে যদিও প্রথম 26টি মৌলিক সংখ্যা জানা গেল, কিন্তু গণিতজ্ঞেরা 1-কে মৌলিক সংখ্যা বলে গণ্য করেন না। কারণ 1 মৌলিক হিসাবে স্বীকৃত হলে মৌলিক সংখ্যা সম্পর্কিত অনেক সিদ্ধান্তই সহজে প্রমাণ করা যায় না। অঙ্কশাস্ত্রের একেবারে গোড়াকার মতবাদ অনুসারে যে কোন

যৌগিক সংখ্যা হলো নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি মৌলিকের উৎপাদক মাত্র। উদাহরণ হিসাবে 100 হলো $2 \times 2 \times 5 \times 5$-এর গুণফল! এর বাইরে আর কোন মৌলিকের গুণফলরূপে 100-কে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু 1 যদি মৌলিক হয় তাহলে এই মত আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সেইক্ষেত্রে 100-কে $2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 1$, $2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 1 \times 1, \cdots\cdots$ ইত্যাদি অসংখ্য মৌলিকের উৎপাদক হিসাবে প্রকাশ করা যাবে। এই জাতীয় অসুবিধার জন্যই মৌলিক সংখ্যার জগতে সর্বকনিষ্ঠের সম্মান থেকে 1-কে বঞ্চিত করা হয়েছে।

Eratosthenes-এর টেবিলটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 3-এর চেয়ে বড় যে কোন মৌলিক সংখ্যাই 6-এর গুণিতকের চেয়ে 1 বেশী নয়তো 1 কম। যেমন

$$5 = 6 \times 1 - 1$$
$$7 = 6 \times 1 + 1$$

কিংবা

$$71 = 6 \times 12 - 1$$
$$73 = 6 \times 12 + 1$$

এই জাতীয় মাত্র 2-এর ব্যবধানে জোড়ায় জোড়ায় মৌলিক সংখ্যাকে বলা হয় যমজ মৌলিক সংখ্যা, যেমন 29, 31; 209267, 209269; 1,000,000,009,649 এবং 1,000,000,00 ,651; ইত্যাদি।

সংখ্যারাশিকে 1 থেকে 10, 10 থেকে 20, 21 হতে 30 ইত্যাদি দশটি সংখ্যার পরিবারে যদি সাজানো যায়, তাহলে দেখা যবে সর্বাধিক চারটির বেশী মৌলিকের সংখ্যা কোন পরিবারেই নেই। নিতান্ত বিরল সংখ্যক ক্ষেত্রেই 4টি করে মৌলিকের আবির্ভাব হয়ে থাকে এবং 1 থেকে 5000-এর মধ্যে মাত্র 10টি ভাগ্যবান পরিবারে যোগাযোগ লক্ষ্য করা গেছে। এই দশটি পরিবার হলো:

(i)	2	3	5	7
(ii)	11	13	17	19
(iii)	101	103	107	109
(iv)	191	193	197	199
(v)	821	823	827	829
(vi)	1481	1483	1487	1489
(vii)	1871	1873	1877	1879
(viii)	2081	2083	2087	2089
(ix)	3251	3253	3257	3259
(x)	3461	3463	3467	3469

এবং এই সংখ্যাগুলির মধ্যেও যমজ মৌলিকের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

Erathosthens প্রবর্তিত সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়াটি ছাড়া যদি কোন সহজ সূত্র আবিষ্কার করা যেত, তাহলে মৌলিক সংখ্যা নির্ণয়ের পদ্ধতি অনেক সরল হয়ে যেত। দীর্ঘকাল ধরে নানা বিজ্ঞানী আর সৌখীন অঙ্কশাস্ত্রবিদ অনেক চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত এমন কোন নিখুঁত ফরমুলা বের করতে পারেন নি, যা দিয়ে শুধু মৌলিক সংখ্যা জানা সম্ভব।

1640 সালে ফরাসী গণিতজ্ঞ ফার্মা একটি ফরমুলা আবিষ্কার করেন; যার সাহায্যে তিনি রায় দিয়েছিলেন যে কেবলমাত্র মৌলিক সংখ্যাই জানা যাবে। ফার্মার সূত্রটি হলো—

$$2^{2^n} + 1, \quad n = 1, 2, 3, 4, \cdots\cdots \text{ইত্যাদি।}$$

এই সূত্রটিতে $n = 1, 2, 3, 4 \cdots\cdots$ বসালে যথাক্রমে পাই

$$2^{2^1} + 1 = 5 \qquad (n=1)$$
$$2^{2^2} + 1 = 17 \qquad (n=2)$$
$$2^{2^3} + 1 = 257 \qquad (n=3)$$
$$2^{2^4} + 1 = 65537 \qquad (n=4)$$

বাস্তবিক পক্ষে এই প্রত্যেকটি সংখ্যাই মৌলিক। ফার্মার প্রায় শতাব্দীকাল পরে জার্মান গণিতজ্ঞ Euler দেখালেন $n = 5$-এর ক্ষেত্রে মৌলিক সংখ্যা পাওয়া যায় না; অর্থাৎ 4,294,967,297 ($n = 5$) হলো 6,700,417 এবং 641-এর গুণফল

মৌলিক সংখ্যা নির্ণয়ের আর একটি চিত্তাকর্ষক সূত্র হলো

n^2-n+41, n=1, 2, 3……ইত্যাদি।

এই সূত্র অনুসারে n=1, 2, 3……থেকে 40 পর্যন্ত সব সময়েই মৌলিক সংখ্যা পাওয়া যায়, কিন্তু n=41 বসালে

$41^2-41+41=41^2$ এবং সংখ্যাটি মৌলিক নয়।

তৃতীয় আর একটি সূত্র মৌলিক সংখ্যা প্রকাশের পথে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হলেও শেষ পর্যন্ত শুধু মাত্র মৌলিক সংখ্যার জন্মদাতার সম্মান লাভ করতে পারে নি। সূত্রটি হলো—

$n^2-79n+1601$। এই সূত্রে n=79 পর্যন্ত কেবল মৌলিক সংখ্যাই প্রকাশ করে, কিন্তু n=80 বসালে

$80^2-79\times80+1601=1681=3\times17\times31$

আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতিতে আজকের মানুষ হতবাক, কিন্তু ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয় যে মৌলিক সংখ্যা নির্ণয়ের মত আপাত সহজ একটা সমস্যার নিখুঁত সমাধান আজ পর্যন্ত হয় নি। এখনো পর্যন্ত এমন একটি সূত্র বা ফরমুলা অঙ্কশাস্ত্রের পাতায় অজানা রয়ে গেছে এবং সত্যি সত্যি এমন কোন ফরমুলা আবিষ্কৃত হবে না কেউ জানে না।

অতঃপর জানা গেল মৌলিক সংখ্যা নির্ণয়ের কোন ত্রুটিহীন সূত্র নেই, স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে তাহলে অন্ততপক্ষে কোন প্রদত্ত সংখ্যা সীমার অন্তর্বর্তী মৌলিক সংখ্যার শতকরা হার নির্ণয় করা কি সম্ভব? আর এই শতকরা হারের মান সংখ্যা-মালার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে-কমে? না, এই শতকরা হার একটি ধ্রুবক সংখ্যা? এই সব প্রশ্নের সবচেয়ে সহজ উত্তর হলো—প্রদত্ত সংখ্যামালার মধ্যবর্তী মৌলিক সংখ্যাগুলিকে গুণে নিয়ে তার শতকরা হার বের করে নেওয়া। যেমন 1 থেকে 100-এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা হলো 26টি; 1000-এর মধ্যে 168টি; 1,000,000-এর মধ্যে 78498টি; 1,000,000,000-এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা হলো 50, 847, 478টি; ইত্যাদি। এই মৌলিক সংখ্যা-গুলিকে নিজ নিজ সংখ্যাসীমা দিয়ে ভাগ করে নীচের টেবিলটি তৈরি করা যায়।

সংখ্যাসীমা 1—N	মৌলিকের সংখ্যা	অনুপাত	$\frac{1}{\log_e N}$	বিচ্যুতি Deviation %
1 — 100	26	0·260	0·217	20
1 — 1000	168	0·168	0·145	16
1 — 10^6	78498	0·078498	0·072382	8
1 — 10^9	50847478	0·050847478	0·048254942	5

এই টেবিলটি থেকে মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে সংখ্যাসীমা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে মৌলিক সংখ্যার পরিমাণ কমতে থাকে বটে, কিন্তু কখনই এমন একটা অবস্থা আসে না, যেখানে মৌলিক সংখ্যার অস্তিত্ব একেবারেই নেই। সংখ্যাসীমা বৃদ্ধি ও মৌলিক সংখ্যার শতকরা হার কমে যাওয়ার ব্যাপারটিকে একটি গাণিতিক সূত্রে প্রকাশ করা হয়েছে। এই সূত্রটি দিয়ে যে কোন সংখ্যাসীমার মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কিভাবে ছড়িয়ে আছে তা জানা যায় এবং এই সূত্রটি সংখ্যাবিজ্ঞানের অনেক স্মরণীয় আবিষ্কারের মধ্যে অন্যতম। সূত্রটি মোটামুটি ভাবে এই: 1-থেকে যে কোন সংখ্যাসীমা N পর্যন্ত

মৌলিক সংখ্যার শতকরা হার N-এর স্বাভাবিক লগারিদমের প্রায় সমান।

উল্লিখিত টেবিলের চতুর্থ সারিতে N-এর স্বাভাবিক লগারিদমের মানের সঙ্গে তৃতীয় সারির অনুপাতটির তুলনা করলে সূত্রটির সত্যতা বোঝা যাবে। সূত্রটির সঠিক মূল্যায়ন করতে গেলে N-এর মান অবিশ্বাস্যভাবে বড় হওয়া প্রয়োজন। মৌলিক সংখ্যার এই সিদ্ধান্তটি অন্যান্য সূত্রের মত নিতান্ত পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে হিসাবনিকাশ করেই আবিষ্কৃত হয়েছে এবং দীর্ঘকাল যাবৎ কোন গাণিতিক চিন্তাধারা অনুসরণ করে তা প্রমাণ করা হয় নি। গত শতাব্দীর শেষপ্রান্তে ফরাসী অঙ্কবিদ Hada-

কিন্তু আধুনিককালে এই চিন্তাধারায় যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটতে চলেছে এবং এই নতুন তত্ত্বের জন্মদাতা হলেন অধ্যাপক M. Ulam

লস্ এলামস্ ল্যাবোরেটরীর (Los Alamos Scientific Laboratory, USA) পদার্থবিদ M. Ulam কোন একটি সেমিনারে নিতান্ত দীর্ঘ একটি একঘেয়ে নীরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের আলোচনা শুনতে শুনতে সময় কাটানোর জন্য কিছু না ভেবেই একটি কাগজে লাইন কেটে গ্রাফের মত তৈরি করলেন। প্রথমে ভাবলেন দাবা খেলার কোন একটা সমস্যা নিয়ে চিন্তা করবেন। পরে কি ভেবে গ্রাফের মধ্যিখান থেকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত মুখী

100	99	98	97	96	95	94	93	92	91
65	64	63	62	61	60	59	58	57	90
66	37	36	35	34	33	32	31	56	89
67	38	17	16	15	14	13	30	55	88
68	39	18	5	4	3	12	29	54	87
69	40	19	6	1	2	11	28	53	86
70	41	20	7	8	9	10	27	52	85
71	42	21	22	23	24	25	26	51	84
72	43	44	45	46	47	48	49	50	83
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82

অধ্যাপক Ulam-এর পদ্ধতিতে 1 হতে 100 পর্যন্ত শৃঙ্খল রেখায় লিখিত সংখ্যা। মৌলিক সংখ্যাগুলোকে বৃত্ত দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

mard এবং বেলজিয়ান বিজ্ঞানী Vallee´ Poussin অত্যন্ত জটিল গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে সূত্রটির সত্যতা প্রমাণ করেছেন এবং তার আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বহির্ভূত।

প্রবন্ধের গোড়ায় উল্লেখ করেছি মৌলিক সংখ্যাগুলি সাধারণভাবে কোন নিয়মের বাঁধনে পড়ে না।

একটি শৃঙ্খল রেখায় 1 থেকে আরম্ভ করে সংখ্যা লিখতে লাগলেন। তারপর যতগুলি মৌলিক সংখ্যা চোখে পড়লো, সবগুলিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করলেন। অবাক হয়ে দেখলেন প্রায় সমস্ত মৌলিক সংখ্যাগুলি এক একটি সরলরেখায় কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। অধ্যাপক Ulam-এর পদ্ধতি অনুসরণ করে

1 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যা লিখে মৌলিক সংখ্যা-গুলিকে বৃত্ত দিয়ে চিহ্নিত করে পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো গেল।

প্রথমেই চোখে পড়ে মৌলিক সংখ্যাগুলেই তির্যক রেখায় সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে আর এই বিশেষ জ্যামিতিক পদ্ধতিতে সংখ্যা প্রকাশ করার ফলে আর একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। যেমন—তির্যক রেখায় অবস্থিত 5, 19, 41 এবং 71-কে একটি দ্বিঘাত রাশিমালা $4x^2+10x+5$-এর সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। যদি ক্রমান্বয়ে $x=0$, 1, 2 এবং 3 হয় তাহলে এই দ্বিঘাত রাশিমালার মান যথাক্রমে 5, 19, 41 এবং 71 হবে।

+x	y	−x	y
0	17		19
1	23	2	29
2	37	3	47
3	59	4	73
4	89	5	107

অধ্যাপক Ulam প্রবর্তিত টেবিলের দিকে তাকিয়ে এই মৌলিক সংখ্যাগুলির অবস্থান লক্ষ্য করে আপাতভাবে তাঁর থিওরি পর্কে সন্দেহ আসতে পারে। টেবিলের কেন্দ্রে রয়েছে বলে এই আপাত অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছে এবং যদি 17-কে কেন্দ্রে রেখে একটি শঙ্খিল রেখা আঁকা যায়, তাহলে এই সন্দেহের নিরসন হবে। একটি 10 × 10 বর্গক্ষেত্র এঁকে তা বোঝানো হলো।

							109	108	107
81	80	79	78	77	76	75	74	73	106
82	53	52	51	50	49	48	47	72	105
83	54	33	32	31	30	29	46	71	104
84	55	34	21	20	19	28	45	70	103
85	56	35	22	17	18	27	44	69	102
86	57	36	23	24	25	26	43	68	101
87	58	37	38	39	40	41	42	67	100
88	59	60	61	62	63	64	65	66	99
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98

$4x^2+2x+17$ অথবা x^2+x+17 এই দুই দ্বিঘাত রাশিমালার অন্তর্গত মৌলিক সংখ্যার অবস্থান।

উল্লিখিত আলোচনার সূত্র ধরে দেখানো যাবে যে 17 দিয়ে যে তির্যক রেখাটি আরম্ভ হয়েছে তার সংখ্যাগুলোকে $4x^2+2x+17$ $(=y)$ দিয়ে নির্ণয় করা যাবে। x-এর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মান বসিয়ে আমরা y-এর নিম্নলিখিত মান পাই :

টেবিলটি থেকে দেখা যাবে যে x-এর ধনাত্মক মানের জন্য মৌলিক সংখ্যাগুলি কর্ণের নিম্নার্ধে এবং x-এর ঋণাত্মক মানের জন্য মৌলিক সংখ্যাগুলি কর্ণের উপরার্ধে অবস্থান করছে। শুধুমাত্র x-এর ধনাত্মক মান দিয়ে এই টেবিলটি

প্রকাশ করতে হলে x^2+x+17-এর সাহায্যে তা করা যাবে। এই সূত্রের সাহায্যে $x=0$ থেকে $x=15$ পর্যন্ত শুধু মৌলিক সংখ্যা নির্ণয় করা যাবে। এর অর্থ হলো, যদি আমরা শঙ্খিল রেখাটি 17 দিয়ে সুরু করে 16×16 সাইজের একটি বর্গক্ষেত্র সম্পূর্ণ করি, তাহলে কর্ণের উপরে মৌলিক সংখ্যাগুলি ঠাসাঠাসিভাবে থাকবে। 10×10 বর্গক্ষেত্রের কর্ণ থেকে পাঠকরা তা সহজেই আন্দাজ করে নিতে পারবেন।

Euler-এর একটি মৌলিক সংখ্যা সম্বন্ধ সূত্র হলো x^2+x+41, তার সাহায্যে 41-কে কেন্দ্র রেখে একটি শঙ্খিল রেখা আঁকা যায়। এই সূত্রটি 41 থেকে আরম্ভ করে 40টি মৌলিক সংখ্যা প্রকাশ করবে যারা একটি 40×40 বর্গক্ষেত্রের কর্ণের উপরেই থাকবে। উৎসাহী পাঠকরা বর্গক্ষেত্রটি এঁকে এর সত্যতা যাচাই করতে পারেন।

প্রবন্ধের গোড়াতে আলোচনা করেছিলাম মৌলিক সংখ্যার জগতে কোন নিয়মকানুন নেই, এরা হয়ত কোন অনিশ্চয়তাবাদের মায়ায় নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু অধ্যাপক Ulam এর হিজিবিজি চিন্তার খাতা থেকে আমরা যেসব চিত্তাকর্ষক তত্ত্ব জানতে পারলাম, তাতে হয়তো এই তথাকথিত অনিশ্চয়তাবাদের অনেক আবরণ একদিন উন্মোচিত হবে আর মৌলিক সংখ্যা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানীদের ধারণার আমূল পরিবর্তন হবে। Ulam এর যুগান্তকারী চিন্তা সংখ্যাবিজ্ঞানে যা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা গণিতবিদ্‌রা হাল্কাভাবে গ্রহণ করতে চান না; কারণ, একদা অধ্যাপক Ulam-এর বক্তব্য অনুসরণ করেই পৃথিবীর সর্বপ্রথম থার্মোনিউক্লিয়ার বোমাটি তৈরি হয়েছিল।

সপগন্ধার চাষ

পরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য*

বিভিন্ন রকমের অসুখে গাছগাছালির ব্যবহার আজ নতুন কিছু নয়। প্রাচীনকাল থেকেই এই গাছগাছালির ব্যবহার চলে আসছে। এদের মধ্যে সর্পগন্ধাও একটি। এর প্রয়োজনীয়তাও অনেক।

সর্পগন্ধা সাপের বিষের প্রতিষেধক হিসেবেই সুপরিচিত। অন্যান্য কীট 'দংশনেও এর ব্যবহার

ভারতের প্রায় সর্বত্রই গাছটি জন্মায়। মহারাষ্ট্রে গুজরাটে, তামিলনাড়ুতে, কেরালাতে, কর্ণাটকে, বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব এবং উড়িষ্যাতেই এই গাছ বেশী পরিমাণে হয়ে থাকে। সাধারণতঃ স্যাঁতসেতে অঞ্চলেই এই গাছ উৎপন্ন হয়। বৃষ্টিপাতের পাল্লা সাধারণতঃ 175 সেন্টিমিটার থেকে বছরে 375 সেন্টিমিটার পর্যন্ত এবং উচ্চতা

সর্পগন্ধা

জানা আছে। সর্পগন্ধা হচ্ছে সংস্কৃত নাম। বিজ্ঞানীরা গাছটিকে রাউলফিয়া সার্পেণ্টিনা বেন্থ বলেই জানেন। এটি গাছের বৈজ্ঞানিক নাম। এটি অ্যাপোসায়ানেসিয়া পরিবারভুক্ত।
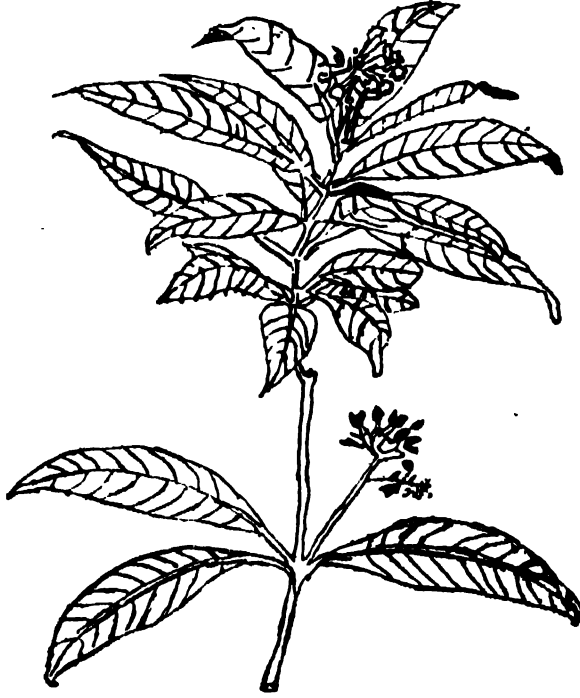
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 13.0 মিটারের মত হলেই ভাল হয় (Science Reporter, August 1977, P. 524।

এই গাছের উচ্চতা 30 থেকে 36 সেন্টিমিটার

পোঃ আগরপাড়া নর্থ ষ্টেশন রোড ২৪ পরগণা

পর্যন্ত হতে পারে। এর পাতাগুলি আয়তাকার ফলগুলি সাদা এবং ছোট। এর চামড়া মসৃণ। পাতাগুলি লম্বায় 7·5 সেন্টিমিটার থেকে 15·5 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাতাগুলি উজ্জ্বল সবুজ, এরা ডাটাকে ঘিরে চক্রাকারে বর্তমান থাকে।

দিনে দিনেই দেশীয় এই গাছটির প্রতি দেশ বিদেশের সকল বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি বেড়েই চলছে। যে উপক্ষারটির ব্যবহার খুবই বেশী তার নাম রেসারপিন। গাছটির মূল থেকেই এই উপক্ষারটি শোষণ করা হয়। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতিকরণ জানা থাকলেও প্রাকৃতিক সূত্রই এখন পর্যন্ত বাণিজ্যিক পর্যায়ে উপক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ওষুধ হিসেবে এই গাছের উপকারিতা খতিয়ে দেখবার জন্যেও বিজ্ঞানীরা উদগ্রীব।

রেসারপিনই একমাত্র উপক্ষার নয়; অন্য অনেক উপক্ষারের সন্ধানও বিজ্ঞানীরা দিতে পেয়েছেন। এদের মধ্যে অ্যাজমেলিন আর সার-পেনটাইনের নাম উল্লেখযোগ্য। দুই-ই ক্ষতিকারক। ব্যাঙ্ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে অ্যাজ-মেলিন হার্টের অবনতি ঘটায় আর সারপেনটাইনও স্নায়ুকে দুর্বল করে। ইউরোপ এবং আমেরিকা প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশগুলিতে সর্পগন্ধার বিভিন্ন উপক্ষারের উপযোগিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

উপক্ষার বাদেও গাছের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে রেসিন, ষ্টার্চ, সিলিকেট, ফসফেট, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, ফাইটোস্টিরল, অলিয়িক অ্যাসিড ইত্যাদি। বর্তমান সময় পর্যন্ত রেসারপিনই ওষুধ হিসেবে বিশেষ স্থান পেয়েছে। অন্য উপাদানগুলির ব্যবহারের বিষয়টি এখনও পরীক্ষাধীন।

বেদনানাশক ওষুধ হিসেবেও রেসারপিনের ব্যবহার সুপরিচিত। অল্পমাত্রায় (0·01 মিলিগ্রাম প্রতি কেজিতে) যদি খরগোসের উপর ইনজেকশন করা যায় তবে দেখা যায় তা খরগোসকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আবার কুকুরের উপরেও (1 মিলিগ্রাম প্রতি কেজিতে) ইনজেকশন করে একই ফল দেখা গেছে।

সুতরাং বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি যত না অন্য অংশের প্রতি তার চেয়ে ঢের বেশী সর্পগন্ধার মূলের দিকে। একদা এই গাছের মূলই রক্তের উচ্চচাপ কমাতে ব্যবহার করা হতো। কুড়ি থেকে ত্রিশ গ্রামের মত মূল চূর্ণ করে দিনে দু-বার করে উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা গ্রহণ করতেন। এখন এই মূল থেকে যে রেসারপিন সংগৃহীত হয় তাই কাজে লাগানো হয়। যারা উচ্চ রক্তের চাপে ভুগছেন তাদের জন্যে 500 মিলিগ্রাম দৈনিক বরাদ্দ করা হয়।

যারা মানসিক রোগে ভুগছেন তাদের জন্যেও এই সর্পগন্ধার মূল অব্যর্থ ওষুধ। মৃগীরোগী এই মূল চূর্ণ গ্রহণ করে অনেক ভাল থাকে। সর্প-গন্ধার মূল এই রোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। যারা অনিদ্রা বা অন্য কারণ থেকে ভুগছেন তাদের পক্ষেও এই গাছের মূল সবিশেষ কার্যকরী। শুধু তাই নয়। কবিরাজরাও এই মূলকে ফুটিয়ে ক্বাথ তৈরি করতেন। সেই ক্বাথ নানা স্ত্রী-ব্যাধিতেও ব্যবহৃত হতো। যারা রক্তমাশয়ে বা অন্ত্রের পীড়ায় ভুগতেন তাদের জন্যেও কবিরাজরা হয় এই মূল না হয় এই ক্বাথ ব্যবহার করতেন।

বর্তমানে এই রকম গাছের উৎপাদন বৃদ্ধি নিয়ে বিজ্ঞানীরা বিচলিত। উৎপাদনের চেয়ে তাদের কাছে বড় কথা কিভাবে সর্পগন্ধার মূলে অধিক পরিমাণে (Science & culture, 36, P, 463, 1970; ibid, 35 P, 212, 1969) রেসারপিন গজানো সম্ভব হবে এবং কি ক পদ্ধতিতে সেই রেসারপিন সহজে বেশী পরিমাণে সংগ্রহ করা যাবে। তেমন একটি উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের দেশেও গবেষণা চলছে। দেখা গেছে এই গাছের ফল যখন ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে অর্থাৎ পাকে তখনই সর্পগন্ধার মূলে রেসারপিন উপক্ষারের মাত্রা বেড়ে যায়। সুতরাং

বেশী পরিমাণে রেসারপিন পেতে হলে সেই সময়েই মূল থেকে তা শোষণ করা শ্রেয়। মার্চ মাস নাগাদ যখন গাছে ফুল ধরতে চাইছে তখন গাছের মূলে রেসারপিনের মাত্রা খুবই কম থাকে। সে সময়ে শোষণ অর্থকরী হতে পারে না। কোন কোন বিজ্ঞানী এত ভাবছেন যে ডিফ্লোরেশন পদ্ধতিতে যদি রাউলফিয়া সারপেনটিনার চাষ হয় তবে মূলে রেসারপিনের মাত্রা অধিক পরিমাণে বাড়বে। কলকাতার সেণ্ট্রাল বোটানিক্যাল গার্ডেনে এ রকম একটি গবেষণা হয়েছে।

ডিফ্লোরেশন পদ্ধতিতে রাউলফিয়া সারপেনটিনা গাছের চাষের বিশেষ তাৎপর্য হলো—এতে মূলের ভিতর রেসারপিনের মাত্রাও বেশী হয়ে থাকে। দেখা গেছে মূলগুলি থেকে অধিক পরিমাণে শিকড় গজায় আর এই পদ্ধতিতে রাউলফিয়া সারপেনটিনার চাষ হলে মূলের ছালও ভারী হয়। বীজ থেকে উৎপন্ন চারাগুলিকে প্রতিস্থাপনের সময় যদি সম্পূর্ণভাবেই ডিফ্লোরেট করা হয় কেবল তখনই গাছের মূল অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় আর মূলই যেখানে রেসারপিনের প্রধান সূত্র, রেসারপিনও অত্যধিক পরিমাণেই মিলে।

ডিফ্লোরেশন বলতে ফুলধরে যেসব শাখায় তার বিনাশ সাধন আর ফুলের মুকুলের মূলোৎপাটনই বুঝায়। বীজোৎপন্ন চারাগুলিকে কতকগুলি সারিতে প্রতিস্থাপিত করা হয়। সারিতে সারিতে দূরত্বের ব্যবধান প্রায় 45 সেন্টিমিটারের মত। আর প্রতি সারিতে গাছ থেকে গাছের ব্যবধানও প্রায় 30 সেন্টিমিটারের মত। প্রথমাবস্থায় ছোট চারাগুলি যাতে রোদের সংস্পর্শে না আসতে পারে তার জন্যে চারাগুলিকে মাটির পাত্র (15 সেন্টিমিটারবিশিষ্ট) দিয়ে ঢেকে রাখলে ভাল হয়। প্রতিস্থাপনের একমাস পরে 14 দিন অন্তর অন্তর মাথাগুলির ড্রেসিং দরকার। জমিতে নাইট্রোজেন সার (অ্যামোনিয়াম সালফেট) ছড়ালে মূলে রেসারপিনের মাত্রা অত্যধিক বাড়তে পারে।

ফুল আর ফল দুই-ই গাছগুলি বাড়বার পক্ষে অন্তরায়। শীতকালে কোন গাছই—ডিফ্লোরেটেডই হউক আর নাই হউক—কোনটিই বাড়ে না। কলকাতায় সারাবছরই গাছে ফুল ধরে। সে কারণেই এদের দূরীকরণ অত্যাবশ্যক।

একমাত্র ডিফ্লোরেশন পদ্ধতিতেই রাউলফিয়া সারপেনটিনা গাছের চাষ অর্থকরী হতে পারে। এতে উৎপাদন বাড়ছে ; সঙ্গে সঙ্গে মূল থেকে রেসারপিনও বেশী মিলবে। বিদেশের চাহিদা মেটাতে গিয়ে উদ্বৃত্ত রেসারপিনও রপ্তানী সম্ভব হবে। বিজ্ঞানীরা কলকাতার শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে এই নতুন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন যে এটি লাভজনক। যদিও ভারতের বিভিন্ন স্থানেই এই গাছের চাষ সম্ভব, বাংলায় কলকাতা, উত্তরপ্রদেশের হৃষিকেশে এবং দেরাদুনেই তা ভাল জন্মায়। অতীতে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষার কাজে পাটনা থেকেও এই গাছ সংগ্রহ করেছিলেন।

রেসারপিন কৃত্রিম উপায়েও তৈরি হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রাকৃতিক সূত্রই প্রধান। রাউলফিয়া-সারপেনটিনা গাছের মূলই এর অন্যতম সূত্র।

সঙ্গীত, সঙ্গীতযন্ত্র ও বিজ্ঞান

শশধর দে*

সঙ্গীত ও সঙ্গীতযন্ত্রে শব্দ-বিজ্ঞানের মূল নীতিগুলির প্রয়োগ দেখা যায়। সঙ্গীত শব্দ অথবা বর্ণের কম্পন সংখ্যার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। কম্পনে থাকে শক্তি ও গতি। এখানে নৃত্য, গীত ও বাদ্য—এই তিনটি কলার সমাবেশ দেখা যায়। স্বরসমষ্টিই সঙ্গীতের প্রাণ, রাগ ও রাগের রূপকে গড়ে তোলে। শিল্পীরা রাগকে রূপ (আকার) ও বর্ণের মাধ্যমে কল্পনা করেন। সূর্যের সাদা আলো যেমন সাতটি বর্ণের সমষ্টি, স্বরও তেমনি অনেকগুলি সুরের সমষ্টি। এই স্বরগুলিকে অনেকে বিভিন্ন পাখীর সঙ্গেও কল্পনা করে থাকেন।

সাম সঙ্গীতে সাত স্বরের পরিচয় পাওয়া যায়। কোরিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গীতে মাত্র 5টি করে স্বরের প্রচলন ছিল। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের গির্জাগুলিতে ধর্ম-সঙ্গীতেও 5 স্বরের ব্যবহার ছিল, পরে সংস্কৃতির বিকাশের ফলে 5 স্বর 7 স্বরে পরিণত হয়। চীনা সঙ্গীতের 5 স্বরের বিস্তার হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভূপালী রাগের মত। এই সঙ্গীতে 5 স্বরকে 12টি সমান সূক্ষ্ম অংশেও বিভক্ত করা হয়। জাপানী সঙ্গীতেও প্রধানতঃ 5টি মাত্র স্বরের ব্যবহার হয়।

সুরযুক্ত শব্দের ব্যাপারে মানুষের প্রকৃতি বড়ই জটিল। অনুমান করা হয়, বৈদিক মন্ত্রের সুর থেকেই হিন্দুরা প্রথম সঙ্গীত-বিজ্ঞান সৃষ্টি করেন। প্রকৃতপক্ষে সামবেদের সঙ্গে সঙ্গীত এক বিশেষ রূপে জড়িত। শব্দের তাত্ত্বিক ভাগ আবার সঙ্গীত বিজ্ঞানেই পুনঃ প্রকাশ করে।

প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতির পরিচয় দেয়। এই সঙ্গীতের উপর ভিত্তি করে আমরা কালের পক্ষে সুখদায়ক নূতন নূতন বাদ্যযন্ত্র তৈরি করি। সম্প্রতি 22টি শ্রুতির উপর ভিত্তি করে লেখক এক নূতন musical scale শ্রুতিযন্ত্র তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। এই musical scale প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, হিন্দুস্থানী ও দাক্ষিণাত্য সঙ্গীত, শ্রীনিবাস স্কেল, মঞ্জুরীকার স্কেল, Diatomic scale ও Equally tempered স্কেলকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করবে। শ্রীনিবাস মঞ্জুরীকার স্কেলে প্রথম কম্পাঙ্ক 240 ও শেষ কম্পাঙ্ক 480 ধরা হয়েছে। Diatomic ও Tempered স্কেলে প্রথম কম্পাঙ্ক 256 এবং শেষ কম্পাঙ্ক 512 ধরা হয়। Diatomic স্কেলে C, DO বা SA-কে Keynote, বা tonic ধরা হয়। এক্ষেত্রে Keynote-কে বদলানো সম্ভব নয় বলে Tempered Scale উত্থাপন করা হয়। এতে কম্পাঙ্ক 256 ও 512-র মধ্যবর্তী ভাগকে 12টি সমানভাবে ভাগ করা হয়।

সুরের মাধুর্য্য ও ধ্বনির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সঙ্গীত যন্ত্রকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে—(ক) বায়ু-কম্পনে যন্ত্র, (খ) তার-যন্ত্র ও (গ) পিটিয়ে-বাজানো যন্ত্র। আরও কিছু যন্ত্র আছে, যা রড বা বার ও প্লেট দিয়ে তৈরী। ঘণ্টা হচ্ছে প্লেট বা মেমব্রেনের সংস্করণ। অন্য আর এক রকম যন্ত্র জাইলোফোনে স্কেল দেবার জন্য ক্রমানুসারে সাজান বার থাকে। যখন হাতুড়ী দিয়ে ঘা মারা হয় তখন প্রত্যেক বার থেকে নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের সুর নির্গত হয়।

খোলা ও বন্ধ নলের বায়ুস্তম্ভকে কাঁপিয়ে সুমিষ্ট

*শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

শব্দের উৎপত্তি হয়। এখানে যে ধরণের তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তাকে স্থানুতরঙ্গ বলে। এই ধরণের বায়ু-কম্পনে বাদ্যযন্ত্র দুই শ্রেণীর—পত্রীবিহীন যন্ত্র (ফ্লুট, পিকোলো), পত্রীযুক্ত যন্ত্র (ক্ল্যারিয়োনেট হারমোনিয়াম, অর্গান, প্রভৃতি)। পত্রীযন্ত্র থেকে যে সুর নির্গত হয় তার কম্পাঙ্ক পত্রীর কম্পাঙ্কের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। Clarione', Oboes, Basson ইত্যাদির মুখে কেবলমাত্র একটি রীড ব্যবহার করা হয়। বায়ুস্তম্ভের ঠিক দৈর্ঘ্যেই কেবল নির্দিষ্ট সুর বেরিয়ে আসে। cavity যদি ঠিক সিলিণ্ডার হয় তবে সমমেলের উৎপত্তি হয়। বদ্ধ নল থেকে মূল সুরের কেবল অযুগ্ম সমমেলগুলি পাওয়া যায় কিন্তু খোলা নলে মূল সুরের যুগ্ম ও অযুগ্ম সকল প্রকার গুণিতকযুক্ত উপসুরই সৃষ্টি করা যায় বলে দু-মুখ খোলা বাঁশি বা অর্গান নলের সুর খুব মধুর হয়। শাঁখে ফুঁ দিয়ে বায়ুস্তম্ভের কম্পন সৃষ্টি করে মধুর শব্দ সৃষ্টি করা যায়। পিকোলো বা ছোট ফ্লুট খোলামুখযুক্ত বেলনাকার (cylindrical) পাইপ দিয়ে তৈরী এবং এতে 6টি ছিদ্রই বদ্ধ করে মাঝারি চাপে নলে ফু দেওয়া হয়। খোলা নলের মত মূল সুর বেরিয়ে আসবে। ফু দেওয়া মুখের দিকে যদি ছিদ্রগুলি একটির পর একটি খোলা হতে থাকে তবে সুরের তীক্ষ্ণতা বাড়তে থাকবে। যদি ছিদ্রগুলি বদ্ধ করে জোর চাপে ফু দেওয়া হয় তবে মূল সুরের এক অষ্টক ঊর্ধ্বে সুর নির্গত হবে।

টান-দেওয়া তারে তির্যক কম্পনের ফলে মধুর শব্দের সৃষ্টি হয়। এই সকল তার-যন্ত্রে তার বা পশুর অন্ত্র থেকে তৈরী ছিলা থাকে। এদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়—Plucke!, Struck এবং Bowed। ব্যাঞ্জো, ম্যাণ্ডোলিন, গীটার, harp ইত্যাদি হচ্ছে পাশ্চাত্ত্য দেশের plucked যন্ত্র কিন্তু সেতার, তানপুরা, সরোদ, বীণা ইত্যাদি এই রকম ভারতীয় যন্ত্র। আবার violin (বেহালা), viola ইত্যাদি হচ্ছে পাশ্চাত্ত্য bowed instruments, এই রকম ভারতীয় যন্ত্র হচ্ছে সারেঙ্গী, এস্রাজ, ইত্যাদি। একমাত্র Struck instrument হচ্ছে পিয়ানো, এই রকম ভারতীয় কোন যন্ত্র নেই। সেতার, এস্রাজ, বীণা গীটার প্রভৃতি যন্ত্রে তারের দৈর্ঘ্য ইচ্ছামত পরিবর্তন করে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের চড়া ও খাদের মিষ্টিসুর উৎপন্ন করা যায়। তারের বা ছিলার সুর তাদের টান, দৈর্ঘ্য ও ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। বেহালার শব্দের গুণ কোথায় ছড় টানা হয় তার উপর নির্ভর করে। তারের কম্পনের ফলে যে শব্দের সৃষ্টি হয় তাতে মূল সুরের সঙ্গে উচ্চ গ্রামের অনেক সুর অল্প পরিমাণে মিশানো থাকে। গীটারের তারকে pluck করার ফলে যে লব্ধি কম্পন পাওয়া যায় তা অনেকগুলি স্থানুতরঙ্গের উপরিপাত। প্রত্যেক স্থানুতরঙ্গ উপাংশের কম্পাঙ্কের জন্য লেখা যায়, $n = mv/2L$, $m = 1, 2, 3, \cdots$, v = শব্দের বেগ, L = তারের দৈর্ঘ্য। সাধারণতঃ মূল সুর প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ এর বিস্তার অন্যান্য উপাংশের চেয়ে অনেক বেশী। কম্পমান তার বায়ুকে কাঁপায় এবং তার ফলে একই কম্পাঙ্কের শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। কান এই তরঙ্গগুলিকে n কম্পাঙ্কের মধুর সুর হিসাবে শোনে। অন্যান্য উপসুরগুলি সুরের জাতি নির্ধারণ করে। সমস্ত তার-নির্মিত বাদ্যযন্ত্র এরকম ভাবে সুর সৃষ্টি করে। এই সব যন্ত্র যখন একই সুরে গাঁথা হয় অর্থাৎ একই মূলসুরের সঙ্গে কাঁপতে থাকে তখন তার থেকে উদ্ভূত শব্দের জাতিতে পার্থক্য উপসুরের বিস্তারের পার্থক্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কম্পনের সময় যে যে স্থানে কোন স্পন্দন থাকে না তারা হলো নিস্পন্দ বিন্দু (node) এবং সর্বাধিক স্পন্দনশীল বিন্দুগুলিকে বলা হয় সুস্পন্দ বিন্দু anti-node)। Young – Helmholtz-এর সূত্র থেকে জানা যায়, টানা তারের যে ভগ্নাংশে টঙ্কার দেওয়া অথবা ছড় টানা হয়, সেই অংশে যে যে উপরের সুরের নিস্পন্দ বিন্দু, সেই সেই সুরগুলি উৎপন্ন হয় না। তাছাড়া অন্যান্য উপসুরগুলি মূল সুরের সঙ্গেই পাওয়া যায়। যদি তারের এক-চতুর্থাংশে ছড় টানা

বা টঙ্কার দেওয়া হয়, তবে 4র্থ, 8ম, 16শ প্রভৃতি অঙ্কের স্বরগুলি বাদ পড়ে যাবে কিন্তু মূল স্বরের সঙ্গে 2য়, 3য়, 5ম, 6ষ্ঠ, 7ম, 9ম প্রভৃতি অঙ্কের উপস্বরগুলি পাওয়া যাবে। দেখা গেছে, 2য়, 3য় ও 4র্থ অঙ্কের উপস্বরই শব্দকে মধুর করে, 7ম-এর চেয়ে উঁচু স্বর মেশানো থাকলে শব্দ পীড়াদায়ক হয়ে পড়ে। লেখক composite string-এর (দুই বা তার বেশী বিভিন্ন প্রকৃতির তার দিয়ে তৈরী) কম্পন বিশ্লেষণ করে কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের শব্দ-তরঙ্গ লক্ষ্য করেন এবং দেখান যে Young-Helmholtz-এর সূত্র সেখানে খাটছে না। এই তথ্য নূতন বাদ্যযন্ত্র নির্মাণে আলোকপাত করতে পারে বলে অনুমান করা হয়। তানপুরা ও বীণার ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রথম যে কয়টি উপস্বর শব্দকে মধুর করে, এইগুলিই প্রাধান্য লাভ করে। যন্ত্রের খোলের বায়ু ও তারের যুগ্ম কম্পন থেকে Prof. White ও Prof. Raman violin জাতীয় যন্ত্রের 'wolf note' দেখান। দেখা যায়, এতে একটি নির্দিষ্ট স্বরকে স্বচ্ছন্দে বের করা যায় না, এই তীক্ষ্ণতাতে সমস্ত যন্ত্রই কেঁপে উঠে এবং নেকড়ের গর্জনের মত শব্দ উত্থিত হয়।

Struck যন্ত্রে ছোট কাঠের হাতুড়ী দিয়ে তারকে কাঁপানো হয়। এই সব যন্ত্রের সঙ্গে কাঁপা কাঠের বাক্স লাগানো থাকে। তার কাঁপালে এই সব বাক্সের বায়ুও কাঁপে এবং তার ফলে শব্দ বহুগুণ বেড়ে যায়। যন্ত্র থেকে নিঃসৃত শব্দের জাতি কি কাঠ দিয়ে ও কি ভাবে তৈরী তার উপর বেশ কিছু নির্ভর করে। খাঁজকাটা চাকৃতিবিশিষ্ট ও প্রচুর কোষ-দেয়াল সমন্বিত কাঠই এইরূপ যন্ত্র নির্মাণের পক্ষে উপযোগী বলে ধরা হয়। আবার, সেতুর (bridge) গঠনের উপরও জাতি নির্ভর করে। bridge-এর তল প্রায় চ্যাপ্টা এবং তারগুলি এর সঙ্গে সামান্য সূক্ষ্মকোণ উৎপন্ন করে। এজন্য কম্পন সমমেলে সমৃদ্ধ হয় এবং ম্যাণ্ডোলিন ইত্যাদি যন্ত্র থেকে ঊর্ধ্ব partial গুলির শক্তি বেশী উচ্চ হয়। সেতার, তানপুরা ইত্যাদিতে সেতুর গঠন একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। "The worth of a violin lies in the sound box, does not lie in the strings". আবার একটি তারের পরিবর্তে অনেকগুলি তার থাকার ফলে অনুনাদের বা স্বর ঝঙ্কারের সৃষ্টি হয়।

pluck করে যখন কোন তার যন্ত্রকে কাঁপানো হয়, গাণিতিক নিয়মে স্বরের অসীমশ্রেণী পাওয়া যায়। একটি বিশিষ্ট স্বরের বিস্তার স্বরের ক্রমের (order) বর্গের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। কাজেই উচ্চ ক্রমের স্বরের প্রাবল্য খুব তাড়াতাড়ি কমে যায়। উচ্চ সমমেলে শব্দ সমৃদ্ধ হয় না বলে মধুরতার অভাব হয়। তারের পুরো দৈর্ঘ্য এবং plucking-এর অবস্থানের উপরও প্রাবল্য নির্ভর করে। bowed যন্ত্রেও partial-এর বিস্তার সমমেল শ্রেণীতে partial-এর সংখ্যার বর্গের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু struck যন্ত্রেও সংখ্যার ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। কাজেই আমরা আশা করতে পারি যে, পরবর্তী ক্ষেত্রে বহির্গত শব্দ সমমেলে সমৃদ্ধ হবে। উপরন্তু তারকে কাঁপানোর পদ্ধতির উপরও জাতি নির্ভর করে। পাতলা সেলুলয়েড sheet (plectrum) দিয়ে pluck করা হয় বলে ম্যাণ্ডেলিনের শব্দ বীণা (harp) থেকে খুবই চমৎকার। বীণায় আঙুল দিয়ে pluck করা হয়।

তারযন্ত্রে মূল স্বরের তুলনায় উপস্বরগুলির কম্পাঙ্ক 2 গুণ, 3 গুণ, 4 গুণ ইত্যাদি অর্থাৎ সমমেলের সৃষ্টি হয়, কিন্তু চামড়ার পর্দা বা ঘণ্টায় কম্পাঙ্ক সরল অনুপাতে আসে না। এজন্য শব্দ শ্রুতিমধুর হয় না। পাতের উপর মিহি বালি ছড়িয়ে সুস্পন্দ ও নিস্পন্দ বিন্দু পাঠ করা যায়। ঢোল জাতীয় যন্ত্রে খোলের ভিতরের বায়ু ও খোলের নিজস্ব কম্পনের ফলে এক অন্য বৈশিষ্ট্যের শব্দ পাওয়া যায়, এই শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কম্পাঙ্কের অনুপাত সরল অনুপাতে নয় বলে শব্দ মিষ্ট হয় না, কিন্তু মৃদঙ্গ ও তবলার শব্দ মধুর হয়। অধ্যাপক রমন প্রথম এ সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করেন এবং পরে লেখক পর্দায় loading-এর

ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বাঁয়া ও তবলার কম্পনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন। কিরকম load কেমনভাবে দিলে উপসুর সমমেল হবে এবং কি রকম আকৃতির তবলা কোন্ যন্ত্র বা সঙ্গীতের পক্ষে সমতাল রেখে বাজবে, কার্নিস, তুন ও তুম্ থেকে কি ধরনের শব্দের উৎপত্তি হয় ইত্যাদির আলোচনা লেখকের কয়েকটি গবেষণাপত্র থেকে জানা যায় (Vibrations of a Kettledrum, J. Acoust. Soc. Am., **51** (5), 1972; Vibrations of a loaded Kettledrum, J. Sound & Vib., **20** (1), 1972; Experimental Study of the Vibration Characteristics of a loaded Kettledrum, Acustiea, 1978) লেখক যে loading-এর সূত্রাবলী উল্লেখ করেন, সেগুলি এখন De's Laws of Loading নামে সর্বত্র সুপরিচিত। বাঁয়া বা তবলার মুখ elliptical বা rectangular না হয়ে কেন circular হয় এবং তবলাতে কেন্দ্র ছাড়া সমকেন্দ্রিক পরিধির উপর বা অন্যত্র load দিলে উত্থিত শব্দ শ্রুতিমধুর হয় না কেন তারও ব্যাখ্যা লেখক দিয়েছেন (Vibrations of Loaded Composite Membranes, Proc. Ind. Soc. of Theo. & Appl. Mech. Cong., 1978, Vibrations of Composite Membranes, Ind. J. Math., 1978, Approx. Methods, for Determining the Vib. Modes of Membranes, Appl. Mech. Reviews, p. 1743, 1976).

মূল সুরের ক্ষেত্রে চামড়ার গোল পর্দা একভাগে কাঁপে, ঠিক পরের উপসুরের বেলায় দু-ভাগে কাঁপে। শব্দ যখন পর্দা ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখন পর্দার সঙ্গে কিরকম coupling হচ্ছে এবং শব্দ তরঙ্গ কিভাবে বিস্তারলাভ করছে এবং অসীমতলে কম্পমান পর্দাকে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে কিনা এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা লেখকের গবেষণাপত্র "Radiation of Sound from a Vibrating Baffled Drum, Acustica, 1975" থেকে জানা যাবে।

এখন আমরা অন্য একটি বাদ্যযন্ত্র "Aeolian Harp"-এর কথা আলোচনা করব। এতে একটি কাঠামোতে আড়াআড়িভাবে টান করা কতকগুলি তার থাকে। স্থির প্রবহমান বাতাসের জায়গায় রাখলে সুরযুক্ত শব্দের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সুরের উৎপত্তির জন্য বিভিন্ন ব্যাসের তার থাকে। বালুকণার বিরুদ্ধে যখন বাতাস বইতে থাকে তখন মরুভূমিতে এই Aeolian সুর শোনা যায়, এই করুণ সুরকে ভূতের কান্না ভেবে লোকে ভয় পায়।

সঙ্গীতে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 10 মিটার থেকে 3 মিটার (32 cps, থেকে 10.000 cps.) হয়। যদি 30 cm (1 ফুট) ব্যাসের কোন ছিদ্র থেকে শব্দ বেরিয়ে আসে, উচ্চকম্পাঙ্কের তরঙ্গ খুবই কম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু নিম্নকম্পাঙ্কের শব্দ তরঙ্গ পর্দার পিছনে চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। যখন ঐ ব্যাসের (30cm.) লাউড স্পীকার শব্দ পুনরুৎপাদন করে, ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি পাশের দিকে বেশী বিস্তৃত হয় না, কিন্তু দীর্ঘ তরঙ্গগুলি হয়। কাজেই লাউড স্পীকারের অক্ষ থেকে দূরে অবস্থানকারী কোন শ্রোতার কাছে সঙ্গীত অস্বাভাবিক মনে হবে। আবার, শব্দ-বিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী নাট্যঘর নির্মাণ না করলে সঙ্গীত সন্তোষজনকভাবে সকলের কাছে শ্রুতিগোচর হয় না। এটি প্রধানতঃ দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে:—(1) অনুরণন, (2) শব্দের ব্যতিচার।

এই ধরনের ঘরের ছাদ সমতল না হয়ে আর্চের মত বাঁকানো হয়। শব্দ আস্তে হলেও বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিফলিত হয়ে শ্রোতৃবর্গের সকলের কাছে পৌছায়। আবার, দেয়াল থেকে প্রতিফলিত শব্দ মূল শব্দের সঙ্গে মিশে গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে। দেয়ালে নরম সছিদ্র পর্দা ঝোলানো বা দেয়াল নরম প্যাড্ দ্বারা ঢেকে

দিলে প্রতিফলন হতে পারে না। অনেক সময় লোক বেশী থাকলে, শরীর শব্দ রশ্মি শুষে নেয় বলে এই ভয় কম থাকে। ঘরের মাত্রা ও আকৃতি ঠিকমত হলে ব্যতিচারের ভয় কম থাকে। দেয়াল ও সিলিং থেকে শব্দ তরঙ্গের প্রতিফলনের ফলে ব্যতিচারের সৃষ্টি হতে পারে। এই ব্যতিচারের ফলে শব্দ কোন কোন অংশে জোরালো হয় এবং কোন কোন অংশে নীরবতার সৃষ্টি হয়।

ঘরে অনুরণন-সময় এর আয়তনের সঙ্গে সমানুপাতিক কিন্তু শব্দের বেগ ও ঘরের পুরো শোষণের ব্যস্তানুপাতিক। ফেল্টের শোষণ ক্ষমতা বেশী, এতে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে সেখানে বায়ু কম্পন কমে যায় এবং তাদের শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

অনুরণন-সময় যদি খুব বেশী হয় তবে উৎস থেকে সরাসরি আগত পরবর্তী শব্দের সঙ্গে প্রতিফলিত শব্দের ব্যতিচারের সৃষ্টি হয়। আবার, এই সময় যদি খুবই কম হয় এবং ঘরের শোষণ ক্ষমতা যদি খুব বেশী হয় তবে ঘরকে dead room বলা যাবে।

ভারতে ঈল বা বান মাছের চাষ

নরেশমোহন চক্রবর্তী*

বর্তমানে মাছচাষের সঙ্গে সঙ্গে 'ঈল' বা বানমাছের' চাষও ভারত তথা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বেশ প্রচলিত হয়েছে। এর অন্যতম কারণ বিশ্বের বাজারে এর চাহিদা। বিশ্বের প্রায় সকল উন্নতিশীল দেশে বর্তমানে ঈল একটি সৌখিন ও রুচিকর খাবাররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সব দেশ হলো জাপান, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, ডেনমার্ক, ইটালী, ফ্রান্স, আয়ারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, গ্রীস প্রভৃতি। কাজেই বিভিন্ন দেশে মূল্যবান পণ্য হিসাবে ঈল চাষের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে জাপানই ঈলচাষের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। জাপানে কেবলমাত্র চাষের মাধ্যমেই বার্ষিক মোট 24,000 টন ঈল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। নানা প্রজাতির ঈল বা বানমাছের মধ্যে Anguilla anguilla, Anguilla japanica, Anguilla bicolar ও Anguilla bengalensis বিশেষ পরিচিত। এদের মধ্যে শেষোক্ত দুটি ভিন্ন প্রজাতির ঈল ভারতের পূর্ব সমুদ্র উপকূলবর্তী কয়েকটি প্রধান নদী ও জলাধারগুলিতে পাওয়া যায়।

চাষের পদ্ধতি—ঈল চাষে প্রথম প্রয়োজনীয় জিনিষ হলো এদের ছোট চারা সংগ্রহ। এলভ্যার (Elver) নামক 100 মি. মি. লম্বা ও 2 গ্রাম ওজন বিশিষ্ট এই চারাদের নানাধরণের জাল, যেমন - ছাকনী জাল, থলি জাল, জাপানী এলভার জাল প্রভৃতির সাহায্যে সংগ্রহ করা যায়, বিশেষ করে যখন এরা সমুদ্র থেকে বিভিন্ন নদীর নিম্ন এলাকায় উঠে আসে। ভারতে দুটি ভিন্ন প্রজাতির ঈলের এল্ভ্যার Anguilla bicolar ও A. bengalensis হুগলী, গোদাবরী, ও তাম্রপারনী প্রভৃতি নদী থেকে অক্টোবর-মার্চ মাসে সংগ্রহ করা হয়। এই সব সংগৃহীত 'এল্ভারদের' নানাধরণের প্রচলিত টিনের

ঈল মাছ

*সেন্ট্রাল ফিশারী, কাকদ্বীপ, পশ্চিমবঙ্গ

আধারে করে মৎস্য খামারে লালনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। একই সঙ্গে অনেক এলভ্যার বৃহৎ যানবাহনে বিশেষ বাতানুকূলের ব্যবস্থাসম্পন্ন জলাধারে করে বহন করা সম্ভব। তবে প্রতি ক্ষেত্রেই পরিবহণের পূর্বে প্রায় 24 ঘণ্টা ধরে এদের অনশনে রাখা প্রয়োজন। ঈলচাষের খামারে আঁতুড় পুকুর (nursery pond) ও লালন পুকুরগুলি (rearing pond) এক সমান্তরাল পংক্তিতে অবস্থান হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত যেন প্রতি পুকুরে স্বতন্ত্র জল প্রবেশ ও নির্গমনের ব্যবস্থা থাকে। এলভ্যারদের মজুত সংখ্যা পুকুরের জলের পরিমাণ ও গুণাগুণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। তবে সাধারণতঃ আঁতুড় পুকুরে প্রতি বর্গ মিটারে 30টি এলভ্যার ও লালনপুকুরে 20টি ছোট ঈল ছাড়া যেতে পারে। ঈল চাষে পরবর্তী লক্ষণীয় বিষয় হলো এদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করা। প্রারম্ভিক এলভ্যার দশায় খাদ্য হিসাবে কেবল কেঁচো জাতীয় প্রাণী ও পরে শুকনো মাছের গুঁড়া ও কেঁচোজাতীয় প্রাণীর মিশ্রণ দেওয়া যেতে পারে। প্রায় মাসাধিকাল পরে ছোট ঈলদের তাজা অথবা সিদ্ধ করা ম্যাকরেল, সার্ডিন ও অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ ও তৎসহ চিংড়ি, শামুক ও পশুর নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদিও দেওয়া যেতে পারে। সাধারণতঃ প্রতিদিন দু-বার এই খাদ্য দেওয়া যায়। প্রতিবারেই পুকুরের কোন একটি আচ্ছাদিত স্থানে তারজাল নির্মিত পাত্রে এই খাবার রেখে পাত্রটিকে ঠিক জলের উপরিতলে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, যাতে পুকুরের জল দূষিত না হয়। এলভ্যার দশায় তাদের দেহের মোট ওজনের শতকরা 30 ভাগ ও ছোট ঈলদের শতকরা 10 ভাগ হিসাবে খাদ্য দেওয়া যেতে পারে। খামারে চাষকালে জলের গুণাগুণের মান পরীক্ষা করা একান্তই আবশ্যক। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ যথেষ্ট থাকা একান্তই দরকার। পুকুরের জলে শৈবালজাতীয় উদ্ভিদের অবস্থান ঈলচাষের পক্ষে খুবই উপযোগী। লালনপুকুরে মজুতের অনতিকাল পরেই তাদের বৃদ্ধি নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন। এই সময় ছোট বা অবৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঈলদের সরিয়ে ফেলা আবশ্যক। এতে চাষের শেষে উৎপাদিত ঈলদের আকারের সমতা লক্ষ্য করা যায়। চাষের সময় এদের রোগ নিয়ন্ত্রণের উপরও নজর রাখা একান্তই আবশ্যক। চাষের শেষে 100 থেকে 200 গ্রাম ওজনের ঈলদের তুলে ফেলা যায়।

ভারতের দক্ষিণে কয়েকটি রাজ্যে ঈল চাষের ক্ষেত্রে বিশেষ আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। তামিলনাড়ুর 'মান্দাপাম ক্যাম্পে' 1971 সনে পরীক্ষালব্ধ ঈলচাষে বিশেষ নজির গড়া সম্ভব হয়েছে। উক্ত পরীক্ষাগারে সিমেণ্ট নির্মিত আধারে জল নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থাপনায় একই চাষ পদ্ধতিতে ঈলের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি এক বছরের শেষভাগে 50 সে. মি./202 গ্রাম ও দ্বিতীয় বছরের 55·6 সে. মি./380 গ্রাম করাও সম্ভব হয়েছে। মোটামুটি দেখা গেছে এক বছরেই এরা বাজারে বিক্রয়ের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। এই সময় তাদের বিক্রয় করাই লাভজনক। A.bicolar নামক ঈলের দু-বছরের শেষে মোট উৎপাদন হেক্টর প্রতি 38,000 কিগ্রা. পাওয়া গেছে যা নিঃসন্দেহে অপর যে কোন দেশের সঙ্গে তুলনীয়। ভারতে বিভিন্ন নদীসমূহে অবস্থিত এই অপর্যাপ্ত এলভ্যারদের যথাযথ উদ্ধার করা বা চাষের কাজে লাগানো আদৌ সম্ভব হয় নি। যদি সম্ভাব্য চেষ্টা চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে এদের সংগ্রহ করে কাজে লাগানো যায় তবে ভারতে সামগ্রিক ঈল উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব। এছাড়া বিদেশেও এদের যথেষ্ট চাহিদা আছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে জাপানেই ভারতের 'এলভ্যার' ও ঈলের চাহিদা ও কদর অত্যধিক। 1971 সনে এলভ্যারদের বাজার দর কেজি. প্রতি 1,100 টাকা থেকে 1,400 টাকা ও ঈলেদের ক্ষেত্রে 40 টাকা থেকে 50 টাকা পর্যন্ত হয়েছিল।

ভারতে 'এলভ্যার ও ঈলের অবস্থান, গতি প্রকৃতি, উৎস প্রভৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা চলেছে ও আশা করা যায় স্বল্পকালেই ভারতে ঈলচাষের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল প্রত্যাশিত ফল পাওয়া সম্ভব হবে। এতে কেবলমাত্র বিদেশী মুদ্রাই অর্জন করে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আরো শক্তিশালী করা যাবে তাই নয়, একই সঙ্গে দেশের বেকারীর এক অংশ দূর করা সম্ভব হবে।

বিজ্ঞান সমীক্ষা

শিল্পনগরী হাওড়ায় জনস্বাস্থ্য ও পেশাগত রোগ

বিকাশ চক্রবর্তী*

কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত হাওড়া জেলা শুধু পশ্চিম বঙ্গেরই নয়, ভারতের একটি অন্যতম শিল্পাঞ্চল। অবশ্য স্বাধীনতার পরে হাওড়ার শিল্প-প্রতিষ্ঠা ক্রমাগত কমেছে। তবু আজও হাওড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পনগরী।

অসংখ্য ছোটখাটো কলকারখানার ধোঁয়া, গৃহস্থের কয়লা, ঘুঁটের ধোঁয়া, খোলা নর্দমা, খাটা পায়খানা এবং সর্বোপরি কলকারখানাগুলির দরিদ্র শ্রমিকদের অগণতি বস্তি—এ হলো হাওড়ার প্রাথমিক পরিচয়। এর উপর আছে মুমূর্ষু শিল্পগুলির দারিদ্রজনিত প্রতিকারের অভাবে এবং কিছুটা সচেতনতার অভাবে শ্রমিকদের বিভিন্ন পেশাগত রোগ। সর্বমিলিয়ে হাওড়ার বর্তমান জনস্বাস্থ্য-পরিস্থিতি বিশেষ উদ্বেগজনক। অথচ কলকাতায় বাসস্থানের অভাবে হাওড়া আজকাল নিকটবর্তী বসতি-অঞ্চল হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। হাওড়ার বর্তমান জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশই আজ কলকাতার চাকুরে এবং তাদের আশ্রিত (dependent)। সে হিসেবে ইদানিং হাওড়ার চরিত্র কিছুটা বদলাচ্ছে।

হাওড়ার শিল্প প্রতিষ্ঠা : কলকাতার জন্মের কালে উল্টোদিকে হুগলী নদীর অপর পারে হাওড়াকে ব্রিটিশরা "ওয়ার্কশপ" হিসেবে তৈরি করেছিলেন। সমুদ্রপথে ব্যবসায়ে হাওড়ার প্রাচীন পরিচিতি (নৌঘাটা হিসাবে) অনুযায়ী য়ুরোপীয়রা অষ্টাদশ শতকে হাওড়াকে নৌ বা জাহাজঘাট হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। সেই থেকে হাওড়ায় প্রাচীন জাহাজ মেরামতি এবং পরে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের পত্তন। এই জাহাজঘাটগুলির প্রয়োজনে এবং তদানীন্তন বঙ্গে পাটের সুবিধার কারণে কিছু চটকল এবং দড়ির কারখানা গড়ে ওঠে। এরপর উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতার সঙ্গে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হাওড়া থেকে রেল লাইন পাতা শুরু হয়। প্রধানত উপরিউক্ত তিনটি বৃহৎ শিল্পের চাহিদা মেটাতে এবং রেল যোগাযোগের কারণে বাজার বৃদ্ধির ফলে হাওড়ায় বহু ধাতু (প্রধানত লোহ) শিল্প এবং আরো বহুতর শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। হাওড়ার এই বৃদ্ধি চলতে থাকে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত। এরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধের কালে বিপুল চাহিদা জনিত বৃদ্ধি এবং যুদ্ধোত্তর কালের মন্দা হাওড়ার বিশাল শিল্প কাঠামোকে বিশেষ অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয়। সেই সঙ্গে স্বদেশী যুগের কুটিরশিল্পের প্রসার এবং প্রবর্তনে হাওড়ার ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বিশেষভাবে মার খেতে থাকে। দেশভাগের পর ভারতের প্রধান পাট উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলি পূর্ববাংলায় পড়ে যায়, ফলে হাওড়ার চটকলগুলি বিশেষ অসুবিধায় পড়ে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দেশের সর্বত্র শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হাওড়ার বৃহৎ শিল্পের বাজারে মন্দা দেখা দিতে শুরু করে। এরপর সরকারী প্রচেষ্টায় কিছুটা সংরক্ষণের চেষ্টা করলেও হাওড়ার শিল্প আর সতেজ হতে পারে নি। বর্তমানে এই জেলার বৃহৎ এবং কিছু ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা মোটামুটি এই রকম [1] :

*হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ, 20 শিবপুর রোড, হাওড়া-711102

প্রধান বৃহৎ শিল্প	কারখানার সংখ্যা	মোট শ্রমিক সংখ্যা
জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামতি	11	2, 049
দড়ি নির্মাণ	7	2, 128
চটশিল্প	11 (1951 সালে ছিল 18)	19, 640 (151 সালে ছিল 25, 198)
ধাতু (প্রধানত লৌহ)	446	41, 122

প্রধান ক্ষুদ্র শিল্প	কারখানার সংখ্যা	শ্রমিক সংখ্যা
হোসিয়ারী	4	97
সাবান	4	159
তেলকল	10	213
সুতি বুনন	16	285
ছাপাখানা ইত্যাদি	80 (আনুমানিক)	400 (আনুমানিক)
প্লাস্টিক ও রাবার সংক্রান্ত	25 („)	900 („)
ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ, গাড়ী মেরামতি গ্যারেজ ইত্যাদি	200 („)	950 („)
অলঙ্কার নির্মাণ ইত্যাদি	200 („)	650 („)
ইলেকট্রিক সরঞ্জাম সংক্রান্ত	15	1, 516

আজকাল হাওড়ার শহরাঞ্চলগুলি কলকাতার নিকটবর্তী জনপদ হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে, এজন্য ছাপাখানা, অলঙ্কার নির্মাণ ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষ লক্ষণীয়।

জনসংখ্যা, জনপদ এবং জনস্বাস্থ্য : 1961 সালের আদমসুমারী অনুযায়ী হাওড়ার লোকসংখ্যা 512,598 [2] এবং এই জনসংখ্যার 46%ই বহির্দেশীয় (immigrant) [1]। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে বিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে হাওড়ার শিল্পের বিপুল প্রসারের শ্রমিক চাহিদা মেটাতে প্রধানত বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং উড়িষ্যা থেকে এরা হাওড়ায় এসে বসবাস করতে শুরু করে। সম্প্রতি কলকাতার বহু চাকুরীজীবী হাওড়ার কিছু কিছু অঞ্চলে (প্রধানত শিবপুর ইত্যাদি) এসে বাস করছেন।

হাওড়ার এই বিশাল জনতার বেশীরভাগই (প্রায় 62%) পরজীবী বা আশ্রিত (dependent) এবং জীবিকা উপার্জনক্ষম (সুযোগপ্রাপ্ত) কর্মীদের মাত্র 1·1% কৃষিকাজে নিযুক্ত [1], বেশীর ভাগ কর্মীই হাওড়ার বিভিন্ন ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ শিল্পগুলিতে অথবা পরিবহণ ব্যবস্থায় নিযুক্ত।

হাওড়া শহরাঞ্চলের জনপদগুলি অধিকাংশই হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি (স্থাপিত 1862) বিশেষ ভাবে কার্যকর হবার পূর্বেই গঠিত। এছাড়া দুঃস্থ শিল্পগুলির শ্রমিকদের স্বল্প মজুরীর কারণে অধিকাংশই শিল্প এলাকাগুলিতে বস্তি জীবন যাপনে বাধ্য হয়। হাওড়ার জনসংখ্যার 10%এর বেশীই বস্তিবাসী। শিল্পাঞ্চলগুলিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব তাই কলকাতার সমতুল। অথচ পুরব্যবস্থা যথাযথ না হওয়ায় হাওড়ার জনপদগুলি, বিশেষত শিল্পাঞ্চলগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সভ্য মানুষের বসবাসের অযোগ্য।

বর্তমানে হাওয়ায় শিশুমৃত্যুর হার 24·8%। মিউনিসিপ্যাল রেকর্ড অনুযায়ী [1] কয়েকটি বিশেষ রোগে হাওড়ায় বার্ষিক মৃত্যুর হার (1950-54) নীচে দেওয়া হলো :

রোগ :	শ্বাসকষ্ট জনিত	রক্তামাশয়	পেটের অসুখ	বসন্ত	নিউমোনিয়া	কলেরা	যক্ষ্মা
বার্ষিক মৃত্যু সংখ্যা	1,173	733	731	627	516	356	344

দেখা যাচ্ছে, শ্বাসকষ্টজনিত রোগের আক্রমণ হাওড়ার অধিবাসীদের মধ্যে খুব বেশী। এর কারণ অজস্র কলকারখানার ধোঁয়ায় আর ধুলোয় শিল্পাঞ্চলগুলির বাতাস সব সময় ভরে থাকে। তার ওপরে গৃহকর্মে কয়লা, ঘুঁটের যথেচ্ছ ব্যবহারে এবং বিশেষ করে শীতকালে বস্তি অঞ্চলে গা-গরম রাখার জন্য রাবার প্লাস্টিক ইত্যাদি পোড়ানোর কারণে শীতের তাপ-মাত্রার বিপরীত বিভব মারাত্মক ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও হাওড়ায় বহু পাট এবং সুতিকলের অবস্থিতির কারণে বাতাসে "আঁশ" এর পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। গঙ্গার উপর দিয়ে বাতাসে কিছুটা ছড়িয়ে পড়লেও এই সমস্ত ধুলো, ধোঁয়া এবং আঁশের বেশীর ভাগই প্রশ্বাসের সঙ্গে হাওড়াবাসীর ফুসফুসের মধ্যে চলে যায়।

পেশাগত রোগ : শিল্পে শ্রমিকদের দু-ধরণের বিপদের সম্ভাবনা : এক ধরণের হলো দুর্ঘটনাজনিত আকস্মিক, অপরটি পেশাগতজনিত দীর্ঘস্থায়ী। আগেই বলেছি হাওড়ার বর্তমান শিল্পগুলির ভীষণ আর্থিক দুর্দশা। সদিচ্ছা থাকলেও তাই কারখানা-গুলিতে, বিশেষত ছোট ছোট কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের পেশাজনিত বিপত্তি বা সঙ্কটগুলির বিরুদ্ধে কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। অবশ্য হাওড়ার বৃহৎ কিছু শিল্পসংস্থা তাদের মেডিকেল ইউনিটের মাধ্যমে কর্মীদের পেশাজনিত রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা, রোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা করে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে তারা নথিও (record) সংগ্রহ করে রাখে।

এ সম্পর্কে হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক সংগৃহীত এক সাম্প্রতিক সমীক্ষা প্রচেষ্টার উত্তরে আন্দুল রোডস্থিত হাওড়ার অন্যতম বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান Guest Keen Willums Ltd, তাদের তদানীন্তন মেডিকেল অফিসার ডাঃ বি. ভরের মাধ্যমে জানান [3] যে তারা তাদের সংস্থায় নয় প্রকার পেশাগত বিপত্তি বা রোগের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। বিপত্তি-গুলি যথাক্রমে : (1) অত্যধিক তাপজনিত, (2) বিভিন্ন তৈলজনিত, (3) ধাতুবাষ্পজনিত, (4) সায়ানাইড বিষক্রিয়া, (5) ট্রাইক্লোরোইথিলিন বিষক্রিয়া, (6) সীসা বিষক্রিয়া, (7) শক্তধাতু ক্রিয়া, (8) আর্ক ওয়েল্ডিংজনিত চক্ষুপীড়া, (9) তীক্ষ্ণ ও তীব্র শব্দজনিত পীড়া। উক্ত সংস্থা

আরও জানান যে এই সমস্ত রোগের প্রতি তাঁরা তীব্র দৃষ্টি রাখেন এবং এগুলির প্রতিকার ব্যবস্থায় তারা এ অঞ্চলে তো বটেই, সমগ্র ভারতের মধ্যে বিশেষ সাফল্যের দাবী করেন। অবশ্য উক্ত সমীক্ষক দলের অভিজ্ঞতা হাওড়ার অন্য সমস্ত বৃহৎ শিল্প সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে অনুরূপ নয়। বিশেষত কিছু 'মারোয়াড়ী' মালিকাধীন শিল্পসংস্থার অযথা হয়রানি এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকার প্রচেষ্টা এবং নথিপথের অভাব বিশেষ বিস্মিত করেছে।

ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে কিছু গাড়ী মেরামতি কারখানা, ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ, ছাপাখানা এবং অলঙ্কার নির্মাণ (স্যাকরা) কারখানা (দোকান) ইত্যাদিতে সমীক্ষা চালানো হয় [3]।

দেখা গেছে অনেকক্ষেত্রে 'গ্লাস' থাকা সত্ত্বেও ওয়েল্ডাররা শুধু চোখে ওয়েল্ডিং করেন। পরীক্ষিত 7 জন ওয়েল্ডারের মধ্যে 3 জন 'অসুবিধা না হলে' শুধু চোখেই ওয়েল্ডিং করে থাকেন। এদের মধ্যে 5 জন আমাদের কাছেই প্রথম জানলেন যে এতে চোখের রেটিনা চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা, এমন কি এ রোগ বংশানুক্রমিক হতে পারে, 2 জন জানালেন এবং বিপদ সম্বন্ধে তারা অবহিত ছিলেন।

দশ বছরের উপর ছাপাখানায় কর্মরত তিনজন কর্মীকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেছে তিনজনেরই পেটে মাঝে মাঝে ব্যথা হয়, যেটা lead colic কিনা তাঁরা জানেন না। সীসার বিষক্রিয়াজনিত কোন রক্তদোষের ব্যাপারেও তারা সচেতন নন। অবশ্য সচেতন হলেও উপায় কি আমরা জানি না।

অলঙ্কার শিল্পের কর্মীদের একটি বিশেষ বিপত্তি হলো নাইট্রিক অ্যাসিডের (অ্যাকোয়ারিজিয়ার) ধোঁয়া, অসহ্য ঝাঁজ এবং অস্বস্তির কারণে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করলেও এই ধোঁয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে গিয়ে ফুসফুসের যে মারাত্মক ক্ষতি করে দিতে পারে, সে চেতনা থেকে প্রতিকারের কোন চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় নি। পরীক্ষিত 16 জন কর্মীর 12 জনই শ্বাসকষ্টজনিত পীড়ায় অল্পবিস্তর আক্রান্ত। পরিষদের সম্মুখবর্তী অলঙ্কার শিল্পের কারখানাটিই (23, শিবপুর রোড) সম্ভবত এই অঞ্চলের একমাত্র এ ধরণের কারখানা যারা এ ব্যাপারে অবহিত হয়ে বিষাক্ত ধোঁয়াকে প্রায় 20 ফুট উচ্চ একটি চিম্‌নীর সাহায্যে বাইরে বের করে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার: পরিষদ কর্তৃক হাওড়ায় পেশাগত রোগের উপর সমীক্ষা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর একস্ট্রাকারিকুলার সায়েন্টিফিক অ্যাক্টিভিটিস (IAESA)-এর কলকাতা শাখা প্রদত্ত আর্থিক সহযোগিতায় সম্পন্ন, এজন্য পরিষদ উক্ত সংস্থাটির নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। সমীক্ষায় বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন শ্রীতপন দাস, শ্রীতাপস সেন, শ্রীপীতাম্বর পাল, শ্রীবিবেক চক্রবর্তী, শ্রীশৈলেন্ চৌধুরী, অভিতাভ মুখার্জী প্রমুখ সদস্যবৃন্দ। সামগ্রিকভাবে প্রকল্পটির জন্য ডাঃ বিশ্বনাথ ভরের প্রেরণা এবং সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।—লেখক]

উল্লেখ-নির্দেশ (Reference):

[1] A. B. Chatterjee, Howrah: A study in Social Geography Kashipati-Bharati Series 1. Calcutta 1967

[2] Census of India, Bengal 1961

[3] পরিষদ কর্তৃক IAESA-এ পেশাকৃত অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট, 1975-'77.

আমি আপনার পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। আমি একজন অর্থনীতির ছাত্র, যদিও সবকিছু বুঝতে পারি না, তথাপি আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত সহজ সরল ভাষার প্রবন্ধ, ধাঁধা ও প্রশ্নোত্তরগুলি পড়ে বুঝবার চেষ্টা করি।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সেই উদ্দেশ্য আজ আপনাদের মত কিছু দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট সমাদর লাভ করছে, তার বড় প্রমাণ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর জনপ্রিয়তা।

বর্তমানে চিঠি লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হলো যে, বিদেশের কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় (যেমন :—কেম্ব্রিজ, লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স, ম্যাসাচুসেট্স)-এর মত আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও অর্থনীতিকে একটি বিজ্ঞান হিসাবে ঘোষণা করেছেন এবং সেইমত আমাদের প্রথম পর্যায়ের ('78 সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা '81 সালে স্নাতক) ছাত্রদের থেকে বি. এস্-সি (ইকন্) ডিগ্রী দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী অর্থনীতিতে প্রচুর পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে এবং নতুন বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিসংখ্যান ও অঙ্কের উপর আলাদা পত্র (তৃতীয় পত্র) করা হয়েছে। সর্বোপরি অর্থনীতি একটি সমাজ-বিজ্ঞান। আপনাদের পত্রিকায় পরিসংখ্যানের উপর বিভিন্ন প্রবন্ধ বেরোয়, এমন কি মনোবিজ্ঞানের উপরও অনেক প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে।

তাই সমস্ত অর্থনীতির ছাত্রের তরফ থেকে, কেবল মাত্র ছাত্রই নয়, যাঁরাই অর্থবিজ্ঞানে আগ্রহী—তাঁদের পক্ষ থেকে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানএর 'বিজ্ঞান ও সমাজ' শীর্ষক বিভাগটিতে অর্থবিজ্ঞানের উপর কিছু কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করুন। বাংলাভাষায় অর্থনীতির উপর কোন প্রবন্ধই প্রকাশিত হয় না।

আশা করি আমার এই সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনার ও আপনার পত্রিকার পরিচালক মণ্ডলীর বিবেচনা লাভের যোগ্য।

পারিজাত পল্লব বিশ্বাস
ডাকঘর : কাঁথি, জেলা : মেদিনীপুর

দুঃখ প্রকাশ

1979 সালের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার 'বন্যা' সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারী'79) "ভাষান্তর বিজ্ঞান" বিভাগে প্রকাশিত "দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা" (মূল লেখক মেঘনাদ সাহা ও কমলেশ রায়) ভাষান্তর—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রবন্ধটি, বারোমাস পত্রিকার বন্যা সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর, 1978) প্রকাশিত এবং পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত উপরিউক্ত প্রবন্ধের বহুলাংশে নকল বলে শ্রীদেবদাস ভট্টাচার্যের লিখিত অভিযোগ পাবার পর আমরা শ্রীভট্টাচার্যের অভিযোগের যথার্থতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে নিঃসন্দেহ হয়েছি। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্যে আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি।

প্রকাশনা সচিব
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ভারতের দ্বিতীয় উপগ্রহ 'ভাস্কর'

এ বছর 7ই জুন ভারতের দ্বিতীয় উপগ্রহ 'ভাস্কর' মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এবং রাশিয়ার অ্যাকাডেমী অভ সায়েন্সেস 1975 সালে যে চুক্তি করেছিলেন সে অনুযায়ী এই উপগ্রহ উৎক্ষেপণের সমস্ত কর্মসূচী স্থির করা হয়েছে। উৎক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শ্রীহরিকোটা ও আমেদাবাদ এবং মস্কোর বেয়ার্স লেক থেকে এর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা হয়েছে।

উপগ্রহটির ওজন প্রায় 444 কিলোগ্রাম। উপগ্রহের সৌর ব্যাটারী থেকে প্রায় 47 ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এর সঙ্গে আছে নিকেল-ক্যাডমিয়াম রাসায়নিক ব্যাটারী। এই উপগ্রহ উৎক্ষেপণের উদ্দেশ্য হলো আবহাওয়া, জল, অরণ্য, সমুদ্র সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করা। এই উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'পৃথিবীর পর্যবেক্ষণের উপগ্রহ' (স্যাটেলাইট ফর আর্থ অবজারভেশন বা এস-ই-ও বা সিও)। এই উপগ্রহে আছে মাইক্রোওয়েভ রেডিওমিটার। এর সাহায্যে পর্বতের তুষার আবরণ, ভারতের উপকূল এলাকা এবং সমুদ্র সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যাবে। দক্ষিণ-এশিয়া উপমহাদেশের উদ্ভিদ, জলভাগের উপরিতল এবং বায়ুমণ্ডলের জল ও জলীয়-বাষ্পের পরিমাণ কত তাও জানা যাবে। দুই ব্যাণ্ড আলোকচিত্র তোলার উপযোগী দূরদর্শন ক্যামেরা উপগ্রহটিতে আছে।

বিষুবরেখার সঙ্গে 50·2 ডিগ্রি কোণ করে উপগ্রহটি প্রায় উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। প্রদক্ষিণকালে পৃথিবী থেকে এর নিকটতম দূরত্ব হচ্ছে প্রায় 512 কিঃ মিঃ এবং বৃহত্তম দূরত্ব হবে 557 কিঃ মিঃ। 50 দিন অন্তর উপগ্রহটি ভারতীয় উপমহাদেশের উপর দিয়ে যাচ্ছে।

ভাস্কর-1 (ষষ্ঠ শতাব্দী) এবং ভাস্কর-2 (দ্বাদশ শতাব্দী) দু-জন নামে ভারতীয় গণিতজ্ঞের কথা আমরা জানি। এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা উপগ্রহটির নাম দিয়েছেন 'ভাস্কর'।

অমূল্যধন দেব স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা (প্রথম বর্ষ)

বিষয় : "স্বয়ংনির্ভর ক্ষুদ্র শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ"

প্রবন্ধ দাখিলের শেষ তারিখ— 0শে অগাষ্ট, 1979

পুরস্কার :—প্রথম পুরস্কার—150·00 টাকা (নগদে)

দ্বিতীয় পুরস্কার—100·00 টাকা (নগদে)

বিঃ দ্রঃ (ক) প্রবন্ধ অনধিক 2000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে,

(খ) প্রবন্ধ ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিস্কারভাবে লিখে পাঠাতে হবে,

(গ) যোগদানকারীগণের বয়স অনধিক একুশ বৎসর হতে হবে,

(ঘ) প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানা কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006),

(ঙ) প্রবন্ধ নির্বাচন বিষয়ে পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং প্রবন্ধগুলি পরিষদ কর্তৃক প্রয়োজনবোধে প্রকাশ করবার অধিকার থাকবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

বিমুক্তিকরণ টিকা

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়*

"বিমুক্তিকরণ টিকা দিতে হবে—দিতে হবে—" বিশ্বের তাবত শিশুরা যদি এইরূপ একটি দাবী তোলে তাহলে অন্যায় হবে না। কারণ যে সব রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব সেগুলি প্রতিরোধের জন্য বিমুক্তিকরণ টিকা দেবার ব্যবস্থা না করতে পারাটা অবশ্যই প্রতিবাদযোগ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে আর একটি ধুয়াও আজকাল প্রচলিত হয়েছে--উপযুক্ত টিকার দ্বারা বিমুক্তি লাভের ব্যবস্থা করা শিশুদের জন্মগত অধিকার। এই প্রসঙ্গগুলি এত জোরদার হল কী করে। সত্যই কি শিশুদের কোন কোন সংক্রামক ব্যাধি থেকে বিমুক্ত রাখা সম্ভব? হ্যাঁ—সম্ভব। প্রথমতঃ দেখা গেছে কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধি বিশেষ করে শিশুদেরই আক্রমণ করে এবং এও প্রমাণিত হয়েছে যে—ঐসব রোগের মধ্যে অনেকগুলিকেই প্রতিষেধক টিকার দ্বারা শিশুদের অনাক্রান্ত রাখা সম্ভব এবং এর ফলে শিশুদের মৃত্যুর হার কমানো যায় ও ভবিষ্যতে—তাদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে সাহায্য করে।

উপযুক্ত টিকার দ্বারা সংক্রামক ব্যাধি বিমুক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা শিশু বা বয়স্কদের মধ্যে

25A, নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006

সমানভাবেই প্রযোজ্য। এখানে শিশুদের বিমুক্তিকরণের টিকা লওয়ার পদ্ধতি ও ক্রমসূচীর বিষয়েই আলোচনা করা হবে।

ডিফথিরিয়া ও হুপিংকাশি—এ দুটি রোগ সাধারণতঃ শিশুদেরই আক্রমণ করে থাকে। দুটিই দুরারোগ্য এবং মারাত্মক হতে পারে। গুটিবসন্ত, ধনুষ্টংকার এবং যক্ষ্মা এ কটি রোগ শিশু এবং বয়স্ক উভয়কেই আক্রমণ করতে পারে এবং এগুলিও দুরারোগ্য ও শরীরের বিশেষ হানিকর।

এখানে মাত্র এই কয়টি রোগের নাম করার উদ্দেশ্য, কেবল এই রোগগুলিরই প্রতিষেধক টিকা বিশেষ ফলপ্রদ এবং সেই জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া শিশুদের আক্রমণ করতে পারে এমন আরও দু-একটি রোগ আছে; যেমন—হাম ও মাম্পস্ (mumps)। হামের টিকা দেওয়ার প্রচলন আছে তবে আমাদের দেশে তা সুলভ নয়।

যে কয়টি শিশুরোগের টিকা দেওয়া হয় সেগুলি দেবার প্রকৃত সময়, মধ্যবর্তী কালক্ষেপ এবং বিশেষ পদ্ধতি আছে। এই রীতি পদ্ধতির আবার দেশে দেশে কিছু কিছু হেরফের করা হয়। এই কারণে শিশু স্বাস্থ্য সংস্থা একটি সর্বসম্মত সূচী নির্ধারিত করে দিয়েছে। আমাদের দেশে মোটামুটি ভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত রীতি মেনে চলা হয়। আমাদের দেশে যে পদ্ধতি ও সময়সূচীর নির্দেশ আছে সেটি নীচে দেওয়া হলো।

জন্মের প্রথম 3 মাসের মধ্যে	বসন্ত ও যক্ষ্মার টিকা (B.C.G.)
4 মাস থেকে 1 বছরের মধ্যে	3টি ট্রিপল্ অ্যান্টিজেন এবং 3 বার পোলিও টিকা
2 বছর বয়সে	দ্বিতীয় বার পোলিও টিকা
3 বছরে ও 5 বছরে	আর একবার ট্রিপল বা ডাবল্ অ্যান্টিজেন
8 বা 11 বছর বয়সে	আর একবার যক্ষ্মার টিকা

বসন্তর টিকা 2/3 মাসের মধ্যে অর্থাৎ শিশু এপাশ-ওপাশ করতে শেখার আগে দিলেই ভাল হয় তাহলে টিকা দেবার পর বেদনাদায়ক স্ফীত অংশটিতে কম আঘাত লাগবার সম্ভাবনা। এ সময়ের দেবার সুবিধা না হয়ে থাকলে যখন হোক নিশ্চয়ই দিয়ে নেওয়া উচিত।

যক্ষ্মার টিকা দেবার কয়েকটি বিশেষ নিয়ম আছে সেইজন্য যোগ্য অধিকারী ব্যতীত এ টিকা দেবার অধিকার আর কারও নাই। এইজন্য অন্যান্য টিকার মত যক্ষ্মা টিকা দেবার ব্যাপক ব্যবস্থা ভারতে নেই।

বলা হয়েছে 4 মাস থেকে 1 বছরের মধ্যে ট্রিপল্ অ্যান্টিজেন ও পোলিও টিকা নেওয়া কর্তব্য। এর যে কোন একটি 4 মাস থেকে আরম্ভ করে 4, 5, 6 এবং 7, 8 ও 9 মাসে দেওয়া যেতে পারে। পোলিও টিকা শেষের 3 মাসে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। দু-রকম টিকা একই সঙ্গে দেওয়া যেতে পারে অর্থাৎ একই মাসে একবার ট্রিপল অ্যান্টিজেন ও একবার পোলিও টিকা দিতে পারা যায়। মাঝখানে কিছু ব্যবধান রাখা উচিত।

ট্রিপল্ অ্যান্টিজেন টিকা কোন কারণে যদি সময়মত না দেওয়া হয়ে থাকে তবে 5 বছরের মধ্যে যে কোন সময়ে দেওয়া চলতে পারে। 5 বছরের মধ্যে না দেওয়া থাকলে যদি টিকা দেবার

প্রয়োজন হয় তাহলে ট্রিপল্-এর পরিবর্তে ডাবল্ অ্যান্টিজেন দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। মিশ্রিত টিকা থেকে হুপিং কাশির অংশ বাদ দিলে ডাবল্ অ্যান্টিজেন বলা হয়। 5 বছরের পর হুপিংকাশি টিকা দেওয়ার বিপদ আছে তাই দেওয়া হয় না। ট্রিপল্ অ্যান্টিজেন দেবার পরেও কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু উপসর্গ দেখা দেয়। তাতে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। দৈবাৎ যদি উপসর্গ গুরুতর হয় তখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

জ্বর অবস্থায় বা উদরাময় থাকলে কোন টিকা লওয়া উচিত নয়। দেহে চর্মরোগ থাকলে বসন্তের টিকা লওয়া উচিৎ নয়। 2 বছরের আগে শিশুদের কলেরার টিকা ও টায়ফয়েডের টিকা দেওয়া উচিত নয়। কলেরা বা টায়ফয়েডের টিকা মহামারী ছাড়া দেবার কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

টিকা দেবার এই কার্যক্রম সরকারী প্রচেষ্টা, চিকিৎসকের সহযোগিতা এবং আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। সকল সুবিধা থাকা সত্ত্বেও দেশের কিছু কিছু লোকের টিকা সম্বন্ধে ভয় বা অনীহা আছে। সেগুলি প্রচার এবং লোকশিক্ষার দ্বারা দূর করতে হবে। এ বিষয়ে চিকিৎসক ও অভিভাবকদের অবহিত হওয়া উচিত। যে সব জায়গায় টিকা দেবার ব্যবস্থা অপ্রতুল, সেসব জায়গায় অভিভাবকদেরই আপন আপন শিশুদের টিকা দেবার ব্যবস্থা করতে তৎপর হওয়া উচিৎ।

একটি স্বপ্ন ও তার সম্ভাবনা

সুভাষচন্দ্র মিত্র*

কেমন ভাল লাগে ভাবতে, দুপুরের পাঁচ-গলা গরমে কোনদিনই বৈদ্যুতিক পাখা বন্ধ হবে না বা পরীক্ষার আগের দিন মোমবাতি বা কেরোসিনের আলো প্রস্তুত করে রাখতে হবে না, হঠাৎ 'লোড শেডিং'-এর আশঙ্কায়। কিন্তু ভাল লাগলে কী হবে, যা নাকি হবার নয়, তা নিয়ে অনর্থক ভেবে কী লাভ ? এমন কথাটাই সাধারণ ভাবে মনে আসে। কিন্তু মানুষের একদিনের চিন্তাই তো ভবিষ্যতে বাস্তবে পরিণত হয়। অন্তত কিছুটা হয়তো বটেই। আর ভাবতে বা চিন্তা করতে দোষ তো কিছু নেই !

বিজ্ঞানীরা তাই ভাবতে বসলেন। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন, একরূপ শক্তি থেকে অন্যরূপ শক্তির উৎপাদন সম্ভব। বিজ্ঞানী জুল বললেন—কোন যান্ত্রিক শক্তিকে যদি তাপশক্তিতে পরিবর্তিত করা হয়, তবে দেখা যায় যে ঐ যান্ত্রিক শক্তি ও উদ্ভূত তাপশক্তির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত বর্তমান। অঙ্কের ভাষায় বলা যায় $W = JQ$. এখানে W বলতে যান্ত্রিক শক্তি এবং Q বলতে উদ্ভূত তাপ শক্তিকে বোঝাচ্ছে। J হচ্ছে একটি ধ্রুবক, যাকে সাধারণভাবে জুলের ধ্রুবক বা তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক বলে। অনুরূপভাবে তাপশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি এবং তার থেকে বৈদ্যুতিক শক্তিও তৈরি করা সম্ভব।

এখন এটা বোঝা গেল, তাপশক্তি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু তাপশক্তি আসবে কোথা থেকে ? সমস্যা তো সেইখানেই। তাপশক্তি তৈরি করার মত কয়লা, তেল ইত্যাদিরই তো অভাব। আর কয়লা, তেল ইত্যাদি যে সব জ্বালানী আছে, একদিন তো তারও শেষ হবে। তখন কি হবে ?

এই সমস্যাতেই তো সারা পৃথিবীর সবার মাথায় হাত। বিজ্ঞানীরা তখন থেকেই খোঁজ করতে লাগলেন প্রাকৃতিক কোন শক্তির উৎসের কথা, এমন সব ব্যবস্থার কথা, যাতে কয়লা, তেল ইত্যাদির দরকার হবে না অথচ শক্তি পাওয়া যাবে আপনা থেকেই।

প্রথমেই তাঁদের চোখ পড়ল সমুদ্র এবং বায়ুমণ্ডলের দিকে, কেননা এরাই হলো শক্তির বিরাট ভাঁড়ার ঘর। কেমন করে শক্তির এই বিরাট উৎস থেকে যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরি করা যায়, সেটাই হলো তাঁদের চিন্তা। তাঁরা ভাবতে শুরু করলেন, সমুদ্রের মধ্যে যে তাপশক্তি লুকিয়ে আছে, তাকে কাজে লাগিয়ে যদি জাহাজ চালানো যায় তবে জাহাজ চলাকালীন তার প্রোপেলার বা অন্যান্য অংশের সঙ্গে জলের ঘর্ষণের ফলে উদ্ভূত তাপশক্তি আবার সমুদ্রজলে চলে যাবে। ফলে, জাহাজ বা সমুদ্র কারও কোন শক্তির হ্রাস হবে না অথচ জাহাজ চলার ফলে যে যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন হবে তার থেকে

---

*রসায়ন বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মীলনী কলেজ, বাঁকুড়া

বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব হবে। অনুরূপ ভাবে, বায়ুমণ্ডলের তাপশক্তিকেও কাজে লাগিয়ে রেলগাড়ী চালানো সম্ভব হবে এবং রেলগাড়ী চলাকালীন রেল বা অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে উদ্ভূত তাপ বায়ুমণ্ডলেই ফিরে যাবে। ফলে রেলগাড়ী বা বায়ুমণ্ডলের শক্তির কোন তারতম্য ঘটবে না অথচ শক্তি তৈরি হয়ে যাবে। প্রকৃতির থেকে এইভাবে তাপশক্তি নিয়ে বারবার জাহাজ চালানো এবং রেলগাড়ী চালানো হলেও প্রকৃতির শক্তির হ্রাস ঘটবে না এবং আমরাও চিরকালের জন্য যন্ত্রগুলি চালিয়ে যেতে পারব। বিজ্ঞানীদের এককালের এই ধারণাকেই বলা হয় 'দ্বিতীয় ধরণের চিরন্তন গতি' (Perpetual motion of second kind)। চিন্তাটি খুবই আনন্দদায়ক, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এ ধরণের গতি সৃষ্টি করতে সক্ষম, এমন যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হয় নি আজ পর্যন্ত।

কিন্তু কেন? আমাদের জ্ঞানের অভাব, না প্রকৃতিলব্ধ পদার্থের গঠনের রহস্যই এর জন্য দায়ী? উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল জল আপনা থেকেই নীচের দিকে গড়িয়ে যায় উপর দিক থেকে। উষ্ণতর বস্তু থেকে তাপ নিম্নউষ্ণতাসম্পন্ন বস্তুতে প্রবাহিত হয়। কিন্তু উল্টো ঘটনাগুলি আপনা থেকে কখনই ঘটে না, যদি না কোন বাইরের যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। এমনটা হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল, পদার্থের গঠনই এমন যে উল্টো ঘটনাগুলিকে ঘটতে দেয় না। একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা বুঝতে চেষ্টা করা যেতে পারে। আমরা জানি পদার্থগুলি এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি, আর তাপ হচ্ছে এই কণাগুলির অনিয়ত গতির ফল। এখন যদি একটি ঘূর্ণায়মান চাকাকে ধাক্কা দিয়ে থামানো যায় তবে ঘর্ষণের ফলে তাপ উৎপন্ন হবে অর্থাৎ ঘোরার জন্য যে যান্ত্রিক শক্তি কাজ করছিল তা তাপশক্তিতে পরিণত হবে। এখন দেখতে হবে এই ঘটনার কারণ কি। বিজ্ঞানীরা বললেন, চাকাটি ঘোরার সময় এর মধ্যেকার ক্ষুদ্র কণাগুলি নিয়তকারে বিন্যস্ত ছিল কিন্তু ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে কণাগুলির বিন্যাস নষ্ট হয়ে যায় এবং কণাগুলির অনিয়তকারে ছোটাছুটি করতে থাকে ফলে নিজেদের মধ্যেও ধাক্কা দেয় এবং গরম হয়ে ওঠে। এখন যদি ঐ কণাগুলিকে ঠাণ্ডা করে পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে যেতে হয়, তবে কণাগুলির প্রত্যেকটিকে এক এক করে নিয়তকারে বিন্যস্ত করতে হবে কিন্তু তা সম্ভব নয়। কেননা ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে কোন কাজ করা বা তাদের আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পদার্থের গঠনই হচ্ছে প্রধান অন্তরায়। সুতরাং সমুদ্র বা বায়ুমণ্ডলের যে সঞ্চিত তাপ আছে, তাকে কাজে লাগিয়ে চিরন্তন গতি পাওয়াও অসম্ভব।

আর একটি কথা, সমুদ্র বা বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যে যন্ত্রই রাখা হোক না কেন তা সমুদ্র বা বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে একই উষ্ণতায় থাকবে, ফলে এদের থেকে তাপ নিয়ে কাজ করানো সম্ভব নয়, কেননা তাপশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি পেতে গেলে অবশ্যই উষ্ণতার পার্থক্য থাকা দরকার। এই উষ্ণতার পার্থক্যই হলো চালন বল (directive force), যার অবর্তমানে এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে তাপ প্রবাহিত হতে পারে না। আর না পারার কারণই হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলির ব্যবহার, যা আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি।

কিন্তু তা হলে কি কোনদিনই আমরা সমুদ্র ভাণ্ডারের মধ্যে লুকানো তাপশক্তিকে কাজে লাগাতে পারব না?

অনেক চিন্তার পর, তাঁরা সমুদ্রজলের বিভিন্ন তলের উষ্ণতার পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে কিছু করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করলেন। একটু আশার আলোও দেখা গেল। বিজ্ঞানীরা দেখলেন বিষুব রেখার উপর যে সমস্ত সমুদ্রতল অবস্থিত তার উষ্ণতা বছরের প্রায় সবসময়েই 28^0 সেন্টিগ্রেড এবং তার বেশকিছু নীচের জলতলের উষ্ণতা অনেক কম। বিজ্ঞানীরা, এই উষ্ণতার পার্থক্যকেই কাজে লাগালেন অবশেষে।

বিষয়টি বোঝার জন্য যদি আমরা বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্য নিই এবং তার কার্যপদ্ধতিকে প্রথমে আলোচনা করি, তাহলে বিজ্ঞানীদের গবেষণার সমস্যাটি কী, তা বোঝা সহজ হবে। বাষ্পীয় ইঞ্জিনে, প্রথম ধাপে তেল বা কয়লা পুড়িয়ে জলকে বাষ্পায়িত করা হয় এবং এই বাষ্প আয়তনে বেড়ে গিয়ে একটা পিস্টনকে ঠেলা দেয়, ফলে পিস্টনটি সামনের দিকে এগিয়ে যায়। পরের ধাপে, পিস্টনটি আবার পূর্বেকার স্থানে ফিরে আসে বাষ্পটি বেরিয়ে গেলে। এর ফলে কিছু যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন হয়। বাষ্পের কিছু তাপ যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার পরও যে তাপ থাকে, তার জন্য কিছুটা গরম থেকে যায় বাষ্পটি। পরে ঠাণ্ডা করে ঘনীভূত করার পর আবার জলকে বয়লারে গরম করা যায়। জলকে এই ভাবে তাপ-ইঞ্জিনে ব্যবহার করার বিশেষ সুবিধা এই কারণেই যে জলের বাষ্পীয়ভবনের লীনতাপও বেশী। ফলে অনেকটা তাপ, তাপ উৎপাদনের উৎস থেকে, জল গ্রহণ করতে পারে, যার জন্য যান্ত্রিক শক্তিও বেশী পরিমাণে উৎপাদিত হয়। কিন্তু বাষ্পীয় ইঞ্জিনে জলকে বাষ্পায়িত করার জন্য যে কয়লা, তেল ইত্যাদির দরকার তার ভাঁড়ার তো দিন দিন কমে আসছে, এমন একদিন আসবে যেদিন হয়তো তেল, কয়লা সবই শেষ হয়ে যাবে। সেদিনের কথা চিন্তা করেই তো বিজ্ঞানীদের রাতের ঘুম বন্ধ হবার যোগাড়।

বিজ্ঞানীরা তাই জলকে বাষ্পায়িত করার কাজটি প্রকৃতিকে দিয়েই করাতে চান যাতে কয়লা, তেল শেষ হলেও কিছু যাবে-আসবে না। কিন্তু সমস্যা হলো, জলের স্ফুটনাংক 100^0 সেন্টিগ্রেড, অথচ সমুদ্রজলের কোথাও এত উষ্ণতা নেই। আমরা আগেই দেখেছি এই উষ্ণতা হয় 28^0 সেন্টিগ্রেড। তাই বিজ্ঞানীরা খুঁজতে লাগলেন এখন একটি তরল পদার্থ যাকে 28^0 সেন্টিগ্রেড বা তার নীচের উষ্ণতাতেই ফোটানো যাবে। তাহলে, সমুদ্রের উপরিতলের উষ্ণতায় তরল পদার্থটিকে বাষ্পায়িত করে, তাকে আয়তনে বাড়িয়ে কিছু যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন করা যাবে। পরে, ঐ বাষ্পকে সমুদ্রতলের নীচেকার নিম্নউষ্ণতায় নিয়ে গিয়ে ঘনীভূত করে তরল পদার্থটিকে আবার ফিরে পাওয়া যাবে। এই ফিরে-পাওয়া তরল পদার্থটিকে আবার বাষ্পায়িত করার জন্য ব্যবহার করা যাবে। এই ভাবে ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে আমরা সমুদ্রজলে লুকানো শক্তিকে কাজে লাগাতে পারব, আমাদের ইচ্ছামত যে কোন ধরণের শক্তি তৈরি করার জন্য।

কিন্তু সাধারণ যে সব তরল পদার্থ আমাদের জানা আছে তাদের কাউকেই সমুদ্র জলতলের উষ্ণতায় বাষ্পীভূত করে আবার নীচের তলের উষ্ণতায় ঘনীভূত করা যায় না। অনেক গবেষণার পর সাগা বিশ্ববিদ্যালয় এবং 'জাপানের শক্তির ব্যবহার ও গবেষণা সংস্থা' আবিষ্কার করলেন 'ফ্রিয়ন-114' নামক একটি তরল পদার্থ, যার ধর্মগুলি আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম। যতদূর জানা গেছে,

তাঁরা 'ফ্রিয়ন-114' দ্বারা কিছু বিদ্যুতও উৎপাদন করেছেন। তবে বৃহৎভাবে এবং ব্যবসায়িকভাবে এই পদ্ধতিতে বিদ্যুত উৎপাদনের আরও কিছু দেরী আছে। তবে সেদিনও খুব দূরে নয়।

আমাদেরও এবার স্বস্তির একটা কারণ ঘটলো, কেননা চিরন্তন গতির সৃষ্টি সম্ভব না হলেও, সূর্যের তাপশক্তি যা সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে ঘুমন্ত আছে তাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুত উৎপাদনের সন্ধিক্ষণ প্রায় সমুপস্থিত।

ভেবে কর

নবকুমার চট্টোপাধ্যায়*

নীচের প্রশ্নগুলির তিনটি করে উত্তর দেওয়া আছে, তিনটি উত্তরের মধ্যে একটি ঠিক। সঠিক উত্তর বের কর।

1. "সমসত্ত্ব এবং স্বচ্ছ কোন পদার্থকে তীব্র চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে সেটি আলোক-সক্রিয় হয়"—এই ঘটনাকে কি বলে? a) ফ্যারাডে ক্রিয়া b) সিবেক ক্রিয়া c) পেলটিয়ার ক্রিয়া

2. একটি ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি চুম্বক। চুম্বকটি কি রকম?
   a) সূচীচুম্বক, b) অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক, c) দন্ডচুম্বক

3. 'আইকনোস্কোপ' ব্যবহার করা হয়—
   a) টেপ-রেকর্ডে b) টেলিভিসনে c) দূরবীনে

4. র‍্যাডার থেকে যে তরঙ্গ প্রেরণ করা হয় তার কম্পাঙ্ক কত?
   a) 3×10^{10} per sec. b) $4{\cdot}2 \times 10^{-10}$ per sec. c) 4×10^{-8} per sec.

5. সবচেয়ে কম গলনাঙ্কের ধাতুর নাম কি?
   a) লোহা b) জিঙ্ক c) লেড

6. বোরন পরমাণুর ক্ষেত্রে এর দুটি যোজ্যতার মধ্যবর্তী কোণের পরিমাণ কত হয়?
   a) $109°28$ b) $120°$ c) $90°$

7. ইলেকট্রনের ভর কত?
   a) $4{\cdot}77 \times 10^{-28}$ gm. b) $6{\cdot}03 \times 10^{-23}$ gm.
   c) $9{\cdot}057 \times 10^{-28}$ gm.

8. $\text{Log}_e a$—এর মান কত?
   a) $\frac{1}{\text{Log}_a b}$ b) $\text{Log}_a b$ c) $\text{Log} \frac{a}{b}$

8/B, রামকান্ত বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 003

9. টেস্ট-টিউব বেবীর (1978) আবিষ্কারকদ্বয়ের নাম কি ?
   a) ডোনাল্ড ও অ্যান্ডারসন্
   b) প্যাট্রিক স্টেপটো ও রবার্টস এডওয়ার্ডস্
   c) জন পলসন ও ডিউক
10. sin180°-এর মান কত ?
   a) $\sqrt{5}+1$ b) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ c) $\frac{1}{4}(\sqrt{5}-1)$
11. মূত্রে ইউরিয়ার স্বাভাবিক পরিমাণ কত ?
   a) 30 গ্রাম b) 9 গ্রাম c) 0·2 গ্রাম।
12 কোন্ গ্রহের সবচেয়ে বেশী উপগ্রহ আছে ?
   a) বুধ b) বৃহস্পতি c) শনি
13. তামাকের কোন্ উপাদানটি ক্ষতিকারক ?
   a) নিকোটিন b) গ্লুকোজ c) ট্যানিন ?
14. ভারতের প্রথম উপগ্রহ আর্যভট্টের অপভূ (apogee) দূরত্ব কত ?
   a) 100 K.M.S. b) 623 K.M.S. c) 420 K.M.S.
15. আর্যভট্টের অনুভূ (perigee) দূরত্ব কত ?
   a) 110 K.M.S. b) 330 K.M.S. c) 564 K.M.S.

(সমাধান 313 পৃষ্ঠায়)

মডেল তৈরি

পথের প্রস্রাবখানা

কেশবচন্দ্র দাস*

পথেঘাটে যে সব প্রস্রাবখানা থাকে, সেগুলিকে অনেক সময় অপরিষ্কার অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়, কিন্তু এগুলি অপরিষ্কার থাকলে পথিকের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক হয়। তাই এই প্রস্রাবখানাগুলি সব সময় পরিষ্কার রাখার জন্য একটি অটোমেটিক ব্যবস্থা করা হলো।

ঘটনা অনেকটা এই রকম, যখন কোন পথিক প্রস্রাবখানায় এসে দাঁড়াবেন তখনই একটি জলাধারের মুখ খুলে তা থেকে জল নীচে পড়ে সমস্ত পরিষ্কার করে দেবে। কিন্তু পথিক চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জলাধারের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে এবং জলের অযথা অপচয়ও হবে না।

যন্ত্রের গঠন অনেকটা চিত্রে দেওয়া হলো। জলের পাইপের মুখে একটা কপাট লাগানো হলো।

*ব্যারাকপুর 24 পরগণা

এর একমাথা একটা লম্বাকার দণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে অপর মাথা কব্জার সাহায্যে আর একটি দণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হলো।

এখন 1নং চিত্র অনুসারে পাদানির প্রান্তটি একটি স্প্রিং-এর সাহায্যে উঁচু করা হলো। পাদানির প্রান্তটি যখন উঁচুতে থাকে তখন দণ্ড দুটি নীচের দিকে থাকে এবং পাইপের মুখের কপাট নীচের দিকে থেকে পাইপের মুখ বন্ধ করে রাখে। কিন্তু পথিক যখন পাদানির উপর দাঁড়ায় (2নং চিত্র) পাদানির

চিত্র 1 চিত্র 2
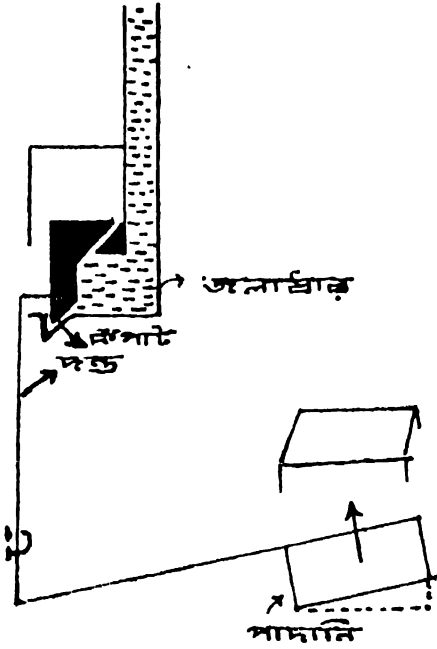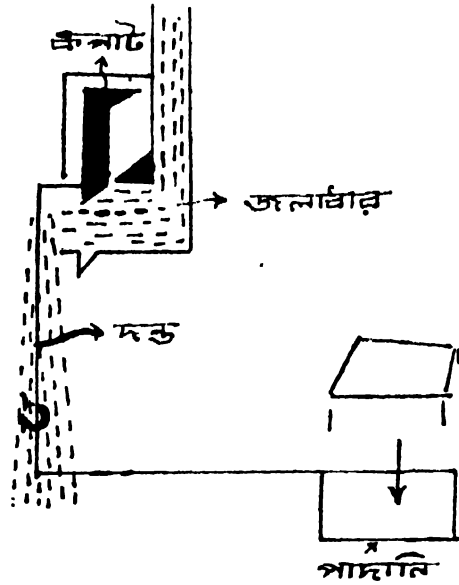
মাথা পায়ের চাপে নীচের দিকে নামে এবং দণ্ড দুটি উপরে উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাইপের মুখের কপাটও উপরে উঠে যায় এবং জল নীচে পড়তে থাকে। আবার পথিক ঐ স্থান পরিত্যাগ করামাত্রই পাদানি উপরে ওঠে এবং জলের কপাট বন্ধ হয়ে যায়।

এই ব্যবস্থার ফলে জলের অপচয় একেবারেই হয় না এবং প্রয়োজনের সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পাওয়া যায়।

'ভেবে কর'-র সমাধান

1. (a), 2. (a) 3. (b) 4. (a) 5. (c) 6. (b) 7. (c) 8. (a) 9. (b) 10. (c) 11. (a) 12. (b) 13. (a) 14. (b) 15. (c

মধু

স্বদীপ্তকুমার ঘোষ*

'মধু' নামটির সঙ্গে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। যাঁরা আয়ুর্বেদ চিকিৎসা করেন, তাঁদের সঙ্গে মধুর ঘনিষ্ঠতা সর্বাপেক্ষা বেশী। শিশু অবস্থায় আমরা কেউ কেউ মধু খেয়ে থাকি। মধু কথাটির ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। বেদ ও রামায়ণে মধুর উল্লেখ রয়েছে। এই মধু উৎপন্ন করবার ক্ষমতা কেবলমাত্র মৌমাছিরই আছে। মৌমাছি পতঙ্গ শ্রেণীর হাইমেনপটের বর্গের অন্তর্গত। মৌমাছি কর্তৃক নির্মিত মৌচাক থেকে মধু ও মোম পাওয়া যায়। মানুষ যদিও মধুর উপাদানের সঙ্গে পরিচিত, তথাপি মানুষ প্রাকৃতিক মধুর ন্যায় মধু উৎপন্ন করতে সক্ষম নয়।

কর্মী-মৌমাছি ফুল থেকে পরাগরেণু ও মকরন্দ সংগ্রহ করে নিজের খাদ্যনালীর ক্রপ অংশে নিয়ে যায়। ক্রপ অংশে মৌমাছি উৎসেচকের সাহায্যে পরাগরেণু ও মকরন্দকে লেভুলোজ ও ডেক্সট্রোজে পরিণত করে। অতঃপর মৌমাছি এই পরিবর্তিত অংশকে মৌচাকে জমা করে এবং এই জমা করা অংশই প্রকৃতপক্ষে মধু হিসাবে পরিচিত। মধুতে শতকরা 78 ভাগ ডেক্সট্রোজ ও লেভুলোজ, 17 ভাগ জল এবং কিছু উৎসেচক ও খনিজ পদার্থ রয়েছে।

মধু বিভিন্ন ফুল থেকে উৎপন্ন হয় বলে মধুর রং ও স্বাদ বিভিন্ন রকমের হয়। তরমুজ, আম, বেল, পেয়ারা, লাউ, কুমড়া, বাবলা, কমলা, বাদাম প্রভৃতি গাছের ফুল মধুর ভাল উৎস। সরষে, তিল প্রভৃতি থেকেও মৌমাছি মধু উৎপাদনে সক্ষম। সরষে থেকে উৎপন্ন মধু জমে যায়। লিচুর মধুও আংশিক জমে যায়।

মধু প্রধানতঃ বীজাণুনাশক হিসাবে কাজ করে থাকে। মধু ব্যাকটিরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পচে যায় না। বিভিন্ন রোগে মধুর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার রয়েছে। রক্তহীন রোগীদের পক্ষে কালো রঙের মধু বিশেষ উপকারী। কারণ, কালো রঙের মধুতে যথেষ্ট পরিমাণে কপার, ম্যাঙ্গানিজ ও আয়রন রয়েছে যা রক্তহীন রোগীদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় মধুর ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী। বহুমূত্র প্রভৃতি মূত্রাশয়ের রোগে, গ্যাসট্রিক, আন্ত্রিক ক্ষত, অম্ল, গা বমিভাব, বুকজ্বালা, চক্ষুরোগ, চর্মরোগ, সর্দিকাশি প্রভৃতিতে মধুর ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রদ। মস্তিষ্কের রোগে তিতো স্বাদের মধু বিশেষ উপকারী। পুড়ে গেলে, কেটে গেলে, আঘাত লাগলে ক্ষতস্থানে মধুর প্রলেপ প্রভূত উপকার করে। একজন রুশ বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন যে, বী-ব্রেড ব্যবহারে ক্যান্সার রোগজীবাণুও বাঁচতে পারে না। বী-ব্রেড হলো মধুর পরাগ ও জল দিয়ে মৌমাছি, শূককীটকে খাওয়ানোর জন্য যা তৈরি করা হয়। মধুর অ্যান্টিসেপ্টিক গুণ রয়েছে। ত্বকের মসৃণতা রক্ষা করতে দেহের

---

*চিন্ময়ী সায়েন্স ক্লাব, চুঁচুড়া, হুগলী

লাবণ্য ও যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে, দেহকে সবল করতে, শরীরের ক্লান্তি দূর করতে মধু আশ্চর্য ফলপ্রদ।

মধু সরল ও সহজপাচ্য। তাই মধুকে খাদ্যদ্রব্য হিসাবে এবং বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা চলে। চিনি এবং অন্যান্য মিষ্টিদ্রব্য হজম হতে তিন ঘণ্টার মত সময় লাগে। কিন্তু মধু এ অপেক্ষা কম সময়ে হজম হয়ে যায়। 20 মিনিটের মধ্যে মধু রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। তাছাড়া মধু পাচনতন্ত্রের পাতলা চামড়ার কোন ক্ষতি করে না। মধু থেকে শরীরে তাপশক্তি উৎপন্ন হয়ে যায় ফলস্বরূপ আমরা কাজ করবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পাই। 1 পাউণ্ড মধু থেকে 1600 ক্যালরির মত তাপ উৎপন্ন হয়। দুধ থেকে আমরা যে তাপশক্তি পাই, মধু থেকে প্রাপ্ত তাপশক্তির পরিমাণ তা অপেক্ষা ছয়গুণ বেশী। এক চামচ মধু একটি বড় মুরগীর ডিম অপেক্ষা বেশী কার্যকরী। কারণ, ডিমটি থেকে যে তাপ শক্তি আমরা পাই তার পরিমাণ মধু থেকে প্রাপ্ত তাপশক্তি অপেক্ষা কম।

বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যে বিশুদ্ধ মধু প্রস্তুত করা হয় তার নাম 'অ্যাপিয়ারী মধু'। এই মধুর উপকারিতা জঙ্গলের চাক থেকে যে মধু পাওয়া যায়, তা অপেক্ষা বেশী। কারণ, অ্যাপিয়ারী মধুতে কোনপ্রকার জিনিষ মিশে থাকতে পারে না। কিন্তু জঙ্গল থেকে প্রাপ্ত মধুতে মোমের গুঁড়ো, ডিমের রস প্রভৃতি অপরিষ্কার জিনিষ মিশ্রিত অবস্থায় থাকতে পারে। তাই স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে মধু বিশেষ উপকারী। বিশুদ্ধ মধুতে রয়েছে শতকরা 34 ভাগ গ্লুকোজ, 41 ভাগ ফ্রাকটোজ, উৎসেচক, অ্যাসিটাইকোলিন, অরগ্যানিক অ্যাসিড, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন প্রভৃতি। খনিজ পদার্থ হিসাবে মধুতে আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, পটাসিয়াম প্রভৃতি পাওয়া যায়। উপরিউক্ত উপাদানগুলি সুস্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করে।

মধু নিয়মিত আহার করলে উপকার ছাড়া অপকার হয় না। একটি শিশুকে দৈনিক 30 গ্রাম মধু দিলে উপকার পাওয়া যায়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ দিনে 100 গ্রাম মধু খেলে উপকার পাবেন। আহারের একঘণ্টা আগে বা পরে মধু খেলে বিভিন্ন অসুস্থতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, সাধারণ শিশু থেকে মধু সেবনকারী শিশুর ওজন আড়াই গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

জনপ্রিয় বক্তৃতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে নিম্নোক্ত জনপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বিষয়: সত্যেন বোসের আড্ডা — বক্তা: জীবনতারা হালদার

তারিখ: 8ই অগাষ্ট, 1979 — সময়: বিকাল 4 টা

স্থান: সত্যেন্দ্র ভবন, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

প্রথম ষান্মাসিক সূচীপত্র

দ্বাত্রিংশত্তম বর্ষ ঃ জানুয়ারী—জুন

1979

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সত্যেন্দ্র ভবন

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

ফোন-55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষান্মাসিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী থেকে জুন—1979

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচী

জানুয়ারী থেকে জুন, 1979

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা	মাস
অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	চুম্বকীয় এক মেরুর অস্তিত্ব	126	মার্চ
অরূপরতন ভট্টাচার্য	শতাব্দীর দুর্যোগে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ কতটা কার্যকরী ছিল?	92	ফেব্রুয়ারী
অরুণকুমার ঘোষ	দূরবীন আবিষ্কার	120	মার্চ
অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায়	গ্রামীণ শল্যচিকিৎসা	155	মার্চ
অনিলেন্দু চক্রবর্তী	সপ্তবর্ণা	157	মার্চ
অনন্তকুমার ঘাটা	ভেবে কর	159	এপ্রিল
অনন্তকুমার ঘোষ	ভেবে বল	218	এপ্রিল
অমিতোষ ভট্টাচার্য	মৌলিক সংখ্যা	280	জুন
আশিস সিংহ	একটি পুরাতন প্রসঙ্গ	271	জুন
ই. পি. নর্থো প (ভাষান্তর : যুগলকান্তি রায়)	কূটাভাস	29	জানুয়ারী
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	হীরক	11	জানুয়ারী
উইলিয়াম বয়েড, আর্থার সি. গাইটন, টি. এস. এল বেসউইক (ভাষান্তর : গুণধর বর্মণ)	ভাইরাস	196	এপ্রিল
কপিল ভট্টাচার্য	প্লাবনের কবলে কলিকাতা	74	ফেব্রুয়ারী
কেশবচন্দ্র দাস	মডেল তৈরি	312	জুন
ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা	নববর্ষের নিবেদন	1	জানুয়ারী
	শ্রুতকীর্তি সত্যেন্দ্রনাথ	4	জানুয়ারী
	বন্যাসংক্রান্ত সেমিনার	101	ফেব্রুয়ারী
গঙ্গেশ বিশ্বাস	আর্যশাস্ত্র ও দেশের এই বন্যা	95	,,
গিরিজাপসন্ন বিশ্বাস	পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা ও ভূমিসংরক্ষণ	77	,,
গৌতম ব্যানার্জী	সহজ বা গ্রামীণ রেফ্রিজারেটর	30	জানুয়ারী
	মডেল তৈরি	215	এপ্রিল
গৌতম গাঙ্গুলী	ভেবে কর	48	জানুয়ারী
জগদীশচন্দ্র বসু	কবিতা ও বিজ্ঞান	225	মে
জয়ন্ত বসু	ইলেকট্রনিক্সের জগতে লিলিপুট	18	জানুয়ারী
	সম্পাদকীয়	63	ফেব্রুয়ারী
ত্রিদিবরঞ্জন মিত্র	ভিন্ন দেশের প্রাণিকুলের জ্ঞাতিত্ব	173	এপ্রিল
দীপককুমার দাঁ	সোপান শিল্পে প্রতিবন্ধকতা	143	মার্চ

চিত্র-সূচী

প্রকাশনা সচিব—রতনমোহন খাঁ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা : ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা। আজীবন সদস্য চাঁদা 200 টাকা। যদি কেউ পরপর পাঁচ বৎসর সাধারণ সদস্য থাকেন তবে তিনি 150 টাকা দিলে আজীবন সদস্য হতে পারবেন।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি “আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং”-এ ‘ডাকযোগে’ পাঠানো হয়; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোস্ট অফিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয় : উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। টাকা, চেক ইত্যাদি কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে পাঠাবেন না। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করিবেন।
6. কলিকাতার বাইরের কোন চেক প্রেরণ করলে গ্রহণ করা হবে না।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্যবিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং **মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন।** কিশোর বিজ্ঞানীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা : প্রকাশনা সচিব, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন : 55-0660.
2. **প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।**
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক-মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রকাশনা সচিব
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

JNAN-O-BIJNAN
Regd. No. C 3684
(G.P.O. Calcutta)
June, 1979

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে প্রকৃত জনকল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য পরিষদের বর্তমান
কর্মসমিতি একান্তই সচেষ্ট, সেই বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাকে সফল করতে
হলে সকলের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা চাই। এই উদ্দেশ্যে
পরিষদের সদস্যবৃন্দ, দেশের বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞানকর্মী, বিজ্ঞান
সংগঠন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সমাজসেবা সংগঠন, সমাজ ও
রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং জনসাধারণের কাছে
আমাদের আবেদন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
প্রতিষ্ঠিত এই মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের
উন্নতি ও প্রসারকল্পে সকলে আন্ত
রিকভাবে এগিয়ে আসুন,
সাহায্য করুন ও পরামর্শ
দিন।

বঙ্গশ্রী মুদ্রণ—নীলাচল প্রেস, কলিকাতা-700 009
মূল্য—1·50 টাকা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 8-9, অগাষ্ট-সেপ্টেম্বর, 1979

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

মূল্য—পাঁচ টাকা

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

শারদীয় উৎসবের আনন্দমুখর দিনগুলিতে সর্বত্র সংযম ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন। আপনার আনন্দের আতিশয্য যেন অন্যের অসুবিধার কারণ না হয়।

উৎসবের সময় অর্থ ও বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন। চাঁদা আদায়ের নামে যাঁরা জনগণের ওপর জুলুম করেন, পথচারী ও যানবাহন সমস্যার কথা না ভেবে যাঁরা পথের ওপর উৎসব আয়োজন করেন, মাইক্রোফোনের অত্যাচারে যাঁরা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করেন তাঁদের সংযমী আচরণে উদ্দীপিত করা শুভ-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাজ। উৎসবের উদ্দেশ্য কোনো মানুষকে বিব্রত করা নয়, সকলের মধ্যে প্রীতির বিনিময় করা।

আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বহু ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের পাশাপাশি অবস্থান। কোনো এক সাধারণ উৎসব তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে আরও দৃঢ় ও প্রসারিত করার সুযোগ এনে দেয়। কোনো অবস্থাতেই পারস্পরিক সম্প্রীতি যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।

যুবসম্প্রদায় তথা রাজ্যের সকল মানুষের কাছে আমার আবেদন, শারদীয় উৎসব পালনের সময় সংযম ও সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখুন। অন্যের অসুবিধা না করে উৎসব উদ্‌যাপন করুন।

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাত্রিংশত্তম বর্ষ অগাষ্ট-সেপ্টেম্বর, 1979 অষ্টম-নবম সংখ্যা

সামাজিক, বৈষয়িক এবং অর্থনৈতিক বিন্যাসকে ভিত্তি করে একেকটি দেশে উৎসবের কাঠামো গড়ে ওঠে। কালে, সেই নানা বিন্যাসের অবশ্যই পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু উৎসবের দেশ প্রচলিত রূপটি তার প্রাচীন ঐতিহ্যই বহন করে চলে। বাংলা-দেশের শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব, তার শারদীয়া উৎসব। ভৌগোলিক পরিবর্তন, দুর্বহ অর্থনৈতিক চাপ এবং প্রায় প্রতিবৎসর নিষ্করুণ এবং প্রতিকূল প্রকৃতি —এই উৎসবের আনন্দ আজ খণ্ডিত পশ্চিম বাংলায় অনেকাংশেই ম্লান করে দিয়েছে, তবু শারদীয়া উৎসবের প্রতীক্ষাও বাঙালীর সারা বৎসরের একটি প্রতীক্ষা, এও সত্য।

জনজীবন ও বিজ্ঞান

ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা

বাঙালীর শারদীয়া উৎসবের আরো একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে- যার তুলনা পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও নেই। সেটি হল, তার সাহিত্য-সংস্কৃতির সৃজনশীল দিক। এই উৎসবকে ভিত্তি করেই গ্রাম-শহরে প্রকাশিত হয় বিশেষ শারদীয়া সাহিত্য এবং নানা পত্র-পত্রিকার বিশেষ সম্ভার, উদ্ভাসিত হয় বৎসরান্তিক নানা মননশীলতার সেরা ফসল। শারদীয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র সংখ্যাটিরও সাধ্য মতো গ্রন্থনা করে, গ্রাহক ও পাঠকদের কাছে নিবেদন করা হল।

একথা আমরা কে না জানি,—'দেশ কেবল

ভৌগোলিক নয়, দেশ মানবিক। মানুষে মানুষে মিলিয়ে এই দেশ জ্ঞানে জ্ঞানে, কর্মে কর্মে।' মানুষকে নিয়েই—দেশ, সমাজ, সভ্যতা। সমগ্র মানব সমাজকে ফলে-শস্যে পরিপূর্ণ করাই সভ্যতার অন্বিষ্ট। শুধু বিত্তে নয় চিত্তেও এই পরিপূর্ণতাকে লক্ষ্য করেই সভ্যতার পথ চলা, সংস্কৃতির সাধনা। অথচ, সেই পূর্ণতার সাধনায় আজ কেবলই যেন বিঘ্ন ঘটছে, কেবলই যেন নৈরাশ্য তার হতাশা আমাদের আচ্ছন্ন করছে। বড়ো, সমষ্টির সহযোগ, সমষ্টির কল্যাণকে ছাপিয়ে উঠছে—ছোটো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ছোট ব্যক্তিস্বার্থ। অথচ, ব্যক্তির সহযোগিতা ছাড়া, সামগ্রিক কল্যাণের যে সব প্রতিষ্ঠান, তাদের কোন কল্যাণযজ্ঞই সফল হয় না, হওয়া সম্ভব নয়।

আজো যে সব সারস্বত প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে আমরা বাঙালীরা গর্ব করি, তার পেছনে স্বপ্ন-মেধা-উদ্যমে, তার পেছনে স্বেদ-মমতা-ভালোবাসায় যুক্ত ছিল বাংলার কিছু বরণীয় মানুষের স্মরণীয় নাম, কিছু দীপ্ত নক্ষত্রের নাম। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, মহেন্দ্রলাল, প্রফুল্লচন্দ্র, আশুতোষ, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ—এঁরা, সংঘ-মানসে দেশকে উদ্বোধিত করতে চেয়ে গড়ে তুলেছিলেন নানা সারস্বত প্রতিষ্ঠান। তাঁদের কালে কতো মানুষের চিত্ত এবং বিত্ত নিয়োজিত ছিল সেই সব সংঘে; সেই সব সৃষ্টিশীল সংঘের পেছনে সেদিন ক্রিয়াশীল ছিল উদ্দীপ্ত জাতীয়তা বোধও।

আজ ছবি বদলেছে। আজ নৈরাশ্য-অবক্ষয়ের দিনে, ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার দিনে—ব্যষ্টি হিসাবে আমরা আর আমাদের আন্তরিক স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম বা অর্থ নিয়োগ করি না জাতীয় সংস্কৃতি-শিক্ষা-জনকল্যাণের ধারাটিতে। অথচ, পৃথিবীর নানা দেশে জনকল্যান, জনসংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি—বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠাগার, আতুরালয়, বিজ্ঞান গবেষণাগার, নানা সারস্বত প্রতিষ্ঠান মূলতঃ গড়ে উঠেছে সেদেশের জনসাধারণের উদ্যমে ও দানে।

স্বাধীনতার পর থেকে, আমাদের দেশে কোন নতুন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, বিশ্বভারতী, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ইত্যাদি যে গড়ে ওঠেনি তাই নয়—সেগুলি পূর্বপ্রতিষ্ঠিত, যাদের নিয়ে আমাদের গৌরবের পুঁজি, সেগুলিও ক্ষীণপ্রাণে কোনমতে অস্তিত্ব রক্ষা করছে মাত্র, শাখা পল্লবে বিস্তৃত হচ্ছেনা তাদের নতুন প্রাণের বিকাশ। 'পেসমেকার' হৃদযন্ত্র চালু রেখে কোনমতে প্রাণরক্ষা করে, স্বাভাবিক প্রাণ-চাঞ্চল্য জাগানো তার পক্ষে সম্ভব নয় কোনমতেই।

প্রতিষ্ঠান থেকে জনউদ্যমের এই যে বিচ্ছিন্নতা এতে আমরা বুদ্ধিজীবীরা আড়াল খুঁজি 'সরকার' নামক দেয়ালের আড়ালে। পরিত্রাণ পেতে চাই, যাবতীয় দায়দায়িত্ব তাকেই সমর্পণ করে। অথচ, একথা আমরা কে না জানি, 'সরকার' নামক বিমূর্ত সত্তাকে দায়ী করে, দায় মিটলেও, দায়িত্ব মেটে না। কে না জানি, আমাদের মিলিত ইচ্ছা ও কর্মের ইন্টিগ্রেশানের আরেক নাম 'সরকার'। তাকে কায়িক ও আর্থিক শূন্যতা পূরণের প্রশ্নে দায়ভাগী করলেও, জনসাধারণের দায়িত্ব মেটেনা—জনসাধারণের সহযোগিতার প্রশ্ন থেকেই যায়, প্রশ্ন থেকেই যায় জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক্ কর্মচারীদেরও, বেতন গ্রহণের পরও প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্বতঃ উৎসারিত মমতা ও আবেগের।

এ যুগ 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যুগ' একথা যতোই আমরা উচ্চারণ করিনা কেন, আক্ষেপের সঙ্গে একথা স্বীকার করতেই হবে—ভারতবর্ষে আজো আধুনিক বিজ্ঞানের আশীর্বাদ যথার্থ কল্যাণময় রূপ নিয়ে প্রতিভাত হয়নি রাষ্ট্র ও জনজীবনে। আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং প্রযুক্তি এদেশে আজো সীমাবদ্ধ হয়ে আছে মুষ্টিমেয় শহর এবং নাগরিক জীবনের পরিধিতে। তাই স্বাধীনতার ত্রিরিশ বছর পরে ভারতবর্ষের সাতলক্ষ গ্রামের এখনো অনেক মানুষেরই কাছে পৌঁছয়নি - বিদ্যুৎ, পানীয় জলের সরবরাহ, উন্নত পরিবহন, আধুনিক

চিকিৎসার উপকরণ। আজো খরায় এবং বন্যায় এই উপমহাদেশের ভাগ্য নির্ভর করে; খেয়ালী প্রকৃতির বদান্যতার ওপর নির্ভর করে আমাদের খাদ্য, স্বাস্থ্য, অস্তিত্ব। এ সত্য, এবং রূঢ় সত্য।

এই অশিক্ষা-অস্বাস্থ্য-দারিদ্রপীড়িত দেশে সীমিত সামর্থ্যে বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির প্রয়োগ যথাযথ ঘটেনি—এর থেকে বড়ো আক্ষেপ, বিজ্ঞান আমাদের দেশে অকৃতার্থ শুধু কর্মজগতে নয়, মর্মজগতেও। ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশে যেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা বিপুল, সেখানে শিক্ষিত এবং বিশেষ করে বিজ্ঞান-শিক্ষিতের সংখ্যা স্বভাবতঃই নগণ্য। এই নগণ্য সংখ্যক বিজ্ঞান-শিক্ষিতদের মধ্যেও আবার বড়ো অংশের কাছেই বিজ্ঞান ডিগ্রী ও চাকুরী লাভের উপকরণ মাত্র। সে উপকরণ সংগ্রহ হবার পর বিজ্ঞান-শিক্ষিতদের অনেকেরই জীবন থেকে বিজ্ঞানের যে নির্বাসন ঘটে, তা প্রায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। তাঁরা কেউই আর নেমে আসেন না, দেশের বিজ্ঞান-না-জানা মানুষের কাছে বিজ্ঞান-মানস গঠনে, বিজ্ঞান-স্বাক্ষরতা গঠনে; এ সত্যটিও, বেদনার সঙ্গে স্বীকার্য।

অথচ, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা শুধু উন্নাসিকতা নয়, মূর্খতাও বটে। বাঁচার মত বাঁচতে গেলে, বৈষয়িক ও জাতীয় অগ্রগতি ঘটাতে গেলে—বিজ্ঞানকে আত্মীকরণ করতেই হবে। আর তার জন্যে দরকার বিজ্ঞানের ওপর অনুরাগ, দরকার বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে ছড়িয়ে দেওয়ার; কোনো এক সুপ্রভাতে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের পর, বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানো যাবে এই আকাশকুসুমের কল্পনায় বসে না থেকে, জনজীবনের বিজ্ঞানকে ঘরে ঘরে পৌছিয়ে দেওয়া দরকার—দরকার বিজ্ঞান-মনস্কতা, বিজ্ঞান স্বাক্ষরতা গড়ে তোলার। সাধারণ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মূল কথাগুলি, কৃষিবিজ্ঞানের মূল কথাগুলি, গ্রামীণ পরিবেশে বিশেষ পরিবেশ-বিজ্ঞানের মূল কথাগুলি এগুলি সম্বন্ধে গ্রামীণ মানুষ ও সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা এ শুধু আজ আত্যন্তিক প্রয়োজন তাই নয়, এ দায়িত্ব আমাদের অবিলম্বে স্বীকার করে নিতেই হবে—রাষ্ট্র, সমষ্টি এবং ব্যষ্টির দায়িত্বেই। বিজ্ঞানই আমাদের জানিয়েছে—ব্যষ্টির অজ্ঞতা আমাদের সমষ্টির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানই জানিয়েছে,—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী ছাড়া কোনো ক্ষেত্রেই সার্বিক বিপ্লব বা বৈষয়িক অগ্রগতিও ঘটানো যায় না।

দেশের সার্থক উন্নতি ও দেশের মানুষের জীবনের সামগ্রিক মান উন্নয়নে—এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, বিজ্ঞান-প্রসার এবং বিজ্ঞান-মনস্কতা, গড়ে তোলার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন—উপলব্ধি করেছিলেন এদেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রসার ও প্রচারের একান্ত প্রয়োজনীয়তাকে। তাঁরই আহ্বানে সেদিন সমবেত হয়েছিলেন বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞান-অনুরাগী মানুষেরা। স্বাধীনতার লগ্ন থেকেই সেদিন প্রতিষ্ঠা হয় 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' এবং তার মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা'। "যারা বলেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান হয় না, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান জানেন না"—এই জলন্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর জীবৎকালে অনলস পরিশ্রমে এ সত্যটি প্রতিষ্ঠা করে যান যে—মাতৃভাষায় বিজ্ঞান সত্যিই ছড়িয়ে দেওয়া যায়। বত্রিশ বছরের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' কতো বিচিত্র বিজ্ঞান সমাচার প্রকাশিত এবং তা সবই মাতৃভাষায়। বত্রিশ বছরে, নানা কর্মসূচীতে—বক্তৃতা, পাঠাগার, পত্রিকা, জনপ্রিয় বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশ, মডেল তৈরী কেন্দ্র, প্রদর্শনী - প্রভৃতিতে, 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' একটি ঐতিহ্য রচনা করেছে, আজো করছে। তবু এই ঐতিহ্য, আমাদের আত্মতৃপ্তি ঘটায়নি। নিকট ভবিষ্যতেও ঘটাবে না। আচার্যের অনেক স্বপ্নই আজো অকৃতার্থ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কৃত্য আজো অল্পই উদ্‌যাপিত।

এই আত্মসমীক্ষার পাশাপাশি, আরো দু'একটি সমীক্ষা প্রয়োজন। কেরালায় 'শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ' ('জ্ঞান ও বিজ্ঞান', জানুয়ারি 1979) বিপুল কর্মকাণ্ড গড়ে তুলেছেন, সারা প্রদেশে—বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে, লোকপ্রিয় বিজ্ঞানের প্রচুর সৃষ্টিতে, ও বিজ্ঞান-ক্লাব প্রভৃতি নানা কর্মসূচীতে। বেসরকারী বদান্যতা ছাড়াও প্রভূত সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা তাঁদের নিয়তই উৎসাহিত করছে। সব থেকে বড়ো কর্মসূচী নিয়েছেন, আমাদেরই প্রতিবেশী রাষ্ট্র—বাংলাদেশ। তাঁদের ভাষাও, বাংলাভাষা। বাংলাদেশ 'বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানজীবী সমিতি'—জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিকল্পনার পরিপূরকে, জনজীবনে বিজ্ঞান প্রসারের জন্য গড়ে তুলেছেন 'বিজ্ঞান-ক্লাব' আন্দোলন। সারা বাংলা-দেশে গ্রাম-শহরে অন্যন 140টি বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠেছে, এই বিজ্ঞান ক্লাবগুলি কেবল চমক লাগানোর ম্যাজিক দেখানোর বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরিই নয়, স্থানীয় পরিবেশকে ভিত্তি করে নানা মূল্যবান বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা নিয়মিতভাবে করছে, যা কালে সমগ্র দেশের বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে লাভবান করবে। এই আন্দোলনে, যুক্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের নানা বিজ্ঞান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উদ্যম। আর্থিক সহযোগিতা করছেন বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও বিভাগ ও জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ। উদ্‌যাপিত হচ্ছে জাতীয় কর্মসূচীর ভিত্তিতে—জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ। প্রকাশিত হয়েছে কম করে 400 লোকবিজ্ঞান স্বল্প মূল্যের গ্রন্থ। প্রকাশিত হচ্ছে নিয়মিত বেশ কয়েকটি মাসিক ও ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা – যার প্রধান মুখপত্র মাসিক 'বিজ্ঞান সাময়িকী' ও ত্রৈমাসিক 'বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা'।

সরকার ও জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ও বদান্যতা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে ভবিষ্যতে যুক্ত হয়ে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকেও সমান্তরাল কর্ম সূচীতে প্রেরণা দেবে, এই আশাবাদ নিয়ে, সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

"যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে ফলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। দুই চারিজন ইংরেজিতে বিজ্ঞান শিখিয়া কি করিবেন? তাহাতে সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন? সামাজিক 'আবহাওয়া' কেমন করিয়া বদলাইবে? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া শুনুক আর নাই শুনুক। দশবার বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্তিত হয়। অতএব বাঙ্গাল কে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।"

বঙ্গে বিজ্ঞান (বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক, 1289 বঙ্গাব্দ)

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান

রাজশেখর বসু

যাদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখা হয় তাদের মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম, যারা ইংরেজী জানে না বা অতি অল্প জানে। অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়ে এবং অল্পশিক্ষিত বয়স্ক লোক এই শ্রেণীতে পড়ে। দ্বিতীয়, যারা ইংরেজী জানে এবং ইংরেজী ভাষায় অল্পাধিক বিজ্ঞান পড়েছে।

প্রথম শ্রেণীর পাঠকদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় নেই। গুটিকতক ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ হয়তো তারা শিখেছে, যেমন টাইফয়েড, আয়োডিন, মোটর, ক্রোটন, জেব্রা। অনেক রকম স্থূল তথ্যও তাদের জানা থাকতে পারে, যেমন জল আর কর্পূর উবে যায়, পিতলের চাইতে অ্যালিউমিনিয়ম হালকা, লাউ কুমড়ো জাতীয় গাছে দু রকম ফুল হয়। এই রকম সামান্য জ্ঞান থাকলেও সুশৃঙ্খল আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য তারা কিছুই জানে না। এই শ্রেণীর পাঠক ইংরেজী ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত, সেজন্য বাংলা পরিভাষা আয়ত্ত করে বাংলায় বিজ্ঞান শেখা তাদের সংস্কারের বিরোধী নয়। ছেলেবেলায় আমাকে ব্রহ্মমোহন মল্লিকের বাংলা জ্যামিতি পড়তে হয়েছিল। 'এক নির্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট সরল রেখার উপর এক সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত করতে হইবে'—এর মানে বুঝতে বাধা হয় নি, কারণ ভাষাগত বিরোধী সংস্কার ছিল না কিন্তু যারা ইংরেজী জিওমেট্রি পড়েছে তাদের কাছে উক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যটি সুশ্রাব্য ঠেকবে না, তার মানেও স্পষ্ট হবে না। যে লোক আজন্ম ইজার পরেছে তার পক্ষে হঠাৎ ধুতি পরা অভ্যাস করা একটু শক্ত। আমাদের সরকার ক্রমে ক্রমে রাজকার্যে দেশী পরিভাষা চালাচ্ছেন, তাতে অনেকে মুশকিলে পড়েছেন, কারণ তাঁদের নূতন করে শিখতে হচ্ছে।

পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর পাঠক যখন বাংলায় বিজ্ঞান শিখে তখন ভাষার জন্য তার বাধা হয় না, শুধু বিষয়টি যত্ন করে বুঝতে হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশের শিক্ষার্থীর চেয়ে তাকে বেশী চেষ্টা করতে হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠক যখন বাংলা ভাষায় লেখা বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ পড়ে তখন তাকে পূর্ব সংস্কার দমন করে (অর্থাৎ ইংরেজীর প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাত বর্জন করে) প্রীতির সহিত মাতৃভাষার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হয়। এই কারণে পাশ্চাত্ত্য পাঠকের তুলনায় তার পক্ষে একটু বেশী চেষ্টা আবশ্যক।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার এখনও নানা রকম বাধা আছে। বাংলা পারিভাষিক শব্দ প্রচুর নেই। অনেক বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েক জন বিদ্যোৎসাহী লেখক নানা বিষয়ের পরিভাষা রচনা করেছিলেন। তাঁদের উদ্‌যোগের এই ত্রুটি ছিল, যে তাঁরা একযোগে কাজ না করে স্বতন্ত্রভাবে করেছিলেন, তার ফলে সংকলিত পরিভাষার সাম্য হয় নি, একই ইংরেজী সংজ্ঞার বিভিন্ন প্রতিশব্দ রচিত হয়েছে। 1936 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে পরিভাষা-সমিতি নিযুক্ত করেছিলেন তাতে বিভিন্ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্বজ্ঞ, সংস্কৃতজ্ঞ, পণ্ডিত এবং কয়েক জন লেখক একযোগে কাজ করেছিলেন, তার ফলে তাঁদের চেষ্টা অধিকতর সফল হয়েছে।

পরিভাষা-রচনা একজনের কাজ নয়, সমবেত ভাবে না করলে নানা ক্রটি হতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলন খুব বড় নয়, আরও শব্দের প্রয়োজন আছে এবং তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কিন্তু দরকার মতন বাংলা শব্দ পাওয়া না গেলেও বৈজ্ঞানিক রচনা চলতে পারে। যত দিন উপযুক্ত ও প্রামাণিক বাংলা শব্দ রচিত না হয় তত দিন ইংরেজী শব্দই বাংলা বানানে চালানো ভাল। বিশ্ববিদ্যালয়-নিযুক্ত সমিতি বিস্তর ইংরেজী শব্দ বজায় রেখেছেন। তাঁরা বিধান দিয়েছেন যে নবাগত রাসায়নিক বস্তুর ইংরেজী নামই বাংলা বানানে চলবে, যেমন অক্সিজেন, প্যারাডাই ক্লোরোবেনজিন। উদ্‌ভিদ ও প্রাণীর জাতিবাচক বা পরিচয়বাচক অধিকাংশ ইংরেজী (বা সার্বজাতিক, international) নামও বাংলায় চালানো যেতে পারে, যেমন ম্যালভাসী, ফার্ন, আরথ্রোপোডা, ইনসেক্টা।

পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় এদেশের জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নগণ্য। প্রাথমিক বিজ্ঞানের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় না থাকলে কোনও বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ বোঝা কঠিন। ইওরোপ আমেরিকায় পপুলার সায়েন্স লেখা সুসাধ্য এবং সাধারণে তা সহজেই বোঝে। কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা তেমন নয়, বয়স্কদের জন্য যা লেখা হয় তাও প্রাথমিক বিজ্ঞানের মতন গোড়া থেকে না লিখলে বোধগম্য হয় না। জনসাধারণের জন্য যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞান লেখেন তাঁরা এ বিষয়ে অবহিত না হলে তাঁদের লেখা জনপ্রিয় হবে না। অবশ্য কালক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার হলে এই অসুবিধা দূর হবে, তখন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা সুসাধ্য হবে।

বিজ্ঞান আলোচনার জন্য যে রচনাপদ্ধতি আবশ্যক তা অনেক লেখক এখনও আয়ত্ত করতে পারেন নি, অনেক স্থলে তাঁদের ভাষা আড়ষ্ট এবং ইংরেজীর আক্ষরিক অনুবাদ হয়ে পড়ে। এই দোষ থেকে মুক্ত না হলে বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। অনেক লেখক মনে করেন, ইংরেজী শব্দের যে অর্থব্যাপ্তি বা connotation, বাংলা প্রতিশব্দেরও ঠিক তাই হওয়া চাই, এজন্য অনেক সময় তাঁরা অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ করেন। ইংরেজী sensitive শব্দ নানা অর্থে চলে, যেমন sensitive person, wound, plant balance, photographic paper, ইত্যাদি। বাংলায় অর্থভেদে বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করাই উচিত, যেমন অভিমানী, ব্যথাপ্রবণ, উত্তেজী, সুবেদী, সুগ্রাহী। Sensitized paper এর অনুবাদ স্পর্শকাতর কাগজ অতি উৎকট, কিন্তু তাও কেউ কেউ লিখে থাকেন। সুগ্রাহী কাগজ লিখলে ঠিক হয়।

অনেক লেখক তাঁদের বক্তব্য ইংরেজীতে ভাবেন এবং যথাযথ বাংলা অনুবাদে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। এতে রচনা উৎকট হয়। The atomic engine has not even reached the blue print stage,—'পরমাণু এঞ্জিন নীল চিত্রের অবস্থাতেও পৌছায় নি।' এরকম বর্ণনা বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। একটু ঘুরিয়ে লিখলে অর্থ সরল হয়—পরমাণু এঞ্জিনের নক্‌শা পর্যন্ত এখনও প্রস্তুত হয় নি। When sulphur burns in air the nitrogen does not take part in the reaction—'যখন গন্ধক হাওয়ায় পোড়ে তখন নাইট্রোজেন প্রতিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না" এরকম মাছি মারা নকল না করে 'নাইট্রোজেনের কোনও পরিবর্তন হয় না' লিখলে বাংলা ভাষা বজায় থাকে।

অনেকে মনে করেন পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করলে রচনা সহজ হয়। এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। স্থান বিশেষে পারিভাষিক শব্দ বাদ দেওয়া চলে, যেমন 'অমেরুদণ্ডী'র বদলে লেখা যেতে পারে—যেসব জন্তুর শিরদাঁড়া নেই। কিন্তু 'আলোক-তরঙ্গ' এর বদলে আলোর কাঁপন বা নাচন লিখলে কিছুমাত্র সহজ হয় না।

পরিভাষার উদ্দেশ্য ভাষার সংক্ষেপ এবং অর্থ সুনির্দিষ্ট করা। যদি বার বার কোনও বিষয়ের বর্ণনা দিতে হয় তবে অনর্থক কথা বেড়ে যায়, তাতে পাঠকেরও অসুবিধা হয়। সাধারণের জন্য যে বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ লেখা হয় তাতে অল্পপরিচিত পারিভাষিক শব্দের প্রথমবার প্রয়োগের সময় তার ব্যাখ্যা (এবং স্থল-বিশেষে ইংরেজী নাম) দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু পরে শুধু বাংলা পারিভাষিক শব্দটি দিলেই চলে।

আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ শক্তির কথা বলেছেন—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। প্রথমটি শুধু আভিধানিক অর্থ প্রকাশ করে, যেমন 'দেশ-এর অর্থ ভারত ইত্যাদি, অথবা স্থান। কিন্তু 'দেশের লজ্জা'—এখানে লক্ষণায় দেশের অর্থ দেশ-বাসীর। 'অরণ্য'-এর আভিধানিক অর্থ বন, কিন্তু 'অরণ্যে রোদন' বললে ব্যঞ্জনায় অর্থ হয় নিষ্ফল খেদ। সাধারণ সাহিত্যে লক্ষণা বা ব্যঞ্জনা, এবং উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলংকারের সার্থক প্রয়োগ হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে তা যত কম থাকে ততই ভাল। উপমার কিছু প্রয়োজন হয়, রূপকও স্থলবিশেষে চলতে পারে, কিন্তু অন্যান্য অলংকার বর্জন করাই উচিত। 'হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড'—কালিদাসের এই উক্তি কাব্যেরই উপযুক্ত, ভূগোলের নয়। বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের ভাষা অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক—এই কথাটি সকল লেখকেরই মনে রাখা উচিত।

বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিতে আর একটি দোষ প্রায় নজরে পড়ে। অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী এই প্রবাদটি যে কত ঠিক তার প্রমাণ আমাদের সাময়িক পত্রাদিতে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে একটি পত্রিকায় দেখেছি—'অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন স্বাস্থ্যকর বলে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। তারা জীবের বেঁচে থাকবার পক্ষে অপরিহার্য অঙ্গ মাত্র। তবে ওজন গ্যাস স্বাস্থ্যকর।' এই রকম ভুল লেখা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনিষ্টকর। সম্পাদকের উচিত অবিখ্যাত লেখকের বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশের আগে অভিজ্ঞ লোককে দিয়ে যাচাই করে নেওয়া।

"যিনি বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক তিনি ধীরভাবে ভ্রমপ্রমাদ যথাসাধ্য পরিহার ক'রে সত্যের সন্ধান করেন, প্রবাদকে প্রমাণ মনে করেন না, প্রচুর প্রমাণ না পেলে কোনও নূতন সিদ্ধান্ত মানেন না, অন্য বিজ্ঞানীর ভিন্ন মত থাকলে অসহিষ্ণু হন না, এবং সুপ্রচলিত মতও অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকেন না। উপযুক্ত প্রমাণ পেলেই বিনা দ্বিধায় মত বদলাতে পারেন। জগতের শিক্ষিত জন যদি সকল ক্ষেত্রে এই প্রকার উদার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োগ করতে শেখেন তবে কেবল সাধারণ ভ্রান্ত সংস্কার দূর হবে না, ধর্মান্ধতা ও রাজনীতিক সংঘর্ষেরও অবসান হবে।"

রাজশেখর বসু

বিজ্ঞান প্রবন্ধ

মৃত্তিকা বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ

।। শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতার (1979) সারাংশ ।।

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়*

চলতি ভাষায় মৃত্তিকাকে মাটি বলা হয়। মাটি এতই সুলভ ও কাছের বস্তু যে মনে হয় পরিচয় অনাবশ্যক। মাটি বলতে সাধারণতঃ অবহেলা, ময়লা এবং অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পায়। 'মা'-টি বললে অন্য অর্থ হয়। সর্বংসহা পৃথিবী, যেমন মা। মাটি নানাবিধ উৎপীড়ন সহ্য করেও যথাসাধ্য উপকার করতে কার্পণ্য করে না।

মৃত্তিকা অনেক কাজে লাগে। প্রধানতঃ কৃষি-কার্যে; তা ছাড়া গৃহ ও রাস্তা-নির্মাণ কার্যে; কাগজশিল্পে; তৈলাদি পরিশ্রুত করতে; খনিজ তৈল উদ্ধারকার্যে; চীনামাটিজাত শিল্পাদিতে; ময়লা ও বীজাণু ধ্বংস কার্যে। যে বস্তুটি এত রকম কাজে ব্যবহৃত হয় তার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন রয়েছে।

মৃত্তিকা একটি জটিল বস্তু এবং নানাবিধ উপাদানের সমষ্টি। মৃত্তিকা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সুবিন্যস্ত ভিত্তি রচিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সাহায্যে এই জটিল মৃত্তিকার গুণাগুণ যেমন জানা গিয়েছে তেমনি কী কী উপাদান দ্বারা গুণাদি নির্ধারিত হয় অথবা কী কী বিক্রিয়ার সাহায্যে গুণাদির সুযোগ নিয়ে কী কী প্রয়োগ শিল্প রচনা করা সম্ভব তাও জানা গিয়েছে।

পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থিত ধুলা-বালি-কাদা-ময়লা ইত্যাদিকে সাধারণতঃ মাটি বা মৃত্তিকা বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করতে হলে মৃত্তিকার একটি সংজ্ঞা প্রয়োজন। এই জন্য মৃত্তিকা কী এবং কী থেকে তার উৎপত্তি জানা দরকার। মৃত্তিকা রাসায়নিক দৃষ্টিতে একটি জটিল সিলিকেট সমষ্টি। এই সিলিকেটগুলির আয়তন সাধারণ অণুর তুলনায় বিরাট; বস্তুতঃ অসংখ্য অণুর সহযোগে এক একটি বৃহৎ অণুর সৃষ্টি হয়েছে। এত বড় যে চোখেও ধরা পড়ে। এই জন্য মৃত্তিকা সিলিকেট অণুসমষ্টিকে কণা বলা যায়। এই কণা-গুলির ব্যাস <2 মি. মি ধরা হয়। 2 মি. মি. এর থেকে বড় কণাগুলির মধ্যে মৃত্তিকার তথাকথিত কোন গুণই পাওয়া যায় না। নানা আয়তনের কণাসমষ্টির রাসায়নিক গঠন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন।

মৃত্তিকার উৎপত্তি হল শিলা থেকে। শিলা নানা ধরণের। পৃথিবীর জন্মকাল থেকে এই সব শিলাশ্রেণী তাপ, শৈত্য, জল, বৃষ্টি, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদির সংস্পর্শে এসেছে এবং নিয়ত রূপান্তরিত হচ্ছে। বছরের পর বছর রাসায়নিক এবং ভৌত বিক্রিয়াদির ফলে কঠিন শিলাপৃষ্ঠে একটি অপেক্ষাকৃত নরম এবং কণাবিশিষ্ট আস্তরণ তৈরি হয়েছে। আপাতঃদৃষ্টিতে আস্তরণটি কঠিন শিলা থেকেই উদ্ভূত এবং সম্ভবতঃ তাপশৈত্য জলবৃষ্টির আক্রমণে কণায় রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধান করলে অণুকণাটির সমষ্টি এবং চূর্ণীকৃত শিলার মধ্যে ব্যবধান প্রকট হয়ে পড়ে। একটি সামান্য পরীক্ষার সাহায্যে নেওয়া যেতে পারে। দুটি কাঁসার পাত্রের

---

*332, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা-700068

(4-5 সে. মি. ব্যাস ও 1 সে. মি. উঁচু) তলদেশে কতগুলি ছিদ্র করা হল। সছিদ্র তলদেশে দু-খানি চোষকাগজ মাপমত বসিয়ে <2 মি. মি. শুষ্ক মৃত্তিকা ও চূর্ণীকৃত শিলাদ্বারা যথাক্রমে ভরাট করে দেওয়া হল। দুটি পাত্রকেই একসাথে একটি বড় পাত্রে রাখা হল যাতে তলদেশ না ঠেকে যায়। অতঃপর এমন পরিমাণ জল ঢেলে দেওয়া হল যাতে মধ্যস্থিত মৃত্তিকা শিলাচূর্ণ ভরা পাত্র দুটির তলদেশ 0.5 সে. মি. পর্যন্ত ডুবে যায়। সবটাই আর একটি ঢাকনা দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে দেওয়া হল যাতে বাষ্পাকারে জল দ্রুত উড়ে না যায়। 24 ঘণ্টা পরে দেখা যাবে যে, যে পাত্রটিতে মৃত্তিকা রাখা আছে তা কিছুটা স্ফীত হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় পাত্রস্থিত শিলাচূর্ণ প্রায় একই অবস্থায় আছে কিম্বা সামান্য চুপ্‌সে গিয়েছে। জলের সংস্পর্শে রাখার সঙ্গে সঙ্গে নজর করলে দেখা যেত যে মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে জল টেনে নিচ্ছে। যদি এই অবস্থায় পাত্রদুটি তুলে এনে কিছুটা মৃত্তিকা এবং শিলাচূর্ণ সরিয়ে জল ঢেলে দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যে শিলাচূর্ণ ভরা পাত্রটির তলদেশ থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই জল নিষ্কাশিত হচ্ছে। কিন্তু মৃত্তিকা ভরা পাত্রটি থেকে জল একেবারেই বেরোচ্ছে না কিম্বা অতি মন্থর গতিতে সামান্যই বেরোচ্ছে (চিত্র-1)।

এমন কি অধিকতর সূক্ষ্ম কণায় পরিণত করলেও শিলাচূর্ণ মৃত্তিকার গুণ পায় না। মৃত্তিকা যেমন জল টানতে পারে, তেমনি জল ধরেও রাখতে পারে। জলের প্রতি আকর্ষণ ও জলের সহিত বন্ধন মৃত্তিকার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই জন্যই কৃষি এবং উল্লিখিত নানাবিধ প্রয়োগকার্যে মৃত্তিকার উপযোগিতা অতুলনীয়।

শিলা থেকে রূপান্তরিত হয়েই যে মৃত্তিকার উৎপত্তি ঘটেছে সেই বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে শিলা ও মৃত্তিকার মধ্যে বিভেদও প্রতীয়মান হয়।

কয়েকটি উপাদানের পরিমাণগত তারতম্য সহজেই চোখে পড়ে (প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ সারণী দ্রষ্টব্য) যেমন, শিলার তুলনায় সিলিকার পরিমাণ মৃত্তিকায় কিছু বেশী, কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম ও আয়রন অক্সাইড মৃত্তিকায় কম। অন্যদিকে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, পটাসিয়াম ও সোডিয়ামের পরিমাণ শিলায় অনেক বেশী। মৃত্তিকায় অধিক পরিমাণ জলের অবস্থিতি বিশেষ লক্ষণীয়। প্রারম্ভে পরীক্ষাদ্বারা এই তথ্যটিই বোঝানো হয়েছিল। 2নং ও 4 নং সারণী সঙ্গে পার্থক্য লক্ষণীয়। দ্বিতীয় মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের প্রাধান্য দ্রষ্টব্য। চতুর্থটিতে বিযোজন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।
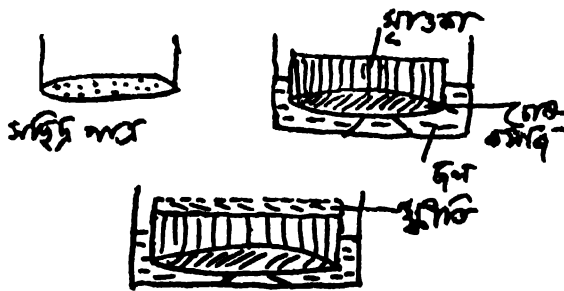
চিত্র-1

এই ছোট একটি পরীক্ষাদ্বারা এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে শিলাচূর্ণ এবং মৃত্তিকা একই বস্তু নয়। অর্থাৎ শিলাখণ্ড চূর্ণ করলেই মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয় না।

শিলাস্থিত আদি মিনারেল, আবহাওয়া যথা গড় বারিপাত ও তাপাঙ্ক, উদ্ভিজ্জ পদার্থ, জীবাণুসমষ্টি ও কাল—এই পাঁচটিকে শিলা থেকে মৃত্তিকায় রূপান্তরের

প্রধান কারণ রূপে চিহ্নিত করা হয়। এই কারণগুলির তারতম্য মৃত্তিকার জটিলতা এবং পার্থক্যের জন্য দায়ী। অবস্থার উপর নির্ভর করে কী কী করতে হবে। কল্পনার ভিত্তি হলো শিলাপৃষ্ঠস্থিত মৃত্তিকা কিংবা মৃত্তিকাসম পদার্থের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যদি এমন একটি জায়গার মৃত্তিকা পরীক্ষা করা হয়

তালিকা-1

	আগ্নেয় শিলা	মৃত্তিকা 1	মৃত্তিকা 2	মৃত্তিকা 3	মৃত্তিকা 4
SiO_2	59·1	69·3	57·5	74·7	19·9
M_2O_3	15·3	11·4	7·8	12·3	37·1
$F_{e_2}O_3$	7·3	3·8	2·5	4·9	15·6
TiO_2	1·0	0·5	0·7	1·3	2·0
M_nO	0·1	0·2	0·2	0·3	0·3
C_aO	5·1	1·6	1·2	0·2	0·2
M_gO	3·5	0·9	0·6	0·1	0·5
K_2O	3·1	1·8	0·9	0·6	0·1
$N_{a_2}O$	3·8	1·1	1·0	0·2	0·2
P_2O_5	0·3	0·2	0·2	0·2	0·3
SO_3	0·1	0·1	0·3	—	0·2
দহনজনিত ঘাটতি	1·2	9·5	27·2	7·1	24·1
জৈব পদার্থ	—	6·0	25·5	2·4	6·0

* দহনজনিত ঘাটতির অন্তর্গত

রাসায়নিক ও ভৌত ক্রিয়া প্রাধান্য লাভ করবে। এই ক্রিয়াগুলি অতি মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়। যুগ যুগ ধরে এই সকল বিক্রিয়ার ফলে মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়। একটি মানুষের জীবদ্দশায় হয়তো এই রূপান্তর ধরা পড়বে না। যেহেতু এই রূপান্তর চলমান সেই জন্য নিত্য পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে অনুমিত হয় না। এই জন্য কাল অন্যতম কারণরূপে স্বীকৃত হয়েছে। কালের প্রভাব—এই তথ্য থেকে অনুমান করা যায়, যে এক মিলিমিটার মৃত্তিকাস্তর প্রস্তুত হতে প্রায় শতাধিক বৎসর লাগে। সুতরাং কীভাবে শিলা মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয়েছে তার পারম্পর্য সম্পর্কে আংশিক কল্পনা এবং আংশিক পরোক্ষ তথ্যের উপর নির্ভর

যেখানে বারিপাত বা তাপমাত্রা অত্যধিক নয় তা হলে মৃত্তিকার স্তর ভেদ করে অনায়াসে ক্রমশঃ অপরিবর্তিত শিলাপৃষ্ঠের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। এই অবস্থায় স্তরগুলির মধ্যে কিছু কিছু চাক্ষুষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে। শিলাখণ্ডের সান্নিধ্যে যে স্তরটি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় কঠিন শিলা অপেক্ষাকৃত নরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে এবং ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ক্রমশঃ উপরের দিকে অগ্রসর হলে দেখা যায় যে, যেমন রং-এর পরিবর্তন হচ্ছে, —হল্‌দে থেকে ছাই বা কৃষ্ণবর্ণ—তেমনি কণাগুলির আয়তন ক্ষুদ্রতর হয়েছে ও জলীয় অংশের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃষ্ঠস্থিত সর্বপ্রথম স্তরে উদ্ভিদাদি থেকে উদ্ভূত জৈব পদার্থের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যাবে।

অনুরূপ তথ্যের ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে মৃত্তিকার উৎপত্তি সম্পর্কে নিম্নরূপ ধারণা করা হয়। প্রধানতঃ দিনে গরম রাত্রে ঠাণ্ডার জন্য তাপমাত্রার হঠাৎ পরিবর্তন হেতু শিলাস্তূপ ভেঙ্গে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত হয়। এ ছাড়া কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেও শিলাখণ্ড মন্দ অথচ অবিরাম গতিতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শিলাস্তূপের ফাটলে জল বরফে পরিণত হলে আয়তন সম্প্রসারিত হয়, তার চাপেও শিলাস্তূপ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে থাকে।

সোদন, জারণ-বিজারণ এবং কার্বনেট্‌করণ এই তিনটি বিক্রিয়ার ফলে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থগুলি আয়তনে বৃদ্ধি লাভ করে এবং শিলাখণ্ডের গাত্র থেকে ধীরে ধীরে পাত্‌লা পাত্‌লা টুক্‌রো পৃথক হয়ে বেরিয়ে যায়। ফেরাসঅক্সাইড্‌ জারিত হয়ে জলের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রক্সাইড্‌ প্রস্তুত করে। তেমনি ফেরাস্‌ সাল্‌ফাইড জারিত হয়ে ফেরাস্‌ সাল্‌ফেট তৈরি করে। অন্যদিকে বায়ুর অনুপস্থিতিতে জলাবৃত অবস্থায় ফেরিক অক্সাইড্‌ ফেরাস অক্সাইডে পরিণত হয়। আর্দ্র-বিশ্লেষ বিক্রিয়া দ্বারা শিলাস্থিত মিনারেল ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সোদন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। আর্দ্রবিশ্লেষলব্ধ ক্ষারীয় বস্তু বায়ুস্থিত কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কার্বনেট প্রস্তুত করে। উল্লিখিত সব কয়টি বিক্রিয়ার আর একটি সাধারণ ফল হল আয়তন বৃদ্ধি। নিম্ন-লিখিত সমীকরণ সাহায্যে বিক্রিয়াগুলি প্রকাশ করা যায়:

তালিকা 2

$4FeO + O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$ (জারণ)

$Fe_2O_3 + 3H_2O \rightarrow 2Fe(OH)_3$ অথবা $Fe_2O_3, 3H_2O$ (সোদন)

$FeS + 2O_2 - FeSO_4$ (জারণ)

$Fe_2O_3 \rightarrow FeO$ (বিজারণ, জলাবৃত অবস্থায়)

$K_2O, Al_2O_3, 6\,SiO_2 + 3H_2O \rightarrow Al_2O_3, 2SiO_2, 2H_2O + 2KOH + 4SiO_2$ (আর্দ্রবিশ্লেষ)

$2KOH + CO_2 \rightarrow K_2CO_3 + H_2O$ (কার্বনেটকরণ)
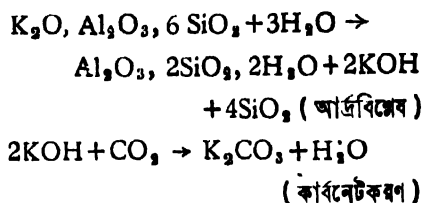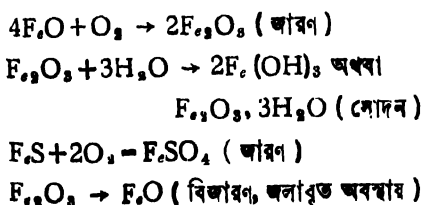
উল্লিখিত আর্দ্রবিশ্লেষের ফলে সিলিকেটের ক্ষারীয় ও আম্লিক উপাদানগুলি পৃথক হয়ে যায়। প্রচুর পরিমাণ বারিপাত হলে বিক্রিয়াঘটিত দ্রবণীয় উপাদানগুলি দূরীভূত হয় এবং স্বল্পদ্রব আম্লিক সিলিকেট প্রাধান্য লাভ করে। বস্তুতঃ বিযোজিত সিলিকেটের রাসায়নিক সংযুতি আর্দ্রবিশ্লেষের তীব্রতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। এই জন্য বারিপাত ও উৎপন্ন মৃত্তিকার সংযুক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। আর্দ্র-বিশ্লেষ ব্যতীত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াদ্বারাও মিনারেলের রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সিলিকেট মিনারেলের রাসায়নিক বিযোজন প্রবণতা সাধারণতঃ অক্সিজেন ও সিলিকনের পারমাণবিক ব্যাসের অনুপাতের উপর নির্ভরশীল। নিম্নলিখিত মিনারেলগুলির বিযোজনপ্রবণতা বাম দিক থেকে ডাইনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু অক্সিজেন-সিলিকনের অনুপাত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

তালিকা 3

মিনারেল	অলিভিন	অগাইট	হর্নব্লেণ্ড	বায়োটাইট	কোয়ার্ৎজ্‌
OiSi	4	3	2·7	2·5	2

শিলাপৃষ্ঠ কঠিন হলে কোন কোন বৃক্ষ বা উদ্ভিদ্‌ শিকড় সাহায্যে পুষ্টি আহরণ করতে সমর্থ হয়। উদ্ভিজ্জের পত্রাদি কিংবা অবশিষ্টাংশ উপযুক্ত পরিমাণ জলের উপস্থিতিতে জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং পচনক্রিয়ার সম্মুখীন হয়। পচনক্রিয়ার গতিবিধি নির্ণীত হয় জীবাণুর প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর। পচনের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বহুবিধ জৈব

অম্ল উৎপন্ন হয়। মৃত্তিকার উৎপত্তির কারণ হিসেবে এই সব অম্ল পদার্থের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এমন কি উৎপন্ন মৃত্তিকা জৈব পদার্থের সংস্পর্শে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে নূতন গুণবিশিষ্ট মৃত্তিকা সৃষ্টি করতে পারে।

মৃত্তিকার উৎপত্তির প্রধান পাঁচটি কারণ, কী কী প্রক্রিয়াদ্বারা শিলাকে রূপান্তরিত করে তাদের কিছু পরিচয় দেওয়া হল। অতি মন্থর গতিতে এই রূপান্তর অগ্রসর হয় এবং যদি শিলাপৃষ্ঠ মোটামুটি সমতল হয় তা হলে মৃত্তিকা প্রস্তুতিকার্য ক্রমশঃ পৃষ্ঠদেশ থেকে শুরু করে নিম্নদিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং মৃত্তিকার স্তর ক্রমশঃ গভীরতা লাভ করে। অবিকৃত শিলাপৃষ্ঠ থেকে মৃত্তিকার গভীরতা জেনে মৃত্তিকার বয়সেরও একটা আন্দাজ করা যায়। সমতল না হয়ে যদি নতিবিশিষ্ট হয়, তা হলে বারিপাতের আক্রমণে উৎপন্ন মৃত্তিকা ঢালুদিকে স্থানান্তরিত হয়। এই কারণে ঢালুবিশিষ্ট শিলাপৃষ্ঠের মৃত্তিকা বিভিন্ন হতে বাধ্য। নদী খালের ঘোলা জলে যে মৃত্তিকা প্রলম্বিত থাকে তার আংশিক উৎস হল ঢালু জমি থেকে ধুয়ে আসা মাটি। পলিমাটির উৎপত্তিও অনুরূপ।

শিলা ও মৃত্তিকার সঙ্গে জলের বিক্রিয়ার তারতম্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এদের অজৈব অংশের প্রধান উপাদানগুলি কেলাসিত। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর পদার্থের কেলাসের মধ্যে বিস্তর তারতম্য আছে, যার ফলে মৃত্তিকার জলধারণের ক্ষমতা অধিকতর। এক্স্-রে বিশ্লেষণ সাহায্যে দেখা গিয়েছে যে মৃত্তিকাস্থিত সিলিকেট কেলাস দ্বিমাত্রিক কিন্তু শিলাস্থিত সিলিকেট কেলাস ত্রিমাত্রিক। এই রূপান্তর কী ভাবে সংঘটিত হল সেই সম্পর্কে বহু গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে শিলাস্থিত ত্রিমাত্রিক সিলিকেট কেলাস আর্দ্র বিশ্লেষের ফলে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে গিয়ে প্রধানতঃ অ্যালুমিনিয়াম ও আয়রন অক্সাইড কিম্বা হাইড্রক্সাইড এবং সিলিসিক অম্ল বা সিলিকা উৎপন্ন করে। বিশ্লিষ্ট অণুগুলির মধ্যে পুনরায় বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অথবা স্থানান্তরিত হয়, অর্থাৎ পুনরায় বিক্রিয়াকালে তারা অংশগ্রহণ করে না। কেবলমাত্র অবশিষ্ট অণুগুলিই বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে শিলা উৎপত্তি-কালীন উচ্চ চাপ কিম্বা তাপের পরিবর্তে মৃত্তিকা প্রস্তুতির সময় সাধারণ তাপ ও চাপই বিদ্যমান। সুতরাং বিশ্লিষ্ট অণুগুলি শিলা বা সমগুণ বিশিষ্ট পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে না। অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী মৃদু পরিবেশ অনুসারে বিশ্লিষ্ট অণুগুলি সহজ পদ্ধতিতে দ্বিমাত্রিক (অথবা কখনও এক মাত্রিক) কেলাসে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ খাদ্যগ্রহণ ও দেহ পরিপুষ্টির বিষয়টি উল্লেখ করা অবান্তর হবে না। খাদ্যের উপাদান, যথা প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি ইত্যাদি পাকস্থলীতে গিয়ে এন্‌জাইম সাহায্যে আর্দ্র বিশ্লেষ বিক্রিয়া দ্বারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত হয়। যেমন, প্রোটিন থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড। অ্যামিনো অ্যাসিড যথাস্থানে প্রবাহিত হয়ে অবস্থানুসারে প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু যে-প্রোটিন খাদ্যে ছিল তার সঙ্গে রূপান্তরিত প্রোটিনের বিশেষ কোন সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। এমনও হতে পারে যে ঐ অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পাত্রভেদে প্রোটিনে রূপান্তরিত না হয়ে অন্যভাবে পরিবর্তিত হলো এবং শরীরের কোন কাজে লাগার পূর্বেই নিষ্কাশিত হয়ে গেল।

শিলাস্থিত মিনারেলগুলিকে সাধারণতঃ প্রাথমিক পর্যায়ের এবং মৃত্তিকাস্থিত মিনারেলগুলিকে মাধ্যমিক পর্যায়ের বলা হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ের মিনারেল-গুলির যে কয়টি মৃত্তিকায় প্রায়শঃ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে কেওলিনাইট, মণ্ট্‌মরিলনাইট, ইলাইট, বাইডেলাইট ও ভার্মিকিউলাইট উল্লেখযোগ্য।

শিলা থেকে মৃত্তিকার উৎপত্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। উভয়বিধ পদার্থে বিদ্যমান কেলাসিত মিনারেলের বিন্যাস যে অভিন্ন নয় সে বিষয়েও জানা

গেল। মৃত্তিকার আরও কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যার পরিচয় বাঞ্ছনীয়। মৃত্তিকার অজৈব অংশ নানা আয়তনের কণাদ্বারা গঠিত। এই কণাসমষ্টিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয় (আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসারে)।

<0·002 মি মি. কণাসমষ্টিকে ক্লেদ বা কর্দম বলা হয়, 0·002 – 0·02 মি. মি. কণাসমষ্টিকে পলি বলা হয়। এবং 0·02 – 2 মি. মি. কণাসমষ্টিকে বালুকা বা বালি বলা হয়। বালিকে মিহি (0·02 – 0·2 মি.মি) ও মোটা (0·2 – 2 মি.মি) শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

সূক্ষ্ম ক্লেদ অংশই সর্বাধিক ক্রিয়াক্ষম। মৃত্তিকা জল আকর্ষণ করে স্ফীতিলাভ করে তার জন্য প্রকৃত দায়ী মৃত্তিকার ক্লেদ অংশ। ক্লেদের সঙ্গে পলি ও বালি বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত অবস্থায় ক্লেদের বৈশিষ্ট্যগুলি কমবেশী হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ক্লেদ অন্য দুটি কণাসমষ্টিকে উপযুক্ত গ্রথন বাঞ্ছনীয়। যেমন, কৃষিকার্যে ক্লেদ অংশ অধিক হলে জল ও আয়নধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু জলনিকাশ ব্যাহত হয়, শুষ্ক অবস্থায় মৃত্তিকায় ফাটল ধরে এবং কঠিনত্ব লাভ করে। তাতে কৃষিকর্মের ব্যাঘাত ঘটে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে 10-25 শতাংশ ক্লেদ, 20-50 শতাংশ বালি এবং 70-90 শতাংশ পলিযুক্ত মৃত্তিকা বিভিন্ন দিক থেকে কৃষিকর্মে উৎকৃষ্ট। মৃৎশিল্পে ক্লেদ এবং বালি অংশ অপেক্ষাকৃত কম হওয়া বাঞ্ছনীয়, অতএব পলি অংশই সর্বাধিক। ইট তৈরির কাজেও ঐরূপ অনুপাত রাখা কাম্য। পেট্রোলিয়াম উদ্ধার কার্যে সেই মৃত্তিকাই ব্যবহার্য যার ক্লেদ অংশ অধিক, অথবা কেবলমাত্র ক্লেদ অংশই (বিশেষ করে মণ্ট্‌-মরিলনাইট শ্রেণীর ব্যবহার্য।

চলতি কথায় বেলে মাটি, এঁটেল মাটি, দো-আঁশ মাটি বলা হয়। এই বিবরণের মূল ভিত্তি হল

চিত্র-2
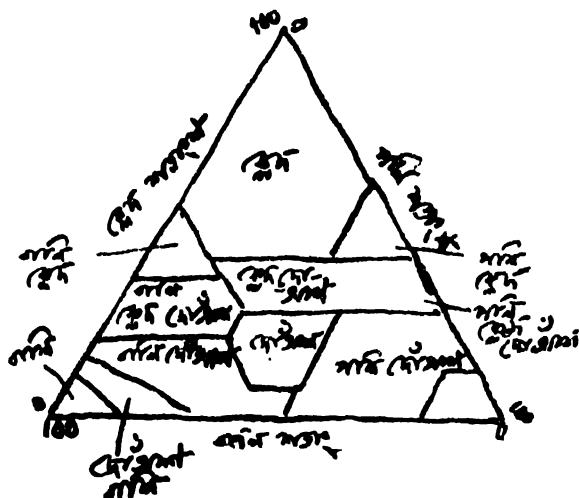
গ্রথিত করে. এই জন্য তিনটি অংশের সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় গ্রথন। মৃত্তিকার গ্রথন (অর্থাৎ ক্লেদ-পলি-বালির অনুপাত) অনুসারে তার প্রয়োগ বিধি নির্ভর করে। প্রত্যেক প্রয়োগক্ষেত্রে যথাসম্ভব গ্রথন। ক্লেদ-পলি-বালি এই তিনটি উপাদানের পরিমাণ সহজেই নির্ণয় করা যায়। নির্ণীত পরিমাণের শতাংশ একটি সমভুজ ত্রিকোণ গ্রাফে প্রকাশ করা সম্ভব (চিত্র-2)। তিনটি উপাদানের

সংখ্যানুপাত অনুসারে। বিভিন্ন মৃত্তিকার গ্রথনের যে শ্রেণী নির্দিষ্ট করা যায়। আমেরিকার মৃত্তিকা জরিপ বিভাগ যে সকল শ্রেণী চিহ্নিত করেছে সেগুলিই এখন সর্বত্র গ্রাহ্য হয়েছে।

মৃত্তিকাস্থিত বিভিন্ন আয়তনের কণা-সমষ্টি পরস্পরের সহিত আবদ্ধ থেকে বহুরকম ছোট-বড় দানা সৃষ্টি করে। এই বন্ধনের কাজে ক্লেদ অংশের অবদান যথেষ্ট। মৃত্তিকার জৈব অংশের মধ্যে হিউমাস্, গাম্ ও পেকটিন জাতীয় দ্রব্যাদি কম-বেশী পরিমাণে থাকে। এদের উদ্ভব হলো উদ্ভিজ্জ পত্রাদি এবং জীবাণুর দেহাবশেষ থেকে। ছোট-বড় দানাগুলির পারস্পরিক অবস্থান মৃত্তিকার গঠন নির্ণয় করে। মৃত্তিকার গঠনের বৈশিষ্ট্য দ্বারা কৃষিকর্ম প্রভাবিত হয়। জল ও বায়ু চলাচলের সুবিধা-অসুবিধা, গাছের শিকড়ের গতিবিধি ইত্যাদি বহুলাংশে নির্ভর করে মৃত্তিকার গঠনের উপর। ছোট ছোট দানা পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলে জল-বায়ু চলাচল সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়। গাছের শিকড়ও অবাধগতিতে অগ্রসর হতে পারে। কৃষিকর্মে এইরকম গঠনেরই মৃত্তিকার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। যে মৃত্তিকাতে কণাগুলি পরস্পর দৃঢ় বাঁধনের ফলে বড় বড় আয়তনের চাঙর বা মাটির তাল তৈরি করে সেই মৃত্তিকায় জল-বায়ু চলাচল ব্যাহত হয় এবং গাছের শিকড় খাদ্য আহরণের জন্য বেশী গভীরে যেতে পারে না। সুতরাং গাছ পুষ্টির অভাবে ক্রমশঃ শীর্ণ হয়ে পড়ে।

মৃত্তিকার গঠনের একটি মাপকাঠি ঠিক করা সম্ভব। কণাসমষ্টির বাঁধুনীর দৃঢ়তার উপর ভিত্তি করেই মৃত্তিকার গঠন শ্রেণী বিভাগ করা যায়। এই জন্য বাঁধুনীর একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা ধরে নিতে হয়। বড় থেকে ছোট ছিদ্রবিশিষ্ট এক সারি চালনী সাজানো হল এবং পরিমিত মৃত্তিকা 2 মি. মি. ব্যাস ছিদ্রবিশিষ্ট সর্বোপরি চালনীতে রাখা হল। চালনীগুলি সারিবদ্ধ অবস্থায় একটি জলভরা পাত্রে ডুবিয়ে দেওয়া হল এবং 20-25 বার উপর-নীচ ওঠানো-নামানো হল। এই প্রক্রিয়া দ্বারা জলের আঘাতে শিথিল বাঁধুনীযুক্ত কণাসমষ্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ক্রমশঃ নিচের ছোট ছিদ্রযুক্ত চালনীগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করবে। প্রত্যেকটি চালনীর ছিদ্রের ব্যাস জানা আছে, সুতরাং একটি গ্রাফ্ টেনে বলা যায় মৃত্তিকার কত শতাংশ >0.25 মি. মি. ব্যাসের ছিদ্রযুক্ত চালনীগুলিতে ধরা পড়বে। মৃত্তিকার এই আনুপাতিক পরিমাণ কণাসমষ্টির বাঁধুনীর একটি পরিমাণ বলে গণ্য করা হয়। যে মৃত্তিকার বেলায় এই আনুপাতিক সংখ্যাটি যত বড় গঠনও তত দৃঢ় হবে। এইরূপে বিভিন্ন মৃত্তিকার মধ্যে একটি তুলনামূলক মাপকাঠি রচিত হয়েছে। তাছাড়া সেক্সন্ কেটে অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে বিভিন্ন ব্যাসযুক্ত কণাগুলির আনুপাতিক হিসাব পাওয়া যায় এবং এই তথ্যের ভিত্তিতেও গঠন সম্পর্কে একটি আপেক্ষিক মাপকাঠি স্থির করা যায়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শক্তি-সঙ্কটে সৌরশক্তি

।। রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতার (1979) সারাংশ ।।

তপেন রায়*

এতদিন আমরা জ্বালানী হিসেবে কাঠ, কয়লা, পেট্রোল এ সব পদার্থ ব্যবহার করে এসেছি এবং এই সবগুলিই পৃথিবীর সঞ্চিত ধন। মানুষ এগুলির প্রচণ্ড ব্যবহার করে পৃথিবীর পুরো সঞ্চয়টাকে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছে। এখন বন-বাদাড় নেই বললেই হয়, যেজন্য কাঠ নেই, খনি থেকে কয়লা, তেল, তুলে তুলে এমন অবস্থা হয়েছে যে পেট্রোল ইত্যাদি নেই, কয়লা নেই। এ অবস্থায় আমাদের শিল্প চলবে কী করে? বিদ্যুৎ উৎপাদন করতেও তো জ্বালানী চাই, সুতরাং বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে কী করে? সাধারণ ভাবে রান্না গরম জল তাই-ই বা হবে কী করে? সত্যি কথা বলতে কি জ্বালানী না পাওয়া গেলে বর্তমান সভ্যতাই থাকবে না। এই জ্বালানী না পাওয়ার ব্যাপারটাকেই শক্তি সঙ্কট বলা হয়েছে।

ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান এরা তো মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। কেন না তাদের পেট্রোল ইত্যাদিতে টান পড়লে প্রচণ্ড সমস্যা, সেজন্য তারা প্রচলিত জ্বালানীর বিকল্প জ্বালানীর জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করছে এবং জীবন-মরণ পণ করে প্রচণ্ড গবেষণা শুরু করে দিয়েছে। কয়লা, তেল, কাঠ এসব জ্বালানীও কিন্তু তৈরি হয়েছে অতীতের সূর্যালোক দিয়ে। আজও আমরা সারা পৃথিবীতে প্রচুর সূর্যালোক পেয়ে থাকি, এবং প্রায় অনন্তকাল ধরেই যেন পেতে থাকব। ঠিক এই কারণেই বৈজ্ঞানিক শক্তির উৎস হিসেবে প্রচলিত জ্বালানীর পরিবর্তে সূর্যালোক ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছেন। সূর্যালোককে ঠিক কাজের উপযোগী করে নেওয়াটাই আলোচনার বিষয়বস্তু। সুতরাং সৌরশক্তি এবং তজ্জ্য গবেষণা।

প্রকৃতিতে রূপান্তরিত সৌরশক্তি হিসেবে আমরা পাই জলশক্তি, বায়ুশক্তি, রাসায়নিক শক্তি ইত্যাদি। রৌদ্রে সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ হয় এবং তাই থেকে বৃষ্টি এবং শেষে নদী-নালাতে জলপ্রবাহ হয়। এই নদী যদি উঁচু জায়গা থেকে নীচে আসে তবে স্রোতের তীক্ষ্ণতা বাড়ে আর তা হলেই তাকে কাজে লাগানো সহজতর হয়। জলস্রোতকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন চালানো হয় এবং সেই টারবাইনের সঙ্গে জেনারেটর যুক্ত করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। অনেক সময়েই জলকে উঁচুতেই ধরে রাখা হয় এবং সেই জলাধারকে ড্যাম বলা হয়। সময়মত সেই জলকে নীচে নামানোর সময়ে টারবাইন চালিয়ে আবার বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। জমির ঢাল যত বেশী হবে এইভাবে বিদ্যুৎ তৈরি তত সহজতর হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের জমি প্রায় সমতল (হিমালয় !)। সেজন্য এত নদী থাকা সত্ত্বেও জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা খুব একটা সুবিধাজনক নয়। ঝড়, হওয়া এ সবই সৌরশক্তির কল্যাণে। এসবের ব্যবহার বহুদিন থেকেই মানুষ করে আসছে। এ ব্যাপারে হল্যাণ্ডের উইণ্ডমিল বিখ্যাত। এই উইণ্ড-মিলের সঙ্গে জেনারেটার যুক্ত করে আবার বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রউপকূলে বেশ শক্তিসম্পন্ন হাওয়া পাওয়া যায় বটে কিন্তু সারাদিন এবং সারাবছর সেটা এতই কমবেশী হয় যে তা দিয়ে আসল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, তবে ছোটখাট ব্যাপারের নিশ্চয়ই সমাধান করা যায়।

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-700032

রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলতে এখানে আমরা গাছপালার কথা ভাবছি অর্থাৎ সূর্যের আলোয় গাছপালা জন্মায় এবং তা থেকে আমরা জ্বালানী পেতে পারি— তাই-ই তো পেয়ে এসেছি এতদিন। কিন্তু রোজ আমাদের যে পরিমাণ শক্তির দরকার সেটা এইভাবে সমাধান সম্ভব নয়। আংশিক সমাধান নিশ্চয়ই হতে পারে।

সমুদ্রের উঁচু উঁচু বড় বড় ঢেউগুলি যেগুলি সমুদ্রউপকূলে আছ্‌ড়ে পড়ছে (broken) তাকে কাজে লাগিয়ে সমাধান হতে পারে। স্বদেশে যোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সুযোগ্য লোকজন থাকলেও ভারত সরকার এ বিষয়ে এখনও কোনও পরিকল্পনা করে উঠতে পারেন নি, যেজন্য এখনও এদিকটা গড়ে ওঠে নি। পশ্চিমবঙ্গ এদিকেও অভাগা কারণ উড়িষ্যা, মাদ্রাজ এদের মত বেক র পশ্চিমবঙ্গে নেই।

সূর্যালোক যেভাবে এসে আমাদের গায়ে পড়ছে তাকে সোজাসুজি কাজে লাগিয়ে দরকারমত শক্তি সঞ্চয় করা বেশ দুরূহ। যদিও আজকের দিনে বিদেশে প্রচুর solar cell (সৌর কোষ) তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেটাও সমাধান নয়, কারণ সেটা পড়তায় পোষায় না। সৌর কোষের উপর সূর্যের আলো পড়লেই বিদ্যুৎ তৈরি হয়। খুবই ভাল ব্যাপার। দামটা খুবই খারাপ আমেরিকানরাও ভরসা পায় না। পরাবৃত্তাকার বা অন্যান্য রকম আয়না দিয়ে সূর্যালোককে মোটামুটিভাবে ফোকাসে এনে, সেখানে জলপূর্ণ পাত্র রাখলে সেটার তাপমাত্রা বেশ বাড়ানো যায়, এমন কি ভালভাবে বাষ্পীভবনও করা যায়। আমাদের ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীতে এভাবে ভাত রান্না করে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলিশমাছ ভাতে রান্না করে লোককে যৎকিঞ্চিৎ খাওয়ানো হয়েছে। হটএয়ার এঞ্জিনও ঐ ফোকাসে রাখলে চলতে শুরু করবে। শুধু তাই নয় আমাদের ষ্টীম এঞ্জিনের বয়লারও ঐ ফোকাসে রাখলে চলবে। তবে আমাদের শক্তির চাহিদা মেটাতে কয়েক হাজার স্কোয়ার মাইলের সূর্যালোককে ঘনীভূত করতে হবে। সে আর এক সমস্যা।

জলবিদ্যুৎ উইণ্ডমিল দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা— এগুলি কার্যকরী মডেলের সাহায্যে আমি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে 'রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতা'র সময়ে দেখিয়েছিলাম। সেই সময়ে আরও দেখিয়েছিলাম যে কী ভাবে সৌরশক্তিকে ঘনীভূত করে প্রচলিত ষ্টীম এঞ্জিন এবং Hot Air Engine চালানো যাচ্ছে। solar cell খুব দামী হলেও সূর্যালোকে solar cell কীভাবে কাজ করে তাও সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়েছিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় ঠিক বর্তমানে এখনও পর্যন্ত প্রকৃতিই আমাদের উপর টেক্কা মারছে। সৌরশক্তি ব্যবহারের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক আজও প্রকৃতির কাছে নেহাৎই শিশু।

এছাড়াও অন্যান্য ভাবেও সূর্যালোককে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে, তবে সেগুলি এখনও গবেষণাগারেই আবদ্ধ। তবে আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি যে অদূর ভবিষ্যতে সৌরশক্তিকে ব্যবহার উপযোগী করে পৃথিবীর মানুষ তার শক্তির চাহিদা মেটাবে।

'রামন এফেক্ট'-এর পঞ্চাশৎ বৎসর

তুষারকান্তি পাল*

বিজ্ঞানে ভারতের একমাত্র নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের আবিষ্কারের পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্তি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-অনুরাগী মহলে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষে গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের 4 তারিখ থেকে 9 তারিখ অবধি ব্যাঙ্গালোরে 'রামন বর্ণালীবীক্ষণ তত্ত্বের (Raman Spectroscopy) ওপর ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত জানুয়ারী মাসের 8 তারিখ থেকে 20 তারিখ অবধি যাদবপুরে—'দি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ্ সায়েন্স' এই উপলক্ষ্যে একটি 'শীতকালীন শিক্ষাশিবির' (winter school) হয়ে গেল 'রামন বর্ণালীবীক্ষণ তত্ত্বের' উপর। খ্যাতনামা বেশ কয়েকজন ভারতীয় ও ভারতের বাইরের দেশের বিজ্ঞানী এতে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করেন। এছাড়া বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

1888 সালের 7ই নভেম্বর পূর্বতন মাদ্রাজ প্রদেশের ত্রিচিনাপল্লীতে রামনের জন্ম হয়। স্থানীয় বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে তিনি মাদ্রাজ শহরের প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হন, এবং 1904 সালে প্রথম বিভাগে বি. এ. পরীক্ষায় পাস করেন। 1907 সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পদার্থবিদ্যায় প্রথম বিভাগে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে গবেষণা কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করার ইচ্ছা তাঁর প্রবল ছিল। কিন্তু আমাদের দেশে তৎকালে গবেষণার, বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার তেমন কোন বিশেষ সুযোগ ছিল না। তাই ঐ বৎসর তিনি ভারত সরকারের অর্থদপ্তরে কার্যে যোগদান করেন এবং কলিকাতার অফিসে নিযুক্ত হন। অংকের হিসাব ও সংখ্যাতত্ত্বের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত থাকতে হলেও তাঁর মনের গহনে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ সদা বিরাজমান ছিল। কিভাবে বিজ্ঞান চর্চা করা যেতে পারে এই চিন্তায় যখন উদ্বিগ্ন তখন তিনি একদিন আকস্মিকভাবে অফিস ফেরতা ট্রামে 210নং বৌবাজার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে একটি সাইনবোর্ড দেখে চকিতে ট্রাম থেকে নেমে পড়লেন। ঐ সাইনবোর্ডটিতে লেখা ছিল—"The Indian Association For the Cultivation of Science". আলাপ হল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে, ঠিক হল প্রতিদিন সরকারী চাকুরির শেষে বিকাল ও সন্ধ্যায় তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানে গবেষণাকার্য চালাবেন। বহুদিনের ঈপ্সিত বস্তু এত সহজে লাভ করা যাবে এটা ঠিক রামনের নিজেরও ধারণায় ছিল না।

এইভাবেই সেইদিন থেকে তাঁর জীবনে এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। বিকাল, সন্ধ্যা, মধ্যরাত্রি কোন কোন দিন আবার সারারাত্রি, এইভাবে শুরু হল তাঁর নিরলস বিজ্ঞান সাধনা। বৈজ্ঞানিক পত্রিকায়, তাঁর একের পর এক পদার্থ-বিজ্ঞানের ওপর

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

বিভিন্ন গবেষণাপ্রবন্ধ প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল এবং অল্প সময়েই তিনি পদার্থবিদ্যার খ্যাতনামা গবেষক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। স্বভাবতঃই এই বিজ্ঞানকৃতীর দিকে নজর পড়ল স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের। স্যার আশুতোষ তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জ্ঞানী-গুণীদের আহ্বান করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী সমৃদ্ধ করার কাজে তখন তিনি বিশেষ ব্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সবে স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়েছে। স্যার আশুতোষ রামনকে আহ্বান করলেন ঐ বিভাগের অধ্যাপকরূপে। স্যার আশুতোষের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেন না রামন। 1917 সালে, রামন বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় 'পালিত অধ্যাপকের' পদ গ্রহণ করেন। সরকারী চাকুরীতে তখন তিনি ইস্তফা দিয়েছেন, স্বভাবতঃই পূর্ণ উৎসাহে দিবারাত্রি ছাত্র ও গবেষণাই হয়ে উঠল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। কিন্তু 'বিজ্ঞান কলেজ' সবেমাত্র শুরু হয়েছে, সেখানে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের যথাযথ বীক্ষণাগারের সুযোগ ছিল একান্তই অপর্যাপ্ত। রামনকে তখন বিশেষ অনুমতি দেওয়া হল যাতে তিনি পূর্ববৎ 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স'-এ গবেষণাকার্য করতে পারেন।

1919 সালে, অ্যাসোসিয়েশনের অবৈতনিক সম্পাদক ডাঃ অমৃতলাল মজুমদারের দেহান্তের পর ঐ শূন্যপদে রামন নির্বাচিত হন এবং 1933 সাল অবধি, অর্থাৎ কলিকাতায় তাঁর অবস্থানকালে শেষ পর্যন্তই ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বস্তুত পক্ষে, এই দুই সংস্থার বীক্ষণাগার, গ্রন্থাগার ও সর্বোপরি পরিচালনায় তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকায় তাঁর যে কোন ছাত্র যে কোন সময়ে যে কোন প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কার্য করতে পারত। এই দুর্লভ সুযোগের জন্য, এবং তাঁর নেতৃত্বে তৎকালে কলিকাতায় পদার্থবিদ্যায় গবেষণার যে জোয়ার সেদিন এসেছিল, তার আকর্ষণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একদল কৃতী গবেষক ছাত্র সমবেত হয়েছিলেন, গড়ে উঠেছিল গবেষনার একটি ঘরানা বা 'স্কুল'। এঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখ্য কয়েকজন হলেন—কে. এস. কৃষ্ণান, এল. এ. রামদাস, এ. এস. গণেশন, কে. আর. রামনাথন, এস. ভেঙ্কটেশ্বরণ, এস. সি. সরকার প্রমুখ।

1921 সালে অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগে ইউরোপ যান। জাহাজে থাকা-কালীন মধ্যাহ্নে অনন্ত সমুদ্রের নীল রং এবং সকালে বিকালে জলের রং-এর পরিবর্তন তাঁর মনে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি গম্ভীরভাবে এর কারণ সন্ধানে চিন্তা শুরু করেন এবং ঘটনাটিকে 'আণবিক বিক্ষেপ' (molecular scattering) বলেই অনুমান করেন। তাঁর গবেষক জীবন এর পর থেকে এক নূতন পথে চালিত হয়।

স্বদেশে ফিরে এসে উপরিউক্ত ঘটনার কারণ বিশ্লেষণে নতুন নতুন গবেষণা শুরু করেন। 1923 সালে তাঁর গবেষক ছাত্র কে. আর. রামনাথন এবং 1924 সালে তাঁর অপর ছাত্র কে. এস. কৃষ্ণান কিছু জৈব তরলে দুর্বল ফ্লোরেসেন্স (fluorescence)-এর প্রকৃতি অনুধাবন করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। 'ফ্লোরেসেনস' বলতে আমরা বুঝি কোন নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের আলোক রশ্মি কোনও পদার্থের উপর আপতিত হলে, পদার্থ থেকে ভিন্ন কম্পাঙ্কের আলোকরশ্মি নির্গত হবে। কিন্তু রামনাথন ও কৃষ্ণানের পরীক্ষায়, প্রত্যাশিত এই ফল প্রতীয়মান হল না। তাঁরা নির্গত বিক্ষেপিত (scattered) রশ্মির বর্ণালী গ্রহণ করে আপতিত রশ্মির কম্পাঙ্ক ছাড়াও আরো অসংখ্য বৃহৎ কম্পাঙ্কের রশ্মির সন্ধান পেলেন। রামন নিজেও বরফ এবং স্বচ্ছ কাঁচের উপর পরীক্ষা করে অনুরূপ একটি নূতন ধরনের বিকিরণের সন্ধান পেলেন।

এই ঘটনার অল্প কিছুদিনের মধ্যে, 1925 সালে, এ. এইচ. কম্পটন—আপতিত ফোটনের সঙ্গে ইলেকট্রনের সংঘাতের যে কার্য-কারণ তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিজ্ঞানে কম্পটনের এই তত্ত্ব "কম্পটন এফেক্ট" নামে পরিচিত।

কম্পটনের এই আবিষ্কার এবং পূর্বোক্ত 'নূতন ধরনের বিকিরণ' এই দুইয়ের মধ্যে কোন সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায় কিনা এ বিষয়টি রামনের চিন্তাকে প্রভাবিত করল। রামনের অপর এক ছাত্র, ভেঙ্কটেশ্বরণ, ঐ সময় একটি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অতীব শোধিত তরল গ্লিসারিনের মধ্য দিয়ে সূর্যরশ্মি আপতিত করে দেখা গেল প্রত্যাশিত বিক্ষেপিত রশ্মি সাধারণ নীল না হয়ে সুন্দর সবুজ রং-এর হচ্ছে। রামন, এইবার রামনাথ এবং কৃষ্ণান-এর জৈব তরলের উপর ফ্লোরেসেন্স-এর সাথে ভেঙ্কটেশ্বরণের গবেষণার সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন। 1927 সালে, রামন প্রায় 80টি বিভিন্ন প্রকৃতির তরলের উপর এই পরীক্ষা করলেন এবং ঐ একই ফল পেলেন, অর্থাৎ দেখলেন, সব পরীক্ষাকালেই বিক্ষেপিত রশ্মি উচ্চতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দিকে সরে যাচ্ছে। এই পরীক্ষাগুলিতে একটি গোলাকার তলবিশিষ্ট ফ্লাস্কে পরীক্ষাধীন তরলটি রেখে 'মার্কারি আলোকে'র 4358 আঙ্গস্ট্রম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোকরশ্মিকে তরলের উপর আপতিত করা হয় এবং বিক্ষেপিত রশ্মির বর্ণালী অতীব সাধারণ একটি বর্ণালী-বীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়। দেখা গেল, বিশ্লেষিত বিক্ষেপিত রশ্মিতে আদি আপতিত রশ্মির রেখা (line) ছাড়াও, তার দু পাশেই অসংখ্য নূতন রেখা পাওয়া যাচ্ছে। এই রেখাসমূহকে 'রামন রেখা' (Raman line) বলা হয়। রামন রেখার মধ্যে যেগুলি আদি আপতিত রেখার তুলনায় কম তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা বেশী কম্পাঙ্কবিশিষ্ট সেগুলিকে 'অ্যান্টিস্টোকরেখা' বলা হয় এবং যেগুলি আদি আপতিত রশ্মির তুলনায় বেশী তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা কম কম্পাঙ্কবিশিষ্ট সেগুলিকে 'স্টোক রেখা' বলা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য রামনের ব্যবহৃত এই বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রটি এখনো যাদবপুরস্থিত "দি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়ান্সে'-র" আলোকবিদ্যা বিভাগে সংরক্ষিত আছে।

1928 সালের 16ই মার্চ "দক্ষিণ ভারতীয় বিজ্ঞান মণ্ডলীর" সভায় ব্যাঙ্গালোরে অধ্যাপক রামন, তাঁর এই আবিষ্কারের কথা প্রথম ঘোষণা করেন। কিছুদিনের মধ্যেই বিখ্যাত আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকা 'Nature'-এ এই আবিষ্কার প্রকাশিত হয়। এই আবিষ্কার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জার্মান বৈজ্ঞানিক 'স্মেকলে' দাবী করেন যে 1923 সালে গাণিতিক পদ্ধতিতে তিনি এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু রামন পরীক্ষার সাহায্যে এই ঘটনা প্রমাণ করেছেন বলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি তিনিই পান। বিজ্ঞানে রামনের এই আবিষ্কারকে "রামন এফেক্ট" (Raman Effect) নামে অভিহিত করা হয় এবং এই মৌলিক আবিষ্কারের সম্মানস্বরূপ 1930 সালে তিনি বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সম্মান, পদার্থবিদ্যায় "নোবেল পুরস্কার" পেলেন।

সি. ভি রামনের এই আবিষ্কারের পর, পরীক্ষা-মূলক গবেষণার ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্তের উন্মোচন হয়। রামন বর্ণালীবীক্ষতত্ত্ব (Raman Spectroscopy) ব্যাপকভাবে গবেষণার বিষয়বস্তু হয় এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কঠিন ও গ্যাসের উপর পরীক্ষা করে এবং সত্যতা যাচাই করা হয়। 'রামন-এফেক্ট'-এর তত্ত্বগত বিষয়ের আলোচনায় দেখা যায় এটি একটি আণবিক ঘটনা' (molecular phenomena)। একটি অণুতে যেহেতু, কম্পন (vibrational), ঘূর্ণন (rotational), কম্পন-ঘূর্ণন (vibrational rotational), ইলেকট্রনিক (electronic) – এই চার প্রকার শক্তি (energy) বিদ্যমান, সেইহেতু রামন বর্ণালীতে এই চার প্রকারের বর্ণালী পাওয়া উচিত। মুক্ত অণুর ক্ষেত্রে কম্পন শক্তি—ঘূর্ণনশক্তি ও ইলেকট্রনিক শক্তি অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে বেশী, তাই 'রামন-এফেক্ট'-এর

বর্ণালীতে যে রেখাগুলি পাওয়া যায় তারা মূলত অণুর কম্পনশক্তি থেকে উদ্ভূত। ঘূর্ননশক্তি থেকে উদ্ভূত রেখাসমূহ আদি আপতিত রশ্মির মাতৃরেখার (mother line) খুবই কাছে সংশ্লিষ্ট এবং উচ্চ ক্ষমতা-যুক্ত বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এগুলি দেখা সম্ভব নয়। বর্ণালীতে তাই আদি মাতৃরেখাটিকে মোটা ও যথেষ্ট উজ্জ্বল দেখায়। হাইড্রোজেন, ডয়টেরিয়াম, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি হাল্কা গ্যাসের ক্ষেত্রে বর্ণালীর রেখাগুলি বিচ্ছিন্ন হয়। ভারী গ্যাসের ক্ষেত্রে বর্ণালীর মধ্য অংশে শুধুমাত্র একটি মোটা ও চওড়া পটি দেখতে পাওয়া যায় এবং উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বর্ণালীবীক্ষণযন্ত্রে ঐ বর্ণালীকে বিভিন্ন উপাংশে বিভক্ত করা যায়। আগেই বলা হয়েছে যে, বর্ণালীতে যে 'রামনরেখা' সমূহ পাওয়া যায় তারা মূলতঃ পদার্থের অণু পরমাণুর কম্পনজনিত শক্তি থেকে উদ্ভূত। আবার এই অণু-পরমাণুর কম্পনভঙ্গির বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য থেকেই বিভিন্ন ধরণের শক্তির সৃষ্টি হয়। পদার্থের মধ্যস্থিত অণু-পরমাণুগুলি কতগুলি নির্দিষ্ট শক্তির স্তরে অবস্থান করে। কম্পনের ফলে এদের স্থানচ্যুতি ঘটে অর্থাৎ উচ্চশক্তি স্তর থেকে নিম্নশক্তিস্তরে বা নিম্নশক্তিস্তর থেকে উচ্চশক্তিস্তরে নির্গমন হয়। এর ফলে শক্তির নির্গমন বা শোষণ হয়; এগুলিই বর্ণালীতে রেখা হিসাবে প্রতীয়মান হয়। কেবলমাত্র বিজ্ঞানী রসেটী দ্বারা আবিষ্কৃত একটি পদার্থ ছাড়া ইলেকট্রনিক শক্তির ক্ষেত্রে 'রামন এফেক্ট'-এর কোন উদাহরণ এখন পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয় নি।

সনাতনী প্রথায় ব্যাখ্যা করতে গেলে 'রামন এফেক্ট'-এর যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু 'কোয়াণ্টাম তত্ত্বে'র সাহায্যে 'রামন এফেক্ট'-এর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের আপতিত রশ্মি যখন পরীক্ষাধীন পদার্থের উপর পতিত হয় তখন দুটি ঘটনার সম্ভাব্যতা দেখা যায়; প্রথমতঃ, আপতিত রশ্মিতে যে ফোটনকণা আছে তারা অপরিবর্তিত অবস্থায় পরীক্ষাধীন পদার্থের আন্তরাণবিক স্থান দিয়ে কোনরূপ সংঘাতের সুযোগ না পেয়ে বিক্ষেপিত রশ্মি হিসাবে নির্গত হয়। এক্ষেত্রে আপতিত রশ্মির কম্পাঙ্ক কোনরূপ পরিবর্তিত না হয়ে বিচ্ছুরিত রশ্মির কম্পাঙ্ক হিসাবে প্রতীয়মান হয় এবং বর্ণালীতে এগুলিই মোটা ও চওড়া পটি হিসাবে দৃশ্যমান হয়। পূর্বে একেই আদি মাতৃরেখা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, আপতিত ফোটন কণার সঙ্গে পরীক্ষাধীন পদার্থের অণুর সংঘাতে শক্তির সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী ফোটন কণিকা কখনও বা শক্তি শোষণ করে আবার কখনও বা শক্তি বিকিরণ করে। বর্ণালীতে এগুলিই আদি মাতৃরেখার দু'পাশে অবস্থিত অসংখ্য রেখারূপে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে ফোটন কণা পদার্থের অণু থেকে শক্তি শোষণ করে, সেক্ষেত্রে বিচ্ছুরিত রশ্মি উচ্চ কম্পাঙ্ক হিসাবে নির্গত হয়; এর ফলে বর্ণালীতে 'অ্যান্টিস্টোক' রেখা সমূহ পাওয়া যায় এবং যেক্ষেত্রে ফোটন কণা পদার্থের অণুকে শক্তি প্রদান করে, সেক্ষেত্রে বর্ণালীতে 'স্টোক' রেখাসমূহ পাওয়া যায়। 'রামন এফেক্ট' বিজ্ঞানে একটি শক্তিশালী পদ্ধতি, যার সাহায্যে শুধুমাত্র পদার্থবিদ্‌গণই নন — রসায়নবিদ্, জীবরসায়নবিদ্, জীববিজ্ঞানী এবং চিকিৎসাবিদ্‌গণও তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে গবেষণায় প্রভূত উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়েছেন। বস্তুত পক্ষে আজ পর্যন্ত রামন বর্ণালী বীক্ষণতত্ত্বের উপর প্রায় 20,000 গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

স্যার সি. ভি. রামনের আবিষ্কারের প্রথম কয়েক বছর ভারতবর্ষ থেকেই এই বিষয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সর্বাধিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। পরে অবশ্য ভারত এই মান নির্দিষ্ট রাখতে পারে নি। বর্তমানে ভারত 'রামন বর্ণালী বীক্ষণ তত্ত্বে' গবেষণায়, অষ্টম স্থানে। এই স্থান নির্ণয় অবশ্য গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশের সংখ্যা দ্বারা নির্ণীত হয়েছে।

1962 সালে, 'লেসার' আবিষ্কৃত হওয়ার পর লেসার রশ্মিকে আপতিত রশ্মি হিসাবে ব্যবহার করার পর "রামন বর্ণালী বীক্ষণ তত্ত্বের" গবেষণায় এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। পলিমার চরিত্রচিত্রণ,

রোগ প্রতিষেধিকরণের পরীক্ষা, ডাই-সালফাইড বণ্ড এর জ্যামিতি নির্ণয়, কঠিন পদার্থে রামন-বিক্ষেপ নির্ণয় ইত্যাদি বহু নতুন বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা সুরু হয়েছে।

1917 সালের আগে স্যার রামন মূলত "শব্দ-তরঙ্গ", "যন্ত্রসংগীতের তত্ত্ব", "আলোকতরঙ্গ" এবং "সংঘাত"-এর উপর গবেষণা করেন এবং অনধিক 54টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। 1917 সাল থেকে 1933 সাল অবধি, তিনি আলোকের ব্যতিচার (interference), অপবর্তন (diffraction), সমবর্তন (polarisation), সান্দ্রতা (viscosity) আণবিক বিক্ষেপ (molecular scattering), রঞ্জেনরশ্মি ও ইলেকট্রনের অপবর্তন (x-ray & electron diffraction), আলো-তড়িৎক্রিয়া ও আলো-চুম্বক ক্রিয়া (electro-optical effect & magneto-optical effect), 'রামন এফেক্ট' ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করেন।

রামনের আবিষ্কারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির সাথে সাথে তাঁকে সম্মানিত করার জন্য আরও বহু উপাধি ও পদ প্রদান করা হয়। 1928 সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। 1929 সালে, ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সম্মান-সূচক 'নাইট' উপাধি অর্পণ করেন, ঐ বছরই তিনি রোমের "মাটেউচি পদক" পান। 1930 সালে, লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে "হুজেস পদক" দেন। 1933 সালে, তিনি দীর্ঘস্মৃতিবিজড়িত কলিকাতা ত্যাগ করে ব্যাঙ্গালোরে 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিউট অব সায়েন্সের'-এর অধিকর্তার পদ গ্রহণ করেন, এবং একাধিক্রমে দশ বৎসর ঐ পদে আসীন থাকার পর 1943 সালে ব্যাঙ্গালোরে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত "রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে"র প্রতিষ্ঠাতা-অধিকর্তা পদে আসীন হন। 1948 সালে, ভারত সরকার তাঁকে "জাতীয় অধ্যাপক" পদে বরণ করেন। 1951 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "ফিলাডেলফিয়া ইনস্টিটিউট" তাঁকে 'ফ্র্যাঙ্কলিন পদক' প্রদানে সম্মানিত করেন। 1954 সালে, জাতীয় দুর্লভ সম্মান 'ভারতরত্ন' সম্মানে তিনি ভূষিত হন। 1957 সালে তিনি অপর এক দুর্লভ আন্তর্জাতিক সম্মান —"আন্তর্জাতিক লেনিন পুরস্কার" পান। প্রায় 63 বৎসর অনলস বিজ্ঞান চর্চা করে বিশ্বের বিজ্ঞানমানচিত্রে ভারতবর্ষের স্থান সুচিহ্নিত করে এবং পদার্থবিদ্যার এক সম্পূর্ণ নূতন শাখার উদ্বোধন করে, এই প্রথিতযশা বিজ্ঞানী 1970 সালে প্রায় 82 বৎসর বয়সে ব্যাঙ্গালোরে পরলোকগমন করেন।

স্মৃতির দেশে

নারায়ণ দাস*

আবর্ত সংকুল জীবনের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ক্লান্ত মুহূর্তে আসে অবসরের পালা। বড় বিষণ্ণ দিনগুলিতে হারিয়ে যাওয়া অতীত সময়গুলি মনের কোণে ভীড় জমায় আপন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে। বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছুই হারিয়ে গেলেও টাট্‌কা সজীব চেহারায় হাজির হয় তারা অ্যালবামের হলদে হয়ে যাওয়া ফটোগুলির হাজার গুণ বেশী আবেদন নিয়ে। অতীতের বাস্তব প্রতিফলনের এই রূপই হল স্মৃতি। মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত ভাণ্ডার স্মৃতি অভিজ্ঞতারই পুনর্নবীকরণ। বিবর্ণ বার্ধক্যে তাজা যৌবনের দিন, বাসরের শিহরণ, মায়ের স্নেহ, চুম্বন, বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এক আনন্দঘন মুহূর্ত, কিংবা অতি বীভৎস ট্রেন কলিসনের মুহূর্তে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সব কিছুই আমাদেরকে নিয়ে চলে ভিন রাজ্যে। তার অনুভূতি কোথাও বেদনাঘন, কোথাও বা আনন্দ মুখরিত প্রাণ-চাঞ্চল্যের বান ডাকানো মহিমায় প্রোজ্জ্বল। ফেলে-আসা দুর্গা-অপুর কাশবন, অচেনা আনন্দের শিহরণ, স্নেহাবেশের আস্বাদ, সব কিছুই মানুষের জীবনস্মৃতি। ভারী মজার ব্যাপার, মনকে ভর করলেই দূর-দুরান্তরের চড়াই-উৎরাই ডিঙিয়ে চোখের পলকে হাজির হওয়া যায় স্মৃতির দেশে। অচেতন থেকে ভেসে আসা আবেশ প্রাক্‌চেতনের বেড়া ডিঙিয়ে চেতনের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ ভঙ্গিমাও ধরা দেয় স্মৃতিরূপেই।

কিন্তু কি এই স্মৃতি, কিভাবে ঘটে তার বহিঃপ্রকাশ, কোথায় তার অবস্থান, কেই-বা তার নিয়ন্ত্রক—এইরকম হাজারো প্রশ্ন সুদূর অতীত থেকেই সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। অথচ আজ পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর হয় নি। মনোবিজ্ঞানীদেরও জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। তাঁরা স্মৃতিকে কেউ বলেন—এটি একটি মানসিক শক্তি, কেউ বলেন মনের কাজই স্মৃতি, আবার কারোর মতে স্মৃতি এমন একটি ভাণ্ডার যেখানে অভিজ্ঞতার ছাপ বা প্রতীকগুলিকে আমরা সাজিয়ে রাখি। ভারতীয় দার্শনিক পতঞ্জলির ধারণা স্মৃতি মনের পঞ্চ প্রকৃতির একটি (অন্যগুলি হল প্রকৃত জ্ঞান, ভ্রান্ত-ধারণা, কল্পনা এবং বিশ্রাম)। গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেন (Galen-130-200AD) মনে করতেন মন থাকে মাথায়, আবার অ্যারিষ্টটলের মতে মনের অবস্থান হৃৎপিণ্ডে। সুতরাং সব কিছুরই উৎস ঐসব অঙ্গ। আগস্টাইনের অভিমত স্মৃতি এবং সময় অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একটি বস্তু, তাই—"The past is memory, the future expectation, the present attention.... since the present only exists, it follows that the present contains within it the past as present memory and the future as present expectation."

দেখা যাক্ বর্তমান মনস্তত্ত্ববিদরা কিভাবে স্মৃতিকে ব্যাখ্যা করেছেন শক্তিবাদীরা (Faculty psychologists) স্মৃতিকে এমন এক প্রকার শক্তিরূপে কল্পনা করেছেন যা ক্রমাগত চর্চার ফলে শক্তিশালী এবং অবহেলায় দুবল হয়ে ওঠে। আর একদল বিজ্ঞানী স্মৃতিকে একটি বিশেষ উপাদানরূপে বিশ্লেষণ (factor analysis) করলেন (thurstone) যা অনেকটা অভিব্যক্তিবাদে ল্যামার্ক এবং পরে মেণ্ডেলের সঙ্গে তুলনীয়। বিজ্ঞানসম্মত মনস্তত্ত্ব গবেষণা শুরু

*বসিরহাট কলেজ, পোঃ বসিরহাট, 24 পরগণা

হলো স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন (F. Galton, 1820-1911) এবং জার্মান মনোবিদ্ ও চিকিৎসক হার্ম্যান এবিংহাউসের (H. Ebbinghous, 1850-1909) পরীক্ষামূলক গবেষণার ফলে। এবার তাঁরা বললেন —স্মৃতি তিন ধরনের মানসিক ক্রিয়ার সমষ্টি—যেগুলি হলো শিক্ষণ (learning), সংরক্ষণ (retention) এবং স্মরণ (remembering)। না শেখা কোন বস্তুকে আমরা স্মরণ করতে পারি না। সুতরাং স্মৃতির প্রথম পর্যায় হলো কোন কিছুকে জানা বা শেখা। দ্বিতীয় স্তরে এই নতুন অর্জিত বস্তুকে মস্তিষ্কের কোন অংশে রক্ষা করা অর্থাৎ সংরক্ষণ। এই সংরক্ষণের কথা ভাবতে গিয়ে কেউ কেউ বিশেষ স্মৃতি প্রকোষ্ঠের কথা বলেছেন (Gall's phrenology) যেখানে প্রতিটি প্রকোষ্ঠে একটি জাতের স্মৃতি জমা থাকে। বিজ্ঞানী মূলার স্মৃতির ভাষাকে ফটোগ্রাফিক প্লেটের সঙ্গে তুলনা করেছেন তাঁর 'Memory Trace' তত্ত্বে। কয়েক ধাপ এগিয়ে বিজ্ঞানী Hoagland সংরক্ষণক্রিয়াকে তারবার্তায় সংবাদ গ্রহণের উপমায় ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে তারের বার্তাবহনে যেমন পারমাণবিক পরিবর্তনরূপে কোন সংবাদকে ধরে রাখা হয় আবার প্রয়োজনে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় সেইরূপে মস্তিষ্কেরও কোন পরিবর্তনে আবেগ সংরক্ষিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে স্মরণক্রিয়াকে আবার দুটি অংশে ভাগ করা হয়ে থাকে—কোন কিছুকে মনে করা (recall) এবং তাকে স্বীকৃতি দেওয়া (recognition)। মনে করার মাধ্যমে পূর্বের অর্জিত কোন বস্তুকে বা তার প্রতিক্রিয়াকে জাগিয়ে তোলা হয় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অর্থাৎ একটি বস্তু থেকে আমাদের স্মরণক্রিয়া সরাসরি ইপ্সিত বস্তুতে যায় অথবা ইপ্সিত বস্তুতে যে, অন্তর্বর্তীভাবে কতকগুলি জিনিস ভেবে নিয়ে তবে মনে আসে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা কাউকে চিনতে গিয়েও চিনতে পারছি না বা কোন নাম ইত্যাদি। এই মনে আসছে মনে হচ্ছে না বা অনেকগুলি আনুষঙ্গিক বিষয়বস্তুর মাধ্যমে শেষে আসল কথাটি মনে আসে। এ ধরণের ক্রিয়া অসম্পূর্ণ স্মরণের লক্ষণ। আমাদের প্রত্যহিক জীবনে কতকগুলি ক্রিয়া কিন্তু আদৌ স্মরণ করতে হয় না এক্ষেত্রে শিক্ষণ, সংরক্ষণ এবং স্মরণ মিলে একাকার হয়ে গেছে। যেমন ধরুন দাঁত ব্রাশ করা, জুতোর ফিতে বাঁধা, অক্ষর লেখা, অনেক ক্ষেত্রে সেলাই করা ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, স্মরণ (remembering) এবং পুনঃবহিঃপ্রকাশের চেষ্টা (recall) কিন্তু এক জিনিস নয়। ধরুন, কোন বই বা টেপরেকর্ড বা কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছুকে ধরে রাখলাম। একেই স্মরণ তথা একধরণের সংরক্ষণের সঙ্গে তুলনা করা যায়। আবার প্রয়োজনে নির্দিষ্ট অংশের জন্য বইয়ের পাতা উল্টানো বা টেপ বাজানো অনেকটা পুনঃপ্রকাশের সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য এই কাজ কিন্তু হুবহু টেপের মত পূর্ব ঘটনার দ্বিত্বকরণ (duplication) নয় বরং অতি নির্দিষ্ট সুনির্বাচিত ক্রিয়া মাত্র। যেমন কোন কিছুকে মনে করতে গিয়ে ভাবতে হয় বস্তুটির নাম, ছন্দোবদ্ধতা, পরিমাপ, এবং প্রথম অক্ষরটি কিংবা কোন বিশেষ ধর্ম ইত্যাদি। তবু একই ঘটনাকে দুই বা ততোধিকবার বর্ণনা করলে হুবহু একরকম হয় না। সুতরাং স্মৃতি বস্তুটি কোন একক ক্রিয়া নয়। এটি অনেকগুলি মানসিক ক্রিয়ার যৌথ বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

বিভিন্ন ক্রিয়ার প্রসারতার উপরেই স্মৃতির প্রকৃতি ও তার বহিঃপ্রকাশ নির্ভর করে। যেমন ধরুন, আপনার পিয়ারলেসের সার্টিফিকেট নং মনে রাখা একটি যান্ত্রিক স্মৃতি আবার দীর্ঘক্ষণ এই প্রবন্ধটি পড়ে হৃদয়ঙ্গম করলেন। ফলে স্মৃতি হয়ে থাকল—এ হলো বিচারমূলক স্মৃতি। কিন্তু আপনি যখন বিয়ে করতে যাওয়া গাড়ীটির নাম্বারের সঙ্গে বিয়ের রাতের ঘটনাটি মনে রাখলেন অর্থাৎ ঐ ধরনের কোন নাম্বার বা গাড়ী দেখলেই সেই রাতটির কথা মনে পড়ল—একে মনোবিজ্ঞানীরা বললেন অনুষঙ্গ স্মৃতি (associative memory। অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনে আমরা পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অহরহ যে সব

স্পর্শ, গন্ধ বর্ণ, স্বর ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হয়ে মনের মণিকোঠার সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলছি তা হলো সংবেদ স্মৃতি। সুতরাং প্রতিটি স্মৃতি যে ভাবে মনে দাগ কাটবে তার বহিঃপ্রকাশ হবে তত নিখুঁত তাতে কিন্তু সুখবর বা দুঃখকর অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না। যেমন ধরুন এমন অনেক দুঃস্বপ্নভরা স্মৃতি আছে যাকে আমরা কখনই মনে ঠাঁই দিতে চাই না। তবু কিন্তু তা জগদ্দল পাথরের মতই মনে চেপে বসে। আবার অনেক কিছুকে মনে রাখতে চাইলেও আমরা তা পারি না। এই বিপরীতধর্মী স্মৃতিকথা যে কোথায় এবং কিভাবে রহস্যাবৃত তা আমরা আজও জানি না। পরীক্ষামূলকভাবে এও দেখা গেছে কেউ কখনই কোন স্মৃতিকেই বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে দিতে পারে না। সম্মোহিত করলে অতি তুচ্ছ নগণ্য ঘটনারও হুবহু স্মৃতি প্রতিফলন ঘটে। যেমন—কোন রাজমিস্ত্রী বাড়ী তৈরির কোন সময়ে ঠিক কোন ধরনের ইট ব্যবহার করেছিলেন ইত্যাদি। সামগ্রিকভাবে এই স্থায়িত্ব কতকগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। যেমন—চর্চার অভাব, একটি শিখতে গিয়ে আরেকটি চাপা পড়ে যাওয়া, অভিনিবেশ মাত্রা, মনে করার পরিবেশ পাল্টে গেছে কিনা, কোন প্রক্ষোভজনিত ক্রিয়া জড়িত থাকলে, কিংবা মাথায় আঘাত লাগলে, নেশাকারক বস্তুর প্রভাব থাকলে, মানসিক ইচ্ছাকে অবদমন করলে, স্মৃতি বিভ্রান্তিকর হতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় ছেলেরা বাড়ীতে পড়া বেশ মুখস্থ বলতে পারলেও পরীক্ষা হলে আর খেয়াল থাকে না। মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই প্রায় মনে থাকে না ফলে পড়াশুনায় তারা প্রায়ই পিছিয়ে থাকে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে লজ্জা ইত্যাদি। এগুলি সাধারণ উদাহরণ। সব কিছু মিলিয়ে শুধু মনকে বিশ্লেষণ করলে স্মৃতি নামক ক্রিয়াটির কোন মূল কিনারার হদিশ মেলে না।

তাইতো আধুনিক বিজ্ঞানীরা মনরাজ্য ছেড়ে নেমে এসেছেন জৈবিক বস্তুস্তরে। এই বিচারে স্মৃতির রাজপুরী মস্তিষ্ক। জৈবিক বিবর্তনে কোটি কোটি বৎসরের সাধনার ফলশ্রুতি ক্ষুদ্র এই মস্তিষ্ক ক্ষমতায় কিন্তু সিন্ধুর চেয়েও শক্তিশালী। শুধু এক মানব মস্তিষ্কে চার কোটি বইতে যা তথ্য আছে তার দশগুণ বেশী তথ্য জমা থাকতে পারে। মস্তিষ্কের আদিমতম রূপ বোধ করি অ্যামিবার মধ্যে থাকলেও আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। প্রথম সুস্পষ্টরূপ দেখা যায় চ্যাপ্টাকৃতি প্রাণী প্লানেরিয়াম। মানব মস্তিষ্ক-প্রাসাদের বাসিন্দা অর্থাৎ স্নায়ুকোষের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার কোটি। আর মোট ওজন তিন পাউণ্ডের মত। একটি শিশুর জন্মের পর থেকেই স্নায়ুকোষের বিলুপ্তি প্রায় শুরু হলেও নতুন করে আর কোষ সৃষ্টি হয় না; শুধু আয়তনে বাড়ে মাত্র, যার ফলে পূর্ণাঙ্গ মস্তিষ্কের আয়তন দাঁড়ায় প্রায় 1400 থেকে 1600 ঘন সে. মি.। তাবৎ ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলের আশ্চর্যতম এই প্রাসাদের হাজারো গবাক্ষে দেহ রাজ্যের ও বাইরের জগতের প্রায় প্রতিদিন প্রতি সেকেণ্ডে দশ কোটি সংবাদ তথা সংবেদ বয়ে আসছে। এই সংবাদের যদি অতি ভগ্নাংশ এক সেকেণ্ডের সহস্রাংশের জন্যও আমাদের মস্তিষ্কের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতো তবে আমরা পাগল হয়ে যেতাম। সব কিছুই তাই কঠোর প্রহরায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ব্রেনস্টেম নামক অংশের মাধ্যমে। রাজঅন্তঃপুরে অর্থাৎ মস্তিষ্কের কর্টেক্স অঞ্চলে মাত্র দশ লক্ষের মধ্যে একটি সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছাতে পারে।

এমনিতর মস্তিষ্ক-রাজ্যের স্নায়ুকোষগুলি কোষ দেহ, ডেনড্রন এবং অ্যাক্সন অংশে বিভক্ত। ডেনড্রন সংবেদ গ্রহণ করে আর অ্যাক্সন তা পরবর্তী অংশে পৌঁছে দেয়। তবে সংলগ্ন স্নায়ু কোষ দুটির সংযোগস্থলে ঈষৎ ফাঁক থাকে এবং প্রত্যেকেই সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখায় বিন্যস্ত হয়। এই সন্ধিস্থলকে বলা হয় সাইন্যাপস এবং যে তরল ঐ স্থানকে ভরে থাকে তা হলো নিউরোহিউমর বা অ্যাসিটিল কোলিন নামক পদার্থ। স্নায়ুকোষের সংবেদ পরিবহণ ক্রিয়া অনুযায়ী অন্তর্বাহী, বহির্বাহী,

মিশ্র এবং সংযোজককারী প্রকৃতির হয়। মস্তিষ্ক সামগ্রিকভাবে অগ্র, মধ্য ও পশ্চাৎ এই তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। অগ্র মস্তিষ্কের বৃহত্তম অংশটির নাম গুরুমস্তিষ্ক, যা পাঁচটি অংশে যথা সম্মুখ, প্যারাইট্যাল, পার্শ্ব, অক্সিপিটাল এবং লিম্বিক-খণ্ড দ্বারা গঠিত। গুরুমস্তিষ্কের দুই অর্ধাংশকে বলা হয় সেরিব্রাল হেমিস্ফেয়ার এবং এর যোজক অংশকে করপাস ক্যালোসাম, গুরুমস্তিষ্কের ধূসর বস্তু গঠিত প্রায় 1·3—4·5 মি. মি. পুরু স্তরটি সেরিব্রাল কর্টেক্স। এই কর্টেক্সই সমস্ত প্রধান স্নায়বিক ক্রিয়া যথা—চিন্তন, শ্রবণ, বাচন, স্মৃতি, বুদ্ধি ইত্যাদির কেন্দ্রবিন্দু। প্রশ্ন হচ্ছে—কোন্ বিশেষ অংশটি এই স্মৃতির জন্য দায়ী ?

দীর্ঘ দিনের বিতর্কিত এই প্রশ্নের অনুসন্ধানে বিখ্যাত দেহতত্ত্ববিদ ফ্রাঙ্কগল (Frank Gall, 1825) মনে করতেন প্রত্যেকটি মানসিক শক্তির জন্য এক একটি বিশেষ প্রকোষ্ঠ আছে। এই ভিত্তিতে তিনি একটি ম্যাপ তৈরি করেছিলেন, কিন্তু জোসেফ লোয়েব (Joseph Loeb, 1900) এই তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন, সেরিব্রাল কর্টেক্স-এর প্রত্যেকটি অংশই এর জন্য দায়ী, কোন বিশেষ অংশ নয়। S. I. Fraz (1907) কয়েকটি পরীক্ষায় দেখান বিড়াল এবং বানরের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের অগ্রখণ্ডটিকে বাদ দিলে সদ্যশেখা কৌশলগুলি ভুলে গেলেও দীর্ঘ স্মৃতির বিষয়গুলি কিন্তু ঠিকই থাকে। হার্ভার্ড মনস্তত্ত্ববিদ K. S. Lashley কর্টেক্সের বিভিন্ন অংশ বাদ দিয়ে প্রমাণ করেন স্মরণ এবং শিখনের জন্য মস্তিষ্কের কর্টেক্স অংশই দায়ী এবং ঐ ক্রিয়াগুলি কর্টেক্সের পরিমাণের সঙ্গে আনুপাতিক অর্থাৎ অল্প অংশ বাদ দিলে কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া না ঘটলেও অধিক অংশের বিযুক্তিতে স্মৃতি বা শিখন ব্যবহৃত হয় বেশী। একে তাই 'ভরভিত্তিক ক্রিয়া' (Law of mass action) বলা হয়েছে। এঁর পরীক্ষায় আরও দেখা যায় কোন বিশেষ স্মৃতি পরীক্ষায় কর্টেক্সের নির্দিষ্ট একটি এলাকা দুটি কাজ করতে পারে আবার দুই বা ততোধিক অংশ একই কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে ; অর্থাৎ একাধিক অংশ সমক্ষমতাযুক্ত (Law of equipotentiality)। বয়কট (Boycott) অক্টোপাসের উপর পরীক্ষা চালিয়ে কর্টেক্সের এই 'সমশক্তিমত্তা'র তথ্যটি প্রমাণ করেন আরও দৃঢ়ভাবে। আবার বানরের উপর C F. Jacobson-র পরীক্ষায় দেখা যায়, মস্তিষ্কের অগ্রখণ্ডে ক্ষত সৃষ্টিতে তার পরিবেশগত অভিজ্ঞতার স্মরণক্রিয়া বিলম্বিত হয়। ফরাসী এক চিকিৎসক তাঁর রোগীদের বাচনভঙ্গীতে ত্রুটির কারণ অনুসন্ধানে তাদের সেরিব্রাল হেমিস্ফেয়ারে বিশেষ স্নায়ুকোষের অবলুপ্তি লক্ষ্য করেন এবং এই বাচনত্রুটি স্মৃতি সংরক্ষণের অভাবেরই পরিচায়ক বলে চিহ্নিত হয়েছে। মন্ট্রিল স্নায়ু অধ্যাপক Wilder Penfield কর্টেক্সে বৈদ্যুতিক আবেশ ঘটিয়ে দেখতে পান বাচন কেন্দ্রে শুধু বাম হেমিস্ফেয়ারেই নয়, প্রয়োজনবোধে ডান কিংবা আঘাতপ্রাপ্ত হলে অন্য যে কোন অংশই এই কাজ করতে পারে এবং আরো মজার ব্যাপার, এই ধরনের আবেশের ফলে রোগীরা অদ্ভুত বিস্তারিতভাবে অনেক কিছু ঘটনাকেই মনে করতে পারছে। যেমন—একজন হঠাৎ নিজেকে তার কাকার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখতে পেলেন, একজন হল্যাণ্ডের এক চার্চের কোরাস গান শুনতে পেলেন ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধরনের কর্টেক্স পরীক্ষার ভিত্তিতে ডঃ পেনফিল্ড সিদ্ধান্তে আসেন, স্মরণ এলাকা (recall areas) মস্তিষ্কের ডান ও বাম দিকে নীচে টেম্পোর‍্যাল খণ্ডেই সীমাবদ্ধ। অথচ বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল এবং টেম্পোর‍্যাল এলাকাকে নিস্তব্ধ এলাকা (silent areas বলে চিহ্নিত করেছেন। বাইরে থেকে কোন প্রকার উত্তেজনায় এখানে কোন সাড়া যায় না তবে সম্মোহিত করলে বহু শৈশব স্মৃতিও ভেসে আসে। অবশ্য নিশ্চিত করে বলা যায় না যে স্মরণক্রিয় ঐ অংশেই সীমাবদ্ধ। এমনও হতে পারে আবিষ্ট সংকেত ঐ স্থান থেকে যেখানে প্রকৃত ভাবে স্মৃতি সংরক্ষিত হচ্ছে সেখানে প্রবাহিত হতে পারে

অথবা এমনও হতে পারে কর্টেক্স হয়ত আদৌ স্মৃতিস্থান নয়। যেমন ক্যালিফোর্নিয়া টেকনোলজি ইনষ্টিটিউটের Roger Sperry বিড়ালের ক্ষেত্রে এক চোখ দিয়ে দেখিয়ে কোন একটি ক্রিয়ায় অভ্যস্ত করিয়ে ঐ চোখ বন্ধ করে অন্য চোখের মাধ্যমে কাজটি করতে বললে বিড়াল সঠিক ভাবেই করতে পারে। কিন্তু করপাস ক্যালোসাম কেটে বাদ দিয়ে ঐ পরীক্ষা করলে বিড়াল ঐরূপ কাজ করতে পারে না। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন চোখে দেখা অভিজ্ঞতার ছাপ কর্টেক্সে এক অংশ থেকে অন্য অংশে প্রবাহিত হতে পারে। এবং তার সংযোগ মাধ্যমে ঐ করপাস ক্যালোসাম; অর্থাৎ দুই চোখের মাধ্যমে দেখলে কোন বস্তুর দুটি স্মৃতি ছাপ সৃষ্টি হয় এবং তা ভিন্ন ভাবে দুটি হেমিস্ফেয়ারে জমা করে কিন্তু এর দ্বারা শুধুমাত্র কর্টেক্সকে স্মৃতির অবস্থান বিন্দু হিসাবে চিহ্নিত না করে আরও অন্য কিছু অংশ যে যুক্ত তা বলা যায়। এর মধ্যে ব্রেন-ষ্টেম অন্যতম। যাই হোক না কেন, এটা প্রায় নিশ্চিত ব্যাপার, শুধুমাত্র কোন বিশেষ অংশের স্নায়ু কোষগুলিই নির্দিষ্ট কাজ করছে না বরং বলা চলে ঐ সব কোষগোষ্ঠীর যৌথ প্রভাবে একটি বিশেষ ক্রিয়া চক্রই ঘটে চলে আবার একই কোষ একাধিক ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

এবারে প্রশ্ন হচ্ছে—স্নায়বিক ক্রিয়া কি ভাবে ঘটলে তা মস্তিষ্কে শিখন, স্মরণ ইত্যাদি ক্রিয়াগুলিকে বিমূর্ত থেকে মূর্ত অবস্থায় রূপান্তরিত করে? স্নায়ুকোষ আবেগ পরিবহন করে তড়িৎ-আবেশের মাধ্যমে। কোন স্নায়ু উদ্দীপ্ত হলে অ্যাক্সন আবরণীর ভেদ্যতা বৃদ্ধি পায় ফলে ক্যালসিয়াম আয়ন (Ca^{++}) প্রবেশ করে এবং তড়িৎ-রাসায়নিক সাম্য বিঘ্নিত হয় যাতে করে নিউরোহিউমর প্রান্ত সন্নিকর্ষে প্রবাহিত হয় এবং পরবর্তী কোষে অনুরূপ ক্রিয়া ঘটে। এবং চক্রটির পুনরাবৃত্তি ঘটে। তবে ঐ প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা নির্ভর করে আবেশকারী আবেগটির উপর। কোন আবেগ সৃষ্টি হলেই প্রবাহিত হয় না, একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলেই তবে অ্যাক্সন তাকে পরবর্তী অংশে প্রবাহিত করে বলা যায়, এই ধরনের কোন স্থায়ী অবস্থার পরিবর্তনই স্মৃতি সৃষ্টি করে।

এই স্মৃতি ক্রিয়া হতে পার ক্ষণস্থায়ী কিংবা দীর্ঘস্থায়ী 'short term or long term memory। যেমন কোন একটি ইঁদুরকে বিশেষ একটি ক্রিয়ার জন্য অভ্যস্ত করে তুলে মাথায় একটু বেশী রকমের বিদ্যুত শক্ দিলে দেখা যায়, শক্ শেখার পাঁচ মিনিটের মধ্যে হলে ঐ কৌশলটি ভুলে যায়, কিন্তু পনের মিনিট থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে বিভিন্ন মিশ্র ক্রিয়া দেখা গেলেও এক ঘণ্টায় ক্ষেত্রে প্রায় কোন ক্রিয়াই দেখা যায় না। এর থেকে স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্তে আসা যায়, স্মৃতিবস্তুটি ক্রমে স্থায়িত্ব লাভ করে অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী থেকে স্থায়ী স্মৃতিতে পরিবর্তিত হয়। দেখা গেছে, বিস্মরণ (forgetting) সৃষ্টিকারী বস্তুগুলি বৈদ্যুতিক আবেশকেই প্রভাবিত করে। সুতরাং প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায় স্মৃতির গভীরে মূল ক্রিয়াটি হলো এক বিশেষ তড়িৎ-ক্রিয়া এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে স্নায়ুকোষের মধ্যে কোন রাসায়নিক বস্তুর সংশ্লেষ বা বৃদ্ধি ঘটে। বিস্মরণ তাহলে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিরই ক্ষতি, পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, স্থায়ী বিস্মরণের কারণ মস্তিষ্কের থ্যালামাসের নিম্নদেশে অবস্থিত ম্যামিলারী বডি এবং টেম্পোর‍্যাল খণ্ডের হিপ্পোক্যাম্পাস অংশে স্নায়ুকোষের বিলুপ্তি। এর দ্বারা সম্ভাবনা দেখা যায়। বোধ করি এই অংশই স্মৃতির ধারক।

মস্তিষ্ক আঘাতের ফলে স্মৃতির ক্ষণস্থায়ী বিলুপ্তিও দেখা যায়। এক্ষেত্রে স্মৃতি পুনর্জাগরণে প্রথমে আসে অতীতের গুলি পরে আসে সাম্প্রতিক কালের গুলি। কিছু ঘটনার ঠিক কিছু আগের স্মৃতিকে কিছুতেই মনে আনা যায় না অর্থাৎ এই সময়ের স্মৃতি স্থিতি-লাভ করতে পারে না। আসলে আমাদের মস্তিষ্ক যতখানি ধরে রাখতে পারে তার অনেক বেশীই হানা দেয় মস্তিষ্কে। অতএব অধিকাংশগুলি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আমরা ভুলে যাই। সংবেদ স্নায়ুকোষ মস্তিষ্কে যে আবেগ নিয়ে হাজির হয় তার স্থিতির পূর্বেই অন্য আবেগ আঘাত হানে, ফলে স্মৃতি স্থায়ী

হিসাবে গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং কোন ঘটনাকে দীর্ঘ স্মৃতিতে পরিণত করতে হলে অবশ্যই এটি সুনির্বাচিত হওয়া দরকার। শারীর-বিজ্ঞানী D. Hebbs এর পরীক্ষায়, স্নায়ুপথে কোন আবেগের পুনঃসংবহন প্রাথমিক স্মৃতি সংরক্ষণের সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু এর বিপক্ষে অনেকে যুক্তি দেখান। অনেকের ধারণা ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির স্নায়ুআবেগ সম্ভবত সাইন্যাপস অংশে মৃদু বিভব-প্রভেদ সৃষ্টি করে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ইলেকট্রোএনকেফালোগ্রামে (EEG)।

দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির ক্ষেত্রে কিন্তু ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি ক্রিয়ার মত ঘটে না, আঘাতে বা শকে ঐ স্মৃতি মুছে যায় না। এর কারণ সম্ভবতঃ মস্তিষ্কে দীর্ঘ স্মৃতির ক্ষেত্রে আরও গভীরতর পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন হয়ত মস্তিষ্কের গঠনগত কিংবা রাসায়নিক উপাদানগত। মনে হয় বিশেষ কিছু তড়িতাবেশের পুনঃ পুনঃ সঞ্চালনে স্নায়ুকোষ মাধ্যমে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। একটি পরীক্ষায় খরগোশকে একটি আলোর ক্রিয়ায় পা তুলতে শেখানো হয়। দেখা যায় ঋণাত্মক আয়নযুক্ত কোন দ্রবণ সেরিব্রাল হেমিস্ফেয়ারে ইনজেকশান করলে ঐ শেখা ক্রিয়া আর মনে থাকে না। কিন্তু ধনাত্মক আয়নে কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে না। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের W. R. Adey একটি বিড়ালের শিখনের সময় প্রতি সেকেণ্ডের ছয়টি চক্র সৃষ্টিকারী তরঙ্গের (6 cycles per second) লক্ষ্য করেন যা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে যেমন ব্রেনস্টেম, রেটিকুলার ফরমেশন এবং ভিজুয়াল কর্টেক্সে ছড়িয়ে পড়েছে। যখনই বিড়ালটি ভুল করে তখনই ঐ তরঙ্গের পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। অ্যাডে মন্তব্য করেন, এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গই মস্তিষ্কে শিখন স্বাক্ষর যা শিখন ও স্মৃতির ভিত্তি।

স্নায়ুর গঠনগত পরিবর্তনের দিক বিচার করলে দেখা যায়, স্নায়ুতন্ত্রের গঠনবিন্যাস মূলতঃ জিনবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে ওঠে। সুতরাং অধিকাংশই বংশানুগতভাবে অর্জিত। কর্টেক্সের সেন্সার মোটর, ভিজুয়াল কর্টেক্স কোষ মূলতঃ ঐভাবে নির্দিষ্ট হলেও পরীক্ষামূলকভাবে কিছু পরিবর্তন ঘটে। অনেকের ধারণা প্রাথমিকভাবে অবিকশিত এবং সমশক্তিশালী স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে পরিবর্তনশীল কিছু গঠনের আবির্ভাব ঘটে যার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের ক্রিয়ায় খণ্ড এককত্ব দেখা যায় এবং এই নতুনভাবে গড়ে ওঠা অংশ হয় নমনীয় ও স্ব-নিয়ন্ত্রিত, আবার কেউ কেউ এর বিপরীত ধারণা পোষণ করে বলেন, সব কিছুই পূর্বে নির্ধারিত। তবে দীর্ঘ স্মৃতি গড়ে ওঠে পূর্ববর্তী স্নায়ুসন্ধিতে পরিবর্তনের ফলেই। স্নায়ুকোষ বিভাজিত না হলেও ক্রমবয়ঃবৃদ্ধিতে অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভেদিত হয় এবং সম্ভবতঃ এই ক্রিয়াতেই শিখন ক্ষমতা বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। Habel এবং Wiesel-এর পরীক্ষায় এই সত্য প্রমাণিত। কোন ধরণের সংবেদের সঙ্গে স্নায়ুকোষের বিলুপ্তিও যুক্ত। অনেকে মনে করেন, স্নায়ুকোষে বিশেষ উদ্দীপনাই সংলগ্ন গ্লিয়া কোষকে বিভাজনে উদ্বুদ্ধ করে ফলে স্নায়ুকোষ শাখায় বিভক্ত হতে পারে ও বিশেষ সংযুক্তি ঘটে। কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও একটা কথা মনে আসছে, স্নায়ুকোষ উদ্দীপনে দীর্ঘ স্মৃতির ক্ষেত্রে কি এমন পরিবর্তন ঘটে যার ক্রিয়ায় স্মৃতি উজ্জ্বল দাগ কাটে? বর্তমানের শারীরবিদ্যা বা অঙ্গসংস্থানবিদ্যা কোন কিছুই এই ক্রিয়াকে জানার সুস্পষ্ট কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারে নি।

স্মৃতির জৈক রাসায়নিক ব্যাখ্যায়, স্নায়বিক ক্রিয়া ঘটার জন্য দায়ী যে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা, তা প্রয়োগে দেখা গেছে স্নায়ুকোষে RNA বা রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড নামক জৈব অম্লের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সেই ভিত্তিতে কারোর মতামত, স্মৃতি-প্রতিচ্ছবি বা বিশেষ সংকেতটি বিশেষ একধরণের RNA-র মধ্যেই নিহিত এবং RNA-র বেশ ক্রমসজ্জা বৈদ্যুতিক উদ্দীপনার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা Hyden-এর কথা অনুসারে, "The modulated frequency generated in a neuron by specific stimulation is supposed to affect RAN molecules and

to induce a new sequence of nucleotide residues along the backbone of the molecule......". এই ক্রিয়ার মূল পদ্ধতিটি হল, কোন উদ্দীপনা স্নায়ুকোষে এলে RNA প্রভাবে বিশেষ ধরণের প্রোটিন সৃষ্টি হয় এবং এই প্রোটিন স্নায়ুপ্রান্ত সন্নিকর্ষে অবস্থিত নিউরোহিউমোরকে সক্রিয় করে এবং পরবর্তী কোষে স্থানান্তরিত হয়।

অপর একদল বিজ্ঞানীর ব্যাখ্যা হল আসলে বৈদ্যুতিক আবেশ কেবল মাত্র DNA-এর মধ্যে বিশেষ জিনের সংশ্লেষণক্রিয়াকেই শুরু করতে সাহায্য করে যার ফলশ্রুতিই হল বিশেষ ধরণের RNA সৃষ্টি এবং কোষ থেকে কোষান্তরে প্রবাহিত হয়ে প্রান্ত সন্নিকর্ষে আবেগ সৃষ্টি করে। আবার ভিন্ন একটি গোষ্ঠী মন্তব্য করেছেন আসল বস্তু RNA নয়। প্রোটিনই সমস্ত কাজটি করছে। এমন কি এই ধরণের প্রোটিন অস্তিত্ব মাছ এবং ইঁদুরের ক্ষেত্রে আবিষ্কারও করেছেন। অবশ্য এই দু-পক্ষের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃতপক্ষে স্মৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—তা সঠিক করে বলা সম্ভব হয় নি। তবে আরো প্রত্যক্ষভাবে RNA প্রোটিন তত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে পিউরোমাইসিন (puromycin) অথবা সাইক্লোহেক্সামাইড (cyclohexamide) প্রয়োগে। এই উপাদানগুলি RNA এবং প্রোটিন সংশ্লেষে বাধাদান করে। ফলে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি আর দীর্ঘস্থায়ী অবস্থায় পৌছাতে পারে না। অনেকের ধারণা RNA প্রকৃতপক্ষে স্মৃতির সংরক্ষণ এবং পুনরুজ্জীবিকরণকেই সাহায্য করে। গোল্ডফিসে RNA প্রতিবন্ধক বস্তু মস্তিষ্কে প্রয়োগ করলে সহজেই কোন শেখানো কৌশলকে ভুলে যায় আবার RNA সংশ্লেষণ উদ্দীপনাকারী বস্তু প্রয়োগে কৌশলটিকে শেখানো সহজতর হয়। পরীক্ষামূলকভাবে অনেক বয়স্ক প্রাণীর ক্ষেত্রে ইষ্ট RNA ইন্‌জেকসান কিন্তু স্মৃতিশক্তিকে বাড়িয়েই তুলেছে এমন প্রমাণও পাওয়া যায়।

ম্যাককোনেলের মগজ স্থানান্তরিতকরণের বিখ্যাত পরীক্ষায় প্লানেরিয়ার ক্ষেত্রে ফলাফল উক্ত তত্ত্বকেই সমর্থন করে। এক্ষেত্রে আলোক প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দানে অভ্যস্ত প্লানেরিয়াকে এক ধরণের কীটকে খাইয়ে দেখা যায়, ঐ কীটগুলি অন্যান্য সঙ্গীদের তুলনায় অনেক সহজে ঐ আলোক প্রতিবর্ত কৌশলটি আয়ত্ত করতে পারে। অপর পক্ষে RNA ধ্বংসী উৎসেচক প্রয়োগে ঐরূপ ক্রিয়ার কোন অস্তিত্বই ধরা পড়ে না। অনুরূপ পরীক্ষায় ইঁদুরের ক্ষেত্রেও সাফল্য এসেছে।

কিন্তু এই সব সত্বেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি। কারণ উল্লিখিত ধরণের পরীক্ষাগুলিই অনেকের মতে বিতর্কিত, অবশ্য তা বলে স্মৃতির জৈব রাসায়নিক দিকটিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বরং এখন প্রয়োজন মনস্তাত্ত্বিক জৈবনিক এবং জৈব রাসায়নিক সমস্ত দিকগুলির সমন্বয়নের মাধ্যমে স্মৃতি রাজ্যের আসল রূপটি উদ্ঘাটন করা। আলোচনা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে—স্মৃতি কি—এর একক কোন উত্তর নেই। সবচেয়ে বড় কথা পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কি অদ্ভুতভাবে সব কিছু ঘটে যাচ্ছে সেটাই পরম বিস্ময়। সব কিছুকে পেছনে ফেলে রেখে আশাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা ভাবতে পারি। আসল রহস্য একদিন সত্যের আলোকে আসবেই। সেদিন স্মৃতির অতল তলে লুকিয়ে থাকা গুপ্ত ভাণ্ডার আমরা আবিষ্কার করব। স্মৃতিকে পুরুষানুক্রমে বংশগত উপাদানের মত উত্তর পুরুষের হাতে তুলে দিতে পারব। মানব জাতি হবে অমরত্বের আসনে। সেই আশাতেই অধ্যাপক ইয়ং (Young)-এর আবেদন আমরা সকলের কাছে রাখছি—"The study of the brain is certainly one of the most challenging of all scientific problems. At present we spend much of our mathematical and physical genius on the study of the world around us. Why not apply more of it to ourselves and especially to our brains?"

এক্স-রশ্মি ও গামা-রশ্মি জ্যোতির্বিজ্ঞান

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র*

এক্স-রশ্মির উৎস নক্ষত্রলোক

মহাকাশ থেকে প্রায় সব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণ হয়, কিন্তু সে সবই পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় না। পৃথিবীর আবহমণ্ডল ভেদ করে আলো এবং কোন কোন দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ অনায়াসে পৃথিবীতে আসতে পারে, তাই আমরা খালি চোখে জ্যোতিষ্ক দেখতে পাই, মহাকাশের অণুতরঙ্গ ধরতে পারি। কিন্তু গামা বা এক্স রশ্মির মত অতিভেদক বিকিরণের কাছে আবহমণ্ডলের এই জানালা কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ থাকে। তার কারণ এই সব বিকিরণ আয়নন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবহমণ্ডলে নিঃশোষিত হয়ে যায়। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে তাই এসব বিকিরণ ধরা পড়ে। অ্যারিয়াল-1 উপগ্রহ দিয়ে সূর্যের 4·7 থেকে 13·8 Å (10^{-8} সেঃ মিঃ) এক্স-রশ্মি শুধু ধরা পড়ে নি, সৌরশিখার সঙ্গে তার তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধিও দেখা গেছে।

1962 খৃষ্টাব্দে একটি এরোবী রকেট মহাকাশে এক্স-রশ্মির মূল্যবান তথ্য এনে দেয়। 1970 খৃস্টাব্দে নাসা কেনিয়া থেকে 'উহুরু' নামে যে উপগ্রহটি পাঠায়, তা শুধু এক্স-রশ্মি ধরতে পারে। 'উহুরু' আমাদের গবেষণাগারে অনেক তথ্য পৌঁছে দিয়েছে। এই সব তথ্যের একটি হলো মহাকাশের অন্তত এক-শো'র বেশী নক্ষত্র—এক্স-রশ্মি বিকিরণ করে। আর একটি তথ্য হলো সূর্যের মোট বিকিরণের শক্তির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও কম শক্তি এক্স-রশ্মি হিসেবে বেরিয়ে আসে। সূর্যের করোনা এই শক্তির উৎস। 1970 খৃষ্টাব্দে 7ই মার্চ সূর্যগ্রহণের ঠিক পরে একটি রকেট পাঠিয়ে যে এক্স-রশ্মি চিত্র পাওয়া গেছে, তাতে সূর্যের প্লাজ্মা ও চুম্বক ক্ষেত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হয়েছে।

আমাদের ছায়াপথে 30° দ্রাঘিমাংশের মধ্যে দেখা যায় অধিকাংশ এক্স-রশ্মি নক্ষত্রের ভীড়। অন্যগুলি 90° দ্রাঘিমাংশে সিগ্‌নাস ও 300° দ্রাঘিমাংশে সেণ্টা-উরি নক্ষত্র মণ্ডলে দেখা যায়। বাইরের ছায়াপথেও বিভিন্ন অক্ষাংশে এরা ছড়িয়ে আছে।

আমাদের ছায়াপথে বেশ কয়টি সুপারনোভার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। নক্ষত্রের বৃদ্ধাবস্থায় তার পরমাণুগুলির নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন আর পারমাণবিক অবস্থায় থাকে না—এই অবস্থার নক্ষত্রগুলি শ্বেত-বামন। এই অবস্থা আসার আগেই কোন কোন নক্ষত্র প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সম্মুখীন হয়ে নোভা বা সুপারনোভায় পরিণত হয়। আমাদের ছায়াপথের ক্র্যাব্‌নেবুলা এরকম একটি অতিনবতারার ধ্বংসাবশেষ। আলো ও বেতার-তরঙ্গের সঙ্গে এই জ্যোতিষ্ক এক্স-রশ্মিও বিকিরণ করে। ক্র্যাব্‌নেবুলার এক্স-রশ্মি বিকিরণ বেতার বিকিরণ থেকে কম হলেও দৃশ্য আলো থেকে বেশী। সাধারণ নক্ষত্রগুলি বেশী ঠাণ্ডা হলে লাল বা লালউজানী রশ্মিই বেশী বিকিরণ করে, আর নক্ষত্র যত বেশী উত্তপ্ত হয়, ততই তার বিকিরণ বর্ণালীতে বেগুনী বা অতিবেগুনী রশ্মি বাড়তে থাকে। সবচেয়ে উত্তপ্ত নক্ষত্রের বেলায়ও এত এক্স-রশ্মি বিকিরণ সম্ভব না। তাই ক্র্যাব্‌নেবুলার আচরণ অদ্ভুত মনে হয়। অনুমান করা হয়—এর কেন্দ্রে আছে একটি নিউট্রন নক্ষত্র—যাতে ইলেক্ট্রন

* সাহা ইন্‌স্টিট্যুট্‌ অব্‌ নিউক্লিয়ার ফিজিক্‌স, কলি-700009

ও প্রোটন যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে আধানহীন নিউট্রন। ক্র্যাব্ নেবুলার নিউট্রন নক্ষত্র বেতার-তরঙ্গের সঙ্গে সমানে সেকেণ্ডে 30 বার এক্স-রশ্মির স্পন্দন ও বিকিরণ করে। এরা স্পন্দমান নক্ষত্র।

প্রায় সব সুপারনোভাই এক্স-রশ্মি বিকিরণ করে, কিন্তু তাদের বিকিরণের ধরণ এক নয়। যেমন, সিগ্ন্যাস্-এর এক্স-রশ্মি, তার উত্তপ্ত গ্যাসীয়মণ্ডল থেকে আসে।

কৃষ্ণবিবর ও এক্স-রশ্মি

আজ পর্যন্ত যে সব এক্স-রশ্মি নক্ষত্র ধরা পড়েছে তার এক-পঞ্চমাংশই হলো সুপারনোভার ধ্বংসাবশেষ। বাকীগুলি অন্য সব নক্ষত্র জগতের। এমন একটি অজানা জুড়ি তারার সন্ধান পাওয়া গেছে, যার একটি হলো সাধারণ নক্ষত্র, অন্যটি নিউট্রন নক্ষত্র। সাধারণ নক্ষত্রের বস্তুপুঞ্জ নিউট্রন নক্ষত্রটিতে অনবরত এসে পড়ায় এক্স-রশ্মির উদ্ভব হয়। কারণ নিউট্রন নক্ষত্রে মহাকর্ষশক্তিই প্রধান, তাই পদার্থের সংযোগে এরা শক্তি বিকিরণ করে। নিউট্রন নক্ষত্র আবার মহাকর্ষের চাপে ক্রমশ এত সংকুচিত হয়ে পড়ে যে, তাতে আর পদার্থ বলে কিছু থাকে না—অথচ তীব্র মহাকর্ষশক্তি বর্তমান থাকে। এদের কৃষ্ণবিবর (black hole) বলা হয়।

নিউট্রন নক্ষত্রের বহমান নিউট্রনীয় পদার্থ নক্ষত্রদেহে মহাকর্ষীয় সংকোচনকে বাধা দেয়। 1939 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার একটি বিতর্ক তুললেন যে, নিউট্রনীয় পদার্থের বাধা তো অসীম হতে পারে না—এক সময় তা ভেঙ্গে পড়বে। আর তখনই তা কৃষ্ণবিবরে পরিণত হবে। নক্ষত্রভরের কোন্ ক্রান্তিক মানে ভেঙ্গে পড়বে এই বাধা? এই ভর হলো সূর্যের 3·2 গুণ। সুপারনোভার বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন কোন ধ্বংসাবশেষ এরকম ভরে পরিণত হলে সৃষ্টি হবে কৃষ্ণবিবরের। কৃষ্ণবিবরে মহাকর্ষ শক্তি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না, তাই ধরা পড়বে না কোন বিকিরণ। এদের আয়তন হবে একই ভরের সাধারণ নক্ষত্র থেকে অনেক কম।

আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বলে যে, যে কোন মহাকর্ষ ক্ষেত্র থেকে মহাকর্ষ তরঙ্গ বেরোতে পারে। কৃষ্ণবিবরের মহাকর্ষ তরঙ্গ দিয়ে কি তার অস্তিত্ব ধরা যাবে? 1960 খৃষ্টাব্দে ওয়েবার-এর এরকম পরীক্ষা ব্যর্থই হয়েছে। কৃষ্ণবিবর ধরা পড়তে পারে আর একটি পরীক্ষায়। তার মহাকর্ষ ক্ষেত্রে যে কোন নক্ষত্রের চারিদিকে দৃশ্য আলো বেঁকে গিয়ে পৃথিবীর দিকে একটি অভিসৃত আলোর সৃষ্টি করতে পারে অর্থাৎ কৃষ্ণবিবরটি একটি মহাকর্ষীয় লেন্সের মত কাজ করবে। কিন্তু এরকম আলো এখনও পাওয়া সম্ভব হয় নি।

কৃষ্ণবিবরের চারপাশে বস্তুপুঞ্জ কেবলই আবর্তিত হবে। পরস্পর সংঘাতে যতই তাদের শক্তি কমবে, ততই তাদের আবর্তনী বৃত্ত ছোট হয়ে আসবে—ক্রমশ তারা লোপ পাবে কৃষ্ণবিবরের অভ্যন্তরে। এই লুপ্তির ফলে মহাকর্ষীয় শক্তি রূপান্তরিত হবে তাপে। কৃষ্ণবিবরের মহাকর্ষীয় শক্তির ক্ষণে ক্ষণে যে প্রসারণ ও সঙ্কোচন ঘটে, তার প্রভাবে এই তাপ হবে তীব্র—ফলে এক্স-রশ্মি বা অন্য বিকিরণ বর্ণালীর সৃষ্টি হবে। কৃষ্ণবিবরের নিজস্ব বিকিরণ না থাক, বাইরের বস্তুর অবলোপের চিহ্ন হিসেবে এক্স-রশ্মি ধরা পড়বে। 1965 খৃষ্টাব্দে সিগ্নাস নক্ষত্রমণ্ডলীতে সিগ্নাস X-1 নামে একটি এক্স-রশ্মির উৎস ধরা পড়ে, 1971 খৃষ্টাব্দে উহুরু'র তথ্য হল এর এই বিকিরণের হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছে। নিউট্রন নক্ষত্রের মত এর স্পন্দন নিয়মিত নয়। ফলে সিগ্নাস X-1 একটি কৃষ্ণবিবর বলে সন্দেহ হয়। অণুতরঙ্গের সাহায্যে এর অবস্থান একটি দৃশ্য নীল নক্ষত্র H-226868-এর কাছে স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। এই নক্ষত্রটি সূর্যের চেয়ে প্রায় 30 গুণ ভারী। বিজ্ঞানী বোল্ট্ দেখান যে, জুড়ি তারার অন্যতম এই নক্ষত্রটি 56 দিনে একটি কক্ষে বৃত্তাকারে ঘোরে। কক্ষের প্রকৃতি থেকে মনে হয় জুড়িটি সূর্যের চেয়ে

প্রায় 5 থেকে 8 গুণ ভারী। নক্ষত্রটি অদৃশ্য। তবে কি এটি শ্বেতবামন অথবা নিউট্রন নক্ষত্র অথবা কৃষ্ণবিবর? নিউট্রন নক্ষত্র সূর্য থেকে 3·2 গুণের বেশী ভারী হতে পারে না, শ্বেতবামন 1·4 গুণের বেশী নয়। তাহলে এই জুড়ি তারাটি কি কৃষ্ণবিবর? অসম্ভব নয়। HD-226868 নক্ষত্রটির প্রসারণ ঘটেছে। হয়তো তার জুড়ি কৃষ্ণবিবর তার ভর টেনে নিচ্ছে। আর এই ভর বিবরে ঢোকার মুখে তাদের অবলুপ্তির চিহ্নস্বরূপ যে এক্স-রশ্মি বিকিরণ করে, তাই 'উহুরু' উপগ্রহে ধরা পড়ছে। এর স্পন্দন নিয়মিত নয়, তার কারণ অসাম্য অবস্থার এই নক্ষত্রের মহাকর্ষ ও বস্তুর অনিয়মিত গতিবিধি বিকিরণের নির্দিষ্ট পর্যায় মেনে চলতে পারে না।

বাইরের ছায়াপথে কিছু এক্স-রশ্মির উৎস মনে হয় কোয়াসার (Quasar)।

ভবিষ্যতে আরও ক্ষীণ এক্স-রশ্মি ধরার ব্যবস্থা হলেও তার সঙ্গে গামা-রশ্মি বা নভো-রশ্মির গবেষণা-যুক্ত হলে বিশ্বজগতের স্বরূপ আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

গামা-রশ্মি জ্যোতির্বিজ্ঞান

মহাকাশ থেকে গামা-রশ্মির বিকিরণ নিয়ে এখনও খুব বেশী গবেষণা হয় নি। গামা-রশ্মির ভেদ শক্তি বেশী বলেই এক্স-রশ্মি, বেতার-তরঙ্গ বা আলো যে সব প্রক্রিয়া বা যে সব অবস্থানের খবর দিতে পারে না, গামা-রশ্মি যে সব খবর নিয়ে আসতে পারবে।

গামা রশ্মির মহাকর্ষীয় লাল অপসরণ থেকে নিউট্রন নক্ষত্র ও কৃষ্ণবিবর নক্ষত্রগুলির পৃষ্ঠদেশের সঠিক ধর্ম নির্ণয় করা যাবে।

নভোরশ্মির অজানা উপাদান, তার তীব্রতা ও অবস্থিতি গামা-রশ্মি বিশ্লেষণ করে ধরা পড়তে পারে। নক্ষত্র জগতের মধ্যবর্তী মাধ্যমের উপাদানের যে সব অংশ আণবিক বা পারমাণবিক অবস্থায় নেই, তাদের স্বরূপ অথবা নাক্ষত্রিক মেঘে গামা-রশ্মির তীব্রতা হ্রাসের পরিমাপ থেকে নক্ষত্র সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা জানা যাবে।

1972 খৃষ্টাব্দের 4 ও 7 আগস্ট OSO−7 উপগ্রহ সৌরশিখার যে গামা বিকিরণ পেয়েছে, তাদের তীব্রতা থেকে সৌর-কণিকার ত্বরণকাল, শক্তি বর্ণালী ও সৌরশিখায় দ্রুতগামী কণিকার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। মহাকাশ থেকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন যে সব গামা-রশ্মি পাওয়া গেছে, তার মূলে রয়েছে অস্থায়ী π (পাই) মৌল কণার ক্ষয়। এই তথ্য থেকে আমাদের ছায়াপথে নভোরশ্মির অবস্থান বিন্যাস সম্পর্কে নূতন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। সুপারনোভা, নিউট্রন নক্ষত্র ও কৃষ্ণ বিবর, নক্ষত্র জগতের ধূলিকণা ও গ্যাস—জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই সব কয়টি বৈচিত্র্যের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গামা-রশ্মি অন্য-সব বিকিরণের চেয়ে বেশী শক্তিশালী হবে সন্দেহ নেই। এখনই উপগ্রহ বা রকেটে গামাবিকিরণ ধরবার যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে নানা পরীক্ষা চলছে। 1980 খৃষ্টাব্দে নাসা (NASA) গামা-রশ্মি পরীক্ষার মানমন্দির হিসেবে যে মহাকাশ যানটি পাঠাবে, তার প্রেরিত ফলাফল জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

রহস্যে ঘেরা দেশান্তরী পাখী

সৌমেনকুমার মৈত্র*

হেমন্তের হিমেল হাওয়ার রেশ টেনে শীত সবে পড়তে সুরু করেছে কি করে নি, এই সময় কেউ একটু খবর রাখলে জানতে পারবেন নীল আকাশের বুক চিরে আমাদের এই আলিপুরের চিড়িয়াখানার বাড়তি আকর্ষণ হিসাবে হাজির হয় কত হাজার হাজার পাখীর ঝাঁক। শুধুমাত্র শীতের সুন্দর ঋতুটিকে উপভোগ করেই এই সব পাখী ডানায় ভর করে আবার পাড়ি দেয় সুদূরের পথে, তাদের পুরানো আবাসস্থলের দিকে। নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দিষ্ট পথের এই পরিভ্রমণকে ঘিরে এক বিরাট রহস্য লুকিয়ে আছে এই সব দেশান্তরী পাখীদের আচরণের মধ্যে। অসীম কৌতূহল আমাদের পাখীদের এই বিশেষ বৃত্তিকে নিয়ে। এই বৃত্তির শুরু কেমন ভাবে, এই আচরণগত বৈশিষ্ট্য ছড়িয়ে আছে কত পাখীর মধ্যে, পরিভ্রমণের রীতিনীতি কি সব পাখীর ক্ষেত্রেই এক, কেনই বা এইসব পাখী আসে কেনই বা ফিরে যায় দুস্তর বাধার পথ পেরিয়ে, এই যাওয়া-আসার পথের নির্দেশই বা পায় কোথা থেকে আর এই বাড়তি ভ্রমণের উদ্দীপনার উৎসটাই বা কি—এই রকম হাজার জিজ্ঞাসার অন্ত নেই আমাদের মনে। কিন্তু, বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসেও অনেক প্রশ্নের উত্তরই আজও আমাদের অজানা রয়ে গেছে

পৃথিবীতে পাখীরাই হচ্ছে পালকবিশিষ্ট একমাত্র প্রাণী, আর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে এই পাখীদের 8600 রকমের প্রজাতি। আমরা সকলেই জানি পালকবিশিষ্ট সব পাখীই আকাশে উড়তে পারে না, কিন্তু যাদেরই আকাশের বুকে ভেসে বেড়ানোর কৌশলটি জানা আছে, তারা কি সকলেই এই যাযাবর বৃত্তিতে অভ্যস্ত? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া বেশ শক্ত, তবে দেখা গেছে বিভিন্ন পাখীদের মধ্যে দেশান্তর গমনের রীতি-নীতি বা দূরত্বের পার্থক্য থাকলেও এই আচরণে অভ্যস্ত পাখীর সংখ্যা খুব একটা কম নয়। শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই মোট পাখীদের দুই-তৃতীয়াংশ প্রজাতি, উত্তরাংশ থেকে দক্ষিণাংশে নিয়মিত স্থান পরিবর্তন করে। এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের পাখীদের মধ্যে যাযাবর পাখীর সংখ্যা চল্লিশ শতাংশের কম নয়। বৃটেনে 68টি প্রজাতির গাইয়ে পাখীদের মধ্যে 22 রকমের পাখীই এই দেশান্তর ভ্রমণে অভ্যস্ত। আমাদের দেশে যে 1200 প্রজাতির পাখী পাওয়া যায় তার প্রায় এক-চতুর্থাংশই শীতের অতিথি, যাদের মধ্যে নানারকমের হাঁস ও নানা জাতের টার্ণ, গাল্-জাতীয় জলচর পাখীর সংখ্যা বেশী হলেও কালোশির, লালশির, বিভিন্ন রকমের খঞ্জন, বেশ কিছু প্রজাতির লার্ক, সোয়ালো, প্যাপ্টর বা স্টার্লিং প্রভৃতি পাখীর নাম উল্লেখ করার মত।

একদেশ থেকে অন্যদেশে উড়ে চলার মধ্যে এই সব যাযাবর পাখীর যে শুধুই খামখেয়ালীপনা লুকিয়ে আছে - এ কথা আজ আর কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন না। কারণ—দেখা যায় মুখ্যতঃ বাঁচার তাগিদেই এই সব পাখীর পৃথিবীর একপ্রান্তকে নিজের বাসা বাঁধার, ডিম পাড়ার, বাচ্চা ফুটিয়ে তোলার জায়গা এবং অন্য একপ্রান্তকে জন্মভূমির প্রতিকূল আবহাওয়া এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকার উপযুক্ত স্থান হিসাবে বেছে নিতে হয়। জন্মভূমিকে সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করার পেছনে খাবার, দিনের আলো বা উষ্ণতার যে কোন

*প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 35নং বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-700019

একটির ঘাটতির কারণই যথেষ্ট। যতদূর জানা যায়, এই দেশান্তরী পাখীদের অবকাশ যাপনের স্থান নির্বাচন নির্ভর করে পাখীদের নিজস্ব জন্মভূমির ভৌগোলিক অবস্থানের ওপরে, কারণ দেখা গেছে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে শীতের প্রাক্কালে উত্তরাঞ্চলের পাখীরা চলে আসে দক্ষিণে এবং উঁচু পার্বত্য অঞ্চলের পাখীরা নেমে আসে সমতলে। পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে এই ঘটনা হয় ঠিক বিপরীতমুখী, দক্ষিণ অঞ্চলের পাখীরা শীত থেকে রক্ষা পেতে চলে আসে উত্তরে এবং শীত ফুরালেই ফিরে যায় নিজের জন্মভূমিতে। আমাদের দেশে যে সব পাখী বেড়াতে আসে, তাদের এটা শীতকালীন আবাসস্থল, এখানে তারা ডিম পাড়তে আসে না এদের বেশীর ভাগেরই জন্মভূমি সাইবেরিয়াং এবং অনেকেরই পূর্ব ইউরোপ, উত্তর ও মধ্য এশিয়া এবং হিমালয় অঞ্চলে।

দেশ ভ্রমণের নেশায় এই সব পাখী কতটা দূরত্বের পথ অতিক্রম করে—ভাবলে অবাক লাগে। সাধারণতঃ যারা পৃথিবীর উত্তর গোলর্ধ থেকে দক্ষিণ গোলার্ধের বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাতায়াত করে তাদের কাছে শুধু এক পিঠের পথে গড়ে 1000-3000 কিলোমিটারের দূরত্ব অতিক্রম করতেই হয়, কিন্তু একদিকেই এই দূরত্ব 4000-6000 কিলোমিটার হওয়াটা অসাধারণ কিছু নয়, মেরু অঞ্চলে কোন কোন সামুদ্রিক পাখীরা প্রতি বছরে মোট 35000 কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করাটাকে খুব কঠিন কিছু বলে মনে করে না।

বছরের কিছুটা সময়ে অন্ততঃপক্ষে যারা পথকেই ঘর করে নেয় সেই সব যাযাবর পাখীর পক্ষে কিন্তু এই লম্বা দূরত্বের পথকে নিরবচ্ছিন্নভাবে অতিক্রম করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, বিশ্রাম তাদের নিতেই হয়। আর এই সময়ে বেশীরভাগ পাখীদের উড়ে চলার জন্য রাতকেই বেশী পছন্দ হয়। কারণ, অনেক পাখীই আছে যারা আদৌ নিশাচর নয় কিন্তু এই দীর্ঘপথে পাড়ি দেবার সময় দেখা যায় তারা রাতের অন্ধকারেই সেরে নিতে চায় এগিয়ে যাওয়ার কাজটা। সাধারণতঃ সূর্যাস্তের আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টা পর এরা উড়তে শুরু করে এবং পথে বিশ্রাম নেবার অবকাশ থাকলে এক নাগাড়ে 8-10 ঘণ্টার বেশী ওড়ে না, যদিও এই সময়েই তারা প্রায় 300-600 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারে অনায়াসে। কিন্তু দীর্ঘ যাত্রাপথে যখন সমুদ্র বা মরুভূমির মত দুর্গম স্থানের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে হয় তখন ডানার নীচে ক্লান্তি লুকানো থাকলেও তাদের একটানা 36 ঘণ্টা পর্যন্ত উড়ে চলা বিচিত্র কিছু নয়। যদিও মোটামুটি ভাবে দেখা যায় 3000 কিলোমিটারের মত দূরত্বের পথ অতিক্রম করতে এই পাখীদের মোট সময় লাগে প্রায় তিন থেকে চার সপ্তাহের মত। এই রাতে উড়ে-চলা পাখীদের বৈশিষ্ট্য হলো, পুরো যাত্রাপথে—হয় তারা একা একা, নয়তো খুব ছাড়া ছাড়া ভাবে, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে উড়তে বেশী ভালোবাসে। কিন্তু, যে সব পাখী দিনের আলোতেই উড়তে বেশী পছন্দ করে তাদের মধ্যে ঘন হয়ে বিরাট বড় দল বেঁধে ওড়ার প্রবণতাই বেশী।

দেশান্তরী পাখীদের দীর্ঘ সময় ধরে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়া-আসার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা যদি কিছু লুকিয়ে থাকে তা হচ্ছে তাদের নির্ভুলভাবে পথ চেনা। এক ভৌগোলিক এলাকা থেকে অপর এক ভৌগোলিক এলাকার মাঝে আকাশের পথে কোথা থেকে তারা সঠিক পথের নির্দেশ পায়—সেটা কিন্তু সত্যি খুবই ভাবনার কথা। এই প্রসঙ্গ নিয়ে ভাবনা অনেক পুরানো হলেও সঠিক তথ্য কিন্তু এখনও অজানা। বর্তমানের ধারণা শুধু কিছু অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। বেশীর ভাগ বিশেষজ্ঞের মত এই যে, দেশান্তরী পাখীরা তাদের যাত্রাপথের বিভিন্ন সমুদ্রের উপকূল, পাহাড়, পর্বত,

এমন কি নদী-নালাকেও পথের চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করে ; যদিও একেবারে নতুন পাখীদের এই সব সঙ্কেত চেনায় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় পুরানো অভিজ্ঞ সহচরদের কাছ থেকেই। এ ছাড়াও, দিনে উড়ে চলে যে সব পাখী তাদের কাছে সূর্যের অবস্থান, আর নিশাচর পাখীদের ক্ষেত্রে তারকামণ্ডল যে নির্দিষ্ট পথের ঠিকানা দিতে পারে—এ ব্যাপারে অনেকেই এখন একমত। তবে দেশান্তরী পাখীদের নির্ভুল পথ চেনার ব্যাপারে সবচেয়ে পুরানো ধারণা এই যে পাখীদের চৌম্বক ক্ষেত্র সম্বন্ধে অনুভূতি ভীষণ তীক্ষ্ণ এবং এটাও সত্যি যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের চৌম্বকত্ব শুধুই পৃথক নয়, ঋতু-বৈচিত্র্যের সাথে সাথে এই চৌম্বকত্বের তীব্রতারও পরিবর্তন হয়, আর এই তারতম্যকেই সঠিকভাবে অনুধাবন করে ভ্রমণকারী পাখীরা চিনে নেয় তাদের গন্তব্যের গতিপথ।

বিশাল এই পৃথিবীর বৈচিত্র্যে ভরা প্রকৃতির যে কোন উপকরণকেই ভ্রাম্যমান পাখীরা তাদের পথের দিশারী হিসাবে ব্যবহার করুক না কেন, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই বিরাট দূরত্বের এই পথে দুস্তর বাধা এবং ঝুঁকিও অনেক। কিন্তু প্রশ্ন জাগে সত্যিই কি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা খাদ্যাভাবের ফলেই প্রত্যেক বছর একই সময়ে এই যাযাবর পাখীদের পাড়ি দিতে হয় সুদূরের পথে! এর পেছনে কি অন্য কোন উদ্দীপনা নেই ? এ কথা সত্যি—যে কোন কাজই নিয়মিত করলে জন্ম নেয় অভ্যাস, আর এই অভ্যাসের প্রতি দুর্বলতা জন্মালেই সৃষ্টি হয় নেশার ; তবে কি বৎসরান্তে দেশ ভ্রমণ এই সব পাখীর এক রকমের নেশাই! যদি স্বীকার করে নিতেই হয় প্রাথমিক ভাবে এই বৃত্তির সূত্রপাত হয়েছিল প্রকৃতির মধ্যে বাছাই করে প্রতিকূলতা এড়িয়ে অনুকূল পরিবেশ খোঁজার মধ্যে, পরে সেটা ক্রমাগত অভ্যাসের ফলে পর্যবসিত হয়ে গেছে নেশায়, তবে এ কথা বিশ্বাস করতে বাধা নেই দেশান্তরী পাখীদের এই নেশা বংশগত এবং এই বংশগত অভ্যাসের মধ্যে জড়িয়ে আছে এক বিরাট শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের জটিলতা।

দেশান্তরী পাখীদের দেশভ্রমণের সুরু ও শেষের মধ্যে যে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন হয় তার সাথে তুলনা করে একই সময়ে তাদের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের পরিবর্তন দেখতে গেলে মনে হবে আরোই বিস্ময়কর। নানারকম বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেছে দেশান্তর গমনের এই প্রবণতাকে জাগিয়ে তুলতে প্রকৃতির যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও মুখ্য উদ্দীপনা কিন্তু আসে তাদের নিজেদের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের মধ্যেই। আধুনিক বিজ্ঞানীদের অভিমত—প্রকৃতিতে চক্রাকারে ঋতু পরিবর্তনের মত প্রত্যেকটি জীবের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপেও নিজস্ব ছন্দে চক্রাকারে পরিবর্তন দেখা যায় যাকে পরিভাষায় বলা হয়েছে endogenous rhythm বা "অন্তর্জাত স্পন্দন"। এই কথার অর্থ হলো, বাহ্যিক পরিবেশে একটি নির্দিষ্ট তাল রেখে যেমন দিনের পর রাত এবং রাতের পর আবার দিন আসে কিংবা শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্তের পরে ঘুরে ঘুরে পুরানো ঋতুর ফিরে আসার ঘটনা যেমন একই ভাবে ঘটছে তেমনই প্রত্যেকটি শরীরের আভ্যন্তরীণ পরিবেশে চলেছে এক ছন্দোময় পরিবর্তন—যার কিছুটা বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তনসাপেক্ষ, আবার কিছুটা বাহ্যিক পরিবেশ প্রভাবমুক্ত। এখন দেখা গেছে দেশান্তরী পাখীদের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপে কিছুটা প্রকৃতি-নির্ভর পরিবর্তন হলেও এদের নিজেরও বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে যা শুধুই "আভ্যন্তরীণ দিনপঞ্জী" বা 'internal calender-কে' মেনে চলার ফল। যে সমস্ত পাখী জন্মগতভাবে দেশান্তর গমনে নেশাগ্রস্ত তাদের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ লক্ষ্য করে দেখা গেছে—স্বাভাবিকভাবে তাদের ঋতুকালীন ভ্রমণ সুরুর আগে বা পরে, একনাগাড়ে বেশ কিছুদিন

পরীক্ষাগারে কৃত্রিম পরিবেশে যদি রেখে দেওয়া যায় তাতে তাদের আচরণ ও শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের দিক থেকে স্বপ্রজাতির স্বাভাবিক পরিবেশের পাখীদের থেকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখা যায় না। এর থেকে বর্তমান বিজ্ঞানীদের এক বিরাট অংশ আজ বিশ্বাস করেন, যারা প্রকৃতই জন্মগত দেশান্তরী পাখী, তাদের এই নেশা মিশে গেছে তাদের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের মধ্যে এবং এই শারীরবৃত্তীয় প্রস্তুতিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তাদের শরীরের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ "অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি" নিঃসৃত রস বা 'হর্মোন'। এখন অবধি আমাদের জানার আয়ত্তে যতটুকু তথ্য এসে পৌঁছিয়েছে তাতে দেখা যায় শরীরে বিভিন্ন রকম 'হর্মোন' থাকলেও তাদের সকলের প্রভাব সমান নয়। 'অন্তর্জাত স্পন্দন'-ই যদি মুখ্য নিয়ন্ত্রক হয়, তবে অনেকেরই স্পষ্ট মত এই যে, শারীরবৃত্তীয় কাযাবলীর 'অন্তর্জাত স্পন্দনের ঘড়িটি' (endogeneous rhythmic clock) বসানো আছে সমস্ত 'হর্মোন' নিঃসরণের মুখ্য নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশ 'হাইপোথ্যালামাস' (hypothalamus)-এর মধ্যে; অর্থাৎ, আভ্যন্তরীণ যে শারীরিক পরিবেশে পাখীরা তাদের যাত্রাপথে উদ্দীপিত হতে পারে- তার সময় নির্ধারণ করে এই 'হাইপোথ্যালামাস' নিঃসৃত বিশেষ ধরণের রস, যার প্রভাবে 'পিট্যুইটারি' (pituitary) গ্রন্থি নানারকম উদ্দীপক 'হর্মোন' নিঃসরণ করে সৃষ্টি করে উপযুক্ত শারীরবৃত্তীয় পরিবেশ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'পিট্যুইটারি' গ্রন্থিতো অনেক হর্মোনেরই উৎস কিন্তু দেশান্তর গমনের পরিবেশ রচনায় সব হর্মোনেরই অবদান কি সমান। নিশ্চই নয়, তবে 'পিট্যুইটারী' নিঃসৃত 'প্রোল্যাকটিন হর্মোন' (prolactin hormone), যার প্রভাবেই প্রাক্‌ভ্রমণ পর্যায়ে শরীরে অতিরিক্ত মেদ জমে এবং দীর্ঘ যাত্রা পথে এই মেদই শরীরে বাড়তি শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করে। সেই হর্মোন, নিঃসন্দেহে মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও, পিট্যুইটারি নিঃসৃত 'যৌন উদ্দীপক হর্মোন' (যার উপর নির্ভর করেই শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয়ের কার্যক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়) তার অবদানও নগণ্য নয়। সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে পরিভ্রমণের বার্ষিক সময়-নির্ঘণ্ট নির্ণয়ে 'থাইরয়েড' (thyroid), 'অ্যাডরেনাল' (adrenal), ও 'অন্তঃস্রাবী অগ্ন্যাশয়' (endocrine pancreas) নিঃসৃত রসের প্রভাব থাকলেও, দুরান্তের পথে পাড়ি দেবার উদ্দীপনা জোগাতে আর একটি ছোট গ্রন্থির অংশগ্রহণকেও অস্বীকার করা যায় না— যার অবস্থান মস্তিষ্কের একেবারে ওপরে এবং এর নাম—'পাইনিয়াল বা পিনিয়াল' (pineal)। কিন্তু বিরাট কোন কর্মযজ্ঞের সাফল্যের পেছনে যেমন একক অবদানই যথেষ্ট নয়, তেমনই আকাশের বুকে ক্লান্তিবিহীন পথে ভেসে চলার পিছনেও একক হর্মোনই সম্পূর্ণভাবে দায়ী হতে পারে না, এবং আধুনিক বিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে এখন এক মত যে সমগ্র শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের প্রস্তুতিতে প্রায় প্রত্যেক হর্মোনকেই অংশগ্রহণ করতে হয়, যদিও 'মুখ্য' অথবা 'গৌণ' ভূমিকার প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট জবাব দিতে দ্বিধাশূন্য হওয়া ঠিক এই মুহূর্তে সম্ভব নয়।

আচার-আচরণে অনন্যতা, গতিবিধিতে স্বকীয়তা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে জটিলতা জড়িয়ে আছে যে দেশান্তরী পাখীদের মধ্যে, তারা সত্যি আমাদের কাছে এক রহস্য। বহু বছরের বহু গবেষণার বেড়াজালে পেরিয়ে আজও আমরা এই রহস্যের আবরণকে খুলে ফেলতে পারি নি। কিন্তু তাই বলে আমরা থেমে নেই, সারা বিশ্বজুড়ে এই বিষয়কে ঘিরে চলেছে নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আমাদের ভারতবর্ষেই এই উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসেছে বিশ্ববিখ্যাত পক্ষী-বিজ্ঞানী ডঃ সালিম আলির নেতৃত্বে "বম্বে ন্যাচরাল হিস্ট্রি সোসাইটি"র এক বিরাট সমীক্ষক দল, যার সাথে আমাদের কলিকাতার বিশিষ্ট

পক্ষীতত্ত্ববিদ্ ডঃ বিশ্বময় বিশ্বাসের উদ্যোগও উল্লেখ করার মত। খুবই সুখের কথা, অতি সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই বিখ্যাত পক্ষীহর্মোন-তত্ত্ববিদ ডঃ অশোক ঘোষের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় সরকারের 'শিক্ষা ও কারিগরি বিভাগ'-এর অর্থানুকূল্যে এক প্রকল্প চালু হয়েছে যার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো পাখীদের দেশান্তরী হবার পেছনে হর্মোনের প্রভাবকে খুঁটিয়ে দেখা। আমাদের মধ্যে অনেকেরই যাদের ভালোলাগা বা ভালোবাসা শুধু পশুপাখীদের রূপ-বৈচিত্র্যে নয় আচরণের অনন্যতার মধ্যেও ছড়িয়ে আছে, তাদের চোখ চেয়ে থাকবেই আগামী দিনের গবেষণার ফলের দিকে।

আকাশের আগন্তুক

মলয় সিকদার*

ঋগ্‌বেদের বর্ণনায় উষার আগমনে রাতের অন্ধকার তিরোহিত হওয়ার সংগে সংগে মহাশূন্যের তারকাখচিত পূর্ণ উদ্যান শূন্যতায় বিলীন হয়। রাতের বন্দনায় মুখরিত উপনিষদের ঋষি-কবিরা আকাশের তারকামালার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। শুধু যে রাতের তারকাখচিত অপরূপ আকাশ প্রাচীন কালের মানুষকেই আকর্ষণ করেছিল তা নয়, যুগ যুগ ধরে কবি, ভাবুক ও বিজ্ঞানীদের সে আকর্ষণ করেছে এবং আজও সমানভাবে আকর্ষণ করে। বিশাল আকাশের আঙিনায় যুগ যুগ ধরে চলেছে কত বিবর্তন, কত বিচিত্র উত্থান-পতন, কত আবির্ভাব-তিরোভাব ও ভাঙা-গড়ার খেলা, মানুষ তার সীমাবদ্ধতা আর ক্ষুদ্রতা নিয়ে তার কতটুকুইবা খবর রাখে?

লেনিনগ্রাডে রক্ষিত প্রাচীন প্যাপিরাস পুঁথি-পত্র থেকে জানা যায় খ্রীষ্টপূর্ব 2000 বছর আগে মিশরবাসীরা আকাশে তারকার উত্থান-পতন লক্ষ্য করেছিলেন। সমকালীন যুগের দক্ষিণ চীনের শাং (Shang) রাজবংশের শিলালিপি ও পুঁথিপত্র থেকে জানা যায় যে চীনাবাসীরা তখন আকাশে বিভিন্ন বস্তুর আগমন-প্রতিগমন লক্ষ্য করতেন। সম্ভবতঃ সম্রাট য়ান (Yan : খ্রীষ্টপূর্ব—2300) জ্যোতির্বিজ্ঞানের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পরবর্তীকালে, (Han) রাজবংশের (খ্রীষ্টপূর্ব 202) সময় থেকে চীনাবাসীরা আকাশে তারকামালা ও তার উত্থান পতন নিয়মিত ভাবে পর্যবেক্ষণ করে লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করেন। তাঁরাই পৃথিবীর আকাশে আগন্তুক ধূমকেতুকে সর্বপ্রথম 'পুচ্ছযুক্ত' (hui-hsing) ও 'পুচ্ছবিহীন' (po-hsing) দু-ভাগে ভাগ করেছিলেন আর দূর আকাশে তারকামালার দেশে ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত তারকার নাম দিয়েছিলেন 'অতিথি তারকা (ko-hsing), বর্তমানে যাদের বলা হয় নোভা ও সুপার-নোভা।

ভারতবর্ষও প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চায় পিছিয়ে ছিল না—সূর্য সিদ্ধান্ত, জ্যোতিষ সংহিতা, বেদাঙ্গজ্যোতিষ ও তৈত্তিরীয় সংহিতা সে যুগেই লিখিত। তাছাড়া আর্যভট্টের (440 খ্রীষ্টাব্দ) 'গীতিকাপদ', বরাহমিহিরের (600 খ্রীষ্টাব্দে) 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' এবং ভাস্করাচার্যের (1000 খ্রীষ্টাব্দ) 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' পরবর্তীকালের ভারতবর্ষের অতি উন্নতমানের জ্যোতির্বিদ্যাচর্চার পরিচয় বহন করে।

*পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া

ধ্রুব'র পাণ্ডিত্য ও প্রশান্তিকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য ভারতীয় জ্যোতিবিজ্ঞানীরাই উত্তর আকাশের স্থির তারাটির নামকরণ করেছিলেন ধ্রুবতারা বলে। নানা নক্ষত্রের 'সপ্তর্ষিমণ্ডল', 'কাশ্যপ', ও 'অনুসূয়া' প্রভৃতি নামকরণ তাঁরাই করেছিলেন তৎকালীন যুগের জ্ঞানীগুণীকে অমর করে রাখার জন্য।

আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, ও রাশিচক্র বিভাগে প্রাচীন ভারতীয়রা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও, আকাশে তারার আগমন-প্রতিগমন কিংবা আবির্ভাব-তিরোভাবের প্রতি তাঁরা কিন্তু তেমন নজর দেন নি (বা এখন পর্যন্ত তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি)। তবে প্রাচীন মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য কিংবা অন্যান্য পুরাণে, দুর্যোধন প্রভৃতি বিপথগামী ক্ষমতাশালী পুরুষের জন্মকালে কিংবা বড় বড় রাজত্বের পতনকালে আকাশের ধূমকেতু কিংবা অন্যান্য অশুভ তারার আবির্ভাবের কথা উল্লেখ আছে, অনেক ক্ষেত্রেই।

আধুনিক কালে, আকাশের আগন্তুকের বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা আরম্ভ হয় টাইকো ব্রা (Tycho-Brahe, 1572) এবং তার শিষ্য কেপ্‌লারের বিজ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে। 1572 সনে ক্যাসিওপিয়া অঞ্চলে একটা নতুন তারার আবির্ভাব ঘটল (অর্থাৎ বিস্ফোরণ ঘটে) ; এই তারা, একসময়ে শুক্রের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং দিনের বেলায়ও আকাশে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। জ্যোতিবিজ্ঞানী টাইকো ব্রা জ্যোতির্বিদ্যাচর্চা ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু দূর আকাশের এই আগন্তুক সম্পর্কে টাইকো ব্রা তখন উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং পুনরায় জ্যোতিবিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ করেন। তাঁরই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় তাঁর ছাত্র কেপ্‌লার সূর্যের চারপাশে গ্রহদের ঘোরবার নিয়ম আবিষ্কার করেন—আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় আধুনিক জ্যোতিবিজ্ঞানের জয়যাত্রার ইতিহাস।

পৃথিবী ও দূর আকাশের আগন্তুকদের সাধারণতঃ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : 1. ধূমকেতু (comet), উল্কা (meteors), উল্কাপিণ্ড ও ভূপতিত উল্কাপিণ্ড (meteorite), ফায়ার বল (fire ball), উল্কাবৃষ্টি (meteors showers) 2. নোভা (nova) ও সুপারনোভা (supernova).

ধূমকেতু : ধূমকেতুকে যখন আকাশে প্রথম দেখা যায় তখন অনেকটা ধোঁয়াশাচ্ছন্ন উজ্জ্বল তারার মত মনে হয় আর এই ধোঁয়ার আবরণ থেকেই নামকরণ করা হয়েছে ধূমকেতু। ইংরেজীতে 'কমেট' (comet) কথাটাও অর্থবহ কারণ ল্যাটিন শব্দ কোমা (coma) র অর্থ চুল আর ধূমকেতুর মাথার চারপাশে ধোঁয়ার আবরণকে চুল কল্পনা করে পাশ্চাত্ত্য জগতে এর নামকরণ করা হয়েছে 'কমেট'।

ধূমকেতুকে সাধারণত দু-ভাগে ভাগ করা হয় যথা পর্যাবৃত্ত (periodic) অ-পর্যাবৃত্ত (non-periodic) রূপে। যে সব ধূমকেতু নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পর পর আকাশে আবির্ভূত হয় বহুকাল ধরে, তাদের
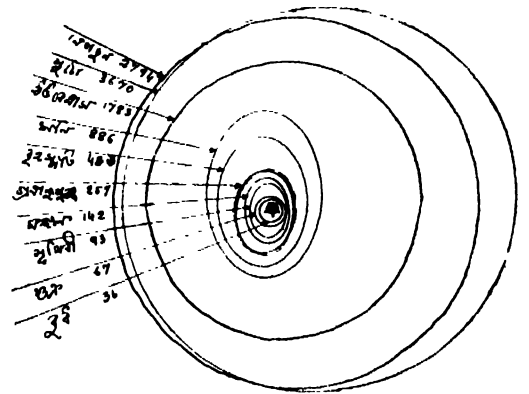
আমাদের সৌর জগত এবং সূর্য থেকে বিভিন্ন গ্রহের দূরত্ব মিলিয়ন মাইলে।

বলা হয় 'পর্যাবৃত্ত ধূমকেতু' এবং উপবৃত্তাকার (elliptical) পথে এই সকল ধূমকেতুর পরিভ্রমণ কাল সোয়া তিন বছর থেকে এক হাজার বছর পর্যন্ত হতে পারে। এই সকল পর্যাবৃত্ত ধূমকেতুর মধ্যে 'হ্যালীর

ধূমকেতু' (Halley's comet) বিখ্যাত। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর বন্ধু হ্যালী পুরানো ইতিহাস ঘেঁটে যত ধূমকেতু জানা ছিল তাদের গতিপথ নির্ণয় করতে থাকেন এবং 1682 সনের ধূমকেতুর গতিপথের সঙ্গে 1531 ও 1607 সনের গতিপথের সাদৃশ্য দেখে বলেন যে এগুলি একই ধূমকেতু এবং 1758 সনে আবার দেখা যাবে। পরে যখন 1758 সনের 25শে ডিসেম্বর আবার এই ধূমকেতু আকাশে দেখা গেল তখন হ্যালীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হলো এবং এই ধূমকেতুকে 'হ্যালীর ধূমকেতু' হিসাবে নামকরণ করা হলো। 75 বছর পরিভ্রমণ কালযুক্ত এই ধূমকেতুকে আকাশে পরবর্তীকালে বহুবার দেখা গেছে এবং 1985 সনেও আবার দেখা যাবে। তেমনি আরেকটি বিখ্যাত 6 বছর পরিভ্রমণ কালযুক্ত পর্যাবৃত্ত ধূমকেতু—'দা-এরেষ্ট'কে 1982 সনে আবার আকাশে দেখা যাবে। যে সকল ধূমকেতুর পরিভ্রমণ কাল অত্যন্ত বেশী এবং অন্যান্য গ্রহের আকর্ষণে গতিপথ উপবৃত্ত থেকে পরাবৃত্তে পরিবর্তিত হয়েছে তাদের বলা হয় অ-পর্যাবৃত্ত ধূমকেতু। প্রতিবছরই পৃথিবীর আকাশে অসংখ্য ধূমকেতু আবির্ভূত হয়, তাদের বেশীর ভাগকেই খালি চোখে দেখা যায় না—1978 সনের শেষের দিকে এইরূপ 6টি ধূমকেতু, পর্যবেক্ষণ করা গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে।

ধূমকেতুর লেজের পরিবর্তন প্রাচীন কাল থেকে মানুষকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে আসছে—সূর্য থেকে যখন অনেক দূরে থাকে তখন এদের লেজ প্রায় থাকেই না এবং যতই সূর্যের নিকটবর্তী হতে থাকে ততই সূর্যের বিপরীত দিকে এই লেজ জন্মায় ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। যখন সূর্যের সবচেয়ে নিকটে আসে, তখন লেজও সবচেয়ে লম্বা হয় এবং যতই সূর্য থেকে দূরে চলে যেতে থাকে ততই সূর্যের বিপরীত দিকে লেজটি ছোট হতে হতে মিলিয়ে যায়। এই লেজের দৈর্ঘ্য 18 হাজার মাইল থেকে 20 কোটি মাইল পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। 1910 সনে হ্যালীর ধূমকেতুর লেজের মধ্যে পৃথিবী পড়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা অনেক আগে খবরটা পৃথিবীর মানুষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, আর সারা পৃথিবীর মানুষ রুদ্ধশ্বাসে ও বিজ্ঞানীরা নানা ধরণের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন সে মুহূর্তের;

পর্যাবৃত্ত ধূমকেতু 'দা এরেষ্ট'-এর (D-arrest) গতিপথ

আবির্ভাবের বৎসর	সূর্যের নিকটবর্তী বিন্দু অতিক্রমের সময়	সূর্য থেকে কক্ষপথের নিকটবর্তী বিন্দুর দূরত্ব (জ্যোতির্বিদ্যা একক)
18·51	জুলাই 9·2	1·17
18·57	নভেম্বর 28·7	1·17
......	......	......
1970	মে 18·4	1·17
1976	অগাস্ট 12·9	1·17
1982	সেপ্টেম্বর 14·1	1·19

1978-এর শেষের দিকে দক্ষিণ গোলার্ধে আবির্ভূত ধূমকেতু সকল

নাম	পর্যবেক্ষণের সময়	উজ্জ্বলতা পরিমাপক সূচক	প্রকৃতি ও মন্তব্য
পি / কমাস সোলা, (P/ Comas Sola, 1977n)	সেপ্টেম্বর 1978-এর শেষের দিকে	13·0	পর্যাবৃত্ত ধূমকেতু (8.9 বৎসর পরিভ্রমণ কাল)
পি / সয়্যাসম্যান—ওয়াচম্যান (P/ Schwassmann —wachmann)	সেপ্টেম্বর 1978-এর শেষের দিকে	18·0	জাপান থেকে প্রথম লক্ষ্য করা হয়
পি / অ্যাসব্রুক—জেক্‌সন (P/ Ashbrook —Jackson)	সেপ্টেম্বর—অক্টোবর	14·0	আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে লক্ষ্য করা হয়
মেইয়ার (Meier, 1978)	নভেম্বর 1978	6·0	অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রথম লক্ষ্য করা হয়
পি / হেনেডা-কেমপোস্ (P/ Haneda-Campos 1978)	সেপ্টেম্বর 1978-এর প্রথম দিকে	10·2	অ-স্থিতিশীল ধূমকেতু আর আবির্ভূত নাও হতে পারে
ম্যাছ্‌ল (Machholz 19781)	সেপ্টেম্বর	10·6	আমেরিকা থেকে প্রথম লক্ষ্য করা হয়
সীয়ার জেন্ট্ (Seargent, 1978n)	অক্টোবর 1978	6·4	
পি / ডেন্নিং-ফুজিকওয়া (P/ Denning —Fujikawa)	অক্টোবর 1978	11·0	জাপান থেকে লক্ষ্য করা হয়

কিন্তু সেই ভীতিপ্রদ মুহূর্তে যখন এলো, তখন কোন পরিবর্তনই লক্ষ্য করা গেল না—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপ, তাপ ও ঘনত্ব যা ছিল তাই রইল। ধূমকেতুর লেজ ধূলিকণা ও হালকা গ্যাসীয় পদার্থের দ্বারা গঠিত আর এই হাল্কা গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব আমাদের ভূ-পৃষ্ঠের বাতাসের ঘনত্বের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে প্রায় শূন্য আর এই জন্যই ধূমকেতুর লেজের মধ্যে পড়ে গিয়েও পৃথিবীর কোন পরিবর্তন হয় নি। বর্ণালী বিশ্লেষণ করে জানা গেছে ধূমকেতুতে জল (H_2O), মিথেন (CH_4) অ্যামোনিয়া (NH_3) প্রভৃতি যৌগ এবং আয়রন, নিকেল. ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, সিলিকন ও সোডিয়াম প্রভৃতি ধাতব পদার্থ বিদ্যমান। ধূমকেতু যতই সূর্যের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে ততই কঠিন অ্যামোনিয়া, মিথেন ও জল গলতে আরম্ভ করে এবং শেষে বায়বীয় পদার্থে পরিণত হয় এবং আরও সূর্যের নিকটবর্তী হলে নানান ধরণের মূলক (যথা $-OH$, $\equiv CH$, $-NH_2$, $=NH$, $-CN$) তৈরি হয় এবং ধাতব পদার্থের খানিকটা ও গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হতে থাকে। সূর্যের তাপ ও আলো প্রভৃতি বিকিরণের চাপ ধূমকেতুর মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করায় এই সকল বায়বীয় পদার্থ অর্থাৎ লেজটি সব সময় সূর্যের বিপরীত দিকে মুখ করে থাকে। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে সূর্যের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ধূমকেতু তার ভরের $\frac{1}{200}$ অংশ গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত করে। এইভাবে অনেকবার আবর্তনের পর ধূমকেতু ভেঙে গিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায় কিংবা গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে মহাশূন্যে চিরকালের জন্যে হারিয়ে যায়। ধূমকেতুর মাথায় কঠিন বস্তু থাকে এবং তার ব্যাস সাধারণতঃ কয়েক মাইলের বেশী হয় না। কোন কোন ধূমকেতুর আবার একাধিক লেজ থাকে 1744 সনের ধূমকেতু থেকে ছয়টি লেজ বেরিয়ে একটি সুন্দর পেখমের মত তৈরি করেছিল।

ধূমকেতু সৃষ্টি সম্পর্কে নানান মতবাদ প্রচলিত আছে—কেউ কেউ বলেন ধূমকেতু সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা পদার্থ মাত্র, আবার কেউ কেউ বলেন গ্রহের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি।

উল্কা : রাতের আকাশের দিকে তাকালে মাঝে মাঝে দেখা যায় ছোট একটি কিংবা একাধিক উজ্জ্বল বস্তু আকাশের এপাশ থেকে ওপাশে দ্রুত চলে গেল কিংবা যেতে যেতেই নিঃশেষিত হয়ে গেল—এগুলিকে উল্কা বলা হয়, এগুলি মূলতঃ নানা ধাতব পদার্থ যথা, নিকেল, লোহা প্রভৃতি দিয়ে তৈরী। উল্কা প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে বলে বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় এবং তাতেই অধিকাংশ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

উল্কা আবার দু-ধরণের হতে পারে এক সৌর জগতে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘূর্ণ্যমান বস্তুখণ্ড; সাধারণত তাদের গতিপথ উপবৃত্তাকার হয়ে থাকে এবং ধূমকেতু কিম্বা ছোট ছোট গ্রহের ধ্বংসাবশেষ বা সৌর বিস্ফোরণের ফলে সৌর বক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত বস্তুখণ্ড বা গ্রহাণুপুঞ্জ থেকে বিচ্যুত বস্তু থেকে এই সব উল্কা সৃষ্টি হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, বহির্জগত থেকে আগত উল্কারাশি; সাধারণত তাদের গতিপথ পরাবৃত্ত হয়ে থাকে। এই ধরণের কোন উল্কার গতিপথকে যদি আকাশের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে তা আকাশে যে তারকামণ্ডলীকে ছেদ করে সেই তারকামণ্ডলীকে উক্ত উল্কার 'বিক্ষেপণ স্থান' বলা হয় এবং সেই তারকামণ্ডলীর নাম অনুসারেই উল্কার নামকরণ করা হয়। 1799, 1833, ও 1866 সনে যে উল্কারাশি আকাশে দেখা গিয়েছিল তারা সিংহরাশি থেকে উদ্ভূত।

বহির্জগত থেকে এমনি কোটি কোটি উল্কা বা উল্কাঝাঁক প্রতিনিয়তই আমাদের সৌরজগতে প্রবেশ করছে—তাদের অনেকেই আবার আমাদের পৃথিবীর আকাশে হানা দেয় কিন্তু বায়ুমণ্ডলের পুরু আস্তরণের মধ্যেই বেশীর ভাগ পুড়ে ছাই হয়ে যায়—পৃথিবীতে নেমে আসে দু-একটি মাত্র। প্রাচীন কাল

থেকে এই ধরণের অনেক উল্কাপাতের ঘটনা জানা আছে।

সাইবেরিয়ার উল্কাপাত একটি বিশেষ স্মরণীয় উল্কাপাত। সাইবেরিয়ার বনভূমির মধ্যে তুঙ্গুসকা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে 1908 সনের 30 জুন ও 1 এবং 2রা জুলাই যে উল্কাপাত ঘটেছিল তার ফলে কয়েক শত বর্গমাইল জায়গা একেবারে ধ্বংসস্তূপের পরিণত হয়েছিল। এই উল্কাপাতে যে অগ্নিশিখার সৃষ্টি হয়েছিল তা ভরা দুপুরের সূর্যের আলোকেও ম্লান ক'রে দিয়েছিল, আকাশে যে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতার সৃষ্টি হয়েছিল তা সারা ইউরোপে প্রায় দু-মাস স্থায়ী হয়েছিল, যে তাপ উৎপন্ন হয়েছিল তাতে 40/50 মাইল দূরের ধাতু পর্যন্ত গলে যায় এবং ঘটনাস্থল থেকে 60 কিলোমিটার দূরবর্তী ভেনোভারা গ্রামের অধিবাসী সেমিয়নোভ ও কোসোলাপভের মনে হয়েছিল সারা গায়ের জামাকাপড়ে আগুন ধরে গেছে এবং কানে এত তাপ অনুভূত হচ্ছিল যে দু-হাতে কান বন্ধ করে রাখতে হয়। তাছাড়া এই বিস্ফোরণের প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত ধরণের; কারণ কোথাও কোথাও পোড়া গাছগুলি সোজা দাঁড়িয়ে ছিল আর কোথাও কোথাও বিস্ফোরণ কেন্দ্রের বিপরীত দিকে মুখ করে পড়েছিল। সবচেয়ে বিচিত্র বিস্ময় এই যে, এই বিস্ফোরণ তথা পতনের ফলে কোন খাদ তৈরী কিংবা উল্কাপিণ্ডের কোন ক্ষুদ্রতম কণাও পাওয়া যায় নি। তবে এই বিস্ফোরণের ফলে, সেই অঞ্চলে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল, ভূ-চুম্বকের খানিকটা পরিবর্তনও ধরা পড়েছিল এবং সেই অঞ্চলের কোন কোন জায়গায় গাছের তেজস্ক্রিয় কার্বনের পরিমাণ শতকরা সাত ভাগ বেড়ে গিয়েছিল পরবর্তী কালে। 1927 সন থেকে রাশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে বহু বিজ্ঞানী ও অভিযাত্রীদল এই স্থানে গিয়েছেন বহুবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য। কেউ কেউ বলেছেন গ্রহান্তরের মানুষেরা পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ভূপৃষ্ঠের পাঁচ মাইল উপরে, কেউ কেউ বলেছেন ছায়াপথ থেকে আগত প্রতিপদার্থের (anti-matter) জন্যই এই ধরণের বিস্ফোরণ ঘটেছে, তবে বেশীর ভাগ বিজ্ঞানী মনে করেন প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন বিশাল উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার ফলে এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে।

যে সকল উল্কা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় তাদের বলা হয় উল্কাপিণ্ড (meteorite)। নিউইয়র্কের হাইডেন প্ল্যানেটরিয়ামে এই ধরণের উল্কাপিণ্ড সংগ্রহ করে রাখা আছে। 1975 সনের 4 মার্চের সকাল বেলায় পূর্ব নিউগিনির পাপুয়া অঞ্চলের কফিবাগানে 7·33 কে জি. ওজন এবং 3·66 গ্রাম/সি. সি. ঘনত্বযুক্ত একটা উল্কাপিণ্ড পতিত হয়েছিল। কফি শ্রমিক টভোবুকা 25 কিলোমিটার দূর থেকে ঘটনাটি লক্ষ্য করেছিল; তার বর্ণনা—হেলিকপ্টার কিংবা এরোপ্লেনের ভাঙ্গা ইনজিনের মত শব্দ করে, কুণ্ডলাকৃতি ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে এই উল্কাপিণ্ড।

আরেক ধরণের বিচিত্র উল্কার নাম দেয়া হয়েছে 'ফায়ার বল'। যে সকল উল্কার আলো পূর্ণিমার চাঁদের আলোর চেয়েও বেশী বা দিনের আলোতেও দেখা যায় তাদের ফায়ার বল বলা হয়। এই ধরণের ফায়ার বল গত কয়েক শতাব্দী ধরে বহুবার লক্ষ্য করা গেছে। 1975 সনের 25 ও 26শে এপ্রিল ইউরোপে পূর্ণ চাঁদের চেয়ে উজ্জ্বল এই রকম দুটি ফায়ার বল দেখা গেছে। প্রথমটি দেখা যায় সুইজারল্যাণ্ডে 25শে এপ্রিল রাত 8টায়; এটি উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে নেদারল্যাণ্ডের পঁচিশ কিলোমিটার উচ্চতায় বিস্ফোরিত হয় সবুজ ও কমলা রঙের আলোর ক্ষণিক আভা বিস্তার করে। ইউরোপের হাজার হাজার মানুষ এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিভিন্ন জায়গা থেকে। উল্কাপাতের ফলে অনেক সময় জ্বালামুখের সৃষ্টি হয়—এর মধ্যে উত্তর আমেরিকার এরিজোনা জ্বালামুখ বিখ্যাত।

উল্কার উৎপত্তি সম্পর্কে যে সব মতবাদ প্রচলিত আছে তার মধ্যে একটি—তারা, গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতুর ধ্বংসাবশেষ কিংবা গ্রহাণুপুঞ্জ থেকে বিক্ষিপ্ত ধাতব পিণ্ড ছাড়া উল্কা আর কিছুই নয়। দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে, নীহারিকার পাতলা হাইড্রোজেন গ্যাসের স্তর বিবর্তনের ধারায় যখন জমাট বেঁধে সূর্য প্রভৃতি বড় বড় তারার জন্ম দিচ্ছিল তখন মহাবিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় জমাট বেঁধে এই সকল উল্কাপিণ্ড আগাছার ন্যায় যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে পড়ে। এই সকল উল্কাপিণ্ড বিজ্ঞানীদের কাছে খুব মূল্যবান, কারণ এদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মহাবিশ্বের বিভিন্ন জায়গার গঠন সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

শরৎকালীন আকাশের তারামণ্ডলে ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্র অঞ্চল যেখানে টাইকোর সুপারনোভা আবির্ভূত হয়েছিল

নোভা, সুপারনোভা : রাতে দূর আকাশে তারকামালার গায়ে মাঝে মাঝে এক একটি ছোট তারা ঝলসে উঠে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ম্লান হতে হতেই মহাকাশের অন্ধকারে চিরতরে হারিয়ে যায়। বহুকাল আগে থেকে চীনারা এই সব আবির্ভাব-তিরোভাব আকাশের গায়ে লক্ষ্য করেছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় দূর আকাশের গায়ে বুঝি কোন নতুন তারার আগমন ঘটলো, আসলে কিন্তু তা নয়। সেই তারা আগে যেখানে ছিল পরেও সেখানে থাকে—শুধু বিবর্তনের ধারায় ঘটে বিশাল বিস্ফোরণ, ফলে মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হয় প্রচুর আলো, তাপ এবং বিপুল গ্যাসীয় পদার্থের আবরণ আর জন্ম নেয় নব নব গ্রহ উপগ্রহ,

ধূমকেতু ও উল্কারাশি আর পাল্‌সার, কোয়াসার ও বেতার-উৎস। মহাকাশের গায়ে এমন একটি বিস্ফোরণই বিখ্যাত বিজ্ঞানী টাইকো ব্রা-কে আকৃষ্ট করেছিল পুনরায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চার দিকে। এই ধরণের বিস্ফোরণ যে শুধু আমাদের ছায়াপথে ঘটে তা নয়, বহুদূরের ছায়াপথ এবং বহির্বিশ্বের গ্যালাক্সিতে ঘটেছে বহুবার এবং এখনও ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। এই সকল বিস্ফোরণের ফলে যেখানে কম তাপ ও আলো নির্গত হয় এবং বিস্ফোরণের স্থায়িত্বকাল খুব কম অর্থাৎ আকাশে কম দিন ধরে লক্ষ্য করা যায় তাদের 'নোভা' (Nova) বলা হয়। বিবর্তনের ধারায় যখন কোন তারা শ্বেতবামনে (white dwarf) পরিণত হতে থাকে তখনই ঘটে এইসব বিস্ফোরণ এবং তার ফলে তার ভরের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়। বানরাশিতে (Sagitta) 1977 সনের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে এই রকম একটি বিস্ফোরণ ঘটে থাকে যাকে আকাশে দেখা যায় 7 জানুয়ারী থেকে 24 জানুয়ারী পর্যন্ত। আমাদের গ্যালাক্সিতে এই ধরণের সাধারণ নোভা লক্ষ্য করা গেছে এক শতেরও অধিক এবং একটি কিংবা দুটি করে প্রতি বছর বেড়ে যাচ্ছে। কোন তারার আবার একাধিকবার এই ধরণের বিস্ফোরণ ঘটে থাকে—যেমন ধনুরাশিতে থাকে এবং পুনরায় স্থিতিশীল হতে 20 থেকে 40 বছর পর্যন্ত লেগে যায়।

কোন কোন সময় দূর আকাশের গায়ে কোন কোন তারায় বিশাল বিস্ফোরণ ঘটে—ফলে প্রচুর গ্যাসীয় পদার্থ ও তাপ নিক্ষিপ্ত হয়, যে আলো নির্গত হয় তার পরিমাণ সূর্যের আলোর চেয়ে দশকোটি গুণ বেশী—তাতে আশেপাশের তারার আলো ম্লান হয়ে যায় ও দীর্ঘ সময় ধরে সেই আলো আকাশের গায়ে বিদ্যমান থাকে তাদের 'সুপারনোভা' (Supernova) বলা হয়। এই সকল 'সুপারনোভা'র আলো প্রথমে বাড়তে থাকে এবং সবচেয়ে উজ্জ্বল অবস্থায় উপনীত হয় এবং শেষে কমতে থাকে। এবং এই আলো কমতে থাকার প্রকৃতি অনুসারে সুপারনোভাকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়—(1) সবচেয়ে উজ্জ্বল অবস্থা থেকে উজ্জ্বলতা 100 দিনের মধ্যে দ্রুত কমতে থাকে এবং তারপর ধীরে ধীরে কমতে আরম্ভ করে; এই সকল সুপারনোভায় হাইড্রোজেন কম থাকে এবং বিস্ফোরণের ফলে সৌর ভরের চেয়ে কম কিংবা সমান ভর মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। (2) এই ধরণের বিস্ফোরণের ফলে সুপারনোভা নিজস্ব ভরের সবটাই মহাশূন্যে ছড়িয়ে দেয় এবং সবচেয়ে উজ্জ্বল অবস্থা থেকে উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখিয়েছেন প্রতি
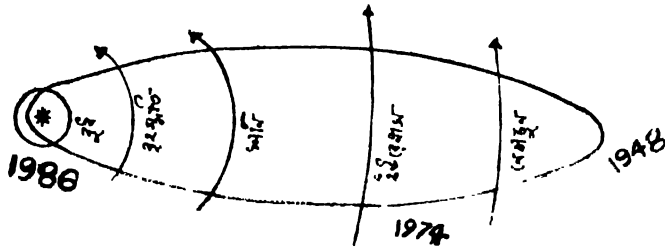
পর্যাবৃত্ত হ্যালির ধূমকেতুর গতিপথ

(Sagittarii); একই তারার 1901 সনে প্রথম এবং 1919 সনে দ্বিতীয়বার বিস্ফোরণ লক্ষ্য করা গেছে। বিস্ফোরণের পর তারা সাধারণভাবে কাঁপতে গ্যালাক্সিতে 200 থেকে 300 বছরের মধ্যে একবার এই ধরণের সুপারনোভা বিস্ফোরণ হতে পারে এবং এক একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণ মহাশূন্যের গভীর

অন্ধকারের হিমশীতলতায় জন্ম দিয়ে যেতে পারে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কারাশি, গ্রহাণুপুঞ্জ অর্থাৎ সৌর. জগতের, কিংবা নীহারিকা, পাল্সার বা বেতার-উৎসের। 1572 সনের ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্র অঞ্চলে এই ধরণের একটি বিস্ফোরণ ঘটেছিল।

আকাশের আগন্তুকের তালিকা এখনও পূর্ণ হয় নি সংযোজিত হয় নি মহাকাশের আগন্তুক গ্রহান্তরের মানব। মহাবিশ্বের অতন্দ্র গভীরতার নিঃসীম অন্ধকারের হিমশীতলতায় যেখানে বিবর্তনের ধারা মেতে উঠেছে নব নব ধ্বংস ও সৃষ্টির উৎসবে – যেখানে

গত এক হাজার বছরে আমাদের ছায়াপথে বিস্ফারিত সুপারনোভা

বিস্ফোরণের বৎসর	ছায়াপথের অঞ্চল	সুপারনোভার প্রকৃতি
1006	লুপাস (Lupus) শার্দূল	পরম উজ্জ্বলতা > 1
1054	টরাস (Taurus) বৃষরাশি	ক্র্যাব নেবুলী ও ক্র্যাব নেবুলা পালসারের জন্মদাতা
1181	ক্যাসিওপিয়া (Cassiopeia) কাশ্যপ ?	বেতার-উৎসের জন্মদাতা
1572	ক্যাসিওপিয়ার টাইকো তারকা (Tychos Star) অঞ্চল	শুক্র গ্রহের চেয়ে উজ্জ্বল ও দিনের বেলায় দৃশ্যমান
1604	অফিয়াকাস (Ophiuchus)-এর কেপলার তারকা	বৃহস্পতির মত উজ্জ্বল

প্রাচীন প্রাচ্য অর্থাৎ চীন, জাপান ইত্যাদির নথিপত্র ঘেঁটে নোভা, সুপারনোভা সংক্রান্ত যে সকল তথ্য পাওয়া গেছে তা নিম্নে দেখানো হল।

প্রাচীন প্রাচ্যের নথিপত্র থেকে সংগৃহীত নোভা, সুপারনোভা সংক্রান্ত তথ্য

বৎসর (এ. ডি)	আকাশে অবস্থানের সময়	মন্তব্য ও সম্ভাব্যতা
185	20 মাস	সুপারনোভা ?
369	5 মাস	নোভা ?
386	3 মাস	নোভা ?
393	8 মাস	সুপারনোভা ?
1006	2 বছর	সুপারনোভা
1592	3 মাস	নোভা

মহাশূন্যের জমাট বাঁধা অন্ধকার ও নৈঃশব্দ ভেদ করে রাশি রাশি উল্কা, ধূমকেতু, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, নোভা, সুপারনোভা, কোয়াসার, পাল্সার, গ্যালাক্সি, নীহারিকা, ছায়াপথ উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত, সেখানে কোথায় না কোথাও সৃষ্টি হয়েছে, হচ্ছে সৌর-জগত। মহাবিশ্বের আলো ও সেখান থেকে আগত উল্কার উপাদান পরীক্ষা করে নতুন কোন পদার্থ পাওয়া যায় নি যা আমাদের পৃথিবীতে নেই - কাজেই বলা যেতে পারে সারা বিশ্ব জুড়ে বিবর্তন চলেছে একই ধারায় আর সেই সকল সৌরজগতেও মানুষের মত বুদ্ধিমান প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো তবে তারা কেন পৃথিবীতে আসে না বা যোগাযোগ করতে পারছে না? উত্তর সহজ, মহা-বিশ্বের বিভিন্ন সৌরজগতের মধ্যে দূরত্ব কোটি কোটি

বর্ষের অর্থাৎ আলোকবর্ষের গুণিতকে অবস্থিত আর কোন সৌর জগতের অন্তর্গত গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বকাল কয়েক কোটি বছর—তাই পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের সম্ভাব্যতা (probability) খুব কম। কিন্তু সম্ভাব্যতা যতই কম হোক্ তা কিন্তু কখনই শূন্য নয় (> 0) - তাই একদিন না একদিন আকাশের আগন্তুকের তালিকায় যুক্ত হবে গ্রহ স্তরের মানব।

এখনও মহাকাশের বিভিন্ন স্থানের খবরাখবরের জন্যে নির্ভর করতে হয় উল্কা, তাপ, আলো ও অন্যান্য বিকিরণ প্রভৃতি দৃশ্যমান (observable) ফলের উপর কিন্তু আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগসম্পন্ন কোন অবজারভ্যাবল্ যদি আবিষ্কৃত হয় কোন দিন তাহলে আকাশের আগন্তুকের তালিকায় গ্রহান্তরের মানুষ যুক্ত হওয়ার সম্ভাব্যতা অনেক বেড়ে যাবে।

গ্রন্থপঞ্জী :

1. 'হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা' সুকুমাররঞ্জন দাশ
2. 'খগোল পরিচয়' মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার
3. 'Sky & Telescope' (197–—1979)
4. 'Astronomy'—Robert H. Baker
5. 'On the Track of Discovery' (Trans. from Russian by D Skvirsky & Tolomi)

গর্ভনিরোধক বড়ি— কাজ ও প্রতিক্রিয়া

দেবব্রত বসু*

বর্তমানে পৃথিবী তিনটি "পি" নিয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তিত।

(1) পোভার্টি বা দারিদ্র্য; (2) পলিউশান বা পরিবেশ দূষিতকরণ; (3) পপুলেশান বা জনসংখ্যা।

খৃষ্টপূর্ব 6000 অব্দে পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় 8 মিলিয়ন বা 80 লক্ষ ছিল আজ সেখানে দাঁড়িয়েছে 3200 মিলিয়ন বা 320 কোটি। অনুমান আগামী 2000 সালে এই লোকসংখ্যা 640 কোটিতে দাঁড়াবে। বিজ্ঞান পৃথিবীকে ক্রমবর্ধমান এই বিরাট জনসংখ্যার জন্য আর কতদিন খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি দিতে পারবে এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে।

এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় জনসংখ্যার হারকে রোধ করা। সম্প্রতি এটা স্বীকৃত যে গর্ভ নিয়ন্ত্রণ বা লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।

বর্তমানে জন্ম নিয়ন্ত্রণে যে সব পদ্ধতি প্রচলিত তার মধ্যে বহুল প্রচলিত ও ফলাফলে নিরাপদ হল জন্মনিরোধক বড়ি। বাজারে এখন যে গর্ভনিরোধক বড়ি বা কনট্রাসেপটিভ পিল পাওয়া যায় সেগুলি হল—(চার্ট 1)।

*কাটোয়া ভারতী ভবন, কাটোয়া, বর্ধমান

চার্ট—1

	প্রস্তুতকারক	এফ. এড. এ ছাড়পত্র পায়	নাম	কি আছে	
				প্রজেস্টিন	ইস্ট্রজেন
1	জি. ডি. সার্লে	জুন 1960	এনোভিড	নরএথিনোড্রেন 9.85 মি. গ্রা.	মেস্ট্রানল 0.15 মি.গ্রা.
2	„	মার্চ 1961	„	„ 5 মি. গ্রা.	„ 0.075 মি.গ্রা.
3	„	ফেব্রুয়ারী 1964	এনোভিড 'ই'	„ 2.5 „	„ 0.1 „
4	অর্থো ফার্মাসিউটিক্যাল	মে 1962	অর্থোনভাম	নরএথিনোড্রোন 10 মি. গ্রা.	„ 0.06 „
5	„	অক্টোবর 1963	„	„ 2 মি. গ্রা.	„ 0.1 „
6	সিনটেক্স	মার্চ 1964	নরিনীল্	„ 2 মি. গ্রা.	„ 0.1 „
7	পার্কডেভিস	„	নরলেসট্রিন	নরএথিনোড্রোন এসিটেট 2.5 মিগ্রা.	এথিনিল ইস্ট্রাডায়ল 0.05 মি গ্রা.
8	আপ-জন	অগাস্ট 1964	প্রোভেষ্ট	মেড্রোক্সি প্রজেস্টেরন এসিটেট 10 মি.গ্রা.	„ 0.05 „
9	জি. ডি. সার্লে	মার্চ 1966	ওভ্যুলেন	এথিনোডায়ল ডাইএসিটেট 1 মি. গ্রা.	মেস্ট্রানল 0.1 মি.গ্রা.
10	মীড জনসন	এপ্রিল 1965	ওরাসেন	ডাইমেথিষ্টেরন 25 মি. গ্রা.	এথিনিল ইস্ট্রাডায়ল 0.1 মি. গ্রা.
11	এলি-লিলি	„	সি-কোয়েন	ক্লোরোমেডিনন এসিটেট 2 মি.গ্রা.	মেস্ট্রানল 0.08 মি. গ্রা.
12	অর্থো ফার্মাসিউটিক্যাল	ডিসেম্বর 1966	অর্থোনভাম এস-কিউ	নরএথিনোড্রোন 2 মি.গ্রা.	„ 0.08 „
13	„	ফেব্রুয়ারী 1967	অর্থোনভাম-1	„ 1 মি. গ্রা.	„ 0.05 „
14	সিনটেক্স	„	নরিনীল-1	„ 1 মি. গ্রা.	„ 0.05 „

এফ. এড. এ.=ফেডারেল ড্রাগ অ্যাডমিনস্ট্রেশন (আমেরিকা)

এই পিল কিভাবে কাজ করে, তা জানবার আগে একটু দেখা যাক জন্মের রহস্যটাকে।

স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয়, ডিম্বনালী বা ফ্যালোপিয়ান টিউব, জরায়ু বা ইউটেরাস ও জন্মনালী বা যোনি প্রভৃতি হলো যৌন অঙ্গ [চিত্র-1 (ক)]।

372টি ডিম্বাণু)। এক একটি ডিম্বাণুর ব্যাস প্রায় 0·25 মি. মি.। প্রাইমরডিয়াল ফলিকল পরিণত হয়ে ডিম্বাধার বা ডিম্বগুটি বা গ্রাফিয়ান ফলিকলে পরিণত হয়। একটি নির্দিষ্ট আকারে পৌছবার পর এই ডিম্বাধারটি ফেটে যায় এবং ডিম্বাণু বেরিয়ে আসে।

চিত্র-1 (ক)

1 (খ)
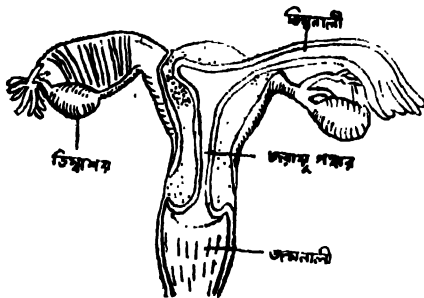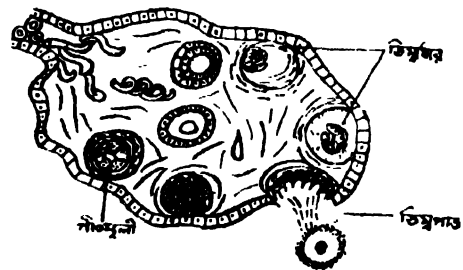
ডিম্বাশয়ের দ্বৈত ভূমিকা—(1) গ্যামেট বা ডিম্বাণু বা ওভাম উৎপাদন এবং (2) হরমোন উৎপাদন ও ক্ষরণ। ডিম্বাশয় দুটির আকৃতি বাদামের মত, আয়তন 3·5×2×1·4 ঘন সে.মি. এবং ওজন 4-8 গ্রাম। অল্প বয়সী বালিকাদের ডিম্বাশয়ে প্রায় 100,000—300,000 প্রাইমরডিয়াল ফলিকল (যা থেকে পরিণত

এই পদ্ধতিকে ডিম্বপাত বা ওভিউলেশন বলে [চিত্র 1 (খ)]। অগ্র পিটিউটারির ফলিকল ষ্টিমুলেটিং হরমোন বা এফ. এস. এইচ ডিম্বপাতকে নিয়ন্ত্রণ করে। ডিম্বাণু বেরিয়ে যাবার পর ডিম্বাধারটি পীতগ্রন্থি বা করপাস লিউটিয়ামে পরিণত হয়। এখানে অগ্র পিটিউটারির লিউটেনাইজিং হরমোন বা এল. এইচ

চিত্র-2
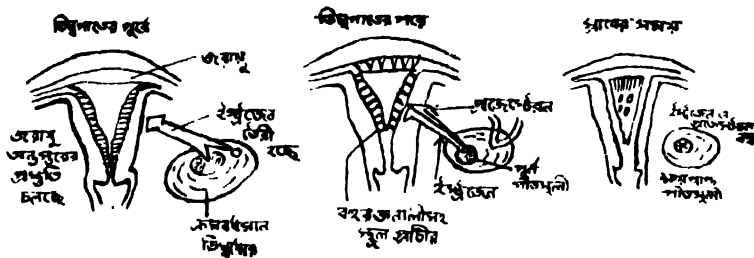
ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়) থাকে। কিন্তু একজন স্ত্রীলোকের পুরো যৌনজীবনে মাত্র 300-400 পরিণত ডিম্বাণু তৈরি হয় (যৌন জীবন 14-45 বা 31 বছর ধরলে, প্রতিমাসে 1টি করে বছরে 12টি অর্থাৎ 31×12=

কাজ করে। প্রায় 28 দিন অন্তর এই ডিম্বপাত ঘটে। মুক্ত ডিম্বাণু অতঃপর ডিম্বনালীতে প্রবেশ করে এবং তার তিন-চার দিন পর জরায়ুতে পৌছায়। ডিম্বনালীতেই সাধারণতঃ নিষিক্তকরণ সংঘটিত হয়।

যদি এটা ঘটে এবং যাতে ঐ নিষিক্ত ডিম্বাণু রাজকীয় মর্যাদা পায় তার প্রস্তুতিপর্ব চলে জরায়ুতে এই ভাবে (চিত্র 2)—

(1) ডিম্বাশয়ের ডিম্বাধার ডিম্বপাতের পূর্বে ইস্ট্রজেন ক্ষরণ করে। এই হরমোন জরায়ুর অন্তস্তরে প্রস্তুতিপর্ব চালায়। ঐ স্তরের বৃদ্ধি ঘটিয়ে ওর গাত্র একটু নরম করে দেয়।

(2) ডিম্বপাতের পর পীতগ্রন্থি ইস্ট্রজেন ও প্রজেস্টেরন হরমোন ক্ষরণ করে। এই দুটি হরমোন অগ্র পিটিউটারির এফ. এস এইচ ও এল. এইচ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রজেস্টেরনকে কেউ কেউ অন্তঃসত্ত্বার হরমোনও বলেন। এই দুই হরমোন একত্রে জরায়ুর অন্তঃস্তরকে স্থূল করে এর গ্রন্থিগুলি ও স্তনের বৃদ্ধি উদ্দীপ্ত করে, এবং জরায়ুর পেশীযুক্ত প্রাচীরের সংকোচন রোধ করে। এই হরমোন জরায়ুর অন্তঃস্তরে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে নিষিক্ত ডিম্বাণুর অপেক্ষা করে। এখানে উল্লেখ্য যে যদিও ইস্ট্রজেন ও প্রজেস্টেরন এফ. এস. এইচ ও এল. এইচ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তবু প্রথমোক্ত হরমোন দুটি যখন কাজ করে তখন শেষোক্ত হরমোন দুটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

যদি ডিম্বাণু নিষিক্ত না হয় তা হলে পীতগ্রন্থি ক্ষয় পেতে থাকে এবং জরায়ুর ভেতর সেই প্রস্তুতিপর্ব বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় জরায়ুর অন্তঃস্তরের রক্তনালীগুলির প্রচণ্ড অনৈচ্ছিক আক্ষেপের ফলে অন্তঃস্তরের কোষগুলি প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অক্সিজেন পায় না। ফলে কোষগুলি বেঁচে থাকতে পারে না এবং অন্তঃস্তরের স্থূল অংশটি বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু পরিমাণ রক্ত এবং সেই অনিষিক্ত ডিম্বাণুসমেত জন্মনালী দিয়ে বেরিয়ে যায়। একে মাসিক স্রাব বা রজঃস্রাব বা মেনস্ট্রুয়েশন বলে। এইজন্য কেউ কেউ মাসিক স্রাবকে "অনিষিক্ত ডিম্বাণুর শোকযাত্রা" বা "নিহত ডিম্বাণুর জন্য জরায়ুর ক্রন্দন" নামে অভিহিত করেছেন।

পিল কিভাবে কাজ করে—সাধারণতঃ গর্ভ নিরোধক পিল সিউডোপ্রেগন্যান্সি বা 'নকল গর্ভাবস্থা' সৃষ্টি করে। গর্ভবস্থায় কোন ডিম্বাণু তৈরি হয় না সুতরাং তখন কোন নতুন ডিম্বাণু পাওয়া যায় না বলে নিষিক্ত হয়ে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে না। সিন্থেটিক কৃত্রিম ইস্ট্রজেন ও প্রজেস্ট্েরন দিয়ে তৈরী পিলগুলি সাধারণতঃ তিনভাবে কাজ করে—

প্রথমতঃ, এগুলি ডিম্বপাত বন্ধ করে। পিলগুলি অগ্র পিটিউটারির এফ. এস. এইচ ও এল. এইচের ক্রিয়া বন্ধ করে এ কাজ করে।

দ্বিতীয়ত : সারভাইকাল মিউকাস শুক্রাণুর পক্ষে অভেদ্য করে তোলে। পিলের প্রভাবে স্বাভাবিক, তরল, জলবৎ থেকে অঞ্চলটি অস্বাভাবিক, ঘন ও থকথকে হয়ে পড়ায় শুক্রাণুর পক্ষে প্রবেশ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত : পিলগুলি জরায়ুর অন্তঃস্তরকে নিষিক্ত ডিম্বাণুর পক্ষে বাসের অযোগ্য করে তোলে।

সাতটি কৃত্রিম প্রজেস্টেরন ও দুটি কৃত্রিম ইস্ট্রজেন সাধারণতঃ বিভিন্ন অনুপাতে পিল তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম ব্যবহার করার কারণ এগুলি প্রকৃতিক প্রজেস্টরন ইস্ট্রজেন থেকে অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন।

ফলাফল—পিল আজ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত জন্মনিরোধক হাতিয়ার। প্রায় 14,000,000 নারী আজ এই পিল ব্যবহার করেন।

পিল ব্যবহারের বিরূপ প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করা গেছে। যেমন অনিয়ত রজঃস্রাব, ওজনবৃদ্ধি, পেটের গোলমাল, অ্যাকনি, হৃদপিণ্ডের ব্যাধি, এবং কখনও গর্ভকালীন লক্ষণও দেখা যায় যথা—স্তনের আকার বৃদ্ধি, অস্বাচ্ছন্দ্য, মাথাধরা, নিদ্রাভাব ইডিমা, ক্লোআসমা (গর্ভবতীমায়ের ঘাড়ে ও মুখে হলুদ ছাপ বা দাগ)। অবশ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই লক্ষণগুলি পিলের নিয়মিত ব্যবহারের ফলে কমে যায়। ইস্ট্রজেন দ্বারা পেটের গোলমালের খবর পাওয়া গেছে। তবে নিয়মিত ব্যবহারের ফলে মাসিক স্রাব নিয়মিত ও বেদনাশূন্য হয়।

আজকাল বহুল ব্যবহৃত একটি পিল প্রতিদিন 10 মিলিগ্রামের বদলে 2 মিলিগ্রাম ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে। পিলটির নাম নরএথিনোড্রোন।

পিল ব্যবহারের ফলে ক্যান্সার রক্তকণিকার সংখ্যা হ্রাস বা ক্যানসার পূর্ববর্তী কোন রোগের খবর পাওয়া যায় নি। কিন্তু পিল, যদিও দুর্লভ তবুও জনডিসের কারণ হতে পারে।

পিলের ব্যবহার বন্ধ করলে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া থাকে না। নারী আবার তার যৌনজীবনে ফিরে যেতে পারে। তবে যৌন-ইচ্ছা (ওরগাসাম) বাড়তে বা কমতে পারে, এটা পিলের প্রভাব কিনা বলা মুস্কিল। পুরুষের ব্যবহার করার জন্য পিলের খবর আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। তবে, বাজারে পেতে হলে, আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্ট

হরিসাধন ঘোষ*

বর্তমান কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের কৃষকদের নিকট সারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুপাতে যোগানের পরিমাণ কম ও রাসায়নিক সার অগ্নিমূল্য হওয়ায় তাদের কাছে একটা বেদনাদায়ক অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে, প্রথম প্রথম রাসায়নিক সার প্রয়োগে প্রচণ্ড দ্রুত ফসলের বৃদ্ধি হত কিন্তু তার মাটির উপর অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া অম্ল (acid) উৎপন্ন হওয়ার ফলে কিছুদিন পর অনেক বেশী পরিমাণে সার প্রয়োগ করার পরও কোন ফল লক্ষণীয় হয় না, মাটি অপেক্ষাকৃত শক্ত অবস্থা ধারণ করে। এইভাবে দিনের পর দিন মৃত্তিকা সম্পূর্ণরূপে ক্ষার (alkali) রিক্ত হওয়ায় ফসল উৎপাদনে অক্ষম হয়ে পড়ছে। কিন্তু বসুন্ধরা কখনই মৃত নয়, এতে সর্বদাই জীবনের অস্তিত্বের সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায়—আমাদের অপপ্রয়োগের ফলেই এই শোচনীয় অবনতির সম্মুখীন হয়েছি।

রাসায়নিক সারসমূহ নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যাক্টেরিয়াকে বাড়তে সাহায্য করে ও অন্যান্য ব্যাক্টেরিয়ার ধ্বংসসাধন করে, ফলে, মৃত্তিকার সমতা রক্ষিত হয় না, ও মৃত্তিকার গঠন পাল্টে যায়। কিন্তু জৈব সারসমূহ মৃত্তিকার সাথে কোন ক্ষতিকর বিক্রিয়া করে না, যাতে অম্ল কিংবা ক্ষারের মাত্রার বৃদ্ধি ঘটে ফসলের ক্ষতিসাধন করে। অজৈব সার শুধুমাত্র নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও পটাস দেয় কিন্তু ফসলের পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত মৃত্তিকার অভ্যন্তরে আরো অনেক পদার্থের প্রয়োজন হয়। তাদের অনুপস্থিতিতে গাছপালা সঠিকভাবে বাড়তে পারে না। কিন্তু জৈব সারের ক্ষেত্রে এই সকল অজৈব পদার্থ দিতে সক্ষম থাকায় ফসলের পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধনে সক্ষম হয়। তাছাড়া জৈব সার হর্মোন (hormone), এন্‌জাইম (enzyme) ও অন্যান্য ব্যাক্টেরিয়ার পুষ্টিকর পদার্থ, যেমন—obscure elements দিতেও সক্ষম হয়।

প্রত্যহ বৃহৎ আকারের মহিষ থেকে 20 কেজি, প্রতি সাধারণ মহিষ থেকে 15 কেজি, প্রতি গরু থেকে 10 কেজি ও প্রতি বাছুর থেকে 5 কেজি গোবর পাওয়া যায়। পরিসংখ্যান হিসাবে দেখা গেছে ভারতের পাচ লক্ষ

*দিগপাড়, বাঁকুড়া

গ্রামেই 2080 লক্ষ গরু রয়েছে। তাহলে সকলেরই মনে প্রশ্ন জাগে যদি বিশ্বের গবাদিপশুর এক-পঞ্চমাংশ ভারতেই অবস্থিত তবে এখানে কেন জৈব গোবর সার প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল? কারণটা সহজেই অনুমেয়। এখানে গোময়ও গোমূত্র অপব্যবহৃত হচ্ছে। এখন ভারতে 9800 লক্ষ টন গোময় উৎপন্ন হয় কিন্তু তার 30% জ্বালানীর কাজে ঘুঁটের আকারে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়। যদি এই পরিমাণ গোবর, গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্টের জন্য ব্যবহৃত হয় তবে 1140 লক্ষ টন জৈব সার বৃদ্ধি পাবে। ভারতে 44 লক্ষ হেক্টর কৃষিক্ষেত্রের নিমিত্ত হেক্টর প্রতি 25 লক্ষ টন গোবর সার হিসাবে ব্যবহারই যথেষ্ট। এছাড়াও এর থেকে 11240 লক্ষ ঘন-মিটার গ্যাস পাওয়া যাবে যা পল্লীতে 271·1 লক্ষ পরিবারের রান্নার জ্বালানীর পক্ষে যথেষ্ট। এই পরিমাণ অংশের সমস্তটাই আমরা ঘুঁটের আকারে পুড়িয়ে অপচয় করছি। যদি আমরা সমস্ত 9800 লক্ষ টন গোবর, প্রস্তাবিত গোবর-গ্যাস প্ল্যাণ্টের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করে তুলি তবে 36260 লক্ষ ঘনমিটার গ্যাস পাওয়া যাবে যেটা 87·45 লক্ষ লোকের রান্নার নিমিত্ত ব্যবহৃত হতে পারে।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তি: অক্সিজেনবিহীন স্থানে গোময়, গোমূত্র, মানুষের মলমূত্র, পোলট্রির আবর্জনা কিংবা শূকরের মল ও অন্যান্য জঞ্জাল থাকলে সেখানে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া জন্মায়। এই সকল ব্যাকটে-রিয়াকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়:—

(1) অ্যাসিড উৎপাদক ব্যাকটেরিয়া বা স্যাপ্রোফাইটিক ব্যাকটেরিয়া (saprophytic bacteria)

(2) গ্যাস-উৎপাদক ব্যাকটেরিয়া বা মিথেন ব্যাকটেরিয়া।

অ্যাসিড উৎপাদক ব্যাকটেরিয়া কার্বোহাইড্রেটস্, প্রোটিন-চর্বি থেকে উদ্বায়ী অ্যাসিড উৎপন্ন করে ও এই পদ্ধতিতে এক্সট্রাসেলুলার এন্জাইমের (extracellular enzyme) সাহায্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই অবস্থাকে তরলীকরণের অবস্থা বলা হয়। এই অবস্থা ছাড়া গ্যাসীয়করণ অসম্ভব। এই সকল ব্যাকটেরিয়া খুব বেশী স্পর্শকাতর নয় ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে। অ্যাসিড উৎপাদক ব্যাকটেরিয়া যখন কাজ বন্ধ করে তখন গ্যাস উৎপাদক ব্যাকটেরিয়া কাজ আরম্ভ করে। গ্যাস উৎপাদক ব্যাকটেরিয়া এই সমস্ত দ্রব্য থেকে ইন্ট্রাসেলুলার এন্জাইমের (intracellular enzime) সাহায্যে মিথেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া তাপমাত্রা ও pH পরিবর্তনের সাথে সাথে খুব বেশী স্পর্শকাতর হয় তবে এরা অ্যাসিডের মধ্যে বাঁচতে পারে।

তাপমাত্রা: গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্ট থেকে 35°C সর্বাধিক গ্যাস পাওয়া যায়। এর চেয়ে কম তাপমাত্রায় গ্যাস ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং 15°C তাপমাত্রায় সর্বাপেক্ষা কম গ্যাস উৎপন্ন হওয়ার ফলে শীতকালে সর্বনিম্ন গ্যাস পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে নিম্নতম 12 ফুট গভীরতায় গ্যাস প্ল্যাণ্ট স্থাপনের ফলে পচন কক্ষের সাথে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রানিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

চাপের পরিমাণ: গোবর গ্যাসের চাপ, পচন কক্ষে প্রধানতঃ প্রতি ঘনমিটারে দুই কেজি। যদি এই চাপের হার পরিবর্তিত করা হয় তবে পচনযন্ত্রের সমতা ও পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য সাধারণতঃ এই হার স্থির রাখার চেষ্টা করা হয়। পচন-কক্ষে যদি চাপের হার বৃদ্ধি ঘটে তবে 'সন্ধান প্রক্রিয়া'র অর্থাৎ পচনের সময় কমে যায়। সাধারণতঃ 45 থেকে 55 দিন ভালভাবে পচনের জন্য সময় লাগে কিন্তু অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করলে ইতিপূর্বেই অত্যন্ত বিশ্রী গন্ধপূর্ণ সার নির্গমন নল দিয়ে বের হয়ে আসবে ও তাতে বাইরে মশা, মাছি জন্মাবে—এ অবস্থা সৃষ্টি মোটেই কাম্য নয়।

পদার্থের গাঢ়ত্ব: সাধারণতঃ বস্তুর গাঢ়ত্ব

7% থেকে 9% হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ 7 থেকে 9 ভাগ কঠিন পদার্থ 100 ভাগ ময়লার (slurry) মধ্যে থাকবে। গোবর ও জলের অনুপাত 4 : 5 হওয়া দরকার, এতে 8% কিংবা তদপেক্ষা কিছু বেশী গাঢ়ত্ব হয়।

পচনকাল (Detention period) : গ্যাস প্ল্যাণ্টের পচন-কক্ষে সমস্ত দ্রব্য পচনের জন্য সময় লাগে সাধারণতঃ সর্বাধিক 55দিন। দেখা গেছে প্রথম চার সপ্তাহ সর্বাধিক গ্যাস উৎপন্ন হয়, তারপর আস্তে আস্তে অধিবৃত্তাকারে (parabolic way) কমতে থাকে। একেই পচনকাল বলা হয়। যদি পচন ট্যাঙ্কের আকার ছোট হয় তবে সঠিকভাবে পচন সমাপ্ত হয়ে গ্যাস বের হওয়ার পূর্বেই নির্গমন নল দিয়ে সার বের হওয়ার ফলে সেটা দুর্গন্ধপূর্ণ হবে, তাতে মশা, মাছি বসতে শুরু করবে ও রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা দেখা দেবে। পূর্বেই বলেছি, বেশী চাপের ফলেও একই অবস্থার সৃষ্টি করে। 100 ঘন ফুট পচন-ট্যাঙ্কে 40 কেজি গোবর প্রত্যহ ফেলা চলে। যদি এর মাত্রা দ্বিগুণ করে 80 কেজি গোবর ফেলতে শুরু করা হয় তবে পচনকাল 55 দিন থেকে কমে গিয়ে 28 দিনে গিয়ে দাঁড়াবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা স্থির রাখলেও কিংবা ব্যাক্‌টেরিয়ার পুষ্টিকর খাদ্যবৃদ্ধি করলেও পচনকাল কমতে থাকে। মানুষের মলমূত্র পচতে এই যন্ত্রে মাত্র 30 দিন সময় লাগে কারণ এর মধ্যে ব্যাক্‌টেরিয়ার উপযুক্ত বেশী পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যপ্রোটিন, ভেজিটেবেল ইত্যাদি যা মানুষের দেহ গ্রহণে অক্ষম হয় সেটা সবই বর্তমান রয়েছে। গবেষণা থেকে কতিপয় গবেষকের প্রতি সপ্তাহে গ্যাস উৎপাদনের ধারণা নিম্নে সন্নিবেশিত হল, তবে এটা সর্বদাই পরিবর্তনশীল :—

- প্রথম সপ্তাহ—37% দ্বিতীয় সপ্তাহ—26.5%
- তৃতীয় সপ্তাহ—17.5% চতুর্থ সপ্তাহ—10%
- পঞ্চম সপ্তাহ—5.75% ষষ্ঠ সপ্তাহ—3.25%

pH : পচনশীল দ্রব্যের PH অর্থাৎ অম্লতা (acidity) ও ক্ষারকত্বের (alkalinity) পরিমাপ 7 এবং 8-এর মধ্যে থাকলেই গ্যাস উৎপাদন সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। যদি pH-এর চেয়ে নিম্নে নেমে যায় তবে গ্যাসের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। বেশী চাপ স্থাপন করলে অ্যাসিড উৎপাদক ব্যাক্‌টেরিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর মিথেন উৎপাদক ব্যাক্‌টেরিয়া অপেক্ষা অনেক বেশী সক্রিয় হয়ে পড়ে ফলে pH কমতে শুরু করে। সে সময়, মিথেন অপেক্ষা অ্যাসিডের উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে।

ব্যাক্‌টেরিয়ার পুষ্টিকর খাদ্য : ব্যাক্‌টেরিয়ার জন্য সব সময় নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাস যুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া আবশ্যক। যখন যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য বর্তমান থাকে তখন গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে সেজন্য গোমূত্র কিংবা গুঁড়া খোল দেওয়া প্রয়োজন। রাসায়নিক সারও অবশ্য প্রয়োগ করা চলে।

প্রতি পশু অনুপাতে গ্যাসের আনুমানিক হিসাব নির্ণয় করা কঠিন বিষয় কারণ বিভিন্ন পশুর ক্ষেত্রে সেটা পরিবর্তনশীল, তাছাড়া বছরের কাল অনুসারে সেটা পরিবর্তনীয় আবার অনুরূপভাবে পশুর খাদ্যের উপর তাদের মলমূত্র নির্ভরশীল। তবে আনুমানিক ভাবে নিম্নে একটা হিসাব দেওয়া হল, তবে এটা সর্বদাই পরিবর্তন হতে পারে :—

উৎস (প্রাণী)	দৈনিক আনুমানিক মলমূত্র (কেজি)	প্রতি কেজিতে উৎপন্ন গ্যাসের পরিমাণ (ঘনফুট)	প্রত্যহ প্রতি প্রাণী পিছু উৎপন্ন গ্যাসের পরিমাণ (ঘনফুট)
গরু	10 কেজি	1.3 ঘনফুট	13 ঘনফুট
মহিষ	15 „	1.3 „	19.5 „
শূকর (45 কেজি ওজনের)	2.25 „	2.8 „	6.3 „
পোলট্রি (2 কেজি ওজনের)	0.18 „	2.2 „	0.4 „
মানুষের মলমূত্র	400 গ্রাম	2.5 „	1 „
পোলট্রির শুকনা ময়লা সার	--	5.3 „	—

গোময়, গোমূত্র থেকে উৎপন্ন গ্যাসকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এতে 55% থেকে 60% মিথেন এবং 40% থেকে 45% CO_2 এবং সামান্য পরিমাণ H_2S ও হাইড্রোজেন বিদ্যমান। মানুষের মলমূত্র থেকে উদ্ভূত গ্যাসে মিথেন বেশি—65%, CO_2—34%, H_2S—0·6 এবং অন্যান্য গ্যাস 0 4%।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুই ঘন মিটারের প্ল্যান্টের জন্য 60 জন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ব্যবহারযোগ্য স্থান প্রয়োজন. প্রেসিডেন্সি নগরী সমূহের সরকারী প্রস্রাবাগার কিংবা হোষ্টেলের সংলগ্ন এলাকায় কমিউনিটি প্ল্যান্টের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তবে এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় যাতে বাড়তি জলের অংশ অন্য কোন পথে বহির্গত হওয়ার ব্যবস্থা থাকে। বর্তমান বিদ্যুত ঘাটতির কথা চিন্তা করে কলিকাতা ও অন্যান্য জনবহুল নগরীতে সরকারী উদ্যোগে কমিউনিটি প্ল্যান্ট স্থাপন করে বায়োগ্যাসের উৎপাদন করা আশু কর্তব্য।

গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের উৎপাদন ফল চক্রাকার হওয়ায় এর সঙ্গে পায়খানা, প্রস্রাবখানা ইত্যাদি যোগ করলে গ্যাস ও সারের পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে, তাছাড়া ব্যাক্‌টেরিয়াদের পরিপুষ্ট ও অধিকতর কার্যক্ষম হতে দেখা যায়।

শীতকালে গরম জল, প্রস্রাব, তৈলাক্ত কেক বা মোলাসেস (molasses) পচন ট্যাঙ্কের ভিতর যাওয়ার জন্য অন্তর্প্রবেশ পথে প্রেরণ করলে বেশ কিছু তাপ পেয়ে ব্যাক্‌টেরিয়া কার্যক্ষম থাকবে।

প্ল্যান্ট প্রস্তুতির ইতিহাস : ডঃ এস, ভি, দেশাই প্রফেসার এন্, ভি. জোশি, শ্রীওয়াই, এন, কোটোনাল প্রথম এই প্ল্যান্ট তৈরির চেষ্টা করেন। শ্রীযশোভাই জে, প্যাটেল 1951 সালের 'গ্রাম্যলক্ষ্মী গ্যাস প্ল্যান্টে' তৈরি করেন। এতে খরচ পড়েছিল 1,800 টাকা ও এর থেকে দৈনিক 200 ঘনফুট গ্যাস উৎপন্ন হত। তারপর 1952 সালে সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠানে শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ডঃ সি. এন্. আচার্য স্বামী বিশ্বরূপানন্দ এই গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট নিয়ে অনেক গবেষণা করেন। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও ডঃ সি. এন. আচার্য দাবি করেন যে গ্যাস সংগ্রাহক পাত্রে গ্যাসের চাপ হ্রাস করলে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে। এরপর শ্রীযশোভাই জে. প্যাটেল গ্রাম্য লক্ষ্মী গ্যাস প্ল্যান্টকে আরও সহজভাবে পরিচর্যা ও অর্থনৈতিক ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করেন। এবার উত্তর-প্রদেশের এটাওয়া জেলার অজিত মলে শ্রীরামবাক্স সিং এই প্রজেক্টের উন্নতিসাধন করেন ও শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের ন্যায় 200 ঘন ফুট ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করেন।

প্রত্যেকের রান্নার ক্ষেত্রে 8 থেকে 12 ঘনফুট গ্যাসের প্রয়োজন হয় যখন গ্যাসের তাপ 450 B. Th. U/C. Ft. এবং বারনারের তাপগ্রাহিতা 60% থাকে। এখন প্রত্যহ দুই ঘন মিটার গ্যাস থেকে প্রত্যহ 85 ঘন মিটার গ্যাসের উৎপাদনশীল প্ল্যান্ট সাফল্যের সঙ্গে তৈরি হয়েছে।

গ্যাস প্ল্যান্টের আকার :

দৈনিক 100 ঘনফুট আয়তনের গ্যাস প্রস্তুতিতে প্ল্যান্টের কতিপয় সমাধান—

(ক) গোময় ও গোমূত্র থেকে গ্যাস প্রস্তুতির আয়তন = 1 3 C.Ft/Kg কিংবা 36887 5 C.C /Kg বা, 0 6C.Ft/lbs.

প্রত্যহ 100C Ft. গ্যাসের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় গোময়ের পরিমাণ $= \frac{100}{0·6} = 166·66$ lbs.

সঠিকভাবে গোময় ও জল সমপরিমাণে মিশ্রণের পর তার ভর দাঁড়ায় (166·66 + 166·66) lbs. = 333 32 lbs

উক্ত মিশ্রণের ঘনত্ব পাওয়া যায় 68 lbs/.C Ft.

∴ গোময়ের আয়তন পাওয়া যায়—

$$\frac{333·32}{68} = \text{S.C. Ft. (প্রায়)}$$

এখানে উল্লেখযোগ্য গোময় ও জলের সমপরিমাণে মিশ্রণ অর্থাৎ ভর অনুপাতে উভয়ের 1 : 1 মিশ্রণের

ক্ষেত্রে আয়তন অনুপাতে 4 : 5 : : 1 : 1·25 হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

(খ) পচনের সময় (Retention period)— পূর্বেই উল্লেখ করেছি এই প্ল্যান্টে গোময়ের সঠিকভাবে পচনের জন্য সময় লাগে সাধারণতঃ 50 দিন। উপর নির্ভরশীল। দৈনিক 2 ঘন মিটার থেকে 25 ঘনমিটার গ্যাস প্ল্যান্টের জন্য পচন কক্ষের কূপের গভীরতা 12 ফুট থেকে 20 ফুট কিংবা M.K.S. এককে 4 মিটার থেকে 6 মিটার করলে ট্যাঙ্কের তাপমাত্রা, বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা নিরোধক ব্যবস্থা
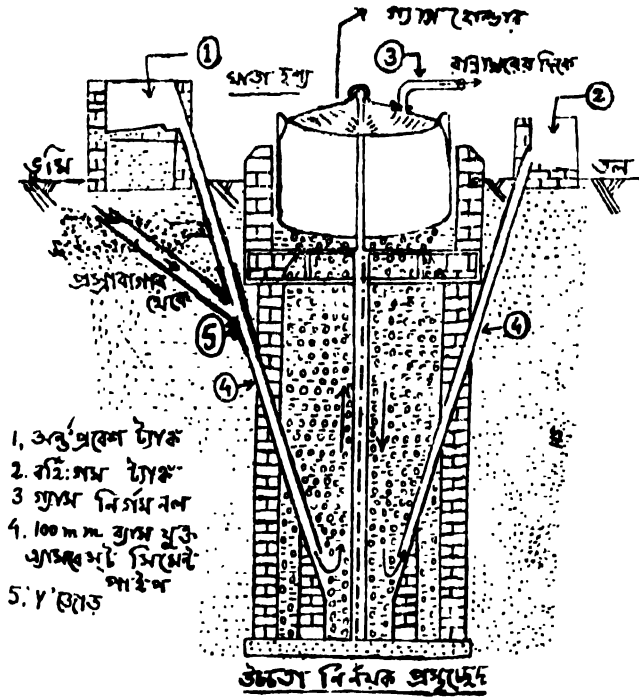
গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট

সেজন্য পচন ট্যাঙ্কের আয়তন দাঁড়ায় 50 × 5 = 250 C. Ft. তাহলে 100 C. Ft প্রতিদিন উৎপন্ন করার জন্য পচনযন্ত্রের আয়তন 250 C. Ft. প্রয়োজন হয়। অতএব এক ঘনফুট গ্যাস দৈনিক তৈরি করার জন্য পচন ট্যাঙ্কের আয়তন 2·50 C. Ft. দরকার হবে। যে কোন আয়তনের গ্যাস প্ল্যান্ট তৈরির ক্ষেত্রে এই ভিত্তিতে কাজ করা চলবে, তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই আয়তনের পরিমাণ একটু বর্ধিত করে পচন ট্যাঙ্কের পরিমাপ F.P.S. এককে 2·75 × প্রত্যহ গ্যাস উৎপাদনের আয়তন করা প্রয়োজন হয়। তাছাড়া পচন ট্যাঙ্কের পরিমাপ ট্যাঙ্কের গভীরতার অবলম্বন করার সুবিধা হয় শীতকালে বিশেষভাবে এটা অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন। তিন ঘন মিটার গ্যাস প্ল্যান্টের জন্য 5 মিটার গভীরতা এবং 1·60 মিটার ব্যাস আবশ্যক। কাঁচামাল দেওয়ার অনুপাতে পচন কক্ষের ব্যাস নির্ভর করে। সাধারণতঃ ব্যাস 4 ফুট থেকে 20 ফুট এবং 1·2 মিটার থেকে 6 মিটার করা হয়।

অন্তর্প্রবেশ ট্যাঙ্ক—গোময়, গোমূত্র এবং জলের মিশ্রণ 7·5% এবং 10% এর মধ্যে করা হয় যাতে জল ও গোবরের অনুপাত আয়তন অনুযায়ী 1 : 1·25 অর্থাৎ 4 : 5 হয়। ঘাস, খড় ইত্যাদি

ভাসমান পদার্থ হয় মুক্ত করতে হবে নচেৎ তাদের অর্ধ ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে কেটে ফেলতে হবে কারণ তা না হলে তারা অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়ে জমাট আকার ধারণ করে পাইপের ছিদ্রপথ বন্ধ করে দেবে ও একটা মোটা স্তরের আকার নিয়ে উপরে ভাসমান অবস্থায় থাকবে। অন্তর্মুখী নল অ্যাসবেস্ট সিমেন্টের তৈরী এবং পচন ট্যাঙ্কের নীচে এটি সংযোগ করা হয়। অজৈব শক্ত পদার্থ ইটগুঁড়ি, বালু, খোলামকুচি, কাঁকর ইত্যাদি থিতিয়ে নীচে পড়ে যাওয়ার জন্য অন্তর্প্রবেশ ট্যাঙ্কের অনুভূমিক তল (floor level) বিপরীতমুখী তুই থেকে তিন ইঞ্চি নিম্নগামী করা হয়। 1·60 মিটার ব্যাস অপেক্ষা বড় পচন ট্যাঙ্কের ক্ষেত্রে কূপের মধ্যস্থলে বিভাজক প্রাচীরের সাহায্যে পচন কক্ষ অর্ধবৃত্তাকারে দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি প্রাথমিক (primary) কক্ষ ও অপরটি মাধ্যমিক (secondary) কক্ষ নামে অভিহিত। নির্গমন নলটি মাধ্যমিক পচন কক্ষের নিম্নাঙ্গ থেকে বের হয়েছে। এটি পচন কক্ষের উপর তল থেকে সাধারণতঃ 7·5 ঘনমিটার নিচু থেকে শুরু হয়। অভ্যন্তরগামী প্রবেশ পথের নলমুখ অপেক্ষা নির্গম পথের নলমুখ অপেক্ষাকৃত নিম্নে অবস্থিত থাকে। যে পরিমাণ দ্রব্য অন্তর্প্রবেশ পথ দিয়ে পচন কক্ষে আসে ঠিক সমপরিমাণ দ্রব্য নির্গম নল দিয়ে বাইরের আধারে গিয়ে পড়ে। পচন কক্ষের নিম্নদেশ ইট, সিমেণ্ট ও কংক্রিট দিয়ে তৈরী করা হয়। ভিতরের অংশ সিমেণ্ট মর্টারের সাহায্যে প্লাস্টার করা হয়। গ্যাস ধারক পাত্রের উচ্চতার সমান একটা কক্ষ পচন ট্যাঙ্কের উপর নির্মাণ করা হয়। সমস্ত গ্যাসের বুদ্‌বুদ্ গ্যাস ধারক পাত্রের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে ধাবিত করানোর নিমিত্ত এই কক্ষের নিম্নভাগ যেখানে পচন কক্ষের সংযোগ স্থলের সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেখানটা একটু ছোট করা হয়।

গ্যাস সংগ্রাহক পাত্রের আকার : সাধারণতঃ গ্যাস সংগ্রাহক পাত্রের আকার দিবারাত্রি গ্যাস ব্যবহার ও গ্যাসের সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল, 60 ঘন ফুট থেকে 2500 ঘন ফুট পর্যন্ত আয়তন যুক্ত গ্যাসহোল্ডার নির্মিত হয়েছে। গ্যাস হোল্ডারটি গোবর কূপের উপর গাইড ফ্রেমের সাহায্যে বসানো হয়। গ্যাস হোল্ডারে গ্যাস সঞ্চিত হলে পাত্রটি উপরের দিকে ঠেলে ওঠে। দৈনিক তিন ঘন মিটার গ্যাস সঞ্চয়ের জন্য গ্যাস ধারক পাত্রের আয়তন 1·75 ঘন মিটার হওয়া আবশ্যক। কিন্তু গ্যাস ব্যবহার করার জন্য কাজে লাগানোর ফলে 1·5 ঘন মিটার আয়তনের গ্যাসধারক পাত্র ব্যবহার করলেই যথেষ্ট। এটা দিনের বেলায় রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্য রাত্রিতে কতখানি গ্যাস সংগৃহীত হবে সেটার উপরই নির্ভর করে। কত ঘণ্টা গ্যাসটা ব্যবহার করা প্রয়োজন সেটার উপরও সংগ্রাহকের আয়তন নির্ভরশীল। উদাহরণ স্বরূপ স্কুল ও ল্যাবোরেটারীর জন্য দিবাভাগে 7/8 ঘণ্টা একসঙ্গে গ্যাসের প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে দৈনিক গ্যাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংগ্রাহকের আয়তন 70% হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সঞ্চিত গ্যাস শীর্ষস্থিত নলের মধ্য দিয়ে বাইরে প্রবাহিত হয় ও প্রয়োজনে 100 ফুট কিংবা 30 মিটারের অনধিক দূরত্বের গ্যাস ল্যাম্প ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা যায়। গ্যাস সংগ্রাহক পাত্রের ভর 18lbs/Sq. Ft বা 90Kgs/Sq Metre. সাধারণতঃ এটি ষ্টীল দিয়ে নির্মাণ করা হয় কিন্তু ষ্টিলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে ফাইবার গ্লাস, সিন্থেটিক ধাতু ইত্যাদির সাহায্যেও তৈরী করা হচ্ছে। তাছাড়া ফেরো-সিমেণ্ট দিয়েও গ্যাস হোল্ডার প্রস্তুত করা যায় কিন্তু তার পুরুত্ব সমানভাবে করা বেশ অসুবিধাজনক, তা না হলে এটি স্টীল হোল্ডার অপেক্ষা 20% থেকে 30% সস্তায় প্রস্তুত করা যায়।

গ্যাসের ব্যবহার : গোবর গ্যাস রান্নার জ্বালানী, আলো ও অন্ত দহন ইঞ্জিনের ব্যবহারের জন্য কাজে লাগানো যায়। বেশী পরিমাণে এই গ্যাস উৎপন্ন করে শিল্প কারখানায় জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যায়। গ্রামে সাধারণতঃ রান্নার জন্য

কাঠ কিংবা কৃষিক্ষেতের জ্বালানী অর্থাৎ গমডাঁটা, পেঁকাটি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গোবরকে ঘুঁটে হিসাবে ব্যবহার করলে শক্তির প্রচুর পরিমাণে অপচয় হয়। কাঠকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে 17% তাপ পাই, ঘুটের আগুনে 11% থার্মল শক্তি বিদ্যমান। এভাবে 83% কাঠ এবং 89% ঘুঁটে হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে নষ্ট হচ্ছে। গোবর গ্যাসে ব্যবহারিক কার্যকারী তাপগ্রাহিতা 60% থার্মল শক্তি বিদ্যমান অধিকন্তু গোবর গ্যাস উৎপাদনে মাত্র এক-চতুর্থাংশ গোবর ব্যয় হয় কিন্তু সম্পূর্ণ গোবরটাই ঘুঁটের আকারে জ্বালিয়ে যে মূল্যবান তাপ উৎপন্ন হয় তদপেক্ষা গোবর গ্যাস ব্যবহারে প্রায় 20% অধিক তাপ পাওয়া যাবে। এই গ্যাসের গঠন কয়লার গ্যাস ও "বারসেন গ্যাস" থেকে ভিন্ন হওয়ায় রান্নার জ্বালানী কিংবা আলো হিসাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ আকারের ষ্টোভ ও ল্যাম্প জাতীয় সরঞ্জাম নির্মিত হয়েছে যাতে এর কার্যকরিতা 55% থেকে 60% পাওয়া যাবে। এই গ্যাস বারসেন কিংবা এ্যাসো (Esso) বার্নারে জ্বালালে শিখার তাপমাত্রা যথেষ্ট হবে না, কার্যকারিতা কম হবে ফলে রান্না হবে অতি মন্থর গতিতে ও বেশী গ্যাস অপচয় হবে। কিন্তু এই গ্যাস ব্যবহারের নিমিত্ত বিশেষ ধরণের ষ্টোভে জ্বালালে অদৃশ্য নীলাভ শিখার 800 C-র নিকটবর্তী গিয়ে পৌছায়, একই ষ্টোভে যদি বায়ু সংস্পর্শ বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে শিখার তাপমাত্রা 400°C-এ নেমে আসে। বিভিন্ন ব্যবহার্য ক্ষেত্রে ষ্টোভের বায়ু সংস্পর্শ কম রাখলে কার্যকারিতা খুবই কম পাওয়া যাবে।

প্রতি ঘণ্টায় 220 লিটার থেকে 1120 লিটার গ্যাসের ব্যবহার্য বার্নার প্রস্তুত কর হয়েছে। শিল্প কারখানার জন্য প্রয়োজন অনুসারে সুবৃহৎ আকারের গ্যাস বার্নার নির্মাণ করা যায়। নির্দিষ্ট গ্যাসের চাপ ও সংশ্লেষণ অনুসারে নির্দিষ্ট গ্যাস বার্নারের ব্যবহার প্রয়োজন। সর্বাপেক্ষা বেশী অর্থনৈতিক সুবিধার্থে একটি সুবিধাজনক আকারের বার্নার ব্যবহারযোগ্য। গোবর গ্যাস ষ্টোভের জন্য সাধারণতঃ গ্যাসের ব্যয় প্রতি ঘণ্টায় 225 লিটার, প্রাইমাস ষ্টোভের বার্নারের জন্য ঘণ্টায় 450 লিটার গ্যাস ও বৃহৎ যৌথ পরিবারের রন্ধনের নিমিত্ত ঘণ্টায় 1130 লিটার গ্যাস ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ ভাবে নিয়মিত বাতির ক্ষেত্রে 100 বাতির ক্ষমতা-সম্পন্ন (candle power) বা 60 ওয়াট ক্ষমতাপূর্ণ প্রতি ল্যাম্পের আলোক প্রস্তুতিতে প্রতি ঘণ্টায় 70 লিটার থেকে 140 লিটার গ্যাসের আবশ্যক। এটি সাধারণতঃ গড়ে ঘণ্টায় 125 লিটারে এসে দাঁড়ায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে রান্নার কাজে প্রত্যহ প্রতি ব্যক্তির ক্ষেত্রে গড়ে বার ঘনফুট গ্যাস ও আলোর জন্য 60 ওয়াট ক্ষমতাপূর্ণ ল্যাম্পে 4·5 ঘনফুট গ্যাস প্রতি ঘণ্টায় ব্যবহৃত হয়।

যে কোন ইঞ্জিন চালাতে সুবৃহৎ আকৃতির কমপক্ষে 20 ঘনমিটার বা 706 ঘনফুটের গ্যাস প্ল্যাণ্ট করা প্রয়োজন। বর্তমানে এই গোবর গ্যাসের সাহায্যে কির্লস্কর কোম্পানী এবং রাস্টন ও পুনসবী কোম্পানী কর্তৃক উদ্ভাবিত 5 থেকে 6 অশ্বক্ষমতা-সম্পন্ন ইঞ্জিন প্রস্তুত হয়েছে। গড়ে এই গ্যাস প্রতি ঘণ্টায় 425 লিটার বা 15·2 ঘনফুট প্রতি ক্ষমতাসম্পন্ন ইঞ্জিন চালানোর নিমিত্ত প্রয়োজন হয়। পাঁচ অশ্বক্ষমতাসম্পন্ন ইঞ্জিন আট ঘণ্টার জন্য চালাতে 17 ঘন মিটার গ্যাসের প্রয়োজন হয় ও যদি ধরা যায় এক ঘন মিটার গ্যাস এদিক-ওদিকে অপচয় হবে; তবুও 18 ঘন মিটার গ্যাস উৎপন্ন করার জন্য শুধুমাত্র 30 থেকে 35টি পশুর তাজা গোবর ও গোমূত্র প্রয়োজন পড়ে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যদি গ্যাস অপচয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে প্রয়োজনীয় গ্যাসের আয়তন 20 ঘন মিটারে গিয়েও দাঁড়ায় তাহলেও সে ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত 15 থেকে 50 সংখ্যক গো-পালনই যথেষ্ট হবে। ডিজেল কিংবা পেট্রল অথবা কেরোসিন চালিত অন্তর্দহন ইঞ্জিনকে গোবর গ্যাস ইঞ্জিনে পরিবর্তিত করতে হলে একটি বিশেষ সংযোজন করতে হয়। ডিজেল ইঞ্জিন

চালানোর জন্য 15% থেকে 20% ডিজেলের সাথে গ্যাসের প্রয়োজন এবং গ্যাসের ব্যয় এই অবস্থায় প্রতি অশ্বক্ষমতাসম্পন্ন ইঞ্জিনের জন্য ঘণ্টায় 420 লিটার থেকে 500 লিটার আবশ্যক। পেট্রল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে পেট্রল পোড়ানোর দরকার লাগে না। কারণ এই ইঞ্জিন গোবর গ্যাসের সাহায্যে ঘুরতে সক্ষম। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ইঞ্জিন চালু করার সময় ডিজেল কিংবা পেট্রোলের সাহায্যে আরম্ভ করা দরকার। যদি গ্যাসের প্রাচুর্য থাকে তবে তা বাণিজ্যিক উপায়ে তাপ প্রয়োগ করার কাজে, জল গরম করা, ধোপাখানারা, ক্ষুদ্র সাবান ফ্যাক্টারীতে সাবান পাত্র গরম করার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এই সব বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে গোবর গ্যাস ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে প্রথমে কি পরিমাণ অন্যান্য গ্যাস কাজে লাগে ও তার সমানুপাতিক গোবর গ্যাস কত লাগবে সেটা নির্ণয় করে ফেলা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ সেই পরিমাণ গ্যাস উৎপন্ন করতে যথেষ্ট সংখ্যক গরু কিংবা অন্যান্য প্রাণী আছে কিনা দেখা দরকার। নিম্নে বিভিন্ন জ্বালানীর তুলনামূলক হার ও পরিবর্তিত মান দেওয়া হল :—

বিভিন্ন জ্বালানীর তুলনা

	জ্বালানীর নাম	তাপন মূল্য (calorific value) কিলো-ক্যালরি এককে	দহনের অবস্থা	শতকরা হারে কার্যকরী তাপগ্রাহিতা	কার্যকরী তাপ কিলোক্যালরি এককে
1.	গোবর গ্যাস (ঘনমিটার)	4713	ষ্ট্যাণ্ডার্ড বার্নারে	60	2828
2.	কেরোসিন (লিটার)	9122	প্রেশার ষ্টোভে	50	4561
3.	কাঠ (কেজি)	4708	খোলা চুল্লীতে	17·3	814
4.	ঘুঁটে (কেজি)	2092	,,	11	230
5.	অঙ্গার (কেজি)	6930	,,	28	1940
6.	নরম কোক (কেজি)	6292	,,	28	1762
7.	বিউটেন* (কেজি)	10882	ষ্ট্যাণ্ডার্ড বার্নারে	60	6529
8.	চুল্লাতে ব্যবহৃত তৈল (Furnace oil) (লিটার)	9041	জল-নলে স্ফুটনকরণে	75	6781
9.	কোল গ্যাস (ঘনমিটার)	4004	ষ্টাণ্ডার্ড বার্নারে	60	2402
10.	বিদ্যুৎ (কিলো-ওয়াট-ঘণ্টা) k. w. h	860	উত্তপ্ত পাতে	70	602

*বিউটেন : ইনডেন (indane), বারসেন (burshane), এসো (Esso) ইত্যাদি বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাস

বিভিন্ন জ্বালানীর পরিবর্তিত মান

মাহুপাত নির্ণয়ে ভি . তব

জ্বালানীর নাম	একক	গোবর গ্যাস 1 ঘনমিটার (M^3)	কেরোসিন 1 লিটার	কাঠ 1 কেজি	ঘুঁটে 1 কেজি	অঙ্গার 1 কেজি	নরম কেক 1 কেজি	বিউটেন 1 কেজি	চুল্লীতে ব্যবহৃত তৈল 1 লিটার	কোল গ্যাস 1 ঘনমিটার (M^3)	বিদ্যুৎ 1 k-w-h
গোবর গ্যাস	ঘনমিটার (M^3)	1·0	1·613	0·288	0·081	0·686	0·623	2·309	2·393	0·849	0·213
কেরোসিন	লিটার	0·620	1·03	0·178	0·050	0·425	0·385	1·431	1·487	0·527	0·132
কাঠ	কেজি	3·474	5·60	1·0	0·283	2·383	2·165	8·210	8·330	2·951	0·740
ঘুঁটে	,,	12·296	19·830	3·539	1·0	8·435	7·640	28·387	29·483	10·443	2·617
অঙ্গার	,,	1·458	2·351	0·420	0·119	1·0	0·903	3·365	3·495	1·238	0·310
নরম কেক	,,	1·605	2·589	0·462	0·130	1·101	1·0	3·705	3·848	1·363	0·342
বিউটেন	,,	0·433	0·699	0·125	0·035	0·297	0·270	1·0	1·039	0·368	0·092
চুল্লীতে ব্যবহৃত তৈল (Furnace Oil)	লিটার	0·417	0·673	0·120	0·034	0·286	0·260	0·963	1·0	0·354	0·089
কোলগ্যাস	ঘনমিটার (M^3)	1·177	1·899	0·339	0·096	0·808	0·734	2·783	2·823	1·0	0·251
বিদ্যুৎ	kwh	4·693	7·576	1·352	0·382	3·223	2·927	10·845	11·264	3·990	1·0

গোবর গ্যাসকে অন্যান্য রিফাইনারি গ্যাসের ন্যায় বোতলে সংরক্ষণ করা অসুবিধাজনক কারণ প্রথমতঃ এই গ্যাস অন্যান্য রিফাইনারি গ্যাসের ন্যায় তরলীভূত হয় না। এই গ্যাস $-296^{\circ}F$ বা $-182^{\circ}C$ তাপমাত্রায় তরলীভূত হয়, তাছাড়া এই গ্যাস সামান্য পরিমাণেও তরলীভূত করা যায় না সেজন্য বোতলে ভর্তি করা অসম্ভব। অপর পক্ষে যদি গ্যাসীয় অবস্থায় চাপ প্রয়োগে সিলিণ্ডারে পূর্ণ করা হয় তবে এই গ্যাসের আয়তন বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সঙ্গে বিপরীতভাবে সমানুপাতিক (inversely proportional) হয়। প্রকৃতপক্ষে সামান্য পরিমাণে গ্যাস ভর্তি করা যায় বড় সিলিণ্ডারের মধ্যে যাতে খুব বেশী ব্যবহারযোগ্য কাজ হয় না। সিলিণ্ডারে সঞ্চিত গ্যাসের সাহায্যে মেশিন চালানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে গ্যাসের প্রয়োজন কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েক মিনিট মেশিন চলার পর বন্ধ হয়ে যায়।

সারের ব্যবহার : গ্যাস প্ল্যাণ্ট থেকে যে সারটা পাওয়া যায় তা গর্তে স্তূপীকৃত সাধারণ গোবর সার অপেক্ষা 43% অধিক কার্যকরী, কারণ গ্যাস প্ল্যাণ্টের পচন কক্ষে গোবরের যে পচন ক্রিয়া সম্পাদিত হয় সেটা খোলা গর্তে স্তূপীকৃত গোবরের পচনক্রিয়া অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ও সম্পূর্ণ হওয়ার সুযোগ পায়। প্ল্যাণ্ট থেকে সদ্য বর্হিগত তরল ময়লায় শতকরা দু-ভাগ অধিক নাইট্রোজেন থাকে যেটা সহজেই সেচের জলের সাথে মিশিয়ে মাটিতে প্রয়োগ করা যায়। সারটা শুকানোর পর জমিতে প্রয়োগ করলে উক্ত শতকরা দুইভাগে নাইট্রোজেন হ্রাস পায়। প্ল্যাণ্ট নির্গত সার অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট ইত্যাদি রাসায়নিক সারের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে একটি সূক্ষ্ম পর্যায়ের জৈব বনিয়াদ গড়ে তুলতে পারে। প্ল্যাণ্টবহির্গত সার পুষ্করিণীতে ফেলে মাছের পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে তাদের সুস্বাস্থ্যের ক্রমবর্ধমান উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্ট থেকে অধিকতর নাইট্রোজেনযুক্ত উন্নতমানের জৈব সার ও উৎকৃষ্ট মানের জ্বালানী দুই সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করলেও অত্যুক্তি করা হয় না।

অন্যান্য উপকারিতা : এই গ্যাসের ব্যবহারের ফলে ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। অন্যান্য জ্বালানী ব্যবহার করলে CO, CO_2 ইত্যাদি উৎপন্ন হয়ে কালি, ঝুল সৃষ্টি করে, বায়ুমণ্ডল দূষিত করে ও ধোঁয়াতে অনেক সময় চক্ষুর ক্ষতিসাধন করে। এই গ্যাসের সাহায্যে জ্বালানীর কাজ চালালে আমরা বন-সংরক্ষণ করতে সক্ষম হব, যেটা এ সময় একান্ত জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে কারণ সমগ্র ভূখণ্ডের অনুপাতে 23% থেকে 25% এলাকায় গাছ-পালা রাখা একান্ত কর্তব্য, নচেৎ গাছের সাহায্য নিয়ে ভূমিক্ষয় রোধ, বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধিকরণ ও মেঘের আকর্ষণ ক্ষমতার ফলে বৃষ্টিপাত হওয়া সবগুলিই কিছু দিন পর অসম্ভব হয়ে পড়বে। পরিসংখ্যান হিসাবে দেখা যাচ্ছে ভারতে কাঠকে জ্বালানী ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের ফলে বন ক্রমবর্ধমান হারে ধ্বংসীভূত হয়ে আজ সমগ্র ভূখণ্ডের 13% এসে ভয়াবহ ঘাটতি রূপে দাঁড়িয়েছে। এখনও আমরা এবিষয়ে লক্ষ্য না দিলে এস্থানের মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার জন্য বেশীদিন সময় লাগবে না। তাছাড়া বর্তমান বিদ্যুত সংকট ও অদূর ভবিষ্যতে কয়লার সংকটের হাত থেকে এই গ্যাস অব্যাহতি দেবে বলেই আশা রাখি।

এই প্ল্যাণ্ট বসালে মশা, মাছি ইত্যাদি যে সমস্ত পোকা মাকড় সার গর্তের আবর্জনার মধ্যে জন্মাত তাদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা সম্ভব হবে। নির্গমন নল দিয়ে যে সার বের হয়ে আসবে সেটা সম্পূর্ণ পচনকাল শেষ হয়ে আসার ফলে সম্পূর্ণরূপে গ্যাস বহির্ভূক্ত হয়ে আসে ফলে তাতে কোন দুর্গন্ধ থাকে না ও সেখানে কোন মশা, মাছির জন্ম হয় না।

সাবধানতা : গ্যাস প্ল্যাণ্ট সব সময় পানীয়

জলের কূপ থেকে 20 মিটার অপেক্ষা দূরবর্তী স্থানে বসানো আবশ্যক, নচেৎ কখনো কখনো ঐ তরল ময়লা চুঁইয়ে চুঁইয়ে জলের সংস্পর্শে গিয়ে পড়তে পারে। সূর্যালোকে আলোকিত একটু উঁচু স্থানে গ্যাস প্ল্যাণ্ট বসালেই ভাল ফল পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের 550 হাজার গ্রামে 4 থেকে 5 কোটি গ্যাস প্ল্যাণ্ট নির্মাণ করা অতীব প্রয়োজন। বর্তমানে আফ্রিকা, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহের ভারতের ন্যায় গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। এখন ভারত থেকে এই প্ল্যাণ্টের প্রযুক্তি-বিদ্যা তানজেনিয়া, বোটস্‌ওয়ানা, শ্রীলঙ্কা, ইরাক নেপাল, ইরাণ ও সোমেলিয়া ইত্যাদি দেশ সমূহে গিয়েছে।

যে শিশুরা ডায়াবেটিসে ভুগছে

অমিত চক্রবর্তী*

দিনটা ছিল ছাব্বিশে জানুয়ারী। কাকডাকা ভোরে ঘুম ভেঙ্গেছিল সেদিন। আশেপাশের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে তখন। আকাশটা ভাল করে ফর্সা হবার আগেই ওরা বেড়িয়ে পড়লো, ওদের চোখমুখ তখন উৎসাহ আর খুশীতে ভরা। ছাব্বিশে জানুয়ারীর প্যারেডে যোগ দিতে চলে গেল ওরা।

গলির মুখটায় ওদের দলটা মিলিয়ে যাবার সাথে সাথে হঠাৎই যেন মনে পড়লো পাশের বাড়ীর ছোট্ট ছেলেটির কথা। প্যারেড করতে যাওয়া ছেলেমেয়েদের দলে ছিল না ও, অবশ্য আশাও করিনি ওকে। একেবারে শৈশবেই ডায়াবেটিস রোগ ছেলেটিকে মোক্ষম কামড় দিয়েছে, সারা জীবনেও সে কামড় ছাড়ানোর আর সাধ্য নেই ওর। ছেলেটির বেঁচে থাকার এখন একমাত্র অস্ত্র—প্রতিদিন ইন্‌সুলিন নেওয়া।

প্যারেড শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। ব্যাণ্ড পাইপের তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে অগণিত স্কুল পড়ুয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। হঠাৎ খেয়াল হল—এটা আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ। ছোটদের দিকে আরও বেশী করে নজর দেওয়ার, ছোটদের নিয়ে আরও বেশী করে ভাববার বছর এটা। আর ঠিক তখনই যেন প্যারেড করে চলে যাওয়া, সূর্যের আলোয় ঝক্‌মক্‌ করা কচিকাঁচা মুখগুলির পাশে ফুটে উঠল ডায়াবেটিসে কষ্ট পাওয়া পাশের বাড়ীর ঐ ছোট্ট ছেলেটির নিস্তেজ মুখটা। মনে পড়লো, কদিন আগেই ছেলেটির বাবা বলছিলেন—ওষুধের দোকান-গুলিতে নাকি ইন্‌সুলিন পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের দেশে ইন্‌সুলিন তৈরী করে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান, তারাও আবার গরুর প্যাংক্রিয়াস অর্থাৎ যা থেকে ইন্‌সুলিন তৈরী করা হয়, তা আনে বিদেশ থেকে। আমাদের দেশের কসাইখানাগুলি এ ব্যাপারে কোন কাজে আসছে না। এরকম অবস্থায় মাঝে মাঝেই যে ইন্‌সুলিনের সঙ্কট দেখা দেবে এতে আশ্চর্যের কি? অথচ যে সব শিশু ডায়াবেটিসে ভুগছে ইন্‌সুলিন ছাড়া তারা বাঁচতে পারে মাত্র কয়েকদিন। ছাব্বিশে জানুয়ারীর সকালটায় কেন জানি না ঘুরে ফিরে খালি ঐ ছোট্ট ছেলেটির কথাই বারবার মনে হচ্ছিল। ইন্‌সুলিন পাওয়া গেছে তো? ভাল আছে তো ছেলেটা?

*বিজ্ঞান বিভাগ, আকাশবাণী, কলিকাতা-700001

অনেকেই হয়তো জানেন না, আমাদের দেশের ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা নেহাৎ কম না, প্রায় দেড় কোটি—অর্থাৎ প্রতি চল্লিশ জনে একজন। এই দেড়কোটি ডায়াবেটিস রোগীর শতকরা দশ ভাগ অর্থাৎ প্রায় পনেরো লক্ষই জুভেনাইল ডায়াবেটিক, অর্থাৎ জন্মের পর কয়েক বছরের মধ্যেই ডায়াবেটিস এদের সঙ্গ নিয়েছে সারা জীবনের জন্য।

ডায়াবেটিস রোগটা আসলে কি? সংক্ষেপে বলতে গেলে—মানুষের শরীরে বিভিন্ন ধরনের কার্বোহাইড্রেট যেমন চাল, গম ও চিনি জাতীয় খাদ্য হজম হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয় এবং রক্তে গিয়ে মেশে। রক্ত চলাচলের মধ্যে দিয়ে এই গ্লুকোজ শরীরের বিভিন্ন তন্তুতে পৌঁছে শক্তি আর পুষ্টি যোগায়। এই যে, গ্লুকোজ থেকে শক্তি পাওয়া— এই ব্যাপারটা কিন্তু আংশিক-ভাবে ঘটাচ্ছে ইন্‌সুলিন নামে একটা হর্মোন, যা তৈরী হয়, আমাদের শরীরের প্যাংক্রিয়াস নামে একটা গ্ল্যাণ্ডের বিশেষ কতকগুলি কোষের মধ্যে। ডায়াবেটিস রোগে আসলে এই ইন্‌সুলিনের ঘাটতি দেখা দেয়, যার ফলে শরীরের তন্তুগুলি গ্লুকোজকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারে না, আর এই অব্যবহৃত গ্লুকোজ তখন অস্বাভাবিক পরিমাণে রক্তে জমা হয়ে সৃষ্টি করতে থাকে নানা-রকম উপসর্গ, যেমন বেশীমাত্রায় জলপিপাসা, মূত্রত্যাগ আর খিদে। প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা না হলে রোগীর অবস্থা হয়ে ওঠে আরও সঙ্গীন। ডায়াবেটিক্‌ - কোমায় জ্ঞান হারানো এমনকি মারা যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

অধিকাংশ ডায়াবেটিস রোগীরই চিকিৎসা বলতে —খাওয়াদাওয়ায় কিছু বাধানিষেধ মেনে চলা। এরা কম কার্বোহাইড্রেট আর বেশী প্রোটিনযুক্ত খাবার খেয়ে মোটামুটি সুস্থ থাকেন। জুভেনাইল ডায়াবেটিক (Juvenile diabetic) অর্থাৎ শৈশব থেকেই যারা ডায়াবেটিসে ভুগছেন, বেঁচে থাকার জন্য তাদের প্রতিদিন এক বা একাধিকবার ইনসুলিন ইনজেকশন নেওয়া ছাড়া গতি নেই। প্রতিদিন ইন্‌জেকশন নেবার যন্ত্রণা থেকে কিভাবে এদের মুক্তি দেওয়া যায় তা নিয়ে দেশে-বিদেশে যে গবেষণা চলছে তারই কিছু আশাজাগানো ফলাফল জানতে পারা গেছে সম্প্রতি। সেই প্রসঙ্গেই আসছি।

আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলিপ ফেলিগ ও তার সহযোগী ডাক্তাররা ডায়াবেটিসের রোগীদের প্রতিনিয়ত ইন্‌সুলিন যোগান দেওয়ার জন্য ব্যাটারীতে চলে এমন ক্ষুদে পাম্পের সাহায্য নিচ্ছেন। এর ওজন 450 গ্রাম। এই পাম্প যা কিনা কৃত্রিম প্যাংক্রিয়াস গ্রন্থির মত কাজ করছে, রোগীর কোমরের বেল্টের সঙ্গে অথবা ছোট কাঁধ ব্যাগের মধ্যে তা রেখে দেওয়া চলে। সরু নলের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট মাত্রায় ইন্‌সুলিন গিয়ে পৌঁছায় পেট অথবা উরুর চামড়ার তলায় বিঁধিয়ে রাখা ছুঁচের গোড়ায়। খাওয়া দাওয়ার সময় রোগী অনায়াসেই প্রয়োজন মত ইন্‌সুলিনের মাত্রা বাড়িয়ে নিতে পারেন। ফেলিগের মতে, এতে রোজ ইন্‌জেক্‌শন নেবার ঝামেলাতো নেই-ই তাছাড়াও এই ধরণের ইন্‌সুলিন চিকিৎসার সময় নাকি রক্তের স্নেহজাতীয় পদার্থ বিশেষতঃ কোলেস্টেরলের (cholesterol) মাত্রা স্বাভাবিক থাকে।

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্‌ লেসী ও তার সহযোগীরা শিশু-ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য অন্য ধরণের হাতিয়ারের কথা ভাবছেন। আগেই বলেছি, আমাদের প্যাংক্রিয়াস গ্রন্থির বিশেষ কতকগুলি কোষ যা ইন্‌সুলিন তৈরি করে তা অকেজো হয়ে যাবার ফলেই ডায়াবেটিস রোগের সৃষ্টি। এই অকেজো কোষগুলির বদলে কি করে প্যাংক্রিয়াস গ্রন্থিতে সুস্থ কোষ, যা ইন্‌সুলিন তৈরি করবে, তা বসিয়ে দেওয়া যায় তাই নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ গবেষকরা। ইঁদুরদের নিয়ে গবেষণা চালিয়ে ওরা দেখেছেন, বিশেষ পদ্ধতিতে বাইরে থেকে বসানো প্যাংক্রিয়াসের সুস্থ কোষ ইঁদুরের শরীরে 100 দিনেরও বেশী সময় ধরে ইন্‌সুলিন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের

ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিকে কাজে লাগানো যায় কিনা তাই নিয়ে এখন ভাবনা চিন্তা করছেন ওঁরা।

এ প্রসঙ্গে আর একদল বিজ্ঞানীর গবেষণার কথা বলি। এঁদের ধারণা জুভেনাইল ডায়াবেটিসের কারণ ভাইরাস জাতীয় কিছু জীবাণুর সংক্রমণ যার ফলে ডায়াবেটিস্ রোগাক্রান্ত শিশুদের প্যাংক্রিয়াস গ্ল্যাণ্ডের ইনসুলিন তৈরীর কোষগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। সম্প্রতি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে, দশ বছরের এমন একটি শিশুর পোষ্টমর্টেমের সময় প্যাংক্রিয়াস গ্রন্থির টিস্যুতে Coxsackie B_4 নামে এক ধরণের আপাতনিরীহ ভাইরাসের সন্ধান পান এঁরা। সুস্থ ইঁদুরের শরীরে এই ভাইরাস প্রবেশ করিয়ে দেখা গেছে—ইঁদুররা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছে। তবে কি এই Coxsackie B_4 ভাইরাসই ডায়াবেটিসের জন্য দায়ী? এ এতই সাধারণ ভাইরাস যে এখনই বিজ্ঞানীদের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া মুশ্‌কিল্। ওঁদের ধারণা হয়তো বংশগতি অথবা অন্য কোনও ভাইরাসেরও এ অসুখের পেছনে ভূমিকা আছে। অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা যদি নিশ্চিত হন যে জুভেনাইল ডায়াবেটিস সত্যিই Coxsackie B_4 অথবা অন্য কোন ভাইরাসজনিত অসুখ তবে অবশ্য এর প্রতিষেধক টিকা বের করা ওঁদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হবে না।

ইন্‌সুলিনের কথায় আবার ফিরে যাই। ইন্‌সুলিন আবিষ্কার করেছিলেন কানাডার দুই চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক গ্র্যাণ্ট ব্যান্টিং (Frederick Grant Banting) আর চার্লস হারবার্ট্ বেষ্ট (Charles Herbert Best) 1921 সালে। এর পেছনে ছিল ডায়াবেটিসে আক্রান্ত একটি ছোট্ট মেয়ের মৃত্যু। ফ্রেডারিক ব্যান্টিং-এর এক বাল্য সহচরীর মৃত্যুই ব্যান্টিংকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ডায়াবেটিস নিয়ে গবেষণা চালাতে, ইন্‌সুলিন আবিষ্কার করতে। ইন্‌সুলিন আবিষ্কারের পরে ডায়াবেটিসে শিশুমৃত্যু রোধ করা অসম্ভব হয়েছিল। নিয়মিতভাবে ইন্‌সুলিন ইন্‌জেকশন নিয়ে রোগের উপসর্গগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্তে রেখে আজ সারা বিশ্বের কোটি কোটি জুভেনাইল ডায়াবেটিক সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, ইন্‌সুলিন আবিষ্কারের যে বিরাট কোন সুযোগ আমাদের দেশের ডায়াবেটিক শিশুরা নিতে পারছে, এমন কথা বোধ হয় বলা চলে না। মাঝে মাঝেই বাজারে ইন্‌সুলিনের যে সঙ্কট দেখা দেয়, সে কথাতো আগেই বলেছি। এদেশে ডায়াবেটিসে শিশুমৃত্যুর হার অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় এখনও অনেক বেশী। বছর দুয়েক আগে দিল্লীতে যে আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস কংগ্রেস হয়েছিল, বিশেষজ্ঞরা সেখানে এই মতই প্রকাশ করেছিলেন। এর পেছনে মোটামুটি তিনটে কারণ দেখিয়েছেন ওঁরা! প্রথমতঃ আমাদের দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ডায়াবেটিস্ রোগ আর তার আশু চিকিৎসার গুরুত্ব বুঝে উঠতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, ইন্‌সুলিন আমাদের দেশে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়—একজন জুভেনাইল ডায়াবেটিস রোগীর ইন্‌সুলিনের খরচ মাসে 30/40 টাকা, দেশের অধিকাংশ মানুষের এ খরচ চালাবার মত আর্থিক সচ্ছলতা নেই। তৃতীয়তঃ ডায়াবেটিস রোগীদের দরকার কম কার্বোহাইড্রেট এবং বেশী প্রোটিনযুক্ত খাবার। এক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। দেশের অধিকাংশ রোগীর কাছে সে খাবারের লিষ্ট তুলে দিতে ডাক্তারদেরই লজ্জা করে।

সবাই জানেন, আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে দেশজুড়ে শিশুদের কল্যাণে নানারকম কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে। যে লাখো লাখো শিশু ডায়াবেটিসে ভুগছে, অথচ ইন্‌সুলিন চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারছে না, তাদের কথাটাও সেইসঙ্গে ভাবা হচ্ছে না কেন?

ক্যান্সার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

শুক্লা দাশ*

আমাদের জীবনচর্চা কতগুলি অভ্যাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই যেমন প্রয়োজন থাক বা না থাক আমরা ধূমপান করি, পান সুপারি-দোক্তা-খৈনি সেবন করি, মাদক-পানীয় গ্রহণ করি। আমাদের জীবন আবার কতগুলি কর্মধারার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। জীবিকার তাড়নায় ইচ্ছা থাক বা না থাক আমাদের কলকারখানা-ল্যাবোরেটরি ইত্যাদিতে কার্যোপলক্ষে ইউরেনিয়াম অ্যাসবেস্টস্ ও বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে আসতে হয়। অসুস্থ ব্যক্তিকে একাধিকবার এক্স-রে-র সম্মুখীন হতে হয় আবার দৈনন্দিন জীবনে আমাদের খাদ্য তালিকায় এমন লোভনীয় বস্তু থাকে যেগুলি কৃত্রিম রঙে রাঙানো। আপাতঃদৃষ্টিতে দেখতে গেলে এগুলি আদৌ হানিকর মনে হবার নয়, কিন্তু আধুনিক গবেষণার আলোকে বিশ্লেষণ করতে গেলে এদের প্রত্যেকের মধ্যেই বিপদ-সংকেত নিহিত। বিপদ চিন্তাটা, বলা বাহুল্য ক্যান্সার রোগের।

ক্যান্সার নামক রোগ বা রোগসমষ্টি নিয়ে বিশ্বব্যাপী গবেষণা-আন্দোলন আজ বিজ্ঞান জগতে শিরোনাম সংবাদ। কিন্তু এই রোগকে কেন্দ্র করে যে রহস্যময় পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে তার সব চাবিকাঠি এখনও অনুসন্ধানীদের আয়ত্তে আসে নি। ফলতঃ আমরা যে সমতলে দাঁড়িয়েছিলাম তার থেকে বড় বেশী দূর এগোতে পারি নি। অতএব অনুসন্ধানের ধারাকে একটি নতুন বাঁক দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমাদের লব্ধ জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে ক্যান্সার রোগের নিরাময় উদ্ভাবনের পাশাপাশি এই রোগের সম্ভাব্য প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণের ওপর সচেতন গুরুত্ব প্রবণতা এখন সুস্পষ্ট।

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ শব্দ দুটি যদিও সমার্থক নয়, এরা স্পষ্টতই একে অপরের পরিপূরক—অর্থাৎ একটি প্রতিস্পর্ধি শক্তি যা এই রোগকে নিয়ন্ত্রণের ঘেরাটোপে অবরুদ্ধ করতে পারে।

আমাদের অভ্যাসাদি, পেশাগত আপৎ, খাদ্য এবং বিবিধ বাতাবরণ, যার ফলে ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব ঘটে সেগুলি ভালভাবে অনুশীলন করলে ক্যান্সার রোগ সংক্রান্ত প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের সম্যক প্রচেষ্টার পরিধিকে সম্প্রসারিত করা সম্ভব। প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ভাবনাকে মোটামুটি তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে পারি। যথা—শিক্ষণ ও জন সচেতনতা (mass education and conscious. ness), প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ণ ও চিকিৎসা (early detection and treatment ও পরীক্ষামূলক জন-সমীক্ষা (mass screening).

একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে —'যা নয় দমনীয় তাকে সহনীয় করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।' কিন্তু সে হলো নেতিবাচক কথা। বিজ্ঞান চিরআশাবাদী। সেজন্য আজ প্রতিকারের প্রশ্নটা পেছনে রেখে অনুসন্ধিৎসু মানুষ প্রতিরোধের প্রশ্নটাকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার মূল মন্ত্রই হলো রোগী হওয়ার পূর্বেই একটি সুস্থ ব্যক্তির প্রতি যথার্থ দৃষ্টিদান। অর্থাৎ প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা ব্যবস্থায় একটি সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্যই প্রধান উপজীব্য। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন রোগ সম্পর্কে জনশিক্ষা ও সচেতনতা।

ক্যান্সার সম্পর্কে অজ্ঞতা অহেতুক ভীতি ও অবাঞ্ছিত সংস্কার আমাদের জনজীবনকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জনমানসিকতাকে আমরা দুটি

*চিত্তরঞ্জন ন্যাশানাল ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার কলিকাতা-26

পর্যায়ে ফেলতে পারি—(1) এই রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞানতা এবং (2) এই রোগ সম্পর্কে অতিরঞ্জিত জ্ঞান। এই দ্বিবিধ মানসিকতাই মানুষকে ভ্রান্ত পথে চালিত করে। সুতরাং জনসচেতনা অর্থে ক্যান্সার রোধ সম্পর্কিত সম্যক জ্ঞান প্রদান অবশ্য কর্তব্য। এর জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যথা পত্র-পত্রিকা। বিজ্ঞাপন, রেডিও, টেলিভিশন, শিক্ষণ ও পরামর্শ কেন্দ্র ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেকের ধারণায় ক্যান্সার রোগ ও মৃত্যু সমার্থক শব্দ। এই ধারণা থেকে সঞ্জাত ক্যান্সার সম্পর্কে অহেতুক ভীতি। এই ভীতি জনমনস্তত্ত্বকে আবিল করে দিয়েছে। ফলে চিকিৎসকের মুখ থেকে ক্যান্সার শব্দটি শোনার ভয়েই অনেকে চিহ্নিত উপসর্গ দেখা দিলেও যথাসময়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে চায় না। অথচ এই রোগটি বড়ই সময়নির্ভর। প্রথমাবস্থায় নির্ণীত হলে যেমন এই রোগ নিরাময় করা সম্ভব, তেমনই শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেলে যথার্থই কিছু করার অবকাশ থাকে না।

যে সব দ্রব্য অথবা অভ্যাস ক্যান্সার রোগসৃষ্টির সহায়করূপে বিবেচিত হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে সাধারণকে অবহিত করা একান্ত প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ ধূমপান, শ্বাসনালী ও ফুস্‌ফুসের ক্যান্সারের সঙ্গে জড়িত, মাদক-পানীয় মস্তিষ্ক, কণ্ঠ ও কণ্ঠনালী ও যকৃতের ক্যান্সারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। খাদ্যে প্রযুক্ত কৃত্রিম রঙ যকৃত ও আন্ত্রিক ব্যবস্থাকে আক্রান্ত করতে পারে। পান ও তামাক সেবনের অভ্যাসে মুখবিবর ও কণ্ঠনালীতে ক্যান্সার হতে পারে। অতিরিক্ত সূর্যরশ্মির সংস্পর্শ ত্বক-ক্যান্সারের কারণ বলে স্বীকৃত। কয়েকটি অভ্যাসকেও এই রোগের জন্য দায়ী করা যেতে পারে। অত্যন্ত আঁটোভাবে ক্রমাগত ধুতি বা শাড়ি বাঁধলে কোমরে ক্যান্সার দেখা দিতে পারে। কাশ্মীরীরা শীতকালে শরীর গরম রাখার জন্য এক ধরণের জ্বলন্ত অঙ্গারপূর্ণ মাটির মালসা (যার নাম কাঙরী) ব্যবহার করে। শরীরের সঙ্গে এর একটানা সংস্পর্শ কাঙরী ক্যান্সারে পরিণত হতে পারে। গর্ভধারণের পৌনঃপুনিকতা জরায়ু ও জরায়ু-মুখের ক্যান্সার সৃষ্টি করে। এই সব যোগাযোগ খুব সতর্কভাবে বর্জন করার দিকে করা বাঞ্ছনীয়।

ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণগুলি সম্পর্কেও জনসাধারণকে সতর্ক করে দেওয়া দরকার। সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকলেই তারা যাতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে আগ্রহান্বিত হয় তার সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন। যথার্থই যদি রোগ নির্ণীত হয়, তাহলে তার চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জনস্বাস্থ্যের কল্যাণে মারকিন ক্যান্সার সোসাইটি 7টি উল্লেখযোগ্য লক্ষণের দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রাথমিক লক্ষণগুলি হল :—

1. শরীরের কোন স্থান থেকে অস্বাভাবিক রক্ত ক্ষরণ।

2. শরীরের কোন পিণ্ডের (lump or growth) আবির্ভাব।

3 অনুপশমিত ঘা।

4. অন্ত্র (bowel) ও বস্তি (bladder)—এদের স্বাভাবিক নিয়ম ক্ষুণ্ণ হওয়া।

5. গলা ধরা, স্বরভাঙ্গা ও একটানা কাশি।

6. বদহজম ও গলাধঃকরণের কষ্ট।

7. তিল বা আঁচিলের রূপ পরিবর্তন।

উল্লিখিত যে কোন লক্ষণ বেশ কিছুদিন ধরে প্রকট হলে বিশেষজ্ঞের অভিমত নেওয়া শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয়, একটি নৈতিক অবশ্য কর্তব্যও বটে। বিশেষজ্ঞ রোগ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে কতগুলি নিয়মমাফিক পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালিয়ে থাকেন। এদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল কোষ পরীক্ষা বা biopsy। এই প্রক্রিয়ায় আক্রান্ত অথবা সন্দেহ-জনক স্থল থেকে শল্য পদ্ধতি দ্বারা একটি ক্ষুদ্র অংশ অপসারিত করা হয়। সংগৃহীত কোষসমূহকে বিশেষ রাসায়নিক রঙের দ্বারা অনুরঞ্জিত করে অণু-বীক্ষণিক পরীক্ষা চালানো হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে

কোষের অস্বাভাবিকতা ধরা সম্ভব। দেহের গভীরে যেখানে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব নয় সেখানে X-ray ও endoscopy পরীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

নির্ণীত রোগ প্রাথমিক অবস্থায় সুষ্ঠু চিকিৎসা ব্যবস্থা পেতে পারে। এই ব্যবস্থা শল্যচিকিৎসা, রশ্মি চিকিৎসা ও ওষুধ প্রয়োগকেন্দ্রিক। প্রয়োজন মত [illegible]ভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে সক্রিয় করা যায়। চিকিৎসাবিশারদদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় এভাবে বহু রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন এবং অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে চিকিৎসা-উত্তর প্রযত্ন ও সতর্কতার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। রোগমুক্ত ব্যক্তিদের নিয়মিত পরীক্ষা আবশ্যিক এবং তাঁদের স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাও সামাজিক দায়িত্ব।

পরীক্ষামূলক জনসমীক্ষা সাম্প্রতিক প্রতিরোধ-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দাবী রাখে। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ক্যান্সার প্রতিরোধ অভিযানে পরীক্ষামূলক জনসমীক্ষায় অসামান্য সাফল্য লাভ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই উপায় অবলম্বন করে "প্যাপানিকুলো" পরীক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশগুলি জরায়ু-মুখের ক্যান্সার দমন করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছে। স্তন-ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণেও আংশিক সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। তুলনামূলকভাবে এই কাজে আমরা পিছিয়ে থাকলেও ভারতের তিন প্রধান শহর—বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে এই সমীক্ষা অভিযান এখন বিশেষ ভাবে সক্রিয়।

জনসমীক্ষা একটি মূল সূত্র উদ্ধারে তৎপর, যথা ব্যক্তিভেদে ক্যান্সার প্রবণতার বৈষম্য নির্ণয়। সমীক্ষা করে দেখা গেছে, অনেক ব্যক্তি তুলনামূলকভাবে অতিরিক্ত ক্যান্সারপ্রবণ। অপরপক্ষে অন্য অনেক ক্ষেত্রে এই প্রবণতা ক্ষীণ। এই প্রবণতার কারণ হিসেবে বংশগত, পারিপার্শ্বিক আঞ্চলিক, ও জীবিকাগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে দায়ী করা যেতে পারে। সমীক্ষার মাধ্যমে যে সব ক্ষেত্রে এই কারণগুলি সনাক্ত করা গেছে সেখানে এই বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতি উপযুক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আরোপ করার প্রচেষ্টা চলছে।

ক্যান্সার রোগ প্রশমনের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলছে রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের দিগন্ত সম্প্রসারের ব্যবস্থা। এটি ইতিহাসেরই ইঙ্গিত যে বিজ্ঞান থামতে জানে না—অর্থাৎ থামতে শেখে নি। এই গতির মধ্যেই লুকোনো আছে ভবিষ্যত মানুষের জীবনকাঠি।

"আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা যে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা কি নূতন করিয়া বলিতে হইবে? প্রয়োজনীয় বলিলে বরং কম বলা হয়। বিজ্ঞান ব্যতীত আমাদের গতি নাই, রক্ষা নাই।*** মনে করিও না, বিজ্ঞান হইতে কেবল অর্থ লাভই হয়। সংসারে মানুষের বড় কে? মানুষের মনের চেয়ে বড় কি আছে? মানবমন বিজ্ঞানবলে মার্জিত উন্নত ও শক্তিশালী হয়। সমাজনীতি, ধর্মনীতি সমস্তই নানা প্রকারে বিজ্ঞানের নিকট ঋণী। তাই বলি, যদি বাঁচিতে চাও, সভ্য মানবমণ্ডলীর মধ্যে মুখ দেখাইতে চাও বিজ্ঞানের সেবা কর।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

মাটি-ছাড়া চাষ

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য*

গত বছর পশ্চিম বঙ্গের নানা জায়গায় যখন অস্বাভাবিক বন্যা হয়ে গেল তখন স্বভাবতঃই লোকের ভাবনা হয়েছিল, মাটি তো সব জলের তলায়, এখন লোকে খাবে কি? ধান চাষ তো দূরের কথা, তরিতরকারি, আনাজপাতি—এ সবের জন্যও তো চাই পর্যাপ্ত পরিমাণ জমি। সেই জমিই যদি অদৃশ্য হয় তা হলে তো দেশে আবার দুর্ভিক্ষ হবে। কারণ আমাদের প্রধান খাদ্যই তো আসে উদ্ভিদ-জগৎ থেকে।

অবশ্য জল চলে যাবার পর জলের স্রোতের সঙ্গে আসা পলি জমে মাটি উর্বরা হয়। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন কি হবে? তা ছাড়া কতক-গুলি ফসলের আবার লাগাবার এবং ফলবার বিশেষ এক একটা সময় আছে; সে সময় পার হয়ে গেলে এক বছরের মধ্যে তা পাওয়ার আর আশা নেই। তার ওপর দেশের জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। সরকার যতই পরিবার পরিকল্পনা করে "এক-দুই-তিন-ব্যস্" বলুন না কেন, দেশের বেশির ভাগ লোকেই যেখানে অশিক্ষিত এবং যারা বংশবৃদ্ধি করাটাকেই জীবনের সবচেয়ে আনন্দ মনে করে, তাদের কাছে এ সব পরিকল্পনার কতটুকু পৌছয় জানি না। তারা জানে এসব ভদ্রলোকদের জন্য, তাদের ঘরে যতই লোকবল বাড়বে ততই সংসারের আয়ও বাড়বে। ছেলে বা মেয়ে আট-দশ বছর বয়স হলেই কিছু কিছু রোজগার করে সংসারে সাহায্য করতে পারবে। এর ফল যা হয়েছে তা তো আমরা সবাই জানি। সত্তর পঁচাত্তর বছর আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"বিশ কোটি কণ্ঠ না বলে ডাকিলে রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে।" অর্থাৎ তখন গোটা ভারতের জনসংখ্যা ছিল বিশ কোটি। তারপর অতুলপ্রসাদ যখন লিখলেন—"তেত্রিশ কোটি মোরা—মোরা নহি কভু হীন", তখন দেখা গেল বিশ তেত্রিশে গিয়ে ঠেকেছে। তার পর ভারত বিভাগ হল ভারত থেকে বেশ বড় দুটো টুকরো কেটে নিয়ে ভারত থেকে আলাদা করে দেওয়া হল। কিন্তু তাতেও দেখা গেল এখন সেই কাটা অংশের জনসংখ্যাই ষাট কোটিতে এসে ঠেকেছে। আর বছর কুড়ি—পঁচিশের মধ্যেই যে এই ষাট কোটি আশি বা এক-শ' কোটি হয়ে দাঁড়াবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অবশ্য যদি কেউ বলেন, বিজ্ঞানের দিন-কে-দিন যে রকম উন্নতি হচ্ছে তাতে একদিন হয়তো গাছ থেকে খাবার নেবার আর দরকারই হবে না। বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরীতেই এমন সব বড়ি বা ট্যাবলেট তৈরি হবে যার মধ্যে সব রকম খাদ্যগুণ—কার্বো-হাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট—মায় এ থেকে জেড্ পর্যন্ত যাবতীয় ভিটামিন পুরে দেওয়া হবে আর ঐ সব খাদ্যগুণে টইটুম্বুর একটা কি দুটো ট্যাবলেট খেয়ে নিলেই খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলা যাবে। সেদিন আসতে এখনও অনেক দেরী আর, চুপিচুপি বলতে বাধা নেই, খাওয়া তো শুধু দেহপুষ্টির জন্যই নয়, খাওয়ার মধ্যে যে বিরাট একটা আনন্দ আছে ট্যাবলেট কি তা দিতে পারবে? উঁহুঃ, নেভার।

তা হলে? তা হলে অন্য উপায়ে ফসল ফলানো যায় কিনা তার কথাই ভাবতে হবে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, ফসল ফলাবার জন্য যে সব সময় মাটিরই দরকার এ কথা কে বলল? গাছ বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড টেনে নিয়ে সূর্যের

---

* 16 টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-700025

আলোয় তার পাতার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট তৈরি নেয়—এর জন্য তো মাটির কোন দরকার নেই। অবশ্য তার অন্যান্য যা খাদ্য গাছ তা মাটি থেকেই টেনে নেয়। কিন্তু আসলে মাটিটা তো আর সে খায় না, মাটির মধ্যে যে নানা রকম খনিজ পদার্থ আছে—রাসায়নিক লবণ মেশানো আছে, জল আছে—তাই হচ্ছে গাছের খাদ্য, মাটিটা নয়। কাজেই সেই খাবারগুলি যদি তাকে ঠিকমত যোগান দেওয়া যায় তা হলে মাটির কোন দরকারই হবে না তার।

পরীক্ষা করে বহুদিন আগে থেকেই জানা গেছে যে অন্ততঃ ছয়টি মৌলিক পদার্থ গাছের খাদ্যে থাকা চাই-ই। সংক্ষেপে এই ছয়টির নাম সি-এইচ্-ও-এন্-এস্-পি। সি হচ্ছে কার্বন, এইচ্-হাইড্রোজেন, ও-অক্সিজেন, এন্-নাইট্রোজেন, এস্ সালফার বা গন্ধক আর পি-ফস্ফরাস্। এ ছাড়া কিছু পরিমাণ পটাসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম্, লোহা, বোরোন এগুলিও অনেক গাছেরই খাবারে দরকার হয়—সামান্য পরিমাণে হলেও। কোন কোন গাছের আবার ওরই সঙ্গে এক-আধ চিমটি দুষ্প্রাপ্য ধাতুও চাই। যেমন কারো কারো খিদে মেটাতে লাগে একটু মলিবডেনাম, কারো বা ভ্যানাডিয়াম, এমন কি কারো কারো খানিকটা সোনা না পেলেও মন ভরে না। তামা, দস্তা, ম্যাঙ্গানীজ, আয়োডিন—এ সবেরও চাহিদা আছে কারো কারো।

বিজ্ঞানীরা কোন্ গাছের কোন্ রাসায়নিক খাদ্য কতখানি করে দরকার তা পরীক্ষা করে বার করছেন। এবং এও দেখেছেন যে ঐসব রাসায়নিক খাবার যদি অন্য কোন মাধ্যম মারফৎ তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তা হলে মাটির কোন দরকারই লাগবে না। অর্থাৎ মাটি ছাড়াই তখন চাষ করা সম্ভব হবে।

আর তা হয়েছেও যতদূর জানা যায়, ফরাসী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী জ্যাঁ বোসিগলৎই এ বিষয়ে প্রথম পথ দেখিয়ে গেছেন বোসিগল্তের পদ্ধতিটা ছিল এই রকম :
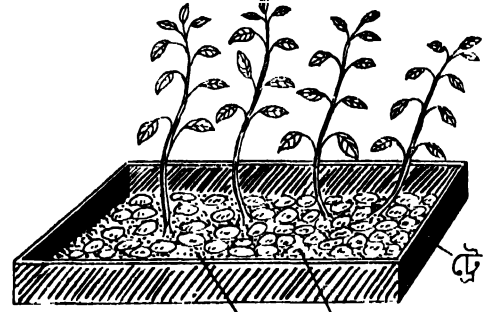
মাটির বদলে খানিকটা বালি আর পাথরকুচি নিয়ে তিনি একটা মস্ত ট্রেতে ছড়িয়ে দিলেন। তার পর যে গাছের চাষ করবেন তার খাবারে কি কি রাসায়নিক পদার্থ কতখানি দরকার তা ঠিক করে নিয়ে সেই বালি আর পাথরকুচির সঙ্গে তা বেশ করে মিশিয়ে দিলেন। দেখা গেল এক ফোঁটা মাটি না থাকা সত্ত্বেও গাছগুলি সেই বালি-কাঁকরের মধ্যেই তরতর করতে বাড়তে লাগল।

এর পর আর একজন জার্মান উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী, জুলিয়ান ফন্ স্যাক্স্ বললেন, মাটিই যখন বাদ দিচ্ছি তখন বালি আর পাথরকুচিরই বা কি দরকার? ওগুলিও বাদ দিয়ে দেখা যাক না! কিন্তু একটা কিছুর মধ্যে তো গাছের ঐ খাদ্যগুলিকে রাখতে হবে! তিনি সেজন্য বেছে নিলেন জল। জলের মধ্যে ঐ সব রাসায়নিক মশলা গুলে তার মধ্যে গাছের চারা বসিয়ে রাখা হল। কিছু বিচিও ছড়িয়ে দেওয়া হল। আর, আশ্চর্য এবারেও চারাগুলি তরতর করে বাড়তে লাগল, বীচিগুলিও ঠিকমতই অঙ্কুরিত হল। স্যাক্স্ কিছুদিন পর পরই জল পাল্টে নতুন করে তাঁর কৃত্রিম খাদ্য যোগান দিয়ে যেতে লাগলেন।

দেখা গেল দেওয়া সার-মাটিতে গাছ যেমন পুষ্ট হয় এ গাছ তার চাইতে কিছু মাত্র অপুষ্ট হল না।

বোসিগল্‌ং ও স্যাক্‌স্‌ যা পরীক্ষাগারে সম্ভব করলেন বাস্তব ক্ষেত্রে সেটা কাজে লাগালেন

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিজ্ঞানী। ক্ষেত বা কিচেন গার্ডেনের বদলে বড় বড় কংক্রিটের চৌবাচ্চা বানিয়ে সম্পূর্ণ মাটি দিয়ে কৃত্রিম খাদ্যের রস ঢেলে দেওয়া হল তাতে। শুধু সারগুলিকে খাড়া রাখার জন্য যেটুকু খোয়া বা কাঁকর না দিলেই নয় তাই রাখা হল ঐসব চৌবাচ্চায়। দেখতে দেখতে সেই সব চৌবাচ্চায় গজিয়ে উঠল ক্ষেতের মতই ছোট-বড় নানান গাছ—শাকসব্‌জি, আনাজপাতি, ইয়া বড় বড় কপি, টোম্যাটো। এমন কি কমলা-লেবুর গাছে বড় বড় কমলালেবুও ফলতে লাগল। ওদের দেখাদেখি এর পর কোন কোন অতি উৎসাহী উদ্যানরসিক বহুতল বাড়ীর ছাদের ওপরেও দস্তুর মত সব্‌জি-বাগান গড়ে তুললেন,—সম্পূর্ণ মাটি বাদ দিয়ে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই মাটি-ছাড়া চাষ বেশ জেঁকে উঠল। কেন না, সৈন্যদের অনেক সময় মরুভূমির রাজ্যে গিয়ে লড়াই চালাতে হত—যেখানে ধূ-ধূ করছে শুধু রুক্ষ বালি—মাইলের পর মাইল। আর কিছু নেই সেখানে। যুদ্ধ করতে হলে ভাল রসদের দরকার। শুধু টিনে ভরা জিয়ানো খাদ্য—মাছ, মাংস বা শুকনো খাবার খেয়ে তো শরীরের সব চাহিদা মেটে না, টাট্‌কা শাকসব্‌জিও কিছু কিছু দরকার। নইলে, সকলেই জানে, কতক-গুলি বিশেষ রোগ এসে আক্রমণ করার আশঙ্কা থাকে। সেখানেও তাই বিজ্ঞানীদের ডাক পড়ল। তাঁরা সেই রুক্ষ মরুপ্রান্তরে রাসায়নিক মশলা ঢেলে দিয়ে শুরু করে দিলেন তাঁদের মাটি-ছাড়া চাষ। আর সত্যি সত্যিই, সেই রুক্ষ মরুভূমির বুকেও এবার ফসল ফলতে শুরু করল। টাট্‌কা শাকসব্‌জি খেয়ে সৈন্যেরা দ্বিগুণ শক্তি আর মনোবল নিয়ে যুদ্ধে মেতে উঠল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর শুরু হল আর এক নতুন অভিযান—যাকে "মরুজয়ের অভিযান" বললে খুব বেশি বাড়িয়ে বলা হবে না। পৃথিবীতে যেমন প্রচুর বনজঙ্গল আছে তেমনি পৃথিবীর নানা জায়গায় বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আজও শুকনো, রুক্ষ চেহারা নিয়ে পড়ে আছে। একটা ঘাসও হয়তো সেখানে জন্মায় না। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি থেকে শুরু করে আরব, মধ্য এশিয়া; অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা, প্যাটাগোনিয়া, এমন কি ভারতেরও রাজস্থান অঞ্চলে হাজার হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা এই রকম শুষ্ক জীর্ণ চেহারা নিয়ে পড়ে আছে। এ যে কী পরিমাণ জায়গা তা বোঝা যাবে এক সাহারার কথা ধরলেই। ঐ একটা মরুভূমিই নাকি আয়তনে আমাদের ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিগুণ। অবশ্য এর সবটাই যে এখনই শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রে পরিণত করা যাবে এমন কথা কেউ বলছে না, কিন্তু এই সব অঞ্চলে এমন সব জায়গাও আছে যেখানে এখনই ঐ রকম কৃত্রিম উপায়ে চাষ করা

অসম্ভব নয় এবং তা করা হচ্ছেও। পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চলেছে এই সবুজ বিদ্রোহ।

অবশ্য, বোঝাই যায়, ভাল মাটিতে ফসল জন্মানোর চাইতে এ পদ্ধতিতে চাষের খরচ অনেক বেশি, কিন্তু কিছু কিছু সুবিধেও যে নেই তা নয়। সবচেয়ে বড় সুবিধে, এখানে সব কিছুই চাষী তথা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর মুঠোর মধ্যে, প্রকৃতির খেয়াল-খুশির ওপর তাকে নির্ভর করতে হয় না। জল কিছুটা দরকার নিশ্চয়ই, কিন্তু মাটির মত অত বেশি পরিমাণ নয়। এমন কি সূর্যের আলো না পেলেও ক্ষতি নেই। বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম সূর্যালোকের সাহায্যে সে বাধাও দূর করতে সমর্থ হয়েছেন।

লোকসংখ্যা, আগেই বলেছি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। শুধু আমাদের দেশেই না, পৃথিবীর সর্বত্র। ভবিষ্যদ্দ্রষ্টারা বলছেন, একদিন হয়তো এমন একটা অবস্থা আসবে যেদিন পৃথিবীর বাইরে অন্য কোন গ্রহ-উপগ্রহে গিয়ে মানুষকে উপনিবেশ গড়তে হবে বাঁচবার তাগিদে। আর, সেখানকার প্রতিকূল পরিবেশে, হয়তো "হট্ হাউসের" মত বিশেষভাবে-তৈরি ঘরের মধ্যে ঐ রকম মানুষের হাতে তৈরি-করা রাসায়নিক রস আর কৃত্রিম সূর্য্য-লোকের সাহায্যে এই ধরণের পদ্ধতিতে শাকসব্জি তৈরি করে নিতে হবে।

অবশ্য এগুলি এখনও কল্পকাহিনী। কিন্তু "অসম্ভব" কথাটা যে মূর্খের অভিধান ছাড়া আর কোথাও নেই নেপোলিয়নের মুখের সেই খাঁটি কথাটাও তো আমরা ভুলতে পারি না!

বিজ্ঞান ও সমাজ

> যাঁরা গ্রহ-নক্ষত্রের হিসাব করে সুখ-দুঃখের নানা ঘটনার পূর্বাভাস দিতে পারেন বলে দাবী করেন এবং তা থেকে জীবিকানির্বাহ করেন তাঁদের সংশ্রবে না থাকাই উচিত।
>
> —গৌতমবুদ্ধ

চার বছর আগে পৃথিবীর এক-শ' ছিয়াশী জন বিজ্ঞানী (যাঁদের মধ্যে আঠার জন ছিলেন নোবেল পুরস্কারবিজয়ী) বিদেশের একটি নামকরা পত্রিকা 'The Humanist' (দি হিউম্যানিস্ট)-এ জ্যোতিষী-দের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করে জানিয়েছিলেন, "যাঁরা জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন তাঁদের জানা দরকার যে, এই শাস্ত্রের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।" 'আপত্তি' শীর্ষক তাঁদের সেই দীর্ঘ আবেদনে তাঁরা বলেছেন—পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্র, রেডিও প্রভৃতির মাধ্যমে যেভাবে মানুষের ভাগ্য-গণনার কথা প্রচার করা হচ্ছে তাতে তাঁরা উদ্বিগ্ন। তারা মনে করেন এতে মানুষের ক্ষতি করা হচ্ছে। তাই তাঁরা জনসাধারণকে এই শাস্ত্রের অসারত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিতে চান। জ্যোতিষীরা এর প্রতিবাদে দাবী করেছিলেন জ্যোতিষ একটি বিজ্ঞান এবং এর গণনা পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। দুঃখের বিষয়, জ্যোতিষীরা তাঁদের দাবীর যথার্থতা এখনও প্রতিপন্ন করতে পারেন নি।

আমাদের ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে 'জ্যোতিষ' শব্দটির অর্থ ছিল আরও ব্যাপক। এর ছিল দুটি শাখা—'গণিত জ্যোতিষ' ও 'ফলিত জ্যোতিষ'। আমরা এখন যাকে 'জ্যোতির্বিদ্যা' বা 'অ্যাস্ট্রোনমি' বলি, তাকেই বলা হত 'গণিত জ্যোতিষ'। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান জেনে মানুষের জীবনের ভাল-মন্দ নির্ধারণ করাই ছিল ফলিত জ্যোতিষের বা

কোষ্ঠী গণনা কি বিজ্ঞানসম্মত?

যুগলকান্তি রায়

astrology (অ্যাস্ট্রোলজি)-র কাজ। আমরা এখন 'জ্যোতিষ' বলতে ঐ 'ফলিত-জ্যোতিষ'-কেই বুঝিয়ে থাকি।

যে মূল অনুমান (বা প্রকল্প)—দুটির উপর জ্যোতিষশাস্ত্র নির্ভর করে আছে তা হল,—(1) মানুষের জীবনের সব কিছু তার জন্মমুহূর্তেই স্থির হয়ে যায় এবং (2) তা স্থিরীকৃত হয় জন্মমুহূর্তে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের দ্বারা। এই প্রকল্প দুটি গ্রহণ করার কি কারণ তা জ্যোতিষীরা আজও ব্যাখ্যা করে বলেন নি অর্থাৎ তাঁদের শাস্ত্রচর্চার মূল ভিত্তি হল দুটি নিছক মনগড়া ধারণা। জ্যোতিষীরা দাবী করেন তাঁরা মানুষের শুধু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-ই বলে দিতে পারেন না, উপযুক্ত ধাতু-রত্নের সাহায্যে মানুষকে তার ভবিষ্যৎ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। জ্যোতিষীরা যখন এই দাবী করেন তখন তারা স্বীকার করে নেন, সেরকম সতর্কতা অবলম্বন করলে মানুষ তার জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে। তাহলে, জন্মমুহূর্তেই মানুষের জীবনের সব কিছু স্থির হয়ে যায়—একথা কি জ্যোতিষীরা নিজেরাই অস্বীকার করছেন না? বিজ্ঞানে এ ধরণের স্ববিরোধিতার স্থান নেই।

জ্যোতিষীরা যখন মানুষের জন্মসময়, জন্মতারিখ, থেকে সেসময়ে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তার ভাগ্য-গণনা করেন তখন তারা অবশ্যই মানুষের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের বিশেষ প্রভাবের কথা স্বীকার করে নেন। আগেই বলেছি, গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব কিভাবে পড়ছে, সেই প্রভাব কিভাবে মানুষের জীবনের সমস্ত ঘটনা আগে থেকে স্থির করে দিচ্ছে, জন্মমুহূর্তেই সেই প্রভাবের কথা বলা হচ্ছে কেন এর কোনটিরই সঠিক উত্তর তাঁরা দিতে পারেন নি।

প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিদ এবং জ্যোতিষী উভয়েই যে নয়টি গ্রহের কথা বলতেন সেগুলি হল সূর্য, চন্দ্র, রাহু, কেতু, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি।

পরে জ্যোতির্বিদরা যখন জানলেন সূর্য একটি নক্ষত্র, চন্দ্র একটি উপগ্রহ এবং রাহু, কেতুর কোন অস্তিত্ব নেই তখনই তাঁরা গ্রহের তালিকা থেকে ঐ চারটিকে বাদ দেন। বিজ্ঞানের মহত্ত্ব এখানেই যে, সে সত্যানুসন্ধানে কখনও থেমে থাকে না, নতুন জ্ঞানের আলোকে সে পুরানো ধারণাকে বদলে নেয়। কিন্তু, জ্যোতিষীরা এখনও রাহু, কেতুকে গ্রহ বলে ধরে নিয়ে হিসেব-নিকেশ করছেন; ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো—এই তিনটি গ্রহের নাম পর্যন্ত করেন না। এর পর তাঁদের গণনা কি করে বিজ্ঞান সম্মত বলা যায়? ভুল ধারণার উপর যে শাস্ত্র গড়ে উঠে, তা মানুষকে কি নির্ভুল পথ দেখাতে পারে?

লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত গ্রহগুলি কি করে মানুষের উপর এমন প্রভাব ফেলতে পারে যাতে তার জন্মমুহূর্তেই তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়? এর ব্যাখ্যা জ্যোতিষীরা দিতে পারেন নি। এর পক্ষে তাঁরা যে যুক্তি দেন তা নিতান্তই হাস্যকর—অর্থাৎ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভাষায়, 'চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়, তবে রামকান্তের জজিয়তী কেন হইবে না,……'! গ্রহের প্রভাব বলতে বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত তার মহাকর্ষ ও বিকিরণের প্রভাবের কথাই জানেন। অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক বোক্ এ সম্পর্কে 'The Humanist'-এর ঐ সংখ্যাতেই বলেছেন, "সদ্যজাত শিশুর উপর তার পাশে উপস্থিত চিকিৎসক, নার্স, তার মা এবং সেই ঘরের আসবাবপত্রের মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবের কাছে তো মহাকাশের জ্যোতিষ্কগুলির প্রভাব খুবই নগণ্য। এবং নক্ষত্রগুলি সূর্য এবং পৃথিবী থেকে এত দূরে অবস্থিত যে তাদের মহাকর্ষীয়, চুম্বকীয় এবং অন্যান্য প্রভাব উল্লেখ করার মত নয়।" বিকিরণের প্রভাব সম্পর্কে অধ্যাপক বোক বলেছেন, যে ঘরে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তার দেয়াল অত দূরের বিকিরণকে আটকাবার পক্ষে যথেষ্ট। তাছাড়া, চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহের সম্মিলিত বিকিরণ অপেক্ষা সূর্য থেকে আগত বিকিরণ অনেক বেশী ও শক্তিশালী। সুতরাং, এ কারণে কোন প্রভাব থাকলে তা সূর্যের জন্যই হবে। উপরন্তু সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র যখন মূলত: একই উপাদানে গঠিত তখন দেখে শুনে দূরের গ্রহগুলির প্রভাবই বা বেশী হবে কেন? মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, সুখ-দুঃখ, বিবাহ, মৃত্যু প্রভৃতি জীবনের যাবতীয় ঘটনা তার জন্মমুহূর্তে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের উপর নির্ভর করে—একথা বলা হাস্যকর ছাড়া কি?

এবার আসি মানুষের 'জন্মসময়'টির কথায়। আমরা জানি, একটি শিশুর জন্ম কোন মুহূর্তের ঘটনা নয়, তা একটি চলমান প্রক্রিয়া। জ্যোতিষীরা এটা ভাবেন না। 'জন্মসময়' নিয়ে জ্যোতিষীদের মধ্যে মতভেদ আছে। মাতৃগর্ভ থেকে শিশুটি যখন যখন সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসে কেউ কেউ সে সময়টি ধরেন, কেউ বা নাড়ী ছেদনের সময়টি ধরেন। তাহলে দু-রকম সময়ে গ্রহগুলির অবস্থান দু-রকম হবে; তখন, একই মানুষের দু-রকম ঠিকুজী হবে। কোনটি তাহলে ঠিক? নাকি, কোনটাই নয়? তাছাড়া, একই হাসপাতালে একই সময়ে যে সব শিশু ভূমিষ্ঠ হচ্ছে তাদের সকলেরই ভবিষ্যৎ তাহলে মোটামুটি একই হওয়া উচিত। কিন্তু, তা হয় না। দেখা গেছে, শিশুর ভবিষ্যৎ অনেকখানি নিভর করে সে যে সামাজিক, পারিবারিক নানা পরিবেশের মধ্য দিয়ে বড় হচ্ছে তার উপর। তাছাড়া, জ্যোতিষীরা যাঁদের ঠিকুজী-কোষ্ঠী তৈরি করেন তাঁদের 'জন্মসময়'টি ঠিকভাবে বলা হয়েছে কিনা বা বলা আদৌ সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখেন না। কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় বা তার নাড়ী ছেদনের সময় ডাক্তার, নার্স বা প্রসূতির বাড়ীর লোকজন এত উদ্বেগ ও ব্যস্ততার মধ্যে থাকেন যে তাঁদের কারো পক্ষেই সে সময় ঘড়ি দেখে নির্ভুল সময় লিখে রাখা সম্ভব হয় না। তাহলে, জ্যোতিষীরা কিসের ভিত্তিতে পূর্বাভাস দেন? কোন একটা ঘটনা মিললে জ্যোতিষশাস্ত্রের বড়াই করব, আর না মললে 'জন্মসময়'টিকে ভুল বলে বা গণনা ভুল হয়েছে বলে জ্যোতিষের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখব তা চলে না।

কখনও কখনও বলা হয় 'জ্যোতিষ' একটি 'পরিসংখ্যান বিজ্ঞান' বা 'সম্ভাবনার বিজ্ঞান'— অর্থাৎ, জ্যোতিষীরা কোন একটি ঘটনার সম্ভাবনার কথাই বলেন। কিন্তু সে ঘটনা, ঘটার সম্ভাবনা কতখানি—তা তাঁরা বলেন না। অথচ, পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে বা সম্ভাবনার বিজ্ঞানে সেটাই অন্যতম মূল কথা। জ্যোতিষীরা যে পূর্বাভাস দেন তা সব সময় ভাসাভাসা, এবং তার দু-রকম অর্থ করা যায়। যেমন, 1979 সালের 22শে আগষ্টের একটি দৈনিক পত্রিকায় মীন-এ বলা হয়েছে, 'স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান'। সেদিন শরীর খারাপ না হলে জ্যোতিষী বলবেন তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন তাই কিছু হল না; আর শরীরে কোন গণ্ডগোল হলে তিনি বলবেন, 'আমার কথা মিলেছে, ঠিকমত সাবধান হলে শরীর খারাপ হত না।'

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বহু পূর্বেই তাঁর 'ফলিত জ্যোতিষ' প্রবন্ধে (বিজ্ঞান গ্রন্থ) লিখেছেন, "একটি সোজা কথা বলি। ফলিত জ্যোতিষকে যাঁহারা বিজ্ঞানবিদ্যার পদে উন্নীত দেখিতে চাহেন তাঁহারা এইরূপ করুন। প্রথমে তাঁহাদের প্রতিপাদ্য নিয়মটা খুলিয়া বলুন। মানুষের জন্মকালে গ্রহ-নক্ষত্রের স্থিতি দেখিয়া কোন্ নিয়মে গণনা হইতেছে তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হইবে। ...ধরি মাছ না ছুঁই পানি হইলে চলিবে না। তাহার পর হাজার খানেক শিশুর জন্মকাল ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিতে হইবে, এবং পূর্বের প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে গণনা করিয়া তাহার ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিতে হইবে।...পূর্বে প্রচারিত ফলাফলের সহিত প্রত্যক্ষ ফলাফল মিলিয়া গেলেই ঘোর অবিশ্বাসীও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসে বাধ্য হইবে। হাজারখানা কোষ্ঠীর মধ্যে যদি নয়শ' মিলিয়া যায় তবে মনে করিতে হইবে যে, ফলিত জ্যোতিষে অবশ্য কিছু আছে। যদি পঞ্চাশখানা মাত্র মেলে তবে মনে করিতে হইবে তেমন কিছুই নাই। হাজারের বদলে যদি লক্ষটা মিলাইতে পার, আরও ভাল। সহস্র পরীক্ষাগারে ও মানমন্দিরে বৈজ্ঞানিকেরা যে রীতিতে ফলাফল গণনা ও প্রকাশ করিতেছেন সেই রীতি আশ্রয় করিতে হইবে। কেবল নেপোলিয়ন ও বিদ্যাসাগরের কোষ্ঠী বাহির করিলে অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মিবে না।"

জ্যোতিষীরা রামেন্দ্রসুন্দরের 'সোজা কথা'-টি না শুনে মানুষের (শিক্ষিত বা অশিক্ষিত) অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে একদিকে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াচ্ছেন, অপরদিকে জনসাধারণের চিত্তশক্তিকে দুর্বল করে তাঁদের জীবনে বিপদ ডেকে আনছেন। মানুষ যে নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা—কোন গ্রহ, কোন ঈশ্বর তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না—এই কথাটা উপলব্ধি করার চেষ্টা না করে তাগা-তাবিজ, মন্ত্র-পুরোহিত, কাল্পনিক ঈশ্বর ও অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে সমস্ত উদ্যম হারিয়ে ফেলছে। আবার, দুর্বলচিত্ত মানুষ জ্যোতিষীর মুখে রোগের পূর্বাভাস শুনে তার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, কেউ বা জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস করে নিজের পরিবারের লোকজনের উপর অকারণ সন্দেহ করে পারিবারিক জীবনে অশান্তি আনছেন। সাম্প্রতিক কালে অনেক রাজনৈতিক নেতা তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের নানা ব্যাপারে জ্যোতিষীদের শরণ নিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি বাড়াচ্ছেন।

আশি বছরেরও বেশী হল বিবেকানন্দ একটু বিদ্রূপ করেই বলেছিলেন, "যদি নক্ষত্র আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলে ফেলুক, তাতে ক্ষতি নেই। যদি কোন নক্ষত্র আমাদের জীবনকে বিব্রত করেও তাতে কিছু আসে যায় না। আপনারা এটা জানুন যে, জ্যোতিষে বিশ্বাস সাধারণতঃ একটি দুর্বল মনের লক্ষণ; সুতরাং, মনে এই দুর্বলতা এলেই আমাদের উচিত ডাক্তার দেখিয়ে ভালভাবে খাওয়া আর বিশ্রাম করা।" (Complete works, Vol III, page 183)। দুঃখের বিষয়, বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও আমাদের সে দুর্বলতা কাটে নি—বরং আরও বাড়ছে!

বিজ্ঞানঃ সাধনা বনাম পেশা

জয়ন্ত বসু*

কলকাতার এক তরুণ বিজ্ঞানী মনীষ তার চাকুরীস্থলে পদোন্নতির আশায় একটি দরখাস্ত করেছিল। তার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে নি, ছিঁড়েছে যথারীতি কর্তৃপক্ষের নেকনজরে থাকা তার এক সহকর্মীর ভাগ্যে। মনীষ যখন বিজ্ঞানচর্চা শুরু করেছিল, তখন সেটা ছিল তার কাছে সাধনার বিষয়। কয়েক বছরের মধ্যেই পারিপার্শ্বিকের চাপে সেটা এখন নেহাৎ পেশায় পর্যবসিত—কোন রকমে পদোন্নতি হয়ে আয় ও সুযোগ-সুবিধে যাতে বাড়ে, তাই তার এখন একমাত্র লক্ষ্য। আশাহত হয়ে সে বেশ খানিকটা মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। শ্মশান-বৈরাগ্যের মত এক ধরণের বৈরাগ্যের বশে সে শেষ বিকেলের পড়ন্ত আলোয় গিয়ে বসলো গঙ্গার তীরে নিরিবিলি এক জায়গায়। আমাদের দেশে যে আদর্শহীন, লক্ষ্যভ্রষ্ট বিজ্ঞানচর্চার কার্যক্রম হাল-ভাঙ্গা নৌকার মত ভাসতে ভাসতে অনির্দিষ্ট পথে চলেছে, তারই কথা সে ভাবছিল। গঙ্গার মৃদুমন্দ বাতাস ও আলস্যের আমেজে একটু পরেই তার চোখে তন্দ্রা নেমে এল।

তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে মনীষ দেখলো দু-জন যুবতী তার পাশের বেঞ্চিতে এসে বসলো। একজনের পরনে আটপৌরে শাড়ি, মুখে প্রসাধনের চিহ্ন নেই, তবে তার সারা শরীর জুড়ে এক আশ্চর্য স্নিগ্ধ সুষমা। অন্য জনের পরনে বাহারে শাড়ি, মুখখানি হরেক প্রসাধন-সামগ্রীর বিজ্ঞাপন, একটা বেশ চটক আছে তার চেহারায়। দু-জনের কথাবার্তা মনীষ শুনতে পাচ্ছিল যা থেকে সে বুঝলো, প্রথম যুবতীর নাম সাধনা আর দ্বিতীয়ের নাম পেশা। বিজ্ঞান নামে একজন যুবকের বিষয় তারা আলোচনা করছিল। তাদের কথোপকথন হচ্ছিল। এই রকম :-

পেশা বলছিল, দেখ, সাধনা, তুই মিথ্যে মুখ গোমড়া করে, আছিস। জানিস তো, 'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান'। মনে কর না কালস্রোতে তোর গরিমাও ভেসে গেছে। বিজ্ঞানের ওপর এককালে তোর যে প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, তা কি তার চিরকাল থাকবে?

সাধনা : বিজ্ঞানের কাছে যাবার জন্যে তখন এত লোকের ভিড় ছিল না, কিন্তু যারা আসতো, তাদের অধিকাংশই বিজ্ঞানের বাইরের মহলে ঘোরাফেরা করে সন্তুষ্ট থাকতো না, যেতে চাইতো অন্দর মহলে। কিন্তু সেখানকার চাবিকাঠি তো আমার কাছে। তাই তারা আমার শরণাপন্ন হত আমিই চাবি খুলে তাদের পথ দেখিয়ে দিতাম। জানি, তাদের অনেকেই তোর কাছেও ধরণা দিত— কিন্তু সে তো কেবল বিজ্ঞানের প্রাসাদের ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢোকবার ছাড়পত্রের জন্যে।

পেশা : মানলাম সে কথা—তখন সুয়োরাণী ছিলি তুই। তবে দিন তো সব সময় সমান যায় না। বিজ্ঞানের কাছে থাকবার জন্যে এখন যত লোক আমার ভজনা করে, তাদের ক'জন আর যায় তোর কাছে!

সাধনা : আসলে কি জানিস, আমার দৌলতে বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি যত বেড়েছে, আমার প্রতিপত্তি কমেছে সেই অনুপাতে, বিজ্ঞান এখন সমাজের একজন কেউকেটা হয়ে উঠেছে, বিজ্ঞানের কাছে থাকবার জন্যে প্রচুর লোক এসে ভিড় করছে তোর

*সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700009

কাছে। তোর দাক্ষিণ্যে তারা বিজ্ঞানের প্রাসাদে এসে ঢুকছে। বিজ্ঞানের বাইরের মহলে এখন অনেক জৌলুষ জমেছে—অর্থের জৌলুষ, ক্ষমতার জৌলুষ। সেই জৌলুষের চোখ-ধাঁধানি আলো বেশির ভাগ মানুষকে বন্দী করে রেখেছে, মধুলোভী মৌমাছির মত তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই জৌলুষের চারপাশে। বিজ্ঞানের অন্দরমহলে যাবার জন্যে তাদের কোন তাগাদা নেই—তাই তারা আমার কাছে আর আসে না। অধিকাংশ মানুষের কাছে অন্দরমহলের চেয়ে বাইরের মহল এখন বেশি আকর্ষণীয়—বিজ্ঞান এখন যতখানি সাধনার, তার চেয়ে অনেক বেশি পেশার।

পেশা : এটাই তো স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের সান্নিধ্য মুষ্টিমেয় কয়েক জনের মধ্যে সীমিত থাকবে কেন? এটা জনগণের যুগ আমি জনগণের জন্যে বিজ্ঞানের দরজা খুলে দিয়েছি।

সাধনা : সত্যিকারের জনগণের জন্যে কি তুই বিজ্ঞানের দরজা খুলে দিতে পেরেছিস? তা যদি পারতিস, তাহলে ভারতের মত দেশে বিজ্ঞানের এই হাল হত না। এখানে যে সব প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানের নামে পুষ্পার্ঘ্য সাজানো হয়, সেগুলির বেশির ভাগই ঘর সাজাবার কাগজের ফুলের মতন তাদের না আছে সজীবতা, না আছে দেশের মাটির সঙ্গে সম্পর্ক।

তোর প্রসাদে পুষ্ট হয়ে যে সব লোক বিজ্ঞানের কাছে আসছে, তাদের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে তাদের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে উঠছে—যেন তেন প্রকারেণ নিজের সুযোগ-সুবিধে বাড়ানো, নিজের ক্ষমতা বাড়ানো, নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানো।

পেশা : তুই তো স্বীকার করবি যে, ইতিহাসের জটিল নিয়মে ভারতের সমাজে একটি অকালপক্ক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে—ভেতর থেকে ভালভাবে পেকে ওঠবার আগেই তাতে পচন শুরু হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের কাছে যারা আসে, তাদের ওপরও যে এই ধনধর্মী সমাজের প্রভাব পড়বে, তাতে আর আশ্চর্য কি? তবে এই সমাজের দূষিত হাওয়াকে আমি বিজ্ঞানের প্রাসাদে ঢুকতে দিই না।

সাধনা : বিজ্ঞানের আওতার মধ্যেই যে তুই এক ধরণের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলছিস, তা কি কোন দিন খেয়াল করিস নি? ধনতন্ত্রে একদিকে থাকে বুর্জোয়া শ্রেণী, অন্য দিকে শ্রমিকশ্রেণী, মাঝখানে পাতি-বুর্জোয়া। অনেকটা সেইরকম ভাবেই তথা-কথিত বিজ্ঞানসেবকদের মধ্যে চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর, বিভাগীয় প্রধান প্রভৃতিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে ওপর তলার শ্রেণী; নিচের তলায় রয়েছে রিসার্চ ফেলো, রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট, টেকনিক্যাল অ্যাসিসটেন্ট ইত্যাদি। মাঝখানে আছে লেকচারার, রীডার, প্রফেসার, সায়েন্টিফিক অফিসার প্রভৃতি যাদের শ্রেণী-চরিত্র অনেকটা পাতি-বুর্জোয়ার শ্রেণী চরিত্রের মতন। অবশ্য বুর্জোয়া, পাতি-বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের যে শ্রেণী-চরিত্র এবং তাদের মধ্যে স্বার্থের যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী, বিজ্ঞানসেবকদের ক্ষেত্রে তা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু ভারতের বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মধ্যেও প্রায় একই ধরণের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

পেশা : তোর কথায় নতুনত্বের চমক আছে, কিন্তু কথাগুলো অর্থহীন।

সাধনা : বর্তমান যুগেও যে গুটি কয়েক লোক আমার ভজনা করে, তাদের কাণ্ডকারখানা সমাজের ফাঁপা মানুষগুলির কাছে অর্থহীন, নেহাৎই নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু সেই ক'টি 'বুদ্ধিহীন' মানুষের কাঁধেই ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে মানুষের সভ্যতা, মানুষের সংস্কৃতি।

তুই তো জানিস, আমি কোন জিনিষের বাইরের খোলস দেখে সন্তুষ্ট হই না, আমার সন্ধানী দৃষ্টি থাকে প্রত্যেক বিষয়ের অন্তর্লোকে। আমার যে কথাগুলো তোর অর্থহীন মনে হল, সেগুলোকে একটু তলিয়ে দেখ—সে সব কথা ঠিক কি-না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকদের পরিশ্রমের বিনিময়ে যা ন্যায্য পাওনা,

তার কিছুটা আত্মসাৎ করে বুর্জোয়া। বহু শ্রমিককে শোষণ করা যে surplus value বা উদ্বৃত্ত মূল্য, তাই দিয়ে গড়ে ওঠে বুর্জোয়ার মুনাফা। বিজ্ঞান-সেবকদের মধ্যে যারা নিচের তলার মানুষ, তারাও সেইরকম তাদের কাজের জন্যে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব পায় না, পদাধিকার বলে নানান কৌশলে তাদের প্রাপ্য কৃতিত্বের বেশ কিছুটা আত্মসাৎ করে ওপর তলার লোকগুলি। ওপরের এই লোকেরা তাদের শ্রেণী স্বার্থ সম্বন্ধেও অত্যন্ত সচেতন—এরা পরস্পরের পৃষ্ঠ-পোষকতা করে, একে অন্যের অন্যায়ের প্রতিবাদ তো করেই না, বরং প্রশ্রয় দেয়। বিজ্ঞানসেবকদের মধ্যে এরা সংখ্যায় শতকরা মাত্র 1 ভাগের মত, কিন্তু বিজ্ঞানকে পরিচালনা করবার ক্ষমতার শতকরা 99 ভাগ এদের হাতে কেন্দ্রীভূত। বস্তুত: বিজ্ঞানের প্রাসাদ এখন এদের শ্রেণী-স্বার্থের লীলাক্ষেত্র।

পেশা: আর তুই যাদের পাতি-বুর্জোয়াদের সঙ্গে তুলনা করলি, সেই মাঝারি তলার বিজ্ঞান সেবকদের ভূমিকা কী ?

সাধনা: তারা একদিকে ওপর তলার লোকদের দ্বারা শোষিত হয়, অন্যদিকে নিজেরা নীচের তলার লোকদের অল্পবিস্তর শোষণ করে। এদের চরিত্র স্বভাবতঃই দোদুল্যমান—কখনো এরা ওপরের তলার পক্ষে, কখনো নিচের তলার। এদের মধ্যে গুটি কয়েক থাকে ওপরের তলার একেবারে তাঁবেদার—তাদের মাধ্যমেই ওপরের তলার পক্ষে শাসন এবং শোষণ চালানো সহজ হয়।

সাধনা একটু থেমে বোধ হয় নিজের মনের ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে নিয়ে বললো, ভারতের মত দেশে বিজ্ঞানের চারপাশে যে লজ্জাকরজনক ব্যবস্থা, তার কারণ কি কি জানিস ? এক, সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই ব্যবস্থাকে মদত দিচ্ছে, বিজ্ঞানের রাজত্বে গণতন্ত্রকে জোরদার না করে স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। দুই, ওপরের তলার লোকেরা কেবলমাত্র পদাধিকার বলে প্রভূত ক্ষমতায় অধিকারী এবং তারা শ্রেণী-স্বার্থ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। তিন, নিচের তলা এবং মাঝের তলারও লোকদের মধ্যে ঐক্য নেই বললেই চলে, তাদের শ্রেণী-সচেতনতাও খুব সামান্য। বার্নার্ড শ এক সময় এই রকম বলেছিলেন: ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শোষিত জনগণের মধ্যে শতকরা এক ভাগের হয়তো সম্ভাবনা থাকে ওপরের স্তরে ওঠার। সেই মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে শতকরা 100 জন। প্রত্যেকেরই আশা, বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মত তার ভাগ্যেও হয়তো শিকে ছিঁড়বে। বিজ্ঞানের রাজত্বে নিচের ও মাঝের তলার মানুষদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। এক ধরণের লটারি মনোবৃত্তিতে এরা সবাই ভুগছে।

এমন সময় গঙ্গার বুকে একটা জাহাজের ভোঁ-এর শব্দে মনীষের তন্দ্রা কেটে যায়। সে বুঝলো, গঙ্গাতীরের শান্ত পরিবেশ ও সুস্নিগ্ধ বায়ু তার ক্লান্ত মনে যে নেশার আমেজ সৃষ্টি করেছিল, তাতে তার অবস্থা হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী সৃষ্ট নেশাখোর কমলাকান্তের মত।

স্মরণে

রবার্ট উডওয়ার্ড ঃ এক অনন্য বিজ্ঞান-প্রতিভা

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

বিধাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র একদা কৃত্রিম বিশ্ব গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর সে প্রয়াস কতদূর সফল হয়েছিল তা আমরা জানি না। কিন্তু আধুনিক যুগের 'বিশ্বামিত্র'-র প্রকৃতিদেবীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে যে বহুবিধ সামগ্রী সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন তা আমরা জানি। সম্প্রতি প্রয়াত সংশ্লেষণ রসায়ন বিজ্ঞানী রবার্ট বার্নস উডওয়ার্ড ছিলেন এমন এক স্রষ্টা যাঁর অনন্য প্রতিভা বিস্ময়কর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাসাচুসেটের বস্টন শহরে 1917 সালে উডওয়ার্ডের জন্ম। ছোট বেলায় তাঁর বাবা-মা তাকে এক সেট রসায়নের জিনিসপত্র কিনে দেন, তখন থেকেই উডওয়ার্ড রসায়নের দিকে আকৃষ্ট হন। 16 বছর বয়সে তিনি বিজ্ঞানে স্নাতক হন এবং চার বছর পরে মাসাচুসেট ইনস্টিট্যুট অফ টেকনোলজি থেকে রসায়নশাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। 1937 সালে তিনি পোস্ট-ডক্টরেট ফেলোশিপ লাভ করে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তার যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। পরবর্তী কালে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ডোনার অধ্যাপক পদে বৃত হন।

সংশ্লেষণ—রসায়নে অসামান্য অবদানের জন্যে ডঃ উডওয়ার্ডের বিশ্বজোড়া খ্যাতি। তাঁকে আধুনিক কালের জৈব সংশ্লেষণ রসায়নে সর্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন-বিজ্ঞানী বলা হত। এই কথাটি মোটেই অত্যুক্তি নয়। 1942 সালে তিনি যখন রসায়ন-বিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রটিতে প্রবেশ করেন, তখন যুদ্ধের দরুন কুইনাইনের বিশেষ অভাব দেখা দেয়। কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্রস্তুত করা যায় কিনা তা গবেষণা করে দেখবার জন্যে উডওয়ার্ডের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। 14 মাস এই বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার পর তিনি এবং তাঁর সহকর্মী ডঃ উইলিয়ম ই ডোরিং আলকাতরার উপজাত বেনজালডিহাইড থেকে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্রস্তুত করতে সমর্থ হন। 1944 সালে সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্রস্তুতের পূর্ণ বিবরণী প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে উডওয়ার্ড সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে প্রস্তুত হল একের পর এক কোলেস্টেরল, স্ট্রিকনিন, লাইসারজিক অ্যাসিড এবং রেসারপিন। ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ সর্পগন্ধা থেকে প্রাপ্ত উপাদানটি তিনি সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে প্রস্তুত করেন।

পরবর্তী 5 বছর কালে উডওয়ার্ড উপক্ষার ও অতিকায় অণু (পলিমার) সম্পর্কিত কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সম্পাদন করেন। অ্যানহাইড্রো-কার্বক্সি অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমারিজেশনের দ্বারা পলিপেপটাইড সংশ্লেষণ তার এই সময়কার মূল্যবান কাজ। এই সময় তিনি প্যাটুলিন (Patulin) নামে একপ্রকার ছত্রাকের গঠনবৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও গবেষণা করেন এবং সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে এর গঠনশৈলী প্রতিষ্ঠিতও করেন।

উডওয়ার্ডের এই অবদান প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীরা

*দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-700029

মন্তব্য করেছিলেন : 'প্রকৃতিতে বিকাশ ও বৃদ্ধির যে প্রক্রিয়া রয়েছে, উডওয়ার্ড তা প্রায় অনুকরণ করেছেন।' তাঁর আগে আর কেউ এই কাজ সম্পন্ন করতে পারেন নি। যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে উডওয়ার্ড এই অতিকায় অণুগুলি সৃষ্টি করেন, সেই প্রক্রিয়া মধ্যে যে প্রচুর সহজলভ্য উপাদানগুলি আছে, তিনিই সর্বপ্রথম সেগুলিকে সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণ করেন। এই স্টেরয়েডের মধ্যে আছে কর্টিসোন, ডিজিটেলিস, ভিটামিন-D, যৌন হর্মোন ইত্যাদি নানা উপাদান।
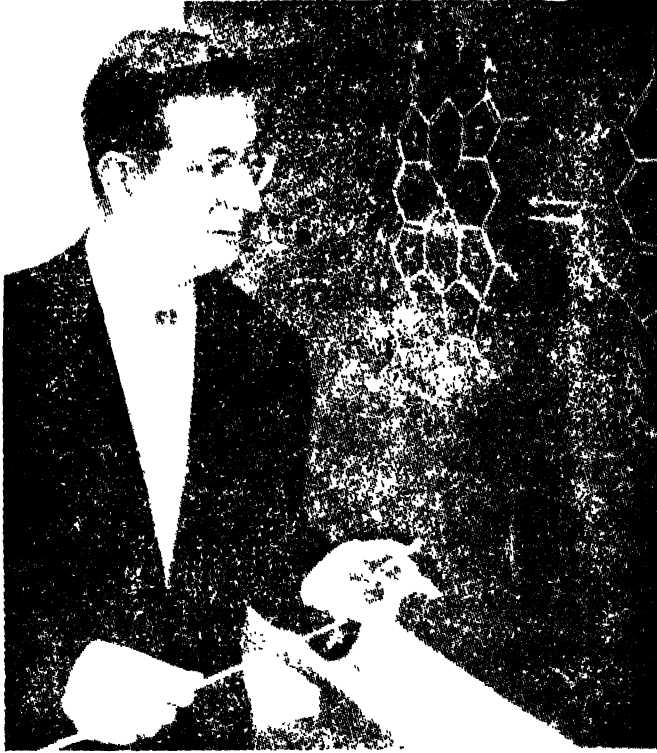
রবার্ট বার্নস উডওয়ার্ড

রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান। প্লাস্টিক ও কৃত্রিম তন্তু প্রস্তুতে, অ্যান্টিবায়োটিক গবেষণায় এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণায়, বিশেষত মানব-দেহে প্রোটিন গ্রহণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যায়, উডওয়ার্ডের প্রক্রিয়াটিই এখন অনুসৃত হয়।

1951 সালে উডওয়ার্ড এমন একটি আবিষ্কার করেন, যা রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম আবিষ্কার বলে অভিহিত হয়ে থাকে। স্টেরয়েডের

1960 সালে ক্লোরোফিলের সম্পূর্ণ সংশ্লেষণ উডওয়ার্ডের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। এই কৃতিত্বের স্বীকৃতিতে 1965 সালে তাঁকে রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিংশ শতকে সংশ্লেষণ রসায়নের ক্ষেত্রে ক্লোরোফিলের সংশ্লেষণকে সম্ভবত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে আখ্যাত করা যায়। আর এই কারণেই ড. উডওয়ার্ডকে 'সংশ্লেষণ-রসায়নের যাদুকর' বলে

অভিহিত করা হয়। আমরা জানি ক্লোরোফিল হচ্ছে সবুজ রঙের জটিল রাসায়নিক পদার্থ, যার দরুন গাছের পাতার রং সবুজ হয়। রাসায়নিক দিক থেকে ক্লোরোফিল হচ্ছে অতিকায় জটিল অণু। এই অতিকায় অণুর সাহায্যে সালোক-সংশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে, গাছপালা জল ও বায়ুর কার্বন-ডাই অক্সাইডকে জৈব বস্তুতে পরিণত করে।

ক্লোরোফিলের সংশ্লেষণ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। কারণ বাস্তব বা আর্থিক দিক থেকে কৃত্রিম উপায়ে ক্লোরোফিল প্রস্তুতের বিশেষ কোন সার্থকতা নেই। কিন্তু এর গঠন-বৈচিত্র্য অনুধাবন করলে ক্লোরোফিল গাছপালার দেহে কিভাবে কাজ করে তা ভালভাবে উপলব্ধি করা যায় এবং পুষ্টির দিক থেকে এর একটা তাৎপর্য আছে। 1972 সালে অধ্যাপক উডওয়ার্ড এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁর সহকর্মীরা সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে অতি-জটিল ভিটামিন-B_{12} প্রস্তুত করে বিজ্ঞানজগতে এক বিস্ময় সৃষ্টি করেন। গবেষণাগারে এই অতি জটিল অণু প্রস্তুত করা প্রায় অসম্ভব বলে ভাবা হত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 1972 সালে নয়া দিল্লীতে আয়োজিত প্রাকৃতিজ উপাদানের অষ্টম আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রে ডঃ উডওয়ার্ড ভিটামিন-B_{12}-এর সম্পূর্ণ সংশ্লেষণের কথা সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন।

শুধু সংশ্লেষণ রসায়নের ক্ষেত্রে নয়, তত্ত্বীয় রসায়নশাস্ত্রেও উডওয়ার্ডের অবদান অসামান্য। তাঁর কাজে তত্ত্বীয় দূরদৃষ্টি ও পরীক্ষাগত প্রতিভার এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। রাসায়নিক যৌগের গঠন-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় আলট্রা-ভায়োলেট এবং ইনফ্রা-রেড অঞ্চলে বর্ণালীবীক্ষণ প্রয়োগের সম্ভাব্যতা তিনিই প্রথম দেখান। তাঁর এই পথ প্রদর্শনের ফলে ইনফ্রা রেড বর্ণালীবীক্ষণ পদ্ধতি জৈব রসায়নের ক্ষেত্রে এক মস্ত বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত 10 জুলাই,'79 আমরা এই দিক্‌পাল রসায়ন-বিজ্ঞানীকে হারিয়েছি। তাঁর প্রয়াণে জৈব রসায়নের এক বিস্ময়কর প্রতিভার তিরোধান ঘটলো।

"*** পশ্চিম হইতে যা কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল তার প্রধান কারণ সেই শিক্ষাকে তারা দেশি ভাষায় আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।"

"*** অথচ জাপানি ভাষায় ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তাছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার-প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল, 'য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করব।' যেমন বলা তেমনি করা তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।"

"*** বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর, কঠিন বৈকি। সেই জন্য কঠোর সংকল্প চাই। একবার ভাবিয়া দেখুন, একে ইংরেজি তাতে সায়ান্স তার উপরে দেশে যে-সকল বিজ্ঞান-বিশারদ আছেন তাঁরা জগদ্বিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই যে, একটুখানি বিজ্ঞানের নীড় দেশের লোক বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের ফলাও জায়গা নাই***।"

রবীন্দ্রনাথ

(শিক্ষার বাহন - পৌষ, 1322 বঙ্গাব্দ)

পরিষদ-সংবাদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন গত 16ই সেপ্টেম্বর'79 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী এবং কার্যকরী সমিতির সদস্য হিসাবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হয়েছেন :

সভাপতি : শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা

সহকারী সভাপতি : শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ
শ্রীঅজিতকুমার মেদ্দা
শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীহেমেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়

কর্মসচিব : শ্রীরতনমোহন খাঁ

সহযোগী কর্মসচিব : শ্রীশ্যামসুন্দর পাল
শ্রীকালিপ্রসন্ন ধাড়া
শ্রীযুগলকান্তি রায়

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীগুণধর বর্মন

সদস্য :

শ্রীসুব্রত পাল	শ্রীহরিপদ বর্মণ
শ্রীতপেশ্বর বসু	শ্রীনলিনীকান্ত দাসচৌধুরী
শ্রীউমা বসু	শ্রীলতিকা বসু
শ্রীঅনিলবরণ দাস	শ্রীবলাই ঘোষ
শ্রীচিত্তরঞ্জন সাঁতরা	শ্রীআশুতোষ খাঁ
শ্রীসলিলরঞ্জন মাইতি	শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
শ্রীপ্রমোদরঞ্জন কুণ্ডু	শ্রীনবকুমার শীল

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

ভারতের দুই উপগ্রহ

রতনমোহন খাঁ

মহাকাশ নিয়ে চিন্তাভাবনা নূতন নয়। গ্রহ, তারা, রবি, শশী, নীহারিকা প্রভৃতির রহস্য সন্ধানে মানুষ কৌতূহলী হয়েছে বহু যুগ আগেই। কিন্তু 1957 সালের 4ঠা অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীদের সাফল্যের স্বাক্ষর নিয়ে পৃথিবীর প্রথম নকল উপগ্রহ স্পুটনিক-1 যখন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে শুরু করল তখনই মহাকাশ গবেষণায় সূচিত হল নব জয়যাত্রা, উন্মোচিত হল নব দিগন্ত। গত 22 বছর ধরে রাশিয়া ও আমেরিকা প্রায় সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে মহাকাশ পরিক্রমায়। ইতিমধ্যে কয়েক হাজার উপগ্রহ মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছে বহু সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নিয়ে নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী মানুষ ইউরি গাগারিন রাশিয়ার ভোস্তক-1-তে ঠিক ঠিকভাবে অভিযান সম্পূর্ণ করেছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে, চাঁদের মাটিতে পড়েছে মানুষের পদচিহ্ন, চাঁদের পাথর মানুষের হাতে বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে সংগৃহীত হয়ে এসেছে পৃথিবীর পরীক্ষাগারে, শুক্র ও মঙ্গল-গ্রহের খবর এনেছে মহাজাগতিক স্টেশনে। সৌরমণ্ডলের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির দিকে ছুটে চলেছে ভয়েজার এবং শনির বলয় ভেদ করতে ব্যস্ত পাইওনিয়ার। মহাকাশে 175 দিন কাটিয়ে নিরাপদে ফিরে এসেছে ভ্লাদিমির লেখভ ও ভালেরি রুমিন। মহাকাশ গবেষণা যখন আজ এই পর্যায়ে উন্নীত

তখন বিদেশের মাটি থেকে সাধারণ উপগ্রহ উৎক্ষেপণ আমাদের দৈন্যতারই প্রকাশ। তবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ও কর্মকর্তাদের এই প্রচেষ্টা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় জ্ঞানলাভের কথা চিন্তা করে উপেক্ষণীয় নয়।

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার সূত্রপাত 1963 সালে থুম্বায়। রকেট উৎক্ষেপণের জন্য এখানে স্থাপিত হয় নিরক্ষীয় রকেট উৎক্ষেপণ স্টেশন (Equatorial Rocket Launching station)। নকল উপগ্রহ উৎক্ষেপণের মত বড় পরিকল্পনা নিয়ে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার কাজ আরম্ভ হয় অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলার সূচাকৃতি দ্বীপ শ্রীহরিকোটায়। ভারতের পূর্বপ্রান্তের এই দ্বীপটি পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম ঘূর্ণনের পরিপ্রেক্ষিতে নকল উপগ্রহ ক্ষেপণের পক্ষে আদর্শ স্থান। প্রায় 33 হাজার একর জমির উপর এখানে রূপায়িত হচ্ছে মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত নানা প্রকল্প। Sriharikota Range-কে সংক্ষেপে বলা হয় SHAR অর্থাৎ তীর। গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর কাজগুলি হয় ত্রিবান্দ্রমে বিক্রম সরাভাই স্পেশ সেন্টারে। এই সংস্থার অন্যতম কেন্দ্র আমেদাবাদে এবং প্রধান কার্যালয় বাঙ্গালোর।

ভারতের প্রথম উপগ্রহ আর্যভট। 1975 সালের 19শে এপ্রিল ভারতীয় সময় বেলা 1টায় সোভিয়েত দেশের এক উৎক্ষেপণ মঞ্চ থেকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সাহায্যে এটি উৎক্ষিপ্ত হয়। নকল উপগ্রহ স্থাপনে ভারতের স্থান হল একাদশ। আর্যভট সংক্রান্ত কয়েকটি উপাত্ত—(1) কক্ষপথ—প্রায় বৃত্তাকার, (2) উচ্চতা—প্রায় 600 কি. মি. (3) বিষুব অক্ষের সঙ্গে কোণ 50·4°, (4) ওজন—360 কি. গ্রা., (5) ব্যাস—1·6 মিটার, (6) ভিতরের তাপমাত্রা—0°C থেকে 40°C, (7) পর্যায়কাল 96·41 মিনিট। প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের জন্য 46 ওয়াট শক্তির যোগান আসত সিলিকন সৌরকোষ ও নিকেল ক্যাডমিয়াম ব্যাটারীর সমন্বয়ে। নাইট্রোজেন গ্যাস জেটের সাহায্যে প্রয়োজনীয় যুগ্মবল (torque) উপগ্রহটিকে উল্টে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করত। উপগ্রহটির নিজস্ব ঘূর্ণনের হার ছিল 10 থেকে 90 rpm. আর্যভটের এককগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, একটি অকেজো হলে অন্য একটিকে চালু করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব।

আর্যভট ছিল একটি সাধারণ নকল উপগ্রহ। প্রধানতঃ এক্স-রে জ্যোতির্বিদ্যা (x-ray astronomy), সৌরপদার্থবিদ্যা (solar physics) ও এরোনমি (aeronomy) সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের উপযোগী কিছু যন্ত্রপাতি এই উপগ্রহ মারফৎ মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল। আর্যভট প্রেরিত সংকেতগুলি সংগৃহীত হয়েছে শ্রীহরিকোটার ও মস্কোর গ্রাউন্ড স্টেশনে।

চার বছর পরে ভারতের দ্বিতীয় উপগ্রহ পৃথিবী পরিক্রমা শুরু করেছে। দ্বিতীয় উপগ্রহ ভাস্কর 1979 সালের 7ই জুন ভারতীয় সময় বিকেল 4টায় সোভিয়েত প্রযুক্তিবিদ্‌দের সাহায্যে ঐ দেশের কোন এক মঞ্চ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়। দুইটি উপগ্রহই রূপ নিয়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (Indian Space Research Organisation) ও USSR Academy of Science-এর যৌথ উদ্যোগে। তবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদানই মুখ্য।

ভাস্করের বহিরাকৃতি প্রায় আর্যভটের মতই। ভাস্কর সম্বন্ধে কয়েকটি উপাত্তঃ—

(1) ভাস্করের খোলসের উচ্চতা 156 সেমি., (2) খোলসের ব্যাস – 159 সেমি, (3) বহিরাবরণের তলের সংখ্যা 28, (4) ওজন 444 কিগ্রা.,.(5) পর্যায়কাল 96 মিনিট, (6) কক্ষপথ প্রায় বৃত্তাকার, (7) বিষুব অক্ষের সঙ্গে কোণ 50·7° (8) উচ্চতা প্রায় 525 কিমি., (9) অনুভূর দূরত্ব প্রায় প্রায় 512 কিমি, (10) অপভূর দূরত্ব প্রায় 557 কি.মি., (11) আয়ুষ্কাল 1 বছর। সিলিকন সৌরকোষ ও নিকেল ক্যাডমিয়াম ব্যাটারীর মাধ্যমে 47 ওয়াট শক্তি উৎপাদিত হয়ে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ যন্ত্রপাতিগুলিকে সজাগ রাখছে। তাপনিরোধক প্লেটের সাহায্যে ভিতরের তাপমাত্রা 0°C থেকে 40°C-এর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

ভাস্করের মধ্যস্থিত যন্ত্রগুলির মোটামুটি দুটি ভাগ – চালক যন্ত্র ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিষয়ক যন্ত্র। এতে আছে দুটি টেলিভিসন ক্যামেরা ও একটি মাইক্রোওয়েভ রেডিওমিটার। টেলিমেট্রি পদ্ধতির সাহায্যে সংকেতগুলি ভূপৃষ্ঠের শ্রীহরিকোটায়, বাঙ্গালোরে, আমেদাবাদে এবং রাশিয়ার বিয়ার লেক কেন্দ্রে প্রেরিত হচ্ছে। খবরে প্রকাশ ভাস্করের যন্ত্রপাতি ঠিকমত কাজ করছে এবং ভূকেন্দ্রের নির্দেশ ঠিকমত পালন করছে।

ভাস্কর ভারতের প্রথম অনুসন্ধানী উপগ্রহ। এই উপগ্রহ প্রেরণের মুখ্য উদ্দেশ্য হল প্রাকৃতিক সম্পদ, আবহাওয়া ও বন্যার পূর্বাভাষ, সমুদ্রপৃষ্ঠ ও ভূপৃষ্ঠ, ভূতলের নীচের জলসম্পদ প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ। এই সব তথ্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আমাদের সম্পদের সংরক্ষণের ও বন্টনের সহায়ক হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতীয় গবেষণা সংস্থা আশা রাখে 1980 সালেই ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ভারতের নিজস্ব উৎক্ষেপণমঞ্চ থেকেই আরো উন্নত মানের উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করতে সমর্থ হবে।

ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় উপগ্রহের নামের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে দু-চার কথা

ভারতীয় প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক ও গণিতজ্ঞ প্রথম আর্যভট কুসুমপুরে (বর্তমানে পাটনা) 476 খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন (অবশ্য এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত নন)। তাঁর রচিত গ্রন্থ আর্যভটীয়। ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আর্যভটীয় ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। এই গ্রন্থটি আর্যসিদ্ধান্ত নামে সমধিক পরিচিত। আর্যসিদ্ধান্তের প্রথম ভাগে আছে দশটি শ্লোক এবং দ্বিতীয় ভাগে আছে একশত আটটি শ্লোক। আর্যভট গ্যালিলিও, কোপারনিকাস প্রমুখ মনীষিদের আবির্ভাবের প্রায় 1000 বছর আগেই পৃথিবীর আহ্নিকগতির কথা ঘোষণা করেন। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর পরিক্রমা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মন্তব্য করেন। জ্যোতির্বিদ্যা, পাটীগণিত, বীজগণিত ও সমতল ত্রিকোণমিতিতে আর্যভটের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি π-এর মান জ্যামিতিক নিয়মে 4-দশমিক স্থান পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করতে সমর্থ হন। অনির্ণেয় সমীকরণের পূর্ণসংখ্যায় সমাধানের সূত্রও আবিষ্কার করেন।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যম পর্বে আর্যভট নামে আর একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি দ্বিতীয় আর্যভট নামে খ্যাত। এঁর রচিত গ্রন্থ আর্যসিদ্ধান্ত বা আর্যভটসিদ্ধান্ত বা

মহাসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। অবশ্য প্রথম আর্যভটের স্মরণেই প্রথম উপগ্রহের নাম আর্যভট রাখা হয়েছে।

আর্যভটের পর বরাহমিহির ভারতের গণিতের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হলেও আর্যভটের পর প্রথম ভাস্কর ও দ্বিতীয় ভাস্কর প্রাচীন জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ হিসাবে বিশেষভাবে স্মরণীয়। সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে নিজামাবাদ বা কেরলে প্রথম ভাস্কর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন কাথিয়াওয়াড়ে। তাঁর প্রণীত পুস্তকগুলি হল—আর্যভটীয় গ্রন্থের টীকা, মহাভাস্করীয় ও লঘুভাস্করীয়। তিনিই সর্বপ্রথম গ্রহদের অবস্থান বিষয়ে সুশৃঙ্খল নিয়মের কথা উল্লেখ করেন। তাঁরই রচনা থেকে ঐতিহাসিকগণ প্রথম আর্যভটের কথা জানতে পারেন।

পরবর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানী দ্বিতীয় ভাস্কর। ইনি ভাস্করাচার্য নামে পরিচিত। 1114 খৃঃ বিজ্জড়বিড়ে (বিজাপুরে) দ্বিতীয় ভাস্করের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম মহেশ্বর। ভাস্করাচার্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। তৎকালীন গণিতের প্রায় সমস্ত শাখায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হল—সিদ্ধান্ত শিরোমণি, লীলাবতী, বীজগণিত, সিদ্ধান্তশিরোমণি টীকা ও করণকুতূহল। করণকুতূহল গ্রন্থ গ্রহগতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। সিদ্ধান্ত শিরোমণি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। বীজগণিতে তাঁর অবদান অতুলনীয়। তাঁর রচনায় গ্রহণ এবং গ্রহদর্শন ও সময় নিরূপণ বিষয়ক নানা যন্ত্রের নির্মাণ পদ্ধতি ও ব্যবহারের নিয়ম বর্ণিত আছে। সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে গোলাধ্যায়ে তাঁর গোলজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। গোলকের ক্ষেত্রফল ও ঘনফল নির্ণয়ের জন্য তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা বর্তমানের সমাকলনীয় পদ্ধতির সমতুল। ভাস্করাচার্যের পরই ভারতীয় গণিতের গৌরবময় অধ্যায়ের অবলুপ্তি ঘটে। এই শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞের স্মরণেই দ্বিতীয় উপগ্রহের নাম ভাস্কর।

"দেশের এই মনকে মানুষকরা কোনমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব, কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিন্তা করিব, কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না—সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কি হইতে পারে। তার ফল হইয়াছে উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা যদি বা আমরা পাই উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ, চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোষাকী ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা কিছু সঞ্চয় থাকে তা আলনায় ঝোলানো থাকে, তারপরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজা-উজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি। এ সত্ত্বেও আমাদের দেশে বাংলায় সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না, কিন্তু এই সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই।

সকলেই জানেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে তৈরি। ঐ বিদ্যালয়টি পরীক্ষায় পাশ করা ডিগ্রীধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার একটা বড়গোছের শিলমোহর। মানুষকে তৈরি করা নয় মানুষকে চিহ্নিত করা তার কাজ। মানুষকে হাটের মাল করিয়া তার বাজার-দর দাগিয়া দিয়া ব্যবসাদারির সহায়তা সে করিয়াছে।"

—রবীন্দ্রনাথ

ব্যাঙের ছাতা

স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়*

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগেন। তার প্রধান কারণ আমাদের খাদ্যে প্রোটিনের অভাব। এই প্রোটিন আমরা পেয়ে থাকি প্রধানতঃ মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি থেকে। কিন্তু যাদের খাদ্যতালিকায় এই সকল খাদ্য থাকে না বা থাকলেও প্রয়োজন অনুপাতে কম, তারা একটু চেষ্টা করলে তাদের দেহগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন ছত্রাক (fungi) থেকে পেতে পারেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সব ছত্রাকই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। অ্যাসকোমাইসিটী (Ascomycetae) শ্রেণীভুক্ত মর্চেল্লা (Morchella), টিউবার (Tuber) প্রভৃতি গণের (genus) কয়েকটি প্রজাতি এবং ব্যাসিডিওমাইসিটী (Basidiomycetae) শ্রেণীভুক্ত অ্যাগারিকাস ক্যাম্পেস্ট্রিস (Agaricus camepestris), অ্যাগারিকাস বাইস্পোরাস (Agaricus bisporus) ইত্যাদি ছত্রাক সুখাদ্য হিসাবে রান্না করে খাওয়া যায়। ছত্রাকের দেহে ক্লোরোফিল নেই, সেজন্য এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা প্রস্তুত করতে পারে না; তাই এসকল নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ মৃত ও গলিত জীবদেহের উপর বা অন্য কোন জৈব পদার্থের উপর জন্মায় এবং ঐ সকল বস্তু থেকে খাদ্যউপাদান গ্রহণ করে নিজেদের পুষ্টিসাধন করে, অর্থাৎ এরা মৃতজীবী (saprophytes)।

এরূপ একটি ছত্রাক হল ব্যাঙের ছাতা (mushroom)। ভালভাবে রান্না করলে এটি একটি উপাদেয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য হতে পারে। আর একটি সুবিধা হল এর প্রায় সবটাই খাওয়া চলে। দেখা গেছে এতে আছে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন বি ও ডি, কিছু পরিপাককারী এনজাইম, একাধিক অ্যামাইনো অ্যাসিড (amino acid)।

এই ব্যাঙের ছাতা দেখা যায় বর্ষাকালে ঘাসের জমির উপরে, জৈব সারসমৃদ্ধ জমিতে, ক্ষয়িষ্ণু কাঠখণ্ডে। এদের সাধারণতঃ দলবদ্ধ অবস্থায় মাটির উপরে চক্রাকারে জন্মাতে দেখা যায়; একে পরীর চক্র (fairy ring) বলা হয়। এই ব্যাঙের ছাতা অ্যাগারিকাস গণভুক্ত। এই অ্যাগারিকাস গ্রীক শব্দ অ্যাগ্রিকন (Agricon) থেকে সংগৃহীত। অ্যাগারিকাসের কয়েকটি ভারতীয় প্রজাতি ক্যাম্পেসট্রিস, আরভেনিসু, বাইস্পোরাসু ইত্যাদি।

অ্যাগারিকাসের দেহ দু-অংশে বিভক্ত—

(ক) মাইসেলিয়াম (Mycelium): এটি বহুবর্ষজীবী ও মৃদ্‌গত। প্রাথমিক মাইসেলিয়াম বা অণুসূত্র এককোষী ও একটি নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং ব্যাসিডিয় রেণু (basidio spore) থেকে অঙ্কুরোদ্গমের দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই মাইসেলিয়াম শাখান্বিত, শ্বেতবর্ণ এবং পর্দাদ্বারা বিভক্ত। এর সাহায্যে ছত্রাকটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অস্তস্তক থেকে পোষক-দ্রব্য শোষণ করে। মাইসেলিয়ামের

*বলাগড় উচ্চবিদ্যালয়, হুগলী

প্রাচীর কাইটিন নির্মিত এবং কোষগুলির মধ্যে দানাদার, ভ্যাকুওল ও বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত (caenocyte) সাইটোপ্লাজম (cytoplasm), সঞ্চিত খাদ্য এবং তৈলবিন্দু থাকে। অণুসূত্রগুলি পৃথক থাকে অথবা একত্র হয়ে রাইজোমর্ফ (rizomorph) নামক রজ্জুর ন্যায় আকার গঠন করে। এই থেকে প্রতি বছর জননের সময় মাটির উপরে জনন অংশ বা স্পোরোফোর (sporophore) উৎপন্ন হয়।
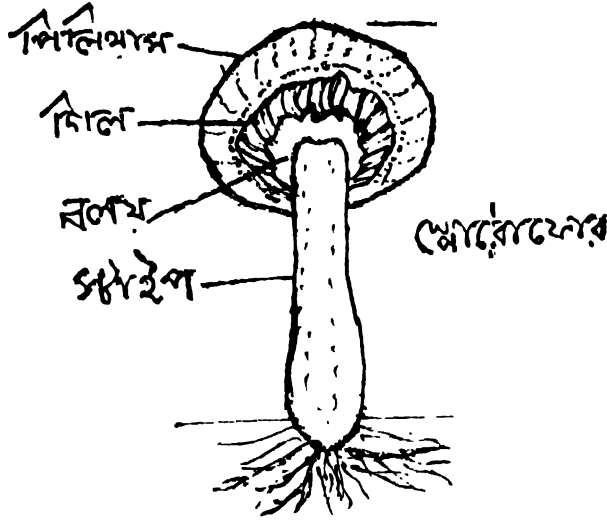
ব্যাঙের ছাত।

(খ) স্পোরোফোর বা ফ্রুট বডি (Fruitbody)ঃ রাইজোমর্ফ থেকে ফ্রুট বডি প্রথম অবস্থায় পিনের মাথার ন্যায় আবির্ভূত হয়ে মাটির নীচে থাকে, পরে এরা গোলাকার দেহ (button) ধারণ করে মাটির উপরে আসে। পরিণত স্পোরোফোর দুটি ভাগে বিভক্ত—

(1) দণ্ড বা স্টাইপ (Stipe)ঃ এই দন্ডটি শ্বেতবর্ণের, বেলনাকার লম্বায় 5-8 cm. এবং নিম্নপ্রান্ত সংকীর্ণ। এটি বায়বীয় অণুসূত্র দ্বারা গঠিত। স্টাইপের ভিতরের দিকের অণুসূত্রগুলি কর্টেক্সের দিকে ঘনসন্নিবিষ্ট। কর্টেক্স, প্যারেনকাইমা (parenchyma) কোষ দ্বারা গঠিত। কেন্দ্রের দিকের অণুসূত্রগুলি আলগাভাবে সাজান। দণ্ডটি বড় হলে এর মাথায় টুপি বা পিলিয়াস (pileus) বিদীর্ণ হয় এবং স্টাইপের মাথায় একটি আবর্তের সৃষ্টি করে, একে বলয় (annulus) বলে।

(2) টুপি বা পিলিয়াসঃ এটি দেখতে ছাতার ন্যায়, দণ্ডের আগায় থাকে। এর পৃষ্ঠদেশ প্রাথমিক অবস্থায় উত্তল (convex) কিন্তু পরিণত অবস্থায় চ্যাপ্টা হয়। এর উপরের তল মাখনের ন্যায় সাদা বা ঈষৎ বাদামী বর্ণের, শুষ্ক এবং মসৃণ। পিলিয়াসের উপরে স্থূল, মাংসল, নরম অংশটিকে ফ্লেস (flesh) বলে। এই অংশটি শ্বেতবর্ণের কিন্তু পরিণত হলে ঈষৎ গোল। এর নীচে পাতলা চাদরের ন্যায়, শ্বেতবর্ণের (অপরিণত অবস্থায়) বা গাঢ় বাদামী বর্ণের (পরিণত অবস্থায়) অঙ্গ নিচের দিকে খাড়া ঝুলতে দেখা যায়। এদেরকে গিল (gill) বা ল্যামেলী

[(lamellae) একবচনে ল্যামেলাম (lamellum)]। এক একটি পিলিয়াসে গিলসের সংখ্যা প্রায় 300-600টি।

গিলের প্রস্থচ্ছেদ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে এর গঠন নিম্নপ্রকারের হয়।

(i) ট্রামা (Trama): এটি মধ্যস্থলে কতকগুলি লম্বাকৃতি বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ দ্বারা গঠিত। এই অঞ্চলটি 2-3 স্তরবিশিষ্ট হয়।

(ii) উপ-হাইমেনিয়াম স্তর (Sub-hymenium): ট্রামার উভয় পার্শ্বে অবস্থিত এক বা দুই স্তরযুক্ত গোলাকার অণুসূত্র কোষ দ্বারা গঠিত।

(iii) হাইমেনিয়াম (Hymenium): এটি উপহাইমেনিয়ামের বাহিরের দিকে এবং গিলের একেবারে ধারের অঞ্চল। এ স্থানের কোষগুলি গিলের তলের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থান করে। এখানে দু-প্রকারের কোষ দেখা যায়, ব্যাসিডিয়া (basidia, একবচনে ব্যাসিডিয়াম) নামক গদাকৃতি কোষ এবং প্যারাফাইসেস (paraphyses) নামক অপেক্ষাকৃত ছোট বন্ধ্যা কোষ।

এই ব্যাসিডিয়া থেকে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় ব্যাসিডিয় রেণু (basidio spore) উৎপন্ন হয়। এই রেণু পরে এথেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে মাটিতে পড়ে। অনুকূল পরিবেশে এই রেণু অঙ্কুরিত হয়ে প্রাথমিক মাইসেলিয়াম গঠন করে।

এই ব্যাঙের ছাতা বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করা হয় ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে এবং সেখানে একটি গবেষণা কেন্দ্রও আছে। মাটি, পাতা বা খড় এবং কম্পোষ্ট নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশিয়ে এর চাষযোগ্য জমি তৈরি করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এর চাষে আদ্রর্তা এবং তাপমাত্রা নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। রাজ্য সরকার সহায়তা করলে পশ্চিমবঙ্গেও ব্যাঙের ছাতার চাষ ব্যাপকভাবে করা যেতে পারে এবং ফলে স্বল্পমূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য-সমস্যার সমাধান করতে পারা যায়।

"বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলি কেবলি ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতা জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রেও আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে"।

রবীন্দ্রনাথ

সমুদ্রে মন্থন

ধূর্জ্জটী সেনগুপ্ত

1975 সালের এপ্রিল মাসে যে খবরটি বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল তা হল বম্বের অদূরে আরব সাগরে "বম্বে হাইতে" "সাগর সম্রাট" নামক তেল সন্ধানকারী জাহাজের তেলের সন্ধান। এর পর থেকেই সমুদ্রে তেল অনুসন্ধানের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী পুরোপুরি উৎপাদন শুরু হলে বম্বে হাই-এ বছরে 10 মিলিয়ন টন তেল উৎপাদিত হবে। হিসাবটি মনে ধরার মতই। কারণ গত 1973 সালে আরব-ইস্রাইলের যুদ্ধের পর থেকে আরব রাষ্ট্রগুলি যেভাবে তেলের দাম বাড়িয়েছিল তাতে ভারতের মত বহু উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছিল। পেট্রোলিয়াম নামক জ্বালানীর অভাবে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল জীবনযাত্রা, ব্যাহত হয়েছিল শিল্পোন্নয়ন। এর পরও বহুবার তেলের দাম বেড়েছে।

অবশ্য বিজ্ঞানীরা এই সমস্যাকে নূতন করে দেখেন নি। তাঁদের মতে সমস্যাটি বর্তমানে সাময়িক মনে হলেও ভবিষ্যতে 2000 খৃষ্টাব্দে বিশ্বের জনসংখ্যা যখন 600 কোটি হবে তখন শুধু পেট্রোলিয়ামই নয়, খাদ্য, পানীয় জল এবং প্রকৃতিতে প্রাপ্ত অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের সমস্যা মানুষের অস্তিত্বকে ভাবিয়ে তুলবে। সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাঁরা চিন্তিত। বহু চিন্তার পর তাঁদের চোখ ফিরেছে অজানা মহাসমুদ্রের দিকে।

এখন একটা প্রশ্ন সহজেই আসতে পারে যে, বিজ্ঞানীমহল হঠাৎ কেন সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল হলেন। কিন্তু সমুদ্রের সৃষ্টি-রহস্য এবং বিচিত্র প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের বিবর্তনের ধারা সহজেই এই প্রশ্নের উত্তর দেয়। সমুদ্রের জলরাশিতেই প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমানে গবেষণার পর 1,40,000 রকম প্রাণী ও উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া 1,000 রকম নতুন প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রতি বৎসর আবিষ্কৃত হচ্ছে। পৃথিবী সৃষ্টির সময়ই সমুদ্রের সৃষ্টি হয় নি। পৃথিবীর তাপমাত্রা বেশী থাকায় বৃষ্টির জল জমতে পারে নি। বাষ্পে পরিণত হয়েছিল ক্রমশঃ, পৃথিবী ঠাণ্ডা হবার পর প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে জল জমতে জমতে নদী, সাগর এবং তারপর মহাসাগরের সৃষ্টি হয়। বৃষ্টির জল নদী মারফত মহাসমুদ্রে আসার পথে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন ধরণের খনিজ পদার্থ ও লবণ সমূহ দ্রবীভূত করার ফলে মহাসমুদ্র বা সমুদ্র খনিজ সম্পদের এক বিরাট ভাণ্ডার হয়ে ওঠে। মহাসমুদ্রের উপর গবেষণায় দেখা গেছে মহাসমুদ্রের তল সব জায়গায় সমান নয়। কোথাও আছে পর্বতশ্রেণী, কোথাও আবার আগ্নেয়গিরি। ভূমিকম্প অথবা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সমুদ্রতল প্রায়ই প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয়। সমুদ্রে বা মহাসমুদ্রে পেট্রোলিয়ামের আবিষ্কারের কারণ হিসাবে বলা যায় যে সমুদ্রের তলের আলোড়নের ফলে কোন কোন স্থানে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ ও প্রাণী সমুদ্রতলের অভ্যন্তরে ঢাকা পড়ে এবং প্রচণ্ড চাপে বহুকাল পরে পেট্রোলিয়ামে পরিণত হয়।

সমুদ্রের উপর প্রথম গবেষণা শুরু করেন আলেকজাণ্ডার। তিনি "কলিমস্কা" নামক ক্যাপসুলে চড়ে সমুদ্রের জলরাশির বৈচিত্র লক্ষ্য করেছিলেন। এরপর শুরু হয় ডুবুরীদের মারফত অনুসন্ধান। কিন্তু ডুবুরী দ্বারা গবেষণা খুব সাফল্য অর্জন করে নি। কারণ, সমুদ্রের গভীরে চাপজনিত অন্যান্য বিভিন্ন অসুবিধা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র গবেষণারও প্রভূত উন্নতি সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে সমুদ্রের যে সব স্থানে মানুষ নামতে পারে না, সেই সব স্থানের প্রকৃতি ও জীবজগতের সম্বন্ধে সহজেই ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তোলা হচ্ছে। ক্যামেরার পাশাপাশি এসেছে টেলিভিশন ক্যামেরা যার সাহায্যে অবিরাম ছবি পাঠানো সম্ভব হচ্ছে।

অবশ্য সমুদ্রের সম্পদ সন্ধানের কাজ শুরু হয়েছে মাত্র 25 বছর আগে। সমুদ্রের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য 1957 সালকে বিভিন্ন দেশ "আন্তর্জাতিক ভূপ্রাকৃতিক বছর" হিসাবে চিহ্নিত করেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা ভারত মহাসাগরই সর্বাপেক্ষা রহস্যময় এবং ভবিষ্যতে খাদ্য সমস্যা ও দারিদ্র দূর করতে ভারত মহাসাগর সর্বাপেক্ষা কাজে আসবে। সেই কারণে ভারত মহাসাগরের উপর গবেষণা চালাবার জন্য আন্তর্জাতিক মহাসামুদ্রিক গবেষণা বিভাগের উদ্যোগে "আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর উদ্যোগ নামে একটি শাখা 1962 সালে গঠিত হয়। 28টি দেশের 500 জন বিজ্ঞানী মিলিতভাবে এই উদ্যোগের সামিল হয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। তাঁদের গবেষণার প্রাথমিক বিষয় ছিল ভারত মহাসাগরে মৌসুমী বায়ুর সৃষ্টির উৎস। এই গবেষণা কৃষিকার্যে; বন্যা নিয়ন্ত্রণে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা সাইক্লোন ও বৃষ্টিপাত সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করছে।

সমুদ্রের উপর গবেষণা যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে সমুদ্রবিদ্যা (Oceanography) নামক বিশেষ বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বে এই বিভাগ ভূতত্ত্ব (Geology) বিভাগের এক শাখা ছিল। সমুদ্রবিদ্যা বিভাগের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাও জড়িত। যেমন ভূগোল ভূপ্রাকৃতিক বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রাসায়নিক সমুদ্রবিদ্যা (Chemical Oceanography) এবং নৌজীববিদ্যা (Marine Biology) সমুদ্রবিদ্যায় অগ্রগণ্য দেশগুলোর মধ্যে আছে নরওয়ে, জাপান, আমেরিকা। সামুদ্রিক গবেষণায় ভারতও পিছিয়ে নেই। গোয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমুদ্রবিদ্যা সংক্রান্ত কেন্দ্র। গবেষণার জন্য বম্বেতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আবহাওয়া সংক্রান্ত কেন্দ্র এবং কোচিনে সামুদ্রিক জীববিদ্যা সংক্রান্ত কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া সমুদ্রে গবেষণার উপযোগী আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত একটি জাহাজ আরব সাগরের উপর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

এবার সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক কিভাবে সমুদ্রের অফুরন্ত সম্পদ মানুষের কাজে আসবে। সমুদ্রে বিভিন্ন প্রকার মাছের এক বিরাট ভাণ্ডার। জাপান ও নরওয়েই ব্যাপকভাবে এই ভাণ্ডারকে গ্রহণযোগ্য খাদ্য হিসাবে কাজে লাগিয়েছে। এই কাজে প্রধান অসুবিধা মাছের ঝাঁকের সন্ধান ও উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা। বর্তমানে শব্দের প্রতিফলন ও শব্দেতর (Ultrasonic) তরঙ্গকে কাজে লাগিয়ে সহজেই মাছের ঝাঁক নির্ণয় করা যায়। এছাড়া ইলেকট্রিক শকও জোরালো আলোর সাহায্যে মাছের ঝাঁককে এক জায়গায় করার ব্যবস্থাও আবিষ্কৃত হয়েছে। পাশাপাশি টিনের কৌটার সাহায্যে

সংরক্ষণ ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। মানুষের গ্রহণযোগ্য মাছ ছাড়াও সমুদ্রের বিভিন্ন প্রকার সেলমাছকে সহজেই হাঁস ও মুরগীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমরা জানি প্রোটিন মানুষের শরীরের বৃদ্ধির জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাদান। বিজ্ঞানীদের মতে সমুদ্রের বিভিন্ন প্রকার অফুরন্ত গাছ গাছড়াই মানুষকে সস্তায় প্রোটিন সরবরাহ করবে। বর্তমান জাপানে পরফিরা নামক এক ধরণের লাল শৈবাল থেকে উৎপন্ন খাদ্যপ্রস্তুত পদ্ধতি 'নরি' নামে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছে। এই ধরণের শৈবাল থেকে উৎপন্ন খাদ্যে শতকরা 100 ভাগের মধ্যে 36·6 ভাগ প্রোটিন, 0 7 ভাগ ফ্যাট, 44·3 ভাগ শর্করা, 4 ভাগ ছাই এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থসমূহ থাকে। এই ধরণের খাদ্য গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে, ঔষধরূপে ও উচ্চমানের সার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া হলোযুরিন নামক শশাজাতীয় গাছকে ক্যান্সার রোগে কাজে লাগানোর চেষ্টা চলছে।

সমুদ্রে মৃত গাছ গাছড়া ও ক্ষুদ্র প্রানীসমূহ সমুদ্রের তলায় জমা হয় এবং পচতে শুরু করে, অবশেষে দ্রাব্য পদার্থে পরিণত হয়। এই দ্রাব্য পদার্থ সমূহ উচ্চমানের সার। কাজেই আশা করা যায় বর্তমানে সারের যে ঘাটতি কৃষিকার্যকে ব্যাহত করেছে ভবিষ্যতে এই ঘাটতি দূর হবে।

খাদ্যলবণ ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের বিরাট ভাণ্ডার হল সমুদ্রজল। শিল্পে বহুল ব্যবহৃত সোডিয়াম সালফেট, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট লবণগুলি সমুদ্রজল থেকে পাওয়া যায়। সমুদ্রজল থেকে খাদ্যলবণ সংগ্রহের সময় প্রচুর পরিমাণে পানীয় জল পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা জল, স্থল ও আকাশের আবহাওয়া যেভাবে দূষিত হচ্ছে তাতে এই পানীয় জল হবে মানুষের প্রধান ভরসা।

সামুদ্রিক তল বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থের এক বিপুল ভাণ্ডার। সমুদ্রতলে ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, কপার, কোবাল্ট, নিকেল, ফসফরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। উপযুক্ত নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলে খনিজ সম্পদের এই বিপুল ভাণ্ডার মানুষের কাজে আসবে।

গত কয়েক বছর ধরে জ্বালানী পদার্থের প্রচণ্ড ঘাট্‌তি চলছে। তরল জ্বালানী পেট্রোলিয়ামের অভাবে বহুদেশের শিল্পোন্নতি ব্যাহত। বহু দেশেই বর্তমানে সমুদ্রের ঢেউ থেকে বিদ্যুত উৎপন্ন করে সেই শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা চলছে! পুনায় কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুত কমিশনের সমুদ্রোপকূল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা যে সমীক্ষা চালিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম উপকূলের ঢেউ থেকে বিদ্যুত উৎপাদন করা যাবে।

সমুদ্রের সম্পদকে কাজে লাগাতে হলে সমুদ্র যাতে দূষিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের বহু অপচয় (waste) নদী মারফত সমুদ্রে চলে আসে। বহু ক্ষেত্রেই এরা সমুদ্রের জলকে দূষিত করে। কাজেই সমুদ্রের প্রাণী ও গাছ-গাছড়া থেকে উৎপন্ন খাদ্যসমূহও দূষিত হয়। কিছুকাল আগে জাপানের উপকূলবর্তী একটি কারখানা থেকে পারদের লবণসমূহ সমুদ্রে চলে আসে। এর ফলে সমুদ্র বিষাক্ত হওয়ায় বহু মাছও বিষাক্ত হয়ে যায়। বহু জাপানী এই মাছ খেয়ে অসুস্থ হয়। বর্তমানে সমুদ্রের জল দূষিতকরণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতায়

সমষ্টিগত প্রয়াসও শুরু হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি শাখাও গঠিত হয়েছে যার নাম ইউ. এন. ই. পি (United Nations Environment Programme)। ভারতবর্ষ এই ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকা নেবার জন্য আরব সাগরের তলায় পাইপ লাইন পেতেছে যাতে বিষাক্ত পদার্থসমূহ গভীর সমুদ্রে চলে যেতে পারে। ফলে ক্ষতির পরিমাণও কমবে।

সমুদ্রের সম্পদ আবিষ্কারের সাথে সাথেই আর একটি রাজনৈতিক অসুবিধা এসে যায়। বর্তমানে সমুদ্রের উপর কোন দেশের অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক কোন আইন বহু আলোচনার পরও গৃহীত হয় নি। কাজেই সমুদ্রের সম্পদের দাবীদার অনেক। উপযুক্ত আন্তর্জাতিক আইন গৃহীত না হলে সমুদ্রের সম্পদ আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপই বহন করবে। পরিনামে হবে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ।

পুরাণের গল্প থেকে আমরা জানি যে সমুদ্রমন্থনের পর দেবতারা সাগরের তলা থেকে আনা অমৃত ভাণ্ডারের অমৃত খেয়ে অমর হয়েছিলেন। যদিও স্বর্গের দেবতাদের অসুরনিধন যজ্ঞেও দ্বিতীয়বার সমুদ্রমন্থনের প্রয়োজন হয় নি কিন্তু বর্তমানে বিংশ শতাব্দীর শেষ সীমায় বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত মানবসমাজকে রক্ষার জন্য দ্বিতীয়বার সমুদ্রমন্থন অর্থাৎ সমুদ্রের উপর গবেষণা ও অভিযানের দ্বারা সমুদ্রের সম্পদকে কাজে লাগানোর চেষ্টা চলছে। যদিও প্রাথমিক দিক দিয়ে এ অভিযান খুবই ব্যয়সাধ্য, তবুও আশা করা যায় বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের সহযোগিতায় এ কাজ সফল হবে এবং মানব সভ্যতার ধারাও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

অঙ্কের মজার ব্যাপারগুলো

চৈতালী চ্যাটার্জী*

পারমাণবিক বিভাজনের ফলে যে অপরিমেয় শক্তি উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে মানব সভ্যতাকে সম্পদশালী করে তুলেছে, শুধু তাই নয়ভবিষ্যতের আরো বৃহত্তর প্রতিশ্রুতি অন্তর্নিহিত হয়ে আছে। ধীরে ধীরে মানুষ পেরিয়ে আসছে "Theory of relativity"র যুগ, "Electron, Proton, Neutron"-এর যুগ, "Quantum Mechanics"এর যুগ, আরও কত কি! বিংশ শতকের শেষে মানুষ চাঁদের সমুদ্রপৃষ্ঠে পাড়ি জমিয়েছে। ভবিষ্যতে চাঁদকে হয়তো আরও কাজে লাগানো যেতে পারে—গ্রহান্তরে যাবার উল্লম্ফন মঞ্চে বসবাসের স্থান আর রসায়ন জ্যোতি-বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর এলাকা হিসাবে। সবই কিন্তু সম্ভব হচ্ছে গণিতশাস্ত্রের সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে। পৃথিবীর প্রখ্যাত গণিতবিদ্ ও তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানীরা একযোগে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর নিরলস সাধনা করে এনে দিয়েছেন প্রযুক্তিবিদ্যার চরম উৎকর্ষ—যা নাকি অবিস্মরণীয় চন্দ্রাভিযানকে বাস্তবে পরিণত করেছে। তাই অংকশাস্ত্র ছাড়া এক পাও এগোন সম্ভব নয়। আবার দেখো আইনস্টাইন জটিল অংকশাস্ত্র প্রয়োগ করে Negative Time'-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর এই Conception দিয়ে তিনি এই বিপুল সৃষ্টির অনির্বচনীয় আনন্দ লহরী অনুভব করতে চেয়েছিলেন। বড় আক্ষেপের সঙ্গে জীবনের শেষভাগে তিনি বলেছিলেন "আর একটু—আর একধাপ এগোতে পারলে সৃষ্টিরহস্যের জনক স্বর্গীয় ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারব অংক কষে" তাহলে দেখো কি অদ্ভুত, অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের আধার এই গণিতশাস্ত্র। গণিত ব্যতিরেকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রগতি সব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে। তাই গণিতের প্রতি কিশোর মানসকে উৎসাহিত ও কৌতূহলী করবার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করছি এই প্রবন্ধে।

আমরা সকলেই জানি হিন্দু গণিতবিদ্‌রা 'Zero' আর 'Decimal system' আবিষ্কার করেছিলেন। এই 'system'এ একটা Number-কে symbolise করা যাক।

$$Z = a\ b\ c\ d \quad (a,\ b,\ c,\ d \text{ হচ্ছে চারটে Integer } 0 \text{ থেকে } 9\text{-এর মধ্যে})$$

$$Z = a \times 10^3 + b \times 10^2 + c \times 10 + d$$

আবার এই দশকে পদ্ধতি ছাড়া আমরা Septimal Systemও ব্যবহার করতে পারি। তফাৎ হচ্ছে কেবল Base টা 10এর পরিবর্তে 7। দশক পদ্ধতির একটা সংখ্যা (ধর 61) সপ্তক পদ্ধতিতে হয়ে যাবে 115। কি ভাবে হচ্ছে ?

$$61 = 1 \times 7^2 + 1 \times 7 + 5$$

আচ্ছা সপ্তক পদ্ধতিতে একটা গুণ করা যাক। দশক পদ্ধতির মত অবিকল।

*ইলেকট্রনিক্স অ্যাণ্ড টেলিকম্যুনিকেশন এঞ্জিনিয়ারিং, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-700032

$$\begin{array}{r} 265 \\ 24 \\ \hline 1456 \\ 563\times \\ \hline 10416 \end{array}$$

পদ্ধতি $4\times5=20=2\times7+6$। তাহলে '6' থাকবে একক স্থানে। আর '2' চলে যাবে সপ্তক স্থানে। কেবল খেয়াল রাখতে হবে সাধারণ দশক পদ্ধতির সঙ্গে উলটপালট না হয়ে যায়। সাধারণ দশ পদ্ধতিতে আমরা $(4\times5=20)$ একক স্থানে 0 বসিয়ে হাতে থাকল 2 এইভাবে এগিয়ে যেতাম।

তোমরা কেউ হয়তো বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করতে পার, এই সপ্তক পদ্ধতির জটিলতাকে ডেকে আনবার দরকার কি? তাহলে আপাততঃ একটা উত্তরই পাবে—Mathematical Interest। আর একটা কথা দশক পদ্ধতির 61 থেকে সপ্তক পদ্ধতির 115-তে যাব কি করে?

$$\begin{array}{r|l l} 7 & 61 & \\ \hline 7 & 8 & 5 \uparrow \\ \hline 7 & 1 & 1 \\ \hline & 0 & 1 \end{array}$$

এই পদ্ধতিতে দেখছ 61 (Decimal system) $\equiv$ 115 (Septimal system) এইরকম আর একটা উদাহরণ নাও। দশক পদ্ধতির 109 $\equiv$ সপ্তক পদ্ধতির 214

$$\begin{array}{r|l l} 7 & 109 & \\ \hline 7 & 15 & 4 \uparrow \\ \hline 7 & 2 & 1 \\ \hline & 0 & 2 \end{array}$$

তোমাদের এই রকম আরও কিছু অভ্যাস করতে বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। অবশ্য 7 ছাড়া যে কোন Base-এ আমরা একইভাবে এগোতে পারি। যত 'Natural Number' আমাদের জানা আছে তাদের আমরা দুটো শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—'Prime' আর 'Composite' Number। Prime Integer-কে গণিতক বা Factor-এ ভাঙ্গা যায় না। কিন্তু Composite Integer-কে দুই বা ততোধিক Facter-এ ভাঙ্গা যায়। তাহলে আমরা দেখছি Composite Integer যত ইচ্ছে তত আমরা চোখ বুজে লিখে দিতে পারি কিন্তু Prime Integer মোট কত আছে? গণিত বিশারদ 'Euclid' জবাব দিয়েছেন 'There are infinitely many Primes'—এর প্রমানও

তিনি দেখিয়েছেন। তবে শক্ত বলে আমরা এক্ষেত্রে তা পরিহার করছি। যা হোক Prime Integer কাকে বলে, তার বৈশিষ্ট্য কি এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু ধারণা তো হল। আচ্ছা আমরা একটা মজার ধাঁধার কথা বলি। একমণ ওজনের একটা পাথরকে চার টুক্‌রো করা হল এমনভাবে যার ফলে এক সের থেকে এক মণ পর্যন্ত সব ওজন সঠিকভাবে সেরে মাপা যাবে। বলতো টুকরোগুলোর ওজন কি রকম হবে ?

Trial & Error পদ্ধতিতে তোমরা হয়তো বলতে পার—1, 3, 9, এবং 27, কিন্তু এর স্বপক্ষে গণিত-বিজ্ঞানীদের যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ রেখেছে আর বলাই বাহুল্য প্রমাণ করবার মূল সূত্র রয়েছে Prime Integer নিয়ে ধ্যানধারণার মধ্যে।

আবার Prime Number নিয়ে সবকিছু এখনো জানা সম্ভব হয় নি। যেমন ধরো Goldbach নামে এক Mathematician একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন। তখনকার একজন বিখ্যাত Mathematician Euler-কে তিনি লিখেছেন "Even Numbers can be expressed as the sum of two primes. Can you cite an example disproving it ?……উদাহরণ হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন—

$$12 = 5 + 7$$

$$16 = 3 + 13$$

$20 = 7 + 13$ এই রকম।

Euler কিন্তু চিন্তায় পড়েছিলেন—সঠিক উত্তর তিনি নিয়ে যেতে পারেন নি। তবে এখনো প্রমাণের চেষ্টা চলছে এই ব্যাপারে। আর আমরাও আশায় রয়েছি।

আচ্ছা এবার একটু অন্যদিকে আসা যাক্। নিচে একটা ম্যাজিক স্কোয়ার দেখাচ্ছি।

17	24	1	8	15
23	5	7	14	16
4	6	13	20	22
10	12	19	21	3
11	18	25	2	9

যে কোন Row. Column বা Diagonal সংখ্যাগুলো যোগ কর—সব ক্ষেত্রেই 65 হচ্ছে। এ সম্বন্ধে চিন্তা করবার সুযোগ তোমাদের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি। মনে রাখবে 1, 2, 3—25 পর্যন্ত সব Natural Number-কে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসানো হয়েছে।

খুব বড় বড় গুণ করার সময় আমরা একটা মজার ব্যাপার দেখাবো এবার। অনেকটা এই পদ্ধতির সাহায্য নিয়েই International Business Machine Corporation একটা 14

digit-এর সংখ্যা দিয়ে গুণ করেছেন মাত্র 1/50 sec-এ। ব্যাপারটা কল্পনা করাও শক্ত। আপাততঃ একটা ছোট উদাহরণ নিই—13×27।

দুটো সারিতে ওপরে লিখলাম 13 আর 37। এরপর প্রথম সারির 13-কে 2 দিয়ে ভাগ করলাম (অবশিষ্ট থাকলে তা উপেক্ষা করতে হবে) আর দ্বিতীয় সারির 37-কে 2 দিয়ে গুণ করলাম। এইভাবে ক্রমাগত চালিয়ে গেলাম। (যেমন নীচে দেখানো হচ্ছে)

13	37
6	74*
3	148
1	296

এর পর দ্বিতীয় সারির সংখ্যাগুলো যেগুলো জোড় সংখ্যা এবং যার ঠিক বিপরীত প্রথম সারির সংখ্যাও জোড় সেগুলোতে তারকা চিহ্ন দিতে হবে। এক্ষেত্রে কেবল 74-তে এই তারকা চিহ্ন পড়েছে।

এরপর তারকা চিহ্ন বাদ দিয়ে দ্বিতীয় সারির সব সংখ্যাগুলো যোগ করে ফেল। সেটাই হবে নির্ণেয় গুণফল। $13 \times 37 = 37 + 148 + 296 = 481$

এই রকম ভাবে তোমরা এগুলো কষে দেখতে পার- -428×73, 53×371 ইত্যাদি।

হয়তো তোমাদের কারো ইচ্ছে হল অঙ্কের ম্যাজিক দেখিয়ে বন্ধুদের তাক্ লাগিয়ে দেবে। তাহলে এই মজার খেলাটা শিখে নাও তুমি তোমার বন্ধুকে একটা পছন্দমতো সংখ্যা বলতে বলো। ধর সে বলল 7। এবার তুমি তাকে 12345679 এই সংখ্যাটাকে $9 \times 7 = 63$ দিয়ে গুণ করতে বল। গুণ করতে বসার আগে তুমি বলে দাও গুণফল হবে 777777777। ধর তার বিশ্বাস না হওয়ায় সে গুণ করতে আরম্ভ করল। কিন্তু সে যখন দেখল গুণ করেও 777777777-ই হচ্ছে তখন সে আবার বলে বসলো 5। তুমি তাকে ঐ 12345679-কে $5 \times 9 = 45$ দিয়ে গুণ করতে বল। উত্তরটা হবে 9টা 5 অর্থাৎ 555555555।

আচ্ছা এবার Prime Number নিয়ে একটা মজার ব্যাপার বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। তুমি তোমার বন্ধুকে '3' এর বেশী যে কোন একটা Prime Number ধরতে বল। সেটাকে বর্গ করতে বল আর সঙ্গে 19 যোগ করতে বল। এরপর 12 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষটা মনে রাখতে বল। সে মনে মনে ভেবে রাখল পরপর—13 169 188 $15\frac{8}{12}$ 8

এক্ষেত্রে 8 হচ্ছে ভাগশেষ। তবে বন্ধুদের বলার আগেই তুমি বলে দাও 8·1 কি করে এটা সম্ভব? তুমি স্রেফ 19-কে 12 দিয়ে ভাগ কর, করে ভাগশেষ 7-এর সঙ্গে 1 যোগ কর, যোগ করে চটপট বলে দাও 8। সবক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। আচ্ছা এর Logicটা কোথায়? যে কোন Prime Number যা '3'-এর চেয়ে বড় তা লেখা যায় ($6 \times \pm 1$) এইভাবে। x হচ্ছে একটা যে কোন পূর্ণ সংখ্যা।

তাহলে এর বর্গ হবে এই রকম $(36x^2 \pm 12x + 1)$ একে 12 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে সবসময় '1' আবার 19 যোগ করবার ফলে অবশিষ্ট হচ্ছে '7' ফলে মোট অবশিষ্ট দাঁড়াচ্ছে $1 + 7 =$ '8'। এইরকম আরও হরেক রকম মজার ব্যাপার জানা রয়েছে আমার ভাণ্ডারে। (যেমন $1 - 2$ এর চেয়ে বড়, বা $1 = 2 = 3$ এইরকম। আবার $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 0$)।

মডেল তৈরি

সমস্যা নিয়ে খেলা

বিজয় বল*

সমস্যায় আমাদের সকলকেই পড়তে হয়। আর বেঁচে থাকার তাগিদে ছোট-বড়-সব সমস্যাকেই সমাধান আমাদেরই করতে হয়। যে কোন সমস্যাকেই মোকাবিলা করার জন্য একান্ত প্রয়োজন—তাকে ভাল ভাবে বোঝা, তার চরিত্রগত বিভিন্ন দিকগুলিকে খুঁজে বের করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে ভালভাবে তলিয়ে দেখা। আর সর্বোপরি—সুশৃঙ্খলভাবে ধাপে-ধাপে সেই সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে যাওয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অভ্যাসে পরিণত করার জন্য ছোটবেলা থেকেই অনেকে ছোট-খাটো মজার প্রশ্ন নিয়ে, মজার সমস্যা নিয়ে ভাববার চেষ্টা করেন। আজ আমি এমনি একটি মোটামুটি প্রচলিত সমস্যা নিয়েই আলোচনা করবো।

সমস্যাটি হল, এক চাষী একটি নদীর পূব পারে দাড়িয়ে। সঙ্গে তার একটি ছাগল, একটি নেকড়ে বাঘ এবং এক ঝুড়ি বাঁধা কপি। এগুলি চাষীকে নদীর পশ্চিম পারে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ঘাটে ছোট একটি নৌকা বাঁধা, যে নৌকায় দু-জনের বেশী যাওয়া সম্ভব নয়। এই অবস্থায় চাষী কিভাবে সকলকে নিয়ে ওপারে যাবে। কিন্তু চাষীর মূল সমস্যা নৌকা নিয়ে বার কয়েক এপার আর ওপার হতে যে পরিশ্রম হবে, তাকে লাঘব করা নয়। ছাগল, বাঁধাকপি ও নেকড়ে বাঘকে ওপারে নিতে হবে কিন্তু এদের মধ্যে একটির বেশী তার সঙ্গে যেতে পারবে না, অথচ ছাগল-নেকড়ে বাঘ বা ছাগল—বাঁধাকপিকেও এক পারে রেখে যেতে পারবে না।

এই সমস্যার উপর ভিত্তিকরেই তৈরী একটি বৈদ্যুতিক মডেলের কথাই আমি বলবো। মডেলটি পাঁচটি সুইচ, একটি তড়িৎ কোষ এবং ছোট একটি বাল্ব এবং তড়িৎ-বর্তনীর জন্য প্রয়োজনীয় তার দিয়ে তৈরী। ছবি অনুসারেই বলি, পাঁচটি সুইচ আছে 1, 2, 3, 4, 5-এর মধ্যে চারটি সুইচ যথাক্রমে চাষী,
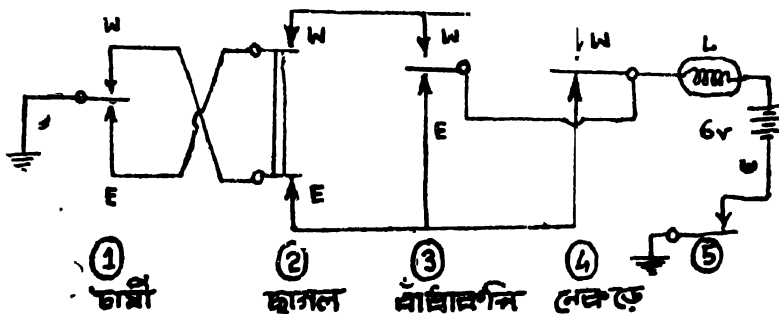
*সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700009

ছাগল, বাঁধাকপি আর নেকড়ের অবস্থা বোঝাচ্ছে। প্রত্যেকটি সুইচই দুটি অবস্থায় থাকতে পারে E অথবা W, অর্থাৎ পূর্ব পারে বা পশ্চিম পারে। কোন সুইচকে E থেকে W বা W থেকে E-তে
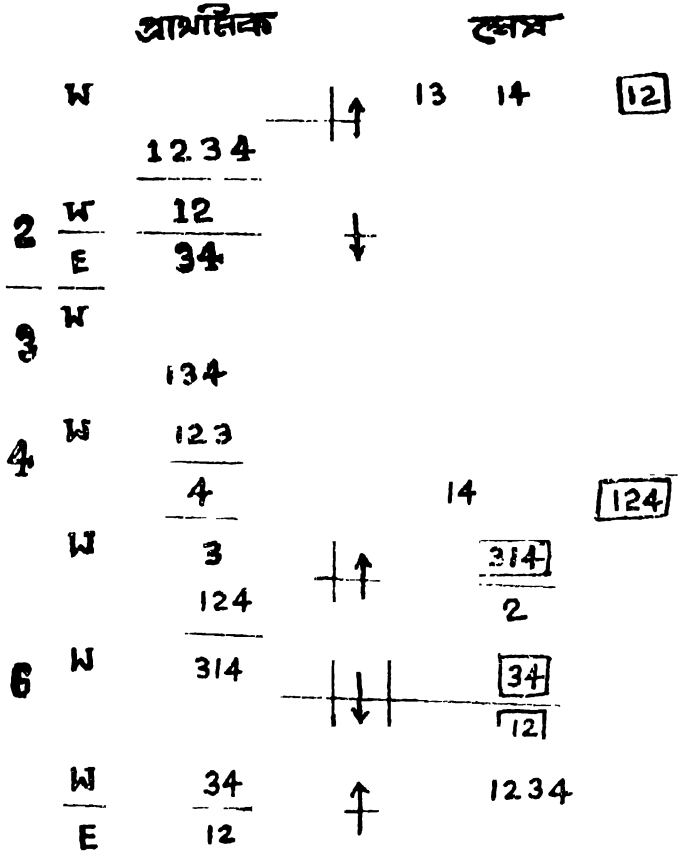
আনা হলে নৌকায় পূব থেকে পশ্চিমে, বা পশ্চিম থেকে পূবে পারি দেওয়া বোঝাবে। এখন একবারে দুটি সুইচের বেশী পরিবর্তন করা চলবে না, কারণ দুজনের বেশী নৌকায় পারি দেওয়া সম্ভব নয়। তার উপর দুটি সুইচের মধ্যে 1 নং থাকবেই, কারণ চাষীকে নৌকা চালাতেই হবে। এখন বর্তনীকে এমন ভাবে সাজানো আছে যে কেউ যদি ছাগল, বাঘ। বাঁধাকপিকে ওপারে নেবার জন্য সুইচ সাজাতে বসে কিছু ভুল করে ফেলে, অর্থাৎ ছাগল-বাঁধাকপি একপাশে রাখে তবে ছাগল বাঁধাকপি খেয়ে ফেলবে বা নেকড়ে এবং ছাগল একপাশে রাখে তবে নেকড়ে ছাগলকে খেয়ে ফেলবে, সঙ্গে সঙ্গে বর্তনীতে বিপদ সংকেত আলো জ্বলে উঠবে। সুতরাং যে কোন বিপদ সংকেত আলো না জ্বালিয়েই ছাগল, বাঁধাকপি এবং নেকড়েকে ওপারে নিয়ে যেতে পারবে সেই প্রকৃত সমস্যার সমাধান করতে পারবে। এখন সুইচের বিভিন্ন অবস্থানের সঙ্গে ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে।

প্রথমে চারটি সুইচ্ E অবস্থায় (অর্থাৎ নদীর পূব পারে)। সুইচ্ (1) এবং (2) E থেকে W-তে নিয়ে যাওয়া হল (অর্থাৎ নৌকায় চাষী ও ছাগল পশ্চিম পারে চলে গেল, (1) এবং (2) সুইচ্ দুটি W অবস্থায় থাকায় বর্তনী সম্পূর্ণ হয় না এবং বিপদ-সংকেত আলোও জ্বলে না। এবার (1)-কে W থেকে E-তে নিয়ে আসা হল। বর্তনী এখনও অসম্পূর্ণ হয় না এবং (4) নং সুইচ্‌কে E থেকে W-তে নেওয়া হল (অর্থাৎ চাষী ও নেকড়ে এবার পশ্চিম পারে গেল। এবারেও বিপদ-সংকেত পাওয়া গেল না। কিন্তু (1) নং সুইচ্‌কে যদি W থেকে Eতে আনা হয় (অর্থাৎ বাঘ ও ছাগলকে একদিকে রেখে চাষী অপর পারে চলে আসে) তবে বর্তনী সম্পূর্ণ হয় এবং বিপদ-সংকেত আলো জ্বলে ওঠে। সুতরাং (1) নং সুইচ্‌কে একা W থেকে Eতে না এনে (1) নং এবং (2) নং সুইচ্‌কে একসঙ্গে W থেকে E-তে আসতে হবে। এমনি ভাবে (1) নং এবং (3) নং সুইচ্ E থেকে W-তে (অর্থাৎ চাষী বাঁধাকপি নিয়ে পশ্চিম পারে গেল)। আবার (1) নং সুইচ্‌কে W থেকে E-তে নিয়ে এসে (1) নং এবং (2) নং সুইচ্‌কে আবার E থেকে W-তে নিয়ে যেতে হবে। এইভাবে ছাগল, বাঁধাকপি এবং নেকড়েকে নিয়ে চাষী নদীর পূবপার থেকে পশ্চিম পারে পৌঁছবে।

অবশেষে প্রসঙ্গক্রমে বলি, অমনি অনেক অংকশাস্ত্রের জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য ইলেকট্রনিক্সে বিভিন্ন লজিক্ সার্কিটের আবিষ্কার হয়েছে। AND, OR, NOR—এমনি ছোট ছোট লজিক সার্কিটের সাহায্যে বড় বড় সার্কিট তৈরি করে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করা হয়।
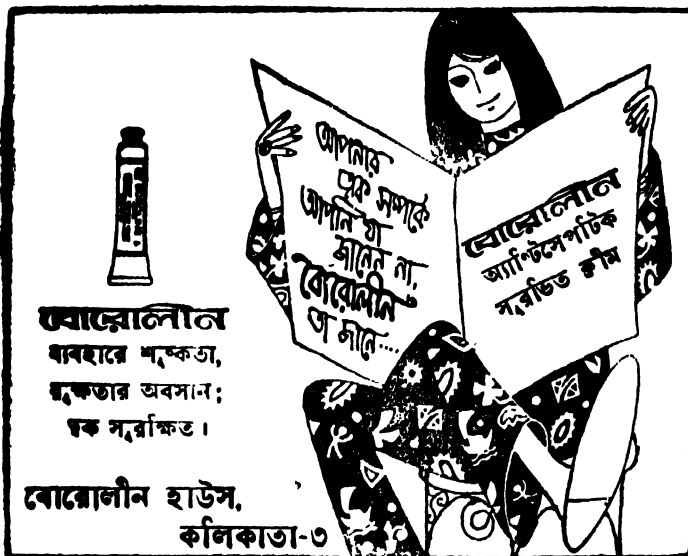
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-চেতনা

সত্যসুন্দর বর্মন*

আদিম মানুষের আগুন-তৈরি করতে জানাটা সেদিনের বিরাট এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। আজকের দিনের মহাকাশযান, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, কম্পিউটার, মোটর, রেলগাড়ী, এরোপ্লেন. বিদ্যুৎশক্তি বা আণবিকশক্তি প্রভৃতি আবিষ্কারের তুলনায় সেই আদিম মানুষের আগুন তৈরি করতে পারা ও তাকে জীবনের নিত্যপ্রয়োজনে লাগানো—কোন অংশেই কম গরুত্বের কথা নয়। কারণ মানুষ যেদিন আগুন তৈরি করে নিজের প্রয়োজনে তার ব্যবহার শিখেছে সেইদিন থেকেই সে অন্যান্য জীব থেকে পৃথক হয়ে এক উন্নত জীবনের পথে পা বাড়িয়েছে। তার আগে পর্যন্ত মানুষ অন্যান্য পশুদের মতই জীবন কাটাত। আগুনের আবিষ্কারই তার পশুজীবনের গতি-প্রকৃতি বদলে দিয়ে তাকে মানুষ করেছে। আগুন তার উন্নত জীবনযাত্রার প্রধান সোপান. তার আত্মরক্ষা ও প্রতিপত্তি বিস্তারের প্রধান হাতিয়ার। আজও সেই আগুনের ব্যবহারের বৈচিত্র্যই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। আগুন না থাকলে সভ্যতা থাকবে না, মানুষও বাঁচবে না অথচ আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যান্য অনেক কিছু আবিষ্কার না হলে বা সেই আবিষ্কারের পথ বন্ধ হয়ে গেলেও মানুষ বাঁচতে পারবে। তার সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে না। সুতরাং আগুনই সভ্যতার জন্মদাতা শুধু নয় তার ধারক ও বাহক। সভ্যতার আদিকাল থেকেই আগুনকে তাই দেবতা বলেই ভাবা হয়েছে। বস্তুতঃ মানুষের দৈবশক্তির কল্পনায় আগুনই হচ্ছে আদি দেবতা। সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমগ্র জীবন-সত্তার সঙ্গে সেই আগুন এমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত যে তার উৎপাদন ও ব্যবহারকে আজ সাধারণভাবে কোন বিজ্ঞানের কাজ বলে মনে হয় না। অথচ আগুনই মানব-সভ্যতার শুধু আদিম আবিষ্কার নয় এটি মানব কল্যাণের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।

ঠিক তেমনি উলঙ্গ যাযাবর মানুষেরা একদিন শুধু প্রকৃতিজাত ফলমূল লতাপাতা বা বন্য প্রাণীর মাংসাদি খেয়েই জীবনধারণ করত, আর খাদ্যের খোঁজে বন থেকে বনান্তরে জন্তুর মত ঘুরে বেড়াত। তারপর যেদিন তারা বীজ পুঁতে গাছ তৈরি করে তা দিয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি সংগ্রহ করতে শিখল সেদিন থেকে তাদের বুনো যাযাবরী জীবন বন্ধ হয়ে যায়। তারা ফসল তৈরি করার উপযোগী জায়গা খুঁজে এক একটি অঞ্চলে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করে। সৃষ্টি হয় কৃষিভিত্তিক সভ্যতার। কৃষিকাজ তাই মানব সভ্যতার অগ্রগমনে পরবর্তী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সেই কৃষির গুরুত্বের কথা সভ্য-মানুষ দীর্ঘকাল ভুলে গেছিল। বর্তমানে আবার কৃষিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উন্নত বিজ্ঞান বলে ভাবা হচ্ছে।

একই ভাবে বন্য পশুদের অনেককে পোষ মানিয়ে নিজেদের প্রয়োজনে লাগান ; গুহা ছেড়ে

*বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ হাতে কলমে বিভাগ

লতাপাতার কুটীর ও পরিকল্পিত বাসগৃহ নির্মাণ : কৃষি থেকে শুধু খাদ্য নয় বিভিন্ন শিল্পসামগ্রী গড়া ; পশুর চামড়া বা লতাপাতার পরিবর্তে পশুলোম ও কার্পাস থেকে বস্ত্রাদি তৈরি করা ; অস্ত্রের জন্য গাছের ডাল, পাথর হাড় প্রভৃতির পরিবর্তে বিভিন্ন ধাতুর আবিষ্কার ও উৎপাদন ও তা দিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করতে শেখা ; নিজেদের মনের ভাবকে ভাষায় রূপ দেওয়া ও পরে তাকে লিপিবদ্ধ করতে শেখা ; বিক্ষিপ্ত অসংগঠিত জীবনধারাকে ক্রমে সংগঠিত করে সমাজ সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রনীতির পত্তন প্রভৃতি সভ্যতাবিকাশের সমস্ত কাজই তো বিজ্ঞান। উন্নত বলিষ্ঠ সুন্দর জীবন-যাপনের জন্য যা কিছু কর্মকাণ্ড সবই ঐ বিজ্ঞান-চিন্তার ফল। ও-সবের কোন কিছুই ভাববাদী কল্পনা বিলাস দিয়ে হয় নি। প্রত্যেকটি কাজের পিছনে সেই সেই যুগের মানুষকে যথার্থ যুক্তিনির্ভর বাস্তব পরিকল্পনা করতে হয়েছে। ক্রমোন্নত জীবনের জন্য যুক্তিসিদ্ধ কর্মকাণ্ডই তো বিজ্ঞান। আদি আগুনের ব্যবহার বা বীজ পুঁতে কৃষি পদ্ধতির উদ্ভাবন ও অন্যান্য অনেক ঘটনাই হয়ত আকস্মিক ভাবে ঘটেছে কিন্তু তার প্রত্যেকটিকে ব্যবহারের উপযোগী রূপ দিতে যে অক্লান্ত শ্রম ও সাধনা করতে হয়েছে তা কোন ভাববিলাসের দ্বারা হয় নি। আদি মানব হঠাৎ করেই হয়ত আগুন পেয়েছিল, বজ্রপাত, দাবানল অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎস থেকে। তবে সেই আগুনকে নিজেদের ইচ্ছামত তৈরি করতে এবং তাকে কাজে লাগানোর জন্য বাঁচিয়ে রাখতে সেদিনের মানুষকে যে শ্রম ও সাধনা করতে হয়েছে সেইটাই বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড।

এইসবের সঙ্গে সেদিনের মানুষ তার পরিবেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির দুর্দমনীয় প্রতাপ ও ভয়াল রূপ দেখে ওসব বিষয়েও নানাভাবে চিন্তা করেছে এবং তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছে। ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরি প্রভৃতির সঙ্গে দুর্ভিক্ষ মহামারী ও শরীরগত রোগযন্ত্রণা জরা মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা বা দুর্ঘটনাগুলি সেই আদিমকাল থেকেই মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে এবং তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চিন্তায় সে আকুল হয়ে উঠেছে ! সেইসব কাজে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সে সফল হয়েছে পরবর্তীকালে সেইগুলিই বিজ্ঞান নামে পরিচিত। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে অনেক ঘটনার যথার্থ সমাধান করতে না পেরে ঐ নিয়ে নানারকমের কল্পনার জাল বুনেছে। যেসব ঘটনা তাদের বিচার বুদ্ধির বাইরে চলে গেছে সেগুলিতে কোন অদৃশ্য শক্তি কাজ করে বলে তারা ভেবেছে। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি দিয়ে সেগুলির ব্যাখ্যা সম্ভব না হওয়ায় তাদের অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক শক্তি বলা হয়েছে। একটা কাজ ঘটছে বা হয়েছে, কিন্তু তা কি করে হচ্ছে তার প্রত্যক্ষ কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে না পেলে সেই কাজের পিছনে কোন অদৃশ্য শক্তির হাত রয়েছে বলা ছাড়া উপায় নেই। আর কাজটা যখন হচ্ছে তখন কেউ তা করছে বা করাচ্ছে এই রকম ভাবাটাই স্বাভাবিক। সুতরাং সেই অদৃশ্য শক্তির পিছনে কোন এক কর্মকর্তা আছেন বলেই মনে করা হয়। সবই অবশ্য কল্পনা ! তাতে যেসব ঘটনার যুক্তিসিদ্ধ কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেল না, সেসবকে সেই অলৌকিক শক্তির কাজ বলে ভাবা হয়। আর সেইসব শক্তির পিছনের কর্তাকে এক একটি দেবতা বা উপদেবতা মনে করা হয় এবং এদের সবার উপরে সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বর বা ভগবানের

কল্পনা করা হয়। সেই ভাবেই বাতাসের দেবতা, জলের দেবতা, মাটির দেবতা, মেঘের দেবতা, ঝড়ের দেবতা, বজ্রের দেবতা, ভূমিকম্পের দেবতা, এমন কি দুর্ভিক্ষ মহামারী এবং রোগজরা প্রভৃতির দেবতা বা অপদেবতার কথাও ভাবা হয়।

যা দেখা যাচ্ছে না অথচ আছে বলে স্থির বিশ্বাস কিন্তু যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে তাকে অনুভব করাও যাচ্ছে না—সেই রকম বিশ্বাসকেই অন্ধ বিশ্বাস বলা হয়। কারণ অন্ধের মতই কোন কিছু না দেখেই সেই সব শক্তির কথা ভাবা হয়। পরবর্তীকালে ঐ সব বিষয়ে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রসারিত হওয়ায় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সেগুলির কার্যকারণ নিরূপিত হওয়ায় সেই অন্ধবিশ্বাসের মাত্রা ও পরিধি ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসে। যেমন রোগ কি করে হয় আদি মানব জানত না। ভাবত এটাও কোন অদৃশ্য শক্তির কাজ। তাই নিরাময়ের জন্য তারা সেই কল্পিত শক্তির কাছে প্রার্থনা করত। আর আজ আমরা জানি রোগ কি ভাবে উৎপন্ন হয় এবং কোন রোগে কি ওষুধ দিলে তা সারে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে এখানে সেই অন্ধবিশ্বাস ও অদৃশ্য শক্তির কল্পনা ক্রমে দূরে সরে যায়। তেমনি দিনরাত্রি কি করে হয় এটা একদিন সাধারণ মানুষের জ্ঞানের বাইরে ছিল। সবাই ভাবত সেই অলৌকিক শক্তির ভগবানই দিনরাত্রি করেন। তার পরের যুগের মানুষেরা ভাবতে থাকে সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে দিনরাত্রি তৈরি করে। আর আজ আমরা জানি যে পৃথিবীটাই ঘোরে, তাতেই দিনরাত্রি হয় এবং বিভিন্ন ঋতু পরিবর্তন হয়। এই অন্ধ বিশ্বাস মানুষের মনকে কি ভয়ংকর ভাবে প্রভাবিত করতে পারে তার একটি বলিষ্ঠ নজীর, এই পৃথিবী ঘোরে না সূর্য ঘোরার ব্যাপার। অলৌকিক শক্তির কল্পনা বা অন্ধবিশ্বাসের কথাগুলি বুদ্ধিমান মানুষদেরই তৈরী। আর তাঁরাই হচ্ছেন সমাজ ও রাষ্ট্রের হর্তাকর্তা। তাঁদের মতামতকে প্রায় সবাই মানতে বাধ্য হয়। ঐশ্বরিক শক্তির কল্পনা নিয়ে তারা যখন বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ গড়ে তোলেন তখন বৃহত্তর জনসাধারণও সেই পথ অনুসরণ করেই চলে, তবে সমাজে প্রাধান্য বজায় রাখার জন্যই সেই ধর্মীয় নেতারা আর একটি জিনিষ সুকৌশলে প্রচার করে চলেন যে সেই অলৌকিক শক্তির মালিক স্বয়ং ভগবানই তাঁদের পাঠিয়েছেন পৃথিবীর সাধারণ মানষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এই পরিকল্পিত অপপ্রচারটাই বুদ্ধিজীবীদের উপর বেশী কার্যকরী হয়। সুতরাং সাধারণ মানুষের আর কোন ক্ষমতা থাকে না সেই ধর্মীয় নেতাদের কথা অমান্য করতে। সেই ধর্মীয় মতেই বলা হয়েছিল সূর্যই ঘোরে পৃথিবীর চারদিকে, আর পৃথিবী এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে, কিন্তু পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীরা যখন অংক কষে ও প্রমাণ করে দেখাতে চাইলেন যে পৃথিবীই ঘোরে সূর্যের চারদিকে, তখন ধর্মীয় নেতারা গেলেন ক্ষেপে। তাঁরা সেসময় সেইসব মহান বিজ্ঞানীদের ওপর যে অকথ্য অত্যাচার করছেন তাতো আজকে আর ভাবাই যায় না। তাঁদের অনেককে তো মেরেই ফেলা হয়, সে কাহিনী লিখতে গেলে মহাভারত হবে।

যাই হোক ঐ ধর্মীয় নেতাদের প্রভাবে কালক্রমে পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা ও কার্যক্রমকে সেই অলৌকিক শক্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। তার প্রধান কারণ জীবের সৃষ্টি বিকাশ এবং তার পরিণতি বিষয়ে তখন বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের অভাব। নিজের জীবন সম্পর্কে যদি যথার্থ জ্ঞান না থাকে, নিজের শরীরের কোথায় কি আছে, কোথায় কি ঘটছে এবং কি করে সেই সব পরিচালিত হয়, তা যদি

ঠিকমত বলা বা বোঝা না যায়, আর জীব ও জীবনের শেষ পরিণতিকেই যদি ঠিকমত বুঝতে ও বোঝাতে না পারা যায় তবে পৃথিবীর অন্যান্য বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে যত জ্ঞানই হোক ওসবের শেষ মূল্য কি? নিজেকেই যে জানে না তার অন্যান্য বিষয়কে জানার সব বাহাদুরীই তো অর্থহীন। এই ধারণাই সেদিনের মননশীল মনকে অহরহ ক্ষতবিক্ষত করে চলে। জীবন ও জীবদেহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাবই সেদিনের সুস্থ চিন্তাবিদ্‌গণকে সম্পূর্ণরূপে ঐ অলৌকিক বা ঐশ্বরিক শক্তির কথায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। সমস্ত চিন্তার ধারাই তখন ঐ একমুখী—কেবল ঈশ্বরমুখী হয়ে ওঠে। এমনকি যে সমস্ত কর্ম ও ঘটনার প্রত্যক্ষ কার্যকারণ সবাই জানেন এবং কোন অলৌকিক শক্তি সেখানে কাজ করে না বলে বোঝেন, তার মধ্যেও ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাব আছে বলে দৃঢ়ভাবে প্রচার করা হয়। কারণ যিনি যা কিছু ভাবছেন তিনি নিজেই যদি এই অলৌকিক শক্তির দ্বারা চালিত বা নিয়ন্ত্রিত হন তবে তাঁর সমস্ত কর্ম ও চিন্তার সবকিছুই তো ঐ অদৃশ্য শক্তি প্রভাবিত, এইরূপ যুক্তিই তখন বড় হয়ে দেখা দেয়। আজও সেই যুক্তির প্রভাব প্রবলভাবেই রয়েছে। সেই চিন্তাধারায় ঈশ্বর বা ঐজাতীয় কোন মহান শক্তির কথাই একমাত্র সত্য এবং জ্ঞানীদের সাধনার বিষয়, আর বিজ্ঞান বা পার্থিব কর্ম ও চিন্তার সব কিছুই অসত্য, মায়াময়, অর্থাৎ ভ্রান্ত। জীবদেহ ও জীবনসংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সেসবের প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপায় তখন ছিল না তাই বিজ্ঞানের বিবিধ ক্ষেত্রের প্রভূত উন্নতির সঙ্গে জীবন-বিজ্ঞানের আনুপাতিক প্রগতি না ঘটায় দর্শনতত্ত্বের সেই সর্বশক্তিমান অদৃশ্য সত্তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব পাওয়া যায় নি। এখন দিন বদলে গেছে। বিগত দুই দশকের মধ্যেই জীবনবিজ্ঞানের যে বৈপ্লবিক আবিষ্কারসমূহ ঘটেছে তাতে জীবন ও জগৎ নিয়ে অন্ধবিশ্বাসের প্রয়োজন আর নাই। সেই বিষয়ের আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। এখন বড় প্রশ্ন—বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ?

অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাস জীবন-প্রবাহের অগ্রগমনের পরিপন্থী। ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থ সেই কাজে আরও জটিলতা আনে। বিজ্ঞান সেই অন্ধবিশ্বাস ও অজ্ঞতা দূর করে জীবনের অগ্রগমনের পথ দেখায়—এই সহজ সত্যটি সর্বসাধারণের মনে তথা বুদ্ধিজীবীদের কাছে সহজে অনুভূত না হলে বিজ্ঞান-চেতনায় ও বিজ্ঞান-সাধনায় বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়। বুদ্ধিজীবী মানুষরা হচ্ছেন সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাধান্যকারী গোষ্ঠী। তাঁদের কর্মে ও চিন্তায় স্বাভাবিকভাবে তাঁদের জীবন ও জীবিকা অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠী-স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত! সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থে আঘাত লাগলে নানাভাবে তার প্রতিরোধের চেষ্টা চলে। অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী ভক্তের দল পৃথিবীব্যাপী মানবকল্যাণের কথা বললেও নিজেদের মধ্যে আধিপত্যের দ্বন্দ্ব বা গোষ্ঠীস্বার্থের সংকীর্ণতা থেকে তাঁরা কখনই মুক্ত হতে পারেন নি। যে যার দলগত বা গোষ্ঠীস্বার্থের জন্যেই এক ধর্ম আর এক ধর্মের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে বারংবার। আজও সেই মনোবৃত্তির অবসান ঘটেনি। ঠিক তেমনি যে বিজ্ঞান মানসিকতায় বা বিজ্ঞান চেতনায় সমাজে রাষ্ট্রে প্রাধান্যকারী বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর প্রাথমিক ক্ষতি বা তাৎক্ষণিক কিছু স্বার্থহানির সম্ভাবনা সেই কাজের বা চিন্তার বিরোধিতা করাই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। এই গোষ্ঠীস্বার্থের প্রশ্ন ছাড়া নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করলে বিজ্ঞানের কোন কাজই মানব সমাজ বা সমগ্র জীবনপ্রবাহের পক্ষে

কোনমতেই অশুভ বা অকল্যাণকর হতে পারে না। জীবনযুদ্ধে ক্রমশঃ অগ্রসর মানুষ অজানাকে জানার চেষ্টায় এবং প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের ওপর আধিপত্য স্থাপনের কাজে এই পৃথিবী ও মহাবিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ে যে জ্ঞান সাধনা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছে তাই হচ্ছে বিজ্ঞান। অনুসন্ধিৎসু মন সব কিছু জানতেই চাইবে। সেই জানার কাজ কখন কি অন্যায় বা অকল্যাণকর হতে পারে? তবে এই জ্ঞান বা বিজ্ঞানের সর্বকিছুই সেই মুহূর্তে মানুষের বাস্তব প্রয়োজনে নাও লাগতে পারে! আজকের জ্ঞানকে এখনই কোন কল্যাণকর কাজে লাগানো না গেলেও ভবিষ্যতের কোন না কোনদিন তার প্রয়োজন হবে না একথা তো বলা যায় না। এই বিষয়টি বহুভাবেই প্রমাণিত। পৃথিবীতে মানুষের বা জীবজগতের কল্যাণ বা প্রগতির কথা ভাবতে গেলে তার পরিবেশের কোথাও ক্ষতিকর কিছু আছে কিনা সে সব খুঁজে বার করাও প্রয়োজন। যেমন সাপের বিষ বা রোগজীবাণু। সেই জীবাণু বা বিষ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের দরকার। বিজ্ঞান সেই কাজ করে এবং ওসবের আক্রমণ থেকে বাঁচার পথ বা উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কিন্তু সেই বিষ বা জীবাণুকে যদি কেউ জীবনহানির কাজে লাগায় তবে সেটা ত বিজ্ঞানের দোষ নয়, সেটা ঐ ব্যক্তিবিশেষরই দোষ,—যার মধ্যে ঐ স্বার্থ-সংকীর্ণতার প্রশ্ন। তবে বিজ্ঞানের এক একটি সাফল্যে সমগ্র জীবনপ্রবাহে যেমন অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে, মানুষের জীবন ধারায় ও জীবনমানে নানা বৈপ্লবিক বিবর্তন এসেছে তেমনি বিজ্ঞানের অনেক কাজে মানুষের অভান্ত জীবনে অবনে অনেক সময় বিপর্যয় বা সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে; যেমন পরমাণু বোমা, বিভিন্ন মারণাস্ত্র ও বিষাক্ত জিনিষের আবিষ্কার। এমনকি শক্তিশালী যান্ত্রিক উৎপাদনের আবিষ্কারেও মানুষের কায়িক-শ্রমের প্রয়োজনীয়তাকে ক্ষুণ্ন করে বহু মানুষের জীবিকার্জনের স্বাভাবিক পথ বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি। সেই জন্যেই সাধারণ ভাবেই প্রশ্ন ওঠে—বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ। আর এইখানেই প্রকৃত বিজ্ঞান-চেতনার প্রশ্ন ও গুরুত্ব।

বিজ্ঞান ছাড়া মানুষের জীবন ও সভ্যতার অগ্রগমন যে সম্ভবই না—সেকথা অনস্বীকার্য। কিন্তু বিজ্ঞানের যেসব আবিষ্কার আপাতঃ ধ্বংসকারী বলেই মনে হয়, সেগুলি কি মানবজীবনে স্থায়ী বিপর্যয় আনছে বা আনবে? একথার উত্তর নির্ভর করে সেইসব জিনিষের প্রয়োগকৌশলের উপরেই। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল নিশ্চতভাবেই মানুষের কল্যাণ কামনা করে। কিন্তু প্রাধান্যকারী স্বার্থপর মানুষের চক্রান্তে সেই ধর্ম ও দর্শনের নামে পৃথিবীব্যাপী যত রক্তক্ষয় ও অজস্র জীবনহানি ঘটেছে বিজ্ঞানের ধ্বংসকারী আবিষ্কারগুলি আজও তত অমঙ্গল ঘটায় নি; পরমাণু বোমা দিয়েও নয়। সবটাই নির্ভর করে মানুষের শুভবুদ্ধি এবং সমষ্টিগত চেতনার ওপর। বৃহত্তর জনগণ যদি বিজ্ঞান সচেতন হয় তবে মানুষের অকল্যাণে বিজ্ঞান কখনই প্রযুক্ত হতে পারে না, যে পরমাণু বোমার বিরুদ্ধে পৃথিবীময় ক্ষোভ সেই পরমাণুর শক্তি সম্পর্কে কারও কিন্তু বিরুদ্ধ মনোভাব নেই। প্রশ্ন শুধু পরমাণুশক্তি দিয়ে বোমা তৈরি হবে না, সেই শক্তিকে অন্য কোন গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করা হবে। এইখানে সেই মতামত স্থির করার ক্ষমতা দেশের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে থাকলে গোষ্ঠীস্বার্থের নীতি অনুসারে তাদের সেই ক্ষমতার অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা। বিজ্ঞান তখন অভিশাপই হতে পারে। কিন্তু সেই মতামত স্থির করার ক্ষমতা যদি বৃহত্তর জনগণের হাতে

থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত কোন অনিষ্টই হতে পারে না। সমস্ত দেশেই এখন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। সেই জনসাধারণ যদি উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হয়, বিজ্ঞান-সচেতন হয়, যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনে সক্ষম হয়, তাহলে রাষ্ট্র পরিচালকগণ কোনকালেই ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে না। সাময়িক ত্রুটি বিচ্যুতি হলেও অচিরেই তার সংশোধন সম্ভব।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের যেসব ধ্বংসকারী শক্তির কথা বলা হচ্ছে বা ভাবা হচ্ছে তার বেশীর ভাগইতো পৃথিবী বা বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্নস্থানে ছাড়ানোই রয়েছে। বিজ্ঞানীরা সেগুলিকে প্রাণপাত সাধনায় খুঁজে বের করছেন মাত্র। তাঁরা সেগুলি হাতেনাতে পরীক্ষা করে না দেখিয়ে দিলেও প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে একদিন না একদিন সেইসব ধ্বংসকারী শক্তির বিকাশ ঘটতই। যেমন সাপের বিষে বা রোগের আক্রমণে অসহায়ভাবে অসংখ্য মানুষ মরত। ওসবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় তখন কিভাবে হত? যে তেজস্ক্রিয় পরমাণু দিয়ে বোমা বানানো হয় তার মৌল উপাদানগুলি-তো পৃথিবীর বুকেই আছে। অজ্ঞাতসারে মানুষ তার সংস্পর্শে এলে কালক্রমে সেই তেজস্ক্রিয়তার বিষক্রিয়া তাদের মধ্যে দেখা দিত। বিজ্ঞান ছাড়া কে বাঁচাবে তাদের? তেমনি বিষাক্ত বাষ্প ও রাসায়নিক দ্রব্যের গুণাগুণ জানা না থাকলে প্রকৃতিজাত সেইসব বিষের বিরুদ্ধে মানুষ আত্মরক্ষা করবে কি করে? আর প্রাকৃতিক নিয়মে যে হারে পৃথিবীর মানুষের জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে অদূর ভবিষ্যতে এই পৃথিবীতে মানুষের স্থানসংকুলান না হবারই কথা। বিজ্ঞান ছাড়া এই সমস্যার সমাধান কি সম্ভব? হয়ত একদিন এই কারণেই বহির্বিশ্বের অন্য কোথাও অর্থাৎ গ্রহান্তরে মানুষের বাসোপযোগী নতুন উপনিবেশে যাত্রা করতে হবে। পরমাণুশক্তি, তেজস্ক্রিয়তা ও বিজ্ঞানের অন্যান্য জ্ঞান না থাকলে সেই কাজের কল্পনাও কি করা যায়! বস্তুতঃ বিজ্ঞানচেতনার অভাবই বিজ্ঞান সম্পর্কে সন্ত্রাসের মনোভাব সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানের ধ্বংসকারী শক্তির কথা ভাবা মূলতঃ অবৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রনীতিরই পরিণতি। সমাজ রাষ্ট্রের শাসন ও নীতি নির্ধারণের পদ্ধতিগুলিও আসলে বিজ্ঞানেরই কাজ। তাই সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি যদি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত হয় তাহলে সেখানে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ কোন মতেই হতে পারে না। বিজ্ঞানকে যারা শুধু ল্যাবরেটরির কথা বলেই ভাবেন আর ব্যক্তিগত জীবনে অন্ধবিশ্বাস ও স্বার্থান্বেষী সংস্কারকে আঁকড়ে ধরতে চান তাঁদের কাছেই বিজ্ঞান কখনও কখনও অভিশাপ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানকে যারা জীবনের প্রাত্যহিক কর্ম হিসাবে গ্রহণ করে সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালনায় দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজে বিজ্ঞানের মঙ্গলস্পর্শ অনুভব করেন, তাঁদের কাছে বিজ্ঞান কোনদিনই অভিসম্পাত হতে পারে না। আজকের দিনে রান্নাঘরের পাকপ্রণালীও খাদ্য তালিকা থেকে আরম্ভ করে খেলাধূলা ও সাধারণ জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপেই বিজ্ঞানের কল্যাণকর প্রয়োগ চলছে। জীবন ও সমাজের প্রতিটি কাজে এই বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারাই হচ্ছে প্রকৃত বিজ্ঞানচেতনা। এই অনুভূতি যদি মনে আসে তাহলে "বিজ্ঞান আশীর্বাদ, না অভিশাপ"--এই প্রশ্ন তো উঠতেই পারে না। একইভাবে "বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কার সবচেয়ে কল্যাণকর" এই কথাও বিজ্ঞানচেতনার অভাবই ঘোষণা করে। আর যখন বিজ্ঞান সমগ্র জীবনপ্রবাহের কল্যাণ ও উন্নয়নে একান্তভাবেই নিযুক্ত তখন "বিজ্ঞান শিশুদের পক্ষে আশীর্বাদ না অভিশাপ" এই জাতীয় প্রশ্নের মধ্যেও অজ্ঞতারই প্রকাশ। দেশের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ চিন্তাবিদ্ এবং তথাকথিত বিজ্ঞানানুরাগীদের মধ্যেও যখন এই ধরণের প্রশ্নের উদয় হয় তখন ভাবতে হয় কবে এদেশে সত্যিকারের বিজ্ঞান-চেতনা আসবে। যুগযুগের অভ্যস্ত অজ্ঞতা ও অন্ধ বিশ্বাসের প্রতি আকর্ষণই বৃহত্তর জনমানসে বিজ্ঞান চেতনা সৃষ্টির প্রধান বাধা। আর সেইটাই মানব কল্যাণের প্রকৃত অন্তরায়।

মৌলিক সংখ্যা চেনার উপায়

দেবাশীষ দাশগুপ্ত

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে পূর্ণ সংখ্যাগুলি (যেমন 1, 2, 3 ইত্যাদি) একটি অপরিহার্য অঙ্গ। পূর্ণ সংখ্যাগুলি জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই লাগে, এবং বিজ্ঞানের যে-কোন শাখার একেবারে গোড়াতেই এদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

পূর্ণ সংখ্যার সংখ্যা অগণিত এবং এদের পরস্পরের মধ্যে যোগ, বিয়োগ বা গুণ দ্বারা পূর্ণ সংখ্যাই পাওয়া যায়। তবে ভাগের ক্ষেত্রে ঘটনাটা একটু অন্যরকম। এমন কতকগুলি পূর্ণ সংখ্যা আছে, যা 1 এবং সংখ্যাটি নিজে ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য নয়—যেমন 2, 3, 5, 17, 19 ইত্যাদি। এই পূর্ণ সংখ্যাগুলিকে মৌলিক সংখ্যা বলা হয়। পূর্ণ সংখ্যার মত মৌলিক সংখ্যার সংখ্যাও অগণিত।

ছোট ছোট মৌলিক সংখ্যা (যেমন 3, 5, 7, 17 ইত্যাদি) চেনার কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু বড় মৌলিক সংখ্যা (যেমন 71, 79, 83, 89 ইত্যাদি) চিনতে গেলে পরিশ্রম করে ছোট ছোট সংখ্যা দিয়ে গুণ করে দেখতে হবে যে, মৌলিক সংখ্যাটি ছোট সংখ্যাগুলি দ্বারা বিভাজ্য কিনা। এটি খুবই পরিশ্রমসাপেক্ষ।

একটি পূর্ণ সংখ্যা মৌলিক কিনা, তা সহজে নির্ণয় করার পদ্ধতি নীচে দেওয়া হল।

দুটি মৌলিক সংখ্যার বর্গের বিয়োগফলকে যদি 12 দিয়ে ভাগ করা হয়, তাহলে ভাগফল সবসময় একটি পূর্ণ সংখ্যা হবে। যদি x একটি পূর্ণ সংখ্যা হয় এবং y (x-এর চেয়ে ছোট) একটি মৌলিক সংখ্যা হয় (1, 2, 3 বাদে) এবং যদি দেখা যায় যে, $(x^2-y^2)/12$ = একটি পূর্ণ সংখ্যা, তাহলে x একটি মৌলিক সংখ্যা। যদি $(x^2-y^2)/12 \neq$ একটি পূর্ণ সংখ্যা, তাহলে x মৌলিক সংখ্যা নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, চারটি মৌলিক সংখ্যা, যথা 1, 2, 3 ও 5-এর ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হয় না।

এবারে উপরের নিয়মটি কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখা যাক।

23 সংখ্যাটি নেওয়া হল এবং জানা মৌলিক সংখ্যা 5 নেওয়া হল।

$$\frac{23^2-5^2}{12} = \frac{(23+5)(23-5)}{12} = \frac{28\times 18}{12} = \frac{504}{12} = 42 = \text{একটি পূর্ণ সংখ্যা।}$$

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, 23 একটি মৌলিক সংখ্যা। এবারে 24 পূর্ণ সংখ্যাটি নিয়ে দেখা যায়—

$$\frac{24^2-5^2}{12} = \frac{(24+5)(24-5)}{12} = \frac{29\times 19}{12} = \frac{551}{12} \neq \text{একটি পূর্ণ সংখ্যা}$$

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, 24 একটি মৌলিক সংখ্যা নয়। 17 পূর্ণ সংখ্যাটি নিয়ে দেখা যায়—

$$\frac{17^2-5^2}{12} = \frac{(17+5)(17-5)}{12} = \frac{22\times 12}{12} = 22 = \text{একটি পূর্ণ সংখ্যা}$$

সুতরাং 17 একটি মৌলিক সংখ্যা। এবারে 15 সংখ্যাটি নিয়ে দেখা যায়

$$\frac{15^2-5^2}{12} = \frac{(15+5)(15-5)}{12} = \frac{200}{12} \neq \text{একটি পূর্ণ সংখ্যা}$$

সুতরাং 15 মৌলিক সংখ্যা নয়।

অতএব, কোন সংখ্যা মৌলিক কিনা, উপরের নিয়মটি প্রয়োগ করে তা নির্ণয় করা যেতে পারে।

প্রকাশনা সচিব—রতনমোহন খাঁ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

একাদশ—দ্বাদশ শ্রেণীর

রসায়ন-পাঠক্রমে লিখিত

উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন

প্রথম খণ্ড

ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা

উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন

দ্বিতীয় খণ্ড

ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা

আই. আই. টি., জয়েন্ট এন্ট্রান্স, প্রি-মেডিক্যাল ও উচ্চ মাধ্যমিকের

বহু প্রশ্নের উত্তর ও আলোচনা এবং বহু গাণিতিক উদাহরণ সহ

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ

: প্রকাশক :

পাবলিশিং সিণ্ডিকেট

৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

Regd. No. C 3684
(G.P.O. Calcutta)

●

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে প্রকৃত জনকল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য পরিষদের বর্তমান
কর্মসমিতি একান্তই সচেষ্ট, সেই বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাকে সফল করতে
হলে সকলের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা চাই। এই উদ্দেশ্যে
পরিষদের সদস্যবৃন্দ, দেশের বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞানকর্মী, বিজ্ঞান-
সংগঠন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সমাজসেবা সংগঠন, সমাজ ও
রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং জনসাধারণের কাছে
আমাদের আবেদন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
প্রতিষ্ঠিত এই মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের
উন্নতি ও প্রসারকল্পে সকলে আন্ত-
রিকভাবে এগিয়ে আসুন,
সাহায্য করুন ও পরামর্শ
দিন।

●

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—নীলাচল প্রেস, কলিকাতা-700 009.

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 10, অক্টোবর, 1979

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাত্রিংশত্তম বর্ষ অক্টোবর, 1979 দশম সংখ্যা

ডাক্তার ও জনসমাজ

গুণধর বর্মণ

1957 সালে নির্বাচনকালে পাশের বস্তীতে রোগী দেখতে গিয়ে বস্তীবাসী কয়েক জনের মধ্যে তুমুল তর্কের কিছু কথা কানে ভেসে আসে। সাধারণভাবে শিক্ষিত বলতে যা বোঝায় এই বস্তীতে সেই ধরণের লোক বিশেষ নেই। তর্করত তাদেরই একজনের উচ্চকণ্ঠে শোনা গেল—আমাদের পার্টিতে সবসে বঢ়িয়া ডাক্তার আছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়! এতবড় ডাক্তার আর কোন পার্টিতে আছে শুনি? বক্তব্যের বলিষ্ঠতায় ও প্রকাশের ভঙ্গীতে প্রতিপক্ষেরা প্রায় কুপোকাৎ। কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে এক তরুণের সপ্রতিভ উত্তর সেই আক্রমণকারীকে 'থ' বানিয়ে দিল। সে জোর দিয়েই বলে উঠল যে, তাদের দলে আরও বড় ডাক্তার আছে। শুধু এই দেশে নয়, তামাম দুনিয়ায় তাঁর বিশেষ নাম আছে। তাঁর শেখানো বিদ্যা অনেক বড় বড় ডাক্তার আদমীকেও পড়তে হয় এবং পড়াতে হয়। তিনি হচ্ছেন ডাক্তার মেঘনাদ সাহা। বিধান রায় তো শেখাবার মত কোন বিদ্যা দিতে পারেন নি। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, এই দুই খ্যাতনামা ব্যক্তি সে সময়ের রাজনীতিতে ভিন্ন দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু সেই তরুণের প্রত্যুৎপন্ন জবাবটি শুধু তার প্রতিপক্ষ দলকে নয়, দূর থেকে আমাকেও খানিকটা হকচকিয়ে দিল। মনে হলো ডাক্তারী পাশ করে এতদিন ডাক্তারী করেও ডাক্তার কথাটার আসল অর্থ আমিও তো ঠিক ঠিক বুঝি না। ক্লাসের পড়ানো বিদ্যার মধ্যে

সাধারণভাবে ওসব কথা শেখাবার ব্যবস্থা নেই। সাধারণ বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন আলোচনাচক্রেও এই সব নিয়ে এখন বিশেষ কেউ মাথা ঘামায় না। তবে মূর্খ ও অশিক্ষিত বলে যাদের ভাবি তাদের কাছে বোধ হয় জ্ঞানের কথা শিখবার মত এখনও অনেক কিছু আছে বলে মনে হলো। সেই মন নিয়ে ঘরে ফিরে বিভিন্ন অভিধান খুলে বসলাম। দেখলাম ইংরেজী অভিধানে 'ডক্টর' কথার প্রথম অর্থ হচ্ছে 'শিক্ষক' (A teacher) দ্বিতীয় বিজ্ঞ ধর্মযাজক (A learned father of a church); তৃতীয়—'ভগবত্তত্ত্ব ও ধর্মীয় বিধিবিধানে সুপণ্ডিত ব্যক্তি'; চতুর্থ—কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষনীয় কোন বিষয়ে উচ্চতম ডিগ্রী (সেই বিষয়ে শিক্ষাদানে যোগ্যতার কথা ভেবেই); পঞ্চম—'চিকিৎসক' বা চিকিৎসাশাস্ত্রে কোন ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তি; ষষ্ঠ—কোন বিষয়ে 'সংশোধক বা সংস্কারক'। সুদূরপ্রসারী ভিন্ন ভিন্ন ধরণের এতগুলি অর্থ দেখে স্বভাবতই পড়লাম ফাঁপরে। নিজে ডাক্তারী করি এবং সবাই আমাকে 'ডাক্তারবাবু' বলে সম্বোধন করার এতদিন ধরে মনে যে একটা বিশেষ ধারণা গড়ে উঠেছিল সেই চিত্রটা কেমন নড়েচড়ে গেল। তার রূপরেখাগুলি অস্পষ্ট মনে হতে লাগলো। প্রশ্ন জাগলো—'ডক্টর' কথাটির আদি এবং প্রথম চারটি অর্থের ধারেকাছেও কি আমাদের ডাক্তারবাবুরা নেই?

সেই মুষড়ানো মন নিয়ে ভাবতে লাগলাম ডাক্তার কথাটি তো পাশ্চাত্ত্য শব্দ এবং যে বিদ্যা শিখলে চিকিৎসকদের এখন ডাক্তার বলা হয় সেই অ্যালোপ্যাথি হচ্ছে আদিতে ইউরোপীয় বিদ্যা। এই দেশে সেই বিদ্যার প্রচলন দু-শ' বছরও হয় নি। তার আগে, বলা যেতে পারে কয়েক হাজার বছর ধরেই তো এদেশে তখনকার মত যথেষ্ট উন্নত চিকিৎসাবিদ্যার প্রচলন ছিল। জীবন বা আয়ু সম্পর্কিত সেই বিদ্যার নাম হচ্ছে আয়ুর্বেদ। সেই শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের ভারতীয় ভাষায় বলা হয় 'কবিরাজ'। কি অদ্ভুত এই নামকরণ। কবি-সম্রাট বলতে সাধারণভাবে আমরা রবীন্দ্রনাথকেই বুঝি। তাহলে 'কবিরাজ' বলতে অন্যান্য 'কবি'দের কথাই তো ভাবা উচিৎ। তা না হয়ে ঐ কথা দিয়ে বোঝানো হলো কেন চিকিৎসকদের? এতে আরও ঘাবড়ে গিয়ে প্রায় বেপথু বনে ছুটলাম—মানবসভ্যতার অন্যতম আদি বিকাশভূমি পশ্চিম এশিয়ার মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে। আরব ও গ্রীসের অতীত গৌরবময় যুগে উন্নত সভ্যতা সংস্কৃতিতে তাদের চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে খোঁজ নিতে। আশ্চর্যের কথা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সেই উন্নত সভ্যতায় চিকিৎসকদের সে দেশে বলা হয় 'হাকিম'। বিভিন্ন দেশের বিচারালয়ে ধর্মাধিকরণ বা বিচারপতিরূপে যাঁরা অধিষ্ঠিত থাকেন সেই নাম? গ্রীসের প্রাচীন নাম ছিল 'ইউনান'। সেই থেকে সে দেশের চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলা হয় 'ইউনানি'। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের চিকিৎসকদের 'হাকিম' নামে অভিহিত করার ফলেই শেষ পর্যন্ত ঐ দেশের চিকিৎসা পদ্ধতি 'হাকিমি' চিকিৎসা নামেই এখন পরিচিত। বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে প্রচলিত যে ইউরোপীয় চিকিৎসাবিদ্যা অ্যালোপ্যাথি নামে পরিচিত সেই অ্যালোপ্যাথির জনক গ্রীসের মহান চিকিৎসক হিপোক্রেটিস্ আদিতে ছিলেন ঐ হাকিমি চিকিৎসক এবং গ্রীসের লোকের কাছে তিনি "হাকিম-বোকরাৎ" নামেই পরিচিত।

তাহলে কথাটা কি দাঁড়ালো? সভ্যতার আদি-কাল থেকে সবদেশেই চিকিৎসকদের যে বিশেষ উপাধিতে পরিচিত করা হয়ে আসছে তা শুধু শারীর-বিদ্যায় জ্ঞান এবং রোগ ও তার প্রতিষেধক ব্যবস্থার সঙ্গেই সীমিত অর্থে ব্যবহৃত নয়। তারও বেশী এবং অনেক কিছু বেশী আশা করা হয়েছে চিকিৎসকদের কাছ থেকে মানুষের জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিস্তারে সেই আদিকাল থেকেই। কেবল ব্যক্তিগত

সুস্থতা বা অসুখ-বিসুখের কথা নয় সমগ্র সমাজদেহের সুস্থতা, গতিশীলতা, তার বিভিন্ন অঙ্গের রোগ, দৌর্বল্য, ভালমন্দের যথাযথ বিচার করে প্রয়োজনীয় প্রেসক্রিপশন অর্থাৎ সেই সব অসুস্থতার প্রতিরোধে বা প্রতিবিধানে উপযুক্ত মতামত ও নির্দেশদানে ক্ষমতা ও যোগ্যতা আশা করা হয়েছে তাঁদের কাছ থেকে। তাইতো তাঁদিগকে যথার্থই বিচারক বা হাকিম বলা হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক শুধুমাত্র শারীরিক অসুস্থতা বা জীবিকাগত ব্যবসায়িক সূত্রে নয়। প্রকৃত চিকিৎসক হচ্ছেন সমগ্র পরিবারের বিশিষ্ট বন্ধু ও বিভিন্ন বিষয়ের পরামর্শদাতা; ইংরেজীতে যাকে বলে—"Friend Philosopher and guide to the family" শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত, স্বাধীন জীবিকায় রত নিরপেক্ষ চেতনায় বলীয়ান এই হাকিমেরা কোন সীমিত কক্ষের বিচার স্থানে বসেন না বটে তবে সারা দেশ জুড়ে রাজা থেকে ভিখারী পর্যন্ত সবস্তরের মানুষের মধ্যে তাঁদের যেমন সুবিস্তৃত, সহজ যোগাযোগ ও স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্র তেমনি সীমাহীন পরিধি নিয়ে তাঁদের নিরপেক্ষ চেতনা ও বিচারের ক্ষেত্রও প্রসারিত।

কিন্তু সুউন্নত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার চিন্তাবিদরা এঁদের 'কবি' ভেবে বসলেন কি করে? এঁরা তখন কি সব ই কবিতা লিখতেন? না, কাব্য নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন? একথার সন্ধানে ভারতীয় সভ্যতার কিছু গোড়ার দিকেই ফিরে যেতে হয়। আমরা জানি ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সাহিত্য ও জ্ঞানের আদি এবং মূল ভাণ্ডারই হচ্ছে তার বেদ, উপনিষদ মহাকাব্য ও পুরাণগুলি। বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। শুনে শুনেই এইসব বৃহৎ অমূল্য জ্ঞান ভাণ্ডারকে তখন মনে করে রাখা হতো। কারণ এগুলিকে তখন লিখে রাখার মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হয় নি। লিখে রাখার সুযোগ না থাকায় মুখস্থ করে স্মৃতিশক্তির সাহায্যে বংশপরম্পরায় বা শিষ্যপরম্পরায় এই মহান জ্ঞানভাণ্ডারকে বহন করে চলতে হয়েছে সুদীর্ঘকাল। সেই মুখস্থ করে মনে রাখার সুবিধার জন্যই বিষয়বস্তুকে যথাসম্ভব সুললিত গীত বা গানের আকারে পদ্যছন্দে বা কাব্যরূপেই রচনা করা হয়েছিল। সবাই জানি গান, কবিতাকে যে ভাবে মুখস্থ করে মনে রাখা যায় গদ্যকে সেভাবে পারা যায় না। বেদের অধিকাংশই গীতিছন্দে রচিত। তবে যজুর্বেদে পদ্যমন্ত্র কম হলেও তার গদ্যাংশ এমন সহজ সরল প্রাণবন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যে রূপকাশ্রয়ী ও প্রতীকী বচনে সমৃদ্ধ যে এযুগের গদ্য-কবিতার সঙ্গেই তা তুলনীয়। এই বেদেই প্রথম ভেষজবিদ্যা বা ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের সূত্রপাত। প্রথম তিন খণ্ডে সে বিষয়ে বেশী লেখা না থাকলেও কিছু কিছু আছে, তবে অথর্ববেদে একটি বিশেষ অংশই হচ্ছে ভেষজবিদ্যার বিষয়। আর সেই সময় থেকেই ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার বিশিষ্ট পরিচিতি। পরে অবশ্য এই অংশকে আরও বিস্তৃত করে পৃথক ভাবে আয়ুর্বেদ নামে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আয়ুর্বেদকে তাই পঞ্চমবেদ বলা হয়। সুতরাং সেই যুগে এদেশের চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে হলে পদ্যছন্দে শ্লোকের মাধ্যমে অপূর্ব স্মৃতিশক্তির সাহায্য বিশেষ সাধনার সঙ্গে বিষয়কে আয়ত্ত করতে হতো। তার জন্য সাধারণভাবে বেদ-উপনিষদের অন্যান্য অংশও সেই ছাত্রদের পড়তে হতো, ফলে ভেষজবিদ্যার ছাত্রদের মধ্যে বেদবেদান্তসহ একটি সমগ্র জীবনদর্শনও গড়ে উঠত। শুধু চিকিৎসা-বিদ্যাই তারা শিখত না, আর ছাত্রজীবনে একান্ত তপস্যায় বা সাধনায় কবিতা আলোচনার মাধ্যমে জীবনের যে প্রাথমিক অধ্যায় গড়ে উঠত পরবর্তী কর্মময় অংশে তার প্রতিফলন নিশ্চয়ই থাকত। তাদের সমস্ত কর্মে ও চিন্তায় তাই কবিতার ছাপ পাওয়া যেত। তারা সবাই কম বেশী যেমন করেও হোক কবি না হয়ে পারতেন না, তাই সার্থক ভাবেই তাঁদের 'কবিরাজ' বলা হতো।

এই কবিরাজগণ তখন শুধু চিকিৎসাবিদ্যাই জানতেন তা নয় বেদ-উপনিষদ পাঠের মাধ্যমে সমাজ রাষ্ট্র, ধর্ম, দর্শন ও জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক চেতনার জ্ঞান এবং তার যথার্থ মূল্যায়ন ছিল তাঁদে

মধ্যে। তাই ইংরেজী অভিধানের 'ডক্টর' কথার অর্থ নিয়ে যে বিষয়ের অবতারণা করেছিলাম এই 'কবিরাজে'র মধ্যেও সেই ভাবধারাই পরিস্ফুট। 'হাকিম' কথাতেও সেই একই কথা বোঝানো হয়েছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এবং ডাক্তার মেঘনাদ সাহা উভয়ের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যাই থাক এবং শিক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ডাক্তার উপাধির মধ্যে প্রকৃত গুণগত সাদৃশ্যই পরিস্ফুট হয়েছে। জ্ঞানে-গুণে সামগ্রিক জীবনবোধে যাঁরা বিশেষজ্ঞ এবং বৃহত্তর জনজীবনকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রগমনে যাঁদের কর্ম ও চিন্তা নিয়োজিত সেই 'পারঙ্গম' ব্যক্তিরাই হচ্ছে 'ডক্টর'। একটি বিশেষ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের জন্য যাঁদের 'ডক্টর' উপাধি দেওয়া হয় সেই উপাধিদানের পিছনেও তাঁদের জনশিক্ষার ক্ষমতার কথাই ভাবা হয়েছে, ইংরেজী অভিধানে সেকথা পরিষ্কার লেখাই আছে। সেই জনশিক্ষার কথা না ভেবে কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থে নিজের জীবিকায় বা ব্যবসায়ে রত থাকলে 'ডক্টর' কথার মর্যাদা থাকে না। তাই চিকিৎসক ডাক্তাররা চিকিৎসাশাস্ত্রকে যদি শুধু ব্যবসা হিসেবেই গ্রহণ করেন তবে তাঁরাও ডাক্তার উপাধির যোগ্য নন। ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ব্যবসার উর্ধ্বে জনসমাজকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানে আন্তরিকভাবে তাদের এগিয়ে আসতে হবে। সেইখানেই ডাক্তার নামের সার্থকতা।

বিভিন্ন সভ্য জাতির রাসায়নিক জ্ঞানের মূল উৎস সন্ধান করিতে গেলে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় যে, সকল ক্ষেত্রেই রাসায়নিক জ্ঞানের মূলে রহিয়াছে চিকিৎসাবিজ্ঞান, ধাতুনিষ্কাষণ এবং পরশপাথরের অনুসন্ধান। অতীত ভারতে রসায়নশাস্ত্রের অনুশীলন প্রধানত চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক হিসাবেই অনুসৃত হইয়াছিল, পরবর্তী কালে অবশ্য উহা ধর্মানুশীলনের পর্যায়ে পড়িয়া তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

* * * *

হিন্দুর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বেদ প্রাচীনতম এবং হিন্দুগণ বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া বিবেচনা করেন। ঋগ্‌বেদে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তবে উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহারা অন্ধকে দৃষ্টি এবং খঞ্জকে চলৎশক্তিদানে সমর্থ ছিলেন। গ্রীক পুরাণের দিওস্কুরোয়ের (Dioskouroi) সহিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে বর্ণিত বিশ্‌পলা নাম্নী কুমারীর উপাখ্যানে দেখা যায় বিশপলার একখানি পা কোন যুদ্ধে কাটা পড়িলে অশ্বিনীকুমারেরা তাঁহাকে লোহার পা তৈয়ারি করিয়া দিয়াছিলেন।

ঋগ্‌বেদের শ্রেষ্ঠ দেবতামণ্ডলীর প্রায় সকলেই মৌলিক পদার্থনিচয় এবং প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের প্রতীক মাত্র বলিয়া মনে হয়। অগ্নি, বায়ু, সূর্য প্রভৃতি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতদ্ব্যতীত রোগনিবারক অথবা রোগপ্রতিষেধক বনৌষধিসমূহকেও দেবগণের সমান মর্যাদা দিয়া অনেক স্তব রচনা করা হইয়াছে। বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে সোমলতার পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, সোমরসকে তাঁহারা অমৃত বলিয়া গণ্য করিতেন। এই সোমরসই দেবতাদিগকে অমরতা দান করিয়াছিল; ইহা ব্যাধিনাশক। সোমদেব রোগমাত্রকেই আরোগ্য করিয়া থাকে।

বেদে রোগনিবারক অনেক ওষধি ও লতাপাতার উচ্ছ্বসিত গুণকীর্তন দেখিতে পাওয়া যায়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

ঔষধ-বিজ্ঞানের যুগ

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

তান্ত্রিক যুগের সঞ্জীবনী সুধার কাল নিঃশেষ হইয়া আসিতে আসিতে অবশেষে হিন্দু রসায়ন ঔষধ-বিজ্ঞানে আসিয়া পৌছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এই যুগ আরম্ভ হইয়াছিল বলা চলিতে পারে। পারদ, লৌহ, তাম্র, প্রভৃতি ধাতুঘটিত অসংখ্য ঔষধের কোনটিই মানুষকে অমরত্ব অথবা মৃতের জীবনদান করিতে সক্ষম না হইলেও ইহা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া উঠিয়াছিল যে রোগ দূরীকরণে ইহাদের অনেকগুলিই বিশেষ কার্যকর। প্রথমে চরক ও সুশ্রুত-বর্ণিত বহুবিধ বনজ ঔষধের সহিত ধাতুঘটিত দুই চারিটি ঔষধ বিশেষ সাবধানতা সহকারেই ব্যবহার করা হইত, কিন্তু কালক্রমে এই ধাতুঘটিত ঔষধাবলীই হিন্দু চিকিৎসা-বিজ্ঞানে একটা মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার ফলে বনজ ঔষধের ব্যবহার ক্রমশই কমিয়া আসিল। 'রসরত্নসমুচ্চয়ে'র সমকালবর্তী 'রসেন্দ্রচিন্তামণি' নামক গ্রন্থের একটি শ্লোকে পরিষ্কার এই কথাই বলা হইয়াছে যে, "হে গুরো, দুর্বল এবং ভীরুগণের উপকারার্থে আমাকে এমন একটি চিকিৎসাবিজ্ঞানে উপদেশ প্রদান কর যাহাতে শল্যশাস্ত্রের ব্যবহার একেবারেই অপ্রয়োজনীয় হইয়া যাইবে।" বলা বাহুল্য পারদঘটিত ঔষধসমূহের বহুল ব্যবহারের ইহা একটি বিশেষ হেতুবাদ ছিল মাত্র।

ঔষধ-বিজ্ঞানের যুগে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নাগার্জুনের প্রভাব সুপরিস্ফুট। বস্তুত নাগার্জুনই তির্যকপাতন ও দহন (calcination) প্রক্রিয়াদ্বয়ের উদ্ভাবক। আলকিমিবিদ্যাবিশারদ সপ্তবিংশতি বুধমণ্ডলীর অন্যতম বলিয়া 'রসরত্নসমুচ্চয়ে'র গ্রন্থকর্তা তাঁহাকে তদীয় গ্রন্থে প্রথমেই বন্দনা করিয়াছেন এবং 'ধাতুবাদ' সম্পর্কে তাঁহার মতামত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 'রসেন্দ্রচিন্তামণি'-গ্রন্থকার এবং চক্রপাণিও তাঁহার অনুরূপ স্তুতি করিয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে বৃন্দ এবং চক্রপাণির মতে নাগার্জুনই কজ্জলীর আবিষ্কর্তা এবং কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থকর্তার মতে নাগার্জুনই সুশ্রুতেরও সংকলয়িতা।

চক্রপাণির টীকাকার পাণিনির টীকাকার পতঞ্জলিকে লৌহশাস্ত্র-বিশারদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পতঞ্জলি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। চক্রপাণি পতঞ্জলিকে চরকের সংকলয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত 'ন্যায়বর্তিকা' গ্রন্থে ভোজ বলিয়াছেন, 'পতঞ্জলি দেহ এবং মন উভয়েরই চিকিৎসক।'

যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য
তু বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং
পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি॥

পতঞ্জলির যোগদর্শনে যে মোক্ষের কথা বলা হইয়াছে তাহার সহিত আলকিমিবিদ্যার বহুল সংযোগ বিদ্যমান।

তান্ত্রিক-মতাবলম্বী এবং আলকিমির-বিদ্যার অনুসরকগণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া রসায়নশাস্ত্রের ভারতীয় ছাত্রগণ অনন্তকাল অযথা সময় নষ্ট করেন

নাই। জীবকে অমরত্ব প্রদানে প্রয়াসী হইয়া অন্ততপক্ষে তাঁহারা আধিব্যাধিকে দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঔষধ-বিজ্ঞানের যুগে যে সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে মালবের রাজবৈদ্য মথনসিংহ প্রণীত 'রসনক্ষত্রমালিকা' অন্যতম। এই গ্রন্থের 1557 সংবৎ অর্থাৎ 1500 খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, গ্রন্থের প্রণয়নকাল তাহারও অনেক পূর্বে। ধাতুঘটিত ঔষধের প্রস্তুতবিধির উল্লেখ এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য পদার্থের সহিত অহিফেনের ব্যবহার এবং রাং, লৌহ ও পারদভস্মের সহিত অন্যান্য ঔষধের মিশ্রণ প্রস্তুত 'স্বচ্ছন্দ-ভৈরবরসে'র উল্লেখ 'রসনক্ষত্রমালিকা'য় দেখিতে পাওয়া যায়।

পার্বতী-সুত সিদ্ধ নিত্যনাথ প্রণীত 'রসরত্নকর' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে, "রসার্ণবে উক্ত পারদঘটিত ঔষধের ব্যবহার সম্বন্ধে ভগবান শিববর্ণিত তথ্যসমূহ, 'রসমঙ্গলদীপিকা'য় পারদ সম্বন্ধে এবং রোগাক্রান্ত জনগণের মঙ্গলার্থে নাগার্জুন প্রস্তাবিত সিদ্ধ চর্পটি, বাগ্‌ভট ও সুশ্রুত-উক্ত মতবাদ এবং ধাতু ও পারদঘটিত ঔষধ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। যে সমস্ত ঔষধ দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্লভ হইয়াছে সেগুলিকে বাদ দিয়ে অন্যগুলির মূলতত্ত্বসমূহ আমি একত্র সংকলিত করিলাম। * * * * আমি আমার শিক্ষকবৃন্দের নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছি এবং যে সমস্ত বিষয় স্বয়ং পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি মানবের হিতার্থে কেবল তাহাই এই গ্রন্থে স্থানলাভ করিয়াছে।" 'রসেন্দ্রচিন্তামণি' গ্রন্থের রচয়িতা ঢুণ্ঢুকনাথ তদীয় গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন,—"আমি মাত্র সেই সমস্ত প্রক্রিয়ার প্রচার করিব যাহা আমি স্বহস্তে পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি।" অন্যত্র—"পারদঘটিত সেই সমস্ত ঔষধ আমার গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে যাহা আমি নিজে পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি। যাঁহারা নিজেরা পরীক্ষা করিতে না পারিলেও শিক্ষাদান করিতে চান তাঁহারা বৃথাই পরিশ্রম করেন।"

এই যুগের 'রসসার' নামক অন্য একখানি গ্রন্থে হিন্দু রাসায়নিকমণ্ডলীর পারদ সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিচয় বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকর্তা গোবিন্দাচার্য ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী বলিয়া প্রথমেই শিব এবং বিষ্ণুর বন্দনা করিয়াছেন এবং এই উপলক্ষ্যে স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি অন্যান্য প্রচলিত প্রামাণিক গ্রন্থরাজি হইতে আবশ্যক তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন। কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিবরণ সম্বন্ধে "এবং বৌদ্ধা বিজানন্তি ভোটদেশনিবাসিনঃ" বলিয়া তিনি তিব্বতস্থ বৌদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে একস্থলে গোবিন্দাচার্য বলিয়াছেন, "বৌদ্ধমতং তথা জ্ঞাত্বা রসসারঃ কৃতো ময়া।" গোবিন্দাচার্যের এই সকল স্বীকৃতি এবং উক্তি হইতে ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই সময় ভারতভূমিতে আলকিমির চর্চা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং সুদূর তিব্বতে তখনও ইহা চলিতেছিল। এইজন্যই গোবিন্দাচার্যকে তথ্যসমূহের জন্য ভোটদেশবাসী বৌদ্ধ বুধমণ্ডলীর দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল।

'রসসারে'র রচনাকাল নির্ণয় করার একটা সুবিধা আছে যে, ইহাতে ঔষধ হিসাবে অহিফেনের ব্যবহারের নির্দেশ পাওয়া যায়। এইখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে অহিফেন ব্যবহারের নির্দেশ দিলেও গোবিন্দাচার্য ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। অহিফেনকে তিনি বিষধর সামুদ্রিক মৎস্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—

সমুদ্রে চৈব জায়ন্তে বিষমৎস্যাশ্চতুর্বিধাঃ
তেভ্যঃ ফেনং সমুৎপন্নম্ অহিফেনো
বিষং স চতুর্বিধম্
কেচিদ্বদন্তি সর্পাণাং ফেনং স্যাদহিফেনকম্।

অন্যান্য প্রমাণ প্রয়োগ আলোচনা করিয়া 'রসসার'কে অনায়াসে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

এযুগের অন্য একখানি গ্রন্থ 'শার্ঙ্গধরসংগ্রহে' ঔষধার্থে সাতটি মৌলিক ধাতু এবং পিত্তল ও কাংস্যের

ব্যবহার-নির্দেশ রহিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় শার্ঙ্গধর দস্তার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন উল্লেখমাত্র করেন নাই। এই গ্রন্থ প্রধানত আয়ুর্বেদ গ্রন্থসমূহকে (চরক-সংহিতা) ভিত্তি করিয়া লিখিত। গ্রন্থকারের পিতার নাম দামোদর এবং পিতামহ চৌহান ভূপতি হম্মীর বা হাম্বীরের সভাসদ রাঘবদেব।

গোপালকৃষ্ণ বিরচিত 'রসেন্দ্রসারসংগ্রহে' প্রথমেই বলা হইয়াছে যে বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্র বিশেষ করিয়া 'রসমঞ্জরী' এবং 'চন্দ্রিকা' তন্ত্রদ্বয় আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ইহাতেও ধাতুঘটিত ঔষধসমূহের উপর অতিরিক্ত দৃষ্টি প্রদত্ত হইয়াছে এবং আয়ুর্বেদোক্ত বনজ ঔষধসমূহকে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থান দেওয়া হইয়াছে। রাসায়নিক জ্ঞানের দিক হইতে বিচার করিলে মনে হয় ইহা 'শার্ঙ্গধরসংগ্রহ' অপেক্ষা নিকৃষ্টতর।

'রসেন্দ্রকল্পদ্রুম' নামক এই যুগের অপর একখানি গ্রন্থও প্রধানত ধাতব পদার্থসমূহের আলোচনায়ই মুখর। 'রসার্ণব', 'রসমঙ্গল', 'রত্নাকর', 'রসামৃত', এবং 'রসরত্নসমুচ্চয়' হইতে বহু শ্লোক ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

'ধাতুরত্নমালা' নামক এই যুগের আর একখানি গ্রন্থেরও উল্লেখ এইস্থালে করা যাইতে পারে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, রাঙ এবং লৌহ, মাত্র এই ছয়টি ধাতুর ব্যবহারের বিধি 'ধাতুরত্নমালা'র প্রথম দিকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যশদ অর্থাৎ দস্তাকে খর্পর বলিয়া উল্লেখ করিয়া তাহার ব্যবহারবিধিও এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

বিশ্বজগৎ আপন অতি-ছোটকে ঢাকা দিয়ে রাখল, অতি বড়োকে ছোটো করে দিল, কিংবা নেপথ্যে সরিয়ে ফেলল। মানুষের সহজ শক্তির কাঠামোর মধ্যে ধরতে পারে নিজের চেহারাটাকে এমনি করে সাজিয়ে আমাদের কাছে ধরল। কিন্তু মানুষ আর যাই হোক সহজ মানুষ নয়। মানুষ একমাত্র জীব যে আপনার সহজ বোধকেই সন্দেহ করছে, প্রতিবাদ করেছে, হার মানতে পারলেই খুশি হয়েছে। মানুষ সহজ শক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দূরকে করেছে নিকট অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ, দুর্বোধকে দিয়েছে ভাষা, প্রকাশ লোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশ লোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ করে বিশ্বব্যাপারে মূল রহস্য কেবলি অবারিত করছে। যে সাধনায় এটা সম্ভব হয়েছে— তার সুযোগ ও শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই নেই। অথচ যারা এই—সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হলো তারা আধুনিক যুগের প্রত্যন্ত দেশে এক ঘরে হয়ে রইল।

রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞান প্রবন্ধ

মৃত্তিকা বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ

।। শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতার (1979) সারাংশ ।।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়*

বিভিন্ন অবস্থায় উৎপন্ন মৃত্তিকার বর্ণ বা রং পৃথক। বস্তুতঃ প্রথমেই চোখে পড়ে মাটির রং। হাল্কা ও গাঢ় ছাই, বিভিন্ন আভাযুক্ত কালো, বাদামী, লাল, হলদে ইত্যাদি নানা রং-এর মৃত্তিকা দেখা যায়। মৃত্তিকার যে দুটি উপাদান রং-এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী তা হল লৌহঘটিত কয়েকটি যৌগ, বিশেষ করে বিভিন্ন আর্দ্রতাযুক্ত অক্সাইড, এবং জৈব পদার্থ। জৈব পদার্থ ছাই, কালো এবং বাদামী রং-এর মৃত্তিকায় অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। লৌহঘটিত অক্সাইড হলদে, লাল এবং কখনও বাদামী রং-এর হতে পারে। লৌহ ও জৈব পদার্থসঞ্জাত নানা রং-এর যৌগ অবস্থাভেদে মৃত্তিকায় উৎপন্ন হতে পারে। যেখানেই জারণ ক্রিয়া প্রবল সেখানে লাল মাটি প্রাধান্য লাভ করে। জারণের ফলে জৈব পদার্থ বিয়োজিত হয় এবং লৌহের লাল অক্সাইডের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে পড়ে। বিজারিত অথবা অপেক্ষাকৃত অল্প জারিত অবস্থায় জৈব পদার্থ কিছু অবশিষ্ট থাকে এবং লৌহ অক্সাইড ও মিশ্রজারিত অবস্থায় পরিণত হয়। এর ফলে মৃত্তিকার রং কৃষ্ণাভ কিম্বা বাদামী হতে পারে। অতএব রং দেখে মৃত্তিকা কি ধরণের বিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

মৃত্তিকার রং-এর আপাতঃ গাঢ়তা আর্দ্রতার উপরও আংশিক নির্ভর করে। শুকানো মৃত্তিকার রং হাল্কা হয়, কিন্তু জলসম্পৃক্ত অবস্থায় গাঢ়তর অনুমিত হয়। সুতরাং শুষ্ক কিম্বা আর্দ্র কোন্ অবস্থায় রং বিচার করা হল বিশেষ করে উল্লেখ করা উচিত। চলতি ভাষায় রং-এর বিবরণ আবার সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়। এই জন্য একটি রং-এর চার্ট তৈরি হয়েছে—নাম দেওয়া হয়েছে মুনসেল চার্ট। বিভিন্ন অনুপাতে লাল ও হলুদ এবং তার সাথে কালো রং মিশিয়ে অনেকগুলি মিশ্রণ তৈরি করা যায় যাদের গাঢ়তা ও আভা বিভিন্ন। রঙীন চার্টের যে কোন একটি রং-এর সঙ্গে মৃত্তিকার রং সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা কাছাকাছি মিলে যাবে। এই ভাবে একটি নিরপেক্ষ মাপকাঠি থাকাতে মৃত্তিকার রং সম্পর্কে চাক্ষুষ না দেখেও চার্টের সাহায্যে পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিলাখণ্ড বা শিলাচূর্ণ আর্দ্র বিশ্লেষ বিক্রিয়ার প্রভাবে সিলিকা, অ্যালুমিনা, আয়রন অক্সাইড ইত্যাদি সৃষ্টি করে। এই বিক্রিয়াগুলির সমীকরণ থেকে H^+ আয়নের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

$$\overset{++}{M_2}SiO_4 + 4H.OH \rightarrow 2M(OH)_2 + H_4SiO_4 \text{ (অথবা } Si(OH)_4 \text{)}$$

$$\overset{+++}{N_4}(SiO_4)_3 + 12H.OH \rightarrow 4N(OH)_3 + 3H_4SiO_4 \text{ (অথবা } 3\ Si(OH)_4 \text{)}$$

H^+ আয়নের পরিমাণ বাড়ালে ধাতব হাইড্রক্সাইড যৌগের (এগুলি সাধারণতঃ স্বল্প দ্রাব্য) দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায়।
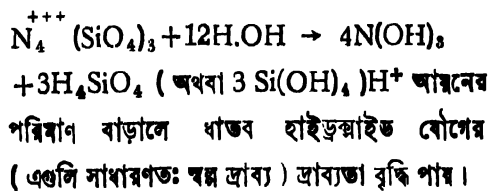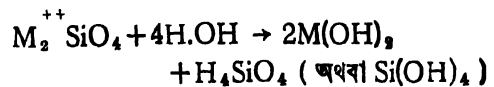
H_4SiO_4-কে বলা হয় অর্থোসিলিসিক অম্ল। নিরুদন প্রক্রিয়ায় এটি সহজেই মেটাসিলিসিক অম্লে পরিণত হয়:

*332, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা

$H_4SiO_4 - H_2O = H_2SiO_3$. মেটাসিলিসিক অম্ল অধিকতর স্থায়ী এবং সাধারণ সিলিকেট লবণ তৈরি করে। নিরূদন প্রক্রিয়া সাহায্যে মেটাসিলিসিক অম্ল সিলিকা ($H_2SiO_3 - H_2O = SiO_2$) বা বালুতায় পরিণত হয়। সিলিকেট বিয়োজনের এটাই চরম স্থায়ী যৌগ। H^+ আয়নের আধিক্যহেতু সিলিসিক অম্লের অনুপাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বিয়োজন বাম দিক থেকে ডাইনে অগ্রসর হতে থাকে। H^+ আয়নের পরিমাণ অল্প হলে সিলিসিক অম্লের অনুপাত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে H^+ আয়নের প্রভাবে মৃত্তিকা তৈরির উপাদানগুলির আনুপাতিক তারতম্য ঘটতে পারে। এইরূপে উদ্ভূত মৃত্তিকার কেলাসিত মিনারেলের এবং তাদের রাসায়নিক সংযুক্তির পার্থক্য সংঘটিত হয়।

একটি দ্বিমাত্রিক স্তর তৈরি করা যায়। শৃঙ্খলায়ন পদ্ধতিতে এই স্তরটি তৈরি হতে পারে। এই দুটি স্তরকে একটির উপর আর একটি এমনভাবে সংস্থাপন করা যায় যাতে করে এরা যুক্ত হতে পারে। নিরূদন বিক্রিয়ার ফলে এই স্তর দুটি অক্সিজেন পরমাণুর মাধ্যমে একটি দ্বিমাত্রিক দ্বিস্তর মিনারেল তৈরি করে (চিত্র-4)। এদের সংক্ষেপে বলা হয় 1 : 1 মিনারেল। কেওলিনাইট এই 1 : 1 মিনারেল অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ অবস্থায় অ্যালুমিনিয়াম স্তরের দুদিকে দুটি সিলিকা স্তর সংযোজিত করা সম্ভব, যার ফলে একটি দ্বিমাত্রিক ত্রিস্তর (1 : 2) মিনারেল তৈরি হয়। 1 : 2 মিনারেলের নাম দেওয়া হয়েছে পাইরোফিলাইট। 1 : 1 এবং 1 : 2 মিনারেলের স্থূল সংক্ষেপিত সঙ্কেত যথাক্রমে Si-O-Al এবং Si-O-Al-O-Al-O-Si. একটি স্তরে বহু-

চিত্র-3 (a)
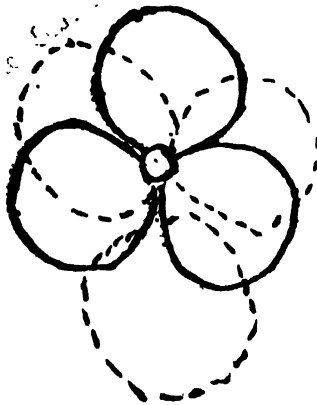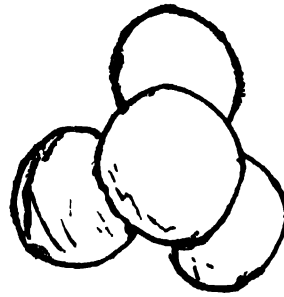
চিত্র-3 (b)

মৃত্তিকাস্থিত কেলাসিত মিনারেল সাধারণতঃ ক্লেদ অংশেই বিদ্যমান। মিনারেলগুলির দ্বিমাত্রিক কেলাসে সিলিসিক অম্ল অর্থাৎ সিলিকন হাইড্রক্সাইড, H_4SiO_4 বা $(OH)_4Si$ একটি চতুস্তল [চিত্র-3(a)] আকৃতি লাভ করে। অ্যালুমিনিয়াম অথবা আয়রন Fe^{+++} হাইড্রক্সাইড-এর $(OH)_6Al_2(Fe_2)$] যৌগের আকৃতি ষড়তল [চিত্র-3(b)]। $(OH)_4Si$ অথবা $(OH)_6Al_2(Fe_2)$ অণুগুলি পরপর সাজিয়ে

সংখ্যক Si-O-Al এবং Si-O-Al-O-Si-এর একক বিদ্যমান। শৃঙ্খলায়ন বিক্রিয়ালব্ধ বৃহদাকার অণুগুলির সঠিক সঙ্কেত হবে যথাক্রমে : $(Si\text{-}O\text{-}Al)_n$ ও $(Si\text{-}O\text{-}Al\text{-}O\text{-}Si)_n$. এই দুটি পদার্থই তড়িৎ আধান রহিত। Si এবং Al-এর সঙ্গে যুক্ত OH (সঙ্কেতে লেখা হয় নি) থেকে H^+ আয়ন বিযুক্ত হয়ে মিনারেলটি অম্লভাব প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষারীয় পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারে।

$$(Si\text{-}O\text{-}Al)_n \cdots\cdots n'OH \rightarrow [(Si\text{-}O\text{-}Al)_n \cdots\cdots On')]+(n'-n-n'-n)H^+$$

$$(Si\text{-}O\text{-}Al\text{-}O\text{-}Si)_n \cdots\cdots n'OH \rightarrow [(Si\text{-}O\text{-}Al\text{-}O\text{-}Si)_n \ldots\ldots (n' \cdots O_n')]^{(n'-n)-} + (n'-n)H^+$$
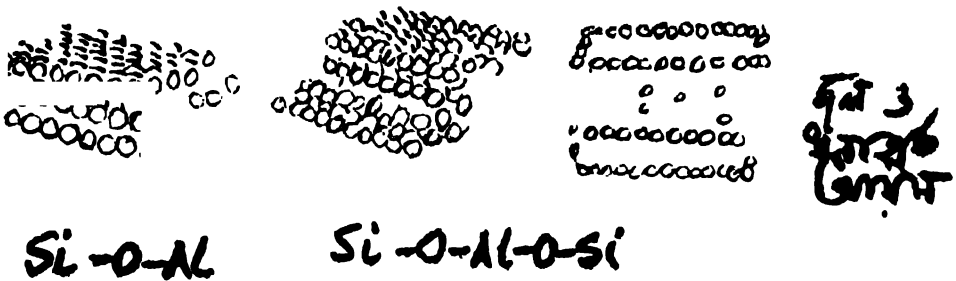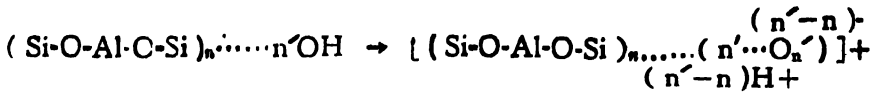
Si-O-Al Si-O-Al-O-Si

অন্য একটি উপায়ে মিনারেলগুলি ঋণাত্মক আধান প্রাপ্ত হতে পারে। Si^{4+}-এর পরিবর্তে যদি Al^{3+}, সিলিকাস্তরে প্রবেশ করে, অথবা অ্যালুমিনা স্তরে Al^{3+}-এর পরিবর্তে Mg^{2+}, তা হলে উদ্ভূত মিনারেল ঋণাত্মক আধান প্রাপ্ত হবে। যেমন,

A. $(Si-O-Al)_n \rightarrow [Si_{n-1}(Al)(-O-Al)]_n^-$

B. $(Si-O-Al)_n \rightarrow [(Si-O)_n-Al_{n-1}Mg]^-$

C. $(Si-O-Al-O-Si)_n \rightarrow [Si_{n-1}(Al)(-O-Al-O-Si)_n]^-$

D. $(Si-O-Al-O-Si)_n \rightarrow [(Si-O)_n-Al_{n-1}Mg(-O-Si)_n]^-$
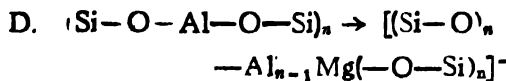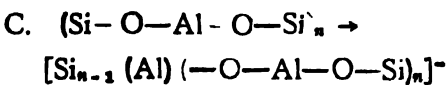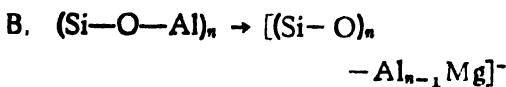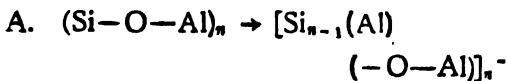
Al^{3+} ও Mg^{2+} যে পরিমাণে Si^{4+} ও Al^{3+}-কে যথাক্রমে বিনিময় করতে পারবে, মিনারেলগুলি ঠিক তত একক ঋণাত্মক আধান লাভ করবে। মৃত্তিকা কিম্বা অন্যত্র যে সব মাধ্যমিক মিনারেল পরীক্ষা করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে উক্ত প্রকার বিনিময় কেবলমাত্র ত্রিস্তর 1 : 2 পাইরোফিলাইট বা সমধর্মী মিনারেলের বেলায়ই পাওয়া গিয়েছে। 1 : 1 কেওলিনাইটের বেলায় খুবই বিরল অথবা হয় না বলা চলে। যদি বিনিময় (D) সমীকরণ অনুযায়ী ঘটে তা হলে মণ্টমরিলনাইট শ্রেণীর মাধ্যমিক মিনারেল উৎপন্ন হবে। কিন্তু সমীকরণ (C) অনুযায়ী ঘটলে উদ্ভূত মিনারেল মাইকা বা অভ্রশ্রেণীভুক্ত হবে। মাধ্যমিক মিনারেল ইলাইটকে অভ্র শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হয়। কোন কোন মিনারেলে উভয়বিধ বিনিময় সংঘটিত হতে পারে। সে রকম মিনারেলও মৃত্তিকায় পাওয়া যায় যেমন বাইডেলাইট।

এই সকল ঋণাত্মক আধানযুক্ত মিনারেল কণা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে ধনাত্মক আয়ন যথা, H^+, K^+, Ca^{++} ইত্যাদি আকর্ষণ করে এবং প্রশম অবস্থায় পরিণত হয়। এই সকল ধনাত্মক আয়ন বিনিময় বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। যথা $1+^+$ আয়নের প্রাধান্য ঘটে তখন মৃত্তিকা অম্ল প্রাপ্ত হয়। যেহেতু অতিবৃহৎ মিনারেল অণু বা কণার দ্রাব্যতা নগণ্য বিনিময়কারী আয়নগুলি কণা থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হতে পারে না। অদ্রবণীয় কণার সাথে যুক্ত অবস্থায়ই পরিমাপক যন্ত্র সাহায্যে H^+ আয়ন মাপা যায় যেমন সাধারণ অম্লদ্রবণের বেলায় করা হয়। H^+ আয়নের পরিমাণ pH

$\left(=\log 1\frac{1}{CH^{+}}\right)$ প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। pH সংখ্যা জানা গেলে মিনারেলের অম্লত্ব অথবা ক্ষারত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। অধিক অম্ল অথবা ক্ষার অবস্থাযুক্ত মৃত্তিকা সাধারণ কৃষিকর্মের পক্ষে অনুপযুক্ত। অতএব পরিমিত ক্ষার অথবা অম্লদায়ী প্রশমনের প্রয়োজন হয়। মিনারেলস্থিত H^+ আয়ন ক্ষারীয় পদার্থের সঙ্গে নিম্নলিখিত সমীকরণ অনুসারে বিক্রিয়া করে :

$$[\text{মিনারেল}]_n^- - nH^+ + nB(OH) \rightleftharpoons$$

$$[\text{মিনারেল}]_n^- - nB^+ + nH.OHB^+$$

যদি N_a^+ কিম্বা K^+ হয় তাহলে আর্দ্রবিশ্লেষ বিক্রিয়া দ্বারা [মিনারেল]—$_n$B প্রলম্বিত অবস্থায় ক্ষারীয় pH প্রদর্শন করবে। যেমন :

$$[\text{মিনারেল}]_n nN_a + nH\,OH \rightleftharpoons$$

$$[\text{মিনারেল}]_n^- - n\overset{+}{H} + nN_aOH$$
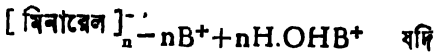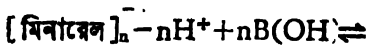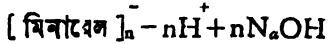
যেহেতু N_aOH তীব্র ক্ষার এবং $[\text{মিনারেল}]_n - nH^+$ মৃদু অম্ল, pH ক্ষারীয় অবস্থার সূচনা করবে। H^+ আয়ন বিনিময় দ্বারা অম্ল অবস্থা ফিরিয়ে নেওয়া যায়। এইরূপ বিনিময় বিক্রিয়া অন্য কোন ধনাত্মক আয়ন দ্বারাও সংঘটিত হতে পারে। আয়ন বিনিময় বিক্রিয়া ত্রিমাত্রিক মিনারেলের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধনাত্মক আয়নের প্রকৃতি ও আনুপাতিক পরিমাণের উপর মিনারেলের অম্লত্ব, ক্ষারত্ব এবং প্রশম অবস্থা নির্ভর করে। পুষ্টির জন্য উদ্ভিদাদি প্রয়োজনীয় আয়ন মৃত্তিকা থেকে আয়ন বিনিময় বিক্রিয়ার মাধ্যমেই গ্রহণ করে। কৃষিকর্মে মৃত্তিকার pH সাধারণতঃ 7-এর কিছু কমই বাঞ্ছনীয় কারণ এই pH উদ্ভিদের পক্ষে যেমন উপযুক্ত, তেমনই মৃত্তিকাস্থিত জীবাণুর কার্যকারিতাও 7-এর কম pH-এ পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে। pH 7-এর বেশী হলে মৃত্তিকার বৈগুণ্য দেখা দেয়। গ্রথন ও গঠন ভেঙে যায়। জলের সংস্পর্শে ক্লেদ অংশ অন্যান্য কণাসমষ্টি থেকে বন্ধনমুক্ত হয় এবং বারিপাত কালে প্রলম্বিত অবস্থায় স্থানান্তরিত হয় অথবা জলস্রোতে নদী-নালায় বেরিয়ে যায়। ক্ষারীয় pH মৃত্তিকা অবক্ষয়ের একটি প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়। যেহেতু এই অবস্থায় উদ্ভিজ্জদের পুষ্টি ব্যাহত হয়, ক্ষারীয় pH যুক্ত মৃত্তিকা অল্পকালের মধ্যেই অনুর্বর হয়ে পড়ে। এই অবস্থা থেকে মৃত্তিকাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে উপযুক্ত পরিমাণ অম্লদায়ী বস্তুর (যথা গন্ধক) সঙ্গে বহুদিনব্যাপী বিক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এছাড়া স্বল্পদ্রব $CaSO_4$ (জিপ্‌সাম) আয়ন বিনিময় বিক্রিয়া দ্বারা মৃত্তিকাস্থিত Na^+-কে Ca^{++} দ্বারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে পারে, যার ফলে প্রলম্বিত মৃত্তিকা অধঃক্ষিপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, pH-3 প্রশম অবস্থায় ফিরে আসে।

মৃত্তিকার pH 7-এর খুব কম হলেও সাধারণ কৃষিকার্য ব্যাহত হয়। উদ্ভিজ্জদের পক্ষে অধিক অম্ল অবস্থা পুষ্টির পক্ষে ক্ষতিকর, কারণ H^+ আয়নের উপস্থিতি এক দিকে যেমন K^+, Ca^{++} এবং ফস্‌ফরাস দুর্লভ হয়ে পড়ে, তেমনই Al^{3+} আয়নের আধিক্য ঘটায়। এই শেষোক্ত আয়ন উদ্ভিজ্জ এবং জীবাণুদের পক্ষে বিষবৎ কার্য করে। pH প্রশম অবস্থার কাছাকাছি (≈7) ফিরিয়ে আনতে পরিমিত মাত্রায় চুনের প্রয়োগই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

বৃক্ষাদির পুষ্টিসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় আয়ন, যথা K^+, C_a^{++}, M_g^{++}, C_u^{++}, Z_n^{++} ইত্যাদি সাধারণতঃ ক্লেদ অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। শিকড়ের মাধ্যমে বৃক্ষাদি মৃত্তিকার ক্লেদ কণা থেকে অথবা সংবদ্ধ জলীয় ভাগ থেকে ঐ আয়নগুলি আহরণ করতে পারে। ঋণাত্মক আয়ন যথা নাইট্রেট ও সালফেট ক্লেদ অংশের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না, কারণ উভয়ই ঋণাত্মক। এরা দ্রবণ অবস্থায় থাকে এবং বৃক্ষাদি শিকড় মাধ্যমে প্রয়োজনমত আহরণ করে। ফস্‌ফেট মৃত্তিকার সঙ্গ নানারকম জটিল বিক্রিয়া ঘটায়। ক্লেদ অংশের অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। উপরন্তু মৃত্তিকাস্থিত

যুক্ত অ্যালুমিনা এবং আয়রন অক্সাইডের সঙ্গে স্বল্পদ্রব ফস্‌ফেট তৈরি করতে পারে। এই কারণে ফসফেট দুর্লভ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মৃত্তিকার pH যদি 7-এর কাছাকাছি রাখা যায় তা হলে ফসফেটের সুলভ্যতা বৃদ্ধি পায়। জৈব সার প্রয়োগেও ফসফেট সুলভ্য হতে পারে।

কৃষিকর্ম ব্যতিরেকে মৃত্তিকার যে কয়টি প্রয়োগের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে ইট তৈরি এবং পোর্সিলেনের বাসনপত্র তৈরি অন্যতম। সব রকম মৃত্তিকা ইট তৈরির পক্ষে উপযুক্ত নয়। ক্লেদ, পলি এবং বালির নির্দিষ্ট অনুপাত যে মৃত্তিকাতে বিদ্যমান সেই মৃত্তিকাই ইট তৈরির উপযোগী। এতে সাধারণতঃ ক্লেদ অংশ কম থাকে এবং পলি অংশ সর্বাধিক। পোর্সিলেনের জন্য উপযুক্ত হল পরিশুদ্ধ কেওলিনাইট জাতীয় মিনারেল। খনিজ পদার্থরূপে কেওলিনাইট বহু জায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু পোর্সিলেনের কাজের জন্য উপযুক্ত করতে কতগুলি পদ্ধতিদ্বারা পরিষ্কার করে নিতে হয়। এই শিল্পটি বর্তমানে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে।

পৃথিবীর গর্ভ থেকে পেট্রোলিয়াম উদ্ধার কাজে মণ্টমরিলনাইট জাতীয় মিনারেল (বেণ্টোনাইট) অপরিহার্য বলা চলে। বস্তুতঃ বিপুল পরিমাণ বেণ্টোনাইট এই কাজে ব্যবহৃত হয়। উদ্ধার কার্যের ব্যবস্থাটি সংক্ষেপে এইরূপ: একটি পাথর কাটার ধারালো অগ্রভাগকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাটির নিচে নামানো হয়। চারদিকে ঘিরে একটি নল, মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষরূপে বেণ্টোনাইট প্রলম্বন রাখা হয়। এই প্রলম্বনটি বিশেষ গুণসম্পন্ন। যখন স্থির থাকে তখন আংশিক কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সান্দ্রতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আর যখন আলোড়িত করা হয় তখন তরলতা লাভ করে এবং সান্দ্রতা হ্রাস পায়। সুতরাং পাথর কাটার যন্ত্রটি নামানোর সময় তরল অথচ অপেক্ষাকৃত সান্দ্র প্রলম্বনটি গমন পথ মসৃণ রাখে। পেট্রোলিয়াম স্তরে পৌছে শেষ উদ্ধারকার্য শুরু করার পূর্বে নলটির মধ্যে চাপ দিয়ে প্রলম্বনটি বাইরে ঠেলে দেওয়া হল। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রলম্বনটির কঠিনত্ব ও সান্দ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং বাইরে জমে যায়। ভিতরের নল দিয়ে পেট্রোলিয়াম বেরিয়ে আসার সময় প্রলম্বনটি অন্যত্র বহির্নির্গমনের পথ বন্ধ করে রাখে। প্রলম্বনটির ঘনত্ব এমন যে কাটার সময় পাথরের টুকরো উপরে ভেসে উঠতে পারে, যাতে ধারালো মুখের কাছে জমা না হয়। ঘনত্ব এবং সান্দ্রতা বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য পদার্থও মিশ্রিত করা হয় যথা বেরিয়াম সালফেট ($BaSO_4$)[3] কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ ইত্যাদি। প্রলম্বনটির যে গুণের বিষয়ে উল্লেখ করা হল তাকে থিক্সট্রপি বলা হয়। মৃত্তিকাস্থিত একমাত্র মণ্ট্‌মরিলনাইট জাতীয় মিনারেলই এই প্রকার গুণের অধিকারী। টি ত্রিস্তর (1 : 2) মিনারেল কণার মধ্যে বিকর্ষণই আশা করা যায়। কিন্তু এদের মধ্যে অন্য উপায়ে বন্ধনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। দ্বিযোজী কিম্বা ত্রিযোজী ধনাত্মক আয়ন দুই কণার মাঝখানে উপস্থিত থেকে বন্ধনের সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কণার আয়তন অত্যধিক বলে এই বন্ধন তত দৃঢ় নয়। কিন্তু ত্রিস্তর মিনারেলের আর একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি হল জল আকর্ষণের ক্ষমতা। জলের সঙ্গে বন্ধন হাইড্রোজেন বন্ধনীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। যেহেতু মিনারেলের কণাগুলি পাতলা দ্বিমাত্রিক পাতার মত, জল এই পাতার উপর হাইড্রোজেন বন্ধনী সাহায্যে একটি সুনির্দিষ্ট দ্বিমাত্রিক বিন্যাস রচনা করতে পারে (চিত্র-5)। অতএব দুটি কণাকে যদি কাছাকাছি নিয়ে আসা যায় তা হলে জলের দ্বিমাত্রিক বিন্যাস দুটি কণাকে যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে বেঁধে রাখতে পারে। মণ্ট্‌মরিলনাইট প্রলম্বন কোলয়ডীয় সুতরাং কণাগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ই থাকে। কিন্তু সামান্য লবণের সংস্পর্শে অধঃক্ষেপণ কিম্বা তঞ্চন প্রবণতা লাভ করে। এই অবস্থায় কণাগুলি পরস্পরের সন্নিকটে আসে অথচ সম্পূর্ণরূপে তঞ্চিত হয় না, কিন্তু উল্লিখিত পদ্ধতিতে

বন্ধনমুক্ত হতে পারে। উৎপন্ন প্রলম্বনে কণাগুলির মধ্যে বন্ধন কিছু দৃঢ় হয় বটে, কিন্তু তাদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিসর্জিত হয় না। এইরূপে প্রলম্বনটি থিক্সট্রপি
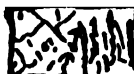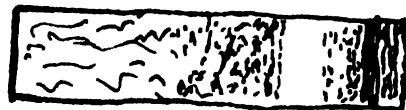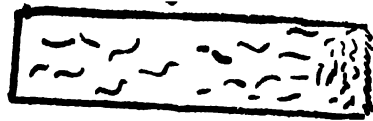
চিত্র 5

গুণ প্রদর্শন করে। স্থির অবস্থায় কণাগুলি হাইড্রোজেন বন্ধনীর প্রভাবে বিন্যস্ত হয় এবং প্রলম্বনটি
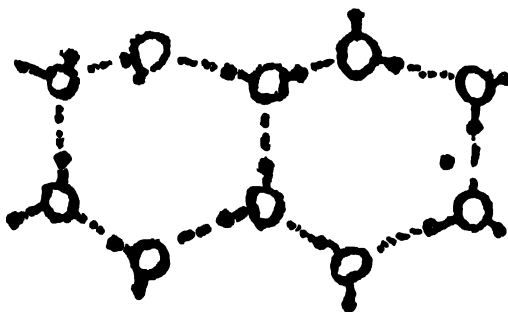
চিত্র-6

আংশিক কঠিনতা এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন করে কিন্তু ঝাঁকালেই কণাগুলির মধ্যে বন্ধন সাময়িক শিথিল হয়ে পড়ে এবং তরলতা প্রদর্শন করে। এই উভমুখী পরিবর্তন পুনঃ পুনঃ সম্পাদন করা যায়।

মৃত্তিকার শোষণ ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার দেখতে পাই তৈল শোধন কার্যে। পদ্ধতিটি এইরূপ : মৃত্তিকার অন্যান্য উপকরণ থেকে মণ্টমরিলনাইট জাতীয় মিনারেলের ক্লেদ অংশ পৃথক করে H^+ আয়ন দ্বারা সম্পৃক্ত করা হল। অতঃপর প্রায় 24 ঘণ্টা ধরে অতি ধীরে 300-400°C-এ উত্তপ্ত করা হল। এই প্রক্রিয়ায় জল নির্গত হয়ে মিনারেলটি সক্রিয় অবস্থায় পরিণত হয় এবং শোষণক্ষমতা লাভ করে। তৈল শোধন পদ্ধতিটি এইরূপ : শোষণযোগ্য তেলের সহিত পরিমিত মাত্রায় সক্রিয় মিনারেল উত্তমরূপে মিশ্রিত করে উত্তপ্ত করা হয়। মিনারেল কণাগুলি তেলের ময়লা এবং রঞ্জক

জাতীয় দ্রব্যাদি শোষণ করে নেয়। অতঃপর পরিস্রাবণ করে নিলেই পরিষ্কার তেল পাওয়া যায়।

মৃত্তিকা কত রকমের হতে পারে তার ইয়ত্তা নেই। আপাতঃ দৃষ্টিতে অল্প দূরত্বের মধ্যেই বিভিন্নতা প্রকট হয়ে পড়ে। কিন্তু এই বিভিন্নতা কতখানি অর্থপূর্ণ তা সহজে অনুমেয় হয় না। তাছাড়া চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ভূপৃষ্ঠস্থিত কয়েক সে. মি. গভীর মৃত্তিকা-স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মৃত্তিকা উৎপাদনের কারণ ও উপকরণগুলির প্রভাব সম্যকরূপে জানতে হলে ভূপৃষ্ঠ থেকে আদি শিলাস্তর পর্যন্ত অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। প্রায় সর্বপ্রকার মৃত্তিকার উপর থেকে নিচু পর্যন্ত কয়েকটি স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই মৃত্তিকাস্তরগুলির গভীরতা, মৃত্তিকার গ্রথন ও গঠন, রং ইত্যাদি বিভিন্ন বলে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এই স্তরগুলির পরম্পরা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে মৃত্তিকা উৎপাদনের কারণগুলির আনুপাতিক প্রভাবের উপর। এই জন্য স্তরবিন্যাস মৃত্তিকার উৎপত্তির একটি স্থায়ী নিদর্শনরূপে গণ্য করা হয় এবং এর ভিত্তিতেই মৃত্তিকার শ্রেণী বিভাগ সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর নানাদেশের মৃত্তিকার স্তরবিন্যাস এবং তাদের গুণাবলী পরীক্ষা করে একটি সুসমঞ্জস শ্রেণী বিভাগ পদ্ধতি উদ্ভব করা হয়েছে। বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা ও শ্রমলব্ধ এই পদ্ধতিটি আমেরিকার মৃত্তিকা-বিজ্ঞানীরা সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করেছেন। এই পদ্ধতিটির সম্যক বিবরণ এই প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এইমাত্র বলা যায় যে মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ নানাদেশে নানা প্রকারে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। এই সকল শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি অভিজ্ঞালব্ধ এবং স্থানীয় পরিচয় ও প্রয়োগের পক্ষে যথেষ্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বলে সর্বত্র প্রযোজ্য বা গ্রহণযোগ্য হতে পারে নি। আমেরিকার নূতন পদ্ধতিটি বিজ্ঞানসম্মত এবং মাত্রাগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়েছে। মৃত্তিকার স্তরবিন্যাসের পরম্পরা, স্তরগুলির গভীরতা, মৃত্তিকাস্থিত জল, ক্লে ও জৈব অংশের পরিমাণ, মিনারেলের প্রকৃতি ও আয়ন বিনিময় ক্ষমতা জারণ-বিজারণ অবস্থা, মৃত্তিকার আপাতঃ ঘনত্ব, বারিপাত এবং তাপাঙ্ক, pH, রং ও তার আভা এবং গাঢ়তা, এই সকল প্রকার বিষয়ে মাত্রাগত তথ্য সংগ্রহ করে শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি তৈরি হয়েছে। সুতরাং আশা করা যায় যে এই পদ্ধতির প্রয়োগ বহুলাংশে সর্বাবস্থায় এবং সর্বদেশে ক্রমশ গ্রাহ্য হবে।

মৃত্তিকা সম্পর্কে যে তথ্যাদি উপস্থিত করা হল তাতে নিঃসন্দেহ বলা যায় যে মৃত্তিকা প্রকৃতই একটি জটিল বস্তুসমষ্টি। উপকরণগুলির মধ্যে মোটামুটি অজৈব সিলিকেট এবং জৈব হিউমাস প্রধান। এছাড়া অ্যালুমিনিয়াম ও আয়রন অক্সাইড, বালুকা, বিভিন্ন রকমের নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস এবং পটাসিয়াম যৌগ ইত্যাদি মৃত্তিকার অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। জল এবং বায়ু ও মৃত্তিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে উদ্ভিজ্জ জীবনের প্রয়োজন মেটাতে। এই জটিল বস্তুকে বিজ্ঞানের মানদণ্ডের মধ্যে নিয়ে আসা এবং একটি সুসংবদ্ধ বিজ্ঞানের শাখারূপে প্রতিপন্ন করা নিঃসন্দেহে শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা। নানাদেশের বহু বিজ্ঞানীর অবিরাম কর্মসাধনার ফলে মৃত্তিকা বিজ্ঞান স্বীকৃতি লাভ করেছে। ক্রমশঃ মৃত্তিকা বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের ঢিলেঢালা ভাব দূরীভূত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, মৃত্তিকা বিজ্ঞান প্রধানতঃ প্রায়োগিক কিন্তু সর্বপ্রকার প্রায়োগিক বিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে ওঠে মৌলিক গবেষণার সহায়তায়। মৃত্তিকা সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি না থাকাতে ভিত্তি শিথিল ছিল। নূতন নূতন গবেষণার উপর নির্ভর করে এই ভিত্তি ক্রমশঃ দৃঢ়তর করা হয়েছে ও হচ্ছে। এই জন্যেই মৃত্তিকাভিত্তিক প্রায়োগিক শিল্পকর্ম অধিকতর আস্থার সঙ্গে সম্পন্ন হচ্ছে।

ব্যারাজগুলি ভাগীরথীকে পুনরুজ্জীবিত করবে, না ধ্বংস করবে?

শিবরাম বেরা*

সূচনা—যে নদীটির তীরে গড়ে উঠেছিল যুগে যুগে বাংলার রাজধানী গৌড়, নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতা, যে নদীর তীরে বর্তমানে অবস্থিত ভারতের বৃহত্তম নগরী ও পূর্বভারতের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র কলিকাতা এবং যার কূলে গড়ে ওঠা অসংখ্য কলকারখানার জন্য দেশ আজ শিল্পসমৃদ্ধ, পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্বভারতের প্রাণস্বরূপ সেই ভাগীরথী বা হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনে বিভিন্ন ব্যারাজের ভূমিকা বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

50 বৎসর পূর্বেও এই নদী যথেষ্ট নাব্য ছিল কলিকাতা পর্যন্ত বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ অনায়াসে আসতে পারত। ষ্টিমারগুলি মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, ভাগলপুর ও এলাহাবাদ হয়ে কানপুর পর্যন্ত চলাচল করত। কিন্তু বর্তমানে সেই নদীপথে বড় জাহাজগুলি আর আসতে পারে না। বর্ষার কয়টি মাস ছাড়া ষ্টিমারে চন্দননগরের ঊর্ধ্বে যাওয়া সম্ভব হয় না। শীতের শেষ থেকে সারা গ্রীষ্মকাল গঙ্গার সঙ্গে নদীটির কোন সংযোগ থাকে না। ভাগীরথী আজ মুমূর্ষু হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে আর সাথে সাথে কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গও অর্থনৈতিক মৃত্যুর দিন গুণছে।

ভাগীরথী নদী বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলায় সামসেরগঞ্জের কাছাকাছি বিশ্বনাথপুরে মূল গঙ্গা থেকে উৎসারিত হয়ে মোটামুটি দক্ষিণবাহিনী হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছে। নবদ্বীপের নিম্নে নদীটির নাম হুগলী। গঙ্গার মূল ধারা পদ্মা নামে পূর্ববঙ্গে বা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। গত 40 বা 50 বৎসরে ভাগীরথী নদীর খাত দ্রুত পলি জমে উঁচু হয়ে উঠছে। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলার এই পলি জমার হার খুবই বেশি। সেখানে নদীখাতটি প্রতি বৎসর প্রায় 3 ইঞ্চি হিসাবে উঁচু হয়ে উঠছে। বর্তমানে ভাগীরথীর খাতটি উৎসমুখে গঙ্গার খাতের চেয়ে প্রায় 24 ফুট উঁচু হওয়ায় বর্ষার সময় ছাড়া গঙ্গার জলধারা আর ভাগীরথীতে প্রবাহিত হয় না।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য রাজমহল থেকে 18 মাইল দক্ষিণে ফরাক্কায় গঙ্গার উপর 170 কোটি টাকা ব্যয়ে 1973 সালে পৃথিবীর দীর্ঘতম ব্যারাজ নির্মাণ করা হয়। ঐ ব্যারাজটির সাহায্যে গঙ্গার জলতল সর্বদাই অন্তত 26 ফুট উঁচু রাখা সম্ভব হয় এবং ব্যারাজের উপর অংশের গঙ্গা থেকে ভাগীরথীর তীরবর্তী জঙ্গীপুর পর্যন্ত প্রায় 25 মাইল দীর্ঘ ও 250 ফুট প্রশস্ত একটি খাল বা ফীডার ক্যানাল পথে 20 হাজার কিউসেক থেকে 40 হাজার কিউসেক পর্যন্ত জল প্রবাহিত করে ভাগীরথীতে অনুপ্রবিষ্ট করানোর ব্যবস্থা হয়। এছাড়া জঙ্গীপুরে ভাগীরথীর উপর অপর একটি ব্যারাজ নির্মাণ করা হয়, যাতে ফীডার ক্যানাল দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট জল আবার গঙ্গার দিকে প্রবাহিত হতে না পারে। অনুমান করা হয় যে, এর দ্বারা হুগলী নদীর নাব্যতা অনেকাংশে বাড়ানো যাবে এবং কলিকাতা বন্দরসহ হুগলীর তীরবর্তী শিল্পাঞ্চলকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

এছাড়া ব্যারাজের উপর দিয়ে সড়ক ও রেলপথে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সরাসরি যোগাযোগ করা

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা-700006

সম্ভব হয়েছে। অবশ্য ঐ যোগাযোগ ওখানে একটি সেতু নির্মাণ করে অনেক স্বল্পব্যয়ে করা যেত। ব্যারাজের উপরাংশে রাজমহল পাহাড়ের কোলে
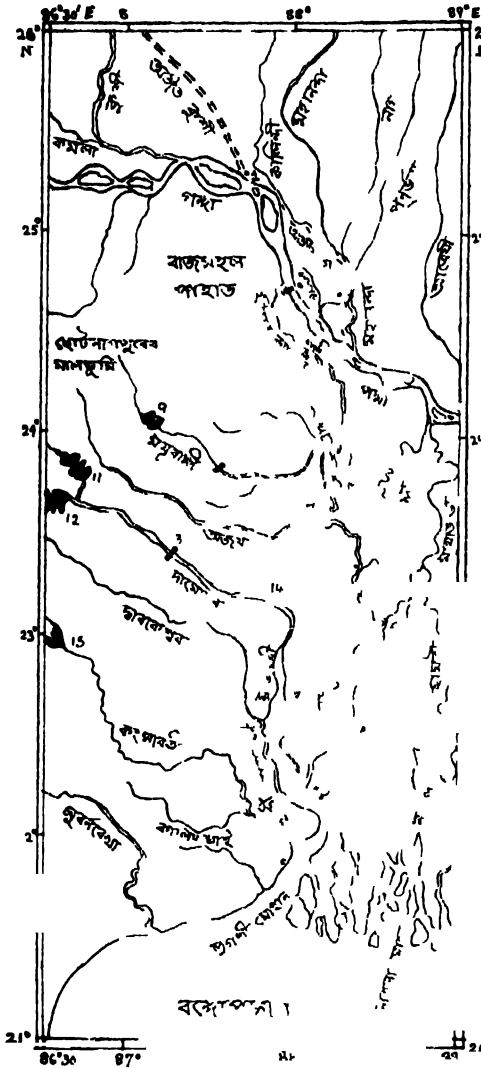
ভাগীরথী-হুগলী নদী ও বিভিন্ন ব্যারাজ
1—মণিহারী, 2—গৌড়, 3—ফরাক্কা ব্যারাজ, 4—জঙ্গীপুর ব্যারাজ, 5—সামসেরগঞ্জ, 6 মুর্শিদাবাদ, 7—কাটোয়া, 8—নবদ্বীপ, 9—ম্যাসেঞ্জোর জলাধার, 10—তিলপাড়া ব্যারাজ, 11—মাইথন জলাধার, 12—পাঞ্চেত জলাধার, 13—দুর্গাপুর ব্যারাজ, 14—বর্ধমান, 15—কংসাবতী জলাধার, 16—ডায়মণ্ডহারবার, 17—হলদিয়া, 18—প্রস্তাবিত হুগলী ব্যারাজ।

গঙ্গার পাড়ে একটি হ্রদও গড়ে উঠছে, যার সঞ্চিত জল দ্বারা মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার কিছু জমিতে সেচের জল দেওয়া যাবে। বর্তমানে ফরাক্কা জঙ্গীপুর ফীডার ক্যানালের তীরে একটি সুপার-পাওয়ার তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে ঐ ক্যানালের জল ব্যবহার করা হবে। এখন ভাগীরথী বা হুগলীকে বাঁচানোর অভীষ্ট লক্ষ্য ফরাক্কা ব্যারাজ দ্বারা কতদূর পূরণ করা যাবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করব।

হুগলী নদীকে বাঁচাতে ফরাক্কা ব্যারাজের ভূমিকা

ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলটি হুগলী নদীপথে সমুদ্র ও কলিকাতার প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং ঐ অঞ্চলে হুগলী নদীর বিস্তার প্রায় 3 মাইল। একটি 3 মাইল বিস্তৃত নদীপথে যদি ভাঁটার টানে ঘণ্টায় 4 মাইল গতিতে জল সাগরপানে ছুটে চলে, তবে প্রতি 1 ফুট গভীরতার জন্য প্রতি সেকেণ্ডে প্রবাহিত জলের আয়তন হবে প্রায় 93 হাজার ঘনফুট বা প্রতি ফুট গভীরতার জন্য প্রবাহমাত্রা হবে 93 হাজার কিউসেক। কাজেই এরূপ একটি নদীপথে বাড়তি 20 হাজার কিউসেক জল প্রবাহিত করলে জলতলের উচ্চতা বাড়বে প্রায় 2.6 ইঞ্চি। অবশ্য জোয়ার-ভাটার কথা বিবেচনা করলে ঐ উচ্চতা-বৃদ্ধি 5 ইঞ্চির মত হতে পারে। কাজেই ফরাক্কা ব্যারাজ দ্বারা 20 হাজার বা 40 হাজার কিউসেক বাড়তি জল অনুপ্রবিষ্ট করলে ডায়মণ্ডহারবারে হুগলী নদীর জলতল 5 ইঞ্চি থেকে 10 ইঞ্চি পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। তাহলে যে সমুদ্রগামী জাহাজগুলি কমপক্ষে 35 বা 40 ফুট গভীর জল না হলে বিচরণ করতে পারে না, তাদের চলাচলে উক্ত বাড়তি জল কতটুকু সাহায্য করবে?

ডায়মণ্ডহারবারে হুগলী নদীর গড় গভীরতা জোয়ারে 25 ফুট ও ভাঁটায় 5 ফুট ধরলে

এবং জলের গড় গতি ঘণ্টায় মাত্র 4 মাইল ধরে নিলেও জোয়ার ও ভাঁটায় নদীপথে জলের প্রবাহমাত্রা হবে যথাক্রমে প্রায় 23 লক্ষ ও 14 লক্ষ কিউসেক। কাজেই যে নদীতে প্রতিদিন 23 লক্ষ থেকে 14 লক্ষ কিউসেক জলধারা নিয়ে প্রকৃতিতে জোয়ারভাঁটার নিত্য খেলা চলে, সেখানে মাত্র 20 হাজার বা 40 হাজার কিউসেক বাড়তি জলধারা নদীর উপর কতটুকু প্রভাব ফেলবে বা নদীখাতকে গভীর করতে কতটুকু সাহায্য করবে?

কাজেই ফরাক্কা ব্যারাজ দ্বারা ভাগীরথীর পথে অনুপ্রবিষ্ট জল না পারে হুগলী নদীর জলতলকে সামগ্রিকভাবে উঁচু করতে, না পারে তার খাতকে সামান্য গভীর করতে। তাহলে ঐ অনুপ্রবিষ্ট জল কেমন করে হুগলী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করবে? ভবিষ্যতে ব্রহ্মপুত্র নদে ব্যারাজ নির্মাণ করে ব্রহ্মপুত্রের কিছু জল ভাগীরথীতে অনুপ্রবিষ্ট করালেও হুগলী নদীখাতের বিশেষ কোন পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। কাজেই ব্যারাজ দ্বারা নয়, অন্যভাবে নদীকে গভীর করে হুগলী নদীর নাব্যতা রক্ষার চেষ্টা করতে হবে। তবে 1978 সালের প্রলয়ঙ্কর বন্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ফরাক্কা ব্যারাজের কয়েকটি ক্ষতিকারক দিক নিয়ে এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ফরাক্কা ব্যারাজের কয়েকটি ক্ষতিকারক দিক—মুর্শিদাবাদ জেলায় উৎসমুখে ভাগীরথী নদীর গর্ভ গঙ্গাগর্ভ থেকে বর্তমানে প্রায় 24 ফুট উঁচু। ফলে শীতের শেষ থেকে সারা গ্রীষ্মকাল গঙ্গার সমস্ত জলই পদ্মার পথে পাড়ি দেয়। সেইজন্য ফরাক্কা ব্যারাজটি যে কংক্রীট ভিতের উপর গড়ে তোলা হয়েছে, তা গঙ্গার গর্ভ থেকে 26 ফুট পর্যন্ত নিশ্ছিদ্র করে রাখা হয়েছে, যাতে ব্যারাজের উপরাংশে গঙ্গার জলতল নদীর তলদেশ থেকে সর্বদাই অন্তত 26 ফুট উঁচু থাকে এবং ফীডার ক্যানাল দ্বারা গঙ্গার জল যে কোন সময়ে ভাগীরথীতে অনুপ্রবিষ্ট করানো সম্ভব হয়। কিন্তু ঐ 26 ফুট উচ্চ নিশ্ছিদ্র কংক্রীট ভিতের জন্য ব্যারাজের উপরাংশে গঙ্গার তলদেশে জমা পলি নদী তো তার স্রোতের দ্বারা কখনও কেটে নিতে পারবে না। তাই ব্যারাজের উপরাংশে গঙ্গানদীর তলদেশ কয়েক দশকে প্রায় 26 ফুট উঁচু হয়ে উঠবে বলে অনুমান করা যায়। ফলে ভবিষ্যতে ফরাক্কা ব্যারাজের জন্য রাজমহল পাহাড়ের কোলে গঙ্গাগর্ভ প্রায় 26 ফুট উঁচু হওয়ায় এবং উত্তরপ্রদেশে গঙ্গাগর্ভ স্বাভাবিক কারণে উঁচু থাকায় বিহারে গঙ্গানদীর মধ্যাঞ্চলটি তো আর নীচু থাকতে পারবে না। কাজেই সমগ্র বিহারে এমন কি উত্তরপ্রদেশে গঙ্গানদীর তলদেশে দ্রুত হারে পলি জমতে থাকবে এবং অদূর ভবিষ্যতে বিহারে গঙ্গাগর্ভ পূর্বাঞ্চলে 20 ফুট থেকে পশ্চিমাঞ্চলে 10 ফুটের মত উঁচু হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে। তখন একই প্রবাহের জন্য গঙ্গানদীর উপরিস্থিত জলতল প্রায় অনুরূপ মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে এবং গঙ্গার দু-তীরবর্তী বাঁধ উপ্‌চে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় উপত্যকা বারবার প্রলয়ঙ্কর প্লাবনের কবলে পড়বে। আবার যেহেতু বিহারের পূর্বাঞ্চলের গঙ্গাগর্ভ পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় অধিক হারে উঁচু হয়ে উঠবে, সেহেতু গঙ্গানদীখাতের মাইল প্রতি ঢাল বর্তমানের চেয়ে যথেষ্ট কমে যাবে। ফলে জলের গতি স্তিমিত হওয়ায় উপরিউক্ত প্লাবনগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে। 1978 সালের বিহার ও উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় উপত্যকায় দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রবল প্লাবনগুলির জন্য ফরাক্কা ব্যারাজের কোন ভূমিকা আছে কিনা, তা সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার।

এছাড়া বিহারে গঙ্গার তলদেশ উঁচু হওয়ায় পুনপুন, শোন, কমলা. কুশী, বাঘমতী, গণ্ডক, ঘর্ঘরা প্রভৃতি গঙ্গার উপনদীগুলির জলপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি হবে এবং বিহারের গাঙ্গেয় উপত্যকায় জলনির্গমনে অসুবিধা দেখা দেবে। এতে বিহার ও উত্তর-প্রদেশের গাঙ্গেয় উপত্যকা শুধু যে বারবার

দীর্ঘকালস্থায়ী প্লাবনের কবলে পড়বে তাই নয়, ঐ অঞ্চলে গঙ্গা ও তার উপনদীগুলির দু-তীরের সমভূমি অদূর ভবিষ্যতে জলাভূমিতে পরিণত হওয়ার সম্ভবনা থাকবে। মনে রাখতে হবে যে, গঙ্গাই সমগ্র উত্তর-ভারতের জলনির্গমনের একমাত্র পথ, সেই পথে বাধা সৃষ্টি করে গঙ্গার গর্ভ উঁচু করার অর্থই হলো সমগ্র উত্তরভারতের ধ্বংস ডেকে আনা। কোন নদীখাত উঁচু হয়ে ওঠার অর্থই হলো যে সর্বনাশা প্লাবন—ব্যারাজ নির্মাণকালে এ কথাটি আমরা কেন বিস্মৃত হলাম?

দ্বিতীয়ত ফরাক্কা ব্যারাজের সমস্ত স্লুইস্ গেট সম্পূর্ণ খুলে দিলে যে জল প্রবাহিত হতে পারে, [বা ব্যারাজের সর্বোচ্চ জলনির্গমন ক্ষমতা] তা হলো মাত্র 27 লক্ষ কিউসেক। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, গঙ্গা ও তার উপনদীগুলিতে যে অঞ্চলের জল বয়ে আসে, [বা ওদের আবহক্ষেত্র] তা হলো প্রায় 3 লক্ষ বর্গমাইল, যার অনেকটাই আবার হিমালয় পর্বতমালার সানুদেশ নিয়ে গড়ে উঠেছে। হিমালয়ের কোণে কোণে কখন কি পরিমাণ বৃষ্টি হতে পারে, বা কখন কোন হ্রদ সৃষ্টি হয়ে আবার মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে বা কোন নদীপথে কি পরিমাণ জল হঠাৎ আসতে পারে, তার সম্যক্ জ্ঞান আমাদের নেই। কাজেই এরূপ কম জলনির্গমন ক্ষমতা নিয়ে গড়া ব্যারাজের জন্য গঙ্গানদী যে কোন মুহূর্তে ব্যারাজ সংলগ্ন বাঁধ ভেঙ্গে লক্ষ লক্ষ কিউসেক ধারা নিয়ে প্রবাহিত হয়ে লক্ষ লোকের জীবন ও বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি ধ্বংস করে দিতে পারে।

1978 সালের সেপ্টেম্বরের যে নিম্নচাপটি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান শতাব্দীর প্রবলতম প্লাবন ডেকে এনেছিল, সেই নিম্নচাপটি পশ্চিমবঙ্গের আকাশে স্থিতিলাভ করার পূর্বে 22শে সেপ্টেম্বর থেকে 26শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণ পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও সমগ্র বিহারের গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি ঢেলে দেয়। তারপর সেই নিম্নচাপটি 27শে সেপ্টেম্বর থেকে 29শে সেপ্টেম্বর 3 দিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী ও দামোদরের নিম্ন-উপত্যকায় 16 ইঞ্চি থেকে 30 ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টি ঝরিয়ে দেয়। ফলে যখন ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী প্রভৃতি নদনদীগুলির পথ বেয়ে কমপক্ষে 15 লক্ষ কিউসেক হারে জল নেমে এসে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে প্লাবনের ধ্বংসলীলা চলছিল, ঠিক সেই সময়ে বিহারের গাঙ্গেয় উপত্যকায় পূর্বোক্ত বৃষ্টির জন্য ফরাক্কা ব্যারাজ দিয়ে একদিন 20 লক্ষ কিউসেক হারে জল বয়ে যায়। যদি ঐ নিম্নচাপটি পশ্চিমবঙ্গের আকাশে সরে না এসে বিহারের আকাশে স্থিতিলাভ করতো; তাহলে পুনপুন, শোন, কুশী, কমলা, বাঘমতী গণ্ডক প্রভৃতি নদনদীগুলির পথ বেয়ে ঐ 15 লক্ষ কিউসেক জলধারার প্রবাহ গঙ্গানদীতে নেমে আসত, তখন গঙ্গানদী আনুমানিক 35 লক্ষ কিউসেক জলপ্রবাহ নিয়ে বিপুল বেগে ফরাক্কা ব্যারাজের বন্ধনকে চূর্ণ করে হয়তো নতুন পথে চলত। সে সময় যদি ব্যারাজের বামতীরের বাঁধ ভাঙত, তবে গঙ্গানদী তার পূর্বলব্ধ পূর্বমুখী প্রচণ্ড গতি নিয়ে মালদহের উপর দিয়ে ছুটে যেত এবং ঢাকা শহরসহ বাংলাদেশকে ধ্বংস করে দেবার সম্ভাবনা থাকত; আর যদি ব্যারাজের ডানতীরের পার্শ্বসংলগ্ন বাঁধটি ভাঙত, তাহলে সেই মুহূর্তে 20 বা 25 লক্ষ কিউসেক জলধারা নিয়ে ভাগীরথী প্রমত্তা পদ্মারূপে সমগ্র গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারত, আর ব্যারাজের উঁচু ভিতের জন্য 5 বা 10 লক্ষ কিউসেক জলপ্রবাহ নিয়ে পদ্মা হয়ে উঠত মুমূর্ষু ভাগীরথী। তাই 1978 সালের প্লাবনের ফলে শত শত জীবনহানির জন্য যখন চোখের জল ফেলি, তখনও বৃহত্তর বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্বস্তি অনুভব করি।

তুষারমৌলি হিমালয়ের পুঞ্জীভূত হিমবাহ গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গার যে প্রধান ধারাটি নেমে এসেছে, তারও নাম ভাগীরথী। সেই ভাগীরথী দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর মিলিত

ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুণ্যসলিলা গঙ্গারূপে মর্ত্যে অবতীর্ণা হয়েছে। গঙ্গোত্রী থেকে প্রায় 30 মাইল নীচে উত্তরকাশীর কাছে বন্দরপুঞ্চ পর্বতমালা থেকে কানোরিয়াগাঢ় নামে একটি খরস্রোতা পার্বত্য নদী ভাগীরথীতে মিলিত হয়েছে। 1978 সালের অগাষ্ট মাসের প্রথম দিকে উত্তর প্রদেশে হিমালয় পর্বতমালার কোলে প্রবল বর্ষণের সময় কানোরিয়াগাঢ় নদীতে ধস্ নেমে একটি বিশাল হ্রদ গড়ে ওঠে। পরে 5ই অগাষ্ট সেই হ্রদটি ভেঙে পড়ে কয়েকটি বিশালাকার শিলাখণ্ডকে অবলীলাক্রমে ছিট্‌কে গঙ্গানদীর পথে ফেলে দেয়। ফলে উচ্চ উপত্যকায় প্রবল বর্ষণ হওয়া সত্ত্বেও গঙ্গার জলধারাটি 1৮ ঘণ্টার জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় এবং সেখানে মাইথন বা পাঞ্চেতের ন্যায় একটি বিশালায়তন হ্রদ গড়ে ওঠে, যার তলে কয়েক শ' ফুট দীর্ঘ পাইন গাছগুলি নিমজ্জিত হয়। পরদিন 6ই অগাষ্ট সেই সদ্য-গড়ে-ওঠা হ্রদটি ভেঙে পড়ে বিপুল পরিমাণ জলরাশি লক্ষ লক্ষ কিউসেক প্রবাহের এক বন্যা তুলে প্রায় এক-শ' ফুট উঁচু হয়ে গঙ্গার পথে হঠাৎ ছুটে আসে। ফলে বহু সংখ্যক গ্রাম, গঙ্গোত্রী যাবার পথ, হিন্দুস্থান কনষ্ট্রাকশন কর্পোরেশনের কারখানা, সামরিক বাহিনীর গ্যারেজ, সিনেমা হল, এমনকি মনেরীর জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রটিও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মুহূর্তের মধ্যে গঙ্গার গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। তারপর সেই বিপুল জলরাশি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের অন্যান্য নদনদী বাহিত জলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকাকে সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত করে দীর্ঘ 15 দিন ধরে শত শত মাইল (প্রায় 900 মাইল) পথ পরিক্রমায় পরও যখন ফরাক্কা ব্যারাজের মধ্য দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলে, তখনও তার প্রবাহমাত্রা ছিল 20 লক্ষ কিউসেকের কাছাকাছি, —যা দীর্ঘ দু'-তিন দিন ধরে প্রায় সমভাবে বিদ্যমান ছিল। 21শে অগাষ্ট সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রা ছিল 23 লক্ষ কিউসেক] তাহলে সেই সদ্য-গড়ে-ওঠা হ্রদটি ভেঙে পড়ায় যে কত লক্ষ কিউসেকের প্রবাহ গঙ্গার পথে ছুটে এসেছিল, তা আমাদের কল্পনারও অতীত।

কাজেই শত শত বা সহস্র মাইল দূরবর্তী হিমাচল প্রদেশ বা উত্তরপ্রদেশে প্রবল বর্ষণের পর একটি সুবিশাল এলাকা প্লাবিত করেও ফরাক্কা ব্যারাজ দিয়ে যদি দীর্ঘদিন ধরে উপরিউক্ত হারে জল বয়ে যায়, তবে ঐ বৃষ্টি ফরাক্কার কাছাকাছি বিহারে বর্ষিত হলে কি অধিকতর হারে জল ছুটে এসে ফরাক্কা ব্যারাজের অস্তিত্ব বিপন্ন করত না? কিংবা যদি অনুরূপ একটি হ্রদ ফরাক্কার কাছাকাছি গঙ্গায় কোন উপনদী যেমন কুশী, বাঘমতী, কমলা বা শোন নদী পথে গড়ে উঠে আবার ভেঙে পড়ত, তবে ফরাক্কা ব্যারাজটিকে রক্ষা করা কি সম্ভব হতো? মনে রাখা দরকার হিমালয়ের কোলে অনুরূপ ঘটনা বিরল নয়। যেমন 28 বৎসর আগে 1950 সালে তিস্তা নদীপথে অনুরূপভাবে গড়ে ওঠা হ্রদ ভেঙে পড়ায় 27 ফুট উঁচু বন্যা ছুটে এসে সমগ্র উত্তরবঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত করে এবং আসাম লিংক রেলপথের তিস্তা সেতু ভেঙে যাওয়ায় আসামের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। এছাড়া 1978 সালের 21শে আগষ্ট যখন ফরাক্কা ব্যারাজ পথে 23 লক্ষ কিউসেক হারে জল ছুটে চলেছিল, তখন মানিকচকে গঙ্গার জলতল ছিল 87.22 ফুট। কিন্তু 40 বৎসর আগে 1938 সালে যখন গঙ্গাগর্ভ বর্তমানের চেয়ে হয়তো 3 বা 4 ফুট নীচু ছিল এবং ফরাক্কা ব্যারাজের জন্য গঙ্গার জলতল কয়েক ফুট উঁচু হওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল নয়, তখন গঙ্গার পথে যে প্রবল বন্যা নেমেছিল, তাতে মাণিকচকে গঙ্গার জলতল 87.22 ফুটের চেয়েও 1.64 ফুট অধিক ছিল বলে জানা যায়। সেদিনের সেই বন্যায় 27 লক্ষ কিউসেকের অধিক হারে জল প্রবাহিত হয়ে গেছে কিনা, তা বিশেষজ্ঞরা বলতে পারেন।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, 1978 সালের অগাষ্ট মাসের উপরিউক্ত বন্যার সময় যখন ফরাক্কা

ব্যারাজ দিয়ে প্রায় 20 লক্ষ কিউসেক হারে জল ছুটে চলেছিল, তখন কিছু লোক তাদের অঞ্চলটি প্লাবনের কবল থেকে বাঁচানোর ইচ্ছায় মুর্শিদাবাদ জেলায় ফরাক্কা-জঙ্গীপুর ফীডার ক্যানালের মুখের কাছে ব্যারাজসংলগ্ন বাঁধ কেটে দিতে এসেছিল। অবশ্য ফরাক্কা ব্যারাজের নিরাপত্তা বাহিনী তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। কিন্তু সেদিন তারা যদি ঐ বাঁধ কেটে দিতে সফল হতো, তবে সেই মুহূর্তে ভাগীরথী হয়ে উঠতে পারত প্রমত্তা পদ্মা এবং সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা ও নদীয়া, হুগলী, 24 পরগণা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলসহ কলিকাতা ও তার শিল্পাঞ্চল প্লাবনের প্রবল স্রোতের মুখে ভেসে যেতে পারত। তাই ফরাক্কা ব্যারাজটিকে মনে হয় একটি পারমাণবিক বোমার সমতুল্য,—যা, কোন এক প্রবল বর্ষণে বিস্ফোরিত হয়ে বাংলাদেশ অথবা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।

তৃতীয়ত কয়েক দশক পরে প্রথমোক্ত কারণে ফরাক্কা ব্যারাজের ঊর্ধ্বাংশে গঙ্গাবক্ষে অর্থাৎ ব্যারাজপণ্ডে (barrage pond) কয়েক কোটি টন বালি ও পলি জমে এক বিশালাকার চড়া পড়ে যাবে এবং ঐ ব্যারাজপণ্ডে গঙ্গাগর্ভ ব্যারাজের নিশ্ছিদ্র কংক্রীট ভিত্তের সমান বা তার চেয়েও উঁচু হয়ে উঠবে। ফলে 20 বা 25 বৎসর পরে ফরাক্কা ব্যারাজের জল নির্গমন ক্ষমতা 27 লক্ষ কিউসেক থাকা সত্ত্বেও সেই বিশালাকার চড়ার জন্য ও ব্যারাজপণ্ডে গঙ্গাবক্ষের মাইল প্রতি ঢাল কমে যাওয়ার জন্য 18 বা 20 লক্ষ কিউসেক জলপ্রবাহ, যা গঙ্গার খাতে প্রায়শই নেমে আসে, তাও নির্গমন করা সম্ভব হবে না। সেদিন গঙ্গানদী লক্ষ লোকের জীবন ছিনিয়ে নিয়ে তার পথটি আকস্মিকভাবে পরিবর্তিত করলে তা রোধ করা সম্ভব হবে কিভাবে? তখন মানুষের ভুলে যে মহাপ্লাবন হবে, তাতে কি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না?

উদাহরণস্বরূপ, দুর্গাপুর ব্যারাজ গঠনের 23 বৎসর পরে 1978 সালের সেপ্টেম্বরের বন্যার সময় দেখা যায় যে, দুর্গাপুর ব্যারাজের জলনির্গমন ক্ষমতা 5·5 লক্ষ কিউসেকের অধিক রাখা সত্ত্বেও ঐ ব্যারাজপণ্ডে জমে যাওয়া বিশাল চড়ার জন্য ব্যারাজের সমস্ত গেট খুলে দিয়ে 3·8 লক্ষ কিউসেকের অধিক হারে জল নির্গমন করা সম্ভব হয় নি। ফলে বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশের জল ছোট ছোট নদী বা খাল বেয়ে দামোদরে এসে পড়তে পারে নি। বরং দামোদর থেকে উল্টো চাপে বিপুল জলরাশি ঐসব নদী ও খাল বেয়ে আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চল ও দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চলকে জলের তলে ডুবিয়ে রাখে এবং কয়েক শত কোটি টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হয়। তখন বাধ্য হয়ে দামোদরের দক্ষিণ পাড় কেটে বন্যার জলরাশির পথ করে দিতে হয়।

প্রসঙ্গত বলি বর্তমান নিবন্ধে ফরাক্কা ব্যারাজের যে সকল ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো, তা আমাদের গড়ে তোলা সকল ব্যারাজ ও নদীবাঁধ সম্বন্ধে কম-বেশী প্রযোজ্য। কাজেই ভবিষ্যত পরিকল্পনাকালে ওদের গঠন-কৌশল সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা করা দরকার যাতে উপরিউক্ত ত্রুটিগুলি দূর করা যায়। বর্তমানে 70 কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তরবঙ্গে তিস্তা-ব্যারাজ প্রকল্পের কাজ চলছে, কিন্তু যে তিস্তানদী 1950 সালে আসাম-লিংক রেলপথের সেতু ভেঙে দিয়েছিল, 1968 সালে কার্শিয়াং-এর তিস্তা সেতু উড়িয়ে দিয়েছিল, দুবারই প্লাবনের ফলে কয়েক হাজার জীবন ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং যে নদীপথে ধস্ নামার ফলে প্রায়ই আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়, সেই দুর্বার দুরন্ত তিস্তাপথে ব্যারাজ নির্মাণ করলে কয়েক বৎসরের মধ্যে তার পথ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হবে বলে মনে হয়।

চতুর্থত, এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে গঙ্গানদী মালদহ জেলার কালিন্দী ও মহানন্দার পথ ধরে বয়ে যেত। বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের মুখে তার পূর্বমুখী গতি থাকা সত্ত্বেও রাজমহল পাহাড়ের কোলে দক্ষিণবাহিনী

পথটি গড়ে ওঠার জন্য ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মণিহারীর কাছে পতিত কুশী নদীর প্রবল বন্যাগুলি দায়ী। বর্তমানে কুশী নদী তো আর সেখানে নেই। ফলে বিহার থেকে গঙ্গানদীর জলধারা যে পূর্বমুখী তীব্র গতি পায়, সেই গতির জন্য নদীটির আবার তারই ফেলে-আসা পথ কালিন্দী-মহানন্দার মধ্য দিয়ে ছুটে চলার খুবই সম্ভাবনা আছে। এখন আমাদের গড়ে তোলা ফরাক্কা ব্যারাজটির জন্য ঐ অঞ্চলের গঙ্গাগর্ভ পলি জমে দ্রুত হারে ক্রমাগত উঁচু হওয়ায় এবং ব্যারাজটির অবস্থিতি ঐ অঞ্চলে গঙ্গানদীর জলপ্রবাহে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করায় গঙ্গার উপরিউক্ত পথ পরিবর্তনের সম্ভাবনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে কোন এক বর্ষাকালের প্রবল বর্ষণে গঙ্গানদী বিহারের মণিহারী থেকে তার পূর্বলব্ধ পূর্বমুখী গতি নিয়ে স্বচ্ছন্দে কালিন্দী-মহানন্দা, এমনকি কালিন্দী-আত্রেয়ীর পথে পাড়ি দিতে পারে। তখন গঙ্গার সেই পথ ভাগীরথীর উৎস অঞ্চল থেকে বহুদূরে সরে যাওয়ায় ভাগীরথীকে বাঁচানোর সকল সম্ভাবনা প্রায় বিলুপ্ত হবে। অর্থাৎ ভাগীরথী-হুগলী তখন শুধু বর্তমানের মত মুমূর্ষু‌ই থাকবে না, সে হয়ে উঠবে একটি মৃত নদী—যে মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে তাকেই বাঁচানোর উদ্দেশ্যে গড়া আমাদের ফরাক্কা ব্যারাজ।

কাজেই ফরাক্কা ব্যারাজটি যেহেতু মুমূর্ষু ভাগীরথীতে প্রাণসঞ্চার করতে পারবে না, পরন্তু প্রথমোক্ত কারণে উত্তর ভারতকে বারবার দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রবল প্লাবনের কবলে ফেলবে ও তাকে ভবিষ্যতে জলাভূমিতে রূপান্তরিত করবে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশকে যে কোন মুহূর্তে ধ্বংস করে দিতে পারে এবং চতুর্থ কারণে ভাগীরথীকে চিরকালের জন্য একটি মৃত নদীতে পরিণত করতে পারে, সেইহেতু ফরাক্কা ব্যারাজটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে তার পার্শ্ব দিয়ে গঙ্গানদীর নতুন পথ গড়ে তোলা সমীচীন হবে বলে আমি মনে করি। এছাড়া ফরাক্কায় ফীডার ক্যানালের তীরে সুপার-পাওয়ার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গড়ে তোলার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা দরকার।

প্রস্তাবিত ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ—এখন প্রস্তাব এসেছে, কয়েক শ' কোটি টাকা ব্যয়ে ব্রহ্মপুত্র নদে একটি ব্যারাজ নির্মাণ করে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে একটি ক্যানালের সাহায্যে কয়েক হাজার কিউসেক জল গ্রীষ্মকালে গঙ্গানদীতে নিয়ে আসার। কিন্তু আমার অনুমান যে, ঐ দীর্ঘপথে নিম্নে তপ্ত বালুকারাশির তলে ও ঊর্ধ্বে অগ্নিঝরা সূর্যকিরণে ঐ ক্যানালের জল অনেকটাই মিলিয়ে যাবে, কিন্তু বর্ষায় ব্যারাজের জন্য ব্রহ্মপুত্র নদটি আসাম থেকে পূর্বলব্ধ পশ্চিমমুখী প্রচণ্ড গতিতে লক্ষ লক্ষ কিউসেক জলধারা নিয়ে সমগ্র উত্তরবঙ্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমরা দেখেছি, 1978 সালে তিলপাড়ার ময়ূরাক্ষী ও খয়রাশোলে হিংলো নদী দুটি কেমন করে শত শত জীবনদীপ নিভিয়ে দিয়েছে। আমরা জানি গত 27শে সেপ্টেম্বর দুর্গাপুর ব্যারাজটি সমগ্র দামোদর উপত্যকাকে কেমন করে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। আমরা বুঝেছি, 1978-এর সেপ্টেম্বরের নিম্নচাপটি মধ্যপ্রদেশ থেকে আসার পথে বিহারের আকাশে থমকে না দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের উপর এসে দাঁড়িয়েছিল বলেই ফরাক্কা ব্যারাজটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। আবার সেই ব্যারাজ ব্রহ্মপুত্র নদের উপর গড়ে উঠতে চলেছে,—যে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় শুধু সমগ্র ভারতের নয়, সমগ্র পৃথিবীর সর্বোচ্চ পরিমাণ বৃষ্টি ঝরে পড়ে এবং হিমালয়ের ওপারে প্রায় 3 লক্ষ বর্গমাইল অববাহিকা থেকে যুগ যুগ ধরে কখন কী পরিমাণ জল এসেছে, তা জানা আমাদের সাধ্যাতীত। শোনা যায় দূর অতীতে ব্রহ্মপুত্র একটি ছোট্ট নদ ছিল। একদিন শানপো নদ তার পথটি পরিবর্তিত করে হিমালয়ের ওপার থেকে ছুটে এসে ব্রহ্মপুত্রর সঙ্গে মিলিত হয়, আর তখনই ব্রহ্মপুত্র একটি বিশাল নদে রূপান্তরিত হয়। ভবিষ্যতে অনুরূপ কোন ঘটনা ঘটবে কিনা,

তা হিমালয়ের ওপারের নদনদী সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না থাকলে বলা অসম্ভব। তাই মনে হয় ভবিষ্যতে ফরাক্কা ও ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ দুটির জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ হয়তো একদিন জলস্রোতে মুছে যাবে এবং সিন্ধু সভ্যতার ন্যায় বাংলার সভ্যতা চিরতরে বিলুপ্ত হবে।

এদেশে মৌসুমী বায়ুপ্রভাবে ভারত মহাসাগর থেকে আগত 'এক একটি নিম্নচাপ হঠাৎ 4 বা 5 দিনের মধ্যে যে কী বিপুল পরিমাণ (কয়েক কোটি একর-ফুট) বৃষ্টি ঝরিয়ে দিতে পারে, তার কয়েকটি উদাহরণ হলো 1978 সালের অগাষ্টের প্রথমে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের, সেপ্টেম্বরের প্রথমে হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের এবং সেপ্টেম্বরের শেষে বিহারও পশ্চিমবঙ্গের প্রলয়ঙ্কর প্লাবনগুলি। দক্ষিণের সীমাহীন সুনীল সাগর থেকে গ্রীষ্মকালের প্রখর সূর্যকিরণে উত্থিত পুঞ্জীভূত মেঘরাশিকে আটকে রাখার মত এত বিশালাকার সুউচ্চ পর্বতমালা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই, এই কথাটি স্মরণে রেখে আমাদের নদী পরিকল্পনাগুলি রচিত হওয়া আবশ্যক। কাজেই এই মৌসুমী বৃষ্টি বহুল দেশে সিন্ধু, গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্রের মতো বিশাল অববাহিকার নদনদীপথে ব্যারাজ নির্মাণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমাদের জলসম্পদ ব্যবহারের জন্য তাদের শত শত উপনদীগুলি থেকে সহজেই জল ও জলবিদ্যুৎ আহরণ করতে পারি।

প্রস্তাবিত হুগলী ব্যারাজ—শ্রীকপিল ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, সাগর থেকে উঠে আসা পলি জোয়ার-ভাঁটার সন্ধিক্ষণে নদীবক্ষে ঝরে পড়ায় হুগলী ও গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চলের নদীগুলি দ্রুত মজে যাচ্ছে এবং জোয়ারে আসা সেই পলি আটকানোর জন্য হুগলী নদীপথে মোহানার কাছে ব্যারাজ নির্মাণ করা দরকার। (দ্রষ্টব্য শ্রীকপিল ভট্টাচার্যের "কলিকাতা-হলদিয়া বন্দর ও ফরাক্কা প্রকল্প" বারোমাস, অগাষ্ট 1978 এবং 'প্লাবনের কবলে কলিকাতা' জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ফেব্রুয়ারী, 1979) কিন্তু যদি জোয়ারের ফলে সাগর থেকে উঠে আসা পলিই নদীর মৃত্যুর কারণ হয়, তাহলে ভাগীরথীসহ গঙ্গার অসংখ্য শাখানদীগুলি জোয়ার-ভাঁটা থাকা সত্ত্বেও অতীতে যুগ যুগ ধরে সাবলীলভাবে বয়ে যেত কেমন করে? কিংবা আজ যখন ভাগীরথী, জলঙ্গী, ইছামতী প্রভৃতি নদীগুলি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে তখন গড়াই মধুমতী ও পদ্মার কীর্তিনাশা খাত বড় হয়ে উঠছে কেন? অথবা হুগলী নদীতে তো জোয়ার-ভাঁটার খেলা নদীয়া জেলার নবদ্বীপের ঊর্ধ্বে ছুটে চলে না, তবে মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথী, জলঙ্গী চূর্ণী প্রভৃতি নদীর খাতগুলি অতি দ্রুতহারে পলি জমে উঁচু হয়ে উঠছে কেন?

এছাড়া পলি তো পাহাড় থেকে বিপুল পরিমাণে নদীপথে বয়ে আসে, কিছু দু-তীরভূমি থেকে ধুয়ে আসে আর কিছু হয়তো সাগর থেকে উঠে আসতে পারে। কিন্তু উক্ত ব্যারাজটি বর্ষাকালে পাহাড় থেকে ঝরে আসা ও তীরভূমি থেকে ধুয়ে আসা পলি আটকাবে কেমন করে? পরন্তু আমার মনে হয়, ব্যারাজের জন্যে জলের গতি স্তিমিত হওয়ায় উক্ত দু-ধরণের পলি নদীবক্ষে ঝরে পড়ে নদীখাত অধিকতর হারে উঁচু হয়ে উঠবে ও হুগলী নদী আরও দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। এছাড়া ব্যারাজটির সাহায্যে নদীর জলতল উঁচু করে রাখায় হুগলী নদীর দু-তীরের হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ পরগণা জেলাগুলির জল নিকাশে অসুবিধা হবে এবং ভবিষ্যতে ঐ জেলাগুলি নিম্নাঞ্চল বা জলাভূমিতে পরিণত হবে।

মনে রাখা দরকার পলি—সে সাগর থেকে উঠে আসাই হোক, তীরভূমি থেকে ধুয়ে আসাই হোক আর পাহাড় থেকে ঝরে আসাই হোক—সব পলি নদী বর্ষার জলরাশির প্রবল গতির সাহায্যে তার পথ থেকে সরিয়ে দেয়। কাজেই সাগর থেকে

উঠে আসা পলি আটকানোর জন্য কোন ব্যারাজ নয়, ভাগীরথীসহ গঙ্গার শাখানদীগুলির বক্ষে জমে যাওয়া পলি সরাতে আমাদের প্রয়োজন উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে গঙ্গা থেকে বর্ষার লক্ষ লক্ষ কিউসেক জলধারা নিয়ে আসা এবং সেই জলধারার গতিকে সম্ভবমত নদীখাতমুখী করে উৎস থেকে সাগর পর্যন্ত প্রবাহিত করা। অর্থাৎ কোন ব্যারাজ দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে নয়, ভাগীরথী মজে যাওয়ার প্রাকৃতিক কারণগুলি অনুসন্ধান করে তাদের প্রতিকারের মাধ্যমে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। বিষয়টি পরবর্তী একটি নিবন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

প্রাণী-বিজ্ঞানে নমুনা সংরক্ষণ

প্রণবকুমার মল্লিক*

সংরক্ষণ শুধু প্রাণীবিজ্ঞানে নয় মানুষের ইতিহাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমগ্র জীবনপ্রবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতীত বর্তমানের যোগসূত্র, তার ক্রমবিকাশ, বিবর্তনের গতি-প্রকৃতি, অনেক তত্ত্ব ও তথ্যের প্রত্যক্ষ নজীর এবং তার থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ প্রভৃতি বহু বিষয়েই সংরক্ষণের গুরুত্ব। সংরক্ষণ একদিকে প্রত্যক্ষ ইতিহাস, অন্যদিকে অনুসন্ধিৎসার প্রেরণা,—তা ঐতিহাসিক শিল্পসামগ্রীই হোক, বিজ্ঞানের নমুনা হোক, আর—সাধারণ ডাকটিকিট বা মুদ্রাসংগ্রহই হোক। প্রাণী-বিজ্ঞানেও এর গুরুত্ব সমধিক। আদি প্রাণী থেকে ক্রমোন্নত প্রজাতি মানুষ পর্যন্ত বহুবিচিত্র জীব সমাবেশেই এই পৃথিবী। প্রকৃতি তাদের অনেকেই স্বাভাবিক জীবিত অবস্থায় রক্ষা করে চলেছে—যা দিয়ে আমাদের চারদিকের বিস্তৃত জীবজগৎ। তবে অনেকের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু হয়ে গেছে অনেক আগেই। কিন্তু প্রকৃতি তাদের স্মৃতি নিশ্চিহ্ন না করে অনেক ক্ষেত্রে তাদের সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছে—কখনও শিলীভূত করে, কখনও শিলাগাত্রে তার নিখুঁত চিত্র ধরে রেখে। এই উভয় নমুনাই জীবাশ্ম নামে পরিচিত। বিস্তীর্ণ জীবজগৎকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে হলে সারা দেশই ঘুরে বেড়াতে হয়, সেটা বৃহত্তর জনসাধারণ বা প্রাণী-বিজ্ঞানের ছাত্রদের বেশীর ভাগের পক্ষেও সম্ভব নয়। তাই বহুবিস্তৃত জীবজগতের যথাসম্ভব নমুনা সংগ্রহ করে একত্রীকরণই জীবন-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রধান উপায়।

সেই সংরক্ষণ কতভাবে এবং কি উপায়ে করা যায় :

1) নানাবিধ জীবন্ত প্রাণীদের একত্রিত করে চিড়িয়াখানা বা প্রাণীউদ্যানের সৃষ্টি।

2) বৃহৎ অরণ্যে স্বাভাবিক পরিবেশে স্বচ্ছন্দে বিবিধ জীবজন্তুর বা বিশেষ বিশেষ প্রাণীর নিরাপদ জীবনযাপনের ব্যবস্থাকে বলা হয় অভয়ারণ্য।

3) স্বদেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মৃতপ্রাণীর দেহ বা জীবাশ্ম সংগ্রহ করে মিউজিয়াম বা যাদুঘর তৈরি করা।

তবে সাধারণ মানুষ বা বিদ্যার্থীদের পক্ষে এইসবের কোনটাই সম্ভব নয়। তারা সম্ভবমত এইগুলি মাঝে মাঝে দেখে আসতে পারে, যদিও অধিকাংশের পক্ষে সেটুকুও সম্ভব নয়, অর্থ ও সময়ের অভাবে। তাই বলে তারা কি জীবন-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে? না—ক্ষুদ্র আকারে তাদের পক্ষেও প্রাণীজগতের অনেক কিছু

*জীববিদ্যা বিভাগ, মহাদেবানন্দ কলেজ, বারাকপুর, 24 পরগণা

তাদের সীমিত সামর্থ্যেই সংরক্ষণ করে জীবন-বিজ্ঞানের বহুতত্ত্ব ও তথ্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের উপযোগী ব্যবস্থা করতে পারে। তাতে যেমন তাদের নিজেদের জ্ঞান, কর্মক্ষমতা, শিল্পবোধ, অবসর-বিনোদন ও নির্মল আনন্দলাভের উপায় হবে তেমনি পারিপার্শ্বিক জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বহু উপকারই হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে নিজেদের পরিবেশ থেকেই কীট-পতঙ্গাদি বিবিধ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করে তাদের উপযুক্ত সংরক্ষণের জন্য ক্ষুদ্র সংগ্রহশালা তৈরি করতে জগতের এমন কতকগুলি অবস্থা বা পরিবেশ আছে যেগুলির প্রত্যক্ষ পরিচয় স্থায়ী করে রাখতে হলে এই আলোকচিত্রই একমাত্র পথ। অন্য কোনমতেই তার যথার্থ সংরক্ষণ সম্ভব নয়। ব্যাঙের আলোকচিত্রটি দ্রষ্টব্য :—

স্ত্রী-পুরুষ দুটি ব্যাঙের মিলিত অবস্থা। আলোক চিত্র ছাড়া অন্য কোনভাবে এই অবস্থাটি ধরে রাখা যাবে না। জীবন-বিজ্ঞানের আরও কত বিষয়েই এইভাবে আলোকচিত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যায় ও

বৈজ্ঞানিক নাম—"রাণা লিমনোক্যারিস" [শিল্পী—প্রণব মল্লিক। স্থান—তুইলা, আন্দুল (কলকাতা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে 13 কিঃ মিঃ) তারিখ 26শে জুন 1978, সময় রাত্রি 10টা]

হবে। জীবন্ত প্রাণী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সাধ্য, কষ্টসাধ্য ও উপযুক্ত স্থানাভাব। সুতরাং যত্রতত্র সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর মৃতদেহের সংরক্ষণ খুব একটা অসম্ভব বা কঠিন কাজই নয়। এর জন্য যারা ছবি আঁকতে পারে তারা উপযুক্ত ছবি এঁকে বহু প্রাণীর জীবন ও জীবনধারার যথার্থ সংরক্ষণ নিজেদের চেষ্টায় পরিমিত স্থানের মধ্যেই করতে পারে।

বিভিন্ন প্রাণীর আলোকচিত্রের সংগ্রহ প্রাণীজগতের নিখুঁত পরিচয় দিতে পারে। প্রাণী-দরকার। প্রজাপতি, মাকড়সা, পাখী, মাছ, সাপ, গুবরেপোকা, প্রভৃতি বহু প্রাণীর সাধারণ জীবনধারার অনেক কিছুকেই এই আলোকচিত্রের মাধ্যমে দেখান ও বোঝানো সম্ভব।

মৃত প্রাণীদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা—ধরে মেরে রেখে দিলেই সংরক্ষণ হয় না, তারজন্য প্রথমেই চাই—জীবন্ত সংগ্রহকরণ-Collection. তারপর সংজ্ঞালুপ্তি-করণ-Anaesthetisation. হনন ও স্থিরীকরণ-Killing + fixing. সংরক্ষণ-Preservation.

সংগ্রহের পর সংজ্ঞালুপ্তিকরণের বিশেষ প্রয়োজন হয় স্বাভাবিক অবস্থায় সংরক্ষণের জন্য। যেমন একটা জীবিত শামুক, তাকে যদি সরাসরি রক্ষণকারী পদার্থে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। তাতে শামুকটি মরে যায় ঠিকই কিন্তু শরীরের প্রলম্বিত অংশ দেহখোলকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নেওয়ায় স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণতঃ সংজ্ঞালুপ্তিকরণের জন্য বিশেষ ধরণের রাসায়নিক পদার্থ নির্দিষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। এই ধরণের পদার্থগুলি হলো কোকেন, মেনথল, ক্লোরাল হাইড্রেট, অ্যালকোহল, ম্যাগনেশিয়াম, ক্লোরোইড, ক্লোরোফর্ম, ইথার ইত্যাদি।

সংজ্ঞালুপ্তিকরণের পর প্রাণীটিকে হনন ও প্রলম্বিত অবস্থায় স্থিরীকরণ করা হয়। হননকার্যে সাধারণতঃ ফর্মালিন (3–5% কোন কোন ক্ষেত্রে 10%) অথবা অ্যালকোহল (70%–90%) প্রয়োগ করা হয়। এই রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ফলে প্রাণীদেহটি অবিকৃত থাকে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সংকোচন ও আভ্যন্তরীণ পচন থেকে রক্ষা পায়। এর পর করা হয় সংরক্ষণ। সংরক্ষণকারী পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয় সাধারণতঃ 4% ফরম্যালডিহাইড বা 10% ফরম্যালিন (40% ফরম্যালডিহাইড এক অংশ+পরিশুদ্ধ জল নয় অংশ) অথবা ইথাইল অ্যালকোহল (70%—90%)

প্রাণীদেহকে সাধারণতঃ হয় ফরম্যালিন নয়ত অ্যালকোহল, যে কোন একটিতে সংরক্ষণ করা হলেও সব ক্ষেত্রে ফরম্যালিন ব্যবহার করা যায় না। যে সব প্রাণীর শরীরে চুনঘটিত (calcareous) পদার্থ থাকে সে সকল ক্ষেত্রে ইথাইল অ্যালকোহল দ্বারা যে কোন প্রাণীর দেহকেই সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু ইথাইল অ্যালকোহলের ব্যবহার ফরম্যালিনের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে আবার অসুবিধাজনক। যেমন—

1) ফরম্যালিনের তুলনায় ইথাইল আলকোহলের দাম অনেক বেশী।

2) স্থিরীকৃত প্রাণীটিকে সরাসরি ফরম্যালিনে দেওয়া যায় কিন্তু (70%—90%) অ্যালকোহলে সরাসরি দেওয়া যায় না। সেখানে তাকে ক্রমানুসারে আসতে হয় (30—40—50—70—90% কম শক্তি থেকে বেশী শক্তিতে) ফলে সময় লাগে বেশী।

যে ভাবেই সংরক্ষণ করা হোক না কেন এর পরে প্রশ্ন আসে প্রাণীটিকে বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পসৌন্দর্যের উপযোগী করে তোলা। সুন্দরভাবে কাচের জারে রক্ষণকারী তরল রাসায়নিক পদার্থে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করে প্রাণীটিকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক উপায়ে সাজিয়ে রাখা। কেমনভাবে সাজানো হবে? কোন জিনিসকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে তোলা বিদ্যার্থীদের পক্ষে নিঃসন্দেহে শিল্পীমনের পরিচয় বহন করে। তাই এই ভারটা তাদের উপরই থাকবে।

প্রাণীটিকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখার পরেই কি আমাদের কাজ শেষ? না, বিজ্ঞান শিক্ষার্থী হিসাবে আরও একটা কাজ করতে হবে। কাজটি হলো প্রত্যেকটি সাজিয়ে-রাখা প্রাণীর সঙ্গে একটুকরো কাগজে লেবেল করে সুন্দরভাবে লিখে রাখতে হবে,—সংগ্রহস্থান, সংগ্রহের তারিখ ও সময়, বৈজ্ঞানিক নাম, সংগ্রহকারীর নাম ইত্যাদি। যদি পাহাড়ের উপর থেকে সংগ্রহ করা হয়, তাহলে যে স্থান থেকে প্রাণীটি পাওয়া গেছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তার উচ্চতা, প্রাণীটির স্বাভাবিক রঙ, সংগ্রহ স্থলের পরিবেশ ইত্যাদিও লিখে রাখা বিধেয়।

প্রোটিনের সন্ধানে

আশিস দাশ*

প্রোটিন থেকেই জীবনের উৎপত্তি। কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী—সমগ্র জীবজগতের দেহগঠনের মূল কাঠামোই হচ্ছে প্রোটিন। এই প্রোটিন বলতে সাধারণতঃ আমরা মাছ, মাংস, দুধ, ডিমকেই বুঝি। কিন্তু ঐ সমস্ত প্রাণীরা তাদের দেহের প্রোটিন সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে উদ্ভিদ জগৎ থেকে। তাই আসলে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনই হচ্ছে আদি প্রোটিন। আজ দেশ জুড়ে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের দুর্ভিক্ষ, দেশের পরিচালক মণ্ডলী এই নিয়ে নানা রকম আলোচনা করছেন বটে কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পন্থা খুঁজছেন, সে রকম প্রমাণ নেই। তাই ঐসব প্রাণীজ প্রোটিন খাদ্যের প্রতি আমাদের যতই আকর্ষণ থাকুক না কেন সুস্থ-ভাবে বাঁচতে হলে সবার জন্য সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে এই সুষম খাদ্যের প্রধান তিনটি উপাদান হলো (1) প্রোটিন, (2 কার্বোহাইড্রেট, (3) ফ্যাট। এ ছাড়া ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জলের প্রয়োজন কথাটা লেখা বা বলা যতটা সহজ বাষট্টি কোটি ভারতবাসীর কাছে পুষ্টিকর বা সুষম খাদ্য পাওয়া ততটা সহজ নয়। কারণ পুষ্টিকর খাদ্য বলতেই আমাদের মনে আসে সেই মাছ, মাংস, ডিম, দুধের কথা। নিঃসন্দেহে এগুলি পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু এই খাদ্যগুলি গ্রহণে কতজন ভারতীয় সমর্থ? বর্তমানে আমাদের কাছে এইগুলি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করাতো দূরের কথা, স্পর্শ করাও প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। তাহলে কি এই বছর আমরা সারা বিশ্বের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে 'আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ' উপলক্ষে সিন্ধুতে বিন্দুর মত কয়েকটি শিশুকে কয়েকটি ফল, মিষ্টি দিয়ে শিশুদের অভাব মিটিয়ে ফেলব; না—"যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে" বলে ভারী গলায় আবৃত্তি করে ক্ষান্ত হব? তখন কি একবারও আমাদের মনে পড়ে এই ভারতবর্ষে প্রতি হাজারে গড়ে 122 জন শিশু অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছে প্রধানতঃ প্রোটিনের অভাবজনিত অপুষ্টি কারণেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পুষ্টি-বিশেষজ্ঞরা বলেছেন প্রোটিনের অভাবে উচ্চতা, ওজন হ্রাস ছাড়াও কোয়াশিয়রকর, ম্যারাসমাস-এর মত ভয়াবহ অসুখ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস, রক্তাল্পতা এবং মানসিক দৌর্বল্য আমাদের দেশে সুস্থ নাগরিকের অভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি করছে। কারণ এই ভারতবর্ষে শতকরা 60টি পরিবার দারিদ্র সীমার নীচে। আমাদের পুষ্টির অভাব বললে পুষ্টি কাকে বলে জানা দরকার। শরীরে সারা দিন রাত কাজ করবার মত শক্তি জোগান, রোগের হাত থেকে দেহকে রক্ষা করা, দেহের গঠন, ক্ষতিপূরণ, বৃদ্ধির উপাদান সংগ্রহের নাম পুষ্টি। পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে প্রোটিনই প্রধান খাদ্য। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন যৌগ নিয়ে গঠিত শৃঙ্খলিত অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিনের দেহ গঠন করে। অ্যামাইনো অ্যাসিড এক ধরণের জৈব অম্ল বিশেষ। অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংখ্যা 20টি। এই 20টি অ্যামাইনো অ্যাসিডের গঠনের পুনর্বিন্যাস দ্বারাই প্রায় 400-র বেশী প্রোটিনের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই 20টি অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে আটটিকে অপরিহার্য আর বাকী 12টিকে সহযোগী অ্যামাইনো অ্যাসিড বলা হয়। অর্থাৎ শরীরের অন্যান্য উপাদান থেকে অপরিহার্য

*1বি, মোহনলাল স্ট্রীট, কলিকাতা-700004

অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাহায্যে শরীরের অভ্যন্তরে অন্যান্য অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি সংশ্লেষিত হতে পারে। কতকগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিড দেহের বিভিন্ন কার্যের জন্য অপরিহার্য অথচ সেইগুলি দেহের কোষে উপযুক্ত পরিমাণে সংশ্লেষিত হয় না। সেই কারণে আমাদের খাদ্যে ঐ অ্যামাইনো অ্যাসিড-গুলি অবশ্যই থাকা চাই। যেমন—(1) লাইসিন, (2) ভ্যালিন, (3) লিউসিন, (4) আইসোলিউসিন, (5) থিওনিন, (6) মেথিওনিন (7) ফিনাইল অ্যালানিন, (8) ট্রিপ্‌টোফ্যান। এইগুলিকে অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে কিন্তু সিস্টাইন, অর্নিথিন, টাইরোসিন, গ্লুটামিক অ্যাসিড, সেরিন, অ্যাস্‌পার্টিক অ্যাসিড প্রভৃতি দেহে নানা সূত্র থেকে সংশ্লেষিত হতে পারে, সেইজন্য এইগুলি অপরিহার্য নয়। তাই অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপস্থিতির উপর প্রোটিনের জৈব মূল্য নির্ভর করে। প্রাণীজ প্রোটিনে এইগুলি বেশী মাত্রায় আছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে প্রাণীজ প্রোটিনের দুর্ভিক্ষ যেদেশে—সেখানে অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড-যুক্ত খাদ্য কি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাবে না? নিশ্চয় পাওয়া যাবে, তবে এর জন্য চাই বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিকর উপাদান সম্পর্কে কিছু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিজ্ঞান-সম্মত জাতীয় পরিকল্পনা ও শিক্ষা। প্রাণীজ প্রোটিন যখন সহজ, সুলভ হচ্ছে না তখন নিশ্চয় আমাদের উদ্ভিজ্জ প্রোটিন উৎপাদন ও সংগ্রহের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ প্রোটিন সমৃদ্ধ উদ্ভিজ্জ খাদ্যে লক্ষ্য করা গেছে যে তাদের উপকারিতা কম নয় বরং দাম অনেক কম। যেমন—সয়াবিন, চীনাবাদাম, ডাল, ছোলা, মটর শুটি, শিম ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এদের ব্যবহার অত্যন্ত কম। যতই এ সবের চাষ বাড়ানো যাবে ততই আমাদের দেশের প্রোটিনের অভাব কিছুটা লাঘব হবে। শরীর সুস্থ রাখতে এবং তাপ ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য চাই প্রোটিন, অধিক ক্যালরির জন্য চাই কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট, এবং ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস, লৌহ, আয়োডিন ও নানা রকম ভিটামিনও চাই শরীরের অন্যান্য জৈবিক কার্যের জন্য। তাই আমাদের প্রতি দিনকার আহারে এমন সব খাদ্য-দ্রব্য থাকা প্রয়োজন যার মধ্যে ঐ সমস্ত গুণাবলী বর্তমান থাকে।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সয়াবিন। কারণ এই সয়াবিনের মধ্যে শতকরা 40-42 ভাগ প্রোটিন থাকে। তাছাড়া এই সয়াবিনের মধ্যে শরীরের পক্ষে অপরিহার্য সমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। সেই জন্যই তো সয়াবিনের অপর নাম 'Wonder Bean'। নীচের তালিকায় (তালিকা-ক) প্রোটিনের উৎস এবং ওদের মধ্যে শতকরা প্রোটিনের ভাগ দেওয়া হলো

তালিকা—ক

প্রোটিনের উৎস		প্রোটিনের ভাগ %
সয়াবিন	...	40—42
বাদাম	...	25
মাংস	...	18—20
মাছ	...	16—20
ডিম	..	13—14
দুধ	...	3-4

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা 1 কি. গ্রা. সয়াবিনের প্রোটিনের সমতুল্য প্রোটিন পেতে হলে 2 কি. গ্রা. মাছ বা মাংসের প্রয়োজন। নীচের তালিকায় (তালিকা-খ) সয়াবিনে কতটা পরিমাণ অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে তা দেওয়া হলো।

তালিকা-খ

সয়াবিনে অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের ভাগ (%)

1. লাইসিন—6.8
2. ট্রিপ্‌টোফ্যান—1.4
3. ফিনাইল অ্যালানিন—5.3

4. মেথিওনিন —1·7
5. থ্রিওনিন—3·9
6. লিউসিন—8·0
7. আইসোলিউসিন —6·0
8. ভ্যালিন—5·3

এ ছাড়াও

আর্জিনিন—7·2
সিস্টাইন—3·1
হিস্টিডিন—2·4

যাঁদের রক্তে কোলেষ্টেরল-এর পরিমাণ বেশী তাঁদের পক্ষে গরুর দুধের পরিবর্তে প্রোটিনের মূল্য ঠিক রাখার জন্য সয়াদুধ বিশেষ উপকারী। শুধু সয়াদুধ কেন সয়াময়দা 'মধুমেহ' বা ডায়বেটিস রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। নীচের তালিকায় (তালিকা-গ) গরুর দুধ ও সয়াদুধের বিভিন্ন উপাদানের তুলনামূলক ভাগ দেওয়া হলো।

তালিকা-গ

সয়াদুধ (চিনি ছাড়া)	গরুর দুধ
প্রোটিন—3·2	3·2
ফ্যাট—1·7	4·5
কার্বোহাইড্রেট —2·0	×
চিনি—×	4·6 (ল্যাক্টোজ)
খনিজ লবণ—0·5	0·4
কঠিন পদার্থ—7·4	13·0

[ক, খ, গ-তালিকা ড: বি. মুখার্জীর সৌজন্যে]

মাংস কেনবার যাদের সামর্থ নেই, তাঁদের জন্য 'নিউট্রিনাগেট' এক অসাধারণ বিকল্প মাংস। রান্না ঠিক মত করতে পারলে রূপে গুণে তো বটেই স্বাদে গন্ধে ও নিউট্রিনাগেট অসাধারণ উদ্ভিজ্জ মাংস। সয়াবিনের সঙ্গে ভুট্টা ও চাল মিশেয়ে এক ধরণের উন্নত মানের খাদ্য প্রস্তুত করা হয়েছে যার 100 গ্রামের মধ্যে শতকরা 21 ভাগ প্রোটিন এবং 384 ক্যালোরী শক্তি পাওয়া যায়।

বিভিন্ন মানুষের ক্যালরির চাহিদা বিভিন্ন রকমের। একজন পূর্ণ বয়স্কের সাধারণ অবস্থায় 3,000 ক্যালরি তাপশক্তির প্রয়োজন, মানুষের খাদ্যবস্তু এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে তার দেহ প্রয়োজনীয় তাপশক্তির জন্য যেন নিজের দেহের কলাকোষকে শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার না করতে পারে। 100 গ্রাম প্রোটিন দেহে জারিত হলে 410 ক্যালরি তাপশক্তি পাওয়া যায়। 100 গ্রাম ডালের ক্যালরি মূল্য প্রায় 325—360 ক্যালরি। ডালে শতকরা প্রায় 20—25 ভাগ প্রোটিন থাকে। পুষ্টি ও দেহের ক্যালরি মূল্যের জন্য একাধিক উদ্ভিজ্জ প্রোটিন একত্রে মিশিয়ে খেলে বিশেষ উপকার হয়, কারণ কোন কোন উদ্ভিজ্জ খাদ্যে কিছু কিছু অপরিহার্য বা পরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের অভাব থাকে, কিন্তু দু-তিনটি উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খাদ্য মিশিয়ে খেলে একের অ্যামাইনো অ্যাসিডের অভাব অন্যে পূরণ করতে পারে। যেমন—খিচুড়ি, ডাল, রুটি ইত্যাদি। ভাতের ফেন ফেলে না দিয়ে খেতে পারলে বা ঐ ফ্যান-এ ডাল সিদ্ধ করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। নীচে একটি অপেক্ষাকৃত সুলভ ও বিজ্ঞানসম্মত খাদ্য তালিকা (তালিকা—ঘ) দেওয়া হলো, যার থেকে আমরা দৈনিক প্রায় 2500 ক্যালরি শক্তি ও প্রায় 65 গ্রাম প্রোটিন পেতে পারি। আজকাল এক ধরণের অসাধু সবজী ব্যবসায়ী নানারকম উদ্ভিজ্জ প্রোটিনকে টাট্কা বা তাজা বলে বিক্রীর উদ্দেশ্যে দেহের পক্ষে মারাত্মক নানারকম ক্ষরিকারক রঙ মেশাচ্ছেন; ফলে ঐ সমস্ত উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের প্রোটিন মূল্য নষ্ট হচ্ছে এবং ক্রমাগত ব্যবহারে দেহে মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন সয়াবিনে যে সবুজ রঙ মেশানো হয় তা অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

তালিকা-ঘ

খাদ্যের নাম	দৈনিক পরিমাণ (গ্রাম)
1. চাল বা গম	300
2. সয়াবিন	50

খাদ্যের নাম	দৈনিক পরিমাণ (গ্রাম)
3. ডাল	50
4. রাঙ্গা আলু	100
5. চীনা বাদাম	30
6. অঙ্কুরিত ছোলা	50
7. শাক-সব্জী	100
8. কচু	200
9. গুড়	50
10. তেল	30

উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের সঙ্গে যদি অল্পস্বল্প প্রাণিজ প্রোটিন মিশিয়ে খাওয়া যায় তাহলে প্রোটিনের জৈবমূল্য অনেক বৃদ্ধি পায়। যেমন—দুধ-ভাত, দুধ-রুটি, গেঁড়ী, গুগলী, কাঁকড়া, ছোট ছোট মাছ অর্থাৎ পুঁটি, মৌরলা ইত্যাদি, কাঁঠাল, কুমড়ো ও তরমুজের বীজ থেকেও ভাল ক্যালরি, তাপশক্তি ও প্রোটিন পাওয়া যায়।

প্রোটিন আমাদের দেহের কোষে সরাসরি শোষিত হয় না। বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয়ে শোষিত হয় আবার কোষেই অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিনের পুনর্গঠন হয়। সাধারণতঃ জারকরসের-দ্বারা খাদ্যের প্রোটিন ভেঙ্গে খাদ্যনালীতে প্রোটিওজ → পেপ্‌টোন → পেপ্‌টাইড → ও শেষে অ্যামাইনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়ে দেহে শোষিত হয়। প্রোটিনের বিপাক এই ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। শুধু বলতে চাই সয়াবিন, চীনাবাদাম, ডাল ইত্যাদির উপযুক্ত চাষ বাড়িয়ে তার থেকে উচ্চ প্রোটিন যুক্ত সুষম খাদ্যের প্রসার সম্ভব। চীনা বাদাম ভাঙ্গাতে শতকরা 40 ভাগ ফ্যাট এবং 32 ভাগ প্রোটিন থাকে। তবে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনকে সহজপাচ্য করে গ্রহণের পদ্ধতি শিখতে ও শিখাতে হবে।

সুতরাং প্রাণিজ প্রোটিনের অভাব বলেই হাহাকার করলে চলবে না, বরং বিকল্প উদ্ভিজ্জ প্রোটিন উৎপাদন, সংগ্রহ, এবং তা গ্রহণের মানসিকতার জন্য সমবেত প্রচেষ্টা ও সর্বোপরি বিশেষ জাতীয় পরিকল্পনা এখন একান্তই প্রয়োজন।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি—থাইরয়েড

চট্টাচার্য*

আমাদের দেহের বিভিন্ন অবস্থানে অবস্থিত যে প্রধান সাতটি অন্তঃক্ষরা (endocrine) গ্রন্থি প্রতিনিয়ত রক্তে তাদের ক্ষরিত রস ঢেলে স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত শারীরিক ক্রিয়াকলাপকে পরিচালিত করছে, তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধানটি আমাদের কণ্ঠদেশে বা গলদেশে অবস্থিত—নাম গলগ্রন্থি বা থাইরয়েড (thyroid gland)।

সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীতেই থাইরয়েড গ্রন্থি থাকে। তবে তাদের আকৃতি, গঠন ও শরীরে অবস্থান প্রজাতি ভেদে ভিন্ন হয়। মানুষসহ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে ভ্রূণ-অবস্থায় পরিস্ফুরণের সময় (foetal development) গ্রন্থিটি গলবিলের মেঝে থেকে উপবৃদ্ধিরূপে সৃষ্টি হয় এবং প্রচুর রক্ত-জালকে পরিবেষ্টিত থাকে। মানুষের থাইরয়েড গ্রন্থিটি স্বরযন্ত্রের (larynx) ঠিক নীচেই দু-পার্শ্বে দুটি লতি (lobe) নিয়ে অবস্থিত। নরম পীতাভ রং-এর লতি দুটি আকারে ও গঠনে প্রতিসম হয় এবং অন্তর্বর্তী কলা (thyroid isthnus) দ্বারা সংযোজিত থাকে। এই অন্তর্বর্তী অংশ থেকেই পিরামিডাকার অন্তর্বর্তী লতর pyramidal lobe) সৃষ্টি করে, সমস্ত গ্রন্থিটি প্রচুর রক্তবাহ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এবং দেহের অন্যতম সর্বাধিক রক্তপ্রবাহপুষ্ট গ্রন্থি এটি। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে গ্রন্থিটির স্বাভাবিক ওজন 25 থেকে 40 গ্রাম।

চিত্র 1 (A)
থাইরয়েড গ্রন্থির অবস্থান ও বাহ্যিক আকৃতি

চিত্র 1 (B)
নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় অবস্থায় গ্রন্থিটির অন্তর্গঠন

থাইরয়েড গ্রন্থিটি লক্ষ লক্ষ আণুবীক্ষনিক গোলাকৃতি থলির মত গঠনের বিভিন্ন আকারের একক

*3/43, বিবেকনগর কলিকাতা-700075

নিয়ে গঠিত, এই থলির মত এককের নাম অ্যাকিনি বা ফলিকল ফলিকলগুলি ঘনতলীয় আবরণীকলায় (cuboidal cells) কোষের প্রাচীরের ন্যায় সজ্জার ফলে তৈরি হয়। ফলিকলগুলির অভ্যন্তর দিকে রক্তাভ প্রোটিনযুক্ত ঘন কলয়েডে পরিপূর্ণ থাকে। থাইরয়েড গ্রন্থির নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কলয়েডের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে যায়। আবরণীকলার কোষগুলি আয়তনে হ্রাস পেয়ে আয়তকার হয়। স্বাভাবিক সক্রিয় অবস্থায় ফলিকলের প্রাচীরের ঐ আবরণী কোষগুলি ঘনতলীয় থাকে ও কলয়েডের পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলিকলকে বেষ্টন করে চতুষ্পার্শ্বে রক্তবাহ ও অন্যান্য সংযোজক কলা, প্যারাফলিকুলার কোষ প্রভৃতি থাকে (চিত্র—1 A ও B)।

থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হরমোনের মধ্যে থাইরক্সিন ও ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন ও থাইরো-ক্যালসিটোনিন সর্বপ্রধান, প্রথম দুটি হরমোনই সংশ্লেষিত হয় কলয়েডে টাইরোসিন নামক জটিল জৈব অণুর আয়োডিভবন (iodination) ও কনডেনশেসন (condensation) হওয়ার ফলে। থাইরোক্যালসিটোনিন নামক হরমোনটি প্যারাফলি-কুলার কোষ থেকে রক্তবাহে ক্ষরিত হয়। থাইরক্সিন ও ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন হরমোন দুটির কোনটিই কলয়েডে সংশ্লেষিত হওয়ার পর মুক্ত অবস্থায় থাকে না। ফলিকলের আবরণী কোষগুলিতে তৈরি হয় থাইরোগ্লোবিউলিন নামক আয়োডিন সমৃদ্ধ গ্লাইকোপ্রোটিন। প্রায় 670,000 আণবিক ওজন সম্পন্ন এই যৌগ আবরণী কোষ থেকে ক্ষরিত হয়ে কলয়েডে সঞ্চিত হয়। এই হরমোনদ্বয় এই গ্লাইকো-প্রোটিনের সাথে পেপ্‌টাইড বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ হয়ে রক্তে ক্ষরিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অস্থায়ী যৌগ রূপে অবস্থান করে। রক্তে ক্ষরিত হওয়ার পূর্বে প্রোটিন বিশ্লেষক উৎসেচকের প্রভাবে উভয় হরমোনই থাইরোগ্লোবিউলিন থেকে বিযুক্ত হয়ে মুক্ত অবস্থায় রক্ত দ্বারা বাহিত হয়।

থাইরক্সিন ও ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন উভয়েই আয়োডোথাইরোনিন—থাইরক্সিন। যেখানে রাসা-য়নিক প্রকৃতিতে টেট্রাআয়োডোথাইরোনিন সেখানে অন্যটি ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন। নিম্নে এদের রাসায়নিক গঠন দেওয়া হলো। অক্সফোর্ড ইউনিভার-

I(3') I(3)

OH–⟨ ⟩–O–⟨ ⟩–CH_2–CH–C–OH (CH–NH_2; C=O)

I(5') I(5)

থাইরক্সিন

I(3') I(3)

OH–⟨ ⟩–O–⟨ ⟩–CH_2–CH–C–OH (CH–NH_2; C=O)

I(5)

ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন
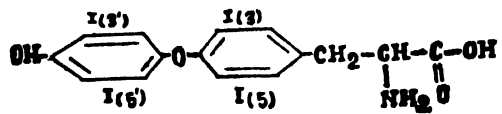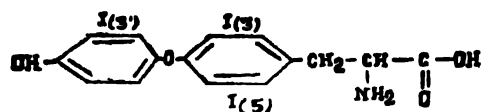
সিটির সি. আর হ্যারিংটন্ 1937 সালে সর্বপ্রথম থাইরক্সিনের রাসায়নিক গঠন উদ্ঘাটন করেন।

থাইরক্সিন গ্রন্থির হরমোনগুলির ক্ষরণ, গ্রন্থটির পরিস্ফুরণ, বৃদ্ধি প্রায় সম্পূর্ণভাবে অগ্র-পিটুইটারী গ্রন্থি-নিঃসৃত থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোনটির (T.S H) অন্তক্ষরীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত। অবশ্য থাইরয়েড হরমোনের ক্রিয়ার উপর পরোক্ষভাবে থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোনের ও অগ্র-পিটুইটারীর অন্যান্য হরমোনের ক্ষরণ কিছুটা নির্ভরশীল, (এই ধরণের পারস্পরিক নির্ভরশীল নিয়ন্ত্রণকে Feed back inter play বলা হয়)।

থাইরক্সিন ও ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন শ্বসনে (ক্রেবস চক্রে) সংশ্লিষ্ট জারক উৎসেচকের সংশ্লেষ বা তাদের কার্যকলাপ ত্বরান্বিত করে কোষীয় বিপাকের হার বৃদ্ধি করে। ফলে কোষ কর্তৃক গৃহীত অক্সিজেনের মাত্রা ও দেহের তাপ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সম্ভবতঃ কোষের মাইটোকনড্রিয়ার (শক্তিঘর—power house) ও কোষীয় পর্দার ভেদ্যতাজনিত কার্যকলাপ প্রভাবিত করে, এই হর্মোনদ্বয়ের প্রভাবে শর্করা, ফ্যাট প্রভৃতির বিপাক হার বৃদ্ধি পায় ও নাইট্রোজেনের রেচনের হার বৃদ্ধি পায়, এছাড়া থাইরোক্যালসিটোনিন রক্তের ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমিয়ে অস্থির বৃদ্ধিতে সাহায্য

করে। কাজেই প্রাণীর বৃদ্ধিতে এই গ্ল্যাণ্ড কর্তৃক নিঃসৃত হরমোনের প্রভাব অনস্বীকার্য। এই হরমোনগুলির প্রভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিপাকের অনুযায়ী খাদ্যগ্রহণ না করা হলে স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। থাইরয়েড হরমোন সংশ্লেষে এবং থাইরয়েড গ্রন্থির অন্যান্য স্বাভাবিক ক্রিয়া বজায় রাখতে প্রচুর আয়োডিন-এর প্রয়োজন হয়। তাই খাদ্যে আয়োডিনের পরিমাণ কমে গেলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। থাইরক্সিন বা ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন-এর স্বল্প প্রয়োগে কিছু কিছু কলার কোষে প্রোটিন সংশ্লেষের হার বৃদ্ধি পায়। এই হরমোনদ্বয়'ক হৃদস্পন্দন ও অন্যান্য পেশীর সংকোচন হার বৃদ্ধিকারী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এরা কোলেস্টেরল সংশ্লেষ ও যকৃতীয় কার্যাবলীর উদ্দীপন দ্বারা রক্তরস থেকে কোলেস্টেরল দূরীকরণ—এই বিপরীতধর্মী উভয় কার্যাবলী প্রভাবিত করে দেহে কোলেস্টেরলের সাম্যাবস্থা বজায় রাখে। এছাড়া থাইরয়েড হরমোন লোহিত কণিকার পূর্ণতাপ্রাপ্তিতে, বহিরাগত সংক্রমণ ও বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে দেহের প্রতিরোধ্যতা (immunity) সৃষ্টিতে সাহায্য করে। শুক্রাণু উৎপাদন প্রক্রিয়া (spermatogenesis) ও অন্যান্য যৌনতাসম্পর্কিত কার্যাবলীও থাইরয়েড হরমোন দ্বারা প্রভাবিত হয়।

শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণীদের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ উভচরদের ক্ষেত্রে থাইরয়েড হরমোনের একটি বিশেষ কার্য হলো লার্ভা থেকে পূর্ণাঙ্গপ্রাণীতে রূপান্তরে (metamorphosis) সাহায্য করা। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বেনেট. এম একেন একটি ব্যাঙাচির দেহ থেকে (tadpole larva) থাইরয়েড গ্রন্থি বাদ দেন এবং দেখান যে ঐ ব্যাঙাচির আকারে কিছু বৃদ্ধি হলেও পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে রূপান্তর ঘটে না। কিন্তু পরে যদি থাইরক্সিন হরমোন প্রয়োগ করা হয় শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে রূপান্তর ঘটে।

থাইরয়েড হরমোনের অল্পক্ষরণে বিপাকজনিত অপচিতির হার প্রয়োজন অনুসারে হ্রাস পাওয়ায় শিশুদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে ক্রেটিনিজম্ রোগ হয়। এই রোগে শিশুরা বামনত্ব লাভ করে, থাইরয়েড নিঃসৃত হর্মোন মস্তিষ্কের পরিস্ফুরণে বড় ভূমিকা নেয়, তাই স্বভাবতঃই রোগে আক্রান্ত শিশু জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয় জিব মোটা হয়ে কথা জড়িয়ে যায়, মুখ দিয়ে লালা ঝরে, চোখ দুটিতে ফুটে ওঠে নির্বোধ দৃষ্টি। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ যারা মুখ্যবৃদ্ধিকাল পেরিয়ে গেছে) এই হরমোনের অভাবে দেহে অতিরিক্ত চর্বি জমে, ত্বকের নীচে একপ্রকার অর্ধতরল পদার্থ জমে দেহ স্থূল ও ওজন বৃদ্ধি হয়। মুখে ভাবলেশহীন জড়বুদ্ধির ছাপ পড়ে, বিপাকীয় হার কমায় দেহের উষ্ণতাও কমে যায়। রোগী মানসিক, দৈহিক অবসাদগ্রস্ত, স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। বড়দের এই রোগকে বলা হয় মিক্সিমিডা বা গলবর্ণিত রোগ।

খাদ্যে থাইরয়েড গ্রন্থি কর্তৃক প্রয়োজনীয় আয়োডিনের অভাব ঘটলে গ্রন্থিতে পূর্ববর্ণিত নিষ্ক্রিয় অবস্থার সৃষ্টি হয়, গ্রন্থিটি আকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে, গ্রন্থির এই বৃদ্ধিকে বলা হয় গলগণ্ড (goitre)। (খাদ্যে আয়োডিনের অভাব বস্তুতঃ অতিরিক্ত T.S.H নিঃসরণ প্রবৃত্ত করে গ্রন্থির এই নিষ্ক্রিয় অবস্থার সৃষ্টি করে। তাই অন্য কোন কারণে T. S. H ক্ষরণ বৃদ্ধি পেলেও গলগণ্ড হতে পারে)। আয়োডিন অভাবহেতু থাইরয়েড হরমোন ক্ষরণ হ্রাস পাওয়ায় T. S. H ক্ষরণ বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রন্থির নিষ্ক্রিয় স্ফীত অবস্থায় যে রোগ হয় তাকে 'গ্রেভবর্ণিত রোগ (Grave's disease) বলে। এই রোগে শরীরের বিপাকীয় হারের বৃদ্ধি, শরীরের ওজন হ্রাস, হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি এবং নেত্রপল্লবের সংকোচন প্রভৃতি লক্ষণ পরিস্ফুট হয়।

থাইরয়েড গ্রন্থি তার নিঃসৃত হরমোনের সরাসরি কার্য দ্বারা এবং অন্য গ্রন্থির হরমোন নিঃসরণে প্রভাব সৃষ্টি দ্বারা স্তন্যপায়ীর দেহে জৈব-রাসায়নিক সাম্যাবস্থা সৃষ্টিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বর্তমানে তাই সুধীসমাজ এর সম্বন্ধে সাধারণ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে সচেষ্ট।

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

ময়ূর

রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়*

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, শিল্প ও কাব্যে যে পাখিটি আপন রূপমাধুর্যে বিশেষ গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে সেটি হল ময়ূর যার মস্তকে ভারতের জাতীয় পক্ষির মুকুট শোভিত হচ্ছে। জংলী মোরগ, ফেসাণ্ট, প্যাট্রিজ ও কোয়েল প্রভৃতি শস্যবীজ বা দানাভুক 'গ্যালিফরমেস' বর্গভুক্ত পাখিদের সঙ্গে ময়ূর জন্মসূত্রে আবদ্ধ হলে ও আপন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। দৃঢ় নাতিবৃহৎ পদদ্বয়, কঠিন চঞ্চু, বৃত্তাকার পক্ষ, শক্ত নখর এবং সর্বোপরি পেখম—ময়ূরের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। প্রাচ্যদেশের নিজস্ব সম্পদ ময়ূরের আদিনিবাস ছিল ভারতবর্ষ, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, জাভা প্রভৃতি দেশে। যদিও বর্তমানে পৃথিবীর সবদেশেই ময়ূর তার আধিপত্য বিস্তার করেছে। গভীর অরণ্য ও পর্বতের সানুদেশে ময়ূর যূথবদ্ধভাবে বাস করে এবং এক একটি দলে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশটি পাখি থাকে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকালে এক ইংরাজ শিকারীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে কখনো কখনো সহস্রাধিক ময়ূরও একটি দলে থাকতে পারে। সাধারণতঃ এরা রাত্রে বৃক্ষশাখায় ঘুমোয় এবং প্রত্যুষে ও প্রদোষে সমবেতভাবে উচ্চরোলে বনভূমি সচকিত করে। স্বাভাবিক খাদ্য শস্যদানা ও

*প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা-700009

ভুট্টাবীজ প্রভৃতি ময়ূর সংগ্রহ করে শস্যক্ষেত থেকে, তবে বিভিন্ন ধরনের কীট-পতঙ্গ, ছোট ছোট সরীসৃপ এমন কি সাপেও এদের অরুচি নেই। রাজস্থান ও গুজরাটের অনেক গ্রামে ময়ূর গৃহপালিত পাখি হিসাবে বাস করে এবং দেখা গেছে মাঠে সদ্যবপন করা শস্যবীজ ধ্বংস করে কৃষিকার্যেরও এরা যথেষ্ট ক্ষতি করে।

ময়ূরের কদর তার অপরূপ পুচ্ছের জন্য। নৃত্যরত শিখিপুচ্ছের বর্ণসুষমাকে কবি বলেছেন ঈশ্বরের মহিমা বা 'গ্লোরি অব্ গড্'। কবিগুরু হৃদয়াবেগের সার্থক প্রকাশ দেখেছেন ময়ূরের নৃত্যছন্দে—'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে। শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মত করেছে বিকাশ, আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচেরে॥' প্রকৃতিবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সবুজ, সোনালী, নীল, ব্রোঞ্জ ও বেগুনী বর্ণসমাহারে গঠিত ও বহু 'চক্ষু'যুক্ত দেহের পশ্চাদভাগ ময়ূরপুচ্ছ বা পেখম নামে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি অতিদীর্ঘ পালকের সমষ্টিমাত্র যা পুচ্ছকে ঢেকে রাখে। ময়ূরের আসল পুচ্ছ আকারে খুবই ছোট, সাত আট ইঞ্চি লম্বা শক্ত পালক দিয়ে তৈরী। এই পালকগুলি ময়ূরের পেখম বা পুচ্ছাবরণকে অর্ধবৃত্তাকারে মেলে ধরে। ময়ূর শাবকের দু'বছর বয়সে প্রথম পেখম দেখা যায় এবং পূর্ণবয়স্ক ময়ূরের পেখম পঞ্চান্ন থেকে বাহাত্তর ইঞ্চি লম্বা হতে পারে। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের শেষে পেখম ঝরে যায় এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আবার গজায়। কলাপের উপর রামধনুর বর্ণালীযুক্ত হৃদপিণ্ডাকৃতি ছাপগুলির সঙ্গে বিকশিত নয়নের অদ্ভুত সাদৃশ্য প্রকৃতির শিল্পনৈপুণ্যের অপূর্ব নিদর্শন সন্দেহ নেই কিন্তু প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা এই অনুকৃতি নিছক সৌন্দর্যের প্রকাশ বলে মেনে নেন নি। অনেক মাছের লেজে ও পাখ্নায় এবং কয়েকটি নখের ডানাতেও কোন কোন স্তন্যপায়ীদের শরীরে ড্যাব্ডেবে চোখের ছাপ আছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, শত্রুকে ভয় দেখানো ও ধোঁকা দেওয়ার জন্যই বিস্ফারিত নয়নের ছাপ পড়েছে দেহের অন্যস্থানে প্রকৃতির কূটকৌশলে। এমন কি চোখ পাকালে অনেক মানুষও ভয় পায়। মোটর গাড়ির জ্বলজ্বলে চোখের মত দুটো 'হেডলাইট' শুধু রাস্তা দেখার জন্য নয়, ভয় দেখানোর জন্যও বটে। মানুষের মাথায় এই মতলবটা এসেছে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে।

ময়ূরীর তার সহচরের মত কোন কলাপ নেই যদিও ময়ূরের মত তার মাথায় ঝুঁটি আছে। ময়ূরীর কণ্ঠদেশে গাঢ় পিঙ্গল ও ধাতব সবুজ বর্ণের অপরূপ মিশ্রণ-এর অনুকরণে শিল্পীরা সৃষ্টি করেছেন ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি। হারেম প্রথার প্রচলন আছে ময়ূর সমাজে এবং এক একটি হারেমে তিন থেকে ছয়টি ময়ূরী থাকে। পূর্বরাগের সময় ময়ূর তার সুন্দর পেখম বিস্তার করে ময়ূরীদের আসনে নৃত্য করে কিন্তু ময়ূরীরা তাদের গৃহস্বামীর নৃত্যকলার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখায় না, বড়জোর দু'একবার চোখ মেলে দেখে! বিহঙ্গজগতে অনেক পাখি নৃত্যে সুপটু কিন্তু ময়ূরের দক্ষতা অতুলনীয় বলা যায়। নীল আকাশে যখন বাদল মেঘের লুকোচুরি খেল তখন কদমতরুতলে দুটি ময়ূরের দ্বৈতনৃত্য নান্দনিক সৌন্দর্যের মূর্ত প্রকাশ বলে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন। আদিবাসীদের রুম্বা নৃত্যের আঙ্গিকও ময়ূরের যুগ্ম নৃত্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

কেবলমাত্র রঙের বাহার নয়, তীক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি ও প্রখর শ্রবণশক্তি এবং স্বাভাবিক চাতুর্যের জন্যও

ময়ূর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। ময়ূরশিকারীরা বলেছেন, কদাচিৎ ময়ূরকে অসতর্ক অবস্থায় দেখা যায়, সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ ঘটলেই চুপি চুপি গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। ময়ূরকে অরণ্যের প্রহরী বললেও অত্যুক্তি হয় না, বাঘ, বন্যকুকুর, শৃগাল ও অন্য কোন হিংস্র জন্তুজানোয়ার দেখলেই এরা কেকারবে সকলকে সতর্ক করে দেয়। কলাপে বর্ণের উচ্ছ্বাস থাকলেও কেকারবে নেই কোন শ্রুতিমাধুর্য; উচ্চগ্রামে বাঁধা অত্যন্ত কর্কশ 'মে—অ' স্বর দেহসুষমার সঙ্গে অত্যন্ত বেমানান। কি ছিল বিধাতার মনে কে জানে। অন্যান্য পাখির মত ময়ূরও উড়তে পারে তবে গুরুভার দেহ ও দীর্ঘ পুচ্ছাবরণের জন্য স্বচ্ছন্দে উপরে উঠতে পারে না তবে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মাটিতে দৌড়তে পারে। প্রজনন ঋতুতে ময়ূরী মাটিতে গর্ত খুঁড়ে শুষ্ক লতাপাতার আড়ালে তিন থেকে পাঁচটি হাল্কা বাদামী রঙের ডিম পাড়ে এবং নভেম্বর মাসের শেষে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয় এবং এই শাবকগুলি পাঁচমাস পর্যন্ত বাসার মধ্যে সঞ্চিত শস্যাদি খেয়ে বড় হয়।

প্রাণীবিজ্ঞানীরা ময়ূরের কুলজী প্রসঙ্গে বলেছেন যে পক্ষিশ্রেণীর গ্যালিফরমেস্ বর্গভুক্ত (Galliformes) ফ্যাসিয়ানিডি (Phasianidae) গোত্রবিশিষ্ট প্যাভোগণের (Genus Pavo) তিনটি প্রজাতি আছে। ভারতবর্ষ ও শ্রীলংকায় পাওয়া যায় নীল-বক্ষ ময়ূর (Pavo cristatus) এবং ব্রহ্মদেশে, জাভায় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাস করে সবুজ-বক্ষ ময়ূর (Pavo spicifer)। কালোময়ূর ও সাদাময়ূর ক্রিস্টেটাস প্রজাতির প্রকার ভেদমাত্র। 1936 খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার কঙ্গোতে তৃতীয় একটি প্রজাতি আবিষ্কৃত হয় এবং এর নাম দেওয়া হয়েছে কঙ্গোময়ূর বা অ্যাফ্রোপ্যাভো কন্‌জেনসিস্ (Afropavo congensis)। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, চীন ও তিব্বতের ফেসাণ্ট (Pheasant) পাখিদের সঙ্গে ময়ূরের আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে ফেসাণ্ট থেকেই ময়ূরের উৎপত্তি হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতে ময়ূর সগৌরবে বাস করবে এবং পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ থেকেই ময়ূরের বিশ্বপরিক্রমা শুরু হয়। প্রাচীন ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় যে, আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট (356-323 খৃঃ পূঃ) স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় ভারতবর্ষ থেকে দু'শো' ময়ূরও গ্রীসে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে। পরবর্তীকালে গ্রীস থেকে ময়ূর পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করে এবং সবশেষে ময়ূর আমেরিকা জয় করে।

ভারতের জাতীয় পাখি নীলময়ূর শিকার ভারত সরকার আইনতঃ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও লোকাচারেও ময়ূর বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। দেবসেনাপতি কার্তিকের বাহনরূপে ময়ূরও পূজিত হয়। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কেবলমাত্র ময়ূরের রূপলাবণ্যে বিমোহিত হয়ে পার্বতীনন্দন কার্তিকের বাহন হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন বলে মনে হয় না। সর্প ভক্ষণের পারদর্শিতার জন্য সাপের দেশ ভারতবর্ষে ময়ূর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল বলেই সম্ভবতঃ কার্তিকের কল্পনার সঙ্গে ময়ূরের মিলন ঘটিয়েছেন প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ এবং সাপকেও রেখেছেন। ভারতবর্ষে ব্যাপকহারে ময়ূর শিকার হয় নি, যদিও ময়ূর শিকারীরা বলেন যে ময়ূরের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। প্রাচীনকালে রোমের অধিবাসীরা যে ময়ূর ভক্ষণ করতো তার কিছু বিবরণ পাওয়া গেছে।

ময়ূরের চেহারাটি যেমন, তার স্বভাব চরিত্র ও বেশ নম্র এবং খুব সহজেই পোষ মানে। খৃষ্টীয়

প্রথম শতাব্দীর প্রখ্যাত রোমীয় ঐতিহাসিক প্লিনির বিবরণ থেকে জানা গেছে যে সে সময় রোমদেশের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে ময়ূর সগৌরবে বিচার করতো এবং সম্মানের প্রতীক হিসাবে গণ্য হত। ভারতেও সব রাজা মহারাজাদের প্রাসাদেও ময়ূর শোভাবর্ধন করতো। মোগল সম্রাট সাজাহান ময়ূরের অপরূপ সৌন্দর্যের মোহিত হয়ে বিশ্ববিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন।

ময়ূরের বিভিন্ন দেশের পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। বন্দী অবস্থাতে চিড়িয়াখানা ও পক্ষিনিবাসেও বহাল তবিয়তে বাস করে এবং বংশবৃদ্ধি করতে পারে। প্রকৃতিপ্রেমিক এলিয়াস বলডুইন 1870 খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার আরকেডিয়াতে মাত্র তিনজোড়া ময়ূর-ময়ূরী নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বছর চল্লিশ পরে তা দু-হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ময়ূরের মনের অনেক গোপন খবরও জেনেছেন প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা। ব্রংকস্ প্রাণীনিবাসের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে যে চিড়িয়াখানার লুসিফার নামে একটি ময়ূর জেরালডিন নামে একটি কৃষ্ণকায় কচ্ছপের প্রেমে পড়েছিল। পশুশালার অধ্যক্ষ অসওয়াল্ড লিখে গেছেন যে জেরালডিনকে দেখতে পেলেই লুসিফার তার পেখম তুলে বন্ধুর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচত। শুধু তাই নয়, অন্য কোন ময়ূরকে জেরালডিনের কাছে যেতে দিত না এবং তার সঙ্গে ঝগড়া করত। পক্ষিপর্যবেক্ষণে মহাকবি কালিদাসের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঋতু-সংহার কাব্যে 'বর্ষা-বর্ণনা' প্রসঙ্গে ময়ূরের রূপ বর্ণনা করেছেন মহাকবি, ময়ূরকে বলেছেন 'শুক্লাপাঙ্গ' কারণ ময়ূরের চোখের রঙ বাদামি কিন্তু চোখের চারিপাশে আছে একটি শ্বেতবৃত্ত। পাখি হিসাবে ময়ূর অতুলনীয়, অনুপম তার সৌন্দর্য। মানুষের মনে রয়েছে সুন্দরের প্রতি চিরন্তন আকুতি, তাই বারবার সেই শিল্পস্রষ্টাকে প্রণাম জানায়।

মডেল তৈরি

লোড শেডিং-এ আলো

প্রদীপ ব্যানার্জী, বিজয় বল,
অনুলেখন—জগন্ময় গুইন্

আমরা এটা দেখতে অভ্যস্ত যে লোড শেডিং হলেই অন্ধকার, তাহলে লোড শেডিং-এ আলো আবার কি ? হ্যাঁ কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। আমাদের হাতে-কলমে এর ক্ষুদে মুশকিল আসবান-কারীরা এগিয়ে এসেছে একটা সমাধান নিয়ে। তাই একথা স্বীকার করেই বলছি এটা অনুলেখন, নিজস্ব নয়, এটা তাদের।

এই মডেলটার জন্য চাই—ইনসুলেটেড তার, গ্লিসারিন, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, স্পিরিট ল্যাম্প, পাতলা ধাতব পাত্ (টিনের), কাঠের দণ্ড ও তক্তা, 100W ল্যাম্প, সুইচ, ছোট লোহার টুক্রো।

আমাদের কি করতে হবে—প্রথমে কাঠের তক্তার উপর একটা কাঠের দণ্ডকে আটকে নিতে হবে। ঐ দণ্ডটার উপর দিকে অপর একটি কাঠের দণ্ডের সাথে তড়িৎ-চুম্বকটি আটকানো হলো। দ্বিতীয় কাঠের
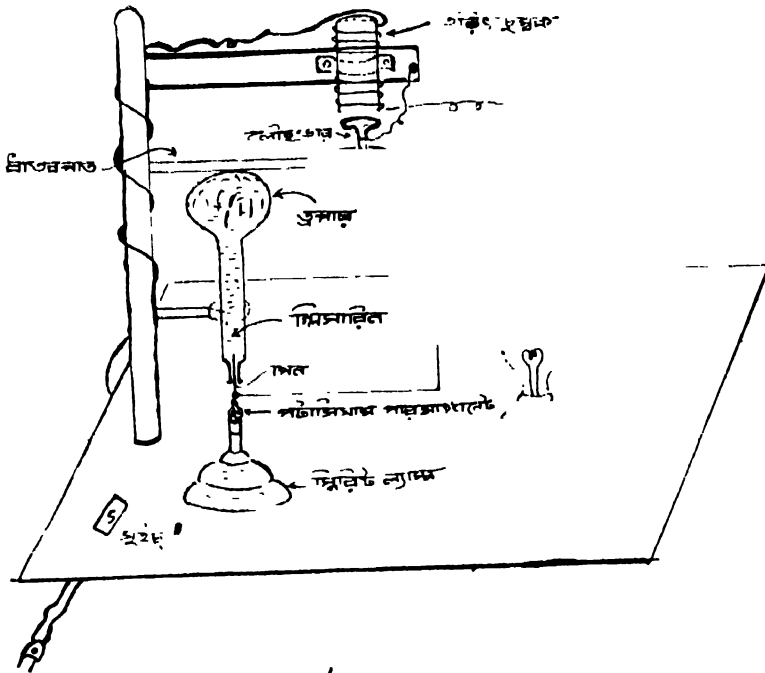
দণ্ড-এর গায়ে ছোট লোহার টুক্রোটি ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। ছবিতে দেখানো হয়েছে। অনুরূপে ধাতব পাতলা পাতটি লাগানো হলো। ধাতব পাতের নীচে ড্রপারটিকে একটি হোল্ডার দিয়ে আটকানো হলো।

ধাতব পাতের পাশ থেকে একটি অল্প শক্ত তার দিয়ে তৈরী একটি পিন দিয়ে ড্রপার-এর মুখটি আটকানো হলো (ছবির মত)। ড্রপার-এর নীচেই বসানো আছে একটি স্পিরিট ল্যাম্প তার মুখে অল্প একটু পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দেওয়া আছে। এরপরে তড়িৎ-চুম্বকটিকে 100W ল্যাম্প-এর সাথে সিরিজ কানেকশন করতে হবে এবং সুইচ-এর মাধ্যমে মেন-এর সাথে যোগ করতে হবে।

যখন বিদ্যুৎ থাকবে, তখন আলো জ্বলবে, তড়িৎ-চুম্বক-এর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে, (কারণ ল্যাম্প ও তড়িৎ-চুম্বক সিরিজ কানেকশনে লাগানো আছে)। তার জন্য তড়িৎ-চুম্বক-এর আকর্ষণের ফলে লোহার ভারটি উপরে ওঠে থাকবে। যখন লোডশেডিং হবে তখন লোহার ভারটি আর আকর্ষিত হবে না তার ফলে ভারটি নীচে পড়ে যাবে এবং ধাতব পাতটির উপর চাপ পড়বে এবং চাপ সংবাহিত হবে ড্রপারের মাথায় এবং ড্রপারের মুখের পিনটিতে। ড্রপারের মাথায় চাপ পড়ার ফলে ড্রপারের মধ্যেকার গ্লিসারিন নীচে পড়ে যাবে এবং একই সময়ে ড্রপারের মুখের পিনটি খুলবে। গ্লিসারিন-এর ফোটাগুলি স্পিরিট ল্যাম্পের পলতের উপর পড়বে এবং ওখানে রাখা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সাথে একটা দ্রবণ তৈরি করবে এবং যার ফলে উদ্ভূত তাপ স্পিরিট ল্যাম্পের পলতে বেয়ে-ওঠা স্পিরিটে আগুন ধরিয়ে দেবে। আগুন ধরতে দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড সময় লাগে।

ফরমিক অ্যাসিড ও আয়না-পরীক্ষা

অমিয়কুমার ঘাঁটা*

পিঁপড়ে, মৌমাছি, বোলতার হুলে ও বিছুটি পাতার রোমে থাকে এক ধরনের অম্ল (acid) যার নাম হলো ফরমিক অ্যাসিড (HCOOH)। এরই উপস্থিতির জন্য পিঁপড়ে, মৌমাছি ও বোল্‌তোর দংশনে যন্ত্রণা বা প্রদাহের সৃষ্টি হয়। এমনকি খালি অ্যাসিড দেহের কোথাও পড়লে ফোস্‌কা পড়ে যায়। অ্যাসিড এমনই মারাত্মক। মৌমাছি, বোল্‌তা হুল ফোটাবার সময় কিছুটা ফরমিক অ্যাসিড (formic acid) ইনজেকশন করে দেয় ফলে ঐরূপ তীব্র প্রদাহের সৃষ্টি হয়। ফরমিক অ্যাসিড এক ধরণের ফ্যাটি অ্যাসিড (fatty acid), কিন্তু অন্যান্য ফ্যাটি অ্যাসিডের সঙ্গে এর মূল তফাৎ হলো—এর তীব্রতা একটুখানি বেশী। তবে অজৈব (inorganic) অম্লের তুলনায় অনেকখানি মৃদু। অর্থাৎ অজৈব ও জৈব (organic) অম্লের মধ্যে তীব্রতার দিক থেকে ফরমিক অ্যাসিডের স্থান মাঝামাঝি। মজার ব্যাপার—এই ফরম্যাল ডিহাইড-এর জারণ ঘটিয়ে একদিকে যেমন এই ফরমিক অ্যাসড তৈরি করা হয় উল্টোদিকে তেমনি এই অ্যাসিডের বিজারণ ঘটিয়ে ফরম্যাল ডিহাইড (HCHO) পুনরায় ফিরে পাওয়া সম্ভব। একই ভাবে অক্সালিক অ্যাসিড (oxalic acid) থেকে যেমন একে তৈরি করা যায়—তেমনি এ থেকেও অক্সালিক অ্যাসিড তৈরি করা সম্ভব।

ফরমিক অ্যাসিড-এর সাহায্যে একটা বেশ মজার পরীক্ষা করা যেতে পারে। তার জন্য দরকার একটা মাত্র পরীক্ষানল (test tube), জলপূর্ণ বিকার একখানা, কিছুটা কাপড় কাচা সোডা (NaOH), অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড ও সিলভার নাইট্রেট ($AGNO_3$)-এর জলীয় দ্রবণ। বাড়ীতে বসেও এই পরীক্ষা অনায়াসে করা যায়। তবে সে ক্ষেত্রে বিকারের বদলে একটা টিনের গ্লাসেও কাজ চলতে পারে; আর বুনসেন দীপের বদলে উনুন তো রয়েছে।

এবার পরীক্ষাটা কেমনভাবে করতে হবে—সেটাই বলি:—প্রথমে পরীক্ষানলটা প্রথমে খালি পাতিত জল (সাধারণ জলও চলবে) ও পরে সোডার জলীয় দ্রবণের সাহায্যে বেশ ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপর সামান্য কয়েক সি. সি. (cc=ml) সিলভার নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণ নলের মধ্যে নিয়ে তার সঙ্গে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড (NH_4OH)-এর দ্রবণ ঢালতে হবে আর একই সঙ্গে নাড়াতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ দ্রবীভূত হয়ে যায়। এবার সমপরিমাণ ফরমিক অ্যাসিড উক্ত মিশ্রণের সঙ্গে যোগ করতে হবে। এরপর একটা টিনের গ্লাসে খানিকটা জল নিয়ে জ্বলন্ত উনুনের ওপর বসিয়ে দিতে হবে। জলটা যখন ফুটতে শুরু করে দেবে - পরীক্ষানলটাকে তখন গ্লাসের মধ্যে খাড়াভাবে ডুবিয়ে রাখতে হবে। কয়েক মিনিট বাদে দেখা যাবে নলটার যতটা পর্যন্ত মিশ্রণ ভর্তি ছিল ততটা জায়গা ঘিরে নলের ভিতরের দেয়ালে উজ্জ্বল, চক্‌চকে একটা পদার্থ জমে উঠেছে—

*নোতুক বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, নোতুক, জেলা-মেদিনীপুর

যেটা দেখতে ঠিক আয়নার কাচের মতই। আসলে ঐ চক্‌চকে পদার্থটা হলো সিলভার (silver) বা রুপা ; এইভাবে বাড়ীতে বসেও রুপা তৈরি করা যায়।

এই পরীক্ষাটির নাম হলো আয়না পরীক্ষা (mirror test) আর এই আয়না পারদ দিয়ে তৈরী নয়—এ হল রুপার আয়না—কাজেই খরচটা একটু বেশী পড়বে।

উল্লেখ্য যে, অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড সরাসরি অ্যামোনিয়া থেকেও তৈরি করা যায়। অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড ও সিলভার নাইট্রেটের বর্ণহীন দ্রবণকে এককথায় বলা হয় টোলা বিকারক (Tollen's reagen) আর কেবল ফরমিক অ্যাসিডই নয়—উপরন্তু ফরম্যালডিহাইড, অ্যাসিটাল ডিহাইড, এমন কি গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ থেকেও অনুরূপ আয়না-পরীক্ষা করা সম্ভব।

ভেবে কর

অনন্ত কুমার ঘোষ*

নীচের প্রশ্নগুলির তিনটি করে উত্তর দেওয়া আছে। যেটি সঠিক তার পাশে ✓ চিহ্ন দাও।

1. 1 H.P কত ওয়াটের সমান ?

উঃ (a) 476 watts, (b) 550 watts, (c) 746 walts.

2. 100°C তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ বাষ্পীয় চাপ হয়

(a) 0, (b) 100, (c) 1000

3. লেঞ্জের সূত্র কোন কোন্ সংরক্ষণ সূত্রকে মেনে চলে ?

(a) শক্তি, (b) ভর, (c) মাত্রা

4. ইলেকট্রিক ল্যাম্পের আবিষ্কারকের নাম

(a) জুল, (b) জেলটার, (c) এডিসন

5. একটি বলকে অনুভূমিক তলের সঙ্গে কত কোণে শট করলে বলটি সর্বোচ্চ দূরত্ব অতিক্রম করবে ?

(a) 30°, (b) 450°, (c) 0°

6. ইলেকট্রনের ভর হয়

(a) নিউট্রনের 2000 ভাগের 1 ভাগ

(b) 9×10^{-27}gm. (c) 0

7. সিলভার ক্লোরাইড কখন বিশ্লেষিত হয় ?

(a) জলে দ্রবীভূত করলে

*বিপ্রদাস পালচৌধুরী ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি, যন্ত্র-বিভাগ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

(b) সূর্য আলোকে মুক্ত অবস্থায় রেখে দিলে

(c) তাতে চাপ সৃষ্টি করলে।

8. এক খণ্ড রক্ততপ্ত কাচকে যখন অন্ধকার ঘরে উত্তপ্ত করা হয় তখন তার বর্ণ দেখায়

(a) সাদা, (b) অদৃশ্য (c) লাল।

9. মোটরগাড়ীতে চালকের পার্শ্বেতে যে দর্পণ ব্যবহৃত হয় তা

(a) উত্তল দর্পণ, (b) সমতল দর্পণ, (c) অবতল দর্পণ।

10. কোন্ তাপের তাপমাত্রা বর্ধন হয় না ?

(a) আপেক্ষিক তাপ, (b) পুনঃশিলীভবন, (c) লীনতাপ

11. পারদের স্ফুটনাঙ্ক হয়

(a) 753°C, (b) 357°C, (c) 273°C

12. স্টীমইঞ্জিনের ক্ষমতা (efficiency) কত ?

(a) 10%, (b) 100% (c) 50%

13. একটি আদর্শ গ্যাস হয়

(a) যা তরলীভূত করা যায় না

(b) যা গ্যাসসূত্রকে মেনে চলে

(c) যা ঘরের তাপমাত্রায় গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে।

14. হঠাৎ ব্যারোমিটারের পাঠ কমে গেল। তা কিসের লক্ষণ ?

(a) সুন্দর আবহাওয়া, (b) ঝড়, (c) বৃষ্টি

15. অণুর গতির ফলে কি শক্তির উৎপন্ন হয় ?

(a) পৃষ্ঠটান, (b) তাপ, (c) গতিশক্তি।

16. হাঁতি কোন্ শ্রেণীর লিভার ?

(a) প্রথম শ্রেণী, (b) তৃতীয় শ্রেণী, (c) দ্বিতীয় শ্রেণী

17. পেনসিলের শিস্ কাটার সময় পেনসিলের সঙ্গে বেলেড কত ডিগ্রী কোণ করে ?

(a) 30°, (b) 60°, (c) 45°

(সমাধান 511 পৃষ্ঠায়)

মাতৃদুগ্ধ

সুদীপ্ত ঘোষ*

বর্তমান বৎসরটিকে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই বর্ষটিতে যথাযথভাবে পালন করার জন্য দেশের সর্বত্র শিশুদের জন্য আবৃত্তি, নৃত্যনাট্য, খেলাধূলা প্রভৃতির আয়োজন করা হচ্ছে। আয়োজন করা হচ্ছে আলোচনা সভা, সেমিনার প্রভৃতির। শিশুবর্ষের স্মারকে প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং শিশুবর্ষের উপর বিশেষ নিবন্ধ। উদ্দেশ্য—সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটানো। বর্তমান প্রবন্ধটি সেই একই উদ্দেশ্যে রচিত।

মাতৃক্রোড়ে শিশুরা মাতৃদুগ্ধ পান করে। সেই মাতৃদুগ্ধ ও তার কয়েকটি দিকে দিয়ে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচনাটি চারিটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—(ক) মাতৃদুগ্ধের উপাদান, (খ) মাতৃদুগ্ধের প্রভাব, (গ) মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা ও (ঘ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর মাতৃদুগ্ধের প্রভাব।

প্রথমে আমরা আলোচনা করব মাতৃদুগ্ধের উপাদান নিয়ে। সাধারণভাবে প্রচলিত চারিটি দুগ্ধের উপাদান ছকের সাহায্যে দেওয়া হলো।

চারিটি দুগ্ধের উপাদান

বিভিন্ন দুধের নাম	ভোজ্য অংশ%	জলীয় অংশ (গ্রাম)	প্রোটিন (গ্রাম)	স্নেহদ্রব্য (গ্রাম)	খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	কার্বোহাইড্রেট (গ্রাম)	শক্তি (কিলোক্যালরি)	ফসফরাস (মিলিগ্রাম)	লৌহ (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন 'এ' (i u).	থায়ামিন (মিলিগ্রাম)	রাইবোফ্লেভিন (মিলিগ্রাম)	নায়াসিন (মিলিগ্রাম)
গরুর দুধ	100	87·5	3·2	4·1	0 8	120	4·4	67	90	0 2	174	0·05	0·19	0·1
মহিষের দুধ	100	81·0	4·3	8·8	0·8	210	5·0	117	130	0·2	160	0·04	0·10	0·1
ছাগলের দুধ	100	86·8	3·3	4·5	0·8	170	4·6	72	120	0·3	182	0·05	0·04	0·3
মায়ের দুধ	100	88·0	1·1	3·4	0·1	28	7·4	65	11	—	137	0·02	0·02	—

উপরিউক্ত তথ্য থেকে প্রচলিত চারিটি দুগ্ধের উপাদানগত পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে। মাতৃদুগ্ধের আলোচনার জন্য এক বৎসর পর্যন্ত শিশুর উদাহরণ নেওয়া হচ্ছে। এই এক বৎসর সময়টিকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। (ক) 0—6 মাস এবং (খ) 6—12 মাস। নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে এই বয়সকাল দুটিতে কিরূপ গুণগত মানের খাদ্য প্রয়োজন হয়, তা বোঝা যাচ্ছে।

*চিনসুরা সায়েন্স ক্লাব, চুচুড়া, হুগলী

পুষ্টিকর পদার্থের দৈনিক প্রয়োজনীয়তা

শিশু অবস্থা	ক্যালরী	প্রোটিন (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (গ্রাম)	লোহ (মি.গ্রা)	ভিটামিন—'এ' রেটিনল (মাইক্রো-গ্রাম)	β-ক্যারোটিন (মাইক্রো-গ্রাম)	অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (মি.গ্রা)	ফোলিক অ্যাসিড (মাইক্রো-গ্রাম)	ভিটামিন 'বি'-12 (মাইক্রোগ্রাম)	ভিটামিন 'ডি' (i.e).
0-6 মাস	120/কি.গ্রা	2·5/কি.গ্রা	...	1·0/কি.গ্রা	400	—	30	25	0·2	200
7-12 মাস	100/কি গ্রা	1·8/কিগ্রা	0·5-0·6	—	300	1200	30	25	0·2	200

গরু, মহিষ ও ছাগলের দুধের তুলনায় মাতৃদুগ্ধে লৌহ ও নিয়াসিনের অভাব রয়েছে। সুতরাং, 0—6 মাস সময়কালে শিশুদেহে যে লৌহের প্রয়োজন হয়, তা ঔষধের মাধ্যমে প্রবেশ করাতে হবে। মাতৃদুগ্ধে প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য, খনিজ পদার্থ অন্যান্য দুগ্ধের তুলনায় কম থাকলেও মাতৃদুগ্ধে অন্যান্য দুধ অপেক্ষা কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ বেশী থাকে। মাতৃদুগ্ধ থেকে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ কম হলেও শিশুকালে তা যথেষ্ট বলে ধরা যেতে পারে। মাতৃদুগ্ধে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, থায়ামিনের পরিমাণ কম থাকে। অবশ্য মাতৃদুগ্ধে ভিটামিন 'সি' অন্যান্য দুধ অপেক্ষা বেশী পরিমাণে থাকে। এই ভিটামিন 'সি' অধিকমাত্রায় থাকার উপকারিতা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব।

এবার মাতৃদুগ্ধের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব। ওজন, বৃদ্ধি, বুদ্ধি, উচ্চারণ এই চারিটি বিষয়সাপেক্ষে মাতৃদুগ্ধের প্রভাব আলোচিত হবে। যেহেতু শিশুকালে মাতৃদুগ্ধই শিশুদের প্রধান খাদ্য তাই মাতৃদুগ্ধেরই প্রভাব বলে উল্লেখ করছি। প্রথমতঃ ওজনসাপেক্ষে প্রভাব। দেখা গেছে, জন্মের পর থেকে প্রথম দশদিন শিশুর ওজন হ্রাস পায়। দশদিনের পর প্রতিদিন 20 গ্রাম করে ওজন বৃদ্ধি পায় ছয় মাস পর্যন্ত। ছয় মাস থেকে এক বৎসর পর্যন্ত প্রতিদিন 10—15 গ্রাম করে ওজন বৃদ্ধি পায়, যদি একটি শিশু পর্যাপ্ত পরিমাণে মাতৃদুগ্ধ পায়। পর্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধের পরিমাণ হলো—প্রথম মাসে 3 আউন্স করে প্রতিবারে। একটি শিশুর দিনে পাঁচ ছয়বার দুগ্ধপান করা উচিত। অর্থাৎ দিনে মোট 15—18 আউন্স দুগ্ধ একটি শিশুর পক্ষে অপরিহার্য। অতঃপর পরবর্তী মাসগুলিতে 1 আউন্স করে বাড়াতে হবে প্রতিবারে। দ্বিতীয়তঃ বৃদ্ধিসাপেক্ষে প্রভাব। একটি স্বাভাবিক শিশুর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়।

(ক) তিন মাসে—ঘাড় সোজা করতে সক্ষম।

(খ) ছয় মাস থেকে সাত মাস—কারো সাহায্যে বসতে সক্ষম।

(গ) সাত মাস থেকে আট মাস—হাত ছেড়ে বসতে সক্ষম।

(ঘ) নয় মাস থেকে দশ মাস—পিছন দিকে ঘুরতে সক্ষম।

(ঙ) দশ মাস থেকে এগারো মাস—হামা দিতে সক্ষম।

(চ) এগারো মাস থেকে বারো মাস—ধরে দাঁড়াতে সক্ষম।

(ছ) বারো মাস থেকে—হাত ছেড়ে দাঁড়াতে সক্ষম এবং এক পা পা করে চলতে সক্ষম।

তৃতীয়তঃ বুদ্ধিসাপেক্ষে প্রভাব। বয়স বুদ্ধিতে নিম্নলিখিত ভাবে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে একটি স্বাভাবিক শিশুর ক্ষেত্রে।

(ক) জন্মের পর থেকে এক মাস—আলোর দিকে চোখ।

(খ) দু-মাস থেকে তিন মাস—চোখের সঙ্গে মাথা সঞ্চালন।

(গ) চার মাস থেকে পাঁচ মাস—হাতে খেলনা দিলে তাকিয়ে থাকা।

(ঘ) পাঁচ মাস থেকে ছয় মাস—পড়ে যাওয়া জিনিষের দিকে লক্ষ্য।

(ঙ) সাত মাস থেকে আট মাস—দূরে থাকা জিনিষ ধরতে সক্ষম।

(চ) নয় মাস থেকে দশ মাস—হাতে ধরা জিনিষ ফেলতে সক্ষম।

(ছ) দশ মাস থেকে এগারো মাস—অঙ্গুলি নির্দেশ করতে সক্ষম।

(জ) এগারো মাস থেকে বারো মাস—বাক্সের মধ্যে জিনিষ রাখা ও তোলা।

চতুর্থতঃ উচ্চারণসাপেক্ষে প্রভাব। উচ্চারণের ক্রমবিকাশ ঘটে নিম্নলিখিতভাবে।

(ক) আট মাস থেকে দশ মাস—বাবা, মামা প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ।

(খ) এগারো মাস থেকে বারো মাস—অর্থহীন কথা বলতে সক্ষম।

(গ) বারো মাস—সাধারণ আদেশ বুঝতে সক্ষম।

এবার মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক্। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, যেসব শিশু পর্যাপ্ত পরিমাণে মাতৃদুগ্ধ পায় তারা ছোঁয়াচে রোগের হাত থেকে সাধারণতঃ রক্ষা পায়। যেমন—হাঁচি, সর্দি, কাশি প্রভৃতি। আবার যারা পর্যাপ্ত পরিমাণে মাতৃদুগ্ধ পান করে শৈশবকালে তারা জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে ক্যানসারের হাত থেকে রক্ষা পায়। আবার যেহেতু মাতৃদুগ্ধে ভিটামিন 'সি' পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে, তাই যারা মাতৃদুগ্ধ পান করে তারা স্কার্ভি, চর্মরোগ প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

এবার আলোচনা করা যাক্—জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর মাতৃদুগ্ধের প্রভাব সম্পর্কে। আমাদের সামনে বর্তমানে তিনটি সমস্যা প্রধানরূপে দেখা দিয়েছে। এই তিনটি সমস্যা হলো—(ক) পপুলেসন—জনসংখ্যা, (খ) পলিউসন—দূষিতকরণ ও (গ) প্রোভারটি—দারিদ্র। সুতরাং এই তিনটি সমস্যা সমাধানের উপায় আমাদেরই খুঁজে নিতে হবে। যেহেতু আমরা এখানে মাতৃদুগ্ধ নিয়ে আলোচনা করছি, তাই উক্ত তিনটি সমস্যার উপর এর প্রভাব সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন। দেখা গেছে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর মাতৃদুগ্ধের অপরিসীম প্রভাব রয়েছে। জানা গেছে, একটি শিশু যতদিন বেশী মাতৃদুগ্ধ পান করবে, সেই মায়ের পরবর্তী সন্তান জন্মাতে তত বিলম্ব হবে। কারণ হিসাবে জানা গেছে শিশু যখন মাতৃস্তনের বোঁটায় মুখ লাগিয়ে দুগ্ধ পান করে তখন মাতৃদেহে এক ধরনের শিহরণ সৃষ্টি হয়। তার ফলস্বরূপ মাতৃদেহে ডিম্বকোষ উৎপাদন ব্যাহত হয়। ডিম্বকোষ সৃষ্টির জন্য প্রোল্যাকটিন এবং আরও কয়েকটি হরমোনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু উক্ত শিহরণের জন্য মাতৃদেহে প্রোল্যাকটিন এবং আরও কয়েকটি হরমোন, যারা ডিম্বকোষ উৎপাদনে সহায়তা করে, তারা উৎপন্ন হতে পারে না বা উক্ত উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই বাধাই সন্তানধারণের সম্ভাবনা বিলম্বিত

করে। তাই একসময়ে যারা অর্থাৎ উন্নতশীল দেশগুলি মাতৃদুগ্ধ পান সম্পর্কে উদাসীনতা দেখাতো আজ তারাই এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিচ্ছে। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা সম্পর্কে জনগণকে বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের ব্যাপকভাবে সচেতন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দারিদ্রের উপরও মাতৃদুগ্ধের প্রভাব আছে। কারণ, সন্তান-সন্ততি সংখ্যায় কম হলে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর চাপ কম পড়ে। তাই দারিদ্রের হাত থেকে হয়তো কিছুটা রক্ষা পাওয়া যায়। সুতরাং এবিষয়ে বর্তমানে সরকারকে অগ্রসর হতে হবে। অগ্রসর হতে হবে সর্বস্তরের জনগণকে। সচেতন হতে হবে আমাদেরই। তাই জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়ে সমস্যার সমাধান সাফল্যের চাবিকাঠি নয় কি ?

ভেবে কর'র উত্তর

1 (c), 2 (b) 3 (b), 4 (c), 5 (c), 6 (b), 7 (b), 8 (b), 9 (a), 10 (c), 11 (b), 12 (a), 13 (b), 14 (b), 15 (b), 16 (c), 17 (a)
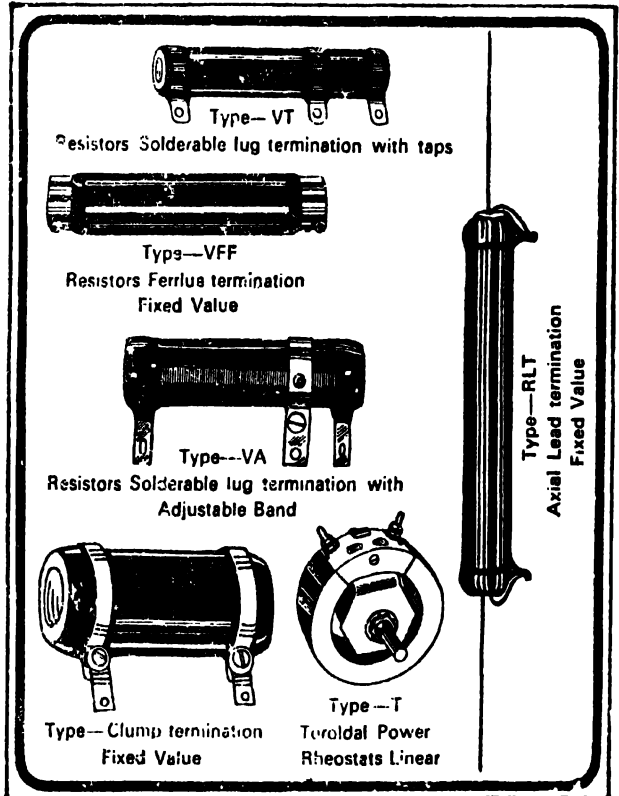
সংখ্যা-চক্র

গৌতম বিশ্বাস*

মহারাষ্ট্রের সংখ্যাতত্ত্বাচার্য কাপ্রেকারের নাম হয়তো পাঠকদের অনেকেরই জানা রয়েছে। "কাপরেকারের ধ্রুবক" 6174 সংখ্যাটি গণিতবিদ্দের আন্তর্জাতিক আসরে তাঁকে পরিচিতি দিয়েছে। তাঁর অন্য আর একটি গবেষণার মূল বিষয়বস্তু হলো 'স্বয়ম্ভূ-সংখ্যা' বা self numbers। আমাদের এই নিবন্ধের আলোচনার বিষয়বস্তু ও ঐ স্বয়ম্ভূ জাতীয় সংখ্যা। তবে সেগুলি আচার্য কাপ্রেকারের স্বয়ম্ভূ সংখ্যা নয়। তবুও প্রথমে আমরা "কাপ্রেকার স্বয়ম্ভূ-সংখ্যা" নিয়েই আলোচনা শুরু করব।

যে কোন একটি সংখ্যা দিয়েই শুরু করা যেতে পারে ; মনে করা যাক সংখ্যাটি 5। এবারে ঐ সংখ্যাটিতে উপস্থিত অংক সংখ্যাগুলির যোগফল, সংখ্যাটির সাথে যোগ করতে হবে। এই এক অংকবিশিষ্ট সংখ্যাটির ক্ষেত্রে অংক সংখ্যাগুলির ঐ যোগফলের মানও হবে 5 ; কাজেই তার সাথে 5 যোগ করলে পাওয়া যাবে 10। এরপর সেই আগের পদ্ধতিতেই 10-এর সাথে $1+0$ যোগ করে নতুন সংখ্যাটি পাওয়া গেল 11। তারপর 11 থেকে $13 \rightarrow 17 \rightarrow 25$ ইত্যাদি। অর্থাৎ পদ্ধতিটি অনুসরণ করে 5 থেকে আমরা 10, 11, 13, 17 ইত্যাদি সংখ্যাগুলি পেতে পারি। কিন্তু এই পদ্ধতি অনুসরণ করে কোন ধনাত্মক সংখ্যা থেকেই 1, 3, 5, 7, 9 ইত্যাদি সংখ্যাগুলি পাওয়া সম্ভব নয়। সেই অর্থেই 3, 5, 7 ইত্যাদি সংখ্যাগুলি হলো স্বয়ম্ভূ সংখ্যা। কাপ্রেকার দেখিয়েছেন যে 1 থেকে 100-এর মধ্যে মোট 13টি (1, 3, 5, 7, 9, 20, 31, 42, 53, 64, 75, 86 এবং 97) স্বয়ম্ভূ সংখ্যা রয়েছে।

এবারে আমরা একটু ভিন্ন পদ্ধতির কথা আলোচনা করব। এক্ষেত্রেও যে কোন একটি সংখ্যা নিয়েই সুরু করা যেতে পারে—ধরা যাক সূচনা সংখ্যাটি 173, যার ডান দিক থেকে 1ম, 2য় এবং 3য় ঘরে যথাক্রমে 3, 7 এবং 1 রয়েছে। নতুন এই পদ্ধতিতে আমরা অযুগ্ম ঘরে যে সব সংখ্যা রয়েছে তাদের যোগফল বের করে সেই যোগফল থেকে যুগ্ম ঘরের সংখ্যাগুলির যোগফল বাদ দিয়ে, সেই বিয়োগফলটিকে মূল সংখ্যার সাথে যোগ করে নতুন সংখ্যা তৈরি করব। কাজেই বিশেষ এই ক্ষেত্রটিতে 173 থেকে নতুন যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে তার মান হল $173+\{(1+3)-7\}=170$। তারপর 170 থেকে পাওয়া যাবে $170+\{(1+0)-7\}=164$ তা থেকে $163 \rightarrow 161$ ইত্যাদি। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে 1 থেকে পাওয়া যায় $2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow 21 \rightarrow 20 \rightarrow 18 \rightarrow 25$ ইত্যাদি।

এইভাবে সংখ্যা তৈরি করতে বসলে দেখা যায় যে 1 থেকে 99-এর মধ্যে মোট 17টি স্বয়ম্ভূ সংখ্যা রয়েছে। এরা হলো (1, 3, 5, 7, 92, 94, 96, 98) এবং (11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99)। এদের মধ্যে দ্বিতীয় সেটের সংখ্যাগুলি আবার আরো একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এরা শুধু

*ফ্ল্যাট নং GB/1, 1, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড, কলিকাতা-700032

স্বয়ম্ভূই নয় এরা নিষ্ক্রিয় চরিত্রেরও (inert number)—কারণ এই সংখ্যাগুলি থেকে নতুন কোন সংখ্যা তৈরি করা যায় না। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই যে 1 থেকে 99 পর্যন্ত সংখ্যা-গুলির যে কোনটি থেকে (inert গুলি বাদ দিয়ে) ধারাবাহিকভাবে নতুন সংখ্যা তৈরি করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত পদ্ধতিটি একটি সংখ্যা-চক্রের আবর্তে এসে পড়ে। সেই চক্রটি চিত্রে দেওয়া হলো।
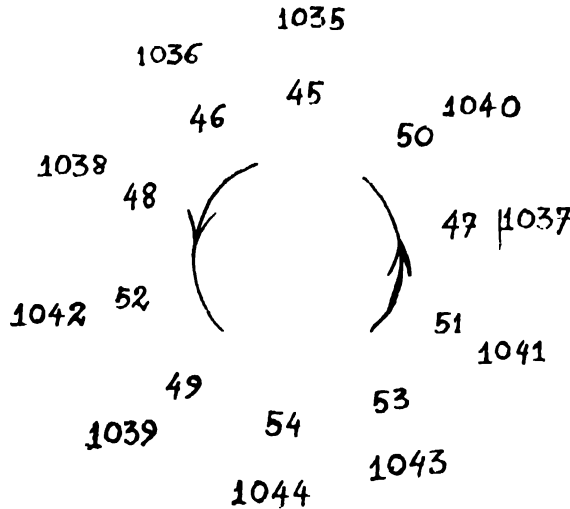
একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—1→2→4

↓

37←35←34←28←25←18←20←21←16←8

↓

41 → 38 → 43 → 42 → 40 → 36→39→45

↓

45←50→47←51←53←54←49←52←48←46

মজার ব্যাপার হলো এই যে সংখ্যা-চক্রটির সংখ্যাগুলির যোগফল একটি নিষ্ক্রিয় সংখ্যা, যার মান 495। আবার 1 থেকে 99 পর্যন্ত সংখ্যাগুলির মধ্যে মোট যে 17 স্বয়ম্ভূ সংখ্যা রয়েছে, তাদের মধ্যে থেকে নিষ্ক্রিয় সংখ্যাগুলিকে বাদ দিয়ে বাকী সংখ্যাগুলির যোগফল বের করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে $(1+3+5+7+92+94+96+98=396)$ সেটিও একটি নিষ্ক্রিয় সংখ্যা। আবার এই দুটি সংখ্যাই 99 দিয়ে বিভাজ্য।

ঠিক একই ভাবে অগ্রসর হয়ে দেখানো যায় যে 100 থেকে 198-এর মধ্যে রয়েছে 17টি স্বয়ম্ভূ সংখ্যা এবং একটি সংখ্যা-চক্র। পাঠককে সেটি খুঁজে বের করাও অনুরোধ করি। তেমনি 199 থেকে 297; 298 থেকে 396 এবং 397 থেকে 495-এর মধ্যেও এক একটি করে মোট তিনটি সংখ্যা-চক্র রয়েছে। কিন্তু 495-এর পর থেকে 1000 পর্যন্ত আর কোন সংখ্যা-চক্রের সন্ধান মেলেনা। আবার নতুন সংখ্যা-চক্র দেখা দেয় 1035 থেকে (চিত্র 1)।

লক্ষ্য করলে খুব সহজেই দেখা যাবে যে পর পর যে কোন দুটি সংখ্যা-চক্রের (প্রথম চারটির) সংখ্যাগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কটি হলো দুটি সংখ্যা-চক্রের অনুরূপ স্থানিক সংখ্যাগুলির ব্যবধানের। এই ব্যবধানের মান 110। ঠিক তেমনি প্রথম চক্রটি এবং 1000-এর পরের প্রথম চক্রটির মধ্যেও অনুরূপ সম্পর্ক বর্তমান। এখানে কেবল ব্যাবধান সংখ্যাটির মান 990। এই দুটি সংখ্যাই আবার নিষ্ক্রিয়। আমরা আগেই দেখেছি যে প্রথম চক্রের সংখ্যাগুলির যোগফল 495, এটি তিন অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা যার থেকে ছোট সংখ্যাগুলি কোন না কোন একটি সংখ্যা-চক্রের সৃষ্টি করে (অবশ্যই নিষ্ক্রিয় সংখ্যা বাদ দিয়ে)।

মডেলের উপর প্রশ্ন ও উত্তর

মডেল—সহজ বা গ্রামীণ রেফ্রিজারেটার – জানুয়ারী সংখ্যা, 1979 গৌতম ব্যানার্জী

লেখক-

প্রশ্ন ঃ (1) চটের চাদর রাখার জন্যে আলমারীর উপরের দেয়ালের নীচেই একটি সেলফ্ করতে হবে কিনা ?

(2) আলমারীর দেয়াল ও তাকের মাঝে চটের চাদর রাখবার জন্যে কোন ফাঁক রাখতে হবে কি ?

(3) আলমারীর একটি পাল্লা হলে কোন অসুবিধা হবে কি ?

(4) চটের চাদরটা আলমারীর দুই দিকের দেয়ালে রাখতে হবে, না পিছনের দেয়াল এবং দরজার সামনে রাখতে হবে ?

(5) বিবরণের মধ্যে একটি চাদরের উল্লেখ আছে। সেখানে দুটি চটের চাদর কিভাবে ব্যবহার করতে হবে ?

কৃষ্ণেন্দু লাহিড়ী, নন্দপল্লী, নৈহাটি

উত্তর ঃ (1) হ্যাঁ, ভিজে চটের চাদর থেকে যাতে জল না পড়ে তাই জিনিষপত্র রাখার সেল্‌ফের উপরে আলমারীর উপরের দেয়ালের ঠিক নীচেই একটি সেল্‌ফ করতে হবে, যার উপর দিয়ে চটের চাদর যাবে।

(2) ঐ ফাঁকের মধ্য দিয়েই চাদরটি যাবে।

(3) না।

(4) চটের চাদরটা আলমারীর দুই দিকের দেয়ালে রাখতে হবে।

(5) প্রতিদিন একটি চাদর কাটতে হবে এবং অপরটি লাগাতে হবে। এই জন্যেই দুটি চাদরের দরকার।

মডেল—গ্যারেজের স্বয়ংক্রিয় দরজা—এপ্রিল সংখ্যা, 1979 গৌতম ব্যানার্জী

লেখক—

প্রশ্ন ঃ (1) 3V—9V মোটরের কেমন দাম পড়বে এবং কোথায় এগুলি কিনতে পাওয়া যাবে ?

(2) মডেল তৈরির সময় 16টি স্প্রিং-এর ব্যবহার কিভাবে করতে হবে ?

অজয় মণ্ডল, খড়দহ, 24-পরগণা

(3) একটি মাঝারি আকারের মডেল তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে ও তাদের মাপ কি হবে ?

দেবাশীষ বসু, ভবানীপুর, কলিকাতা

উত্তর : (1) যে কোন ইলেকট্রিক সাজসরঞ্জামের দোকানেই এই সব মোটর কিনতে পাওয়া যাবে। তবে মডেলকে খুব সক্রিয় করতে হলে 9V মোটরই ভাল। H.M.V. কোম্পানীর 9V মোটর 60-70 টাকার মধ্যে পাওয়া যায়।

(2) প্লাইউডের উপর যে চারটি গর্ত করা হবে সেই চারটির প্রতিটির নীচে অর্থাৎ কাঠের পাতের যে দিকটা বাক্সের ভিতরে থাকবে সেই দিকে চারটি করে হুক লাগাতে হবে। এই চারটি হুকে চারটি স্প্রিং হিসাবে 4×4টা মোট 16টি স্প্রিং লাগাতে হবে।

(3) মডেলটি করতে হলে যা যা লাগবে তার বিবরণ নীচে দেওয়া হলো।

একটি পিজবোর্ডের বাক্স $(3' \times 1')$, পিজবোর্ডের বাড়ী $(1{\cdot}5'' \times 10'')$, প্লাইউডের পাত $(3' \times 1')$, ধাতব পাতটি চক্‌চকে টিনের হলে চলবে। এটি দৈর্ঘ্যে খোলা মোটরগাড়ীর (যেটি মডেলের সঙ্গে ব্যবহৃত হবে) দুই চাকার দূরত্বের চেয়ে সামান্য বড় হবে। একটি গীটারের তার দিয়ে স্প্রিংগুলি তৈরি করতে হবে। স্প্রিংযুক্ত খোলার ভিতরে যে দাঁতওয়ালা চাকা থাকে সেই চাকা দুটি লাগবে। ধাতব দণ্ড হিসাবে সাইকেলের স্পোক ব্যবহার করা চলবে। থার্মোকলের একটা খুব পাতলা পাত দিয়ে দরজা করতে হবে, আর ইলেকট্রিক তার প্রয়োজনমত কিনতে হবে। মডেলকে সক্রিয় করতে হলে 9V মোটরই ভাল। এটি কেনা যেতে পারে, তবে রেডিও রিপেয়ারিং-এর দোকানে ভাড়া পাওয়া যায়। স্প্রিং লাগাবার জন্য প্লাইউডের ভিতরের দিকে (যে দিকটা বাক্সের ভিতর থাকবে) হুক লাগাতে হবে।

পরিষদ-সংবাদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 1978 সালের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী

গত 16ই সেপ্টেম্বর '1979 তারিখে (রবিবার) বেলা 1টায় পরিষদের সত্যেন্দ্র ভবনে (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 1978 সালের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন কর্মসচিব শ্রীরতনমোহন খাঁ কর্তৃক প্রচারিত 30.7.79 তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে আরম্ভ হয়। পরিষদের সভাপতি শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে বার্ষিক অধিবেশনটি আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশন পর দিন ভোর পাচটায় শেষ হয়। অধিবেশনে উপস্থিত 474 জন সভ্যবৃন্দের নামের তালিকা ও তাঁদের স্বাক্ষর যথাযথ সংরক্ষিত করা হয়।

অধিবেশনের প্রারম্ভে উপস্থিত সভ্যবৃন্দ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রতিকৃতির সামনে নতমস্তকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এর পর কর্মসচিব সকল সভ্যকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানান।

সূচী

(1) 1978 সালের পরিষদের কার্যবিবরণী পঠন ও গ্রহণ :—

কর্মসচিব কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং আলোচনান্তে গৃহীত হয়। মুদ্রিত বিবরণী উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে পূর্বেই বিতরণ করা হয়।

(2) 1978 সালের হিসাব পরীক্ষক-এর হিসাব বিবরণী ও মন্তব্য আলোচনা :—

পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীগুণধর বর্মন পরিষদের হিসাব পরীক্ষক (মুখার্জী গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট) কর্তৃক পরীক্ষিত পরিষদের বিগত 1978 সালের হিসাব-নিকাশ, উদ্বৃত্তপত্র, বিবরণী ও হিসাব পরীক্ষকের মন্তব্য পেশ করেন। এই সমস্ত বিবরণী নিয়মমাফিক প্রচারিত হয়েছিল। আলোচনান্তে এই সমস্ত গৃহীত হয়।

(3) 1979 সালের হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ :

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন কুণ্ডু পরিষদের 1979 সালের হিসাব পরীক্ষা ও নিরীক্ষার জন্য মুখার্জী গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউণ্টেণ্টকে নিয়োগের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন শ্রীআশিস সিংহ। সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(4) 1979 সালের সম্ভাব্য ব্যয়-বরাদ্দ (বাজেট) আলোচনা ও গ্রহণ :—

কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেট কর্মসচিব সমর্থন করেন। এটি পূর্বেই নিয়মমাফিক সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হয়েছিল। আলোচনান্তে উক্ত বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

(5) সভাপতির ভাষণ :—

সভাপতির ভাষণের পূবে পরিষদের প্রয়াত সদস্য অমূল্যধন দেব, মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভাপতি শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা তাঁর মুদ্রিত ভাষণটি সভায় পাঠ করেন। সভাপতির আহ্বানে উপস্থিত সদস্যগণ পরিষদের উদ্দেশ্য রূপায়ণে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন

(6) বিধি ও নিয়মাবলী সংস্কার :—

উপস্থিত সভ্যগণ নির্বাচনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ায় এই কর্মসূচীর উপর আলোচনা সম্ভব হয়নি। সভায় ঠিক হয় যে আগামী ডিসেম্বর মাসে একটি সাধারণ সভা ডেকে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

(7) 1979 সালের কার্যকরী সমিতির কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও সাধারণ সদস্য নির্বাচন :—

নির্বাচনের সময় নিয়ে কিছু সভ্য ক্ষোভ প্রকাশ করা সত্ত্বেও প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বিকেল 3টায় ভোটগ্রহণ আরম্ভ হয় এবং 6টার মধ্যে উপস্থিত সভ্যদের ভোট গ্রহণ করা হয়। নির্বাচন অধিকর্তা হিসাবে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস। পরিষদ ভবনের ত্রিতলে দশটি বুথে ভোট নেওয়া হয়। প্রতি বুথে একজন পোলিং অফিসার ও দুইজন পোলিং এজেন্ট ভোটদাতাদের ভোটদানে সাহায্য করেন। প্রতি ভোট পত্রে নির্বাচন অধিকর্তার স্বাক্ষর দেওয়া হয়। সভ্য হবার আবেদনপত্রের স্বাক্ষরের সাথে ভোটদাতাদের স্বাক্ষর মিলিয়ে ভোটদাতাকে ভোটপত্র দেওয়া হয়। নিয়মমত ভোটগ্রহণ শেষ হলে নির্বাচন অধিকর্তা পোলিং অফিসার ও উপস্থিত বেশ কিছু সভ্যের সাধনে বাক্সগুলির মুখ বন্ধ করেন। উপস্থিত সভ্যদের সামনে বাক্সগুলির মুখ খুলে ভোটগণনা শুরু হয়। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয় ভোর পাঁচ ঘটিকায়। ঘোষিত ফলাফলের নীচে নির্বাচন অধিকর্তা স্বাক্ষর করেন।

(8) বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণীর অনুমোদকমণ্ডলী নির্বাচন :—

উক্ত বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণীর লিপিবদ্ধকরণাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে নিম্নলিখিত অনুমোদকমণ্ডলী সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

স্বাক্ষর : (1) শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

স্বাক্ষর : (2) শ্রীগুণধর বর্মণ

স্বাক্ষর : (3) শ্রীসর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাক্ষর : (4) শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

স্বাক্ষর : (5) শ্রীশিবব্রত ভট্টাচার্য

(9) কর্মসচিবের নিবেদন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন :—

নির্ধারিত কর্মসূচী অনুসারে সভার কাজ পরিচালিত হবার পর কর্মসচিব সমস্ত সভ্য ও কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ও প্রত্যেকের সংযোগিতা কামনা করেন। তিনি বিদায়ী কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সদস্যদেরও ধন্যবাদ জানান। এরপর সভাপতি তাঁর স্বল্প ভাষণ সভার কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন ও সকলকে শুভেচ্ছা জানান। সকাল 6টায় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

স্বাক্ষর—ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা
সভাপতি
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

স্বাক্ষর—রতনমোহন খাঁ
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিভিন্ন উপসমিতি ও সম্পাদক মণ্ডলী

গত 2.11.79 তারিখে পরিষদের কার্যকরী সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার নিম্নলিখিত সম্পাদক মণ্ডলী গঠিত হয়েছে।

(1) শ্রীরতনমোহন খাঁ (সম্পাদনা সচিব)
(2) ,, জয়ন্ত বসু
(3) ,, আশিস সিংহ
(4) ,, গুণধর বর্মন
(5) ,, যুগলকান্তি রায়
(6) ,, অজিতকুমার মেদ্দা
(7) ,, রাধাকান্ত মণ্ডল
(8) ,, সুকুমার গুপ্ত
(9) ,, সুব্রত পাল
(9) ,, সলিলরঞ্জন মাইতি
(10) ,, চিত্তরঞ্জন সাঁতরা
(11) ,, অংশুতোষ খাঁ
(12) ,, বলাই ঘোষ
(13) ,, লতিকা বসু
(14) ,, অভিজিৎ লাহিড়ী
(15) ,, নবকুমার শীল
(16) ,, যুগলকান্তি রায়

গত 2.11.79 তারিখে পরিষদের কার্যকরী সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে বিভিন্ন উপসমিতির সদস্য মনোনীত করা হয়েছে।

অর্থ উপসমিতি

(1) শ্রী অনাদিনাথ দাঁ
(2) ,, শিবচন্দ্র ঘোষ
(3) ,, সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
(4) ,, অনিলবরণ দাস

প্রকাশনা উপসমিতি

(1) শ্রীঅজিতকুমার মেদ্দা (আহ্বায়ক)
(2) ,, হেমেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়
(3) ,, জয়ন্ত বসু
(4) ,, আশিস সিংহ
(5) ,, শিবরাম বেরা
(6) ,, ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক
(7) ,, সুব্রত পাল
(8) ,, বিজয়কুমার বল

গ্রন্থাগার উপসমিতি

(1) শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (আহ্বায়ক)
(2) ,, শ্যামসুন্দর পাল
(3) ,, সুকুমার গুপ্ত
(4) ,, সুধীরকুমার সেন
(5) ,, বীরেন্দ্রনাথ সাহা
(6) ,, হরিপদ বর্মণ
(7) ,, সত্যরঞ্জন পাণ্ডা
(8) ,, শশধর বিশ্বাস
(9) ,, মনোজিৎ পোদ্দার

সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্র উপসমিতি

(1) শ্রীযুগলকান্তি রায় (আহ্বায়ক)
(2) ,, কালীপ্রসন্ন ধাড়া
(3) ,, দুলালকুমার সাহা
(4) ,, বিজয়কুমার বল
(5) ,, নলিনীকান্ত দাসচৌধুরী
(6) ,, কৃষ্ণপদ সরকার
(7) ,, নবেন্দু কুণ্ডু
(8) ,, সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
(9) ,, সত্যসুন্দর বর্মন
(10) ,, প্রণবকুমার মল্লিক

(11) ,, জগন্ময় গুইন

(12) ,, গোপীনাথ গিরি

(13) ,, আশিষ চক্রবর্তী

(14) ,, যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র

ভ্রম সংশোধন—জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ 1979 সংখ্যায় প্রকাশিত 'দামোদর আজও দুঃখের নদ কেন?' প্রবন্ধে 135 পৃষ্ঠায় প্রথম স্তবকে 20 থেকে 25 ছত্রে লিখিত "যদি মোট জলধারণ ক্ষমতা··· থাকবে না, "বাক্যাংশটি" যদি জলধারণ ক্ষমতা 10 5 লক্ষ একর-ফুট বন্যানিয়ন্ত্রণে খালি রাখা হয়, তবুও মাত্র 42 ঘণ্টায় তা ভরে যাবে এবং পরবর্তী 30 ঘণ্টা বন্যানিয়ন্ত্রণে জলাধারগুলির কোন ক্ষমতা থাকবে না" পড়তে হবে। এছাড়া 136 পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তবকে 2 ও 32 ছত্রে "3/4 লক্ষ" কথাটির পরিবর্তে '8–10' লক্ষ কথাটি বসবে। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত—লেখক।

1979 সালের শারদীয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' সংখ্যায় 465 পৃষ্ঠার $(x^2-y^2)/12$ = একটি পূর্ণ সংখ্যা, তাহলে x একটি মৌলিক সংখ্যা "হবার সম্ভাবনা থাকে"। "হবার সম্ভাবনা থাকে" ছাপা না হওয়ায় আমরা দুঃখিত।—প্রকাশন সচিব

জনপ্রিয় বক্তৃতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে নিম্নোক্ত জনপ্রিয় বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বিষয়ঃ যোগশাস্ত্রের বিজ্ঞানভিত্তি

বক্তাঃ আশিস সিংহ

তারিখঃ 21 নভেম্বর, 1979

সময়ঃ অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা

স্থানঃ 'সত্যেন্দ্রভবন', পি-23, রাজারাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006

প্রকাশনা সচিব—রতনমোহন খাঁ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা ; ষাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা। আজীবন সদস্য চাঁদা 200 টাকা। যদি কেউ পরপর পাঁচ বৎসর সাধারণ সদস্য থাকেন তবে তিনি 150 টাকা দিলে আজীবন সদস্য হতে পারবেন।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি "আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং"-এ 'ডাকযোগে' পাঠানো হয় ; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট অফিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয় ; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। টাকা, চেক ইত্যাদি কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে পাঠাবেন না। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধারকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করিবেন।
6. কলিকাতার বাইরের কোন চেক প্রেরণ করলে গ্রহণ করা হবে না।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্যবিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। কিশোর বিজ্ঞানীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা : প্রকাশনা সচিব, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন : 55-0660.
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন ; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে পৃথক কাগজে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

প্রকাশনা সচিব
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

JNAN-O-BIJNAN　　Regd. No. C 3684 (G.P.O. Calcutta).　　October

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে প্রকৃত জনকল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য পরিষদের বর্তমান কর্মসমিতি একান্তই সচেষ্ট, সেই বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাকে সফল করতে হলে সকলের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা চাই। এই উদ্দেশ্যে পরিষদের সদস্যবৃন্দ, দেশের বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞানকর্মী, বিজ্ঞান-সংগঠন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সমাজসেবা সংগঠন, সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং জনসাধারণের কাছে

আমাদের আবেদন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

প্রতিষ্ঠিত এই মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের

উন্নতি ও প্রসারকল্পে সকলে আজ

বিভিন্নভাবে এগিয়ে আসুন,

সাহায্য করুন ও সহযোগিতা

দিন

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—নীলাচল প্রেস, কলিকাতা-700 009　　মূল্য— 1.50 টাকা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 11, নভেম্বর, 1979

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাত্রিংশত্তম বর্ষ | নভেম্বর, 1979 | একাদশ সংখ্যা

শিক্ষা বনাম গণিত

রতনমোহন খাঁ

1979 সালের 8ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিং বলেন "আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন"। কথাগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দেশের যারা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যারা দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার—শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সঠিক পথে চালনা করা ও তাদের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে বিকশিত হতে সাহায্য করা রাষ্ট্রের পবিত্র কর্তব্য। শিক্ষাবিদ ও দেশনেতাদের অবশ্য এনিয়ে চিন্তাভাবনার অন্ত নাই। বারবার তাই বসেছে কমিশন, নির্ধারিত হয়েছে শিক্ষাপদ্ধতি, নবরূপে রচিত হয়েছে পাঠ্যক্রম। স্বাধীনতার পর এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কয়েকবার। বারবার পরিবর্তনই সূচিত করছে শিক্ষা বিষয়ে রূপকারদের ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতা, অদূরদর্শিতা ও হঠকারিতার বলি হচ্ছে হাজার হাজার অসহায় ছাত্র-ছাত্রী।

যুগোপযোগী শিক্ষা চাই, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা চাই, কর্মভিত্তিক শিক্ষা চাই—এই সব শ্লোগান যখনই সোচ্চার হয়, তখনই বসে কমিশন। কমিশনের কর্মকর্তাগণ ভালভাবেই জানেন সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ছাড়া কর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব নয়। তাই 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার' ব্যবস্থা। পাঠ্যসূচীর অদল বদল করে, বিজ্ঞান শিক্ষাকে কিছুটা প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা-সংস্কারের ঢাক পিটান হয়। ভারতের ঋষি বাক্য হলো "জ্ঞানের জন্যই শিক্ষা"। একথা মেনে নিয়ে বর্তমান শিক্ষা

সম্বন্ধে দু-চার কথা নিবেদন করব। মাধ্যমিক থেকে স্নাতক স্তরের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

বর্তমান শিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত—

(i) শিক্ষক-শিক্ষিকা

(ii) ছাত্র-ছাত্রী

(iii) বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য ও

(iv) পরিবেশ।

(i) শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকা: পঠন পাঠনের অন্তর্গত বিষয়ের বিভিন্ন দিকগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উপস্থাপন করেন শিক্ষক-শিক্ষিকা। বিষয়-বস্তু সহজ-সরল ও আকর্ষণীয় হওয়া নির্ভর করে শিক্ষক-শিক্ষিকার জ্ঞানের গভীরতা ও উপ-স্থাপনের নৈপুণ্যের উপর। তাই পাঠ্যসূচীতে বিভিন্ন অধ্যায় বা নূতন বিষয় সংযোজনের সময় ঐ সব বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা কতটা ওয়াকিবহাল সে বিষয়ে সম্যক ধারণার প্রয়োজন। বিদ্যালয় থেকে কলেজী শিক্ষাধারার 10+2+2 ব্যবস্থা রদ করে যখন 11+3 ব্যবস্থা চালু করা হলো তখন অধিকাংশ বিদ্যালয়েই ছিল উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব। ফলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান হয়েছে অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে যখন এই অসহনীয় ব্যবস্থার কিছুটা সমাধান হলো তখনই আবার ফিরে এল 10+2+2 ব্যবস্থা। পাঠ্যক্রমেও এল বেশ কিছু পরিবর্তন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে মাধ্যমিক গণিতের অসমীকরণ, রূপান্তর, ত্রিকোণমিতি ও সমীকরণের ব্যবহারিক প্রয়োগ; উচ্চমাধ্যমিকের গণিতে কলনশাস্ত্র ও বলবিদ্যা এবং সাধারণ স্নাতক স্তরের গণিতে বিমূর্ত বীজগণিত (abstract algebra), বৈশ্লেষিক গতিবিদ্যা (analytical dynamics) ও সরল প্রোগাম (linear programming)। যেখানে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনার জন্যই ছিল উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব সেখানেই দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শি..ের করা হলো ব্যবস্থা পাঠ্যসূচীতেও আনা হয়েছে এমন কতকগুলি বিষয় যেগুলি সম্বন্ধে অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকার জ্ঞান স্বল্প। (বাস্তব চিত্র তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কারো প্রতি কটাক্ষ করা নয়।)

(ii) ছাত্র-ছাত্রীদের কথা: যাদের জন্য এত সাড়ম্বর আয়োজন, তারা হলো ছাত্র-ছাত্রী। পাঠ্য-সূচী প্রণয়নের পূর্বে বিবেচনা করতে হবে কাদের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা। সাধারণ মেধাযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা প্রায় 90 শতাংশ। এদের বিভিন্ন বিষয় গ্রহণ করার ক্ষমতা কতটুকু সে বিষয়ে ভাল করে সমীক্ষার পর পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা উচিত। কার্যক্ষেত্রে বিপরীত ঘটনাই ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠ্যক্রমের পরিধি বেশ বড়। ফলে, তাড়াহুড়ো করে সবকিছু পড়ানোর চেষ্টা করা হয়, না হয় আংশিক পড়ানো। ছাত্র ছাত্রীরাও V V.I. মার্কা suggestion নিয়ে পরীক্ষা নামক দরিয়া পাড়ি দেবার চেষ্টা করে। উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে বিভিন্ন পাঠ্যসূচীর দিকে লক্ষ্য করলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। 11+3 পদ্ধতিতে স্নাতক পরীক্ষায় তিন বছরে দুটি পরীক্ষায় 300 নম্বরের পরীক্ষা দিতে হতো। এখন 10+2+2 পদ্ধতিতে ঐ পরীক্ষা দু-বছর পরে একটি পরীক্ষায় দিতে হয়। 300 নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে। এরই বিষময় ফল দেখা যায় 1979 সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায়। গণিতে প্রায় 80 শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী প্রয়োজনীয় মানের নীচে। তবে কি মাধ্যমিক পাশ করে এমন কি গণিতে ভাল ফল করেও উচ্চ মাধ্যমিকে তারা গণিত পড়ার উপযুক্ত নয়? আগামী স্নাতক পরীক্ষাতেও 1980 এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে বললে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় সমালোচনার মুখে দু-একটি পরীক্ষার পর অনেক বিষয়ের পরিধিকে কিছুটা ছোট করতে বাধ্য হন। *

(iii) পাঠ্যক্রমের সামঞ্জস্য: প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ-স্তর পর্যন্ত যে কোন বিষয়ে পাঠ্যতালিকার

মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। এছাড়া একটি বিষয়ে কোন অধ্যায় সংযোজনের জন্যে থাকা চাই যথেষ্ট যৌক্তিকতা, আর সেই সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে পঠন-পাঠনের সম্ভাব্যতা। পরিতাপের বিষয়—কার্যক্ষেত্রে এসবের কোন মূল্যই প্রায় দেওয়া হয় না।

(iv) পরিবেশ: পড়াশুনার জন্য চাই সুস্থ পরিবেশ। পরিবেশ বলতে (ক) পরিচ্ছন্ন পরিচালন ব্যবস্থা, (খ) নিয়মিত ক্লাস, (গ) বিদ্যালয় ও বাড়িতে পড়াশুনার সুযোগ, (ঘ) সুষ্ঠু পরীক্ষা, (ঙ) পড়াশুনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। রাজনৈতিক ডামাডোল, শিক্ষক ও ছাত্রদের দলীয় স্বার্থের নানা সংঘাত পরিচ্ছন্ন পরিচালনা ব্যবস্থা ও নিয়মিত ক্লাসের প্রায়ই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই আসে-নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। পড়াশুনার জন্য চাই বইপত্র, চাই পুষ্টিকর খাবার, চাই স্থান—এ সবরই এদের অভাব। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সব ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবারের অভাব-অনটন লাঘবে সাহায্য করতে হয়। এই কারণেই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া সত্ত্বেও সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর (যারা সংখ্যায় বেশ বড়) ছেলেমেয়েরা স্বাধীনতার 30 বছর পরেও সাক্ষর হলো না। এই একই কারণে শিশুশ্রম আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা সুলভ। গণ-টোকাটুকির জোয়ারে পরীক্ষা আজ প্রহসনে পর্যবসিত। উত্তর-পত্র পরীক্ষা বিষয়ে দায়িত্বহীনতার নজিরও কম নয়। তার উপর কোন আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির না থাকায় ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবক যেনতেন প্রকারে পরীক্ষায় পাশ করাকেই শ্রেয় ভাবে।

শিক্ষাজগতে আজ নৈরাশ্যের ছবি সর্বত্র পরিস্ফুট হলেও আমরা আশা করব এই সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই শিক্ষাসংস্কার করা হবে বাস্তব পটভূমিতে। যেমন স্নাতক পর্যায়ে গণিতের সম্মান-বিভাগে পাঠ্যক্রম অনেক বাস্তবমুখী করার সুযোগ আছে। প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ যেগুলি পুরোপুরি গণিতের উপর নির্ভরশীল অথচ সমাজে চলার পথে সহায়ক সেই সব বিষয়কে অনায়াসে গণিতের পাঠতালিকাভুক্ত করা যায়। ছুৎমার্গ পরিহার করে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলে গণিতের সঙ্কট, গণিতের প্রতি অসূয়া মনোভাব এবং গণিতের প্রতি সর্বস্তরে ভীতি প্রশমিত হবে এবং শিক্ষাজগতেরও কল্যাণ হবে।

"***জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চকমাত্র।"

বঙ্কিমচন্দ্র

শরীরের বিষ

জগদানন্দ রায়

সাপের দাঁতের গোড়ায় বিষ আছে; বোল্‌তার হুলের বিষও অতি ভয়ানক। কুকুর শেয়াল ক্ষেপিলে তাহাদের মুখের লালায় বিষ হয়। তাই ক্ষেপা কুকুরে কামড়াইলে মানুষ মারা যায়। এ-সবই তোমরা জানো। কিন্তু তোমার ও আমার শরীরে সর্ব্বদাই যে ভয়ানক বিষ জন্মিতেছে, তাহার কথা তোমরা শুনিয়াছ কি? বোধ হয় শুন নাই,—এখানে সেই বিষের কথাই বলিব।

একজন খুব বড় ডাক্তার কিছুদিন পূর্বে অনেক পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন,—আমাদের শরীরে প্রতিদিন যে বিষ জন্মিতেছে, তাহা শরীর হইতে বাহির হইয়া না গেলে, রামমূর্ত্তি বা স্যাণ্ডোর মত খুব বড় পালোয়ানও এক দিনে মারা যায়। তোমরা বোধ হয়, কথাটা বিশ্বাস করিতেছ না,—কিন্তু ইহা সত্য। প্রতি মিনিটেই আমাদের শরীরে বিষ জন্মিতেছে। যাহাতে সেই বিষ তাড়াতাড়ি শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহার অনেক ব্যবস্থা আমাদের দেহে আছে। এই জন্যই আমরা বাঁচিয়া আছি।

বিষ নষ্ট করিবার যত যন্ত্র আমাদের শরীরে আছে, তাহার মধ্যে ফুস্‌ফুস্ এবং লিভার অর্থাৎ যকৃৎই প্রধান। আমাদের শরীরের কোন্ জায়গায় ফুস্‌ফুস্ আছে, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো। বুকের পাঁজরার মধ্যে ফুস্‌ফুস্ থাকে। নিশ্বাস লইবার সময়ে আমরা নাক দিয়া যে বাতাস টানি, তাহা ফুস্‌ফুসে গিয়া ফুস্‌ফুস্‌কে ফুলাইয়া তোলে। ইহাতে নিশ্বাস টানার সময়ে আমাদের বুকও ফুলিয়া উঠে। তোমরা বুকের পাশের দুই পাঁজরে হাত দিয়া জোরে নিশ্বাস টানিয়া পরীক্ষা করিয়ো,—দেখিবে, পাঁজর ফুলিয়া উঠিয়াছে। শরীরের ভিতর দিয়া সর্বদাই রক্তের স্রোত চলিতেছে। স্রোতের জল যেমন নদীর ময়লা-মাটি ধুইয়া সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দেয়, তেমনি শরীরের মধ্যে যে-সব বিষ জমা হয়, তাহা রক্তই ধুইয়া আনিয়া আমাদের হৃদ্‌পিণ্ডে জমা করে। তার পরে সেই ময়লা রক্ত ফুস্‌ফুসের মধ্যে পৌঁছিলে আমাদের নিশ্বাসের বাতাসে তাহা শোধন হইয়া যায়। দূষিত জিনিসকে শোধন করিলে তাহার যে ময়লা-মাটি আবর্জ্জনা থাকে সেগুলিকে পৃথক্ করিয়া ফেলা দরকার,—তাহা না হইলে যে জিনিসকে শোধন করা গেল তাহা আবার খারাপ হইয়া যায়। সুতরাং রক্তের শোধন হইলে যে-সব আবর্জ্জনা শরীরে জমা হয়, তাহা বাহির করা দরকার হয়। কি উপায়ে এগুলি শরীরের বাহিরে আসে, তাহা তোমরা বোধ হয় জানো না। নিশ্বাস ফেলিবার সময়ে যে বাতাস আমাদের ফুস্‌ফুস্ হইতে বাহির হয়, তাহাই ঐ-সব আবর্জ্জনা শরীরের বাহিরে আনে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, আমাদের নিশ্বাস ফেলার বাতাসটা ভালো বাতাস নয়,—তাহার সঙ্গে অনেক খারাপ জিনিস মেশানো থাকে। দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া একই ঘরে যদি অনেক লোক গাদাগাদি করিয়া বাস করে, তাহা হইলে এই-সবই

ঘরের বাতাস খারাপ হয়। এই বাতাসে আমাদের নিশ্বাস টানার কাজ চলে না।

যকৃত অর্থাৎ লিভার আমাদের শরীরের কোন্ জায়গায় আছে, তোমরা বোধ হয় জানো। আমাদের পেটের ডান ধারে যকৃৎ থাকে। এই যন্ত্রটি বড়ই অদ্ভুত। ইহা শরীরের যে কত উপকার করে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই যন্ত্র নিজে বিষ উৎপন্ন করে, আবার অন্য বিষকে নষ্ট করে; তা' ছাড়া নানা রকম জারক রস উৎপন্ন করিয়া আমরা যাহা খাই তাহা হজম করে। একটা ছোট যন্ত্রে যখন এক সঙ্গে এত-গুলো কাজ চলে, তখন সত্যই আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয়। ডাক্তারেরা নানা জন্তুর যকৃত কাটিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইতে কি-রকমে এতগুলি কাজ চলে তাঁহারা ঠিক জানিতে পারেন নাই।

মাছের শরীরের ভিতরে যে পিত্তের থলি আছে, তাহা বড় মাছ কুটিবার সময়ে হয় ত তোমরা দেখিয়াছ। খুব পাৎলা চামড়ার এই থলিটা যকৃতের গায়ে লাগানো থাকে এবং তাহার ভিতরে এক রকম গাঢ় হলুদ রঙের রস থাকে,—ইহাই পিত্তরস। এই জিনিসটা ভয়ানক তিত। পিত্ত গলিয়া গিয়া যদি কোটা মাছের গায়ে লাগে, তবে সে ভয়ানক তিত হয়। তাই মাছ কুটিবার সময়ে পিত্তের থলি সাবধানে কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হয়।

মানুষের যকৃতেও ঐ-রকম পিত্তের থলি আছে এবং তাহাতে পিত্ত-রস জমা হয়। এই রসটা কি কাজ করে, তোমরা বোধ হয় জানো না। আমরা যদি দুধ জল বা অন্য খাবারের সঙ্গে কোনো বিষ খাইয়া ফেলি, তবে যকৃৎ সেই বিষ টানিয়া লয় এবং তাহারি কতকটা দিয়া পিত্তরসের সৃষ্টি করে এবং বাকি বিষ নিজের কাছে আট্‌কাইয়া রাখে। কাজেই সামান্য রকমের বিষ খাইলে, তাহা রক্তের সঙ্গে মিশিয়া আমাদের অনিষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু বিষের পরিমাণ বেশী হইলে, তাহার সবটা যকৃতে আট্‌কায় না। তখন বিষ রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং তাহাতে মানুষ মারা পড়ে।

সব জিনিসেরই ক্ষয় আছে। তুমি যে ছুরিখানা দিয়া প্রতিদিনই পেন্‌সিল ও কলম কাটিয়া থাক, দু বছর পরে দেখিবে তাহার ফলা ক্ষয় পাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। ঘস্‌-ঘস্ করিয়া যখন কল চলে, তখন তাহারো লোহা প্রভৃতি ক্ষয় পায়। এই সব ক্ষয়ের জন্য যে ময়লা জমে তাহা, কলের মিস্ত্রি তেল দিয়া এবং ন্যাকড়া দিয়া মুছিয়া ফেলে। ইহা না করিলে কল বিগ্‌ড়াইয়া যায়। আমাদের শরীরের কলেও ঠিক্ ইহাই ঘটে। চলার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ কলের মত আমাদের শরীরের কলেরও ক্ষয় হয় এবং এই ক্ষয়ের আবর্জ্জনা শরীর হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। তাহা না করিলে ব্যারাম দেখা দেয় এবং ইহাতে মানুষ মারা যায়। দেহের ক্ষয়ে শরীরের ভিতরে যে আবর্জ্জনা জমা হয়, তাহা ভয়ানক বিষ। রক্ত হইতে এই বিষ টানিয়া লইয়া বাহির করা আমাদের যকৃতেরই আর একটা কাজ।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, নর্দ্দমা দিয়া যেমন পচা ময়লা মাটি আবর্জ্জনা বাহির হয়, যকৃতের ভিতর দিয়া বুঝি সেই রকমেই শরীরের আবর্জ্জনা বাহির হয়। কিন্তু উহা সেই রকমে হঠাৎ বাহির হয় না। যকৃতে আট্‌কাইয়া আবর্জ্জনাগুলির কতক অংশ প্রথমে পিত্ত-রসের আকৃতি পায়, তার পরে তাহা শরীরের অন্য কাজ করিয়া মলের সহিত বাহিরে আসে। তেল, ঘি, মাখন, চর্ব্বি প্রভৃতি জিনিস হজম করা কঠিন। ঐ পিত্তরস দিয়াই যকৃত ঐ-সব খাদ্যকে হজম করে এবং পেটের ভিতরে আরো যে-বিষাক্ত জিনিস থাকে সেগুলিকেও নষ্ট করিয়া ফেলে। আমাদের যকৃৎ প্রতিদিনই আধ সের হইতে তিন পোয়া পর্য্যন্ত পিত্তরসের সৃষ্টি করে। বিষ হইতে যে জিনিসের সৃষ্টি, তাহা কখনই ভালো জিনিস হইতে পারে না। বিষ হইতেই পিত্তরসের সৃষ্টি হয় বলিয়া, —ইহা ভয়ানক বিষাক্ত। তাই ইহা তাড়াতাড়ি শরীর হইতে বাহির হইয়া না গেলে আমাদের ভয়ানক অনিষ্ট করে।

পিত্তরস প্রস্তুত করার পরেও যে-সব বিষ বা

আবর্জ্জনা বাকি থাকে, তাহা আর একটি জিনিসে পরিণত হয়। এই জিনিসটির ইংরাজি নাম ইউরিয়া। ইহা মূত্রাশয়ের ভিতর দিয়া শরীরের বাহিরে আসে। এই জন্যই প্রাণীদের মূত্রাশয় জখম হইলে ভয়ানক বিপদ ঘটে। তখন গায়ের সমস্ত রক্ত শরীরের বিষে পূর্ণ করিয়া উঠে,—ইহাতে প্রাণী একদিনের মধ্যেই মারা পড়ে।

তাহা হইলে দেখ,—দাঁতে বিষ আছে বলিয়া আমরা সাপ বিছে কুকুর শেয়ালকেই যে দোষ দিই, তাহা ঠিক নয়। আমাদের শরীরের ভিতরেও দিবারাত্রি বিষের সৃষ্টি হইতেছে। যকৃৎ মূত্রাশয় ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি দিয়া সেগুলি বাহির হইয়া যায় বলিয়াই আমরা সুস্থ থাকি। তাহা না হইলে আমরা নিজেদের বিষেই নিজেরা মারা পড়িতাম। মদ খাইয়া সব দেশেই হাজার হাজার লোক মরে। কি-রকমে মরে, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। মদ জিনিসটা ভয়ানক বিষ। ইহা পেটে পড়িয়া রক্তের সঙ্গে মিশিলে প্রথম প্রথম লিভারই তাহা টানিয়া রাখে এবং পিত্তরস বা মূত্রের আকারে শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু মদের বিষে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলে যকৃৎ আর সে-কাজটি করিতে পারে না। তখন রক্তের সঙ্গে মিশিয়া এই মদই মানুষকে মারিয়া ফেলে। কখনো কখনো দিবারাত্রি মদের বিষ লইয়া কাজ করায় যকৃৎ দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং তখন তাহাতে ফোড়া হয়। এই রোগেও অনেক লোক মারা যায়।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেবার নতুন সঠিক পদ্ধতি

শিলার বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা পর্যবেক্ষণ করে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেবার এক নতুন সঠিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন।

তাঁদের মতে, ভূমিকম্পের লক্ষণ ধরার ভিত্তি হচ্ছে শিলার মধ্যে বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো ছিদ্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাটল। পীড়ন বৃদ্ধি পেলে ফাটলগুলো চওড়া হয়ে যায়। তখন, হিমানী-সম্প্রপাতে যেমন হয়ে থাকে, তেমনি একটি ক্রিয়া ঘটে। ফলে বড়োরকমের একটি ভঙ্গ তৈরি হয়। এই হচ্ছে ভূমিকম্পের লক্ষণ।

ছিদ্রের মধ্যে ও ছিদ্রের কাঠামোর মধ্যে যে তরল পদার্থ জমা থাকে তার পরিমাণ ও বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা থেকে সাধারণত শিলার বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা নির্ধারিত হয়। 15 থেকে 20 কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত নানা বিভিন্ন পরিমাণে তরল পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। নতুন তৈরি হওয়া ফাটল-গুলোতে এই তরল পদার্থ ছড়িয়ে পড়ার ফলে অত্যধিক গভীরতায় বৈদ্যুতিক বাধা হ্রাস পায়। এই সমস্ত পরিবর্তন গোড়ার দিকে অপেক্ষাকৃত কম থাকে, কিন্তু ভূমিকম্প ঘটার সময়ে খুবই বৃদ্ধি পায়। পরিবর্তনগুলো ঘটে ভূমিকম্পের কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত আগের সময়কালে। এই ব্যাপারটির বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব মূল্য যথেষ্ট বেশি এবং এ-থেকে সঠিকভাবে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া চলে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শক্তিশালী এম-এইচ-ডি জেনারেটর প্রবর্তিত হচ্ছে। ভূমিকম্পের এলাকায় শিলার বৈদ্যুতিক বাধা স্থায়ীভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োজন তা এই এম-এইচ-ডি জেনারেটর থেকে সরবরাহ করা হবে।

নিউট্রন নক্ষত্রের কথা

দীপক বসু*

[সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে, কিছু সংখ্যক নক্ষত্র নিউট্রন কণিকার দ্বারা গঠিত হতে পারে—এদের নাম নিউট্রন নক্ষত্র। নিউট্রন নক্ষত্রের সৃষ্টি, আবিষ্কারের ইতিহাস, পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন গুণাবলী এখানে আলোচনা করা হয়েছে।]

ভূমিকা—রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে কত কবি যুগে যুগে লিখে গেছেন কত অমর কবিতা। বিজ্ঞানী কিন্তু কবিতা পড়েই নিবৃত্ত হন নি। তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে—ঐসব নক্ষত্রের মধ্যে কি আছে? জ্যোতির্বিজ্ঞানীর অক্লান্ত সাধনার ফলে প্রতিভাত হয়েছে—নক্ষত্ররা প্রধানতঃ নানা জাতীয় গ্যাসীয় পদার্থের দ্বারা গঠিত।

পরমাণুর গঠনতত্ত্ব থেকে আমরা জানি, পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে প্রোটন কণিকা (ধনাত্মক) ও নিউট্রন কণিকা (নিরপেক্ষ) এবং এদের চারদিকে চক্রাকার পথে ঘুরছে ইলেকট্রন কণিকা (ঋণাত্মক)। নক্ষত্রের ভিতর উত্তাপ অত্যধিক বলে পরমাণুর থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ অবস্থায় পরমাণুকে বলে 'আয়ন'। নক্ষত্রের গ্যাসীয় পরমাণু প্রধানতঃ আয়নরূপে অবস্থান করে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে কিছু সংখ্যক নক্ষত্র সম্পূর্ণ নিউট্রন কণিকার দ্বারা গঠিত হতে পারে। এদের নাম নিউট্রন নক্ষত্র—এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সৃষ্টি—নিউট্রন নক্ষত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব জানতে হলে প্রথমে নক্ষত্রের জীবনকথা কিছুটা স্মরণ করা দরকার।

নক্ষত্রের জন্ম হয় আন্তর্নাক্ষত্রিক অঞ্চলের ধূলিকণা ও গ্যাস থেকে। এ অঞ্চলের বস্তুর ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। তাই কখনও কখনও মাধ্যাকর্ষণের ফলে বস্তু একত্রিত হবার চেষ্টা করে। কিন্তু পরমাণুর উত্তাপজনিত গতিবিধি এই বাষ্পকে প্রায় ব্যর্থ করে দেয়। তবে এক সময়ে বস্তুর ঘনত্ব এত বেশী হতে পারে যে, পরমাণুর বহির্গতি হার মানতে বাধ্য হবে এবং বস্তু ক্রমশঃ একত্রিত হতে থাকবে। এরূপ প্রক্রিয়ার ফলে বস্তু তার মাধ্যাকর্ষণজনিত শক্তি 'হারাতে' থাকে। কিন্তু আমরা জানি, শক্তি হারান সম্ভব নয়—রূপান্তরিত হতে পারে মাত্র। তাই প্রকৃত পক্ষে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আংশিকভাবে বিকিরিত হয়ে যায় আর আংশিকভাবে বস্তুকে একত্রিত করে তোলে। এখানেই নক্ষত্রের জন্ম।

যদি প্রচুর পরিমাণে বস্তু একত্রিত হয়ে থাকে তবে ক্রমশঃ মাধ্যাকর্ষণের ফলে তার ঘনত্ব ও উত্তাপ বাড়তে থাকে এবং এক সময়ে পারমাণবিক প্রক্রিয়া সুরু হয়। পারমাণবিক প্রক্রিয়া যখন পুরোদমে চলেছে, নক্ষত্রের বিকিরিত শক্তি পারমাণবিক শক্তি থেকেই আসছে এবং বিকিরণজনিত বহিঃচাপ মাধ্যাকর্ষণজনিত সংকোচনকে প্রতিরোধ করতে পারে।

*Dept. of Physics, University of West Indies, St. Augustine, Trinidad, W. I.

দুই বিপরীতমুখী চাপের এই সাম্যাবস্থাই নক্ষত্রের সাধারণ অবস্থা।

কালক্রমে 'পারমাণবিক জ্বালানী' ফুরিয়ে আসে। তখন বিকিরিত শক্তি মাধ্যাকর্ষণকে আর ধরে রাখতে পারে না। নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে মাধ্যাকর্ষণ-জনিত সঙ্কোচন সুরু হয়, যদিও বহিরাঞ্চল সম্প্রসারিত হতে থাকে। এই সময়ে নক্ষত্রের প্রধান শক্তির উৎস হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ। নক্ষত্র এখন খুব উজ্জল হয়ে উঠেছে এবং 'দানব' অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। এদিকে অভ্যন্তর ভাগে সংকোচনের ফলে ঘনত্ব বেড়ে গিয়ে আবার পারমাণবিক ক্রিয়া সুরু হয় ও সংকোচন থেমে যায়। এইভাবে ক্রমিকভাবে পারমাণবিক ক্রিয়া ও সঙ্কোচন চলতে থাকে। এই অবস্থায় পারমাণবিক ক্রিয়ার ফলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটতে পারে (বিস্ফোরক নক্ষত্রের সৃষ্টি)। ফলে নক্ষত্রের বহির্ভাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও নক্ষত্র বামন অবস্থায় উপনীত হয়।

মনে রাখা দরকার বারবার সঙ্কোচনের ফলে এখন নক্ষত্রের বস্তু-ঘনত্ব খুব বেড়ে গেছে। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে বস্তুর ঘনত্ব যদি অত্যধিক হয়, তবে ইলেকট্রন ও প্রোটন মিলে নিউট্রনের সৃষ্টি করতে পারে। অল্প ঘনত্বের বস্তুর পক্ষে এই ধরণের বিক্রিয়া সম্ভব নয়। ঘনত্বের পরিমাপ একটি বিশেষ মাত্রা (পরে সঠিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে) প্রাপ্ত হলে প্রায় সমস্ত বস্তুই নিউট্রনে রূপান্তরিত হয়ে যাবে এবং 'নিউট্রন নক্ষত্রে'র সৃষ্টি করবে।

ইতিহাস—নিউট্রন নক্ষত্র জাতীয় বস্তুর অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা বিজ্ঞানীদের অনেক দিন আগেই জানা ছিল। নিউট্রন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই বিখ্যাত পদার্থবিদ্ লাণ্ডাউ নিউট্রন নক্ষত্রের আভাস দিয়েছিলেন (1932)। 1933 খৃঃ বা'ডে ও জুইকী প্রমুখ জ্যোতির্বিদ প্রথম নিউট্রন নক্ষত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের মতে একটি সাধারণ নক্ষত্রের বিস্ফোরণকালীন সঙ্কোচনের ফলে নিউট্রন নক্ষত্রের সৃষ্টি হতে পারে। এই ভবিষ্যদ্বাণী যে কতখানি সত্য, উপরের আলোচনা থেকে তা বোঝা যাবে। নিউট্রন নক্ষত্রের গঠন সম্বন্ধে প্রথম বিস্তৃত আলোচনা করেন ওপেনহাইমার ও তাঁর ছাত্রসহযোগিগণ (1938-39) এরপর দীর্ঘকাল এই গবেষণাক্ষেত্রে বিরতি দেখা যায়। তার প্রধান কারণ, এ ধরণের বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা ক্রমশঃ সন্দিহান হতে থাকেন।

1960 খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে নিউট্রন নক্ষত্র গবেষণার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন দেখা দেয়। আমাদের ছায়াপথে একটি নতুন ধরনের বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। এই বস্তু থেকে ক্রমাগত রঞ্টগেন রশ্মি নির্গত হচ্ছে। ইতিপূর্বে বা'ডে ও জুইকী যে নিউট্রন নক্ষত্রের প্রস্তাব করেছিলেন, তার উপরিভাগে উষ্ণতা অত্যন্ত বেশী। হিসাব করে দেখা যায়, এই উষ্ণতায় বস্তু থেকে রঞ্টগেন রশ্মি নির্গত হতে পারে। ফলে নব-আবিষ্কৃত রঞ্টগেন রশ্মি বিকিরণকারী বস্তুটিকে নিউট্রন নক্ষত্র বলে অভিহিত করা হলো। কিন্তু শীঘ্রই বস্তুটির পরিমাপ করে দেখা গেল, নিউট্রন নক্ষত্রের থেকে তা অনেক বড়। এর পর থেকে, বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য না হলেও বিভিন্ন স্থানে নিউট্রন নক্ষত্র সম্বন্ধে গবেষণা চলতে থাকে।

পর্যবেক্ষণ—চীনদেশের জ্যোতির্বিদদের লিপিতে 1054 খৃঃ বৃষ নক্ষত্রমণ্ডলে এক অস্বাভাবিক নক্ষত্রের আবির্ভাবের কথা পাওয়া যায়। তৎকালীন পর্যবেক্ষকদের বর্ণনা অনুসারে, প্রায় তিন দিন ধরে রাতের আকাশে নক্ষত্রটিকে চাঁদ ছাড়া অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের মধ্যে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্করূপে দেখা যায়। আজ আমরা জানি, উপরিউক্ত ঘটনা একটি নক্ষত্রের বিস্ফোরণের ফল। বলা বাহুল্য, এরকম ঘটনা সচরাচর ঘটতে দেখা যায় না। পরে যদি আরও কয়েকটি বিস্ফোরক নক্ষত্র পরিলক্ষিত হয়েছে, কিন্তু বৃষ নক্ষত্রমণ্ডলে সংঘটিত ঘটনা গত 1000 বছরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ। এই বিস্ফোরণের পরিণতি একটি নীহারিকা আজও

দূরবীনের সাহায্যে দেখা যায়। এর নাম কর্কট নীহারিকা। দূরত্ব প্রায় 5000 আলোকবর্ষ (1 আঃ বঃ $=9.5\times10^{12}$ কি. মি.) পরিমাপ প্রায় 6 আলোকবর্ষ। সেকেণ্ডে প্রায় 10^5 কিঃ মিঃ বেগে এখনও এর পরিমাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

914 বছর পর 1968 খৃঃ জ্যোতির্বিদেরা লক্ষ্য করেন, কর্কট নীহারিকা থেকে ঝলকে ঝলকে বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ আসছে। শুধু তাই নয়, তারপর যে কোন দুটি ঝলকের মধ্যে পর্যায়ক্রম (0 0330995-22 সেকেণ্ড) নিখুঁতভাবে সমান। পরবর্তীকালে অবশ্য দেখা গেছে, এই পর্যায়ক্রম কিছুটা পরিবর্তনশীল। ঝলকের ইংরেজী প্রতিশব্দ (পাল্‌স্) অনুযায়ী এই বস্তুর নাম দেওয়া হয়েছে 'পাল্‌সার'।

কর্কট পাল্‌সার অবশ্য একমাত্র পাল্‌সার নয়, এমন কি প্রথম আবিষ্কৃত পাল্‌সারও নয়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্‌গণ 1967 খৃঃ প্রথম পাল্‌সার আবিষ্কার করেন। বর্তমানে দেড় শতাধিক পাল্‌সারের অস্তিত্বের কথা জানা গেছে। কর্কটের ঝলক-পর্যায়ক্রম এদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম (0.033 সেঃ)। সর্বাধিক পর্যায়ক্রম লক্ষ্য করা গেছে 4 সে পর্যন্ত।

পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত পাল্‌সারের গুণাবলী অনুধাবন করে জ্যোতির্বিদ্‌গণ একমত হয়েছেন যে, নিউট্রন নক্ষত্রের দ্রুত ঘূর্ণনের ফলে পাল্‌সারের সৃষ্টি হয়। ব্যাপারটা এরকম। নিউট্রন নক্ষত্র তার অক্ষের চারদিকে ঘুরছে এবং দুই চুম্বক-মেরু বরাবর বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ বিকিরণ করে চলেছে। লাইট হাউসের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। দূরে বসে থাকলে লাইট হাউসের আলো যেমন খানিকক্ষণ পরপর পর্যবেক্ষকের চোখ ছুঁইয়ে যায়, ঘূর্ণায়মান নিউট্রন নক্ষত্রের চুম্বক মেরু বরাবর নির্গত বেতার-তরঙ্গও তেমনিভাবে ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে একবার করে সাড়া জাগিয়ে যায়। এগুলিই এক একটি ঝলক। স্বভাবতঃই ঝলকের পর্যায়ক্রম নির্ভর করবে নিউট্রন নক্ষত্রের ঘূর্ণনবেগের উপর। কর্কট পাল্‌সারের ক্ষেত্রে এই বেগ সেকেণ্ডে 33 বার।

গুণাবলী—অঙ্ক কষে দেখা গেছে, যে সব নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের 4 থেকে 8 গুণ, তারাই ক্রমবিবর্তনে সঙ্কুচিত হয়ে নিউট্রন নক্ষত্রে রূপান্তরিত হতে পারে (সূর্যের ভর $=2\times10^{33}$ গ্রাম)। আগেই বলা হয়েছে, বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রের বহিরাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে নিউট্রন নক্ষত্রের ভর মোটামুটি দাঁড়াবে সূর্যের ভরের 0.7 থেকে 2.5 গুণ। এদের ব্যাসার্ধ 10-20 কি. মি.। এর থেকে সহজেই হিসাব করা যায় নিউট্রন নক্ষত্রের বস্তুর ঘনত্ব প্রতি ঘন সে. মি. এ 10^{14} গ্রাম। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, পৃথিবীর বস্তুর ঘনত্ব প্রতি ঘন সে. মি.-এ 5.5 মাত্র।

ভূপৃষ্ঠে বসে এ ধরণের ঘনত্ব কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র। এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। নিউট্রন নক্ষত্রের বস্তুর দ্বারা গঠিত একটি সিগারেটের ওজন হয়ে দাঁড়াবে পৃথিবীর সকল মানবকুলের ওজনের সমান! প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—এই অস্বাভাবিক ঘনত্ববিশিষ্ট বস্তু কিভাবে অবস্থান করে—অর্থাৎ গ্যাস, তরল, কঠিন, না অন্য কিছু? এ সম্বন্ধে এখনও গবেষণা চলেছে।

আমরা জানি কোন বস্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে থাকলে কিছুটা শক্তি আহরণ করে। তাকে ভূপৃষ্ঠে ফেলে দিলে সেই শক্তি প্রধানতঃ আংশিক শব্দ ও আংশিক উত্তাপে রূপান্তরিত হয়ে যায়। নিউট্রন নক্ষত্রের পৃষ্ঠে যদি একটুকরো চক ফেলা হয় তার থেকে যে শক্তি নির্গত হবে, তা ছোটখাট একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণের সমান!

ঘনত্ব বেশী বলে মাধ্যাকর্ষণও অত্যধিক। তাই নিউট্রন নক্ষত্রের উপরিভাগ খুব মসৃণ। বস্তু পৃষ্ঠদেশ থেকে উপরে উঠে গিয়ে সহজে 'পাহাড়' সৃষ্টি করতে পারে না। যদি নিউট্রন নক্ষত্রে পাহাড় থেকে থাকে, তার উচ্চতা খুব বেশী হলে এক সেঃমিঃ হবে! শুধু তাই নয়; ঐ এক সেঃ মিঃ পাহাড়ে চড়তে

যে শক্তি ক্ষয় হবে, তাতে 10^5 বার এভারেষ্টে ওঠা যাবে!

আগেই বলা হয়েছে, নিউট্রন নক্ষত্রের ঘূর্ণনের ফলে পাল্‌সারের সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণনজনিত শক্তি বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ বিকিরণের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পর্যবেক্ষণ থেকে আরও দেখা গেছে, পাল্‌সার থেকে গৃহীত বেতার-তরঙ্গের স্পন্দন একমুখী, এর থেকে হিসাব করা হয়েছে নিউট্রন নক্ষত্রের উপরিভাগে চুম্বক ক্ষেত্রের পরিমাণ 10^{12} গাউস! ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোথাও এত অত্যধিক পরিমাণের চুম্বক ক্ষেত্র আছে বলে জানা নেই।

উপসংহার—'চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা'—এদের নিয়েই জ্যোতিষ্কমণ্ডল গঠিত বলে বেশীর ভাগ লোকের ধারণা। কারণ খালি চোখে আমরা মোটামুটি এই কয়েক প্রকার জ্যোতিষ্কের সঙ্গেই পরিচিত। উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে, জ্যোতির্বিদ্যা আজ কতদূর এগিয়েছে।

বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সব শাখারই অবদানের ক্ষেত্রে উত্থান-পতন আছে। জ্যোতির্বিদ্যাও তার ব্যতিক্রম নয়। সে দিক থেকে বিচার করলে গত পনের বছরে জ্যোতির্বিদ্যা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে। এসময়ে তত্ত্ব ও তথ্য উভয় দিকেই অনেকগুলি অতি চমকপ্রদ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। নিউট্রন নক্ষত্র এদেরই অন্যতম।

শীত-ঘুম

রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়*

[শীত-ঋতুর কঠিন শাসন থেকে আত্মরক্ষার করার এক অভিনব পন্থা হল শীত-ঘুম যা প্রাণী-জগতের এক বৃহদংশ জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য গ্রহণ করেছে। শীত-ঘুমের গভীরতা নির্ভর করে শীতের তীব্রতার উপর। শীতল-শোণিতবিশিষ্ট প্রাণীরাই শীত-ঘুমে কাতর হয় বেশী কিন্তু অনেক স্তন্যপায়ী ও পাখি শীতকালে দীর্ঘস্থায়ী নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ে। হাইপোথ্যালামাসের ভূমিকা প্রাণীদের শীত-ঘুমের ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শীত-ঘুম এক জৈবিক ছন্দের প্রকাশ মাত্র। শীত ঘুম যে বাৎসরিক হতে হবে এমন নয়। আহ্নিক শীত-ঘুমও আছে বাদুড় এবং হামিংবার্ড ও সুইফ্‌ট পাখিদের জীবনে।]

ছয় ঋতুর আবর্তনের সঙ্গে জীবজগতের এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি, পরিবেশের উষ্ণতা ও আর্দ্রতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীকুল শারীরবৃত্তীয় অভিযোজনের দ্বারা জীবন-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু বেশীর ভাগ প্রাণী চরম অবস্থাকে পাশ কাটিয়ে যায়; অত্যধিক উষ্ণতা ও সুতীব্র শৈত্য তারা ভয় করে কারণ সুষ্ঠু বিপাকীয় প্রক্রিয়াগুলি নির্দিষ্ট তাপসীমার সঙ্গে সম্পৃক্ত। শীতঋতুর কঠিন শাসন থেকে আত্মরক্ষা করা এক দুরূহ সমস্যা। অনেক প্রাণী এ সমস্যা সমাধান করেছে এক অভিনব পন্থায়—শীত-ঘুম বা 'হাইবারনেসান'-এর মাধ্যমে অথবা অপেক্ষাকৃত

*সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা-700009

উষ্ণ অঞ্চলে দেশান্তর যাত্রা করে। মূল ল্যাটিন শব্দ 'হাইবারনেয়ার' থেকে উৎপত্তি হয়েছে ইংরাজিশব্দ 'হাইবারনেশান' যার আক্ষরিক অর্থ হল সুপ্ত অবস্থায় শীত যাপন করা। কীট-পতঙ্গ, শামুক, মাছ, উভচর ও সরীসৃপ প্রভৃতি শীতল শোণিত প্রাণীসমূহ যাদের দেহগভীরের উষ্ণতা আবহ উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে কমে ও বাড়ে তারা এবং সমোষ্ণ প্রাণী হিসাবে পরিচিত কয়েকটি পাখি ও স্তন্যপায়ী শীতকালে গর্তের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ পরিমণ্ডলে আশ্রয় নিয়ে নিস্পন্দ অবস্থায় থাকে বা শীত-ঘুম দেয়।

শীত-নিদ্রা প্রকৃতির এক আজবব্যবস্থা

প্রাণীবিশেষে কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত শীত-নিদ্রার মেয়াদ থাকে এবং শীতের তীব্রতার উপর শীত-ঘুমের গভীরতা নির্ভর করে। বলাবাহুল্য নিরক্ষীয় অঞ্চল অপেক্ষা শীতশীতোষ্ণ বলয় ও মেরু অঞ্চলের প্রাণীদের জীবনে শীত-নিদ্রা বা শীতসুপ্ত অপরিহার্য। শীতই শীত-ঘুমের প্রধান কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং এই ঘুম সাধারণ ঘুমও নয়। শীত-ঘুমের সময় প্রাণীদের সংবেদনশীলতার মাত্রা অত্যন্ত হ্রাস পায়। শীত-নিদ্রার এই আজব ব্যবস্থার বিষয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল ধরে অনুসন্ধান করছেন। রোমদেশীয় প্রখ্যাত প্রকৃতি বিজ্ঞানী প্লিনী (Pliny) খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তাঁর 'ন্যাচারাল হিষ্ট্রি' গ্রন্থে ভালুকের শীত-ঘুম প্রসঙ্গে লিখেছেন যে শীতের আগে ভালুক গর্তের ভিতর ডালপালা জমা করে তার উপর শুকনো পাতা বিছিয়ে একটি সুন্দর শয্যা রচনা করে এবং শীত এলে সেখানে ঘুমোয়। পুরুষ ভালুক ঘুমায় চল্লিশ দিন কিন্তু স্ত্রীভালুক ঘুমোয় চার মাস এবং প্রথম এক পক্ষকাল ঘুম এত গভীর থাকে যে গায়ে খোঁচা মারলেও ঘুম ভাঙ্গে না। সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানীরা শীতযাপক প্রাণীদের দেহে নিদ্রার পূর্বে ও নিদ্রার সময় যে সব শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে তা দেখে বিস্মিত হয়েছেন এবং এমন অনেক তথ্য পেয়েছেন যা প্রাণীদের দেহতাপ নিয়ন্ত্রণের কূট কৌশল বুঝতে সাহায্য করবে।

প্রাণীদের মধ্যে উভচরদের ঋতুপরিবর্তন অনুভব করার এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে এবং শীতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তারা পৃথিবীর জঠরে আশ্রয় নেয়। তারপর ঋতুরাজ বসন্তের আগমনের শুভ-সংবাদে এরাও অলস-নিদ্রা ত্যাগ করে বাইরে এসে আপন কণ্ঠে বসন্ত-বন্দনায় মত্ত হয়। গিরগিটি, সাপ, গোসাপ, কূর্ম ও কুমীর প্রভৃতি সরীসৃপরা কনকনে ঠাণ্ডায় বাইরে বেরোয় না। সাপ গর্তের মধ্যে বৃক্ষের কোটরে অথবা স্তূপীকৃত জঞ্জালের মধ্যে আশ্রয় নেয় এবং লম্বা শরীরটাকে কুণ্ডলী করে নিস্পন্দ অবস্থায় থাকে। শীতের সময় বিভিন্ন প্রজাতির সাপকে একসঙ্গে জড়াজড়ি করে ঘুমোতে দেখা যায় যদিও অন্য সময় তারা পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। শীত-ঘুমের সময় সবাই বন্ধু, কেউ শত্রু নয়। এর একটা সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী কনরাড লোরেঞ্জ (Conrad Lorenz)। উত্তর আমেরিকায় বারোফুট দীর্ঘ একটি গর্তে এক শীতের সময় অত্যন্ত বিষধর আড়াইশো র‍্যাটল সাপ, কয়েকটি ব্যাঙ, গিরিগিটি, কচ্ছপ, ইঁদুর, খরগোশ, মেঠো-কাঠবেড়াল, মৌমাছি, পেঁচা ও প্রেইরীকুকুরকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। উভচর ও সরীসৃপদের তীব্র শীত সহ্য করার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। শীতে দেহের কোন অঙ্গ যদি জমেও যায় কিন্তু হৃদপিণ্ডের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা যদি শূন্য ডিগ্রি সেলেসিয়াসের নীচে না নামে তবে শীতের শেষে তারা আবার জেগে ওঠে। শীতপ্রধান দেশের কচ্ছপরা তুষারপাতের সময় বরফের নীচে বেশ আরামে ঘুমোতে পারে। উভচর ও সরীসৃপদের মত শীতল-শোণিত প্রাণী মাছেদের মধ্যে কিন্তু শীত-ঘুমের ব্যাপার নেই বললেই চলে। বাতাস যত তাড়াতাড়ি গরম বা ঠাণ্ডা হয়, সমূদ্রের জল তত তাড়াতাড়ি হয় না। কাজেই সমূদ্রের মাছেদের

স্থলচর প্রাণীদের মত পরিবেশ পরিবর্তনের চাপ সইতে হয় না। জলের একটা স্তর থেকে অন্যস্তরে গেলে তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে। মাছ সর্বত্র সমান শীতল পরিবেশে বাস করতে অভ্যস্ত বলে শীতল-শোণিত স্থলচর প্রাণীদের মত শীতে নাজেহাল হয় না। সামুদ্রিক মাছেদের মধ্যে শীত-ঘুম বিরল। প্লেইস (Plaice) নামে একটি সামুদ্রিক মাছ শৈশবাস্থায় শীত-ঘুম দেয় কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ অভ্যাস চলে যায়। খাল, বিল, নদী ও পুকুরের মিঠাজলের মাছেদের মধ্যে কিন্তু শীত-ঘুম দেখা যায়। রুই, কাতলা প্রভৃতি পোনামাছ শীতকালে জলের তলায় পাঁকের কাছাকাছি চলে যায় এবং পরস্পরের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে একটি বৃত্ত রচনা করে। টেঞ্চ (Tench) নামে একটি বিদেশী পোনামাছ শীতের সময় নদীগর্ভে গর্তের মধ্যে এমন গভীর ঘুমে ডুবে থাকে যে তাকে ডাঙায় তুলে আনলেও ঘুম ভাঙে না। অধিকাংশ কীট-পতঙ্গ শীত-ঘুমে আচ্ছন্ন থাকলেও মৌমাছিরা কিন্তু ব্যতিক্রম – তারা মৌচাকের তাপমাত্রা বাড়াবার জন্য একসঙ্গে দ্রুততালে ডানা কাঁপায়। অধিকাংশ মাকড়সা শীতে ঘুমোয় না কিন্তু 'ট্র্যাপডোর' (Trap-door) মাকড়সা বাসার গর্তের মুখ লালা ও মাটি মিশিয়ে বন্ধ করে দিয়ে বেশ সুখে নিদ্রা দেয়।

শীত-ঘুম শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন

শীতল-শোণিত প্রাণীসমূহ যাদের দেহে খাদ্যবস্তুর সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে জৈব শক্তি উৎপাদন বা মৌল-বিপাকের হার সংক্ষেপে বি. এম. আর কম এবং যাদের দেহে তাপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নত নয়, তাদের জীবনে শীত-ঘুম অবশ্য পালনীয় আচরণ হিসাবে গণ্য করা হয়।

পরিবেশের তাপমাত্রার উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল হলেও কয়েকটি সরীসৃপ যেমন কণ্টকত্বক কৃকলাস (Horned toad), ভারতীয় ময়াল দেহতাপ বৃদ্ধি করার বিচিত্র পন্থা উদ্ভাবন করেছে। ময়াল সাপ ডিমে তা দেবার সময় অনবরত পেশীসঙ্কোচন করে পরিবেষ্টক উষ্ণতার চেয়ে 7° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উপরে দেহতাপ বৃদ্ধি করতে পারে। সাম্প্রতিক কালে সরীসৃপদের মস্তিষ্কে হাইপোথ্যালামাসে একটি কোষ-গোষ্ঠীর সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন যার মাধ্যমে সরীসৃপরা হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রিত করে দেহতাপকে স্বল্পকালের জন্য একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরে রাখতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য এটা সম্ভব নয় কারণ মূলতঃ এরা আবহউষ্ণতা থেকেই দেহতাপ সঞ্চয় করে। বিবর্তনের পরবর্তী অধ্যায়ে সরীসৃপ গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত পাখি ও স্তন্যপায়ীদের সমোষ্ণতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ এর ফলেই এদের পক্ষে পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তার লাভ করা সম্ভব হয়েছে। উচ্চমৌল বিপাক, উন্নততর রক্ত সংবহনতন্ত্র ও মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের গঠনের জন্যই পাখি ও স্তন্যপায়ীরা এই বিরাট সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু এত সব জটিল ব্যবস্থা থাকা সত্বেও প্লাটিপাস বা হংসচঞ্চু, অপোসাম, মারমট, মেঠো কাঠবেড়াল, কাঁটাচুয়া, বাদুড়, প্রেইরীকুকুর প্রভৃতি কয়েকটি স্তন্যপায়ী এবং হামিংবার্ড ও পুওরুউইল বা নাইটজার নামে দুটি পাখি শীত-ঘুমের মাধ্যমে শীত অতিবাহিত করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এদের দেহগভীরের তাপমাত্রা অন্যান্য উষ্ণশোণিত প্রাণীদের থেকে অপেক্ষাকৃত কম এবং পরিবেশের তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমে ও বাড়ে। তীব্র শীতের সময় পরিবেষ্টক তাপমাত্রা যখন ধীরে ধীরে হিমাঙ্কের দিকে এগিয়ে চলে এবং পরিবহন ও পরিচলন দ্বারা দেহত্বক থেকে তাপক্ষরিত হয় এবং বিপাকীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহতাপ বৃদ্ধি করে সেই ক্ষয়পূরণ যখন ব্যর্থ হয় তখন ঘুমের ভারি কম্বল একমাত্র সম্বল। শীতের সঙ্গে সংগ্রাম করার চেয়ে এই পন্থার অভিযোজন অনেক লাভজনক বলেই এই সব সমোষ্ণ প্রাণী এটা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ এই সব প্রাণী তখন কিছুদিনের জন্য শীতলশোণিত প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। পুরোমস্তিষ্কের অঙ্কদেশে অবস্থিত হাইপোথ্যালামাসের পশ্চাদ্দেশীয় স্নায়ুকেন্দ্র

সমূহের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার দরুণ মৌল-বিপাক, হৃদস্পন্দন হ্রাস পায় এবং দেহতাপও নেমে যায় পরিবেশের নিম্নমুখী তাপমাত্রার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। হাইপোথ্যালামাস সমবেদী স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ামকও বটে এবং এরই নির্দেশে স্বতন্ত্র-স্নায়ুতন্ত্র প্রান্তভাগ থেকে নিঃসৃত 'নরঅ্যাড্রেন্যালিন' বাহুসংকোচন ঘটায় এবং স্বেদগ্রন্থিগুলি নিষ্ক্রিয় করে দেয় বলে শীত-নিদ্রার সময় দেহ থেকে তাপক্ষয় রোধ হয়। এইভাবে যে সব উষ্ণশোণিত প্রাণীরা শীত-অতিবাহিত করে তাদের stubboru ও indifferent উষ্ণ-শোণিত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নৈকষ্যসবোষ্ণ প্রাণীরা বা Obligate home-otturms কিন্তু এই পন্থা গ্রহণ করে নি, তারা যতক্ষণ সম্ভব দেহতাপ উৎপাদন করে শীতের সাথে লড়াই করে, না পারলে মৃত্যুর হিমশীতল কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। জান গেলেও কিন্তু মান দেয় না।

শরতের সুরু থেকেই প্রাণীরা শীত-ঘুমের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে। প্রাণীরা দেহে চর্বির মজুদ ভাণ্ডার এবং যকৃৎ ও পেশীতে গ্লাইকোজেন সঞ্চয় করে যার সাহায্যে শীতে প্রাণধারণ সম্ভব হয়। জেপাস (Zapus) নামে একটি ইঁদুর প্রতিদিন 2 গ্রাম চর্বি সঞ্চয় করে। কেবলমাত্র স্তন্যপায়ীদের বুকে ও গলায় মাইওগ্লোবিন, (myoglobin), ফ্ল্যাভিন (flavin), সাইটোক্রোম (cytochrome যুক্ত এবং মাইটোকন্ড্রিয়াপুষ্ট বিশেষ এক ধরণের বাদামী রঙের চর্বিকলা বা brown adipose tissue জমে এবং এই কলা শীতের সময় তাপশক্তির প্রধান উৎস বলে একে শীতঘুমগ্রন্থি বা 'হাইবারনেটিং গ্ল্যাণ্ড' বলা হয়। শীত-ঘুমের সময় প্রাণীরা খুব হিসেব করেই এই চর্বি খরচ করে এবং দেহগভীরের তাপমাত্রা পরিবেষ্টন তাপমাত্রার চেয়ে 2/1 ডিগ্রী উপরে রাখে। শীতনিদ্রামগ্ন প্রাণীদের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনগুলিও বিস্ময়কর। উত্তর আমেরিকার গুহাবাসী কাঠবেড়ালের দেহতাপ 10 ঘণ্টার মধ্যে 32° সেন্টিগ্রেড থেকে 8° সেঃ নেমে যায়, প্রতি মিনিটে হৃদস্পন্দনের হার 200 থেকে 300-র জায়গায় মাত্র 10 থেকে 20 বার এবং শ্বসনের হার 100 থেকে 200-র স্থলে মাত্র 4 বার। উত্তর আমেরিকার রকি-পর্বতাঞ্চলে, ইউরোপের আল্পস্ ও হিমালয় পর্বতমালার অধিবাসী 'মারমট্' নামে একটি কাঠবেড়ালি জাতীয় প্রাণী শীতের প্রারম্ভে প্রায় 10 গজ লম্বা একটি সুড়ঙ্গপথের শেষে গৃহরচনা করে সেখানে পনেরো জন সভ্য একসঙ্গে থাকতে পারে। বাইরের তাপমাত্রা 60° ফারেনহাইটের নীচে নেমে গেলে তারা এই কক্ষে আশ্রয় নেয় এবং গোটা শীতকাল ঘুমিয়ে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় মারমট মিনিটে 16 বার শ্বাসগ্রহণ করে এবং মিনিটে হৃদপিণ্ড 88 বার স্পন্দিত হয় কিন্তু ঘুমের সময় প্রতি মিনিটে 2বার শ্বাস নেয় এবং হৃদস্পন্দন হয় মাত্র 15 বার। উড্‌চাক বা গ্রাউণ্ডহগ্ নামে পরিচিত উত্তর আমেরিকার একটি মারমট শীত-ঘুমের সময় এক অদ্ভুত আচরণ করে। শোনা গেছে, 2রা ফেব্রুয়ারী শীত-ঘুমের শেষে উড্‌চাক বাসা থেকে বেরিয়ে আসে কিন্তু যদি নিজের দেহের ছায়া দেখতে পায় তবে ফের গর্তের মধ্যে ঢুকে আরও ছ'সপ্তাহ ঘুমোয়! দেহে প্রচুর লোম থাকলেও ভারিক্কি চেহারার ভালুক অত্যন্ত শীতকাতুরে, তাই শীতের আগেই গর্তের মধ্যে শুকনো পাতা বিছিয়ে একটি সুন্দর শয্যা তৈরি করে রাখে যাতে আরাম করে ঘুমোনো যায়। একটা মজার ব্যাপার এই যে, স্ত্রীভালুক প্রথমে গর্তে প্রবেশ করে, স্বামী তাকে অনুসরণ করে। শীতের সময় প্রায় দু শো কিলো-গ্রাম ওজনের দেহের সর্বত্র তাপসঞ্চালন করার জন্য যে পরিমাণ তাপ উৎপাদন করা দরকার তা সম্ভব নয় বলেই ভালুক সারা শীত অনাহারে নিস্পন্দ অবস্থায় গর্তের মধ্যে জবুথবু হয়ে পড়ে থাকে। মারমট, ডরমাউস প্রভৃতি শীতযাপক প্রাণীদের মত ভালুকের দেহতাপ কিন্তু ততটা হ্রাস পায় না, বাইরের তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীতে নেমে গেলেও দেহতাপ 31—34° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে।

ভালুককে তাই আংশিক শীতযাপক প্রাণী বলে গণ্য করা হয়। শীতের সময় পতঙ্গরা ঘুমিয়ে থাকে, তাই পতঙ্গভুক্ বাদুড়রাও ঘুমোতে বাধ্য হয়। শীতের সময় যাতে দেহ থেকে বেশী তাপ বেরিয়ে না যায় সেজন্য অধিকাংশ প্রাণী দেহের আয়তন যতটা সম্ভব কমিয়ে ফেলে কিন্তু বাদুড়রা তা করে না। প্রাত্যহিক নিদ্রার সময় যেমন মাথা নীচু করে ঝুলে থাকে, শীতকালেও সেই একই ভঙ্গিতে ঘুমোয়। প্রশস্ত ডানা থেকে যাতে তাপ বেরিয়ে না যায় সেজন্য চক্ষু ও নাসারন্ধ্রের মধ্যে অবস্থিত গ্রন্থিসমূহ থেকে তৈলজাতীয় রস ক্ষরণ করে ডানার চামড়ায় মাখিয়ে নেয়। বিস্ময়কর মনে হলেও বিবর্তনের শেষ পর্বে সৃষ্ট প্রাইমেটগোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীদের মধ্যেও শীত-ঘুম আছে। ফরাসী প্রকৃতি বিজ্ঞানী বুরলিয়র-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে মাদাগাস্কার দ্বীপে ক্ষুদ্রকায় দুটি লেমুর ডাইরোগ্যালিউস্ ও মাইক্রোসিবস শীতকালে শীত-ঘুমে ডুবে থাকে এবং এ সময় এদের দেহতাপ 20° সেন্টিগ্রেড নেমে যায়।

বিহঙ্গ জগতে শীতঘুমের ব্যাপার নেই বললেই হয়, কারণ পাখিদের দেহতাপ অন্যান্য প্রাণীদের থেকে বেশী প্রায় 40° সেঃ এবং শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শীতপ্রধান দেশের পাখিরা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে যাত্রা করে। একমাত্র ব্যতিক্রম ক্যালিফোর্ণিয়ার মরু অঞ্চলের পুওর-উইল পাখি। শীতের সময় এদের খাদ্য কীট-পতঙ্গ পাওয়া যায় না বলে ঢিবির গর্তের মধ্যে এরা ঘুমিয়ে থাকে এবং এ সময় এদের দেহতাপ 104° ফারেনহাইট থেকে 64° ফাঃ নেমে যায়। বার্ষিক শীত-ঘুম ছাড়াও আহ্নিক শীতঘুমের ব্যবস্থা আছে হামিংবার্ড ও সুইফট্ নামে দুটি পাখি এবং বাদুড়ের বেলায়। রাত্রে ঘুমোবার সময় এই দুটি প্রজাতির পাখির নাড়ী স্পন্দন ও বিপাকের হার হ্রাস পায় এবং দেহতাপ পরিবেষ্টক তাপমাত্রার কাছাকাছি নেমে যায়। অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে নিশাচর বাদুড়ের ক্ষেত্রে যখন সে দিনে ঘুমিয়ে থাকে। প্রাত্যহিক ঘুমের সময় সকল প্রাণীদের মৌল বিপাকের হার ও দেহতাপ কিঞ্চিৎ হ্রাস পেলেও এরকম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে না। সমোষ্ণ প্রাণী হলেও এই আহ্নিক দেহতাপ হ্রাসবৃদ্ধির কারণ হল যে এরা যতক্ষণ সক্রিয় থাকে ততক্ষণ দেহতাপ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম কিন্তু বিশ্রামের সময় তা পারে না বলেই দেহতাপ হ্রাস পায়।

শীতযাপক প্রাণীদের শীত-ঘুমের গভীরতা সম্বন্ধে অনেক চমকপ্রদ তথ্য বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করেছেন যেমন শীত-নিদ্রামগ্ন উড্‌চাক্‌কে 4 ঘণ্টা কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাসের মধ্যে রাখলেও তার শরীরে কোন বিষক্রিয়ার প্রকাশ দেখা যায় না, বাদুড়কে 1 ঘণ্টা জলের মধ্যে চুবিয়ে রাখলেও তার ঘুম ভাঙ্গে না, ঘুমন্ত ডরমাউসকে বলের মত গড়িয়ে দিলেও জাগবে না এবং কাঁটাচুয়া নিদ্রিত অবস্থায় সাঁতার কাটতেও পারে। শীত-ঘুমের সময় প্রাণীদের দেহে যে সব বিস্ময়কর শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে থাকে সেগুলি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহ এবং স্নায়ুতন্ত্র যৌথভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। উষ্ণশোণিত প্রাণীদের বেলায় দেহতাপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শূন্যডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে নূতন বিন্দুতে স্থাপিত হয় এবং শীতলশোণিত প্রাণীতে পর্যবসিত হয়। নিদ্রাভিভূত হবার অব্যবহিত পূর্বে বাহুপ্রসারণ মাধ্যমে দেহতাপ বের করে দেবার পর দেহত্বকে প্রসারিত শোণিত জালিকাসমূহ সঙ্কুচিত হয় এবং এটা ঘটে সমবেদীস্নায়ুতন্ত্রর প্রান্তভাগ থেকে নিঃসৃত নরঅ্যাড্রিন্যালিনের সাহায্যে। শীত-ঘুমের সময় অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহের নিয়ামক পিটুইটারি-গ্রন্থির উদ্বর্তন হয় এবং এ কারণেই থাইরয়েড গ্রন্থির ক্ষরণ থাইরক্সিনের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং মৌলবিপাকের হারও নেমে যায়। পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত যে শীতনিদ্রামগ্ন প্রাণীদের শরীরে দ্রবীভূত পিটুইটারী কিংবা থাইরক্সিন্ প্রয়োগ করলে তাদের ঘুম ভেঙে যায়। শীত-ঘুমের সময় অগ্ন্যাশয়ের অভ্যন্তরে দ্বীপমালার মত সজ্জিত ল্যাঙ্গারহ্যান্‌স্ কোষপুঞ্জের বৃদ্ধি হয় এবং রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। সুতরাং ইনসুলিন প্রয়োগ নিদ্রা

ত্বরান্বিত করবে। অ্যাড্রিনালগ্রন্থির মেডালা থেকে ক্যাটেকল অ্যামাইনবর্গীয় হরমোন নর-অ্যাড্রিন্যালিনের ক্ষরণও বৃদ্ধি পায় এবং শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীতে বিশেষ অংশগ্রহণ করে। শীত-ঘুমের সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ ও হৃদস্পন্দন মৃদুছন্দে চলে বলে রক্তসংবহনের বেগ মন্দীভূত হয় কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে থ্রম্বোসিস হয় না। রক্তে প্রোথ্রম্বিনের পরিমাণ হ্রাস এবং প্লাজ্মা প্রোটিনের অণুর মৌলিক পরিবর্তনের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। শীত-নিদ্রায় সময় রক্তে লোহিতকণিকার বংশবৃদ্ধি ও হিমোগ্লোবিনের আধিক্য ছাড়াও ম্যাগ্নেসিয়াম আয়নের প্রাচুর্য বিশেষ লক্ষণীয়। শীত ঘুমে মগ্ন বাদুড় ও মারমটের রক্তে 92% ম্যাগ্নেসিয়াম পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য চেতনাবিলোপ করার ব্যাপারে ম্যাগ্নেসিয়ামের বিশেষ ভূমিকা আছে। সাম্প্রতিককালে জানা গেছে যে বাদুড় ও গুহাবাসী কাঠবেড়াল (Citellus) শীত-ঘুমের সময় রঞ্জনরশ্মির প্রভাব প্রতিরোধেও সক্ষম।

বিভিন্ন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহের নিয়ন্ত্রক পিটুইটারীকে পরিচালিত করে হাইপোথ্যালামাস এবং শীতা-নিদ্রার সময় হাইপোথ্যালামাসের সক্রিয়তা হ্রাস পাওয়ার দরুণ মৌলবিপাক, হৃদঘাত ও দেহতাপ কমে যায়। হাইপোথ্যালামাস কিন্তু সতর্কপ্রহরীর মত নিদ্রিত প্রাণীকে পাহারা দেয় এবং পরিবেষ্টক তাপমাত্রার ঊর্ধ্বে দেহতাপ বজায় রাখে। পরিবেশের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে গেলে সংবেদনশীল তাপগ্রাহক কোষ মারফৎ সেই সংবাদ হাইপোথ্যালামাসে প্রেরিত হলেই তীব্র শীত-কম্পনের সাহায্যে পেশীর বিপাকীয় প্রক্রিয়ার বৃদ্ধি ঘটিয়ে এবং নর-অ্যাড্রিন্যালিনের সাহায্যে চর্বিকলা জারিত করে দেহতাপ সৃষ্টি করা হয় এবং নিদ্রিত প্রাণী জেগে ওঠে। শীত-ঘুমের সময় দেহের অভ্যন্তরে স্থৈতিকসাম্য (homeostasis প্রতিষ্ঠা করে এই বিচিত্র অভিযোজন সফল করেছে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহ এবং কেন্দ্রীয় ও সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র। বিজ্ঞানীরা এই অবস্থাকে স্বাভাবিক অভিযোজনের ঐক্যতান বা 'জেনারেল অ্যাডাপটেসান্ সিন্ড্রেম (General adaptation syndrome) বলেছেন।

শীত-ঘুমের পরে

সারা শীতকাল নিদ্রাদেবতা মরফিয়াসের রাজ্যে বাস করার পর বসন্তের প্রথম প্রভাতে জেগে ওঠে তখন প্রাণীদের দেহে যে সব পরিবর্তন হয় তাও বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করেছেন। শীতযাপক আবহ উষ্ণ উভচর ও সরীসৃপ এবং সমোষ্ণ স্তন্যপায়ী ও পাখির মধ্যে একটা প্রধান পার্থক্য হল এই যে, সমোষ্ণ প্রাণীরা স্বয়ংক্রিয় শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে দেহতাপ বৃদ্ধি করে শীত-ঘুম থেকে জেগে ওঠে কিন্তু শীতলশোণিত প্রাণীরা পরিবেষ্টক তাপমাত্রা বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। দেহে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন অথবা চর্বি নিঃশেষ হয়ে গেলে প্রবল শীত সত্ত্বেও প্রাণীরা খাদ্যের সন্ধানে বেরোয় প্রাণরক্ষার তাগিদে। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ লাইম্যান এবং ডঃ চ্যাট্ফিল্ড (Lyman and Chatfield) সিরিয়াহ্যামষ্টারের উপর পরীক্ষা করে দেখেছেন যে শীত-ঘুমের সময় দেহের সর্বত্র একই উষ্ণতা থাকে কিন্তু জাগরণের সময় দ্রুত অঙ্গসঞ্চালন এবং শীতকম্পন মারফৎ দেহের অগ্রভাগের উষ্ণতা পশ্চাদ্ভাগের চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পশ্চাদ্দেশের রক্তকণিকার সঙ্কোচন ঘটিয়ে এই তাপ কেবলমাত্র মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসে চালিত করা হয়। কারণ জীবনধারণের জন্য এই অঙ্গত্রয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। দেহের সম্মুখভাগের উষ্ণতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলে পশ্চাদভাগের বাহসংকোচন শিথিল করা হয় এবং তখন সমস্তদেহে সমোষ্ণতা ফিরে আসে। যে সব প্রাণীদের দেহে বাদামী চর্বিকণা (brown adipose tissue) থাকে তারা শীতকম্পন ব্যতিরেকে তাপ উৎপাদনে সক্ষম। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেঠো কাঠবেড়াল মাত্র 4 ঘণ্টায় দেহতাপ 4° সেঃ থেকে 35° সেঃ বাড়াতে

পারে। 144 দিন কৃত্রিম শীতকক্ষে ঘুমিয়ে থাকার পর মাত্র 15 মিনিট পরে বাদুড় স্বচ্ছন্দে গগনবিহার করে। শীত-নিদ্রার অব্যবহিত পূর্বে ও পরে বাহনিয়ামকতন্ত্রের মাধ্যমে রক্তজালিকার সংকোচন ও প্রসারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। চর্বিকলা থেকে তাপ উৎপাদনের জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও হাইপোথ্যালামাসের অবদান কম নয়। পরিবেষ্টক উষ্ণতা হ্রাস পেলে তাপস্থাপক হাইপোথ্যালামাস সক্রিয় হয়ে ওঠে; সমবেদী স্নায়ুর প্রান্তভাগ থেকে নিঃসৃত নর-অ্যাড্রিন্যালিন হরমোন লাইপেজ্ উৎসেচককে উজ্জীবিত করে এবং ট্রাইগ্লিসারাইড অণু গ্লিসারল্ ফ্যাটি অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেটে (ATP) মাধ্যমে ফ্যাটি অ্যাসিডের অণুর বন্ধনে আবদ্ধ রাসায়নিক শক্তি থেকে তাপ উৎপন্ন হয়।

প্রাণীদের শীত-ঘুমের সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানে 'ডিপ্ হাইপোথারমিয়া' পদ্ধতি বা দেহতাপ-কৃত্রিম উপায়ে অবনমিত করে দেহ হিমায়িত করার সঙ্গে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। কারণ উভয়-ক্ষেত্রে একই ধরণের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। বলাবাহুল্য প্রাণীদের শীতঘুম বিজ্ঞানীদের এই পদ্ধতি উদ্ভাবনে প্রেরণা জুগিয়েছে। বেলগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট্ অব ফিজিওলজীর অধ্যাপক ডঃ অ্যানড্জু (Andju) ওষুধ প্রয়োগ করে ইঁদুরের দেহতাপ 1° সেঃ পর্যন্ত নামিয়ে দিয়েছিলেন এবং প্রায় দেড়ঘণ্টা হৃদপিণ্ড ও শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ বন্ধ থাকলেও পুনরায় তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছিলেন তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতির সাহায্যে যা বিজ্ঞান জগতে 'অ্যানড্জু'র পদ্ধতি নামে পরিচিত। প্রাণী-জগতে শীত-নিদ্রার সময় পরিবেষ্টক তাপমাত্রা ধীরে ধীরে হ্রাস পায় বলে দেহগভীরের তাপমাত্রাও মন্থরতালে কমে। কিন্তু হাইপোথারমিয়া করা হলে দেহতাপ দ্রুত নেমে যায়। হাইপোথারমিয়ার পর প্রাণী বা মানুষ কারোর অনুভূতি থাকে না কিন্তু শীতযাপক হ্যামষ্টারের দেহতাপ 3·4° সেঃ নেমে গেলেও সংবেদনশীলতা অক্ষুণ্ণ থাকে। শীতযাপক এবং শীতযাপক নয় এমন দু-রকমের স্তন্যপায়ীর উপর হাইপোথারমিয়া পদ্ধতি অনুযায়ী দেহতাপ হিমাঙ্কের কাছাকাছি নামিয়ে দিয়ে দেখা গেছে যে শীতযাপক প্রাণীরা আপন ক্ষমতা বলে দেহতাপ বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু যারা শীতযাপক নয় তাদের ডঃ অ্যানড্জুর পদ্ধতি অনুসরণে কৃত্রিম উপায়ে হৃদপিণ্ডের উষ্ণতা বৃদ্ধি ও শ্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাণীদের স্বাভাবিক শীতনিদ্রার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ 'হাইপোথারমিয়া' চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যুগান্তর এনেছে এবং মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করছে।

শীত-ঘুম এক জৈবিক ছন্দের প্রকাশ

সাম্প্রতিকালে জীববিজ্ঞানীরা বলছেন যে শীত-নিদ্রা কেবলমাত্র পরিবেশ-নির্ভর নয়, জীবনের গভীরে স্থাপিত এক অদৃশ্য জৈবিক ঘড়ির বা 'বায়োলজিক্যাল্ ক্লক' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জাগরণ ও নিদ্রা যেমন 'সারকেডিয়ান ক্লক (circadian clock) বা আহ্নিক জীবনঘড়ির মন্দমধুর ছন্দ তেমনি শীত-নিদ্রা 'সারক্যানুয়াল ক্লক' বা বার্ষিক 'জীবন-ঘড়ি' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছন্দ বিশেষ। পেঞ্জলে ও ফিশার (Pengelley and Fisher) নামে দু জন জীববিজ্ঞানী আমেরিকার গুহাবাসী কাঠবেড়াল (Citellus)-এর উপর পরীক্ষা করে কয়েকটি চমকপ্রদ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই প্রজাতির কাঠবেড়াল শীতকালে গভীর শীত-ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। গ্রীষ্মকালে কৃত্রিম শীতকক্ষে হিমাঙ্কের কাছাকাছি তাপমাত্রায় রাখলেও ইঁদুর শীত-ঘুমে ডুবে যায় না, স্বাভাবিক জীবন-যাপন করে। অপরদিকে শীতকালে 35° সেঃ উষ্ণতাবিশিষ্ট কক্ষে রেখে দেখা গেছে যে কক্ষে আলো এবং তাপমাত্রা বেশী থাকার জন্য ইঁদুর

ঘুমোতে পারে না কিন্তু প্রচুর খাদ্য সত্বেও অনাহারে থাকে এবং দেহের ওজন ক্রমশঃ হ্রাস পায় এবং অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনও হয় ঠিক যেমনটি দেখা যায় শীতের সময় প্রকৃতিক পরিবেশে। বিহঙ্গজগতে যাযাবরী বৃত্তি ও বার্ষিক জীবনঘড়ির ছন্দানুসারী আচরণ বিশেষ। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রাণীদের জীবনে পরিবেশের প্রতীর ঘাত-প্রতিঘাত বা প্রকৃতির প্রভাব এই ছন্দ সৃষ্টি করেছে এবং পরে বংশগতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। পরিবেশ বদল করলেও ছন্দ বদল করা যায় না। বিজ্ঞানীরা প্রাণীদের শীত-ঘুমের জৈবিক-ছন্দের রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছেন।

শীত-ঘুমরত খরগোস, গাঢ় অংশ শীতসুপ্ত গ্রন্থি।
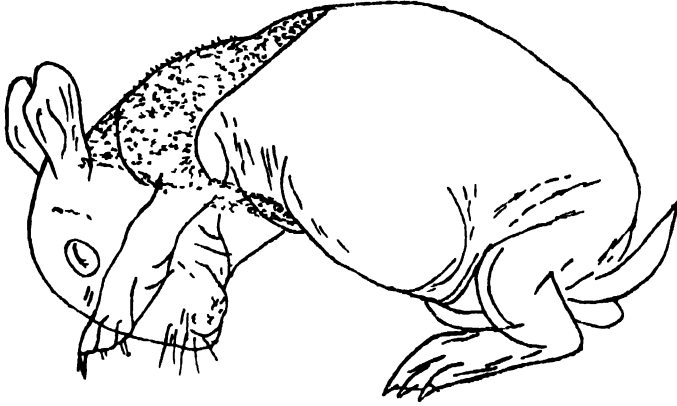
সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে হিন্দুসন্ন্যাসী ও জাপানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাভ্যাসের রীতি প্রচলিত আছে। দীর্ঘ সময় সমাধিতে ডুবে থাকার অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করেছেন যোগীপুরুষগণ। সাম্প্রতিককালে আমেরিকায় বিজ্ঞানীরা ধ্যানের পূর্বে, ধ্যানমগ্ন অবস্থায় এবং ধ্যানভঙ্গের পর যে সব শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন হয় তা পর্যবেক্ষণ করেছেন। দেখা গেছে যে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকার সময় হৃদ্‌স্পন্দনের হার কমে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলে ধীরে, দেহের অম্লজান ক্ষুধা কমে যায় এবং অঙ্গার অম্লগ্যাস স্বল্পপরিমাণে নির্গত হয়, রক্তে ল্যাকটেটের পরিমাণ কমে যায়, দেহত্বকের প্রতিরোধ শক্তি বাড়ে, রক্তচাপ নামে এবং মস্তিষ্কে আলফা তরঙ্গ প্রাধান্য লাভ করে। ধ্যান সমবেদী স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলী দমিত করে। নিদ্রামগ্ন না হয়েও দীর্ঘস্থায়ী গভীর ধ্যানের মাধ্যমে দেহের মৌলবিকাশের হার অবদমন বা wakeful hypometabolism প্রক্রিয়ার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে মনুষ্যেতর প্রাণীদের শীত-নিদ্রার সঙ্গে যার মূল লক্ষ্য হল দেহের মৌলবিকাশের হার দমিত করে বিশেষ একটি ঋতু-চক্রের সঙ্গে অভিযোজন। মন্থর মৌলবিপাকীয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে কি প্রাণীদের আয়ুষ্কালের কোন সম্পর্ক আছে? বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে থাকাটাই স্বাভাবিক। শীতলশোণিতবিশিষ্ট ও শীতযাপক প্রাণীদের গড়-আয়ু উষ্ণশোণিতবিশিষ্ট প্রাণীদের থেকে বেশী, কারণ মৌলবিপাকের হার অপেক্ষাকৃত কম। উষ্ণশোণিত স্তন্যপায়ী ইঁদুর বাঁচে মাত্র আড়াই বছর কিন্তু সমবয়সী এবং সমওজনের শীতযাপক বাদুড় সাত বছর বেঁচে থাকে। দেহের মৌলবিপাকীয় হার কমিয়ে গুপ্তজীবন (cryptobiosis) যাপনে অভ্যস্ত রোটিফার ও আদিম সন্ধিপদ টার্ডিগ্রেড দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। গ্রীষ্মঘুম (aestiration) শীত-ঘুম (hibernation) গুপ্তজীবনের প্রকার ভেদ মাত্র। গভীর সমাধিতে ডুবে থেকে মৌলবিপাকের হার হ্রাস করার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন বলেই কি যোগীগণ দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন? এর উত্তর আগামী দিনে মিলবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন।

পৃথিবীর বুকে খনিজ ভাণ্ডার ও ভূকম্পীয় তরঙ্গ

শশধর দে*

[কৃত্রিম ভূকম্পন ঘটিয়ে কেমন করে পৃথিবীর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত খনিজ-সম্পদের কথা জানা যায় তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হয়েছে]

খনিজ ভাণ্ডার পৃথিবীর নীচে অথবা উপরিভাগে নানাভাবে দেখা যায়। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বা খুব ভারী জিনিস উপর থেকে নীচে ফেলে কৃত্রিম ভূকম্পন সৃষ্টি করা যায়। কয়েক ফুট গভীরে এক গর্তের নীচে বিস্ফোরক পদার্থ রেখে সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে এই কম্পন সাধারণতঃ পাঠ করা হয়। ভূকম্পীয় তরঙ্গ পর্যালোচনা করে কোন জায়গায় খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান করা যায়। যদি মাটির নীচের স্তরে তরঙ্গের গতিবেগ বেশী হয় তবে বিস্ফোরণ থেকে সোজা প্রতিফলিত এবং প্রতিসরিত তরঙ্গ রেকর্ডারে যায়। মাটির নীচে নরম স্তর থাকলে ভূতরঙ্গের বেশীর ভাগই ভিতর দিয়ে চলে যায়, প্রতিহত হয়ে কম ফিরে আসে। প্রতিফলিত তরঙ্গের তীব্রতা ও সময়-পার্থক্য সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্র দিয়ে হিসাব করে সেই জায়গায় বিভিন্ন শিলাস্তরের প্রকৃতি মোটামুটি জানা যায়। আবার, পরে আলোচিত surface তরঙ্গ বেগ জেনেও খনিজ বা মণি-পাথরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়।

ভূকম্পীয় তরঙ্গের গতিবেগ মাধ্যমের ঘনত্ব ও স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের উপর নির্ভর করে। পৃথিবীর যত গভীরে যাওয়া যায় ততই এই বেগ বাড়তে থাকে কিন্তু বিশেষ গভীরতায় (সাধারণতঃ মহাদেশের 30—40 কি মি. নীচে এবং মহাসাগরের 10 কি.মি. নীচে) এই গতির বেশ পার্থক্য দেখা যায়। একে Mohorovicic discontinuity বা 'মোহো' বলে, এর উপরে থাকে ভূত্বক এবং নীচে থাকে ম্যাণ্টল্। ম্যাণ্টলের পর আরম্ভ হয় পৃথিবীর তৃতীয় ভাগ 'কোর'।

ভূকম্পীয় তরঙ্গ সাধারণ পর্যাবৃত্ত তরঙ্গাকারে বিভিন্নভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর উপরিতলে এবং ভিতরের বিভিন্ন স্তরের সন্ধিস্থলে তরঙ্গগুলি প্রতিফলিত এবং প্রতিসরিত হয়। দু-রকম তরঙ্গ পৃথিবীর ভিতর দিয়ে যায়। (1) অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ (মুখ্য বা P—তরঙ্গ) সবচেয়ে দ্রুতগামী। শব্দ তরঙ্গের মত এরা ঘনীভবন ও তনুভবন সৃষ্টি করে। এদের বেগ পৃথিবীর উপরিতলে প্রায় 5 কি.মি./সে. থেকে 2900 কিমি গভীরতায় সর্বোচ্চ 135 কিমি/সে হয়। তারপর আসে (2) তির্যক (গৌণ বা S—) তরঙ্গ। এরা আলোক তরঙ্গের মত, কণাগুলির গতির দিকের সঙ্গে সমকোণে কাঁপে। এদের গতিবেগ প্রায় P-তরঙ্গের $\frac{2}{3}$। পৃথিবীর কঠিন ও তরল দুই অংশের ভিতর দিয়েই P-তরঙ্গ যেতে পারে কিন্তু S-তরঙ্গ কেবলমাত্র কঠিনের ভিতর দিয়েই যায়। পৃথিবীর কোরের বাইরের অংশ তরল বলে S-তরঙ্গ এর মধ্যে প্রবেশ করে না, এজন্য ম্যাণ্টল্ থেকে কোরে প্রবেশের সময় ভূতরঙ্গের বেশী পার্থক্য দেখা যায়।

যখন উল্লিখিত তরঙ্গগুলি বিভিন্ন স্তরের সন্ধিস্থলে আসে তখন প্রতিসরিত বা প্রতিফলিত হয়। তখন হয় P বা S তরঙ্গ নয়ত P এবং S দু-ই দিতে পারে। শেষে আসে surface তরঙ্গ। এই তরঙ্গগুলি পৃথিবীর ভূত্বক এবং উপর ম্যাণ্টলের

*ইনস্টিটিউট, অব থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স, বিজ্ঞান কুটির, কলিকাতা-700004

মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ভূত্বকে এদের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে 2·5 থেকে 4·5 কি.মি.। এরা প্রধানতঃ Rayleigh এবং Love তরঙ্গ। Rayleigh তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এর ভূকম্পন গড়ানো প্রকৃতির। কণাগুলি উপরিস্তরের লম্বতলে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে গমন করে এবং তরঙ্গ যেদিকে যায় তার বিপরীত দিকে অনুভূত হয়। আবার, দুই পুরুমাধ্যমের সীমা বরাবর এরকম যে তরঙ্গ চলে যায় তাকে আমরা Stoneley তরঙ্গ বলি। এক্ষেত্রে গতি প্রতীপ হবে কি direct হবে তা' নির্ভর করে যে মাধ্যম থেকে দেখা হয় তার উপর। গুঁড়ো পদার্থ এবং বালির ক্ষেত্রেও এই তরঙ্গের অস্তিত্ব জানা যায়। Love তরঙ্গে কণার গতি তরঙ্গের গতির অনুভূমিক ও লম্বভাবে থাকে। এছাড়া আরও নানারকম ভূকম্পীয় তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য আছে।

মাটির নীচে পাললিক শিলাস্তরের মাঝে মাঝে নানারকম জৈব পদার্থ জমে রাসায়নিক বিবর্তনের ফলে জন্ম নেয় পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল। এই শিলার মধ্যে থাকে বালিপাথর, চুনাপাথর ও সিল্ট্স্টোন। পলিমাটির নীচে টার্শিয়ারি শিলার স্তরে খনিজ তেল পাবার বেশী সম্ভাবনা দেখা যায়। এই তেল-স্তরের গড়-গভীরতা প্রায় 3900 মিটার। আবার, আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণের সময় পৃথিবীর ভিতরের গলিত অংশ ম্যাগ্মা এসে জমার ফলে পাওয়া যায় অনেক খনিজ পদার্থ।

কেলাসিত পদার্থ মাধ্যমে ভূকম্পীয় তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে বিভিন্ন কেলাসিত পদার্থের ক্ষেত্রে লেখক কিছু অদ্ভুত ধরণের ফলাফল লক্ষ্য করেন। প্রায় 20-রও বেশী কেলাসিত পদার্থের ক্ষেত্রে surface তরঙ্গের গতিবেগ অনুসন্ধান করা হয়। দেখা গেছে উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে surface তরঙ্গগতি cubic কেলাসের ক্ষেত্রে অল্প অল্প কমে যায়।

বিভিন্ন রকম কেলাসিত পদার্থে Stoneley তরঙ্গের সীমা ও অস্তিত্ব লেখক প্রথম অনুসন্ধান করে বেশ কিছু কেলাসিত পদার্থে অস্বাভাবিক ব্যবহার লক্ষ্য করেন এবং তাদের ক্ষেত্রে চরম বা সঙ্কট বেগ বের করা হয়।

মণি-ভাণ্ডার—বিভিন্ন মণি-প্রস্তর স্তরের surface তরঙ্গের গতিবেগ (C) বিভিন্ন। গোমেদে C=1·793 k/s. এটি একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এই পাথরে থোরিয়াম ইউরেনিয়ামের অস্তিত্ব আছে। এর ও ইউরেনিয়ামের 'C' মোটামুটি কাছাকাছি, C (L-uranium)=1·817 k/s। চুনী ও নীলা দুটিই কুরুবিন্দম্ (কোরাণ্ডাম) জাতীয় পাথর। এই পাথরের ক্ষেত্রে surface তরঙ্গবেগ হচ্ছে 6·463k/s। পান্নাতে (এমারেল্ড) বেরিলিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেটের সঙ্গে অল্প ক্রোমিয়াম থাকে। এই পাথরে surface তরঙ্গবেগ 5.270 k/s. স্ফটিকের ক্ষেত্রে C=3·159 k/s. এবং পোখরাজে C=6·312 k/s. তুর্মালীনে বোরোসিলিকেট থাকার জন্য এর রাসায়নিক গঠন নানারকম এবং বেশ জটিল। এরূপ পাথরে কোন কোন ক্ষেত্রে C=5·415 k/s. [k/s বলতে কিলোমিটার/সেকেণ্ড বোঝানো হয়েছে]

তৈল-ভাণ্ডার—শিলাস্তরে বড় আকারের সিনক্লাইন, মাঝে মাঝে ছোট আকারের কিছু অ্যানটিক্লাইন থাকে। এর মধ্যে সঞ্চিত থাকে মূল্যবান পেট্রোলিয়াম। যদি গভীরতা খুব বেশী না হয় তবে অনেক সময় ঐ অঞ্চলের তলের উপর খুব ভারী ওজন চালিয়ে শব্দ-বৈশিষ্ট্য শুনে মোটামুটি তরলের অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে পারে, তবে ভুলও হয়। সেই অঞ্চলে মাটির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ করে এই খনিজ তৈল-ভাণ্ডার সম্বন্ধে প্রাথমিক অনুমান আর দৃঢ় করা যায়। পরে ড্রিলিং-এর সাহায্যে এই অনুমানকে সত্যে রূপ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে লেখক বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর ও পাত্রসায়েরের মধ্যবর্তী এক বিস্তীর্ণ এলাকায় খনিজ তেলের সন্ধান পেয়েছেন এবং ব্যাপারটি Oil and Natural Gas and

Commission-কে তত্ত্বাবধান করার জন্য অনুরোধ করেছেন। (অন্য আর একটি এলাকায় কয়লা পাওয়া যেতে পারে বলেও লেখক অনুমান করেন।)

খনিজ ভাণ্ডার—Cubic কেলাসিত পদার্থের ক্ষেত্রে অক্ষের বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন রকম surface তরঙ্গবেগ পাওয়া যায়। এই সমস্ত পদার্থে cubic অক্ষের দিক (C_a) থেকে fac-diagonal দিকে (C) এইরূপ গতিবেগ কম; যেমন গ্যালিনার ক্ষেত্রে গতিবেগ, Ca=1·764k/s, এবং Cf=1.750k/s পাইরাযিট্স্-এর ক্ষেত্রে C_a=4·345 k/s. এবং C_f=4 240 k/s অন্যান্য আরও কয়েকটি পদার্থের surface বেগ দেওয়া হলো: অ্যারাগোনাইট (অর্থরোম্বিক) C=3·496k/s, স্যোডিয়াম থায়োসালফেট (মোনোক্লিনিক্) C=3·158 k/s, টিন-জাতীয় (টেট্রাগোনাল) C=1·641—0·997 k/s, অ্যাপাটাইট্ (হেক্সাগোনাল) C=4·385 k/s, হেমাটাইট্ (ট্রাইগোন্যাল্) C=3·851 k/s ইত্যাদি।

কেলাসিত পদার্থ মাধ্যমে surface তরঙ্গ গতির উপর অভিকর্ষের প্রভাব এবং প্রাথমিক বলের ফল বিবেচনা করা হয়। প্রাথমিক পীড়নের ফলেও ভূকম্পীয় তরঙ্গবেগ ও কেলাসিত পদার্থের কম্পাঙ্কের পরিবর্তন দেখা যায়। বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে অভিকর্ষের প্রভাব অকেলাসিত ও কেলাসিত পদার্থের ক্ষেত্রে গণনা করা হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 20 কি.মি.-র কম হলে অভিকর্ষের ফলকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি।

জটিঙ্গা পক্ষী-রহস্য ও কয়েকটি কথা

অভিজিৎ ঘোষচৌধুরী*

[আসামের হাফলঙ্ শহরের কোলে বারেল পর্বতের সানুদেশে জটিঙ্গা-গ্রামের একটি নির্দিষ্ট স্থানে গভীর মেঘাচ্ছন্ন ঝড়ো হাওয়ার রাত্রিতে কোন কৃত্রিম আলোক উৎস রাখা হলে বহু প্রজাতির হাজার হাজার পাখী পতঙ্গের মত ঝাঁকে ঝাঁকে ঐ উৎসের প্রতি ধাবিত হয় এবং এক অব্যাখ্যাত আত্মহনন উৎসবে যোগ দেয়।]

কয়েকটি সাময়িক পত্র-পত্রিকায় এই প্রসঙ্গে যদিও কয়েকটি প্রবন্ধ বের হয়েছে তাহলেও সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই নিবন্ধের অবতারণা।

জটিঙ্গা গ্রাম—হাফলঙ্ নামক শহরটির প্রকৃত অবস্থান আসামের জয়ন্তিয়া উপত্যকার কোলে। বারেল (Barail) পর্বতশ্রেণীর পদপ্রান্তে এই উপত্যকার মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি গ্রামের সমাহার দেখা যায়। জনসংখ্যার দিক থেকে গ্রামগুলি একান্তই রিক্ত। অঞ্চলটির অবস্থান মোটামুটি ভাবে 25°N উত্তর অক্ষাংশ এবং 93°E দ্রাঘিমাংশ দ্বারা চিহ্নিত। এই হাফলঙ্-র শহরের কিছুটা দক্ষিণে অবস্থিত একটি ছোট্ট গ্রাম। নাম জটিঙ্গা—অপূর্ব পার্বত্য সুষমার কুহেলিকায় আবৃত এই অঞ্চলটির উচ্চতা মোটামুটি 730 থেকে 740 মিটারের মধ্যে। জটিঙ্গা গ্রামটির জনসংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। বিভিন্ন বিরল অর্কিড ও দুষ্প্রাপ্য গাছপালার দিক থেকে অঞ্চলটি সমৃদ্ধ।

জটিঙ্গা গ্রামে প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে মোটামুটি ভাবে জনবসতি শুরু হলেও স্থানটি জয়ন্তিয়া, গারো, আরব প্রভৃতি উপজাতিঅধ্যুষিত। প্রধানতঃ

*বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

সভ্যতার আলোকের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকার দরুণ কুসংস্কারের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে এরা আজও গভীরভাবে আবদ্ধ।

পক্ষী রহস্য—অঞ্চলটির একটি বৈশিষ্ট্যজনক ঘটনা হল যে বৎসরের একটি বিশেষ সময়ে গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (Natural Characteristics) অক্ষুন্ন থাকলে, যদি কৃত্রিম উজ্জ্বল আলোক সৃষ্টি করা হয় তাহলে প্রচুর পাখী, পতঙ্গের ঝাঁকের মত এসে ঐ আলোক উৎসের প্রতি ধাবিত হয় এবং স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করে। এমন কি দেখা গেছে যে ঐ সময় ঐ পাখীগুলির উড়ে পালাবার কোন রকম লক্ষণই দেখা যায় না এবং তাদের সহজেই ধরা যায়। পার্বত্য আদিম উপজাতির লোকেরা এই সুযোগের প্রভূত পরিমাণে সদ্ব্যবহার করে এবং বিশেষ ধরণের হাতিয়ারের সাহায্যে এগুলি নিধন করে তাদের মাংস সংগ্রহ করে। বহু বছর ধরে এই ভাবে সংগৃহীত মাংস তাদের অন্যতম খাবার এবং ব্যবসার অন্যতম সামগ্রীরূপে পরিগণিত হত। বর্তমানে পক্ষী সংরক্ষণ আইন কার্যকর হবার দরুণ সরাসরি এভাবে পক্ষী নিধন বন্ধ হলেও চোরাপথে আজও বহু পাখী এভাবে নিহত হয়ে চলেছে। ঘটনাটির বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট পরিমাণে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ ভাবে যা জানা যায়, তাতে দৈবক্রমে এই ধরণের ঘটনার প্রথম সূচনা হয় আদিবাসী উপজাতিদের দ্বারা। এই ঘটনায় সহায়ক পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির সমাহার ঘটেছিল কোন একদিন এবং ঐদিন যে কারণেই হোক আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা কৃত্রিম আলোকের সৃষ্টি করেছিল। এর ফলেই ঐ ঘটনার প্রথম আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। এরপর থেকেই এই ঘটনার অনুবর্তন চলে আসছে এবং তার ফলেই বর্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান—স্থানটি যেহেতু হিমালয়ের পার্বত্যশাখার এক দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত সুতরাং সামগ্রিকভাবেই অঞ্চলটির উপজাতিদের জীবনযাত্রা ও তাদের আচার ব্যবহার অঞ্চলটির মতই গাঢ় কুহেলিকায় আচ্ছাদিত ও ততোধিক রহস্যময়। বিবিধ কুসংস্কারগত কারণের দরুণ তারা এই ঘটনাকে বিবিধ তুকতাক বা তথাকথিত মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতির আওতায় এনে ঘটনাটির বৈজ্ঞানিকতা ও স্বাভাবিকতার (naturality) বিসর্জন দিয়েছে। ফলে ঘটনাটি আরও জটিল রূপধারণ করেছে। অন্ধকারময় দেশ ও আধুনিক সভ্যতার অন্তরালে অবস্থানের জন্য ঘটনাটির প্রচার হয় বহু পরে মাত্র কিছুকাল আগে। এরপর জটিঙ্গা গ্রামে বেশকিছু বিজ্ঞানী ও পক্ষীতত্ত্ববিদের সমাবেশ ঘটেছিল, কিন্তু রহস্যের আবরণ উন্মোচনে এই গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ সহায়ক হয় নি। সামগ্রিকভাবে যে তথ্যগুলি এ বিষয়ে সংগৃহীত হয়েছে তা নিম্নে উল্লিখিত হল।

পাখীগুলির কৃত্রিম আলোকের দিকে আগমনের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণগুলির অপরিহার্যতা লক্ষ্য করা গেছে:

(i) অঞ্চলটিতে ঐ দিন গভীর অন্ধকার রাত্রি একান্তই প্রয়োজন। কৃত্রিম জোরালো আলোক উৎস ছাড়া অন্য কোন ধরণের আলোক যথা চাঁদের আলো প্রভৃতির সমাবেশ ঘটলে এ ঘটনা দেখা যাবে না।

(ii) জটিঙ্গা গ্রামটির যত্রতত্র এ ঘটনা ঘটতে দেখা যাবে না। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই (প্রায় 1 বর্গ কি. মি.) শুধুমাত্র এই পাখীগুলির আগমন ঘটতে দেখা যায়।

(iii) গ্রামটির দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বেশ জোরে বাতাস প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন।

(iv) যেদিন পাখীগুলি আসবে সেদিন যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাত হওয়া প্রয়োজন।

(v) আকাশ গাঢ় মেঘ দ্বারা সমাচ্ছাদিত এবং অঞ্চলটি কুয়াশা দ্বারা আবৃত হওয়া একান্তই প্রয়োজন।

(vi) উপরিউক্ত পারিপার্শ্বিক কারণগুলির সমাবেশ ঘটার পর যে আলোক উৎসব রাখা হবে,

তা যথেষ্ট পরিমাণে উজ্জ্বল হওয়া প্রয়োজন। এবিষয়ে যে কয়েকটি পরীক্ষাকার্য সম্পাদিত হয়েছিল তাতে আলোক উৎসরূপে পেট্রোমাক্স ব্যবহৃত হয়েছিল। এই পেট্রোমাক্সগুলি আলাদা আলাদা ভাবে রাখা হয়ে থাকে

কতকগুলি পরীক্ষা থেকেই উপরিউক্ত পারিপার্শ্বিক শর্তগুলির অপরিহার্যতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। সাধারণতঃ দেখা গেছে যে আলোক উৎস রাখার দশ থেকে পনের মিনিটের মধ্যেই পাখীগুলির ধীরে ধীরে ঝাঁকে ঝাঁকে সমাবেশ ঘটতে থাকে। তাদের এই ধরণের নেমে আসাটিও বৈশিষ্ট্য-সূচক। প্রধানতঃ আলোক উৎসটিকে চক্রাকারে বেষ্টন করতে করতে তারা বেষ্টনটিকে ছোট করে আসে এবং হঠাৎ একসময় উৎসের দিকে ধেয়ে যায় এবং এর চতুর্দিকে নেমে পড়ে। এসময় এদের মধ্যে কোনরকম চাঞ্চল্য প্রকাশিত হয় না এবং তারা নির্ভয়ে বিচরণ করতে থাকে এবং ধীরে ধীরে উৎসের প্রতি ঝাঁপিয়ে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে। পাখীগুলির আচরণ লক্ষ্য করলে স্পষ্টতঃই বোঝা যাবে যে পাখীগুলি যেন কোন বিশেষ ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন। যেন তারা কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি একনিষ্ঠভাবে ধাবিত হয়ে চলেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় যেসকল পাখী ধরা অত্যন্ত কষ্টকর সে সকল অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন পাখীগুলির তখন যেন পলায়নের কোন রকম প্রচেষ্টা দেখা যায় না। অত্যন্ত নিরীহ পোষা প্রাণীর মতই তখন তারা আশে পাশে ঘুরতে থাকে। এছাড়া এই সকল পাখীদের আগমন ঘনত্বও (density) স্থান ও কাল ভেদে পরিবর্তনশীল। তবে বৃষ্টিপাত ও কুয়াশা এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরে বায়ুপ্রবাহের গতি বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে পাখীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটুকু বোঝা যেতে পারে যে উপরিউক্ত কারণগুলি যথা (i) ঘনরাত্রি, (ii) ঘনমেঘ ও কুয়াশা, (iii) উত্তম বৃষ্টিপাত, (iv) সুনির্দিষ্ট বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির যে কোন একটির অনুপস্থিতিতে পক্ষীকুলের আগমন ঘটে না এবং পরীক্ষাতেও এই সত্য দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হয়েছে। পরীক্ষাকার্যের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত শর্তগুলির একটি অথবা একাধিক অনুপস্থিত থাকলে ঝাঁকে ঝাঁকে তো দূরের কথা, একটি পাখীও আসে নি।

সুতরাং এই বৈশিষ্ট্যসূচক ঘটনার অভিনবত্বের ক্ষেত্রে কতকগুলি প্রধান প্রশ্ন উঠতে পারে। সামগ্রিকভাবে প্রধান প্রশ্নগুলি হল ঘনতমসাচ্ছন্ন রাত্রির প্রয়োজনীয়তা কি? কুয়াশার পর্দায় ঢাকা আলোকউৎসের প্রতি পাখীগুলির আগমনের কারণ কি? তারা বহুদূর থেকে দেখতেই বা পায় কিভাবে? সাধারণতঃ যে সকল পাখীর সমাবেশ দেখা গেছে সেগুলির মধ্যে স্থায়ী এবং পরিযায়ী বা ভবঘুরে (migratory) পাখীর উভয় প্রকার সমাবেশই উল্লেখ্য। এরা বহুদূর থেকে আলোকের প্রতি ধাবিত হয় কোন অদৃশ্য শক্তির সংকেতে? সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য এই যে, আলোকের প্রতি তাদের একত্র আগমন কিভাবে ঘটে? এক্ষেত্রে মনে করা যেতে পারে যে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন দ্রুত ব্যবস্থার মাধ্যমে যোগাযোগ (communication) ঘটে থাকে। এছাড়া বৃষ্টিপূর্ণ রাত্রি এবং বায়ুর বিশেষ প্রবাহের প্রয়োজনীয়তাই বা কি? এতথ্য এখনও অজানা।

এছাড়া অপর একটি তথ্যের প্রতি মনোনিবেশ করলে দেখা যাবে যে বহু প্রজাতির পাখীর শুধুমাত্র ঐ বিশেষ অঞ্চলটিতেই আগমন হয়ে থাকে। অতবহুল পরিমাণে বিভিন্ন ধরণের পাখীর একত্র সন্নিবেশ কিভাবে হয়? উদাহরণ স্বরূপ অঞ্চলটির ধারেকাছে কোথায়ও জলাজায়গা (swampy land) নেই, শুধুমাত্র 5 কি.মি. দূর দিয়ে ডুলং নামক স্রোতস্বিনীর শাখা প্রবাহিত; কিন্তু স্থানটিতে প্রচুর পরিমাণে জলা জায়গার পাখীও দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলটির প্রতিই শুধুমাত্র পক্ষীকুলের আকর্ষণ কেন প্রকট? এরও কোন বিজ্ঞানসম্মত উত্তরের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় নি।

এগুলি ব্যতীত সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর কারণ হল যে পাখীগুলি কেন আত্মহত্যা করতে বদ্ধপরিকর হয়? পাখীর মস্তিষ্ক (brain) খুব উন্নতমানের না হলেও তাদের স্নায়ু এরকম বিকৃত রূপে ক্রিয়া করতে পারে না যে তারা নিজেদের প্রাণের প্রতি কোন রকম মমত্ব বোধ করে না, এছাড়া মৃত্যুর কষ্টতো আছেই।

সমগ্র প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতাগুলি—যেগুলির দ্বারা পাখীগুলি আকৃষ্ট হয় সেগুলির একটি সামগ্রিক রূপ করা যেতে পারে। এই সামগ্রিক রূপটির দ্বারাই তারা আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এই রূপটি তাদের ইন্দ্রিয়-মারফৎ স্নায়ুতন্ত্রে নিশ্চয়ই এক ধরণের বৈদ্যুতিক আলোড়নের আবির্ভাব ঘটিয়ে থাকে যা তাদের এই রকম অন্ধের ন্যায় লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক কারণগুলির একটু অদলবদল ঘটলেই আর প্রয়োজনীয় আবেগের (emotion) সৃষ্টি হয় না। সেদিক থেকে বলতে গেলে জটিঙ্গার ঘটনাটিকে কি একটি কাকতালীয় যোগাযোগ বলা যেতে পারে যার ফলে সামগ্রিকভাবে হঠাৎই ঐ পরিবেশটি সৃষ্টি হয়ে গেছে? সম্পূর্ণভাবে পারিপার্শ্বিক কারণগুলির প্রকৃত স্বরূপটি জানা গেলে যে কোন স্থানেই উপরিউক্ত ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি করা কি সম্ভবপর হবে? তবে এসব চিন্তা একান্তই কল্পনা-নির্ভর (Hypothesis) এবং এখনও এর যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, প্রমাণাদি প্রয়োজন।

ম্যামথ নিয়ে বিশ্লেষণ ও গবেষণা

সোভিয়েত ভূ-বিজ্ঞানীরা উত্তর সাইবেরিয়ার মেরুদেশীয় তুন্দ্রা অঞ্চলে একটি ম্যামথ আবিষ্কার করেছেন। ম্যামথ ও ম্যামথ-জাতীয় জীবের পর্যবেক্ষণের জন্য গঠিত অ্যাকাডেমিক কমিটির সভাপতি অধ্যাপক নিকোলাই ভেরেশ্চাগিন বলেছেন, লুপ্ত অতিকায় প্রাণীদের নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের হাতে এই প্রথম একটি অল্পবয়স্ক স্ত্রী-ম্যামথের প্রায় সম্পূর্ণ শরীরটি লভ্য হল। প্রাথমিক হিসাব থেকে জানা যায়, স্ত্রী-ম্যামথটির বয়স 10 থেকে 12 বছর। দশ হাজার বছরেরও আগে একটি জলাভূমিতে তার মৃত্যু হয়েছিল। চিরস্থায়ী তুষারের নীচে চাপা পড়ার ফলে তার শরীরের আভ্যন্তরিক অঙ্গগুলি অবিকৃত থেকে গিয়েছে। সেগুলির অবস্থা এমনই ভাল যে তা নিয়ে চমৎকারভাবে প্রাণিবিজ্ঞানের, শারীরবিজ্ঞানের ও কোষবিজ্ঞানের অনুসন্ধান চলতে পারবে। বিশেষ উল্লেখের বিষয়, ম্যামথের উদরটি টন-পরিমাণ ঘাস-পাতায় ঠাসা হয়ে আছে। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা আশা করেন, এ থেকে তাঁরা প্রাগৈতিহাসিক উদ্ভিদজগতের পূর্ণ একটি চিত্র পেতে পারবেন এবং সেই কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিবর্তনের ধারাটি ধরতে পারবেন।

বিজ্ঞান ও সমাজ

বিজ্ঞান, অবিজ্ঞান, সংস্কৃতি

আশিস সিংহ

[দ্বান্দ্বিক দর্শনকে সামনে রেখে সংস্কৃতির দেহব্যবচ্ছেদ করে দেখানো হয়েছে বিজ্ঞান আর অবিজ্ঞান—এই দুই বিপরীতের সমাহারে গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। এ-নিয়ম আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের অনেক আগে থেকে অদ্যাবধি চলে আসছে, চলবেও। আমাদের সমাজকে যে-সব বিজ্ঞানী তথা সমাজকর্মী বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলতে চান সম্ভাব্য অদ্বান্দ্বিক প্রয়াসের বিরুদ্ধে তাঁদের উদ্দেশে উচ্চারিত হয়েছে চেতাবনী।]

আজকাল এই সংকল্প নানান মহলে প্রায়ই ঘোষিত হতে শোনা যায় যে, আমাদের প্রাচীন সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত ও বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলতে হবে। শুনতে শুনতে সত্যজিত রায়ের "জয় বাবা ফেলুনাথ" এর একটি দৃশ্য আমার মনে আসে। গোয়েন্দা ফেলুনাথ, তপসে আর লালমোহনবাবু সমাভিব্যাহারে চলেছেন মগনলালের বাড়ী। বাজারের মধ্য দিয়ে পথ, যেতে যেতে হঠাৎ দেখা গেল এক বৃদ্ধা লাঠি ঠুকে ঠুকে এক বিচিত্র ছন্দে চলেছে তাদের সামনে। এই বৃদ্ধাকে আমার মনে হয়েছিল যেন নিয়তি, আসন্ন বিপদের আভাষ দেওয়ার জন্য তার আবির্ভাব। আর একটু পরে দেখা গেল সামনে একটি গরু পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, যেন আর এগোতে বাঁধা দিচ্ছে। এই পর্যন্ত এসেও পরিচালকের অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমার সংশয় ছিল। কেননা, আমার ছেলেবেলা কেটেছে পাড়াগাঁয়ে, সেখানে "বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে বেড়া ছিলনা উঁচু।'' এবং সেইহেতু, বৃদ্ধাকে নিয়তি আর গরুকে বাঁধা বলে ভাবনাটা আমার পিছিয়ে থাকা মনের কাল্পনিক প্রতিবিম্ব মাত্রও হতে পারে। কিন্তু গরুর বাধা পেরিয়ে যাওয়ার পরেই যখন অলক্ষ্যে তিনবার কাক ডেকে উঠল তখন পরিচালকের স্পষ্ট অভিপ্রায়টি বুঝতে আর ভুল হয় নি। এবং দ্রষ্টব্য, অমঙ্গলচিহ্নও এখানে সংলাপ তিনটি—বৃদ্ধা, গরু এবং কাকের ডাক। এর পরে যদি কোন দর্শকের "ম্যাকবেথ'' নাটকের সেই তিন ডাইনীর ছড়া

কালো বেড়াল তিনবার
করেছিল চীৎকার.........ইত্যাদি, কিংবা মূল ইংরাজী ছড়াটি, মনে পড়ে যায় তবে তাঁকে সংশ্লিষ্ট শিল্পী বা সাহিত্যিককে কোন অভিধায় চিহ্নিত করা ঠিক হবে? সংস্কৃতিবান না সংস্কৃতিহীন?

এমনি নিদর্শন দেখা যাবে প্যারিসের নোৎর-দাম-গীর্জার প্রাচীরেও। এই গীর্জার সম্মুখ ভাগের মাঝামাঝি জায়গায় দেখানো হয়েছে যীশুর জন্ম, তার নিচের অংশে সাধুসন্তদের ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে ফোটানো হয়েছে ধর্মের সার্বজনীন জাগতিক রূপ, আর ওপরে দু'টি নিঃসঙ্গ উন্নত

প্রকাশ পেয়েছে ধর্মের একক আধ্যাত্মিক সাধনার দিকটি। ঐ ওপরের অংশের প্রাচীর গাত্রটি কণ্টকময় বা একই সঙ্গে যীশুর কাঁটার মুকুট এবং সাধনার কণ্টকাকীর্ণ পথের কথা মনে এনে দেয়। এই অংশে অল্প দূরে দূরে একসঙ্গে তিনটি করে দৈত্যদানো অপদেবতার মূর্তি খোদাই করেছেন শিল্পী। আট-শ' বছরের প্রাচীন এই ভাস্কর্য দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল এই অপদেবতারই বুঝি নোৎরদামের আসল হান্‌চ্‌ব্যাক, ভিকটর হুগো হয়তো বা এদের দেখেই পেয়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসটি রচনার প্রথম প্রেরণা।

উন্নত সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কারের শুধু সহাবস্থানই নয়, পুরোপুরি মিলন দেখতে পাই আরো প্রাচীন কালের সৃষ্টি আমাদেরই উপনিষদে। বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। একটি ছোট উদাহরণ উপস্থিত করছি। অন্ধ সংস্কারে "তিন" সংখ্যাটির গুরুত্ব আমরা আগে দেখছি, উপনিষদেও এই সংখ্যাটির অসীম গুরুত্ব। ব্রহ্মের প্রতীক যে
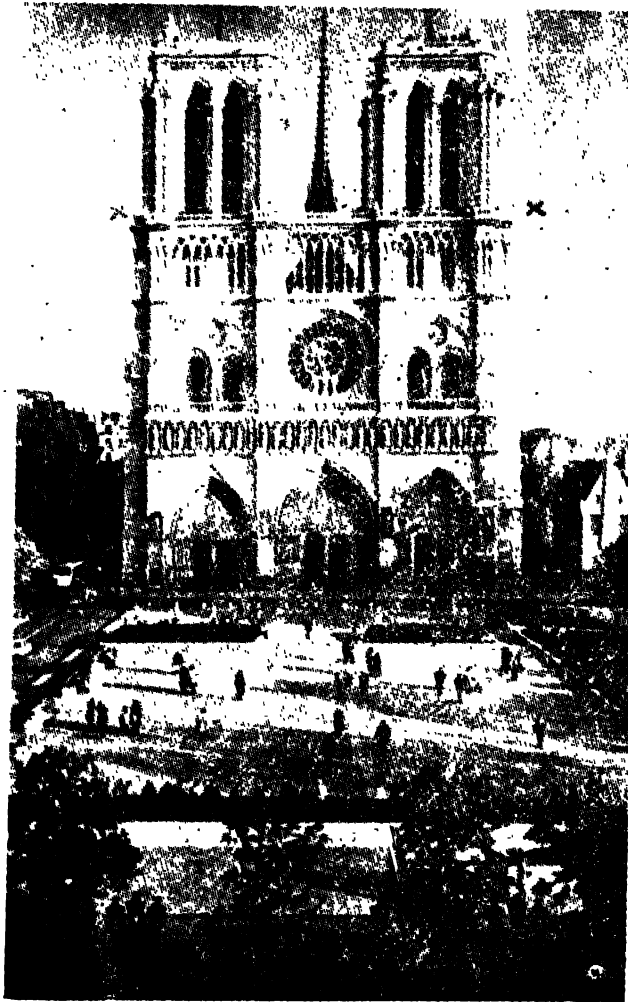
চিত্র 1 : নোৎরদাম গীর্জা, প্যারিস IX-X চিহ্নিত অংশে অল্প দূরে দূরে দৈত্যদানো অপদেবতাদের মূর্তি সামনের চত্বরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে (চিত্র 2 দ্রঃ)।

"ওম্" শব্দে তাতে তিনটি মাত্রা, এবং ব্যাপারটি যে নেহাত কাকতালীয় নয় তার প্রমাণ পাই প্রশ্নোপনিষদের "তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা' আদি মন্ত্রে যেখানে ওঙ্কারের তিনটি মাত্রা পৃথকভাবে এবং একত্র উচ্চারণের ফলপার্থক্য বিবৃত হয়েছে। ঈশোপনিষদের পঞ্চম মন্ত্রটি ("তদেজতি তন্নৈজতি" প্রভৃতি) উদ্ধার করে ব্রহ্মের পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "চলা না-চলা, দূর নিকট, ভিতর বাহির, সমস্তর মাঝখানে সমস্তকে নিয়ে তিনি; কাউকে ছেড়ে তিনি নন। এইজন্য তিনি ওঁ।" বহু বিচিত্রর মধ্যে এই ঐক্যসাধনাই উপনিষদের সাধনা। আর এই বিচিত্র বস্তুর তালিকা সাধারণ বিশ্বাস থেকে অত্যন্ত পরিশীলিত দর্শন চিন্তা পর্যন্ত সর্বপ্রকার মানবিক অভিজ্ঞতাকে নিয়ে তবে পূর্ণ। ভারতের প্রাচীন ঋষিরা অসীম প্রজ্ঞা ও শিশুতুল্য সরলতা সহযোগে এই সমের বৈচিত্র্যের মধ্যে এক প্রত্যেক্ষগম্য ঐক্য আবিষ্কার করেছিলেন যা অদ্যাবধি মানবসভ্যতায় ভারতবর্ষের মহত্তম অবদান।

এখানে অবশ্যই এই তর্কটি উঠতে পারে যে সাহিত্যে বা অন্যবিধ শিল্পকার্যে অন্ধ সংস্কারের এই যে অনুপ্রবেশ (!) এর হেতু কি? একি কেবল বহিরঙ্গের প্রয়োজন? কেবল কি এই জন্যে যে ঈদৃশ আঙ্গিকের অনুষঙ্গে শিল্পী বা সাহিত্যিকের কাঙ্খিত প্রতিবেশটি ফোটে ভাল? এবং ঐ প্রতিবেশের গভীরে এই অসংস্কারাদির কোন ইতিবাচক ভূমিকা নেই? না কি অন্যরূপ? কোন শিল্পকর্মের বহিরঙ্গ অন্তরঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত সম্পর্ক যেহেতু ব্যাকরণ বিরোধী, তাই আমার ধারণা, শিল্প বা দর্শনের সামগ্রিক প্রয়োজনেই এই সংস্কারগুলিকে স্থান দেওয়া হয়েছে কেবল অঙ্গিকের প্রয়োজনে নয়। সংশ্লিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিকেরা ওপরে আলোচিত নিদর্শনগুলিতে এই বক্তব্যই তুলে ধরেছেন যে পরিশীলিত মনন এবং সংস্কার—এই দুই বিপরীতের মিলনে গঠিত এক সত্তাই হল চেতনা, এদের একটিকে বাদ দিলে চেতনার স্বাভাবিকতা তথা সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন হয়। আর এটা তাঁরা করেছেন এবং করে আসছেন আধুনিক বিজ্ঞান এবং হেগেলের দ্বান্দ্বিক দর্শনের অভ্যুদয়ের বহু আগে থেকেই।

আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার গড়ব্যবস্থার দিকে তাকালে স্বীকার করতেই হয় যে সেই ব্যবস্থায় কিন্তু চেতনার এই দ্বান্দ্বিকতাকে স্বীকার করা হয় নি, বিজ্ঞানকে একটি সঙ্কীর্ণ অর্থেই মাত্র গ্রহণ করা হয়েছে। জীবনের সামগ্রিকতার অতি অল্প অংশ এই সঙ্কীর্ণ বিজ্ঞানের অধিকারে। সংক্ষিপ্ততা, যথার্থ্য এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টির যে মানদণ্ডে সে ঘটনাকে যাচাই করতে বসে তা জীবনকে স্বাচ্ছন্দরহিত করে যতটা দণ্ডদান করে ততটা মান দিতে পারে না এমন একটি মতও শিল্প সংস্কৃতির মহলে প্রবল। উদাহরণ দিতে গিয়ে আবার সত্যজিতের কথা চলে আসছে। মনে পড়ছে "চিড়িয়াখানা" চলচ্চিত্রের সেই দৃশ্যের কথা যেখানে সত্যান্বেষী হাজির হয়েছেন পুরোনো দিনের এক শিল্পীর বাড়ীতে তাঁর গোয়েন্দাগিরির প্রয়োজনে "বিষবৃক্ষ" চলচ্চিত্রটি দেখবার উদ্দেশ্যে। ঘটনাপঞ্জীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তিনি সুরু দিয়েছেন ইতিমধ্যে। দোতলায় উঠবার মুহূর্তে দেখা গেল সিঁড়ির গোড়ায় এক মশালবাহী মূর্তি মানুষটি বেঁকেচুরে দাঁড়িয়ে আছে আলোর মশালটিকে উঁচুতে তুলে ধরে। আমার ধারণা, এই হল মানুষের ওপরে সঙ্কীর্ণ বিজ্ঞানের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বর্তমান বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর প্রত্যয়। তাছাড়া, আমাদের "জ্ঞান ও বিজ্ঞানে"র আগেকার প্রচ্ছদে সত্যজিত যে-জ্ঞান সূর্যটি এঁকেছিলেন অক্টোপাশের সঙ্গে তার অবয়বসাদৃশ্য এই ধারণটিকেই সমর্থন করে।

ব্যাপারটা একটু খুলে আলোচনা করলে বোধ হয় সুবিধা হবে। আসুন বলা যাক সূর্য আর পৃথিবীর সেই পুরোনো বিতর্কটি নিয়ে। রোজ সকালে সূর্যকে পূর্বদিকে উঠতে এবং পৃথিবী প্রদক্ষিণান্তে বিকালে পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখি। এই

যে-দেখা এ নিছক ইন্দ্রিয়ের দেখা। তারপরে একদিন পরিশীলিত মনন জানালো আসল তথ্য এই ইন্দ্রিয়ের দেখার ঠিক উলটো, তখন আমরা চমৎকৃত হলাম, বাহবা দিলাম আবিষ্কারককে এই জন্যে যে-তিনি আমাদের চোখ খুলে প্রকৃত বিশ্ববীক্ষণের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এই নতুন কথা বলতে যে-অসীম সাহস ত্যাগ এবং নিষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছিল মানুষের ভাণ্ডারে তা আছে এই দেখেও আমরা সেদিন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। এই পর্যন্ত ব্যাপারটা চলেছিল ঠিক পথে কিন্তু তারপরে বিজ্ঞানের মোহে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ঝোঁকে আমরা যখন ইন্দ্রিয়ের দেখাটিকে উপেক্ষা করতে লাগলাম তখন ভুলে গেলাম আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আবার একপেশে হয়ে পড়ল, তখন আমরা যে ইতিহাসে একদিন মানুষ ছিল গুহাবাসী, সেদিন অভয়, আশ্বাস এবং উত্তাপ বিজড়িত প্রভাতের সূর্যোদয় তার কাছে কেবল

চিত্র 2: নোৎরদাম গীর্জার দৈত্যদানো।

একটি জড়বস্তুর উদয় মাত্র ছিল না, তা ছিল পরম ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব আর সন্ধ্যার সূর্যাস্ত ছিল সূর্যের তিরোধান। সেদিন থেকে আজ এই বিকালের যুগ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়ের আহরিত জ্ঞানও মানুষের সামগ্রিক উপভোগ এবং উপলব্ধির অঙ্গীভূত, বিজ্ঞান যে সামগ্রিক মানব অভিজ্ঞতার একটি অংশ মাত্র। সেই জন্য শুধু পরিশীলিত বিজ্ঞান তথ্যের উপর ভিত্তি করে যদি কোন জীবন দর্শন গঠন করতে যাওয়া হয় তবে তা খুবই সীমিত ও সঙ্কীর্ণ হতে বাধ্য। আমি যতদূর জানি, একমাত্র উপনিষদেই সামগ্রিক মানব অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করে একটি জীবনদর্শন গড়ে তোলা হয়েছে। উপনিষদের ঋষি একবার যেমন বলছেন,

"প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়তি এব সূর্যঃ।"

তেমনি আবার প্রকৃতির তমসার পরপারে আদিত্যবর্ণ এক পুরুষের কথাও বলেছেন। বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে না থাকলেও এটা বলা প্রয়োজন হেগেলের দ্বান্দ্বিক দর্শন এ-ব্যাপারে উপনিষদের অনেকটা কাছাকাছি উপস্থিত। দ্বান্দ্বিকতাকে বাদ দিয়ে কেবল সঙ্কীর্ণ বিজ্ঞানের উপর

নির্ভর করেই যদি একটি দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার চেষ্টা হয় তবে সূক্ষ্ম হলেও তা হবে সামগ্রিক মানব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ ও সঙ্কীর্ণ, ঠিক যেমন বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে কেবল ইন্দ্রিয়লব্ধ এবং কপোলকল্পিত প্রাথমিক তথ্যাদির ওপর ভিত্তি করে কোন দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত তুলে তাও হবে সঙ্কীর্ণ।

এই দুই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর রক্তক্ষয়ী সংঘাতের মধ্য দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান একদিন পশ্চিমী সমাজে জন্ম নিয়েছিল। সেই সংঘাত আজও আমাদের সমস্ত চিন্তাকে অধিকার করে আছে। দ্বান্দ্বিক দর্শন বলে, দ্বন্দ্ব তাবৎ অস্তিত্বের মজ্জাগত, অথবা, অন্যভাষায়, সমস্ত সত্তাই দুই বিপরীতের সমাহারে গড়া। হলডেন দেখিয়েছেন, দ্বন্দ্বকে সমাধান করবার ক্ষমতা যে কোন সভ্যতার অগ্রগতির একটি পরিমাপ। আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের আগেও মানুষকে বস্তু ও চিন্তার বিবিধ দ্বন্দ্বের সমাধান করতে হয়েছে। না হলে অতীতের বিশাল সভ্যতাগুলির অস্তিত্বই সম্ভব হত না। সেই সমাধানের পথ কিন্তু এখনকার মত সংঘাতময় ছিল না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের সংঘাতপূর্ণ অভ্যুদয়ের পরে সেই সংঘাতের স্মৃতি আমরা আজও ভূতের বোঝার মত বয়ে বেড়াচ্ছি। এই এক ধরণের ভুতুড়ে তাগিদেই সমস্ত দ্বন্দ্বের সমাধান করতে গেলে আজকাল প্রথমেই আমাদের সংঘাতের কথা মনে আসে। অবিজ্ঞানের একদেশদর্শী জয়গান করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু একথাটি মনে রাখাও খুবই দরকার যে, তাবৎ সূক্ষ্ম বিজ্ঞান-বুদ্ধির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে সমপরিমাণ স্থূল অবিজ্ঞান বিরাজ করে—হয়তো বা মানুষের দেহ মনের গঠনবৈশিষ্ট্যই এর জন্য দায়ী—কিন্তু দায় যারই হোক, অবিজ্ঞানকে নাকচ করা কখনোই সম্ভব নয়।

প্রাচীন সভ্যতার বিজ্ঞানবুদ্ধির আজ আমূল উত্তরণ ঘটে গেলেও অনেক সংস্কারকে আমরা উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছি। এখনকার সভ্যতার দ্বন্দ্ব তাই আধুনিক বুদ্ধির সঙ্গে প্রাচীন সংস্কারের। সংস্কারকে অবলুপ্ত করা যখন সম্ভব নয় তখন তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতেই হবে। একদিন সমাজ পণ্ডিতেরা ঈশ্বর বা ধর্মের অভিমুখে সমস্ত স্থূল প্রবণতাকে আকর্ষণ করেছিলেন। তখন ছিল ভাববাদী দর্শনের যুগ। পরবর্তীকালে বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী পণ্ডিতেরা ও মানুষ, দেশ প্রভৃতি ধারণার দিকে সংস্কারগুলিকে চালিত করবার চেষ্টা করেছেন। এই ধরণের সব চেষ্টাই হল বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের মধ্যবর্তী সঠিক সাম্যবিন্দুটি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা। একথা ইতিহাসের সত্য যে, সমাজব্যবস্থা যখন এই সাম্যবিন্দুটি খুঁজে পেয়েছে তখনই তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে কিছুদিনের জন্য স্থিতিলাভ করেছে। দার্শনিক পরিভাষায় যাকে বলে synthesis. এই আপাত স্থিতিলাভের পরেই মাত্র তাকে thesis এর আখ্যা দেওয়া যায় যার থেকে নতুন antithesis জন্ম নিতে পারে এবং পুরাতন সাম্যবিন্দুটি বিপর্যস্ত করে, পারে নতুন সাম্যবিন্দুর দিকে চালিত করতে। সাম্যবিন্দুটি যেহেতু বিজ্ঞানবুদ্ধি ও সংস্কার—এই দুই বিপরীতের সমাহারে (unity of opposites) গঠিত সেই জন্য একে মেনে না নিলে অস্তিত্বের দ্বান্দ্বিকতাকেই অস্বীকার করা হয়।

তার ফল হয় কিন্তু ভয়াবহ। এই অস্বীকার থেকে উৎপন্ন হয় যে-জীবনদর্শন বস্তুবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে মনস্বী এঙ্গেল্‌স্ তাকে vulgar বিশেষণে চিহ্নিত করেছেন। ভাববাদ প্রসঙ্গেও আমরা একই কথা বলতে পারি। অর্থাৎ, আমার সাদামাঠা কথাটি হল, একই সমাজদেহে একই সময়ে সূক্ষ্মতা ও স্থূলতা তথা বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের যুথপ্রোথনটিকে জেনে না নিলে একটি vulgar জীবনদর্শনের খপ্পরে পড়তে হয়—সমাজে সেই সময়ে যদি ভাববাদী ঝোঁক প্রবল থাকে তবে এই অস্বীকার থেকে জন্ম নেয় vulgar ভাববাদ, আর বস্তুবাদী প্রবণতা প্রবল হলে জন্ম নেয় vulgar বস্তুবাদ। একজন গ্রামীণ সুদ-খোর মহাজনকে vulgar ভাববাদের এবং বিজ্ঞানের যে ডিগ্রীধারী অর্থের বিনিময়ে খাদ্যে ভেজাল মেশানোর পরামর্শ দেয় তাকে vulgar বস্তুবাদের

প্রতিভূ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। তবে "আলালের ঘরের দুলালে"-র ঠকচাচার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা সম্ভবতঃ আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, vulgar ভাববাদের সঙ্গে vulgar-বস্তুবাদের বিশেষ তফাৎ নেই।

ঠিক এমনি মিল আছে দ্বান্দ্বিক ভাববাদ এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মধ্যেও। বিষয়টি নিয়ে বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা থাকল। তবে, প্রসঙ্গত এইটুকু এখানে বলতেই হবে যে, ভাববাদী সমাজের মধ্যেও দ্বান্দ্বিক ভাববাদীরাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংস্কৃতির মশালটিকে উঁচুতে ধরে রেখেছিলেন, তাঁরাই আহরণ করেছিলেন লৌকিক অভিজ্ঞতার অমূল্য সম্পদ ডাকের বচন, খনার বচন প্রভৃতি, ভাববাদী দর্শনকে আশ্রয় করেই মধ্যযুগীয় অন্ধকারের মধ্যেও তাঁরা দিকে দিকে জেলেছিলেন শিল্প-সাহিত্যের রংমশাল; ধর্মের নামে, জীবনের দ্বান্দ্বিকতার নামে বা দ্বান্দ্বিক ভাববাদী নির্জীবকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ" ধর্ম তাঁর ওপর আফিং-এর কাজ করেছিল একথা মানা যায় না—কোন শ্রদ্ধেয় সমাজ-বিজ্ঞানী বললেও না—অহিফেন মুক্তির উপায় হিসাবেই বরং তিনি ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন।

আজকের বিজ্ঞানকর্মী যাঁরা চান সমাজকে বিজ্ঞানভিত্তিক করে গড়ে তুলতে কোন তাৎপর্যপূর্ণ কাজ যদি করতে হয় তবে আগেকার দ্বান্দ্বিক ভাববাদীদের মশাল থেকেই তাঁদের অগ্নি আহরণ করতে হবে। যেমন চিরকাল তেমনি ঠিক এখনকার লড়াইটাও হল দ্বান্দ্বিক দর্শনের সঙ্গে vulgar দর্শনের, সে-লড়াইতে দ্বান্দ্বিক ভাববাদই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বন্ধুস্থানীয়, vulgar বস্তুবাদের অবস্থান কিন্তু বিপরীত মেরুতে, vulgar ভাববাদের সঙ্গে একাসনে।

এমন ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে যে, আজকাল আমাদের দেশে সমাজকে যাঁরা বিজ্ঞানভিত্তিক করতে চান তাঁরা দ্বান্দ্বিক দর্শনে শিক্ষিত নন। ফলে তাঁদের প্রয়াস vulgar বস্তুবাদের দিকে ঝুঁকে পড়া বিচিত্র নয়। সমস্ত সংস্কারকে তাড়ানোর উদ্যোগ করে তাঁরা হয়তো জীবনকে শুষ্ক যান্ত্রিকতার বলি করে তুলবেন। সাম্রাজ্যবাদের অনুষঙ্গে যেমন মিশনারীদের আগমন হয় তেমনি vulgar বস্তুবাদের সঙ্গে এসে জুটবে vulgar ভাববাদ। মধ্যযুগীয় সমাজের যেটা পাঁকের দিক সেই অন্ধকারের দিকে সমস্ত সমাজের যাত্রা এবার তাহলে শুরু হবে। সংস্কারকে সেদিনও কিন্তু তাড়ানো যাবে না। কেবল সুস্থ সংস্কারগুলির স্থান নেবে কিছু দুষ্ট সংস্কার—যার কথা আমরা আগেই বলেছি।

নিয়তি, গরু এবং কাকের ডাকের অমঙ্গল চিহ্নকে উপেক্ষা করে ফেলুনাথ, তপসে আর লালমোহনবাবু মগনলালের বাড়ী পৌছলেন। সেখানে আমরা vulgar বস্তুবাদ থেকে জাত সংস্কারের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ থেকে জাত সংস্কারের একটি লড়াই দেখতে পেলাম। যে-সংস্কার মগনলালকে টাকার জন্য নরহত্যায় কিংবা দেশের প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্পদের চোরাই চালানে প্রবৃত্ত করে তার উৎস vulgar বস্তুবাদ, আর যে সংস্কার ফেলুনাথকে ঐ চোরাই চালানের বিরুদ্ধে প্রণোদিত করে এবং বন্ধুর অসম্মান ও বিপদকে রুখবার জন্য ঝুঁকি নিতে প্রেরণা দেয় তার উৎস বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ। বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান-সংস্কৃতির টানাপোড়নের মধ্যবিন্দুটি চিরকালই এইখানে। আমাদের সাংস্কৃতিক তথা বিজ্ঞানী সমাজকর্মীরা যদি কথাটি মনে রাখেন তবেই আমরা আপামর জনসাধারণ—একদিন সমস্বরে "জয় বাবা ফেলুনাথ" বলে আনন্দ প্রকাশ করতে পারব।

লিজ্ মাইট্‌নার

বিশ্বনাথ দাস*

[1978 সালের নভেম্বর মাসে পরমাণু বিভাজনের অন্যতম হোতা লিজ্ মাইটনারের জন্মশতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে। এই প্রবন্ধটি তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হল]

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে, অর্থাৎ 1939 সালে বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকার 11-ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল একটি চিঠি। চিঠিটিতে তারিখ দেওয়া ছিল 16-ই জানুয়ারী, 1939। পাঠিয়েছিলেন দু-জন পরমাণুবিজ্ঞানী যাঁদের একজন হলেন অটো ফ্রিশ আর অন্যজন তাঁরই পিসী লিজ্ মাইট্‌নার। ফ্রিশ তখন স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে নীলস্ বোরের গবেষণাগারে কর্মরত এবং মাইট্‌নারও হিটলারের ভয়ে জার্মানী থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রবাস জীবন যাপন করছেন সুইডেনে।

চিঠিখানির আত্মিক জন্ম অবশ্য কিছু আগে, 1938 সালের ডিসেম্বর মাসে। সুইডেনের একটি ছোট্ট গ্রামে বড়দিনের বিশেষ ভোজসভায় মিলিত হয়েছিলেন ষাট বছরের প্রৌঢ়া পিসী ও তাঁর ভাইপো। বার্লিন ছেড়ে চলে আসার পর উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ হয়ে ওঠে না বড় একটা। নানা কথার মধ্যে এসে পড়লো তাঁদের একদা কর্মস্থল বার্লিনের গবেষণাগারে (বর্তমান ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটুট) প্রসঙ্গ। ফ্রিশ ও মাইট্‌নারের মধ্যে সেদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ওঁদের দুই পূর্বতন সহকর্মী অটো হান ও ফ্রিৎস্ স্ট্র্যাসম্যানের সাম্প্রতিক কাজের প্রতিবেদন।

বিশ শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই বিজ্ঞান গবেষণার সূত্রপাত 1934 সালে, ইতালীতে। এন্‌রিকো ফের্মির গবেষণাগারে। ফের্মি এবং তাঁর সহযোগীরা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে ইউরেনিয়াম মৌলকে ধীরগতি নিউট্রন কণিকার সাহায্যে ঘাতিত করলে অন্ততঃ চার রকমের পদার্থ উৎপন্ন হয়ে থাকে। পৃথক পৃথক অর্ধায়ু-বিশিষ্ট এই পদার্থগুলিকে তাঁরা ইউরেনিয়াম-239 (ইউরেনিয়াম-238 থেকে নিউট্রন-গামা বিক্রিয়ায় সৃষ্ট) এবং এর থেকে উৎপন্ন 93-তম, 94-তম এবং সম্ভবতঃ আরো বেশী পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট মৌল বলে মনে করেন। শেষোক্ত মৌলগুলিকে সাধারণ ভাবে বলা হয় 'ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল'।

জার্মান মহিলা রসায়নবিজ্ঞানী আইডা নড্যাক '93-তম মৌল প্রসঙ্গে শীর্ষক একটি নিবন্ধে ইতালীয় বিজ্ঞানীদের উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে লিখলেন "……যতদূর মনে হয় নিউট্রনের সংঘাতে ভারী পরমাণুকেন্দ্রকসমূহ অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত হয়ে পড়ে যারা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন

*বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী

মৌলের সমস্থানিক; স্বারিত মৌলটির নিকটতম প্রতিবেশী এগুলি না হওয়াই সম্ভব।"

1938 সালে হান ও ষ্ট্র্যাসম্যান নিউট্রন স্বারিত ইউরেনিয়ামকে তেজঃ-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অর্ধায়ু-বিশিষ্ট উপাদানে পৃথক করতে গিয়ে বাহক পদার্থ হিসাবে বেরিয়াম যৌগ ব্যবহার করে দেখেন যে একটি তেজস্ক্রিয় উপাদান বেরিয়াম সালফেটের সঙ্গে সহ-অধঃক্ষিপ্ত হয়। বেরিয়ামের সঙ্গে রেডিয়ামের (পারমাণবিক সংখ্যা 88) রাসায়নিক সাদৃশ্য থাকায় ঐ বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেন যে নিউট্রনের সংঘাতে ইউরেনিয়াম রেডিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে।

খবরটি পাওয়া মাত্রই মাইট্নার এটিকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেন। পারমাণবিক সংখ্যা 92-বিশিষ্ট ইউরেনিয়াম মৌল থেকে রেডিয়াম হতে গেলে একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুকেন্দ্রক থেকে যুগপৎ দুটি আল্‌ফা কণা (হিলিয়াম পরমাণুকেন্দ্রক) নির্গত হওয়া দরকার। মাইট্নার বললেন, এর জন্য যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন আলোচ্য পরমাণুকেন্দ্রিক বিক্রিয়ায় তা পাওয়া সম্ভব নয়। পরীক্ষাটি পুনরায় করে সহ-অধঃক্ষিপ্ত অংশটিকে রাসায়নিকভাবে পৃথক করা সম্ভব কিনা তা দেখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে তিনি হান ও স্ট্রাসম্যানকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন।

বড়দিনের কয়েক দিন আগে এর উত্তর আসে। পূর্বোক্ত ঐ অধঃক্ষেপটি থেকে রেডিয়ামের কাছাকাছি পারমাণবিক ভার-বিশিষ্ট কোন মৌলই পাওয়া যায় নি। অর্থাৎ, বিতর্কিত উপাদানটি বেরিয়াম ছাড়া সম্ভবতঃ আর কিছুই নয়।

অন্যান্য অতিথি ও বন্ধুরা বিদায় নেবার পর বাইরের তুষারপাত অগ্রাহ্য করে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে পিসী ভাইপোতে এই আলোচনাই করছিলেন। দীর্ঘ বিতর্কের পর মাইট্নার একরকম নিশ্চিত হলেন যে ওটা বেরিয়াম মৌলই হবে। সুতরাং আলোচ্য বিক্রিয়াটিতে পরমাণুকেন্দ্রকের বিভাজন ঘটেছে এ ধরণের বিক্রিয়ার কথা আগে কেউ ভাবে নি।

মাইট্নারের পরামর্শমত 1939-এর জানুয়ারী মাসে একটি বিবরণীতে হান ও ষ্ট্র্যাসম্যান লেখেন "......আগের নিবন্ধে যে মৌলটিকে আমরা রেডিয়াম বলেছিলাম তা প্রকৃতপক্ষে বেরিয়াম। ......রসায়নবিদ হিসাবে এখন আমাদের পূর্ববর্ণিত শৃঙ্খলে Ra, Ac ও Th...চিহ্নগুলিকে যথাক্রমে Ba, La ও Ce...দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা প্রয়োজন......যদিও এযাবৎ লব্ধ পরমাণুকেন্দ্রকের আচরণের বিরোধী এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে আমরা মনস্থির করতে পারছি না।"

অতঃপর হান ও স্ট্র্যাসম্যান এতদিন যে মৌলটিকে রেনিয়ামের (Re) সদৃশ কোন ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল বলে মনে করেছিলেন সেটিকে এখন ঐ একই শ্রেণীভুক্ত পারমাণবিক সংখ্যা 43-বিশিষ্ট মৌল ম্যাসুরিয়াম (বর্তমান নাম টেকনিশিয়াম, Tc) বললেন এবং দেখালেন যে বেরিয়াম-138 ও ম্যাসুরিয়াম-101—এই দুটি পরমাণুর ভরসংখ্যার যোগফল দাঁড়াচ্ছে 239 যা নিউট্রন ও স্বারিত ইউরেনিয়াম-238 পরমাণুকেন্দ্রকের মিলিত ভরসংখ্যার সমান।

ঐ একই সময়ে ফ্র্যান্সে গবেষণারত আর এক মহিলা বিজ্ঞানী আইরিন জোলিও-কুরী এবং তাঁর সহযোগী পিয়ের সাভিচ প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্তের মুখে এসে পড়েছিলেন। তাঁরা নিউট্রন স্বারিত ইউরেনিয়াম থেকে 3·5 ঘণ্টা অর্ধায়ু-বিশিষ্ট একটি উপাদান (R 3·5hr) পৃথক করলেন। নাইট্রিক অ্যাসিড দ্রবণ থেকে ল্যান্থানাম বাহকের সঙ্গে অক্সালেট যৌগ হিসাবে এটি সহ-অধঃক্ষিপ্ত হয়—যার থেকে বোঝা গেল যে ওটি অ্যাকটিনিয়াম (89তম মৌল Ac) নয়, কেননা অ্যাকটিনিয়াম অক্সালেটকে এরূপ শর্তে অধঃক্ষিপ্ত হতে দেখা যায় না। অবশ্য আলোচ্য উপাদানটিতে সামান্য অপদ্রব্য থেকে যাওয়ায় জোলিও-কুরী ও সাভিচ্ কিছুটা বিভ্রান্ত

হয়ে পড়েন এবং মনে করেন যে ল্যান্থানাম (57তম মৌল, La) থেকে তেজস্ক্রিয় উপাংশটিকে হয়তো আলাদা করা যেতে পারে যা পরবর্তী পরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণিত হয় নি।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ফ্রিশ ও মাইট্নারের মধ্যে সেই রাত্রের আলোচনার ফলস্বরূপ ঐতিহাসিক চিঠিখানি বাণীরূপ পেল। তাঁরা লিখলেন: "হান ও ষ্ট্র্যাসম্যানের পরীক্ষায় যা দেখা গেছে তা প্রথম দৃষ্টিতে স্পষ্টতঃই দুর্বোধ্য। ওভাবে ইউরেনিয়াম থেকে হাল্কা মৌল সৃষ্টি হওয়ার কথা আগেও ভাবা হয়েছে, কিন্তু রাসায়নিক প্রমাণাদি ঠিকমত না পাওয়ার ফলে এযাবৎ এধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে। কুলম্বীয় প্রাচীরের ভেদ্যতা কম ব'লে কোন পরমাণু কেন্দ্র থেকে অনেকগুলি আধান সমন্বিত কণার নির্গমন মোটেই সহজ নয়।

....বর্তমান পরীক্ষাগুলি থেকে মনে হচ্ছে যে ভারী পরমাণুকেন্দ্রকসমূহের আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং এদের ক্ষয় প্রক্রিয়া সনাতন ধারণানুগ নয়। ... ইউরেনিয়াম পরমাণুকেন্দ্রকের গঠনশৈলী এমন যে একটি নিউট্রন কণিকা আত্মসাৎ করার পর এটি প্রায় কাছাকাছি ভরযুক্ত দুটি ভিন্ন পরমাণুকেন্দ্রকের বিভক্ত হয়ে পড়ে। ...ভারী পরমাণুকেন্দ্রকের এরূপ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়াকে বলা যায় 'ফিসন' বা পারমাণবিক বিভাজন। ......নিউট্রনের সংঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুকেন্দ্রক ভেঙে বেরিয়াম, ল্যান্থানাম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত হাল্কা মৌলের সৃষ্টির এরকম সহজ ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি।

বিভাজনের ফলে সৃষ্ট প্রাথমিক টুকরো দুটির পরমাণুকেন্দ্রকের নিউট্রন : প্রোটন অনুপাত অত্যন্ত বেশী থাকায় এগুলি দুঃস্থিত হয় এবং বিটা-রশ্মি বিকিরণের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে এরা অন্যান্য মৌলের পরমাণুতে রূপান্তরিত হতে থাকে। এইসব তেজস্ক্রিয় পরমাণুকেন্দ্রকের অর্ধায়ু যথেষ্ট কম বলে এগুলিকে এযাবৎ ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল বলে মনে করা হতো।"

প্রকৃতপক্ষে ফ্রিশ ও মাইট্নারকে 'ফিসন' কথাটি ব্যবহার করার পরামর্শ দেন মার্কিন জীববিজ্ঞানী আর্নল্ড। তিনি এই সময়ে কোপেনহেগেনে কিছুদিনের জন্য কর্মরত ছিলেন। জীবকোষের বিভাজনের সঙ্গে সাদৃশ্য উপলব্ধি করে তিনি কিছুটা পরিহাসছলেই আলোচ্য ক্ষেত্রে ঐ শব্দটি প্রয়োগ করার কথা বলেছিলেন।

ফ্রিশ ও মাইট্নার তাঁদের চিঠিটিতে এমন কথাও বলেছিলেন যে পরমাণুকেন্দ্রিক বিভাজনের ফলে সৃষ্ট টুকরো দুটির গতিশক্তি এত বেশী থাকবে যে তীব্রবেগে এরা বিক্রিয়াস্থল থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসবে এবং গতিপথে মাধ্যমের মধ্যে পর্যাপ্ত আয়নন সংঘটিত করবে। এর কয়েক দিনের মধ্যেই একটি আয়নন প্রকোষ্ঠ ব্যবহার করে ফ্রিশ প্রমাণ করেন যে নিউট্রন তাড়িত ইউরেনিয়াম থেকে যে সব কণা বেরিয়ে আসে তাদের আয়নন ক্ষমতা অবিশ্বাস্য রকমের প্রচণ্ড।

ইউরেনিয়াম পরমাণুকেন্দ্রকের বিভাজন উপলব্ধি করতে গিয়ে মাইট্নার জীবকোষ বিভাজন ছাড়াও যে বিষয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা হলো তরল পদার্থের ফোঁটার ভৌত ধর্মাবলী। পৃষ্ঠটানের দরুণ যেমন এক ফোঁটা তরল সহজে ক্ষুদ্রতর কণায় বিচ্ছিন্ন না হয়ে একটি নিটোল আকার ধরে থাকে তেমনি পরমাণুকেন্দ্রকগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় সুস্থিত হয় কিন্তু অতিরিক্ত শক্তি দেওয়া হলে তরলের ফোঁটা বা কোন পরমাণুকেন্দ্র প্রথমে বিকৃত এবং পরে ক্ষুদ্রতর কণায় বিভক্ত হয়ে পড়তে পারে। নিউট্রন শোষণ ক্রিয়া সংশ্লিষ্ট শক্তির প্রভাবে আলোড়িত তরল ফোঁটার মত যৌগ ইউরেনিয়াম পরমাণুকেন্দ্রকটির আকারগত বিকৃতি ঘটে। অতঃপর মুদ্গারাকৃতি ঐ বিকৃত পরমাণুকেন্দ্রক পূর্বের অবস্থায় ফিরে না এসে তড়িৎ বিকর্ষণের ফলে প্রায় কাছাকাছি ভরের দুটি প্রধান টুকরোয় বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ফ্রিশ ও মাইট্নারের 'ফিসন' তত্ত্বের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নীল্‌স্ বোর এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণায় প্রবৃত্ত

হন এবং আমেরিকায় গিয়ে হুইলারের সহযোগিতায় প্রমাণ করলেন যে কোন পরমাণুকেন্দ্রকের তড়িৎ বিকর্ষণজনিত শক্তি তার পৃষ্ঠটানের দ্বিগুণের বেশী হলে তবেই এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভাজিত হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হলো, পরমাণুকেন্দ্রকটির Z^2/A মান 50-এর বেশী হবে (Z=পারমাণবিক সংখ্যা, A=ভর সংখ্যা)। পরমাণুকেন্দ্রিক বিভাজনের জন্য এর সংকটমান 40-এর কাছাকাছি হওয়া প্রয়োজন। প্লুটোনিয়াম-239 (Z=94) এর এই মান 37·0, ইউরেনিয়াম-235-এর 36·0 এবং ইউরেনিয়াম-233-এর 36·4। অন্যান্য অপেক্ষাকৃত হাল্কা পরমাণুকেন্দ্রকের এই Z^2/A মান 30 বা তার থেকেও কম বলে সেগুলি বিভাজনযোগ্য নয়। উল্লেখ্য যে, ইউরেনিয়াম-238 বিভাজনযোগ্য নয় কিন্তু এর 235 সমস্থানিকটি (প্রাকৃতিক খনিজে যেটি খুবই কম পরিমাণে থাকে) প্রায় যে কোন শক্তিসমন্বিত নিউট্রনের সংঘাতে বিভক্ত হতে পারে। ইউরেনিয়াম-238 পরমাণু-কেন্দ্রকের বিভাজন ঘটাতে 1 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের অর্থাৎ $1{\cdot}6\times10^{-6}$ আর্গ) বেশী শক্তিসম্পন্ন দ্রুতগামী নিউট্রন প্রয়োজন।

1939-এর আগে পর্যন্ত পরমাণুকেন্দ্রিক বিক্রিয়ায় সর্বাধিক যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া গেছে তা হলো 22·2 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট (Mev)। লিথিয়াম-6-এর উপর ডয়টেরনের (ভারী হাইড্রোজেনের পরমাণুকেন্দ্র) সংঘাতে দুটি আল্ফা কণা সৃষ্টি হওয়ার সময় ঐ পরিমাণ শক্তি উদ্ভূত হতে দেখা গেছে। মাইট্নার ও ফ্রিশ প্রাথমিক হিসেব করে দেখান যে ইউরেনিয়ামের পরমাণুকেন্দ্রিক বিভাজনে প্রায় এর দশগুণ অর্থাৎ 200 Mev-এর মতো শক্তি পাওয়া যাবে। ভর হিসাবে আবদ্ধ স্থিতিশক্তিই এর উৎস এবং ভরের শক্তিতে রূপান্তর ব্যাপারটি স্বভাবতঃই আইনস্টাইনের সুবিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ অনুযায়ী হয়ে থাকে।

ইউরেনিয়াম-235 পরমাণুকেন্দ্রকের বিভাজন নানা ভাবে ঘটতে পারে। যদি এটি প্রধান দুটি টুকরো মলিবডেনাম-95 ও ল্যান্থানাম-139 এবং 7টি বিটা (ইলেকট্রন) ও দুটি উপজাত নিউট্রন (যেগুলি সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে) কণিকায় ভেঙে যায় তাহলে হিসাব করে দেখা যায় একটি U-235 পরমাণু থেকে প্রায় 204 Mev শক্তি উৎপন্ন হবে। একটি পরমাণু থেকে এতখানি শক্তির উদ্ভব হওয়া সত্যিই অবিশ্বাস্য। এই হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীদের সামনে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেল। উন্মুক্ত হলো এক অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার। জীবাশ্ম জ্বালানী অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো নিঃশেষিত হবে কিন্তু পরমাণুকেন্দ্রিক জ্বালানী অত্যন্ত ঘনীভূত বলে দীর্ঘদিন এগুলি মানবজাতিকে শক্তির যোগান দিয়ে যাবে।

লিজ্ মাইট্নারের জন্ম 1878 সালের নভেম্বর মাসে, ভিয়েনায়। তাঁর স্কুল-কলেজের শিক্ষাও সেখানে। অতঃপর রসায়নশাস্ত্রের উপর উচ্চতর অধ্যয়ন ও গবেষণা শুরু করেন তিনি বার্লিনে। রসায়নাগারে সেকালে মেয়েদের কাজ করতে দেওয়া হতো না বড় একটা। কিন্তু কাজের উপর তাঁর অসম্ভব ঝোঁক ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করে কর্তৃপক্ষ তাঁর জন্য বিধিনিষেধ শিথিল করেছিলেন।

বার্লিনের ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিট্যুট ত্রিশ বছর কাজ করেন মাইট্নার। পরমাণুকেন্দ্রিক বিভাজনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও 'মডেল' আবিষ্কার করা ছাড়াও তিনি বিটা রশ্মির মধ্যে ইলেকট্রন কণিকাসমূহের উপর শক্তির বণ্টন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। 1936 সালে তিনি ভিন্ন তেজস্ক্রিয়তা ধর্মবিশিষ্ট সমভর সমস্থানিকগুলিকে (isobaric isotope) পরমাণুকেন্দ্রিক আইসোমার নামে অভিহিত করেন। মাইট্নারের বিস্ময়কর প্রতিভা এবং পরমাণুবিজ্ঞানে জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করে

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর সম্পর্কে বলতেন "আমাদের মাদাম ক্যুরী"।

1938 সালে জার্মান থেকে পালাতে বাধ্য হন মাইট্নার। এরপর সুইডেনে প্রায় বাইশ বছর নানা ধরণের কাজ করেন তিনি। 1960 সালে অবসর নিয়ে চলে আসেন কেম্ব্রিজে এবং বাকী জীবনটা সেইখানেই কাটিয়ে দেন। কিন্তু সক্রিয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকর্ম থেকে বিরত থাকলেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন বিজ্ঞান অন্দোলন এবং মানবকল্যাণে বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

1968তে নিজের নব্বইতম জন্মদিনের মাত্র কয়েকদিন আগে পৃথিবীর প্রথম সারির একজন পরমাণুবিজ্ঞানী লিজ্ মাইট্নারের জীবনান্ত ঘটে। অতি সম্প্রতি তাঁর জন্মের শতবর্ষ অতিক্রান্ত হলো। এই উপলক্ষ্যে পরমাণুকেন্দ্রিক বিভাজন তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা লিজ্ মাইট্নারের নাম আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।
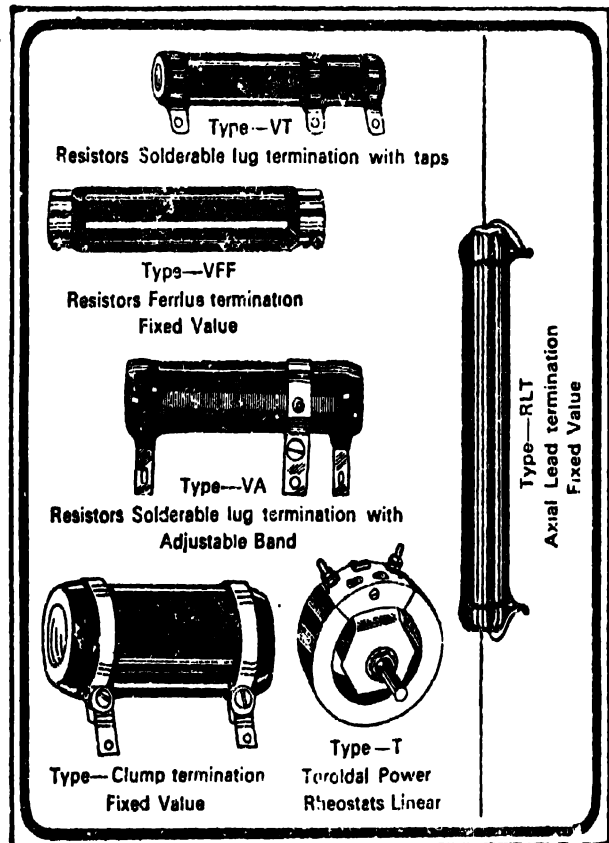
কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

ব্যাক্‌টিরিয়া

অলোকরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় *

ব্যাক্‌টিরিয়া ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককোষী উদ্ভিদ। কিন্তু উদ্ভিদ ও সমগ্র প্রাণী-জগৎ তার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। ব্যাক্‌টিরিয়া অপকারও করে, কিন্তু উপকার করে তার চেয়ে অনেক বেশী। এই প্রবন্ধটিতে এই উপকারের কথাই আলোচনা করা হয়েছে।

জল, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্রই বিরাজমান একপ্রকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্লোরোফিলবিহীন এককোষী উদ্ভিদকে বলে ব্যাক্‌টিরিয়া। মাটির উপর-নীচ, নানারকম খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্রাদি, শ্বাসনালী, অন্ত্র, জননাঙ্গ, চামড়ার ভিতরে বাইরে, প্রভৃতি সব জায়গাতেই এদের বাসস্থান ও আধিপত্য। তাছাড়া, সমুদ্রের গভীরে, নালা-নর্দমায়, জলের পাইপ, এমন কি সুউচ্চ পর্বত-শৃঙ্গেও এরা অসংখ্য পরিমাণে থাকে। এরা অতি নিম্ন তাপমাত্রায় (–190°C) বেঁচে এবং অতি উচ্চ তাপমাত্রায় (78°C) উষ্ণ প্রস্রবণেও থাকতে পারে। কাজেই বাসস্থান সম্পর্কে আমাদের মতো এদের কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই।

* দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে বালক বিদ্যালয়

বিজ্ঞানী লীউয়েন হোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের প্রথম দেখতে পেলেন। তিনি রডের মত আকার দেখে এর নাম দিলেন 'অতি ক্ষুদ্র দণ্ডাকৃতি প্রাণী'। পরে বিজ্ঞানী এফ্, জে, কোন এর নাম দিলেন 'ব্যাক্‌টিরিয়া'। ব্যাক্‌টিরিয়া আসলে উদ্ভিদ। কিন্তু প্রথমে ধারণা ছিল যে ব্যাক্‌টিরিয়া প্রাণী। বিজ্ঞানী লীউয়েন হোক এবং অপর বিজ্ঞানিগণ এর ফ্লাজেলা বা সিলিয়া এবং সচলতা দেখে স্বভাবতই প্রাণী পর্যায়ে ফেললেন। কিন্তু বিজ্ঞানী কোন্ সর্বপ্রথম বিভিন্ন প্রকার প্রমাণের দ্বারা দেখালেন যে ব্যাক্‌টিরিয়া প্রাণী নয়, উদ্ভিদ। তিনি দেখালেন যে সাধারণ উদ্ভিদের মতোই ব্যাক্‌টিরিয়া ব্যাপন বা ডিফিউসন প্রক্রিয়ার দ্বারা খাদ্যগ্রহণ করে, নির্দিষ্ট কোষ-প্রাচীর আছে এবং একপ্রকার সবুজ শৈবালের গঠনের সঙ্গে এর কিছুটা সাদৃশ্য আছে। উদ্ভিদরূপে ব্যাক্‌টিরিয়ার পরিচয় লাভের পর বিজ্ঞানী অ্যান্টন, ডি, ব্যারী এদেরকে থ্যালোফাইটা উদ্ভিদের অন্তর্গত একশ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করলেন।

আকৃতি অনুসারে ব্যাক্‌টিরিয়া প্রধানতঃ তিন প্রকার। যেসব ব্যাক্‌টিরিয়ার আকৃতি গোলাকার তাদের বলে কক্কাস, যাদের আকৃতি দণ্ডের মত তাদের বলে ব্যাসিলাস এবং যাদের আকৃতি প্যাঁচালো বা সর্পিলাকার তাদের বলে স্পাইরিলাম। কার্যকারিতা অনুসারে আবার ব্যাক্‌টিরিয়াকে দু-ভাগে

ছোলার শিকড়ে অর্বুদ

অর্বুদের মধ্যে ব্যাক্‌টিরিয়া
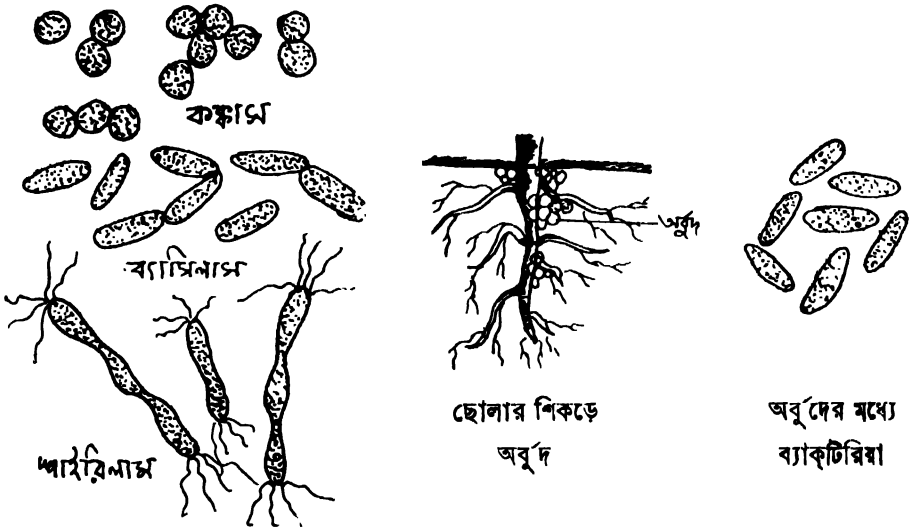
ভাগ করা যায় (1) উপকারী এবং (2) অপকারী। কয়েক প্রকার ব্যাক্‌টিরিয়া আছে যারা প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন স্থানে থেকে নানা রোগ সৃষ্টি করে। এদের বলে অপকারী ব্যাক্টিরিয়া। তাছাড়া এক ধরণের ব্যাক্‌টিরিয়া আছে যারা মানুষ ও উদ্ভিদের জীবনধারণের বহুক্ষেত্রে এমনকি আধুনিক শিল্পেও তাদের কার্যকারিতার দ্বারা বিভিন্ন উপকার করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী, বিশেষ করে মানুষ তাদের জীবনের বিভিন্ন জৈবনিক কার্যবিষয়ে ব্যাক্‌টিরিয়ার উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। তাই ব্যাক্‌টিরিয়া সজীবের পরম মিত্র। প্রথমে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই উপকারের প্রসঙ্গে আসা যাক।

মাটির মধ্যে একপ্রকার ব্যাক্টিরিয়া থাকে, যারা বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনকে এক বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা মাটির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। এদের নাইট্রোজেন-স্থিতিকারী ব্যাক্টিরিয়া (nitrogen fixing bacteria) বলে। এরা অ্যাজোটোব্যাক্টার (azotobacter) এবং ক্লসট্রিডিয়াম (clostridium)—এই দুইপ্রকার গণভুক্ত মৃতজীবী ব্যাক্টিরিয়া এবং রাইজোবিয়াম জাতীয় মিথোজীবী ব্যাক্টিরিয়া। এরা সাধারণতঃ ছোলা, সীম প্রভৃতি উদ্ভিদের শিকড়ের একপ্রকার অর্বুদের (nodule) মধ্যে থাকে। এরা নাইট্রোজেনকে সরাসরি বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রহণ করে এবং তাকে স্বদেহে নাইট্রোজেন যৌগে পরিণত করে। এইসব ব্যাকটিরিয়া যখন মরে যায় তখন তাদের দেহস্থ ঐ সব নাইট্রোজেন যৌগ মাটির সঙ্গে মিশে যায়। উদ্ভিদ জলে দ্রবীভূত অবস্থায় ঐ সব নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ পদার্থ মাটি থেকে আহরণ করে নিজের পুষ্টিসাধনের কাজে লাগায়। দেখা গেছে যে অ্যাজোটোব্যাক্টার গণভুক্ত ব্যাক্টিরিয়া এক বছরে প্রায় একর-প্রতি 5-20 কিলোগ্রাম পর্যন্ত নাইট্রোজেন যৌগ মাটির সঙ্গে সংযোজিত করে।

অনেক প্রাণী উদ্ভিদ আহার করে। ফলে প্রাণীর দেহে গিয়ে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন প্রাণীজ প্রোটিনে পরিণত হয়। প্রাণীর মৃত্যু হলে বা তাদের দেহের নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ কতকগুলি ব্যাক্টিরিয়ার সাহায্যে অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয়। এই ধরণের ব্যাক্টিরিয়াকে বলে অ্যামোনিফাইং (ammonifying) ব্যাক্টিরিয়া। কতকগুলি উদ্ভিদ এই অ্যামোনিয়াকেই সরাসরি গ্রহণ করে নেয়।

অ্যামোনিয়াকে পুনরায় নাইট্রোসোমোনাস (nitrosomonus) ও নাইট্রোকক্কাস ব্যাকটিরিয়া (nitrococcus) জারণক্রিয়ার দ্বারা প্রথমে নাইট্রাইটে পরিণত করে। পরে এই নাইট্রাইটকে নাইট্রোব্যাক্টার ব্যাক্টিরিয়া নাইট্রেট লবণরূপে জারিত করে। উদ্ভিদ তার মূল রোম দ্বারা এই নাইট্রাইট ও নাইট্রেটকে জলে দ্রবীভূত অবস্থায় শোষণ করে। উদ্ভিদের কোষস্থ সাইটোপ্লাজ্মের গঠনের আবশ্যকীয় উপাদান হল নাইট্রোজেন। তাই উদ্ভিদের দেহ গঠনে ব্যাক্টিরিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। উদ্ভিদ তার মূল দ্বারা যে অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট ও নাইট্রেট শোষণ করে তার মধ্যস্থিত নাইট্রোজেন অণুগুলি সাইটোপ্লাজ্ম গঠনে অংশ নেয়।

আবার, ডিনাইট্রিফিকেশন পদ্ধতির দ্বারা ডিনাইট্রিফাইং ব্যাক্টিরিয়া মৃত্তিকাস্থিত নাইট্রেট লবণকে পুনরায় অ্যামোনিয়া ও নাইট্রোজেনরূপে মুক্ত করে। উদ্ভিদ পুনরায় সেই অ্যামোনিয়া গ্রহণ করে দেহ গঠন ও পুষ্টিসাধনের কাজে লাগায় এবং মুক্ত নাইট্রোজেন বায়ুতে মিশে যায়। এইভাবে উদ্ভিদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যাক্টিরিয়ার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

এবার প্রাণী—বিশেষ করে মানুষের উপর ব্যাক্টিরিয়ার উপকারের প্রসঙ্গে আসা যাক। এটা প্রায় সকলেই জানে যে আমাদের দেহের বিভিন্ন রকম রোগের মূলে আছে ব্যাক্টিরিয়া। অর্থাৎ কিনা ব্যাক্টিরিয়া আমাদের অপকার করে। কিন্তু বিশেষভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রাণীজগতে বা মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাকটিরিয়া অপকারের তুলনায় উপকারই বেশী করে।

ভিটামিন B_{12} বা সায়ানোকোবালামিন ($C_{64}H_{92}N_{14}O_{14}PCO$) আমাদের রক্তহীনতা

রোগ থেকে মুক্তি দেয়। কয়েক প্রকার ব্যাক্‌টিরিয়া আমাদের দেহের ভিতর এই ভিটামিন তৈরি করে। ফলে সাধারণতঃ এই রোগ হয় না। আমাদের শরীরের অন্ত্রের মধ্যে এমন ব্যাক্‌টিরিয়া থাকে যারা তাদের দেহনিঃসৃত রস এবং কয়েক প্রকার উৎসেচকের দ্বারা প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের পরিপাকে সাহায্য করে। চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ কোন রোগীর শরীরে পেনিসিলিন প্রয়োগ করেন না। কারণ পেনিসিলিন প্রয়োগে দেহস্থিত ব্যাক্‌টিরিয়াগুলি মরে যায়। শুধু প্রোটিন সংশ্লেষই নয়, এমনকি দেহে অক্সিজেনের যখন অভাব ঘটে তখন ব্যাক্‌টিরিয়াগুলি উৎসেচকের দ্বারা গ্লুকোজ অণু ভেঙ্গে শক্তি ও কোহল মুক্ত করে।

কিন্তু শুধুমাত্র মানুষের শারীরিক বিভিন্ন কার্যকলাপেই নয়, মানুষের অর্থোপার্জনের জন্য বিভিন্ন শিল্পেও ব্যাক্‌টিরিয়ার দান অসামান্য। পাটশিল্পে পাটকে পচিয়ে তা থেকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু বের করবার জন্য কয়েক শ্রেণীর ব্যাক্‌টিরিয়া সক্রিয় সহায়তা করে। এইভাবে পাটজাত সৌখীন দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম আঁশ বের করে ব্যাক্‌টিরিয়া মানুষের সহায়তা করে। স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস নামক ব্যাক্‌টিরিয়া তার ল্যাকটিক অ্যাসিড ও উৎসেচকের দ্বারা ছানা, মাখন, ঘি প্রভৃতি উৎপাদনে সাহায্য করে। কাগজ ও বয়ন শিল্পে ব্যাসিলাস সাবটিলিস নামে এক প্রকার ব্যাক্‌টিরিয়া অ্যামাইলেজ উৎসেচকের সাহায্যে শর্করা জাতীয় বস্তু থেকে পেকটিন উৎপাদন করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। শর্করা জাতীয় দ্রবণে কোহল সন্ধান ঘটিয়ে বা ইথাইল অ্যালকোহলকে জারিত করে মাইকোডারমা অ্যাসিটি ও অ্যাসিটোব্যাকটার অ্যাসিটি নামক দু-প্রকার ব্যাক্‌টিরিয়া ভিনিগার (CH_3COOH) প্রস্তুতে সাহায্য করে। ক্লসট্রিডিয়ম নামক ব্যাক্‌টিরিয়া শর্করা থেকে বিউটাইল অ্যালকোহল ও অ্যাসিটোন প্রস্তুতে সাহায্য করে। ব্যাক্‌টিরিয়া থেকে প্রোটিয়েজ নামক উৎসেচক (enzyme) জামাকাপড়ের দাগ তুলতে প্রয়োজন হয়। কফি প্রস্তুতেও ব্যাকটিরিয়ার দেহনিঃসৃত উৎসেচক কাজে লাগে। ব্যাসিলাস মেগাথেরিয়াম নামক ব্যাক্‌টিরিয়া সিগারেটের তামাকের গন্ধের উৎকর্ষ সাধনের জন্য দরকার হয়। তাছাড়া, ভেষজ শিল্পেও বিভিন্ন বীজঘ্ন ওষুধ বা অ্যান্টিবায়োটিক (যেমন—পলিমিক্সিন, ব্যাসিট্রাসিন) ব্যাক্‌টিরিয়া থেকে তৈরি হয়।

এইভাবে সমস্ত সজীব পদার্থই ব্যাক্‌টিরিয়ার উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নির্ভরশীল। উদ্ভিদ ব্যাক্‌টিরিয়ার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আবার আমরা বা সমগ্র প্রাণীজগৎ উদ্ভিদদের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ দেহের পুষ্টিসাধন, প্রাণীদের পরিপোষণ, পরিপাক ও বিপাক প্রভৃতির অনেকাংশ ব্যাক্‌টিরিয়ার দ্বারা প্রভাবিত। আবার মানুষের অর্থকরী অত্যাধুনিক যন্ত্রশিল্পেও ব্যাক্‌টিরিয়ার দান রয়েছে। ব্যাক্‌টিরিয়া একদিকে যেমন অনেক রোগ সৃষ্টি করে, তেমন অনেক রোগ নিরাময়ও করে। তাই এক কথায় ব্যাক্‌টিরিয়া সমস্ত জীবের পরম সুহৃদ।

প্রেসার কুকার

অলোক চক্রবর্তী*

আগেকার দিনে খাদ্যদ্রব্য রান্না করতে অনেকক্ষণ সময় লাগত এবং জ্বালানীও খরচ হত অনেক। বর্তমানে প্রেসার কুকারে কয়েক মিনিটে খাদ্যদ্রব্য রান্না হয় ফলে সময় ও জ্বালানী খরচ অনেক কম হয়।

এই প্রেসার কুকার 1681 খ্রীষ্টাব্দে ডেনিস পেপিন নামে এক ফরাসী উদ্ভাবন করেন। 'চাপ বৃদ্ধি করলে স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ তরল বেশী তাপমাত্রায় ফোটে' এই নীতির উপর ভিত্তি করে তিনি এই যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।

চিত্রে একটি প্রেসার কুকার দেখানো হয়েছে। এটি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী মোটা দেয়াল
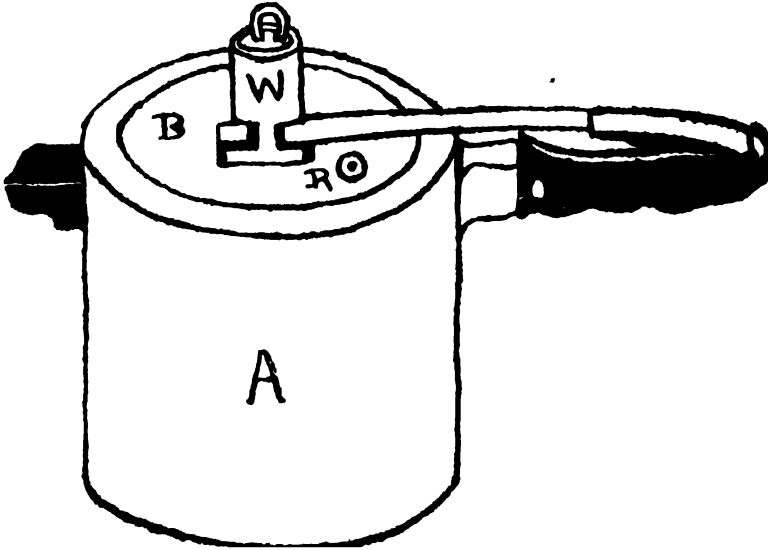
প্রেসার কুকার

বিশিষ্ট একটি পাত্র A। এর মুখে বায়ুনিরুদ্ধ ভাবে আটকানো যায় এইরূপ একটি ঢাকনা B থাকে। এই ঢাকনাতে একটি ছিদ্র আছে এবং এই ছিদ্রের মুখ একটি পিন ভাল্ভ W, বন্ধ করে রাখে। ঢাকনীতে অপর একটি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র একটি নিরাপদ ভাল্ভ R বন্ধ করে রাখে। W পিন ভাল্ভকে ওজন চাপিয়ে ছিদ্র মুখে আটকে রাখা হয়। বিভিন্ন ওজন ব্যবহার করলে পিন ভাল্ভটি বিভিন্ন চাপে ছিদ্র বন্ধ করবে এবং এর জন্য কুকারের ভিতরে ষ্টীমের চাপ বিভিন্ন

* ইছাপুর, মাঠপাড়া, কুঞ্জনিবাস, 24 পরগণা

হবে। ফলে জল অধিক তাপমাত্রায় ফুটবে। এইভাবে জলকে 120° কিংবা আরো অধিক তাপ-মাত্রায় ফুটানো যাবে। ফলে খাদ্যদ্রব্য কম সময়ে এই যন্ত্রে অধিক তাপ পাবে এবং তাড়াতাড়ি রান্না হবে।

এই ধরনের কুকারে দশ মিনিটে মাংস, ডিম প্রভৃতি সুসিদ্ধ করা যায়। এই কারণে সময় ও জ্বালানী খরচ কম হয়।
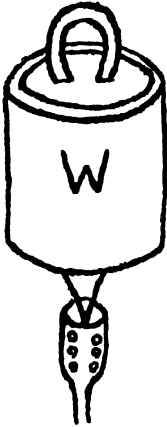
পিন ভাল্‌ভ্‌ (a) বন্ধ নিরাপদ ভাল্‌ভ্‌ (b) খোলা
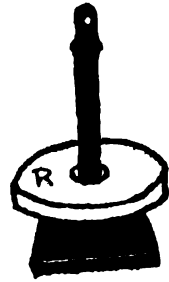
এই যন্ত্রে হঠাৎ যদি ষ্টীমের চাপ বেশী হয়ে পড়ে তাহলে নিরাপদ ভাল্‌ভটি (R) খুলে যাবে এবং অতিরিক্ত চাপ লাঘব হবে এবং পাত্র ভাঙ্গবার ভয় থাকে না।

একটি অবিস্মরণীয় পাঠ্যপুস্তক

নন্দলাল মাইতি*

ইউক্লিডের জীবনের দু-একটি কাহিনী ও তাঁর বিখ্যাত বই এলিমেন্টস্ (Elements) সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন কিছু সৃজনধর্মী রচনা দেখতে পাওয়া যায় যে-সব রচনার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য আজও অম্লান ও আদর্শ হয়ে আছে। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন ও অলংকার সম্পর্কিত রচনাগুলি তার উদাহরণ। গণিত ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছু রচনা মানুষের চিন্তা-জগতে বিপ্লব সূচনা করেছে, —বহু পুরাতন ধ্যান-ধারণার আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। গ্যালেলিও, কোপারনিকাস, নিউটন, ডারউইন, আইনস্টাইন প্রমুখের রচনা এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও সূত্র আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। আবার কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তকেও সমসাময়িককালে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যেমন,—লেজেণ্ডারের E'le'ments de Ge'ometric এক সময় এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে এই গ্রন্থ সমগ্র ইউরোপে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দিষ্ট হয়েছিল ল্যাগরেঞ্জের Me'canique Analytique বইটিকে চমৎকারিত্বের জন্যে 'a kind of scientific poem' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এগুলি কালজয়ী হয়ে উঠতে পারে নি। সেকালের জনপ্রিয়তা ও সমাদর আর একালে নাই। কিন্তু ইউক্লিডের এলিমেন্টস (Elements) 2300 বছর ধরে মহাসমাদরে পঠিত হয়ে আসছে।

ইউক্লিড খৃঃ পূঃ 300 নাগাদ আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মেছিলেন। বয়সে তিনি প্লেটোর চেয়ে ছোট এবং আর্কিমিডিসের চেয়ে বড় ছিলেন। এথেন্সে পড়াশুনা শেষ করে আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল গণিতের অধ্যাপনা করেছিলেন।

সেই দু'হাজার বছর আগে তখনো কাগজ আবিষ্কৃত হয় নি। তখনকার রীতি অনুসারে এখন যেমন মানচিত্র গুটানো থাকে, তেমনি গুটানো থাকত। এই রোল (roll) খুব বড় হলে ব্যবহার করা অসুবিধাজনক। তাই একটি বই-এর অনেকগুলি রোলের প্রয়োজন হতো। এরকম এক একটি রোলকে ইংরেজীতে 'বুক' (book) বলে। ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস' গ্রন্থটি এরকম তেরটি 'বুক' বা খণ্ডে বিভক্ত। অনুমান, 40 বছর বয়সে তিনি এটি রচনা করেন। ইউক্লিড তাঁর গ্রন্থে জ্যামিতি-বিষয়ক নানা সমস্যা সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খলভাবে লিখেছেন এবং সমাধান করেছেন। এই গ্রন্থের সব উপপাদ্য ও সম্পাদ্যই তাঁর নিজের আবিষ্কার নয়। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক গণিতবিদ্‌দের আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্কলনও করেছেন। বিখ্যাত গ্রীক গণিতের ইতিহাসকার অলম্যান বলেন I, II ও IV নং 'বই'-এর প্রমাণিত বিষয়গুলি সব পীথাগোরীয় সম্প্রদায়ের অবদান এবং VI নং 'বই'-এর বিষয়গুলি পীথাগোরীয় ও ইউডক্সাস-এর অবদান,—বিশেষ করে সমানুপাত সম্পর্কিত উপপাদ্য ইউডক্সাস-এর আবিষ্কার।

*পোঃ ঠাকুরাণীচক, ভায়া গোঘাট, জেলা হুগলী

এ-সব সত্ত্বেও ইউক্লিডের কৃতিত্ব বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নি। তিনি তখনকার সমগ্র জ্যামিতিক জ্ঞানই শুধু পরিবেশন করেন নি, জ্যামিতিতে তাঁর মৌলিক অবদানও আছে। পীথাগোরাসের নামে প্রচলিত উপপাদ্যটির প্রমাণের কৃতিত্ব নাকি ইউক্লিডের প্রাপ্য। তা ছাড়াও জ্যামিতিতে তাঁর মৌলিক অবদান কম নয়।

আজ থেকে 2300 বছর আগে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে পাঠ্যপুস্তক রচনা ইউক্লিডের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। এই গ্রন্থটি শুধু একটি পাঠ্যপুস্তক নয়, —গণিতের ইতিহাসে একটি যুগের ইতিবৃত্ত এবং যৌক্তিক পদ্ধতিতে জ্যামিতির একটি মূল্যবান উপস্থাপনা। মাত্র পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধ ও পাঁচটি স্বীকার্য অবলম্বনে প্রায় পাঁচ-শ' উপপাদ্যের ক্রমিক শৃঙ্খলে উপস্থাপনা ইউক্লিডের মননশীলতার এক বিস্ময়কর পরিচয়!

বিখ্যাত মানুষ সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা নানা ঘটনার কথা শোনা যায়। ইউক্লিডের সম্পর্কেও সেরকম দু-একটি কথা আছে। তখন প্রথম টলেমির রাজত্বকাল। তিনি নাকি ইউক্লিডকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এলিমেন্টস না পড়ে জ্যামিতি শেখার আর অন্য কোন সহজতর উপায় আছে কি না। উত্তরে ইউক্লিড বলেছিলেন, —"There is no royal road to Geometry." অর্থাৎ, জ্যামিতি শেখার কোন রাজকীয় পথ নেই। আর একটি কাহিনী হচ্ছে একবার এক যুবক ইউক্লিডের প্রথম উপপাদ্যটি পড়ার পর বলল, —"এ-সব পড়ে কি লাভ?" তখন ইউক্লিড তাঁর ভৃত্যকে ডেকে বলেছিলেন, "ও শিক্ষা থেকে কিছু লাভ করতে চাইছে, ওকে তিন পেন্স দিয়ে বিদেয় কর"।

১

বিশেষ আদালত

বিজয় বল*

কোথাও যদি সুষ্ঠু বিচার না পাই—তবে আদালতে যাব। দেশের শান্তিকামী মানুষের শেষ ভরসা আদালত। কিন্তু আদালতের রায় বা বিচার কি শেষ বিচার? গ্রামের আদালতের বিচারে সন্তুষ্ট না হলে মানুষ ছুটে যায় শহরের আদালতে, শহর থেকে আরও বড়—আরও বড় আদালতে। কিন্তু কিসের আশায়। যে ঘটনা—সে তো একবারই ঘটেছে। প্রচলিত আইনের চোখে এক আদালতে যে একবার দোষী প্রমাণিত হয়েছে, অন্য আদালতে ঐ আইনের চোখেই সে দোষমুক্ত হয় কি করে? কিন্তু কিছুটা আশ্চর্য মনে হলেও এ ঘটনা ঘটে। কারণ—প্রচলিত আইন একই থাকলেও তার ব্যাখ্যা এক-একজন বিচারকের কাছে এক-একরকম হতে পারে। কোন্ ব্যাখ্যাটি ঠিক ও কোন্‌টি ঠিক নয় তা নির্ভর করে বিচারকের নিজস্ব চিন্তাধারার উপর। বিশেষ-বিশেষ ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল আইনের
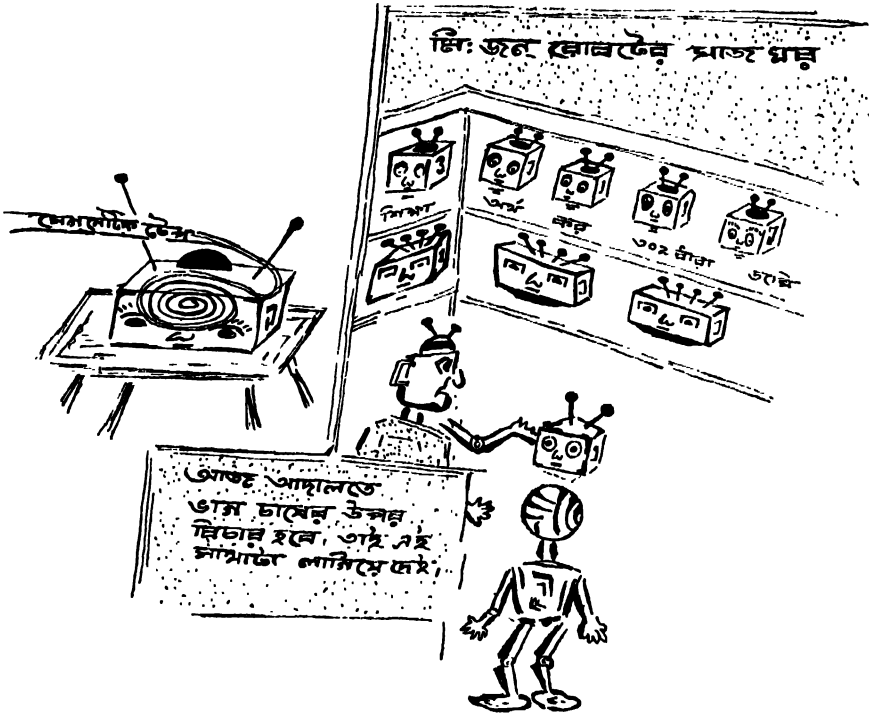
চোখে মানুষ কোন কাজটির জন্য পুরস্কৃত হবেন আর কোন কাজটির জন্য তিরস্কৃত হবেন তা যদি সুস্পষ্টভাবে কোন কাজ করার আগে জানতে না পারেন তবে সে কাজ করবেন কি ভাবে। আইনের গোলকধাঁধার মাঝে দু-একবার পথ হারাবার পর, সে পথ চলতেই ভয় পাবে, কাজ-কর্মে অনীহা জন্মে যাবে।

কিন্তু এ থেকে বাঁচার পথ কি?—হ্যাঁ আছে। বিজ্ঞানীরা এ থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পারেন। চলুন একবার ঘুরে আসি বিজ্ঞানীদের তৈরী বিশেষ আদালতে। এই আদালতের বিচারক

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। কলিকাতা-7000009

রক্ত মাংসের তৈরী কোন মানুষ নয়, মানুষেরই তৈরী যন্ত্র—মানুষ—রোবট। প্রচলিত আইনের এক-একটি বিষয়কে খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে—তাকে যথাযথভাবে সাজিয়ে, রোবটের ভাষায় রূপান্তরিত করে তাকে ম্যাগ্‌নেটিক টেপে তুলে রাখা হয়। তারপর বিচারের সময় টেপটি বিচারকের মাথায়

বিচারক মিঃ জনে রোবট।
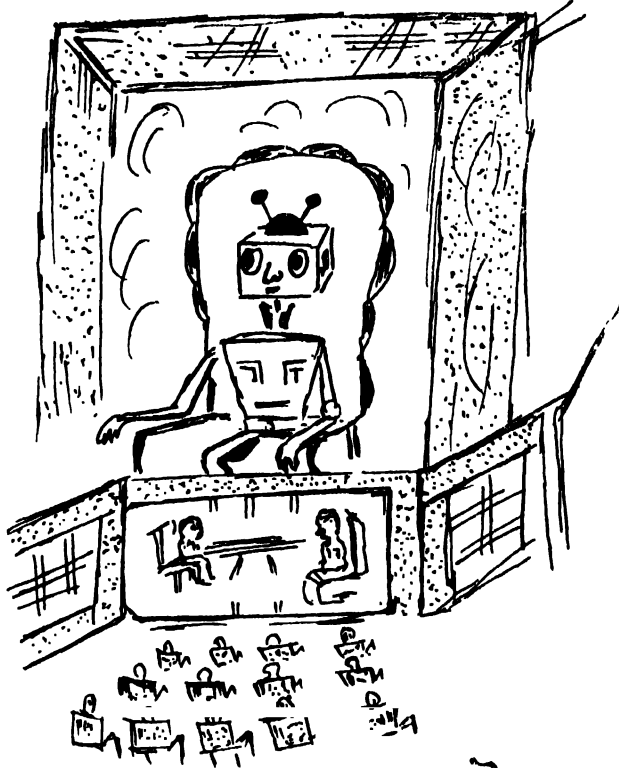
পরিয়ে দেওয়া হয়। মিঃ রোবট ঐ বিষয়ের যে কোন ঘটনাকে যথাযথভাবে ভীষণ ক্ষিপ্র গাতিতে বিচার করতে পারেন। এই বিচার সব আদালতেই সব সময় একই হয়।

অবসর সময়ে মানুষ বন্ধুর সঙ্গে মিঃ রোবট।

এক ভাবে যাহা 'না' আর এক ভাবে তাহা যদি হ্যাঁ হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে। চতুরঙ্গ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জেনে রাখ

ইন্দ্রজিৎ ঘোষ *

তারিখের গোলযোগ ঃ—

একবার ইংল্যাণ্ডে 2রা সেপ্টেম্বরের পরের দিন 14ই সেপ্টেম্বর ঘোষিত হয়।

বিষয়টি বুঝবার জন্য প্রচলিত দিন-গণনা সম্বন্ধে সম্যক ধারণার প্রয়োজন।

এক সৌরদিন = 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 47 সেকেণ্ড = 365·242218 দিন।

জুলিয়াস সীজার-এর সময় জ্যোতির্বিদগণ 365·25 দিনে সৌর বৎসর গণনা করতেন। তাঁরা দেখলেন যে লৌকিক হিসাবে বৎসর গণনায় 4 বৎসরে 1 দিন কম ধরা হয়। এজন্য সৌর ও লৌকিক বৎসরের সমতা রক্ষার জন্য 46 B.C.-তে সম্রাট জুলিয়াস সীজার নিয়ম করিলেন যে প্রত্যেক চতুর্থ লৌকিক বৎসরে 366 দিন ধরা হবে। এই চতুর্থ বৎসরগুলিকে পরিবৎসর (leap year) বলা হয়। প্রত্যেক পরিবৎসরে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে 1 দিন যোগ করে উক্ত মাস 29 দিন করা হয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে জ্যোতির্বিদগণ দেখলেন যে সীজারের নিয়মানুযায়ী বৎসর গণনায় প্রতি বৎসর (365·25—365·242218) বা 0·007782 দিন বেশী ধরা হয়। সুতরাং 400 বৎসরে (400×0·007782) বা 3·1128 দিন বা 3 দিন বেশী ধরা হয়েছে। এজন্য 1582 A. D.-তে রোমের প্রধান ধর্মযাজক পোপ গ্রেগরী 400 বৎসরে 3 দিন কমাবার জন্য একটি সংশোধন করেন। 400 বৎসরে 3টি শতাব্দীর পরিবৎসর বাদ দেওয়া হল। [ইংরেজী বৎসর সংখ্যাকে 4 দ্বারা ভাগ করলে যদি অবশিষ্ট না থাকে তবে সেই বৎসরকে পরিবৎসর বলা হয়, কিন্তু বৎসর সংখ্যার শেষ দুটি অঙ্ক '0' হলে (i.e. 1400, 1500 etc.) 400 দ্বারা বিভাজ্য বৎসর পরিবৎসর হবে, অন্যথায় নয়।]

গ্রেগরীর সংশোধন ইউরোপের রোম্যান্ ক্যাথলিক দেশগুলিতে 1582 খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত হয় কিন্তু ইংল্যাণ্ডে হয় 1752 খ্রীষ্টাব্দে হিসাব অনুযায়ী ভুলের মাশুল দিতে হয় 11টি দিনের বিনিময়ে।

[Nota Bene :—উপরিউক্ত নিয়মসমূহ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও প্রতি 400 বৎসরে 0·1128 দিন বেশী ধরা হয়। সুতরাং 3600 বৎসরে (0·1128×9) বা 1·0152 বা 1 দিন কমাবার প্রয়োজন হবে।]

* 10 1, গোঢ়াবাটুগি লেন, কলিকাতা-700013

সর্বভারতীয় বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলন

গত 14ই ও 15ই আগষ্ট, '79 গোবরডাঙা থাঁটুরা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ক্লাবগুলির কাজকর্ম, বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনের কার্যক্রম ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে মত বিনিময়ের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

14ই আগষ্ট, '79 বেলা 3-30 মিঃ-এ সভা উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়। সভায় 32টি বিজ্ঞান ক্লাবের পক্ষে 77 জন প্রতিনিধি, এবং শতাধিক বিজ্ঞান ক্লাব অনুরাগী উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবাংলার বাইরে থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীবিনোদ জৈন (দিল্লী), শ্রীজে, এন, দীক্ষিত (উড়িষ্যা), শ্রীজে, বি, আর, প্রসাদ (রাঁচি)। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এই রাজ্যের কৃষি বিশেষজ্ঞ শ্রীগণেশচন্দ্র সরকার, মৌমাছি বিশেষজ্ঞ শ্রীকার্তিকচন্দ্র দে, মহিলা বিজ্ঞান ক্লাব সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী কল্যাণী দাশগুপ্তা, শ্রীমতী রেখা দাঁ। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে আর্থিক সাহায্যের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। বিজ্ঞান ক্লাবগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য এ ধরনের বিজ্ঞান সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে (15ই আগষ্ট) সভার উদ্বোধন হয় সকাল দশটায়। অভিজ্ঞ কৃষিবিদ শ্রীগণেশচন্দ্র সরকার কৃষিকাজে তাঁর নানাধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা আলোচনা করেন। তিনি টবে লঙ্কা গাছের ফলন দেখিয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। এরপর বিজ্ঞান ক্লাবের প্রতিনিধিরা বিজ্ঞান ক্লাবের নানা সমস্যা—যেমন, স্থানাভাব, অর্থাভাব, বিজ্ঞান শিক্ষকদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। বিজ্ঞান ক্লাব-গুলিকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত করা যায়, কিভাবে বিজ্ঞান ক্লাব স্বনির্ভর কর্মপ্রযুক্তিমূলক প্রকল্পেও (যেমন, মৌমাছি পালন, মৎস্য-মুরগী-গো-ছাগ পালন) কাজ করতে পারে সে সম্পর্কেও বিভিন্ন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। এই উপলক্ষে একটি 36 পৃষ্ঠার একটি 'বিজ্ঞান ক্লাব পরিচিতি সংখ্যা' প্রকাশ করা হয়েছে।

সম্মেলনের সমাপ্তি ভাষণে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা সকলের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসে বিজ্ঞান স্বাক্ষরতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বিশেষ সাধারণ সভা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গত বার্ষিক সাধারণ সভায় বিধিনিয়মাবলীর সংস্কারের জন্য যে বিশেষ সভা ডিসেম্বর '79 মাসের মধ্যে আহ্বানের কথা ছিল, বর্তমান কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্তানুযায়ী আগামী 30শে ডিসেম্বর '79 (রবিবার) বিকাল 4টায় 'সত্যেন্দ্র ভবনে' (পি 23 রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006) ঐ বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সকল সভ্য-সভ্যাদের ঐ সভায় যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিবেদক
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
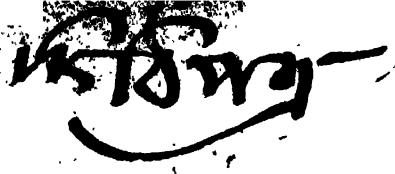
বন্যা-নিয়ন্ত্রণের সঠিক পথ

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠায় শ্রীশিবরাম বেরা মহাশয়ের প্রবন্ধ বন্যা প্রতিকারে আগ্রহী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে বন্যা প্রতিকার প্রচেষ্টায় উদ্যোগী করে তুলবে বলে আশা করা যায়।

এখানে তাঁর বক্তব্যের কিছু কিছু অংশ সম্বন্ধে আমি তাঁর এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীবেরা বলেছেন "প্রচুর বৃষ্টিপাত বন্যার মূল কারণ"। কিন্তু বন্যার মূল কারণ হল বৃষ্টির জলের নির্গমন পথের বাধা। আবার, এই বাধার মূল কারণ হচ্ছে সাগর হতে উঠে আসা জোয়ারের জল, যা বৃষ্টির জলকে নেমে যেতে বাধা দেয়। আর একটি কারণ হল উপযুক্ত পরিমাণ নির্গমন প্রণালীর অভাব।" শ্রীবেরা সেই কারণটির কথা উল্লেখ করেছেন।

শ্রীবেরা বলেছেন, "নদীখাতকে সরল করলে নদী খাতকে গভীর রাখা যায়।" এটা নদ-নদীর ক্ষেত্রে ঠিক নয়। নদী প্রবাহের দ্বারা সৃষ্ট ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা নদী তার গর্ত গভীর রাখে। এটাই প্রাকৃতিক পদ্ধতি। ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থান বিশেষতঃ ভূ-পৃষ্ঠের জলতলের দ্বারা নদীর চলার পথ নিয়ন্ত্রিত হয়। জনশক্তির দ্বারা বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নদীখাতকে রক্ষা করা সহজ কাজ নয়, সম্ভবও নয়; বিশেষত গরীব দেশের পক্ষে। নদীর পাড়ে বাঁধ দিলে নদীর গভীরতা নষ্ট হয়। নদীর পাড়ে বাঁধ দিয়ে নদীর জল বহন ক্ষমতা বাড়ানো যায় না। শাখা নদীর দ্বারা জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করা প্রকৃষ্ট পন্থা। দ্বারকেশ্বর নদের শাখা নদী কানাদ্বারকেশ্বর (পূর্ব নাম রত্নাকর) মজে যাওয়ায় দ্বারকেশ্বর বন্যা গোঘাট থানাকে প্লাবিত করছে। কানাদ্বারকেশ্বরের খাতকে গভীর করলে তার জলের প্রবাহ রূপনারায়ণের খাতকে গভীর রাখার প্রাকৃতিক উপায় করে দেবে। দামোদর দ্বারকেশ্বর সংযুক্তির যে প্রস্তাব শ্রীবেরা করেছেন তা ভয়াবহ। দামোদরের খাতের গভীরতাকে উদ্ধার করে তার প্রবাহ যাতে পরিপূর্ণভাবে হুগলীতে পড়ে তার ব্যবস্থা করা সবিশেষ প্রয়োজন। এর ফলে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে হুগলীর খাতে জোয়ারের জলে বাহিত পলির অপসারণ সম্ভব করে তুলবে। দ্বারকেশ্বর ও দামোদরের ভৌগোলিক অবস্থানহেতু তাদের চলার পথের ঢাল

পলি অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভরবেগের সৃষ্টি করে। এই দুটির সংযুক্তি তাদের অববাহিকা অঞ্চলে বন্যার প্রাবল্য সৃষ্টি করবে এবং তাদের প্রবাহের ভরবেগের প্রয়োজনের অপমৃত্যু ঘটাবে। নদীর উৎসদেশে একান্ত অপ্রয়োজনীয় জলাধার তৈরি করে দামোদর জলের প্রথম বর্ষার ভরবেগের গতি বন্ধ করে তার খাতের মৃত্যু ঘটানো হয়েছে এবং হুগলীর খাতের মরণকে আহ্বান জানানো হয়।

হুগলী নদীর মোহনার পৌর্তিক কাজের রূপরেখা শ্রীকপিল ভট্টাচার্য একটি সংস্থার (ইন্‌জিনিয়ারগণের) মুখপত্রে আট বছর আগে প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীবেরা যে স্কীমটি দিয়েছেন তাহা প্রায় একরূপ। তবে স্কীমটিতে শ্রীবেরার কিছু মৌলিকতা লক্ষণীয় এবং তা প্রণিধানযোগ্য বলেই মনে হয়।

বন্যার প্রতিকারের পদ্ধতিগুলি হল :—

1. নদী-অববাহিকার সমতল অঞ্চলে অজস্র খালবিল (মাঠে মাঠে এগুলি আছে) এবং নদী খাতের সংস্কার করা। এ কাজ এখন করা যায় বিশেষ করে নদী খালের খাত সংস্কারের কাজ বর্ষায় সহজ এবং সস্তায় করা সম্ভব।

2. সমতল এলাকায় বৃক্ষ রোপণ—বিশেষ করে অশ্বত্থ, বট, নিম, বাবলা, এবং প্রতিটি পাকা রাস্তার দুপাশে দেশী আম, খুদীজামের গাছ লাগানো হোক। এছাড়া সর্বত্র জ্বালানী গাছের জঙ্গল তৈরি করা হোক। গ্রামের রাস্তার ধার এবং পুকুরের পাড় এদের উপযুক্ত জায়গা। বাঁশবন এবং তাল-খেজুর গাছ বৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়ায় বৃষ্টি বণ্টনের তথা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হবে।

3. 1 ও 2 নং প্রক্রিয়ার সাথে সাথে আজ যেটি অবশ্যই করতে হবে সেটি হলো হুগলী মোহনার সংস্কার। অন্যথায় সব বিফল। সবার আগেই এর ব্যবস্থা করতে হবে।

রাধানাথ ঘোষ
সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ বন্যা প্রতিকার সমিতি

সম্পাদনা সচিব—রতনমোহন খাঁ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত
এবং গুপ্তপ্রেস 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।